পোকা

গুরু বিশ্বাস

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

অকুণ্ঠ প্রীতির অকৃপণ প্রকাশে
যে নারী চেয়েছে আমার পূর্ণতা
অথচ যাকে কিছুই দেওয়া হয়নি
সেই বরাঙ্গনাকে-

এই লেখকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস

মতিন মিয়ার মরিফত

পরাজিত পদাতিক

বানভাসি

বইশি

স্বর্গ

কুমার প্রকৃতীশ বড়ুয়া (লালজী) ফাঁদ পেতে হাতি ধরতেন, আমি ধরতাম মনে। একই অরণ্যে পরিভ্রমণ কালে তাঁর অসীম অভিজ্ঞতার গল্প শুনেছি। শুনেছি ডুয়ার্সের চিরসবুজ বনভূমির বিস্তার ছিল পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত। এই হাজার হাজার মাইল অবিচ্ছিন্ন অরণ্যের নির্জনতা জুড়ে ছিল হস্তিযূথের স্বাধীন বিচরণ। ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনে তাদের দঙ্গল চলত শিলিগুড়ির বনাঞ্চল থেকে ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত। তাদের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে যেত রাজনৈতিক সীমারেখা, মুছে যেত ভৌগোলিক ভেদাভেদ। কাজেই যে হস্তিযূথকে এ বছর শিলিগুড়ির আশেপাশে দেখা গেল পর বছর হয়ত তাদেরই বিচরণ ক্ষেত্র হল আসামের প্রত্যন্ত প্রদেশ। পরের বর্ষায় সেই দলেরই দেখা মিলল ব্রহ্মদেশের দুর্গম অরণ্যে সুখাবেশে ভ্রাম্যমান।

এই সুবিস্তীর্ণ বনভূমি ধুয়ে গেছে জনবন্যার চাপে। সেই ধ্বস্ত উৎসাদিত আদিম অরণ্যের অন্তিম আর্তনাদই আমার উপন্যাসের পটভূমিতে। এই উপন্যাস লিখতে সুরু ক'রেছিলাম একদিন মনের টানে অন্তর্বেদনার চাপে, ভাবিনি এত শীঘ্র এর প্রকাশ ঘটবে। আমার নীরবে লেখা নিভৃতেই ছিল আপন গোপনীয়তার গভীরে। শ্রীসহদেব সাহার আগ্রহে এবং আনুকূল্যে সেই বিজনবনের সূর্য-না-দেখা অন্ধকার প্রকট হচ্ছে মুদ্রিত পুস্তকের আলোকিত জগতে। সাহিত্য পাঠকেরা যদি এর রসাস্বাদন ক'রতে পারেন তো সাধুবাদ সহদেববাবুরই প্রাপ্য।

[সুধী পাঠক-পাঠিকা, এই উপন্যাসের ১২১-১৩৬ মুদ্রিত পৃষ্ঠা ১২৯-১৪৪ পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।]

কোন ঘটনা বিশ্বাস করা বা না করা সেই ঘটনার ওপর যতটা নির্ভর করে তার চেয়েও বেশী করে যিনি বিশ্বাস ক'রছেন বা না ক'রছেন তাঁর নিজের মানসিকতার ওপর। অনেকসময় দৃশ্যগত বস্তুর দৃষ্টিকোণ যেমন তার মূল্যমানে তারতম্য ঘটিয়ে থাকে তেমনই ঘটনাকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গীও তারতম্য ঘটায় তার গুরুত্বের বা মূল্যায়নের। এই জন্যেই বলা হয়ে থাকে যে কোন কিছু বিশ্বাস করা বা না করা মানুষমাত্রের নিজস্ব ব্যাপার। যেমন আমার বর্তমান কথাগুলো—এ আপনারা বিশ্বাস কেউ ক'রতেও পারেন, আবার না-ও ক'রতে পারেন যে কেউ ইচ্ছামত। তাতে ঘটনার তারতম্য হবার আর উপায় নেই কারণ প্রত্যেকটি ঘটনাই পরবর্তীকালে এমন একটি সত্যে পরিণত হয় যার কোন ব্যতিহার থাকে না। এই ধরুন না কেন নিরাপদ পাকড়াশীর মৃতদেহ যেদিন তার শোবার ঘরে ভোরবেলাতে প্রথম ঘুম ভেঙেই আবিষ্কার ক'রল তার স্ত্রী, চারপাশের অনেক লোকই দেখতে এসে আপন মনের ভাবনা অনুসারে কৌতূহল নিবৃত্ত ক'রে ফিরে গেল স্বীয় গৃহকর্মে, আপন আপন বুদ্ধিমত ব্যাখ্যাও করল সবাই মৃত্যুর—এমন কি ডাক্তার পর্যন্ত। তাই বলে যে সত্য সকলের অজ্ঞাতে নিঃশব্দে রইল তা হ'ল দীর্ঘকালের অনাহারজনিত সূক্ষ্ম অবক্ষয়ের কারণে অকালে কালের কবলে দেহদান ক'রতে হ'ল শান্ত চরিত্রের নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ নিরাপদকে। এই গোপন ঘটনার কাছ দিয়ে কারও অনুমান হাঁটল না বলে দুঃখ পেয়ে যে সত্যের কোন রূপ বদল হ'ল তা কিন্তু নয়। এমন কি বিলাপরতা নিরাপদজায়া যখন স্বামীর মৃতদেহ নামক জড় বস্তুটির কাছে শোকের বিকারে বারংবার জানতে চাইছিল তাকে ছেড়ে যাবার কারণ, সে নিজে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ক'রতে পারল না সেই সত্যটিকে যা সন্ন্যাসীর জীবনচর্যার মত রূক্ষ ও নির্মম।

আমিও আজ আপনাদের সামনে আমার মনের ভেতর থেকে যে কথাগুলো তুলে আনছি আপনারা বিশ্বাস অবিশ্বাস যে যেমন খুশী করুন না কেন স্বাধীনতা দেওয়া রইল। প্রয়োজন আমার নিজের কিছুই নেই, অথবা অন্য কারও এ আলোচনায় কোন উপকার হবে বলে আমি ভাবি না, বলতে পারেন তবে কেন অবতারণা। কারণ কিছুই নেই; শুধু মাত্র স্বতোৎসারিত স্মৃতি আমার সত্তার সম্মুখে ঝরে যাওয়া অবিরাম বর্ষাধারার প্রাক্‌মুহূর্তটির মত উন্মুখ। তাছাড়া আর একটা কথা আছে যা প্রধান তা হ'ল কোন কিছু কারও উপকার ক'রতে পারে এবম্বিধ বিশ্বাস আমার মনাসীন নয়। প্রসঙ্গত একটা কথা মনে এসে গেল; এই যে এই বৃষ্টি অঝোরে ঝরছে—সে কি কোন উদ্দেশ্যে? মোটেই নয়। সে ঝরছে আপন প্রাণের আবেগে, তাতে ভূমি সিক্ত হয় হোক, বৃক্ষ রসময় হয় হোক, নদী বেগবতী হয় তাই হোক। আমার এ স্মৃতিও

তাদৃশে। যদি আপনারা কেউ এই স্মৃতিরেখার বিশ্বাসে আনন্দিত হন সে তাঁর নিজস্ব, যদি কেউ অবিশ্বাসে হন কুণ্ঠিত সে-ও তাঁর আপন সংকোচন মাত্র। আমাদের সামাজিক অবস্থানে আমার কথার প্রতি আপনাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু তারতম্য আগে হ'লে হ'তে পারত, এখন আমি সে সম্ভাবনার বাইরে। এখন সে দূর অতীতে আমার সেই প্রথম অপকর্ম—অপকর্ম কেন বলব, আপনারা কেউ কেউ বলেন বলুন—স্মৃতির অতীত প্রায়। অথচ সেই ব্যাপারটাই আমার এখন মনে আসছে যেটাকে অপপ্রচারের তলোয়ার হিসেবে তুলে ধরেছিল অনেকে মিলে, আমাকে খণ্ডিত ক'রতে, ক্ষুদ্র ক'রতে। আঘাত একেবারে লাগেনি তা নয়, তবে সেই আঘাত তীব্র ছিল না বলে আমার হৃদয়ের বিশল্যকরণী তাকে আরোগ্য ক'রেছিল অচিরেই। এই আবার একটা বড় গোলমালে নিজের কথাতেই নিজে জড়িয়ে পড়লাম—হৃদয়। আসলে এ ব্যাপারটা অর্থহীন একটা শব্দের মত। হৃদয় শব্দটি একটি ফাঁকিবাজীর নামকরণ। কারণ ওটা কিছুই নয়—দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, অনুভব করা যায় না, তার শব্দ নেই, বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, স্বাদ নেই। শুধু আছে একটা নাম। একটা শব্দ মাত্র। অস্তিত্বহীন পদার্থ—শুধু নাম দিয়েই যার পরিচয়, এবং মূল্যায়ণ; সবই কাল্পনিক। ঠিক তাই কি? অথবা, ঠিকভাবে কি বলা হ'ল? আসলে এমনই কিছু শব্দ দিয়ে আমরা নিজেদের পৃথক করবার চেষ্টা করি মাত্র। অন্য সকলের থেকে পৃথক—আর আর প্রাণীদের থেকে। কিন্তু সে এক অর্থহীন প্রয়াস কারণ আসলে আমরা অন্য প্রাণীজগৎ থেকে পৃথক নই—একটা গুবরে পোকা, ঘুরঘুরে পোকা, উচ্চিংড়ে বা গঙ্গাফড়িংএর থেকে আমাদের মূলগত পার্থক্যটা কি? সত্যিই কি কিছু আছে? আমি অনেক ভেবে দেখেছি—নেই। এই সত্য স্বীকার করায় দীনতা অনুভব করতে পারেন অনেকে—অকারণ। নেহাৎই অকারণ দীন চিন্তা সে সব। নিজেকে বিশ্লেষণ করুন—সারাজীবনের সমস্ত কাজগুলো একটা একটা ক'রে মনের সামনে মেলে ধরুন, তারপর আমাকে বলবেন কি পেলেন।

যাক, যেকথা বলছিলাম। অবশ্য এভাবেও ভাবা যেত—এই উপলব্ধি আসবার ঘটনাটা দিয়ে শুরু ক'রলে প্রাসঙ্গিকই হ'ত। কিন্তু সে যাক বরং যেভাবে চাইছিলাম সেইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের পদ্ধতিতেই বলি কথাগুলো। পর্যায়ক্রমে যথাস্থানে পেঁছে যাব সব বিন্দুতেই। অলকানন্দার কথা। আজ আমার চারিদিকে অবিশ্রাম বৃষ্টিধারা ঝরছে—ঝরছেই—ঝরছেই। বিরামহীন, মনে হচ্ছে অন্তহীন বর্ষণে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হয়ে যাবে—জলময় চতুর্মণ্ডলে আমি এই উঁচু পাহাড়টায় বসে থাকব—একা; নিঃসঙ্গ একা। কি জানি এতদিন বাদে হঠাৎ কেন অলকানন্দার কথা মনে হ'ল আমার! অথচ অলকানন্দা—আমার সঙ্গে কয়েক কোটি আলোক-বর্ষ দূরত্বে তার মানসিক অবস্থান। সে এখন—এই সময়ে—নিশ্চয়ই এখন তার পরিমণ্ডলেও কালো মেঘ ঘন বর্ষার এমনি ধারাপাত সুরু ক'রে সমস্ত বিশ্বজগৎকে

আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে! হ্যাঁ বিশ্ব তো ততটুকুই যা আমার চোখের চারপাশে দেখি —মনের চারপাশে পাই। হয়ত এখন এমনই ধারাস্রোতে প্রকৃতির সঙ্গীত সে-ও শুনছে—না না, তা সে পারছে না কারণ নাগরিক জীবন তার, সে এক নাগরিকা মানবী। না পোকা। অন্য জীবন একটি গুটিপোকার জীবন যাপন ক'রছে। প্রকৃতির সঙ্গীত—শুনছি আমি, সামনের বিশাল জামগাছটায় ভিজতে থাকা পাখী ক'টা, আর কে জানে অন্যান্য ঘরগুলোয় বসে কেউ শুনছে কিনা! সঙ্গীত সবাই ভালবাসে না তো! অলকানন্দা কিন্তু ভালবাসত। দূরে কোন তরঙ্গে ধ্বনি ভাসলেও সে উৎকর্ণ হয়ে বলত, শোন কি সুন্দর গান! শুনতাম আমিও—কোন পুরুষ কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছে বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে বা কোন সুরেলা নারীকণ্ঠের সে এক পরিচিত সঙ্গীত। কিন্তু অলকানন্দা কোন দিন শোনে নি এই হুইটসিং পাখীর গান, কোবেলা পাখীর গান, বৃষ্টির ডানায় চেপে আকাশের গান, ঝড়ো বাতাসের তালে শরীর দুলিয়ে বিশাল ইয়াঙ্গো গাছের গান—আরও কত অনন্ত সঙ্গীত যা আমাদের পাহাড়ের ঝোরাগুলো হয়ত সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে আপন আনন্দেই গেয়ে আসছে।

না শুনুক। তার শোনার প্রয়োজন নেই। সে বরং তার নরম কেদারায় শরীর ডুবিয়ে বসে সেই সঙ্গীতই শুনুক যা তাদের স্বরচিত। নিজের গান। হ্যাঁ গান তো প্রত্যেক পোকারই থাকে—ঝিঁ ঝিঁ পোকার গান, ভোমরার গান, এমন কি গান আছে আরশোলারও। আমাদেরও গান আছে, আছে অলকানন্দাদেরও। জীবনে যার যা ভাল লাগে সে তাই করে। এই যেমন সেদিন দেখি একটা পাখি ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আপন মনেই সে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে উঠে পড়ল, গা ঝেড়ে উড়ে গেল। এই যে ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়া এ তো তার ভাললাগা—ইচ্ছা। ইচ্ছা অলকানন্দারও—হ্যাঁ আমারও। তবে আমার ঠিক ইচ্ছা নয় ইচ্ছার চেয়ে অনেক বেশী শক্ত, সবল মানুষের চেয়ে অনেক বেশী লম্বা—না কে তা বলতে পারব না কারণ আমি আজও তাকে সামনাসামনি দেখিনি—সে-ই আমাকে বাঘ যেমন বন্য মহিষ শিকার করতে পারলে তাকে পিঠে ক'রে বয়ে নিয়ে চলে তেমনই ক'রে নিয়ে চলল। নগর থেকে নগরে, গ্রাম থেকে পেরিয়ে গেল গ্রাম, নদী, পর্বত, লোকালয়,অরণ্য—সব যে আমায় পিঠে ক'রে বইল। তারপর ক্লান্ত হয়ে এই পাহাড়ের ওপর নামিয়ে দিয়ে আমার ঠিক পেছনটিতে বসে রইল পাহারা দিতে। পালাব? পারি না। আমার তিন পাশে দেখি সে নেই, অনুভব করি পেছনটিতে বসে আছে, যেই চট ক'রে পেছন ফিরি আবার দেখি সে পেছনে, আমারই মত ক্ষিপ্রতায় ঠিক আমার পেছনটায় গিয়ে বসে পড়ে। কি ক'রে বুঝি? জানেন, বুকের মধ্যে তার অবস্থিতি আমি টের পাই—মনে হয় আমার বুকের মধ্যে তার বাসা। ভারী পাথরের মত ভারী, না তাও নয় বাতাসের মত ভারী। কথাটা ঠিক

মনে ধরছে না, না ? বাতাসের ভার আছে জানেন না ? আপনাদেরই বিজ্ঞানে তো আছে 'এয়ার প্রেসার', সে কি ওজন নয় ? বাতাসের ভার আছে, কখনও কখনও ভয়ানক সে ভার। আমার বুকের মধ্যে যে ভার তা যদি পাথরের হ'ত তবে কোন না কোন সময় তাকে উল্টে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠতাম, উহুরু ! স্বাধীনতা !—হয় না।

আমার কথাগুলো আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না ? না হবারই কথা, কারণ, পাওনাদারের টাকা ফেরৎ দিতে এসে কোন দেনাদার যদি বলে টাকাটা দুজন গুণ্ডা কেড়ে নিয়েছে তাহ'লে বিশ্বাস না করাই আপনাদের অভ্যেস। না করাটা কোন অন্যায়ও নয়। সেই মানসিকতায় অর্থাৎ অবিশ্বাস করার স্বাভাবিক প্রেরণার বশে যদি আমার কথাগুলো বিশ্বাস না করেন, প্রথমেই বলে নিয়েছি যে তাতে আমার নিজস্ব কোন অসুবিধে নেই, ঘটনার যথার্থতারও কোন পরিবর্তন হবে না। এই যে ধরুন না কেন আজ জীবনের এই মধ্যাহ্ন বেলায় দীর্ঘকালের ব্যবধান এড়িয়ে অলকানন্দার কথা যে আমার মনে পড়ছে একথাও যদি আপনারা অবিশ্বাস করেন তাতেই বা আমার কি ? কারণ অলকানন্দাকে যে আমার মনে পড়ছে এ ঘটনার পরিবর্তন হবে না ! হ্যাঁ, হয়ত কেউ ভাবতে পারেন, আমি জানি বিশ্বাস যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা আমাকে বহু অতীত থেকে জানেন, ত'াদেরই কেউ বা হয়ত ভাবছেন, কৃতকর্মের অনুশোচনার জন্যেই মনে পড়ছে অলকানন্দাকে। এদের মধ্যে বিশেষ ক'রে কয়েকজনের কথা বলি যেমন শৈবাল, নীতিন, জয় আর মাধুরী—এরা নিশ্চয়ই মনে ক'রছে আমার কৃতকর্মের দরুণ অনুশোচনার বসেই অলকানন্দাকে মনে পড়ছে। আর এও জানি তারা একথা ভেবে বেশ তৃপ্তি লাভ ক'রছে, কারণ—এক, অলকানন্দার এরা বিশেষ বন্ধু এবং দুই, এদের মধ্যে প্রথম তিন জন একটু ঈর্ষান্বিত ছিল অলকানন্দার সঙ্গে আমার সম্পর্কের জন্যে। নীতিন আর জয় ছিল অলকানন্দার সহপাঠী, মাধুরীও। শৈবাল আমার বন্ধুও। কিন্তু শেষ দিকে শৈবাল যেন একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল। তা হওয়া স্বাভাবিক। শৈবাল এনেছিল বিশাল উত্তরাধিকার, সুদর্শন কান্তি, আমার চেয়ে আর বেশী কি ছিল জানি না। তবে ওই দুটোর জোরেই সে আমার চেয়ে যোগ্যতর ছিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই হয়ত ভেবেছিল অলকানন্দা তারই দিকে ঝুঁকবে। কিন্তু সবকিছুর সঙ্গে যা বুঝেছি একটু বেশী ছিল ওর অজ্ঞানতা, সব মানুষ যে বিশ্বাস নষ্ট করে না এই সত্যটা ছিল বোধ করি তার অজ্ঞাত। তাই অলকানন্দার কাছে ব্যবহারিক ভদ্রতার বেশী আর কিছু না পেয়ে সে হয়ে পড়ল ঈর্ষাকাতর। আর অলকানন্দা নিজে বুদ্ধিমতী বলেই নীতিন জয় প্রসঙ্গে বলত, একইক্লাসে পড়া ছেলের সঙ্গে প্রেম ? ছোঃ। তুমি বলছ কি বলে ? ভবিষ্যৎ ভেবে চলতে হবে তো ? অঙ্কশাস্ত্রে দুর্বল ছিলাম তাতে কি ? আমি বরাবর হিসেব করে চলি। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার মুখেই তোমার জন্মদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম,

মনে আছে? সে মশাই তোমাকে উপহার দেবার জন্যে নয়, তোমার বয়েসটা জানতে। আমি পট ক'রে বুড়ো হয়ে যাব আর তুমি যৌবন নিয়ে দৌড়োদৌড়ি ক'রবে সেটি হচ্ছে না মশাই।—স্বীকার করছি সেদিন সেই তাজ্জব কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম। এতদিন ধরে কবি শিল্পীদের কথা বলে যা জেনে এসেছি, সত্য বলে যা জেনেছি সেই সব দর্শন মাত্র প্রেম, যার সঙ্গে মজে মন, ইত্যাদি সমস্ত কথার সম্পূর্ণ বিপরীত হিসেব কষে ভালবাসার ইতিহাস শুনে ভির্মি লেগে যাবার উপক্রম। তাহ'লে যা জেনেছিলাম সবই মিথ্যে! সত্য হোক মিথ্যে হোক অলকানন্দার দূরদর্শিতা প্রশংসনীয়। আমি তো তাই ভাবতাম কিন্তু সে ভাবনাকে আমিই নষ্ট ক'রে দিয়েছি। এবং এই একটা কারণেই আমি দুঃখিত। আর এই জন্যে মাঝে মাঝে আমারও খারাপ লেগেছে যে হয়ত আমার অবর্তমানে অলকানন্দাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বিদ্রূপ ক'রতে আসছে তার বন্ধু নীতিন, জয় ইত্যাদিরা, আমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে ধিক্কার দিতে আসবে শৈবাল। এ সবে অপমানিত বোধ করবে অলকানন্দা এইটুকু মাত্রই যা আমার দুঃখ, নইলে অলকানন্দার জন্যে আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। সাদা এ্যাপ্রোন গায়ে দিয়ে গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো অবস্থাতেই তাকে যা মনমোহিনী দেখায় তাতে মূল্যবান রেশমী শাড়ীর ওপর বরমাল্য ঝুললে দু-চারটি লঘুচিত্ত যুবকের নিশীথ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাও কিছু বিচিত্র নয়। তার চেয়ে বড় জিনিষ আমাদের প্রগতিশীল সমাজে যার জন্যে সুন্দরী গুণবতীদেরও মূল্য কমে বাড়ে সেদিকেও কোন ঘাটতি নেই অলকানন্দার। ডাক্তারেরই মেয়ে সে এবং এমনই তিনি ডাক্তার যে তাঁর কাছে পেঁছোতে হলে আগে থেকে জেনে নিতে হয় কখন তিনি সময় দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারবেন। কিন্তু যত যাই হোক আয়োজন যতই হোক না কেন আসলে সবই ওই এক, পোকার জীবন, জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উপশম, ব্যস। এটাকেই এক এক শ্রেণীর পোকা এক এক ভাবে ক'রে থাকে। তার বেশী আর কি ক'রবে অলকানন্দা? আর সত্যিকথা বলতে কি সেই ঘৃণাতেই তো—

তাহ'লে সেই কথাটাই বলি শুনুন। আপনারা অনেকে যেমনটি শৈবাল, নীতিন আর মাধুরীদের কাছে শুনে শুনে বলেন ঘটনাটা কিন্তু তা নয়। বেইমানী আমি করিনি। কারণ অলকানন্দার প্রতি মনোভাবনা বিন্দুমাত্র বদলায়নি আমার। আজও ঠিক তেমনই ভালবাসি তাকে—না না ভুল বললাম। ভালবাসাও ওই হৃদয় নামক শব্দটির মত একটা মন ভোলানো শব্দমাত্র। অস্তিত্বহীন, অবস্থিতিহীন, আকারহীন, প্রকরণহীন—স্তোকবাক্য। হ্যাঁ প্রকৃতই স্তোকবাক্য। প্রতারণা। কারণ আসলে নিজের প্রকৃতিবৃত্তি চরিতার্থ করবার ছলাকলার অঙ্গশব্দ এটি। অতএব এগুলোকে একটা ক'রে সোপান বলা যেতে পারে, কামনা চরিতার্থ করবার লক্ষ্যবিন্দুতে পেঁছোবার পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপের স্তর। কৌশলী, চাতুর্যপূর্ণ। কিন্তু আপনারা যাকে ভালবাসা বলেন তা একসময় যে রকম বাসতাম এখনও তেমনি আছে তার প্রতি আমার মনোভাব।

তবে যেদিন আমার মনে হ'ল—সেই মনে হবার কথাটাই বলি।

আপনারা সকলেই অনুমান ক'রতে পারবেন দেড় বছরের সংযোগকালীন সময়ে আমরা প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যাই একসঙ্গে কাটিয়েছি বাগানে, পুকুরঘাটে, সিনেমায়, থিয়েটারে অথবা কোন হোটেলের আলো অন্ধকার ঘরের নরম আবহাওয়ায়। এখন কি অবস্থা জানি না তখন ছিল ইডেন গার্ডেন। সাহেবরা সত্যিই সুন্দর একটা বাগান তৈরী ক'রেছিল যার নামকরণও সঠিকভাবেই ক'রেছিল—ইডেন। সেই বাগানে নিভৃত কুঞ্জের পাশে বা সুন্দরভাবে রচনা করা জলাশয়ের ধারে তখন আরও অনেক সৌন্দর্য পিয়াসীর মত বসে থাকতাম আমরাও। দুজনেরই হাতে ঘড়ি থাকত বন্ধ হয়ে। যে সব কথার কোন অর্থ নেই হয়ত যেসব কথা না বললে কারও কোন ক্ষতি হয় না সেই সব কথা বলেই কেটে যেত অনেক রমণীয় কাল। সূর্যকে একটু এড়িয়ে থাকার চেষ্টা ক'রতাম গুরুজনদের মত, তাকে গাছের আড়ালে রাখতাম, তারপর একদা সূর্য অস্ত গিয়ে অন্ধকার হ'ত; সে অন্ধকার ক্রমাগত গভীরতর হ'ত, চারপাশে পদশব্দ কমে কমে বুটের ভারী আওয়াজ আসত টর্চ ফেলে খুঁজতে, আমরা ততক্ষণ বসে থাকতাম। যতক্ষণ বসে থাকতাম আমাদের মনে য়্যামার্টীম ফিজিওলজি মিথ্যে হয়ে যেত; সত্য হতেন বায়রণ, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর বিশাল সত্তা হয়ে আমাদের সমস্ত প্রাণমন জুড়ে ফুটে উঠতেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে আমরা হালকা হয়ে যেতাম, শরীরের গভীরে না গিয়ে আমরা সেসময় উঠে আসতাম শরীরের উপরটায়—আমাদের বিষয়বস্তু ছেড়ে কবিদের বিষয়বস্তুতে। সেই সময়টা অলকানন্দাকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু সত্য বলে মনে হ'ত না আমার। তখন অলকানন্দার জন্যে গোটা পৃথিবীকে বাজী ধরতে পারতাম আজন্ম জুয়াড়ীর মত। কারণও একটা ছিল, মনে হ'ত অলকানন্দার মত মেয়েকে ভালবেসে তৃপ্তি আছে। ভালবেসে নয়, এখনও কথাটা মনে হচ্ছে—তবে ভালবেসে নয় সঙ্গ লাভ ক'রে। কেন জানেন? অলকানন্দার মনটা ছিল অতি পরিষ্কার খুব উচ্চস্তরের আয়নার মত। আয়নায় যেমন নিজেকে নিজের মনের মত ক'রে দেখা যায় তেমনি অলকানন্দার মনের সামনে নিজেকেও অত্যন্ত সুন্দর মনে হ'ত। জানি না এখন কোন ভাগ্যবান তার মনের মুকুরে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখে ধন্য হচ্ছে প্রতিক্ষণে। আমি সেই ভাগ্যবানের জন্যে ঈর্ষা করি না। করি না তার কারণ সেই বা বেশী আর কি ক'রছে? অলকানন্দা তার রমণসঙ্গিনী মাত্র। সে তো প্রত্যেকেই প্রত্যেকের। আমি যে বাড়ীতে থাকতাম তার সামনেকার পুরানো মন্দিরটার গায়ে থাকত অনেক কবুতর। প্রত্যেকদিন ভোরে তারা তাদের সঙ্গিনীদের সঙ্গে যে কাজ ক'রত সেই কাজের বেশী তো অলকানন্দার সঙ্গে কিছু করণীয় নেই সেই ভাগ্যবানেরও! আছে কি? কি দরকার অলকানন্দা বা অমনি কোন নামের মেয়ে; পোকামাকড়ের তো কোন নাম থাকে না, থাকে সঙ্গিনী। থাকলেই হ'ল। এই সহজ কথাটা সেই লোকটি উপলব্ধি ক'রছে না কিন্তু আমি একদিন ক'রেছিলাম।

সেদিনও বিকেলে আমি আর অলকানন্দা অন্য কিছু করনীয় না থাকায় গিয়ে ইডেন গার্ডেন-এ বসলাম। বাগানের মধ্যে বসবার নির্দিষ্ট কোন জায়গা থাকা যেমন স্বাভাবিক নয় তেমনই সেদিন আমরা বসেছিলাম ঝিলটার ধারে, একদম জলের কিনারায়। আমার বেশ মনে পড়ছে সেদিন একটা কচি দুর্বা তুলে নিয়ে সেটার ওপরের স্তর ছাড়িয়ে ফেলে তলার দিকে ভেতর থেকে সবুজ ডাঁটিটা বের ক'রে দাঁত দিয়ে সেটি কাটছিল অলকানন্দা। তার চিবুকটা হাঁটুর ওপর এমনভাবে রাখা ছিল যে তার মুখমণ্ডলের সমস্ত ভার বইছিল পায়ের হাঁটু। ওর চোখ ছিল জলের ওপর আর আমি কখনও ওকে দেখছিলাম কখনও ছোট্ট ঝিল পেরিয়ে আমার দৃষ্টি পড়ছিল জলের ওপরে ঘাসের মধ্যে ছোট ছোট গুল্মে কি যেন ফুল ফুটে আছে তার ওপর। এত বেশী কথা আমরা এতদিন ধরে বলেছি যে কথা প্রায় ফুরিয়েই গিয়েছিল। আমরা দুজনে প্রায় মুখোমুখি বসেছিলাম, সে সময় হয়ত বা আমাদের দুঃখীও মনে হচ্ছিল, যদিও কিসের এবং কেন দুঃখ কেউই তা জানতাম না, জানা সম্ভবও ছিল না। সে দুঃখ বোধহয় নিরবচ্ছিন্ন সুখের। অতিরিক্ত মিষ্টতার মধ্যে যেমন থাকে তিক্ততা, অনর্গল হাসির মধ্যে থাকে যন্ত্রণা তেমনই অন্তহীন সুখের মধ্যেই থাকে দুঃখের অনুভূতি। আমার মনের সামনে অলকানন্দার অস্তিত্ব এমন এক স্বাভাবিক সত্য যে সে যদি নির্বাকও থাকে আমার মনের ভেতরে তার কথা আমি শুনতে পাই। অব্যক্তস্বর তার মন থেকে বেরিয়ে এসে সবার অজান্তে প্রবেশ করে আমার মনের মধ্যকোটরে। গভীর প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে বসেও আমরা পরস্পরের কথা শুনি। সেদিনও শুনছিলাম। সাহিত্যে তার একটু বিশেষ অনুরাগ ছিল, বিশেষ ক'রে কাব্যসাহিত্যে, আমাকে মাঝে মাঝে কবিতা শোনাত। যা পড়ত খুব ভাল লাগলে আমাকে শোনাত। আমি পড়তাম না, শুনতাম, আর কখনও কখনও ঠাট্টা ক'রে বলতাম, তোমার কবিতার চেয়ে প্রফেসর বোসের য়্যানা-টমির লেকচার আমার কাছে বেশী সুরেলা মনে হয়।

আমার সেই ঠাট্টার জবাবে সে বলত, এখন তো তোমাকে য়্যানাটমির লেকচার শুনতে হয় না, তুমি তো শোন মেডিসিন।

তুমি তো শোন তাই তোমার পরিচিত বিষয়বস্তু দিয়েই তোমাকে বোঝাতে চাইলাম আর কি—।

তুমি কি তাহলে অসুর ? তা তো নও !

সুর শুনি অন্য জায়গায়। একটা ওষুধ মানুষের শরীরে ঢুকে কি ভাবে কাজ করে জানতে গিয়ে আমার মনে হয় যেন একটা ভ্রমর কোন ফুলের কাছে গান গাইছে।

আমার মনে আছে এই জবাবটা শুনে সেদিন অতি উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে অলকানন্দা বলে উঠেছিল, ওরে বাবা! আমরা তো ধার ক'রে কবি, তুমি দেখছি আসলেই কবি।

অমনিধারা অনেক কথার মধ্যে দিয়েই কেটে যেত আমাদের সময়। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় আর অনুরাগের কালে মানুষ অনেক কিছু হয়ে পড়ে, যেমন আমি কখনও কবি হতাম কখনও দার্শনিক এমনই কত কি! আর মেয়েরা যে হয় না তাও নয় তবে বেশীর ভাগই তারা যা হয়ে থাকে তা হ'ল রূপসী। নেহাৎ কুরূপা মেয়েও সেই সময় আপন প্রেমিক-এর কাছে পৃথিবীর প্রথমা রূপসীতে পরিণত হয়। এ যে স্তাবকতা তা হয়ত আমরা তখনই বুঝি তবু সেই কঠিন সত্যকে সেই ক্ষণে মনে আনি না। সত্যের দিকে পেছন ফিরে বসে আমাদের প্রণয়, আমাদের কাব্যরচনা। আর এই পেছন ফিরে থাকার নাম নেশা। যতক্ষণ এইরকম নেশাগ্রস্থ হয়ে থাকি ততক্ষণ মনোরম, কারণ—সত্য এক তীব্র আলোকচ্ছটার মত। তার বেগ অনেক সময়ই চোখ ধাঁধায়, সহ্য হয় না। তাই মিথ্যার ছায়া নরম আশ্রয়, তৃপ্তিদায়ক মনে হয়। কিন্তু কখনও হঠাৎ সত্যের প্রকাশ ঘটলে সব কিছু ছারখার হয়ে যায়, সেই তীব্র জ্যোতির সামনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের এতদিনের রচিত স্বপ্নের রঙগুলো হয়ে যায় ফ্যাকাশে। তখন? বলুন তখন কি করে মানুষ? অনেকে সেই হারিয়ে যাওয়া অন্ধকারের পেছনে দৌড়ে যায় অনেকটা পথ, অন্য এক মিথ্যার আশ্রয় পেলে সেখানেই মুখ গুঁজে আত্মগোপন করে। অনেকে তা করে না, সেই মহাজ্যোতির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে নতজানু হয়ে স্বীকার করে সেই অনড় অচল ধ্রুবজ্যোতির যথার্থতা। আত্মবিশ্লেষণের সেই পর্যায়ে সে ফিরে যেতে চায় সেই স্থানটিতে যেখান থেকে বিচ্যুত হবে না সে কোনদিনই। আমি যে বিশেষ বিকালটির প্রসঙ্গ এনেছিলাম সেও তেমনি অনেক রোমাণ্টিক নামধারী মিথ্যের পর এক সত্যের সম্মুখীন হবার লগ্ন, যা সমস্ত জীবনধারা আচ্ছন্ন ক'রে সমস্ত চিন্তা গুলিয়ে এক অমোঘ নিয়তির দণ্ড হাতে ক'রে সামনে এসে দাঁড়ায়।

অলকানন্দার শরীরের গঠন প্রাকৃতিক ভাবেই এমন ছিল যে সে কি পোষাক বা কি অলংকার পরেছে সে সবই বাহ্যবস্তু হয়ে যেত। অর্থাৎ তার দেহশ্রীর জন্যে পোষাক তাকে সুন্দর করত না, বরং পোষাক তার গায়ে উঠে সুন্দর হ'ত। হয়ত বা যোগ্য স্থান পেত আপন জন্ম সার্থক করতে পারার মত। তাই সেই বিকেলের পোষাক নয়, বসে থাকার ভঙ্গীটা আমার এখনও মনে আছে। আর মনে আছে কর্মহীনতার অবসন্ন অবসরে অনেক ক'টি দূর্বা উৎপাটিত হয়ে সারি সারি লুটিয়ে পড়ছিল সেই দূর্বাবনে, আর আমি দেখছিলাম। ঘাসের ভেতরকার সেই সজীব কাঁচ সবুজ অংশ পৃথিবীর আলো বাতাসের সংস্পর্শে এসে অচিরেই শুকিয়ে যাচ্ছিল, যা সম্ভব হচ্ছিল শুধুমাত্র অলকানন্দার অন্যমনস্কতার জন্যেই। আমি মানুষের পৃথিবীর মধ্যে প্রকৃতির পৃথিবীটুকুতে বসে মাথার ওপরকার গাছের পাতায় পাতায় ছোট ছোট পাখীর কাকলির আবহসঙ্গীতে অলকানন্দার অস্তিত্বকে স্বপ্ন দেখছিলাম। মাঝে মাঝে জলবিহারী নৌকাগুলো আমার তন্ময়তা ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছিল। কেউ-ই বিশেষ

কথা বলছিলাম না হয়ত সবই ফুরিয়ে গেছিল বলে। দু চারটে কথা আমাদের নিঃশব্দতাকে আরও ঘন ক'রে তুলছিল। আমি ওপার থেকে চোখ জলের ওপর বুলিয়ে এপারে আনলাম। অবশেষে আমার দৃষ্টি জলের কিনারে ঠিক জলছোঁয়া মাটির স্থানটিতে আটকে রইল কারণ কিছু কিছু ঘাস সেখানে জলের ঢেউ-এ দুলছিল। সেটাই তখন দর্শনীয় বিষয় আমার কাছে। অনেক সময় জলের এমনি ধারে ছোট ছোট মাছ এসে ঘুর ঘুর করে, কিনারায় ভেসে বেড়ায় না মাছ না ফড়িং একরকম পোকা। যখন সবকিছু দেখা হয়ে যায় তখন এগুলোই হয় দৃশ্য।

আমিও সেই দৃশ্যের সন্ধানে ছিলাম। ঘাসের ওপর মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফড়িং লাফিয়ে বসছে কি ক'রছে কে জানে উড়েও যাচ্ছে অল্পক্ষণ বাদেই। সাধারণ সময়ে এসব জীবকে আমরা হিসেবের মধ্যেই ধরি না কিন্তু সময় বিশেষে এরাই বিরাট হয়ে ওঠে, তখন হয়ত হাতী দেখার চেয়েও তন্ময়তায় দেখতে হয় এইসব পোকামাকড়কেই। সেই এক বিখ্যাত বন্দীও তো এক মাকড়সাকে লক্ষ্য ক'রেই উজ্জীবিত হয়েছিলেন। অতএব আমি প্রায়শ দেখি এবং সেদিনও দেখছিলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরনের পোকা আমার চোখে পড়ল, বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলাফেরা করছিল সেটা। চোখের ওপর সেটার নড়াচড়া ভাসছিল কিন্তু ঠিক সেটাকে কোন সময়েই নজর করছিলাম না। এবার নজরে পড়ল তার কারণ আমার দৃষ্টির বিন্দুতে এসে সে তার ব্যস্ততা প্রদর্শন করতে লাগল। আর ঠিক প্রায় তখনই কোত্থেকে আর একটা সমজাতীয় পোকা এসে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগল। ব্যাপারটা মজার বলেই আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম হঠাৎ অলকানন্দা জানতে চাইল, কি এমন ঘাড় গুঁজে বসে আছ সেই তখন থেকে? এত তন্ময় হয়ে কি দেখছ যে এতগুলো কথার একটা জবাব দিলে না?

আমি চোখ না তুলে বললাম, তুমি কি জিজ্ঞেস করলে যে উত্তর দেব?

দেখ তাহ'লে তুমি এমনই বিভোর যে সেসব কানেও যায় নি। বলেই সে আমার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রতে চেষ্টা ক'রে জানতে চাইল, কি দেখছ বল তো?

কিছু না, পোকা, আমি জানালাম।

পোকা! ব্যাপারটায় যেন বিস্মিত হ'ল অলকানন্দা। তারপরই পোকা দুটোকে দেখতে পেল। আর সেই ক্ষণেই একটা পোকা অপরটির পিঠের ওপর উঠে পড়েছে। এত ঘোরাঘুরির কারণ বোঝা গেল। আসলে সবটাই প্রবৃত্তি আর প্রবৃত্তিটাই সব। এতক্ষণ ধরে পোকাটা যে অন্যটার চারপাশে ঘুরল সে তাহ'লে প্রণয় নিবেদন! অথবা তার আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার ভূমিকা মাত্র! এও তাহ'লে প্রকৃতির দ্বারাই হচ্ছে! কি আশ্চর্য! কি পার্থক্য মানুষের সঙ্গে? কিছুই তো নেই! এই যে আমরা এখানে বসে আছি এ-ও তো তাহ'লে প্রবৃত্তির তাড়নায়! ওই পোকাটার মতই! নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শিহরণ এল। ঘৃণা।

আমরাও তো ওই পোকার মতই এখানে বসে আছি! ওই রকম প্রবৃত্তির তাড়নায়! শরীরের ক্ষিদে মেটাবার অপেক্ষায়! তাছাড়া কি? আর কি উদ্দেশ্য আছে? কি সম্পর্ক আমাদের? ওই দুটো পোকার মধ্যে যা সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার আর অলকানন্দার সম্পর্কের তফাৎ কোথায়? ওরা-ও নিজেদের সুযোগমত দৈহিক কামনা চরিতার্থ করছে আমরাও তাই তো করতে চাইছি! সেই একই প্রণয় পর্ব, একই উদ্দেশ্য—পার্থক্য যা আকারগত! কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়লাম। মনে মনে আমিও হয়ে গেলাম ওই পোকাটার মতই ক্ষুদ্র! ওই পোকার থেকে নিজেকে কিছুতেই আলাদা ক'রতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করলাম, ভাবলাম আমি তো মানুষ। পরক্ষণেই মনে হ'তে লাগল কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়? ওই একই রকমের তাড়নায় আমিও তো ছুটছি সারাদিন পোকাটার মতই। সেই ক্ষুন্নিবৃত্তি, নিদ্রা আর মৈথুন! এর বাইরে কি আর ক'রছি? যা একটা পোকা করে তাই করে মানুষেও, পার্থক্য—আকারগত মাত্র। সে ছোট পোকা তার আয়োজন ছোট আমরা বড় পোকা আমাদের আয়োজনটা একটু বড়, এই যা তফাৎ। কথাটা আমার মনের ভেতর এমন চেপে বসল যে ওই পোকা দুটোর সামনে বসে থাকা আর বিন্দুমাত্র সম্ভব হল না। অলকানন্দা হয়ত তখনও পোকা দুটোর দিকেই তাকিয়েছিল আমি বলে উঠলাম, চল সিনেমায় যাই। আমার ভাল লাগছে না।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অলকানন্দা বলল, এখন কি কোথাও পেঁছান যাবে? দেরী হয়ে যাবে।

তা যাক, চল। খানিকটা কমই দেখব।

তুমিই তো বল ছবি আরম্ভ হয়ে গেলে হলে ঢোকা অন্য সকলের বিরক্তির কারণ হওয়া মাত্র!

তবে চল অন্য কোথাও যাই—বলে উঠে দাঁড়ালাম। অলকানন্দাও উঠল।

কিন্তু যাব কোথায়? অযথা একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলাম। মনে হ'ল চারিদিকে এমন কি শূন্যেও ওই পোকা দুটোর মৈথুন চলছে। আমার চোখের সামনে থেকে ওদের মৈথুন-এর দৃশ্য যাচ্ছে না। নিচেরটার পিঠের উপর আর একটা—নিচেরটা অপরটিকে পিঠে নিয়েই হেঁটে বেড়াচ্ছে সঙ্গমরত অবস্থাতে। আমরাও যেন ওই পোকা। আমরা যদি হেঁটে বেড়াই অন্য সকলেও তাহ'লে ওই দৃশ্যই দেখবে আমাদের দুজনকে নিয়ে। কি এক বীভৎস ভাবনায় পড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অলকানন্দা সেই সময় বাঁ হাতের কনুইটা নিজের ডান হাত দিয়ে ধরে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, চল?

কোথায় যাব? মনে মনেই প্রশ্ন ক'রে নিলাম। আবার ভাবলাম কোথায় যাব? অনেক দিন তো এই উদ্যানের মধ্যেই পরস্পরের হাত ধরে অকারণে পায়চারী ক'রেছি! সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল ওই পোকা দুটোর মত। আমরা যখন পায়চারী

করি তখন অজস্র পোকাও এই বাগানের মধ্যেই ঘাসের মধ্যে, গাছের পাতার ফাঁকে, ঠিক আমাদের মতই চলাফেরা পায়চারী আর মৈথুন করে। তাদের আর আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না।

অকারণে হেঁটে বেড়াতে ভাল লাগছিল না। অলকানন্দার কাছে স্বীকার করলাম, হঠাৎ কেমন যেন খারাপ লাগছে।

কেন? অলকানন্দা জানতে চাইল।

কেন তা তো বুঝতে পারছি না?

কি খারাপ লাগছে?

তাও বুঝছি না!

সে কি!

জবাব দিলাম না। সে উদগ্রীব হয়ে বলল, শরীর খারাপ লাগছে না তো?

না।

অবিশ্বাস ক'রে গায়ে হাত দিয়ে পরখ করবার চেষ্টা ক'রল অলকানন্দা।

আমি চেষ্টা করলাম ঠাট্টা ক'রতে, বললাম, সবে সুরু তো তাই গায়ে হাত দিয়ে শরীর পরীক্ষা করার বুদ্ধি যায় নি। শরীর খারাপ হ'লে কি শুধু তাপ বাড়ে?

অলকানন্দা সপ্রতিভ ভাবেই বলল, তবে কি হয়েছে?

বুঝছি না। শরীর নয়, মনে স্বস্তি পাচ্ছি না।

বিস্মিত হ'ল না অলকানন্দা, বলল, আমিও তাই দেখছি। আজ এসে থেকেই তুমি কেমন আনমনা হয়ে বসে আছ। কথাবার্তাও কিছু বলছ না—

আমিও কোন প্রতিবাদ করলাম না। যেভাবে বোঝে সে বুঝুক, মূল কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছি এটাই যথেষ্ট। কিন্তু এখন কি করা যায়? কোথায় যাওয়া যায়? কোথায় গেলে মনের ওপর থেকে বোঝাটা নামবে? কিছুই না অথচ মনে হচ্ছে কি এক বোঝা যেন মনের ওপর চেপে বসেছে। এখন একে সরাতে হবে, হালকা করে ফেলতে হবে মনটাকে। অতএব তেমনই একটা কিছু করতে হবে। স্থির করলাম সামনেই মেট্রো সিনেমা কাছে ওর মধ্যেই গিয়ে ঢুকে পড়লে হবে, অন্যমনস্ক হবার সুযোগ পাওয়া যাবে। কথা বলতে চেষ্টা ক'রলাম, অলকানন্দাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, এখন মেট্রোয় কি ছবি চলছে জান?

না। অনেকদিন এদিকে সিনেমা দেখতে আসিনি তো—জবাব দিল অলকানন্দা। আমি মনে মনে অসন্তুষ্ট হ'লাম। এই এক দোষ মেয়েদের, দুনিয়ার কিছু খোঁজ রাখতে চায় না! নিজের ঠিক যতটুকু প্রয়োজন তার বাইরে মনটাকে কিছুতেই বাড়াবে না। নিজের ছেলেটি জলের ধারে চলে গেলে যেমন দৌড়ে গিয়ে ধরে আনে তেমনি ক'রে মনকেও ফিরিয়ে আনবে যদি কখনও দৈবাৎ প্রয়োজনের গণ্ডীর বাইরে চলে যায়। আসলে আমরা সবাই প্রয়োজনের তাগিদেই চলি, পোকারাও তাই।

নাঃ আবার সেই বেয়াড়া চিন্তাটা ঘাড়ের ওপর চেপে বসল। যতই ওটাকে সরাতে চাই—কিছুতেই নামে না। বেশ জোর টান পড়ল জামাতে—। সঙ্গে সঙ্গেই অলকানন্দা বলে উঠল, আর একটু হলেই চাপা পড়তে।

—সে-ই জামাটা ধরে টেনে এযাত্রা রক্ষা ক'রেছে। যে গাড়ীটা চাপা দেবার মতলব ক'রছিল হুস ক'রে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। অলকানন্দা প্রশ্ন করল, তোমার কি হ'ল বল তো?

কেন? আমি খানিকটা হকচকিয়ে জানতে চাইলাম।

এরকম গাড়ী চাপা তো তুমি কোনদিন পড় নি?

আমি একটু হেসে ব্যাপারটা হালকা ক'রে দেবার অভিপ্রায়ে বললাম, গাড়ী চাপা কেউ রোজই পড়ে কি? ও তো দৈবাৎ একদিন পড়ে। আজ আমার পড়বার ছিল তুমি আটকে দিয়ে আর একদিনের জন্যে এটাকে তুলে রাখলে।

তার মানে?

মানে এই চাপাটা আর একদিন পড়তে হবে আমাকে।—

কথাটা শুনে খুব একচোট হেসে নিল অলকানন্দা। তারপর জিজ্ঞেস করল, দূর! তাই কি কখনও হয়?

আমি কোন জবাব দিলাম না। সতর্ক হবার চেষ্টা ক'রলাম যাতে আর চাপা না পড়ি। চৌরঙ্গী, কলকাতার প্রধানতম পথ যাকে ধমনী বলা যায়। তাই তখন চৌরঙ্গীতে প্রচুর গাড়ী চলত। এখন কি রকম জানি না। বিশেষ সতর্ক ভাবে চৌরঙ্গী পার হয়ে মেট্রোর দরজায় পেঁাছে যখন টিকিট কিনতে চাইলাম ভদ্র টিকিট বিক্রেতাই জানালেন, মূল ছবি সুরু হয়ে গেছে।

যাক। কি ছবি জানতেও চাইনি শুধু বলেছি দুটো টিকিট অর্থাৎ টিকিট দুটোই আমার প্রধানতম জরুরী বিষয়, অন্যসব বাহ্য। যে কোন মূল্যে দুটো টিকিট নিয়ে আসলে আমি এখন আত্মগোপন ক'রতে চাই অথবা অন্যমনস্ক হতে চাই। হ্যাঁ অন্যমনস্ক হতে চাই আমি। আলোকিত এক বিশাল অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে আমি যেন তৃপ্তি পেলাম। তাৎক্ষণিক তৃপ্তি। সামনেই বিশাল পর্দায় দুর্দম ঘোড়সোয়ার আমারই দিকে ছুটে আসছে। এমনি এক উত্তেজক দৃশ্য আমার মনের পক্ষে দ্রুত-কার্যকর ওষুধের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রল। আমি অন্ধকারে পথ কেটে নির্দ্ধারিত স্থান খুঁজে নিলাম। অলকানন্দা বসামাত্র বলল, বাঃ ভালই হ'ল। আমারও আজ ওখানে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। আর একটু আগে উঠলেই ভাল হ'ত।

আমি কোন কথা না বলে অলকানন্দার একখানা হাত আমার হাতের পাঞ্জার মধ্যে টেনে নিলাম। আমি স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা গুলি ছুটে এসে বিদ্ধ ক'রল এগিয়ে আসা ঘোড়সওয়ারকে! সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। মাথার টুপিটা দূরে ছিটকে পড়ে গেল। ঘোড়াটা

সামান্য কয়েক পা হেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে ঘাতক এগিয়ে এল। আমিও চরম মুহূর্তগুলো ধরে আত্ম বিস্মৃত হলাম।

অলকানন্দার কাছে বিদায় নিয়ে হোস্টেলে যখন ফিরে এলাম মন তখন ফাঁকা। কোন ভাবনাই নেই। শূন্য। এই যে উত্তেজক ঘটনাবলীর ছবি দেখে বেরোলাম তার স্মৃতিমাত্র নেই। তেমনই নেই আগের সেই বুকচাপা ভাবনাটা। তবে কোন কথা-বার্তা ভাল লাগছিল না বলে চুপচাপ খেয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। কোনদিন এত তাড়াতাড়ি শুই না বলেই হয়ত ঘুম আসছিল না কিছুতেই। তবু চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। থাকতে থাকতে কোন সময় যে আবার মনের মধ্যে সেই ভাবনাটা এসে বসে গেছে তা টের পাইনি। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল, গলা পেলাম সুজয়ের।

শুয়ে শুয়েই সাড়া দিলাম। বাইরে থেকেই সে বলল, কি রে? এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লি যে! আচ্ছা ঘুমো। কাল সকালে কথা হবে।

বুঝলাম সে চলে গেল। কিন্তু আমার তখনই আবার মনে হতে লাগল অলকানন্দার কথা। আচ্ছা অলকানন্দার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ওই দুটো পোকার মধ্যে যা সম্পর্ক তার থেকে আর বেশী কি? কি বেশী? ভাবতে লাগলাম। বেশী হবেই বা কি ক'রে আসলে আমিও তো একটা পোকা মাত্র।
প্রাকৃতিক নিয়মে সেই যে জন্মেছি তারপর থেকে একটা কাজও কি আমি ক'রেছি যা আমার জীবন ধারণের উদ্দেশ্যের বাইরে? প্রত্যেকদিন আমি যে সব কাজ করি তার প্রত্যেকটিই শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই করা। সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গা থেকে সেই যে সুরু হয় খাওয়া তারপর রাত্রে শোবার আগে পর্যন্ত সেই খাওয়া অথবা খেতে পাবার ব্যবস্থা করা। অন্যান্য প্রয়োজনের বস্তু সংগ্রহ তো গৌণ ব্যাপার। গৌণ নয় কি? প্রত্যেকটি প্রয়োজনের সামগ্রী সকলেরই কি এক? তা তো নয়? জনে জনে প্রয়োজন আলাদা কিন্তু খাবার প্রত্যেকেরই চাই। হয়ত অনেকে বলবেন খাবার পরেই মানুষের বেলায় পরবার প্রশ্ন আসছে যেটা অন্য কোন প্রাণীর নেই। কথাটা সত্য কিন্তু একসময় ছিল যখন পরবার কাপড় ছাড়া মানুষের চলেছে, খাবার ছাড়া চলে নি। আজ হঠাৎ যদি ধ্বংস হয়ে যায় এ সভ্যতা তাহলে পরবার কাপড়ের প্রয়োজন নাও থাকতে পারে, খাদ্যের প্রয়োজন থাকবেই এবং সেই সঙ্গেই থাকবে প্রাকৃতিক অন্যান্য প্রয়োজন গুলো। এগার নম্বর ঘরে সুশান্ত থাকে তার নাকি অভ্যেস রাত্রে শোবার সময় সে সব জামাকাপড় খুলে একবারে উলঙ্গ হয়ে থাকে। এই যে সমস্তরাত ওর জামাকাপড়ের দরকার থাকে না পেট ভর্তির দরকার কিন্তু সে সময়ও থাকে। ভাস্কর একদিন প্রচণ্ড মদ খেয়ে এসে আমার সামনে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল, কান্না ফুরোলে বেশ সুস্থভাবেই প্রশ্ন করেছিল, আমরা কেন বেঁচে থাকি বলতে পারিস?

পারিনি। জবাব দেবার তাগিদও অনুভব করিনি মাতালের প্রলাপ ভেবে। শুধু বলেছিলাম, এবার যা, নিজের বিছানায় গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়। —আমার তখন ধারণা ছিল শুয়ে পড়লেই সব মিটে যায়। কারণ শুয়ে পড়লেই ঘুম আসে, ঘুম এলেই সব ভুল হয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়াটা কিঞ্চিৎ আত্মহত্যা করার মত আর কি? সব প্লানি বিস্মরণে নিয়ে যাবার জন্যেই যেমন মানুষ আত্মহত্যা করে তেমনি সাময়িক ভাবে কোন কিছুকে ভুলে যাবার জন্যেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ার কথা ভেবে থাকি। শুধু ভাস্করকে সেই উপদেশ দেবার সময় কেন, একটু আগেও তো আমি ভেবেছিলাম ঘুম হচ্ছে সেই বিস্মরণী যা মনের ওপর আলগা প্রলেপ লাগিয়ে দিতে পারে সাময়িক আরামের চুক্তিতে। কিন্তু হচ্ছে না। আমার বিশ্বাস কার্যকর হচ্ছে না আজ নিজের বেলায়। সেদিন মাতাল ভাস্করকে দেওয়া ওষুধ নিজের কাজে লাগছে না আজ। ঘুম আসছে না। বাইরে কত রাত্রি কে জানে? উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে সরু বারান্দাটুকু পেরিয়ে রাস্তার উপরকার ছোট্ট ঝুল বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছে হ'ল। ভাবলাম আলো জ্বালিয়ে হাত ঘড়িটা দেখি। ইচ্ছে হ'ল না উঠতে। কি হবে? ঘড়িতে যা ই বাজুক না আমরা তো প্রাকৃতিক নিয়মেরই দাস। এই যে পোকামাকড় জন্তু জানোয়ার যারা কখনও ঘড়ি দেখে না তারাও তো প্রকৃতির নিয়মেই দিন হ'লে ওঠে আবার রাত্রি হ'লে ঘুমোয়। তারতম্যটা কোথায়? লাভই বা কি ঘড়ি দেখে?

সেই প্রথম রাত্রির কথা এখনও আমি ভুলিনি। কি অসহনীয় অনুভূতির মধ্যে দিয়ে আমাকে অনেকটা রাত যে কাটাতে হয়েছিল কি বলব! তারপর প্রকৃতির অশেষ অনুগ্রহের মত ঘুম এসে আমাকে যে কখন শান্তি দিয়েছিল সে আমার খেয়াল নেই। মধ্যে একবার উঠে জহর-এর ঘরে গিয়েছিলাম ঘুমের ওষুধ চাইতে, তার দরজায় তালা দেখে ফিরে আসতে হয়েছিল এটা মনে আছে। জহর-এর ঘর থেকে ফিরে সেই চিন্তাটাই তীব্রতর হয়েছিল মাত্র। এই যে জহর মাঝে মাঝেই বাইরে রাত কাটায় কোথায় তা আমরা অনেকেই জানি। এ তো ও কেবল তার প্রবৃত্তির টানেই করে! নইলে পয়সা দিয়ে পাওয়া ওই মেয়েমানুষগুলোর কাছে কিসের আকর্ষণ? বেঁচে থাকার জন্যে টাকা রোজগার ছাড়া আর কিসের জন্যই বা মেয়েগুলো এমনি রাতের পর রাত বসে থাকে মুখে রঙ মেখে? এক প্রয়োজন জহর-এর আর এক প্রয়োজন সেই মেয়েমানুষটার—দুটোই কিন্তু প্রাকৃতিক এবং ওই পোকার প্রয়োজনের সঙ্গে সমগোত্রীয়, একজনের শুধু বেঁচে থাকতে চাওয়া—পেটের ভাত। তারই জন্য তার আর দশটা রোজগারের রাস্তার মত এই পথ ধরা—আর এই ব্যাটা জহরের ক্ষিধেও দেহের; তাই ওই ওপরের পোকাটা যেমন যে কোন একটা মাদী পোকাকে পেয়েই তার সঙ্গে রমণে লিপ্ত হয়ে পড়ে জহরও যে কোন একটা মেয়েমানুষ জুটিয়ে নেয় তার দৈহিক আসক্তি মেটাবার জন্যে। শুধু জহরের কথাই বা বলি কেন? একলা জহর হলে না হয় ব্যতিক্রম বলে মনে করতাম এই হোস্টেলেই একবার ভোর রাত্তিরে

একটা মেয়ে ধরা পড়েনি? ধরা পড়ে সে কবুল করে নি অনিল সেনএর ঘরে সে আগেও অনেকবার এসে রাত কাটিয়ে গেছে! যাদব শ্যামলী বলে নার্সটার সঙ্গে খারাপ অবস্থায় ধরা পড়েনি পশ্চিমের করিডরে? কার নাম ক'রব? কোন নামটি অন্য একটি নামকে জড়িয়ে নেই? কিন্তু কেন? কেন? প্রয়োজন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন। যে প্রয়োজন ওই পোকামাকড় জন্তুজানোয়ারের সেই একই প্রয়োজন। সেই একই প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত আমি এবং অলকানন্দাও—

বিশ্বাস করুন এই অবস্থাটা আমি সহ্য করতে পারিনি। অলকানন্দার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে দুটো পোকার মধ্যেকার সম্পর্কের বেশী কিছু নেই—এই চিন্তাটাই আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। অথচ আমি কোনদিক থেকেই এটাকে মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন ক'রতে পারছিলাম না। আমি যদি এটাকে অস্বীকার করতে পারার মত একটুখানি যুক্তি পেতাম তাহ'লে হয়ত—জানি না কি হ'ত তবে যা হয়েছে তা হ'ত না নিশ্চয়ই। কারণ এই একটা পোকার সম্পর্ক নিয়ে অলকানন্দার চারপাশে ঘুরে বেড়ানো—আমার কেমন যেন গা ঘিন ঘিন ক'রতে লাগল।

পরের দিন সকালে বেশ একটু বেলাতেই ঘুম থেকে উঠলাম। আমার দরজা খোলা পেয়েই সুজয়টা এসে হাজির হ'ল। বলল, কি রে, কাল অত সকাল সকাল শুয়ে আজ এত বেলায় উঠলি ব্যাপারটা কি? শরীর ঠিক আছে তো?

মাথা নেড়ে ঠিক আছে জানিয়ে কলঘরে যাবার ব্যবস্থা করতে তৎপর হ'লাম যাতে সুজয় উঠে যায়।

সে না উঠে বলল, কাল রাত্রে তোর কাছে দশটা টাকার জন্য এসেছিলাম। এ মাসে বড্ড টানাটানিতে পড়ে গেছি। আমার টাকা এলেই তোকে দিয়ে দেব।

যদিও কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল না তবু নিজেকে অন্যমনস্ক করবার জন্যেই বললাম, হঠাৎ এত কি দরকার হ'ল? কি ক'রবি দশটাকা দিয়ে?

আছে একটা দরকার। তোকে পরে বলব।

বুঝলাম সে বলবে না। এড়িয়ে গেল। সে যে কোন একটা মিথ্যে প্রয়োজন দেখাতে পারত কিন্তু সেই মিথ্যাচার ক'রল না। 'পরে বলব' যে বলল তা-ও সে ক'রবে না। পরোক্ষে তার মিথ্যা বলাই হ'ল। এখানেই মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর পার্থক্য একটা পেলাম। অন্য প্রাণী মিথ্যাচার করে না। তার অবিশ্বাস সরাসরি অবিশ্বাস, কপটতাহীন ঋজু। মানুষ মিথ্যা এড়ায় মিথ্যা দিয়েই। এক মিথ্যা দিয়ে অন্য এক মিথ্যাকে আড়াল করে। জীবনে পাপ-পুণ্য ধর্মা-ধর্ম নিয়ে হিসেব নিকেশ করবার অভ্যাস যদি থাকত বুঝতে পারছি কোনদিনই তার দুদিকের পাল্লা মিলত না। হিসেব ক'রে ঠিক ক'রতে পারতাম না মানুষ অন্য প্রাণী জগতের চেয়ে পুণ্যবান না অন্যেরা মানুষের চেয়ে? সে সব হিসেবনবিশী না জানা থাকায় শুধু মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে একটা পার্থক্য খুঁজে পেয়েই মন

তখন থামল। আমিও সঞ্জয়-এর সঙ্গে অযথা বাক্য ব্যয় না ক'রে আমার মাথার বালিশের তলা থেকে একটা দশ টাকার নোট তার হাতে দিয়ে বললাম, এবার রাস্তা দ্যাখ আমি বাথরুমে যাব।

সে ব্যাটা ধন্যবাদসূচক কিছু বলবে ভেবেছিল আমি গম্ভীর হয়েই বললাম, কাজ হয়েছে ভোরবেলা বাজে না বকে এখন ভেগে পড়।

সঞ্জয় পালাল কিন্তু আসলে যাকে তাড়াতে চাইছিলাম তাকে এড়াতে পারলাম না। পায়খানায় গিয়ে বসে সেই একই কথা মনে হতে লাগল একটা মাছিকে উড়তে দেখে। এই মাছিটাও আমারই মত অথবা আমিও এই মাছিটারই মত সকাল থেকে রাত্রি অবধি যতক্ষণ জেগে থাকি বেঁচে থাকবার জন্যেই কাজ ক'রে যাই। নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্যেই ব্যবস্থা করি মাত্র। ওটা এই পায়খানার মধ্যে এসে উড়ে বেড়াচ্ছে খাবারের খোঁজে—আমিও এই যে মড়া কেটে লোকের পুঁজ রক্ত ঘেঁটে বেড়াচ্ছি এ-ও তো ওই পেট চালাবার ধান্দাতেই। এখনই একটা বিপরীত লিঙ্গের মাছি এসে পড়লে ও তার সঙ্গে রতিক্রীড়ায় লেগে যাবে—আমিও তো তেমনই অলকানন্দাকে পেয়ে লেগে পড়েছি। দূর! এসব আজগুবি চিন্তাকে বাদ দিতে হবে। কাজকর্ম সেরে এসে ঘরে ঢুকলাম। অন্যদিনের চেয়ে অনেক জোরে চেঁচিয়ে ডাকলাম রঞ্জুকে। বোধহয় অস্বাভাবিকতাতেই অথবা কাছে ছিল বলেই সে দৌড়ে এল। বললাম, খাবার নিয়ে এস। ডিম, চা, পাউরুটি। শীগ্গির আনবে। সমস্তটা বেলা আমি সব কাজগুলোকে ঘোড়ার মত ক'রে ছুটিয়ে সময়টাকে তাড়িয়ে বেড়াবার চেষ্টা ক'রলাম যাতে সেই বিশ্রী চিন্তাটা পা টিপে টিপে এসে পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে উঠতে না পারে। শুনেছিলাম বাঘ এক লাফে বিশ পা এগোয় কিন্তু এই অদ্ভুৎ জন্তুটি যে কত পা লাফাতে পারে সেটা জানা নেই বলে ক্রমবর্ধমান আতংকে আমার গতিবেগ বাড়াতেই চেষ্টা করলাম ক্রমাগত। চটপট দাড়ি কেটে ফেলতে চেষ্টা ক'রলাম। তাতে গালটা একটু কেটে গেল, ভালই হ'ল। গালে ওষুধ লাগাবার জন্য আবার আর এক ব্যস্ততা কিছুক্ষণের। তার আগে কয়েক ফোঁটা রক্ত নিজের গা থেকে বেরোনোর মায়াময় অনুভূতি। সব মিলিয়ে ব্যস্ত অন্যমনস্কতা—এরই মধ্যে এল সিধু, বলল, কি রে? এত চটজলদি কি ক'রছিস?

অন্যদিন যে সিধুকে দেখলে বিরক্ত হই তার রুচিহীনতার জন্যে, আজ তাকে দেখে সে অনুভূতি হ'ল না, বরং বোধহয় একটু খুশী মনেই বললাম, তাড়াতাড়ি ক'রতে গিয়ে কেটেই গেল খানিকটা।

ছোঃ—সিধু অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে বলল, এ আর কি কেটেছে!

দেখছিস না রক্ত পড়ছে?

যাঃ একে আবার রক্ত বলে নাকি? আমি শালা এর চেয়ে অনেক বেশী রক্ত ইচ্ছে ক'রে ঝরিয়েছিলাম।

এই আরম্ভ হ'ল। এই সব অসভ্য কথাবার্তার জন্যেই ওকে আমার কোনদিন ভাল লাগে না, অথচ আজ খারাপ লাগল না, পরন্তু জিজ্ঞেস করলাম, সে আবার কি, এ জন্যে রক্ত ঝরাতে হবে কেন?

আরে শালা বলিস না। শ্রাবণীটা এত হারামী ছিল যে আমাকে গা ঘেঁষে বসতে দিতে আপত্তি ছিল না আপত্তি তার গায়ে হাত দিলে। তা রোজ রোজ এই র‍্যালা ভাল্‌লাগে না। একদিন বললাম, দেখ আজ যদি না জামা খোল তো আমার হাতেই কেটে ফেলব। শ্রাবণী বিশ্বাসই ক'রতে পারে নি যে সত্যিই আমি ওসব ক'রতে পারি। সে মাগী পাত্তাই দেয় না। শেষে করলাম কি জানিস ফট ক'রে ছুরি বের ক'রে এই দ্যাখ হাতের এইখানে খানিকটা চিরে ফেললাম। যেই না রক্ত দেখা অমন শক্ত মেয়ে কেমন যেন নরম হয়ে গেল। আমি আগেই জানতাম আমার ওপর ওর খুবই দুর্বলতা আছে। হাতে হাতে প্রমাণ মিলল, চট করে আমার হাত চেপে ধরলো, হু হু ক'রে কেঁদে উঠল। আমার হাত বাঁচাতে ও ওর যা বাঁচিয়ে রেখেছিল তা দিয়ে দিল আমার হাতে।

আমি ওর বর্ণনা খুব উপভোগ ক'রলাম। হেসে বললাম, শ্রাবণীর বারোটা তাহ'লে তুই সত্যিই বাজিয়েছিলি? সবাই যা বলে তা সত্যি?

সবাই কেন বলবে, আমিই তো বলি। নিজে না বললে সবাই জানত কি ক'রে?

সবাইকে এমন ক'রে বলতে গেলি কেন? তোর কি লাভ হ'ল?

লোকসানই বা কি হয়েছে?

তোর না হোক শ্রাবণীর তো হয়ে থাকতে পারে?

শ্রাবণীর! ছোঃ। প্রচণ্ড উপেক্ষা একসঙ্গে গলা দিয়ে বের ক'রল সিধু। তারপর বলল, শালা নিজের জন্যে ভাববার সময় পাই না ভাবব শ্রাবণীর জন্যে! ভালমন্দ ভাবতে শিখলে তো আগে নিজেরটাই ভাবতাম রে!

কথাটা স্বীকার ক'রতে হ'ল। সত্যিই নিজের ভাল মন্দ ভাবে না সিধু। আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে। সিধু যত অপকর্ম ক'রে বেড়ায় তার প্রতিক্রিয়াও তাহ'লে নিশ্চিত। সে সম্বন্ধে যদি একবার ভাবত সিধু তাহ'লে ওসব সে কিছুতেই করত না। কথাগুলো এক লহমায় মনে হ'ল আমার, কিন্তু ওকে কিছু বললাম না। কথা না বলবার আর একটা কারণও ছিল—আজ মানসিক অবস্থার বৈকল্যে সিধুকে যতই সহ্য করি না কেন ওর এই মানসিকতা আমি আদৌ সহ্য ক'রতে পারি না। শ্রাবণী ছাড়াও বহু মেয়েকে বিভিন্ন ভাবে ভোগ ক'রেছে সে শুধুমাত্র ভোগের বাসনা নিয়েই। এবং সেইসব অপকর্মগুলো খুব আত্মশ্লাঘার সুরে জাহির করে।

অপছন্দ আমার সেইখানেই। তবে এই অপছন্দ যদি ঘৃণা হ'ত তাহ'লে হয়ত জীবনে সিধুর মুখদর্শন করতাম না। ঘৃণা কোনদিন করিনি বলেই সিধুর কথা-

গুলো সেদিন উপভোগ ক'রেছিলাম।

জানি না এখন সেদিনকার সেই অশালীন মানসিকতা সম্পন্ন অভব্য সিধু কি ক'রছে! এখন সে হয়ত একজন চিকিৎসক হয়ে অর্থ আর প্রতিপত্তির মধ্যে আমেজ ক'রে ডুবে আছে। যদি আরও বড় হতে পেরে থাকে তাহ'লে যে কি ক'রছে আন্দাজ ক'রতে পারি না, তবে এটা এই প্রায়-নিভৃত বিজন বনাঞ্চলে বসেও অনুমান ক'রতে পারি যে ব্যাধের মন নিয়ে সুবেশ সিধু এখন সেই সভ্যতার তলার অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্যসব পোষাকী মানুষদের মধ্যেই। কামনার বিকার তার দুচোখ দিয়ে বেরিয়ে গ্রাস করছে পরিচিত পরিমণ্ডল। কে জানে বৃহত্তর পরিধির আরও কত শ্রাবণী-সুভদ্রার বিনাশ ক'রছে কুমারীত্ব, অথবা বিনষ্ট করছে তাদের সাংসারিক জীবনের সততা। আজ আমি তাকে আর ঘৃণা করি না, কারণ পোকামাকড়ের জীবনে এমন কর্ম খুবই স্বাভাবিক। তবে এর মধ্যেও আমার একটা সংশয় জেগেছে। যে বিশাল গাছের গোড়ায় আমার ঘরটা বাঁধা ওই গাছের পাতায় দেখছি একটা থোকা বাঁধা পিঁপড়ের বাসা। আমি অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য ক'রে দেখছি ওই বাসায় একটা মহিলা পিঁপড়ে আছে, সে থাকে রাণীর মত। অসংখ্য পিঁপড়ে আছে সেখানে, সবাই কিন্তু তার সঙ্গে দেহ সম্ভোগ করে না। লক্ষ্য ক'রে দেখছি এবং আমার মনে হচ্ছে এদের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে। কি জানি আমরা তাহ'লে পোকামাকড়ের চেয়ে নিচে কিনা!

ওসব যাক। যা বলছিলাম ফিরে যাই সেই প্রসঙ্গেই। পরের দিন কলেজে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। শুয়েই রইলাম। মাঝে অনেকবার ভাবলাম যাই ভাল লাগল না। নিজেকে নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন চলতে লাগল। মানুষ যে পোকামাকড় থেকে অনেক উচ্চস্তরের একথা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, মনে মনে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে চাঙ্গা হ'তে চাইলাম, অনেকটা সুস্থও হয়ে উঠলাম পরক্ষণেই গিয়ে পড়লাম জীবন যাত্রার একদম তলপ্রান্তে। আমরা এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীরা পৃথক হতে পারি জীবন যাত্রার প্রণালীতে জীবনের গতি কিন্তু এক। সে গতি প্রাকৃতিক। জন্ম থেকে মৃত্যু সেই একই ধারায় চলছে। সেই জন্ম, জীবনধারণ, প্রজনন এবং মৃত্যু। এর বাইরে কে? ব্যতিক্রম কোথায়? এই যে কলেজে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি? লেখাপড়া শিখতে, ডাক্তার হবো। কেন? অর্থ রোজগার করতে হবে, বেঁচে থাকবার জন্যে যে সব বস্তুর প্রয়োজন অর্থ সেইসব বস্তুর বিনিময় মাধ্যম। আমার শ্রমের বিনিময়ে বেঁচে থাকার পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো চাই, তাই চাই বিনিময়ের মাধ্যম অর্থ। যেহেতু আমি একটু বেশী ভাল ভাবে বাঁচতে অর্থাৎ বেশী সামগ্রী ভোগ করতে চাই অতএব বেশী অর্থ আমার প্রয়োজন সেইজন্য আমার শ্রম করার ক্ষমতাকে আরও উপার্জনশীল করবার জন্যেই জ্ঞানের সাহায্য নেওয়া—লেখাপড়া—কলেজ যাওয়া—পাশ করা। চট ক'রে মাথায়

এল এই তো মানুষের সঙ্গে পার্থক্য। পোকামাকড়ের জীবনে এসব কোথায়? পৃথিবীর ওপর প্রকৃতির দয়ায় পড়ে থাকা বস্তুর মধ্যে আপন খাদ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে উদরপূর্তি ও বেঁচে থাকা। আমরা অন্য পৃথিবীর সৃষ্টি করেছি। প্রাকৃতিক পৃথিবীর নূতন বিন্যাস তো মানুষই ক'রেছে।

দূর যত বাজে চিন্তা—ফালতু। উঠে বসলাম। একটা সিগারেট বা অমনি একটা কিছু পেলে ভাল হ'ত। উঠে বারান্দায় গেলাম। এদিকটা প্রায় ফাঁকা। অনেকেই ক্লাসে চলে গেছে, বাইরে বেরিয়ে গেছে, যদি কেউ ঘরে থাকে তো দরজা বন্ধ ক'বে সে ঘরেই কিছু ক'রছে। বারান্দার এই নির্জনতাও আমার ভাল লাগল না। কোনদিনই লাগত না। সে সময় আমি নির্জনতা একদম সইতে পারতাম না। ঘরে ঢুকে মনে হল যাই স্নানটা সেরে আসি। মোট কথা আমি বুঝছিলাম যে আমাকে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। কিছু না কিছু সবসময়েই ক'রতে হবে। অল্প দূরে একটা বাড়ীর বারান্দায় দেখলাম একটা মাঝ বয়সী বউ এসে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে কি দেখছে। মহিলার মুখের দিকে তাকাতে কেমন ক্লান্তির ছায়া আমার চোখে পড়ল। আমার মনে এল গত কাল দেখা পোকা দুটির মৈথুন দৃশ্য। মনে হল এই বউটার মুখে যে ছাপ পড়েছে সে-ও ওই দীর্ঘকালের সহবাসজনিত ক্লান্তির। জীবনের মূল ধাবা তো ওই খাওয়া আব মৈথুন—পোকামাকড়েরও যা মানুষেরও তাই। মনে পড়ল অলকানন্দার কথা। সে হয়ত এখন ক্লাস ক'রছে, আজ সে এতক্ষণ নিশ্চয়ই খুঁজেছে আমায়। খুঁজবেই। কারণ আমি নিজেই তো বুঝছি আমার কালকের আচরণ মোটেই স্বাভাবিক হয়নি। এই অস্বাভাবিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, আজও সে ভাব তার মন থেকে যায় নি, নিশ্চয় সে চিন্তিত। তা করুক। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের? এক গর্ভে আমাদের জন্ম নয় যে সম্পর্ক অবধারিত, পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে জন্মসূত্র ধরেও সে আসেনি যে নির্ধারিত, আসলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক মৈথুনের। অর্থাৎ যে কোন একটা পোকা আর একটা বিপরীত লিঙ্গের পোকার সঙ্গে যে সম্পর্কে যুক্ত হয়ে পড়ে সেই সম্পর্ক অলকানন্দার সঙ্গে আমারও। মনে মনে যেন তাকে বোঝালাম, বুঝলে অলকানন্দা আসলে এই! আর এই আসল রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবার পরও কি আর বাঁধন থাকে? এর পরেও কি তোমারই ভাল লাগবে আমার শরীরের সংলগ্ন হয়ে বসে আকাশের একটা তারাকে নক্ষত্র না ভেবে টিপ বলে ভাবতে? আসলে যা আমরা বলি এবং করি সবই তো উদ্দেশ্যমূলক। পেছনে থাকে রিরংসা। আমি তো দেখেছি একটা কবুতর অন্য একটার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হবার আগে নিজের গলা ফুলিয়ে বকবকুম ক'রে তার চারপাশে ঘোরে, কতরকম মনমোহন ভঙ্গী ক'রে থাকে। সবই সে করে প্রকৃতির প্রেরণায়, পরের মুহূর্তটিব জন্যে। তার আসল কাজ ওই গলা ফুলিয়ে স্ত্রীটির চারপাশে ঘুরে বেড়ানো নয়, আসল মুহূর্ত পরেরটি যখন সে

স্ত্রী পায়রাটির সঙ্গে নিজের দেহ সংযুক্ত ক'রছে। আমরাও কি সেই উদ্দেশ্যেই চলছি না অলকানন্দা! হয়ত তুমি বলবে লোকসান কি? আমি বলব, কি লাভ? এই যে চিরদিন আমরা বলে আসছি এবং জেনে আসছি যে মানুষ অন্য জীবজন্তুর থেকে অনেক উঁচুতে, কোথায় সেই উচ্চতা? পৃথক? কোথায় পার্থক্য? বুদ্ধিতে ছাড়া কোথাও পার্থক্য নেই। প্রকৃতি মানুষকে বাড়তি যা দিয়েছে তা ওই বুদ্ধি। এর বাইরে জীবনচর্যা এক, জীবন যাপনের প্রণালীতে কোনই তফাৎ নেই। কোন না কোন পার্থক্য তো সব প্রাণীকেই দিয়েছে প্রকৃতি। আসলে সবাই এক।

সবই যে এক এটা জেনে যাওয়া আর সবাই সমান এটা মেনে নেওয়ার মধ্যে দুস্তর প্রভেদ। নইলে একটা পোকার সঙ্গে একটা মানুষের জীবনধারায় পার্থক্য নেই কথাটা অত্যন্তই সহজ ভাবে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ওই যে উত্তরাধিকার সূত্রে নিজেদের বড় বলে জেনেছি, অন্যান্য শ্রেণীর প্রাণীদের থেকে মানুষ উন্নত স্তরের এই যে বিশ্বাস মনের মধ্যে নিত্যদিন লালন ক'রে আসছি তারই ফলে এই জ্ঞান অসহনীয় মনে হয়। সমস্ত অন্তর দিয়ে অস্বীকার করতে ইচ্ছা করে। কিছুতেই যখন প্রমাণিত সত্যের ওপরে উঠতে না পারি তখনই হয় অস্বস্তি। ইচ্ছা হয় যেভাবেই হোক এর ওপরে উঠতেই হবে। যে জীবন ধারার বাইরে যাবার উপায় নেই, সেই কক্ষবলয়ের থেকে ছিটকে যাবার ঐকান্তিকতা নিরলস ভাবে প্রভাবিত ক'রতে থাকে মনকে। ফলে সেদিন কোন কাজেই মন বসাতে পারলাম না। কোনক্রমে খাওয়াটা সেরে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় নেমে দুদিকে চেয়ে ভাবলাম কোথায় যাই? এই মুহূর্তে আমার কাছে বাম-দক্ষিণ সমান। তাই দ্বন্দ্ব তীব্র, দ্বিধা অন্তহীন। এক লহমায় ভাবলাম কলেজে গেলাম না কেন? কি হ'ত গেলে? অকারণ নষ্ট হ'ল ক্লাস। মনে মনে হিসেব ক'রে নিলাম ক্লাসটা এখন ডাক্তার শুভ্র বসুর চলছে। না: ক্লাসটা ফাঁকি দেওয়া ঠিক হ'ল না। আগের ক্লাসগুলোও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে পশ্চাত্তাপ হ'ল। মনে হ'ল এখনও তো সময় আছে ডাক্তার বসু কিছু মনে করবেন না, চলে যাই। পরক্ষণেই মনে হ'ল জীবিকার জন্যেই তো এই আয়োজন। সেই খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার জন্যে! সে তো এত আয়োজন না ক'রেও একটা পোকা থাকে। তার সরল জীবন বরং অনেক সহজ। সেই তো বেঁচে থাকা—সে তো জটিল ভাবেও যতটুকু সরল ভাবেও ঠিক ততটুকুই! তবে কি লাভ অকারণ এত আয়োজনের? কি প্রয়োজন এত বিড়ম্বনার। এর শুধু আয়োজনই নয় দায়-ও অনেক। সাত পাঁচ ভেবে বিপরীত পথ ধরে কলেজ থেকে দূরেই সরে গেলাম, সেই সঙ্গে অলকানন্দার কাছ থেকেও।

আজ এই এতদিন বাদে বলছি বিশ্বাস কেউ করুন আর না করুন সেদিন তার পরের দিন এবং তারও পরের দিন অলকানন্দার কথা বারংবার মনে হয়েছে আমার, মনে তার কাছে ছুটে যাবার কথা যেমন এসেছে তেমনই এসেছে সেই জলের ধারে

ঘাসের ওপর দেখা সঙ্গমরত পোকা দুটোর কথা। আমি যে একজন মানুষ একটা পোকা থেকে স্বতন্ত্র, উন্নত, পৃথক, আমার জীবন যাপন প্রণালী যে পোকার সমান্তরাল নয় এই কথাটা সমস্ত চেতনা ও অস্তিত্ব দিয়ে প্রমাণ করার ব্যাগ্রতা তখন আমার সমস্ত প্রাণমন জুড়ে বসেছে। সমস্ত চিন্তা দিয়ে আমি অস্বীকার করার চেষ্টা ক'রলাম যে প্রকৃতি একটা পোকা থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীকে একই জীবনযাত্রা দিয়েছে। দিন যাপনের পদ্ধতিতে কোন তফাৎ নেই। আমরা ঘর সংসার যেমন করি ছোট্ট একটা গাছের পাখীকেও দেখি ঠিক তেমনি ভাবে ক'রতে। আমাদের বাড়ীর বারান্দায় একটা খাঁজে দুটো চড়াই পাখী বাসা বেঁধেছে অনেকদিন ধরে দেখছি। যখনই বাড়ী যাই দেখি চড়াই দুটো সেখানেই আছে, অনেক দিন আগে ওই বাসা থেকে একটা ডিম মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল আমার মনে আছে। অর্থাৎ ওই বাসাটুকুর মধ্যে নিশ্চয় অনেকবার ডিম হয়েছে, অনেক ডিম থেকে বাচ্চাও হয়েছে, আবার অন্যত্র বাসা বেঁধেছে তারা। আমার জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে, আমাদের সান্টুদা-ও তো আলাদা ঘর বেঁধেছে, সংসার ক'রছে তার বউ নিয়ে। তফাৎটা কোথায়! মনে হ'ল তফাৎ কিছুটা আছে, ঘর সংসার করবার ব্যাপারে আমরা যারা মানুষ হিসেবে পরিচিত, কিছুটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি মেনে চলি। বিয়ে নামে নানা রকম বিধি ব্যবস্থা ক'রে ইদানীং ঘরণী জোগাড় করি। কিন্তু আগে এটা ক'রতাম না। তখন জান্তব পদ্ধতিতেই অধিকার, অপহরণ অবশেষে ধর্ষণ ক'রে যে কোন একটি নারীকে ঘরণী করা হ'ত। সে পদ্ধতি পরিবর্তন ক'রেছি, কারণ সভ্য হয়েছি। আজকাল আমরা খুব নিকট আত্মীয়া কোন রমণীকে ঘরণী করিনা। তাই কি সত্যি? এতবড় মনুষ্য সমাজে ব্যতিক্রম কি নেই? অনেকে তো ভাগ্নীকে বিয়ে করে, অনেকে করে আপন কাকার মেয়েকেও। শ্যামল সেদিন গল্প ক'রছিল তার কে এক সম্পর্কে দাদা নাকি আপন মাসতুতো বোনকে বিয়ে ক'রে ঘর ক'রছে। আবার লোকভয়ে ঘর অনেকে করে না স্ত্রীসুলভ কর্ম ক'রে থাকে অনেক আত্মীয়ার সঙ্গেই। কাজেই একটা পোকাকে ঘৃণা করবার মত ব্যবধানটা কোথায়? শুধুমাত্র ভুয়া অহংকারীর উচ্চতায় আমাদেরকে মূর্খের স্বর্গে উঠিয়ে রাখে। সেখানে মহাসুখে দিন যাপন করি আমরা ততক্ষণ, যতক্ষণ না ছিটকে পড়ি নিচে।

আমরা যদি স্মৃতি অনুসরণ করি, যদি সৃষ্টির সেই প্রাথমিক কাল থেকে শুরু করি তাহ'লে নিশ্চয়ই মিলবে যে পোকা থেকে জন্তুর এবং যে কোন জন্তু থেকে মানুষের মধ্যে যে তারতম্য তা শুধু বিবর্তনগত। যদি তেমন গবেষণার সুযোগ থাকত তাহ'লে বোধ হয় এটাও দেখতে পেতাম যে আজ থেকে দশ হাজার বছর আগেকার মানুষের থেকে এখনকার মানুষের আচার আচরণগত প্রভেদ যেমন অনেক তেমনই সেই সময়কার জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে এখনকার সেই একই শ্রেণীর জন্তুদেরও পার্থক্য অনেক বেড়েছে। দশহাজার বছর আগে একটা হরিণ বা একটা বাঘ বা একটা হনুমান-

এর যে ধরণের জীবনযাত্রা ছিল এখন নিশ্চয়ই তা নেই। তবে প্রকৃতির কাছে মানুষ যে সম্পদ বেশী পরিমাণে পেয়েছে সেই বুদ্ধির জোরেই নিজের পার্থক্যটা অন্য যে কোনও প্রাণীর তুলনায় বেশী ক'রে ফেলেছে। কিন্তু যতই যা ক'রতে পেরে থাকি সেই প্রকৃতির উর্ধে উঠতে আমরা পারিনি। প্রকৃতিকে ছাড়াতে পারিনি। তাই অন্যসব প্রাণীর সঙ্গে জীবন যাপনের প্রণালীতে আমরা অভিন্ন। আসলে আমরাও এক শ্রেণীর পোকা মাত্র। ব্যাপারটা এমনই গভীরভাবে আমার মনের মধ্যে জমে গেল যে চিন্তাটাকে কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না। আমার মনের মধ্যে সে এমন ভাবেই বসে রইল আমার একটা বিপরীত চিন্তাও সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী হয়ে উঠল—একে মনের মধ্যে থেকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। কারণ আমি বেশ বুঝছিলাম অন্যথায় শান্তি নেই। এক সময় বিশ্লেষণ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলাম শান্তি নেই-ই বা কেন? হলই বা পোকার সামিল জীবনযাত্রা ক্ষতি কি তাতে? কি আমার ব্যহত হচ্ছে? এত কোটি কোটি মানুষ যদি পোকার জীবনে সুখী হয়ে থাকতে পারে আমার বাধা কোথায়? ভাবলাম মনের এই ভাবটা প্রকাশ ক'রে ফেলি, বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা ক'রে দেখি উপশম হয় কিনা। হয়ত হবে, মনের মধ্যে চাপা থাকা ভাবনা খোলা পেলে হালকা হয়ে যাবে। অনেক ভেবে চিন্তে পেলাম না কাকে বলব। অবশেষে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। দ্বিতীয় দিনে রাত প্রায় সাড়ে দশটায় সুনীল এসে দরজা ঠেলে ঢুকল আমার ঘরে। প্রথমে ঢুকেই জানতে চাইল—কি ব্যাপার হে?—পরক্ষণেই চমকে উঠল, আরে! এ কী চেহারা তোমার! কি হয়েছে? অসুখ ক'রেছে?

আমি বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিলাম। ঘরের আলোটা জ্বলছিল। প্রায় লাফিয়ে উঠে বসলাম। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সুনীলকে দেখে তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজেই প্রশ্ন ক'রলাম, এই সময় হঠাৎ কি মনে ক'রে?

সুনীল বলল, তার আগে আমার প্রশ্নটার উত্তর বিশেষ জরুরী।

কোন প্রশ্ন?

তোমার শরীর খারাপ কি না? হঠাৎ চেহারা এরকম হ'ল কি ক'রে?

কি রকম হয়েছে!—বিস্মিত এবার আমিই হ'লাম।

কি রকম মানে? আয়নায় মুখ দেখ না?

ব্যাপারটা সত্যিই তাহ'লে দেখছি জটিল। ঠাট্টা সুনীল ক'রছে না। তাছাড়া সুনীল আমাদের সহপাঠী বলেই ভাল ভাবে জানি ও বাজে ঠাট্টা করবার মানুষ নয়। ও বরাবরই একটু সীরিয়াস প্রকৃতির। আর এই গভীর প্রকৃতির বলেই ওর কথা পরিমিত। বেশী কথা প্রায় বলেই না, বাজে কথা কদাচিৎ-ই বলে। আমার সহপাঠী সে, কিন্তু কি এক অদ্ভুত অভ্যাসে সব সহপাঠীকেই তুই না বলে তুমি সম্বোধন ক'রে কথা বলে। তা বলে তার ব্যবহারে যে আন্তরিকতার অভাব থাকে একথা কেউ বললে মিথ্যেই বলবে। সুনীল-এর কথায় নিজের মনে পড়ল এবং তার কাছে স্বীকার

ক'রতেই হ'ল সত্যিই ক'দিন আয়নার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।

কি হয়েছে ? ক্লাসেও তো যাওনা।

কথাটা শুনে মনে মনে খুব খুশী হলাম এই ভেবে যে ক্লাসে যাই না বলে আমার খোঁজ ক'রতে এসেছে সুনীল। বেশ একটু আত্মতৃপ্তি লাভ করলাম। সহপাঠী হলেও সুনীল-এর সঙ্গে আমার বিশেষ সংযোগ নেই, আন্তরিকতাও নেই। এহেন একজন খোঁজ ক'রতে এসে আন্তরিকতা প্রকাশ ক'রলে আনন্দ হয় বৈকি ! কিন্তু তার কথার যে কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। পরিবর্তে তাকে বললাম, বসো।

বিছানার একটা অংশের চাদর হাত দিয়েই ঝেড়ে দিলাম। সুনীল বোধকরি অন্তরঙ্গ হবার অভিলাষেই বসল, বলল, তোমাকে দেখে কিন্তু শরীর খারাপ বলেই মনে হচ্ছে।—

আমি বললাম, না তা নয়। শরীর সুস্থই আছে। এই তো কিছুক্ষণ আগেই ঘরে ফিরলাম।

হ্যাঁ, তাও তো বটে ঘরে এলেও তোমাকে পাওয়া যায় না।

আগে এসে ফিরে গেছ না কি ?

জবাব না দিয়ে সে-ই আবার জানতে চাইল, তা হ'লে ক্লাসে যাচ্ছ না কেন ?

একথার কি জবাব দেব, কিভাবে জবাব দেব ভাবতে লাগলাম। আরও একটা কথা মনে এল, সুনীল-এর মত আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকের কাছেই বরং মনের কথা বলা যায়। ওর কাছে পরামর্শ চাওয়া-ই বোধহয় ভাল। এখন মনে হ'ল আসলে অনেকের মত আমিও সুনীলকে ভাল ক'রে চিনি নি এতদিন, বুঝতে চাই নি। সুনীল সহৃদয়। সুহৃদ।

আমার ভাবনার অবসরটুকুতে সুনীল বলল, কিছুক্ষণ আগে অলকানন্দা ফোন ক'রে তোমার খবরটা নেবার জন্যে আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ ক'রেছে। তাকে আমি বলে এসেছি আধঘণ্টার মধ্যেই জানাব। টেলিফোন ছেড়েই বেরিয়ে এসেছি গাড়ী নিয়ে। ফিরে গিয়ে ওকে ফোন ক'রে খবর দেব।

সুনীল-এর কথা শুনে আমি যেন স্বর্গের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম। কয়েক মুহূর্ত আগেকার সুনীল নিমেষে সরে গেল আমার মনের সুন্দরতম স্থানটি থেকে। ও তাহলে অলকানন্দার দূতিয়ালী ক'রতে এসেছে ! নিজের অন্তরের টানে আসে নি। সত্যিই তো, কি প্রীতির বন্ধন আমার সঙ্গে আছে যে সেই টানে আসবে ? আমারই তো বোঝবার ভুল ছিল। কিন্তু অলকানন্দা যে আবার এই রাত্রে ওকে বিব্রত ক'রবে এ আমি ভাবি নি। অবশ্য আবার এটাও মনে পড়ল যে অলকানন্দার সঙ্গে সুনীল-এর কেমন যেন একটা আত্মীয়তা আছে। সেই সুবাদে এতটা করা তার উচিত হয় নি। সুনীল-এর কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ ক'রলাম আমার জন্যে তাকে এতটা হয়রান হতে হয়েছে বলে। আর বলে দিলাম, তুমি অলকানন্দাকে বলে দিয়ো

কাল ভোরে মার কাছে যাচ্ছি বিশেষ দরকারে, শীঘ্রই ফিরব। ফিরে এলে দেখা হবে।

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অলকা তোমাকে খুঁজতে কাল দুপুরে এখানে এসেছিল। তোমার কোন খবর না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তোমাকে বিরক্ত করলাম অসময়ে এসে—সুনীল দুঃখ প্রকাশ করবার ভঙ্গীতে বলল কৈফিয়ৎ দেবার মত ক'রে।

আমি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আসলে আমি কিছুটা সময় নিলাম অলকানন্দার কাছ থেকে। সরাসরি এড়িয়ে যাওয়া যে অসম্ভব তা আমি বেশ ভাল ক'রেই জানি। অথচ চলতি অবস্থা যে সম্পর্ক নির্ধারিত করে দিচ্ছে তা ঠিক মেনে নিতেও পারছি না। আসলে হয়ত অলকানন্দাকে শুধুমাত্র উপভোগের উপকরণ হিসেবে ভাবতে আমার বাধছে। তাকে ভালবাসি—এই বিশ্বাসের ওপর মৈথুনরত পোকাকে যখন নৃত্য ক'রতে দেখছি তখন তা এক অমোঘ সত্যের মূর্তিতে রূপায়িত হয়ে যাচ্ছে আমার চোখের সামনেই। আর মনে হচ্ছে অতি ছোট নগন্য একটা কীটের পায়ের ভারে ফেটে ধ্বসে যাচ্ছে সেই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। তার চেয়ে দিন কয়েক নিভৃতে চেষ্টা ক'রে দেখি ভুতুড়ে চিন্তাটাকে দূর ক'রতে পারি কিনা। দু'চারদিন অলকানন্দা আমার খোঁজ খবর না করুক। সেই অবসরে সুস্থ হয়ে নিই। আর মিথ্যে কথাটাকেই আশ্রয় ক'রে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে। যাই একবার ঘুরে আসি বাড়ী থেকে। মা-বাবা ভাই বোনেরা সবাই রয়েছে সকলের মধ্যে দিন কয়েক হৈ চৈ ক'রেই কেটে যাবে।

কোন বন্ধুর কাছে কথাটা বলে হালকা হতে পারব যে ভেবেছিলাম ভেবে দেখলাম তা বোধহয় সম্ভব হবে না। কারণ একথা এখন যাকেই বলি সে হাসবে, অনেকেই হয়ত বিদ্রূপও ক'রবে নয়ত উড়িয়ে দেবে আমাকে পাগল বলে। এমনিতে নিজের কাছে নিজে হেনস্তা তো কম হচ্ছি না আবার কেন যেচে অপমান বাইরে থেকে কুড়াই? আমার মনে যা হচ্ছে তা নিজের মনের মধ্যেই থাক। সহানুভূতি-শূন্য, আত্মসুখমগ্ন, শূন্যদম্ভী মূর্খের মধ্যে আমাদের বাস—আমরা শিক্ষিত। হয়ত ঠিক অমনি আমি নিজেও, নইলে আমারও জীবনে এমন দু একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকত যাতে অন্যের বেদনা ক্ষোদিত। অনেক আর্ত মানুষই তো বেদনার কথা জানায়, যদি মদগর্বী অহমিকায় মুছেই না ফেলে থাকব তবে তার একটাও স্মৃতিতে নেই কেন?

এবার বেশ কিছুদিন বাদে অকস্মাৎ বাড়ী এলাম না জানিয়ে এবং অসময়ে। বাবা কর্মস্থল থেকে তখনও ফেরেন নি, মা বিস্মিত ও প্রসন্ন হলেন, বললেন, তোর কি এখন ছুটি?

না ছুটি নেই।—জানালাম।

মা মাথায় হাত দিয়ে বললেন, অসুখ ক'রেছিল বুঝি ?

না তো !

তবে যে তোকে কি রকম দেখাচ্ছে !

এত দূরের রাস্তা এলাম, কোন গাড়ী তো বাকী থাকে না চড়তে !

সে তো অনেক দিনই আসছিস। না বাপু আমার মনে হচ্ছে তোর শরীর-টরীর ভাল নেই।

শরীর খারাপ বলব কি ক'রে ?

যাই হোক জামা কাপড় ছেড়ে আগে কিছু খেয়ে নে। একটু ঘুমিয়ে নিলে শরীর ঠিক হয়ে যেতে পারে।

আমার ছোট ভাই ধ্রুব সদ্য স্কুল থেকে ফিরে বোধকরি বাইরে যাবার উদ্যোগ ক'রছিল, সে এসে দাঁড়াল বলল, দাদা তুমি যে হঠাৎ।

হঠাৎ বলছিস কেন ?

এ রকম সময় তুমি কখনও আস না তো ?

সেই জন্যেই এবার এলাম, হেসে বললাম তাকে। তারপর জানতে চাইলাম, তোরা সব কেমন আছিস ?

ভাল। আমাদের স্কুল এবার টুর্নামেণ্ট পাবে। সেই তোমরা থাকতে যে একবার পেয়েছিল তারপর এই প্রথম।

তুই-ও খেলছিস নাকি ?

হ্যাঁ, আমি সেণ্টার ফরোয়ার্ড।

ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম, বলিস কি রে ? গোল ক'রতে পারিস ? দেখে তো মনে হয় না !

মা ছেলের প্রশংসায় এগিয়ে এলেন, ধ্রুব এবার বিরাট কাপ পেয়েছে। অবিনাশ বলছিল খুব নাকি ভাল খেলেছে। সিংহ সায়েব তোর বাবাকে বলেছেন ওর চাকরীর জন্যে কোন ভাবনা নেই। তিনিই নিয়ে নেবেন।

তবে আর কি ?—আমার কথা ফুরোবার আগেই ধ্রুব উধাও হয়ে গেল।

ডলি কোথায় ? জানতে চাইলাম বোনের কথা।

বোধহয় সুমনদের বাড়ী গেছে। সুমন হচ্ছে মারাঠী পরিবারের মেয়ে। ডলির প্রায় সমান বয়স্কা বলে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব বরাবরই খুব নিবিড়, আমাকেও দাদা বলে ডাকে ডলির সুবাদেই। বাড়ী এলেই সব মনে পড়ে, আশ্চর্য কলকাতায় থাকলে এদের সবার কথাই ভুলে যাই ! আমার মনে পড়ার মধ্যে মা বললেন, হ্যাঁ রে, ডলির জন্যে একটা ভাল ছেলের খোঁজ ক'রতে বলেছিলাম কি ক'রলি ?

এই আর একটা কথা আবার মনে এল। বাইরে বেরোনো মাত্রই ভুলে গিয়েছিলাম। মাকে বললাম, সেরকম ছেলে কই, দেখতে তো পাই না।

দেখতে পাস না কি রে? তোদের বন্ধু বান্ধব জানাশোনার মধ্যে হ'লে অনেক সুবিধে হয়। ভাবনা চিন্তা কম থাকে।

মাকে আমি কি ক'রে বোঝাই যে জানার চেয়ে না জানা কাউকে মেয়ে দেওয়াই ভাল কারণ জেনে একটি অপাত্রে দেবার চেয়ে না জেনে কম দুঃখের। আমার জানা যে শিক্ষিত সম্প্রদায় তার মধ্যে কে যে ভাল তা আমি নিজেই বুঝতে পারি না। তাই মাকে বললাম, তুমি বাবাকেই বল ডলির জন্য পাত্র দেখতে। আমার বিদ্যেয় ওসব আসে না।

মা আমাকে বোঝানোর জন্যে বললেন, তুই যদি না চেষ্টা করিস তো কি ক'রে হবে বল? এমনি ভাবে একলা বিদেশে পড়ে আছি আত্মীয় নেই, স্বজন নেই, কে চেষ্টাটা ক'রবে, আর তোর বাবা যাবেই বা কোনখানে?

মার কথায় মনে পড়ল বাবার কথা। ছেলেবেলাতে জীবিকার খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েন। বাবার কাছে গল্প শুনেছি তখন চারপাশে ছিল ঘন ঘাসের জঙ্গল; মাঝে মাঝেই বাঘ আসত গরু মোষ ধরতে, কখনও আসত হরিণের পেছনে দৌড়ে। এই কারখানাও এত বড় ছিল না, চারপাশে কোয়ার্টারগুলো ছড়াতে ছড়াতে মাঠ-জলা-জঙ্গল সব উচ্ছেদ ক'রে কয়েক মাইল চলে গেছে, তাও তখন ছিল দৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই বনভূমি শহর হয়েছে বাবার চুলগুলো পেকে ওঠবার আগেই, বলতে গেলে তাঁর চোখের সামনে। চট ক'রে মনে হ'ল তাহ'লে শুধু মাত্র প্রাণ ধারণের জন্যই বাবার এইভাবে এখানে এসে পড়ে থাকা! শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই বেঁচে থাকা যে কোন এক জায়গায়। যেমন একটা কীট বেঁচে থাকে যে কোনও এক কোটরে। নিজের বেঁচে থাকবার অনুকূল যে কোন একটু স্থান পেলেই যেমন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিঅধীন জীবগুলো সেখানে আশ্রয় পেতে চায় আমার বাবাও তো সেই ভাবেই বাঁচতে চেয়েছেন। আর থাকতে থাকতে প্রাকৃতিক কারণে তারা যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি করে বংশবৃদ্ধি ক'রে থাকে বাবা তার বেশী কি আর ক'রেছেন?—আবার সেই ভাবনাটা মাথার মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল যার কাছ থেকে আমি পালাতে চাইছিলাম! জেল পালানো কয়েদী অনেক দূরে কোথাও পথের মাঝে ধরা পড়ে গেলে যেমন অবস্থা হয় তেমনই হ'ল আমার। আমি অসহায় ভাবেই ধরা দিলাম। আর আমাকে যেন প্রচণ্ড প্রহারে অচৈতন্য ক'রে দিল। আমি কোনক্রমে গিয়ে একটা বিছানার ওপর শুয়ে পড়লাম। মার উৎকণ্ঠাময় ব্যস্ততা দেখে শুধু তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা ক'রলাম, বললাম, ঘুমিয়ে উঠে তোমাদের সঙ্গে কথা বলব, আসলে আমার ঘুম পাচ্ছে। মার বিস্মিত বিহ্বল চোখের দিকে একবার দেখে নিয়ে আমি চোখ বুজলাম।

ঘুম ভাঙতেই বাবার প্রথম প্রশ্ন, কিরে শরীর এখন সুস্থ মনে হচ্ছে?

সত্যিই হচ্ছিল। প্রচণ্ড ক্লান্তি আমার সমস্ত দেহমন জুড়ে বসেছিল, ছোট্ট ঘুমটুকুর

পর তা সরে যেতে বেশ ঝরঝরে লাগল মনটা। সুস্থ মনে হচ্ছিল। বাবা আর প্রশ্ন ক'রলেন না। বললেন, বিদেশে একা পড়ে থাকিস একটু কিছু হলেই জানাবি। কলকাতাতে আত্মীয়স্বজন যা আছে তাদের কারও ঠিকানা ঠিক জানা নেই, যাদের মনে আছে তারাও আবার সেই ঠিকানাতেই এতদিন আছে কিনা কে জানে।

বুঝলাম বাবা আমার কথা চিন্তা করেই কলকাতার আত্মীয়দের কথা পাড়লেন। আমি তাঁকে আশ্বস্ত ক'রতে বললাম, সেজন্যে কোন চিন্তার কারণ নেই। শরীর খারাপ হ'লে তার ব্যবস্থা আমাদের যেমন হবে কলকাতায় কোন লোকেরই অত তাড়াতাড়ি সেরকম ব্যবস্থা হবে না।

মা কাছেই ছিলেন, চট ক'রে বললেন, তাহ'লে শরীরটা ওরকম হয়ে গেল কি ক'রে?

বাবা বললেন, হ্যাঁ শরীরটা বাস্তবিকই বেশ খারাপ দেখছি এবার।

ও কিছু না। সব সময় কি এক রকম থাকে?

বটে, বলে বাবা জামা কাপড় ছাড়তেই বোধকরি চলে গেলেন অন্য ঘরটায়।

ঘটনাগুলো আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে। তারিখের হিসেব দেওয়া এখন আমার সাধ্যের অতীত কিন্তু মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। রাত্রে ঘুমিয়ে উঠলে যেমন আর এক সকাল, এ-ও তেমনি সময়ের ঘন নৈকট্য। জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কালস্রোতের হদিশ রাখতে মানুষ যেমন পারে না, নিশিগন্ধা ফুল যেমন দিনের বেলা মনে ক'রতে পারে না যে তার গন্ধ নেই, আমিও তেমনি ভাবতে পারি না কতগুলো দিনরাত্রি আমাকে ফেলে গেল এই স্মরণের ক্ষণটুকুর মধ্যে। অথচ হয়ত সব বিস্মরণ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অলকানন্দাকে কেন্দ্র ক'রেই বোধ হয় সব মনে আছে। তার কাছে আমার সীমাহীন প্রাপ্তি স্বীকার ক'রে আসা হয়নি বলেই বোধহয় একই সঙ্গে মনে পড়ে বাবার আর্তি মা-র স্বাভাবিক মনোবেদনা। কোনটাই চোখে দেখিনি, শুধু অনুমান করেছি মাত্র। কারণ সব এ তো স্বাভাবিক। পৃথিবীটা প্রয়োজনের ভিত্তিতে চলে, পৃথিবীর সম্পর্কগুলোও স্বাভাবিক ভাবেই তাই। অলকানন্দাকে আমার অথবা আমাকে অলকানন্দার প্রয়োজন শতকরা আশিভাগ দেহগত কারণে, বাকীটুকু মানসিক। আমি বাবা মা-র বড় ছেলে, উপযুক্ত ছেলে যাকে বলে। প্রায় সাড়ে আট হাজার দিনরাত্রি তাঁরা আমাকে খাবার এবং অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র যুগিয়ে বড় ক'রেছেন তাঁদের দুর্দিনে পাশে দাঁড়াব বলেই তো? বোনের বিয়েতে কাজে লাগব, ভায়েদের মানুষ ক'রতে কাজে লাগব, বিপদে-আপদে কাজে লাগব— সেই প্রয়োজনে। আপনারা হয়ত কেউ আপনাদের স্বাভাবিক আবেগের বশবর্তী হয়ে ভাবতে পারেন মা-বাবার সঙ্গে ছেলের সম্পর্কের মধ্যে কোন প্রয়োজনের চিহ্ন নেই। তাই কি? আত্মতৃপ্তিই এ পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সেই আত্মতৃপ্তিরই উৎপাদন হচ্ছে একটি সন্তান। আমি জীবনের বাহ্যিক প্রয়োজনগুলো সব বাদ দিতে রাজী আছি কিন্তু যে মানসিক কারণে একটি নিঃসন্তান দম্পতি

সন্তানের জন্যে কামনা করে তাকে প্রয়োজন ছাড়া আর কি নাম দিতে চান? আমি অনেক হিসেব ক'রে আর লক্ষ ক'রে দেখলাম একটা পোকা যতখানি প্রয়োজনের ভিত্তিতে চলে মানুষ তার চেয়ে বেশী। পোকামাকড় ছোট, তাদের প্রয়োজনও ছোট। মানুষের প্রয়োজনের পরিধি বিশাল, ক্ষেত্র ব্যাপক। এই যে আমার বাবা কোন কৈশোরে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে দূরে অপরিজ্ঞাত জায়গায় গিয়ে পড়েছিলেন, সে কি প্রয়োজনে নয়? তারপর একদিন যৌবনে একজন রমণীকে খুঁজে সহবাসের শর্তে সঙ্গিনী হিসেবে যোগাড় করেছিলেন সে কি নিছক প্রয়োজেনের জন্যে নয়? তারপর একে একে আমি এবং আবও তিনটি ছেলেমেয়ে মায়ের গর্ভে উৎপন্ন হ'লাম এ কি প্রয়োজনেব জন্যে নয়? শেষবার আমি গিয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি ক'রলাম বাবার কোয়ার্টার নামক ঘর দুটোর মধ্যে আমরা কতগুলো প্রাণী কিলবিল করছি। ছেলেবেলায় আমার পেটে একবাব কৃমি হয়েছিল। কি একটা ওষুধ খাবার পর পায়খানায় গিয়ে দেখেছিলাম অসংখ্য কৃমি আমার পরিত্যক্ত মলের মধ্যে কিলবিল করছে। সেই বাল্যস্মৃতি মনে পড়েছিল সেদিন রাত্রেই যখন বিছানায় শুতে যাচ্ছি। তাই সকালে উঠে যখন সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় যে বাইরে বেবিয়েছি তারপব আর ওদিকে যাইনি। সেই এক বস্ত্রে সোজা পাটনা। ঝোঁকের মাথায় পাটনা পেঁছে খেয়াল হ'ল কাজটা ভাল হয় নি। একদম এক কাপড়ে চলে আসা অনুচিত হয়েছে। প্রয়োজনে মনে পড়ল সলিল-এর কথা। সলিল গুহ। পাটনায় থাকে। ঠিকানাটা খেয়াল নেই তবে কদমকুঁয়ায় বাড়ী তা মনে আছে। সেই স্মৃতিকে ধরেই খুঁজে বের করলাম তাকে। উদরপূর্তিটা সেদিন-কার মত ওর ওখানেই হ'ল। এভাবে হঠাৎ এক কাপড়ে হাজির হবার কোন কারণ দেখাতে পারা সম্ভব ছিল না, মিথ্যে বলেই বা কি লাভ? ওকে বললাম, মনে কর হঠাৎ খেয়ালে চলে এসেছি। আজই ফিরে যাব কিনা ভাবিনি। রাত্রে থাকলে কি তোর খুব অসুবিধে হবে?

আন্তরিক ভাবে সে বলল, আদৌ নয়। থাকতে তো তোকে হবেই। কতদিন বাদে দেখা, গল্পগুজব কিছুই তো হ'ল না। বিন্দেশ্বরীকে মনে আছে তো?

খুবই।

সে এখন এখানে একটা ওষুধ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার।

বলিস কি রে?

হ্যাঁ রে।

ওষুধ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার হয়েছে সেই বিন্দেশ্বরী লাল! কোন-ক্রমে বি, কম?

খুব একচোট হাসল সলিল। শব্দ করেই হাসল। তারপর বলল, আজকাল চারিদিকেই নানা রকম কারখানা খুলছে। ওষুধও তার মধ্যে একটা। আমাদের

এদিকেও বেশ কিছু ছোটখাট কারখানা খুলেছে।

তাই বলে বিন্দেশ্বরী জেনারেল ম্যানেজার ?

শ্বশুরকুলের কারখানা। তার ওপর দুকুলের মধ্যে শিক্ষিত ওই একজনই। অতএব আর কে হবে ?

এ তোর একেবারেই ঈর্ষার কথা।

শুনে সলিল ঈষৎ অসন্তুষ্ট হ'ল, বলল, তোর বুঝি তাই মনে হচ্ছে ?

তা ভিন্ন কি ? ওষুধ কারখানা খোলা কি যার তার কাজ ? যত ছোটই হোক রীতিমত অভিজ্ঞ এবং কেমিস্ট না হ'লে এ ব্যবসা তার সাধ্য নয়।

পয়সা থাকলে অভিজ্ঞতা আর শিক্ষা দুটোই কেনা যায়। বোম্বের কোন এক কোম্পানীর কেমিস্ট ভাঙ্গিয়ে এনে এটা খোলা হয়েছে। অবশ্য পাণ্ডে বলে সেই ভদ্রলোক কোম্পানীতে ডিরেক্টর হিসেবে আছেন।

মরুক গে, তুই বিন্দেশ্বরীর কথা বল। শুনে মজা লাগছে।

গিয়ে দেখা করে মজাটা সম্পূর্ণ ক'রে নে না। তোকে অনেকদিন বাদে দেখলে ও নিজেও খুব খুশী হবে।

কিছুটা সলিল-এর কথায় আর কিছুটা পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাতে খুঁজে গিয়ে হাজির হলাম নালন্দা ফার্মাসিউটিক্যালস-এর অফিসে। ঝকঝকে নতুন বাড়ীতে চকচক ক'রছে অফিসটা। উপযুক্ত একটা ঘরেই সন্ধান মিলল বিন্দেশ্বরীর। কিন্তু সে আমার পরিচিত কোন ব্যক্তি নয়, অন্য এক বিন্দেশ্বরী, অথচ তার মুখ দেখে বুঝলাম আমি তার পরিচিত। গভীর বিস্ময়ের তলা থেকে অনেক পরিশ্রম ক'রে মাথা তুলে সে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর চোখমুখের ওপর থেকে বিস্ময়গুলো কিছুটা সরে গেলে সে তার নিবিড় মাতৃভাষা খড়িবোলীতে জিজ্ঞেস ক'রল, তুই ! এতদিন বাদে যা হোক আমাকে মনে করলি !

ওর আমার মাঝখানে বিরাট একটা টেবিলের ব্যবধান। নইলে ও কি করত জানি না, তবে এই ব্যবধান দূর ক'রে মেলবার জন্যে ওর বিশাল পাঞ্জা সমেত কোটের হাতটা মেলে দিল প্রায় আমার কাছ পর্যন্ত। আমি ওর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ভরপুর হাতে হাত রাখলাম। তাছাড়া আর কিছুই ক'রলাম না, এমন কি সৌজন্যের খাতিরেও ওর কথার জবাবটা পর্যন্ত দিলাম না। তবে আমি বুঝছিলাম বিন্দেশ্বরীর সঙ্গে দেখা হবার সুখে আমার মুখে এক পর্দা হাসি আপনা থেকেই প্রলিপ্ত হয়েছিল। তাকেই উত্তর ধরে নিয়ে বিন্দেশ্বরী বলল, সেই যে স্কুল ছেড়ে গেলি আর একবারও আমার সঙ্গে দেখা করলি না ! আমি কিন্তু তোর কথা সলিলের কাছে অনেকবারই জানতে চেয়েছি।

সলিল কি বলেছে ? এবার আমি মুখ খুললাম।

বলেছে ভালই আছিস।

আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে বলেছিল কি ?

একবার বোধহয় বলেছিল।

সত্যিই তাই। আমি কলকাতা চলে যাবার পর বাড়ী এসেছি অনেকবার, কিন্তু সলিল-এর সঙ্গে আমার একবারই দেখা হয়েছে।

আমি না হয় পাটনা চলে এলাম সলিল তো ওখানেই ছিল—

তা ছিল। আমিও বাড়ী ফিরেই ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইতাম কিন্তু হ'ত না কারণ পাকাপাকি ভাবে ওখানে থাকলেও ও প্রায়ই কুমুলিয়ায় ওদের জমিজমা দেখা-শোনা করবার জন্যে চলে যেত।

তার মাতৃভাষা যদি হিন্দির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়ে বেরোয় না বিন্দেশ্বরীর। সেই ভাষাতেই বড় রসিয়ে বলল, মানুষের কি বিচিত্র ভবিষ্যৎ! একসঙ্গে ছেলেবেলাটা কাটিয়ে আজ কে কোথায় ছিটকে পড়লাম যে দেখা-ই হয় না!

অন্য সময় হলে কি হ'ত জানি না তার কথাটা আমার মনে ধরল। যেন আমিও ঠিক এই কথাটিই ভাবছিলাম। আমার মনের কথাটিই যেন বিন্দেশ্বরীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। সত্যিই তো এই নাকি সমাজ সভ্যতা আরও কত কি। অথচ কি ঠুনকো সব—কথার কথা। পেটের টানে কোথায় থেকে কোথায় চলেছি আমরা তার কোন ঠিকানা নেই। এর কোন একটা নাম দিয়ে নিয়ে আমরা বেশ আত্মতৃপ্তি অনুভব ক'রে থাকি। কখনও বলি শিক্ষালাভের জন্যে যাত্রা, কখনও বলি উন্নততর কার্যভার। আসলে কিন্তু সবেরই মূলে ওই বেঁচে থাকা, হয়ত আরও একটু ভাল ভাবে—রসনাকে আর একটু বেশী তৃপ্তি দিয়ে, দেহকে আর একটু বেশী আরাম দিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু মূলত সেই পেটের জন্যেই সব, শিক্ষা, শ্রম এবং যা কিছু আমরা ক'রছি পেট চালাবার জন্যে, বেঁচে থাকবার জন্যে, বেঁচে আছি বলে নয়। এই যে আমি জামালপুরের স্কুলে এত বছর পড়েছি সে শুধু পড়াশোনা শিখে একটা ভাল চাকরী পাব বলে। তারপর কলকাতা গিয়ে ডাক্তারীতে ভর্তি হয়েছি ডাক্তার হ'তে পারলে অনেক রোজগার এই আশায়। নইলে ডাক্তার না হয়ে মাষ্টার হলাম না কেন? সেবা? ওসব ভুয়ো কথা। সেবা নিজের তারপর পরের। পৃথিবীতে দু চারজন মানুষ আসে যার। সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ ক'রে থাকে, সেই ব্যতিক্রম নিয়ে সব নয় কাজেই ডাক্তারী পড়লেই যে সেবক হয়ে যাবে তার কোন মানে নেই। আমার চিন্তাগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে বিন্দেশ্বরী জানতে চাইল, কবে এসেছিস বল?

কাল। রাতটা সলিল-এর বাড়ী কাটিয়ে ওর কাছে শুনে এখানে এলাম।

খুব ভাল। সলিল এল না কেন?

সে তো তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে।

আজ না হয় ছুটি ক'রত ?

একথার জবাব দিলাম না। আমি সাধারণত কোনদিনই এইসব সামান্য বিষয়-গুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ পাইনি। ওরা যে কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ টাকা রোজগারের মাঠে নেমে পড়েছে এই কথাগুলোতেই তা প্রমাণিত। আমি পেছিয়ে। আগে হলে কি ক'রতাম জানি না আজ এই সময় আমার কোন দুঃখ হচ্ছে না কারণ আমি জীবন রহস্য জানি। আসল প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্যে খাবার সংগ্রহ। সে তো আমার চলছে। যেদিন জন্মেছি সেই দিনটি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই যে সমানে চলছি খাদ্যের ওপরে চলছি। আসল প্রয়োজন দৈনন্দিন খাদ্য সংগ্রহ। সেটুকু যেভাবেই হোক হওয়া চাই। নইলে মৃত্যুটা কষ্টকর হবে। সেই কষ্ট থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই খাবার সংগ্রহ—খাবার সংগ্রহের জন্যে কাজ—কাজের জন্যেই অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে যেমন পারে ব্যবস্থাগুলো—করে চলছে। একটা চাকার মত গোল হয়ে সমস্তটা ঘুরছে। পর্যায়ক্রমে এক একটা বস্তু জীবনের সামনে এসে পড়ছে আর চাকাটার কেন্দ্রে থেকে যা তাকে ধরে রয়েছে তার নাম প্রয়োজন।

আমি চুপ ক'রে থাকতে বিন্দেশ্বরীই আবার বলল, সলিল তো পাটনাতেই থাকে, সে-ও একবার আসে না।

তুই যাস ?

দেখছিস তো আমি ব্যস্ত !

নিজের নিজের পেটের জন্যে সবাই ব্যস্ত। সলিলও। আসলে কি জানিস, জগৎটা প্রয়োজনের ওপব চলে, বিশেষ ক'রে আজকাল বিনা প্রয়োজনে কেউ কারও কাছে যায় না।

তাহ'লে তুই কি প্রয়োজনে এসেছিস বল ?

বলতে পারতাম দেখা করবার প্রয়োজনে, সেটা বললেই যথার্থ হ'ত কিন্তু কেন জানি না বলে ফেললাম, চাকরীর প্রয়োজনে।

বিন্দেশ্বরী একটু সন্দেহ ক'রল, বলল, সত্যি-মিথ্যে জানি না। জানতাম তুই ডাক্তারী পড়ছিস। পড়া এখনও শেষ হবার কথা নয়। তবে কথায় যখন কথা এসেছে তখন নিশ্চয়ই আমাকে তা রাখতে হবে। এক্ষুণি তোকে চাকরী দেব।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন হয়ে গেল। বিন্দেশ্বরীর সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা ক'রতে গিয়ে ব্যাপারটা তামাসা রইল না। বললাম, দে। বল কি ক'রতে হবে ?

বিন্দেশ্বরী বলল, গতকালই আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি আসাম পশ্চিমবাংলার জন্যে সেল্‌স-রিপ্রেজেন্টেটিভ চাই।—দেরাজ থেকে সাদা কাগজ টেনে বের ক'রে বলল, নে দরখাস্ত লেখ।

আমি কাগজটা সামনে নিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম। বিরাট ফাঁকা টেবিলটার ওপর বিন্দেশ্বরীর সামনে একটা বন্ধ ফাইল আর আমার সামনে সাদা কাগজটা। আমাকে

ওই ভাবে বসে থাকতে দেখে সে বলল, কি, বললাম না আমার সঙ্গে মস্করা ক'রে পারবি না, দেখলি তো ?

আমি জেদাজেদিতে পেরে উঠবার জন্যই বললাম, দরখাস্ত কোনদিন লিখিনি লিখতে জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের তলায় বোতাম টিপল বিন্দেশ্বরী, আমার পেছনে ব্যাঙের আর্তনাদের মত শব্দ হ'ল। দরজা ঠেলে ঢুকল একজন চাপরাশী। বিন্দেশ্বরী বলল, সিংজীকে ডেকে দাও।

লোকটি যেতে না যেতেই একটি যুবক এল ডিক্টেশন নেবার প্যাড হাতে নিয়ে। বিন্দেশ্বরী বলল, একটা সাদা কাগজে বেঙ্গল এরিয়ার সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর জন্যে একটা দরখাস্ত টাইপ ক'রে নিয়ে এস। —বলে একটা ছোট কাগজ বের ক'রে আমার নাম ঠিকানা বাবার নাম লিখে বলল, কোন ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিস ডাক্তারীতে ?

ফাইনাল ইয়ার—।

সব কিছু লিখে কাগজটা সিং নামক যুবকটিকে দিয়ে দিল। সে চলে যাবার পর বলল, সই ক'রতে জানিস তো!

খুব হালকা ভাবে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল সেদিন। নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে আমি বিন্দেশ্বরীর সঙ্গেই সেদিন বেরিয়ে এলাম তার অফিস থেকে। যে সব ঘটনার স্বপ্নও আমার কাছে সম্ভব ছিল না বিচিত্র ভাবে তাই বাস্তব হয়ে উঠল আমার জীবনে। মনে আছে সেদিন সন্ধেয় বিন্দেশ্বরীর বাড়ীতেই নৈশ ভোজ সেরে শুতে গেলাম সলিল-এর বাড়ী। মাথার মধ্যে নতুন এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'ল—ঝোঁকের বশে যা ক'রলাম তা থেকে মুক্তি পাই কি ক'রে? একটা বছর সামনে, পড়াশোনা ছেড়ে চাকরী নেবার কোন মানেই হয় না। সলিলকেও এই নির্বুদ্ধিতার কথা প্রকাশ ক'রলাম না। জানতাম এরকম বোকামীর কথা শুনলে সবাই আমাকে দুষবে। অতএব হজম ক'রে রাখাই ভাল। তবে অন্য এক উৎকট দুশ্চিন্তা আমাকে বিব্রত ক'রে তুলল। পড়াশোনা ছাড়বার কথা কোনদিন ভাবতেও পারিনি অথচ পাকেচক্রে এ কী হয়ে গেল : কি এক ভূতের তাড়ায় কোথা থেকে কোথায় এলাম আমি! বিন্দেশ্বরীও আমার নিয়োগপত্রটা টাইপ করিয়ে ডাইরেকটরকে দিয়ে সই করাতে নিজে নিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিল, কিরে! এখনও বিবেচনা করে দ্যাখ পড়াশোনা আবার করবি কিনা? কতদিন ছেড়েছিস তাও কিছু বলছিস না—তবু সবকিছু আমি ক'রে দিলাম কিন্তু—

আমি সে কথার জবাব দিই নি। ও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রেছিল আমার জবাব পাবার জন্যে, তারপর আমি বিরক্ত হব মনে করে টাইপ করা চিঠিটা হাতে নিয়ে নিজেই চলে গিয়েছিল ডিরেক্টরের ঘরে। মিনিট পনেরোর মধ্যে সই করিয়ে এনে আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, তোর তো পুরানো অভিজ্ঞতা এ লাইনে নেই আমাদের সেলস

ম্যানেজার মিস্টার ভার্মার সঙ্গে কথা বলে কি ভাবে কি হবে কাল জেনে নিস।

সেই থেকে, কয়েকদিন সেই সেলস ম্যানেজারের কাছে বিক্রি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত শিক্ষা নিয়ে সোজা পে'ছিলাম শিলিগুড়ি। আমার মনে আছে প্রথম রাত্রিটা খালি সলিল-এর বাড়ীতে ছিলাম। পাটনার বাকী দিনগুলো, বিন্দেশ্বরীর কাছে টাকা ধার ক'রে একটা ছোট্ট হোটেলেই কাটালাম। তারপর কোম্পানী থেকে আমার রাহা খরচা বাবদ টাকা আগাম নিয়ে চাপলাম ট্রেনে। কি আশ্চর্য এই ক'দিনের মধ্যে বাড়ীর কথা, অলকানন্দার কথা আমার একবার মনেও হ'ল না। আসলে আমি এক ভয়াবহ ছায়ার এক্তিয়ার থেকে ছাড়া পেতে পালাতে চাইছিলাম। বিন্দেশ্বরীর সঙ্গে দেখা হবার পরের সময়টুকু নতুনতর ভাবনার জন্যে আমি অনেক আবামে ছিলাম বলেই এ অবস্থা ছেড়ে পুরানো পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়তে মন চায়নি। অন্য চিন্তা যদিও ভার নিয়ে এসেছিল তবু এ ভার অনেক কম মনে হচ্ছিল আগের সেই তীব্র অনুভূতির চেয়ে। এক এক বার মনে হচ্ছিল ওই চাকরী ছেড়ে দিই। না হয় বিন্দেশ্বরীর সঙ্গে সম্পর্কটা নষ্ট হবে। হোক। ভবিষ্যতে আর কোনদিন ওর সঙ্গে মুখোমুখি না হলেই হল, লজ্জা আসবে না! যদি ওখানে না আসি দেখা তাহ'লে হবেও না, অতএব ভয়টা কিসের? যেমন একদিন কলকাতা থেকে নিঃশব্দে চলে এসেছিলাম, যেমন বাড়ী থেকে ভোরের নির্জনতায় বেরিয়ে এসেছি কাউকে না বলে তেমনি ভাবেই আবার ফিরে যাই কলকাতা, এখানেও কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। এই যে ক'দিন পাটনাতেই আছি, অথবা এই যে চাকরী নিলাম বিন্দেশ্বরীদের কারখানায় এও তো জানে না সলিল অতএব আবার কলকাতা চলে যাই, ফিরে যাই আমার ক্লাসে, জীবনে। গড়ে তুলি এবং গড়ে উঠি।

কিন্তু এই চিন্তা করার মুহূর্তেই মনে হ'ল তা হ'লে আবার সেই পোকা হয়ে যাওয়া শরীরের প্রবৃত্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণে ফিরে যাওয়া তাদের হুকুমমত। যেমন একটা পোকা চলে, তেমনি ক'রে চলা। জীবনের অর্থ কি? এই কি উদ্দেশ্য? পরিণতি কি শুধুমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়? তাহ'লে মানুষ নাকি উন্নততর জীব? মানুষ নাকি ঈশ্বরের মত? মানুষ নাকি দ্বিতীয় ঈশ্বর?

যে কল্পনার নামে ঈশ্বর সে কল্পনা তো মানুষেও আরোপিত হতে পারে? বাধা কি? অতএব এই শব্দগুলো যা আমরা ব্যবহার ক'রে থাকি তা ব্যবহার ক'রতে পারি যা কিছুর সম্পর্কেই। কে বাধা দেবে? ঈশ্বর, মানুষ এবং পোকা তিনটিই শব্দ মাত্র। যে কোনটিকে ইচ্ছামত যে কোনটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। অতএব মানুষ এবং ঈশ্বর এক হতে পারে কিন্তু মানুষ আর পোকা যে এক সে তাদের ব্যবহারগত ঐক্যের কারণেই। মানুষের পরিবর্তে যদি ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করি তো পার্থক্যটা কি হয়? আসলে তো শব্দ। কিন্তু এই শব্দমাত্রকে নিয়েই যত জটিলতা।

মানুষ সম্পর্কে পোকা শব্দটা ব্যবহার ক'রলেই আসলে বিড়ম্বনাটা বাড়ে এবং বেধে যায় গণ্ডগোল। মানুষও যে এক শ্রেণীর পোকা মাত্র তা অস্বীকার করার প্রবণতা কেবল নিজের উৎকর্ষ প্রমাণের জন্যেই। মূল সত্যে যাই থাক আমরা তাকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি অনেক দূর। এই উত্তরণ দিয়েই আজ আমরা ঈশ্বরের কাছাকাছি —দ্বিতীয় ঈশ্বর। কিন্তু একটা ঘুড়ি যতই উঁচুতে উঠুক মূলের সঙ্গে তার সংযোগ যেমন থেকেই যায় তেমনই সেই মৌলিক ঐক্য আমাদের এখনও অবিচ্ছিন্ন। আমি একথা কোন ভাবেই অস্বীকার ক'রতে পারছি না, আকাশে উঠলেও আমি নিজেকে ওই ইডেন গার্ডেন-এর পোকাটির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখতে পাই।

এবং এই যে এতদিন, যাকে বছরের মাপে হিসেব ক'রলে অনেক বছর পার হয়ে গেছে, এই দীর্ঘ ব্যবধানেও আমার মনের গোচরে সেই দৃশ্য। ভুলতে পারি না। আমার নিজের হাত দুটো চোখের সামনে তুলে ধরলে দেখি শরীরের বাঁধন তেমন মজবুত নয়, কেমন যেন ঢিল ঢিল লাগে হাতের মাংসল জায়গাগুলো। শরীরের বিভিন্ন স্থানে মনে হয় যেন দুর্বলতা বাসা বেঁধেছে। সবচেয়ে যে জিনিসটা লক্ষ্য ক'রছি উঠতি-পড়ুতি কোন বয়সের মেয়েগুলোই আর আমার দিকে তাকায় না, যুবকগুলো তো নয়ই। একমাত্র—থাক, জারোমথাঙ্গির প্রসঙ্গ এখন নাই বা টানলাম। জারোমথাঙ্গি বিশেষ আলোচনার বিষয়বস্তু হ'তে পারে না, কারণ সে আমার আশ্রয়-স্থল, যেমন একটা ঘর। আমার চারপাশে তার অস্তিত্ব ছিটানো, সে রয়েছে আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে। এই তো আমার পেছনে বসে একটা মোরগের পাখা ছাড়াচ্ছে। আর জীবন্ত মোরগটা প্রচণ্ডতম বেগে ছটফট ক'রছে তীব্রতম আর্তনাদের সঙ্গে। ব্যাপারটা আমার অসহ্য কিন্তু উপায় নেই, সমগ্র পৃথিবীতে মানুষ প্রথার ওপর নির্ভর ক'রেই চলে। চলতি প্রথার বাইরে যাওয়া প্রচণ্ড মানসিক গতিবেগ ছাড়া কারও পক্ষে অসম্ভব ; সে গতি দুর্লভ। সর্বসাধারণের মধ্যে সেই দুর্লভ গতির দেখা মেলে না। যে ব্যতিক্রমের মধ্যে মেলে, তাদের মস্তিষ্কে থাকে বিশেষ বিশেষ উপাদান যা তাদের মহাশক্তিতে ঠেলতে থাকে বিশ্ববিচ্যুত হবার অভীপ্সায়। অথচ তারা সব সময় তা বোঝেও না ; বিশ্বাস অবিশ্বাসও ঠিক তেমনি। ওই যে প্রথমেই আমার ব্যাপারে বলেছিলাম বিশ্বাস অবিশ্বাস যা খুশী ক'রতে পারেন —আসলে ভুলই বলেছিলাম, যা খুশী ক'রতে কেউ পারেন না। স্বাভাবিক বিশ্বাস প্রবণতা যাদের মধ্যে থাকবে তাঁরা বিশ্বাস ক'রবেন আর যাদের মধ্যে এই দোষটির অভাব তারা ক'রবে না। এতে মানুষের ইচ্ছার কোন অধিকার নেই।

আসলে মানুষের ইচ্ছার অধিকার কোন কিছুতেই নেই। এই যে আমি একদিন বিন্দেশ্বরীর অধীনে ওষুধের কারখানার ভ্রাম্যমান বিক্রেতার কাজ নিলাম, সে তো ইচ্ছায় নয়! অনিচ্ছায়ও নয়। ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে কি এক অবস্থায় —ঠিক যেন তরল বস্তু ঢালু দিকে গড়িয়ে যাবার মত ক'রে সব অবস্থাকে মেনে

নেওয়ার মত ক'রেই পেঁাছে যাওয়া শিলিগুড়ি। ওখানে ভার্মা সাহেব আগে দুচারবার গিয়েছিলেন, সেই যাওয়ায় যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল তাদের ঠিকানা ছিল আমার বাণিজ্যযাত্রার মূলধন। প্রথম কাজ, প্রথম সেই শহরে যাওয়া, প্রথম অভিজ্ঞতা, সঙ্গে ছিল অপরিমেয় অস্বস্তি। তুল্যমূল্য মানসিকতা নিয়ে পেঁাছোলাম ভার্মা সাহেব নির্দেশিত হোটেলটিতে। ট্রেনে বসে যা ভেবেছিলাম প্রথম অবস্থাটা কিন্তু সেরকম হল না। ভেবেছিলাম ভার্মা সাহেব-এর নাম করার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত হোটেল মালিক আমাকে কোলে তুলে নেবে। কিন্তু ছোট হোটেলটিতে গিয়ে ভার্মা সায়েব-এর নাম বলাতেও আপ্যায়নে বিশেষ আধিক্য দেখা গেল না, নিয়মমত আমাকে বলা হল নিজস্ব ঘর এখন পাওয়া সম্ভব হবে না, আমাকে তারা বর্তমানে একটি মাত্র খালি বিছানা দিতে পারেন এমন একটি ঘরে যেখানে অন্য একজন বাস্তবিক ভদ্রলোক অবস্থান করছেন।

ঘরে ঢুকে ছেড়ে আসা কলেজ হোস্টেলের প্রতি শ্রদ্ধা পরবশ হয়ে পড়লাম এই জন্যে যে কদিন আগে কলেজ হোস্টেলে থাকতে তার খাট এবং ঘরের কি বিরূপ সমালোচনাই না করেছি অথচ আজ এই হোটেলে তার ত্রিশগুণ পয়সা দিয়েও আমাকে যে খাটটি দেওয়া হয়েছে তা সেই কলেজ হোস্টেল-এর খাটের থেকে আয়তনে আদৌ বড় নয়। যাই হোক মানসিক ক্লান্তির জন্যে যে সময় সেটা ছোট ক'রে না দেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। চুপচাপ শুয়ে রইলাম। বেশ কয়েকদিন—মনে মনে হিসেব করে নিলাম বাইশ দিন হয়ে গেছে বাড়ী ছেড়েছি, নিশ্চয়ই বাবা মা বিশেষ চিন্তিত হয়ে এতদিন তোলপাড় করছে। কে জানে কেউ কলকাতা পেঁাছে গেছে কিনা আমায় খুঁজতে। কলকাতায় অলকানন্দা নিশ্চয়ই হয়ে উঠেছে উতলা অধীর। অলকানন্দার কথা মনে হওয়া মাত্রই সেই ভাবনাটা মনে এল একটা পোকার যে জৈবিক প্রয়োজন সেই প্রয়োজনেই তো খুঁজছে আমাকে অলকানন্দা। সে যেমন আমাকে ভাবছে আমিও যে তার কথা মনে ক'রছি সে ও তো সেই দেহগত প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই। কলকাতায় থাকলে অলকানন্দার সাহচর্য উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব হ'ত না, আর তার সাহচর্য মানেই প্রবৃত্তি চরিতার্থতার পথ ক'রে নেওয়া। অথচ অলকানন্দাকে আমি অন্য দশটা জীবজন্তু কীট পতঙ্গের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই না কোন ক্রমেই। সে আমার মনের কোরক, ভালবাসার রক্ত গোলাপ সুবাসে হয়ে থাক প্রলিপ্ত। ব্যবহারিক প্লানির স্বার্থে, ধর্ষণের প্রয়োজনে তাকে পোকায় পরিণত ক'রে নিজেকে নিয়ে যেতে চাইনা সেই পর্যায়ে। অলস চিন্তায় সময়ের হিসাব পাওয়া যায় না। তাই জানি না কতটা সময় পরে দরজা খুলে ঘরের ঠিক মাঝখানটায় আবির্ভাব হ'ল মধ্য উচ্চতার এক সুদর্শন ভদ্রলোকের। মাথায় একটা নেপালী টুপি পরা সুবেশ ভদ্রলোকে-র দিকে চোখ পড়তেই বোঝা গেল তাঁর চেহারাটি বিশেষ আকর্ষক। বেশ ফর্সা গায়ের রঙ এবং সপ্রতিভ মুখমণ্ডল। আমার সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই ভদ্রলোক বললেন, বিরক্ত করার জন্যে আমি বিশেষ দুঃখিত।

আমি সত্যি বলতে কি একটু ঘাবড়েই গেলাম। কোন কথাই অমার মুখ দিয়ে সরল না, শুধু উঠে বসলাম তাঁর দিকে চেয়ে।

ভদ্রলোক আমাকে বিস্মিত করে বললেন, এ লাইনে নতুন। আন্দাজটা ঠিক হচ্ছেনা?

আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। অথচ ভদ্রলোক অতি পরিচিতের মত আমাকে বলে যেতে লাগলেন, বলছি ওষুধের ব্যাগ নিয়ে এই প্রথম বেরোনো হ'ল তো?

এক একজন মানুষ আছেন যাঁরা কথা বললে খুব আন্তরিক মনে হয়। যাই বলুন না কেন ভাল লাগে, মনে হয় আপন লোক কথা বলছে, এ ভদ্রলোক তেমনি। ভঙ্গি হালকা কিন্তু ধ্বনি হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। সাহস হ'ল, বললাম, এমন সঠিক অনুমান কি ভাবে ক'রলেন?

ভদ্রলোক রহস্যের হাসি হাসি হাসলেন, তারপর বললেন, এই তো ব্রাদার, ওই খানেই তো আসল ব্যাপার। পাটনা থেকে আসা হ'ল তাই না?

এবার বিস্ময় পরিমাপ ছাড়াল। ভদ্রলোক আবার সেই রহস্যময় হাসিটা মুখময় ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা ব্রাদার! বুঝলে কিনা এ একেবারে এক্সরে আই! অর্থাৎ রঞ্জন রশ্মির চোখ।

সে তো দেখছি, কিন্তু শুধু চোখের ব্যাপার মনে হচ্ছে না।

ঠিক বলেছ। ভদ্রলোক ওপাশের বিছানাটায় হাতের পাতলা ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে মঞ্চে অভিনেতার মত ঘুরে এলেন, বললেন, আমি তোমার রুমমেট—বলেই ইংরিজীতে বললেন, এক বৃদ্ধ এবং এক তরুণ—পরক্ষণে আবার বললেন নিজের ভাষা, ওই যে কবি বলেছেন 'না তোমার হোল সুবু আমার হোল সারা' তাই।

মানে? আমি সারা হবার ব্যাপারটা জানতে চাইলাম।

মানে বিশেষ কিছু না এই তুমি লাইনে এলে আর আমার রিটায়ার করবার পালা এল। আবার ধর তুমি শিলিগুড়ি এলে আর আমার শিলিগুড়ি থেকে যাবার সময় হ'ল।

ও'র যে অবসর নেবার বয়স হতে পারে এ আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না এবং ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার ব্যাপারটাও বুঝতে পারছিলাম না আমি। বললাম, যদি কিছু মনে না করেন আপনার বয়েসটা বলবেন?

ইংরাজীতে বললেন, ষাট।

হতেই পারে না। আমি অসৌজন্য প্রকাশ করেই বলে ফেললাম। ভদ্রলোক সেটা ধরলেন না, মৃদু হেসে বললেন, কত হতে পারে?

বড় জোর চল্লিশ।

ভদ্রলোক সুন্দর ওকটু হেসে বললেন, তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া দেখছি খুবই প্রয়োজন।

কেন?

আমার গিন্নিকে অনুমানটা শুনিয়ে দিয়ে আসতে।

বাড়ীর এবং স্ত্রীর কথা চট ক'রে চলে আসতে আমি চুপ ক'রে গেলাম। আমার কথা বলার উৎসাহ নিভে গেল। কিন্তু ভদ্রলোককে দেখে এটা বেশ ভালভাবেই অনুমান করা যায় যে ওঁর বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে বেশী দূরে যায় নি। ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ষাট বছর বয়েস বলাটা ওঁর এক একটি রসিকতা মাত্র। আমার চুপ ক'রে থাকার দরুণ উনিই বললেন, কি ব্রাদার ?

বলুন ?

অমন চুপচাপ থাকলে কি এক ঘরে বাস করা যাবে ?

আপনি বলুন আমি শুনি ?

মাঝে মাঝে দু চারটে যদি না বল তো সুবটা টেনে রাখা যাবে না যে ?

আমি একটু হেসে বললাম, আপনি একাই সব পারবেন।

পারব ? বলছ ? তাহলেও মাঝে মাঝে হুঁ হাঁটা ক'রো নইলে আমার কথা-গুলো তোমাব কাছে যাচ্ছে সেটা বোঝা যাবে না।

আপনি নিশ্চিন্তে বলে যান আমি ঠিক শুনে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক জামা কাপড় কিছুই ছাড়লেন না। ঘর ময় হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। এমন ভাবে বেড়াচ্ছিলেন যাকে পায়চারি করাও বলতে পারি না। মনে হ'ল কিছু একটা কাজ উনি খুঁজছেন যার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারেন। তাঁর নীববতার সুবাদে আমি বললাম, আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর তো বোধ হয় আমার জন্মদিন থেকেই নিয়ে ফেলেছেন, দয়া ক'রে নিজেকে একটু বলবেন কি ?

শুনে বেশ মিষ্টি হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, আমার নাম মুখার্জী। লোকে আমাকে শার্লি'র মুখার্জী বলেই জানে। আর ওই নাম বললে তুমি পাটনা থেকে গৌহাটি পর্যন্ত যে কোন কনফেকশনারী বড় বড় ব্যবসায়ীর কাছে আমার কথা জানতে পারবে। পরেই ইংরেজীতে বললেন, ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা। আমি শার্লি বিস্কুট কোম্পানীর পূর্বাঞ্চলের পরিদর্শক মুখার্জী।

আপনি তো শুধু মুখার্জী বলছেন, নাম তো বলছেন না ?

ওই পদবী বললেই লোকে চিনবে।

এ তো হ'ল নামের প্রসঙ্গ। আমি যেমন পাটনাই আপনার সন্ধান কোথায় গেলে পাওয়া যায় ?

সর্বত্র। আজ শিলিগুড়ি, আগামীকাল মনে ক'রছি আসামের দিকে, সোমবারে আশা করছি গৌহাটি পেঁছাতে পারব আর বুধবার আমি কোহিমা থাকব, সেই রকমই স্থির আছে।

আমি মজা পেয়ে বললাম, তারপর ?

এমনি সামনে আছে ইম্ফল, ডিমাপুর, শিলং, আইজল, হাফলং—অনেক অনেক।

কিন্তু স্থায়ী বাসস্থানটি কোথায় সেটিই আমি জানতে চাইছি।

স্থায়ী তেমন কিছু নেই। বলতে গেলে নাম ক'রতে হয় বোম্বাই-এর।

সেখানেই ঘর বাড়ী?

আপাততঃ।

এরপর আর কথা চলে না। আমি বেশ বুঝছিলাম অন্যসব কথাবার্তায় উনি যেমন সহজ বাড়ীর ব্যাপারে তার বিপরীত। বাড়ীর কথা প্রকাশ ক'রতেই যেন অনিচ্ছুক, তাই আর কথা না বলে চুপ ক'রে রইলাম। উনিই আবার কিছুক্ষণ বাদে বললেন, এই যে প্রথম দেখাতেই তুমি বলছি তাতে রাগ ক'রলে না তো?—

আমি বললাম, আপনার মত লোকের এমন কথা মনে হওয়া উচিত নয়!

তা যা বলেছ ব্রাদার। অমি নিজের মত চলি, অন্যে কি ভাবল অনেক সময়েই তা ভাবতে ভুলে যাই।

ভালই তো—

ভাল? অনেকে অসন্তুষ্টও হয়।

হলেই বা আপনার কি?

তা যা বলেছ। চমৎকার বলেছ, আমার কি, য়্যাঁ?

ঠিক তাই যে অসন্তুষ্ট হবে তার নিজের মনে হবে। আপনার তো তাতে কিছু এসে যায় না! যদি যেত তাহলে একজন লোক প্রথম অসন্তুষ্ট হলেই আপনি সংযত হয়ে যেতেন, পরে সকলের সঙ্গে হিসেব করে ব্যবহার ক'রতেন।

চমৎকার! বলে বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন করমর্দনের জন্যে নিজের ফর্সা হাতের বিশাল পাঞ্জা প্রসারিত ক'রে, বললেন, তুমি সত্যিই খুব বুদ্ধিমান ছেলে। এলেম আছে, হবে। এ লাইনে উন্নতি তোমার মত লোকের জন্যে নিশ্চিত।

আমার মনে যে প্রশ্ন প্রথম থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিল প্রসঙ্গ ছেড়ে তাকেই ছুঁড়ে দিলাম, আচ্ছা মুখার্জীদা, সত্যিকথাটা বলবেন, আপনার বয়েস কত?

যা বললাম বিশ্বাস হ'ল না?

না।

দ্যাখ, আচ্ছা সকাল হ'লে দেখো আমার দাড়ি গোঁফ সব পাক ধরে গেছে।

ওতে বয়েস বোঝা যায় না। আমার ছোট ভাই-এর মাথায় অনেকগুলো চুলই পেকে গেছে।

মুখার্জীদা যেন কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লেন, তাঁর স্বভাবমত মৃদু হাসিটুকু দুই ঠোঁটের মধ্যে ধরে বললেন, ছেলেমানুষ তাই এতক্ষণ খুব সংযত হয়ে কথা বলতে হচ্ছে। আসলে বয়েস বোঝে তোমার বৌদি—বলেই মুখার্জীদা একটা অতি অশ্লীল কথা বলে বয়েস বোঝাতে চাইলেন।

আমি কথাটা অন্য লোকের মুখ থেকে শুনলে কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারতাম না।

কিন্তু মুখাজীর্দার এমন মুখের গুণ যে অত অকথ্য কথাগুলোও কদর্য শোনাল না। বরং খুব হালকা লাগল শুনতে। সাধারণ একটা রসিকতা বলেই মনে হ'ল। পরক্ষণেই আবার বললেন, তোমার বয়েস খুবই কম, আমাদের মত অভিজ্ঞতা তো নেই তাই অনেক জিনিসই বুঝবে না। মেয়েদের এদিক দিয়ে একটা সুবিধে আছে—বলে মেয়েদের শরীরের চিব আবৃত জায়গাগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা সহ আলোচনা ক'রতে লাগলেন শিক্ষকেব ভঙ্গিতে। কথাগুলো আদৌ শ্রুতি সুখকর ছিল না তবে বাকভঙ্গীতে এমনই বৈচিত্র ছিল যে সেই সব অশ্রাব্য কথাও আকর্ষক হয়ে উঠছিল। আমি শুধু মুখাজীর্দাকে গুরুত্ব দেবার জন্যেই যেন তাঁর কথাগুলো শুনছিলাম।

মধ্যে আমি কেবল একবার তাঁকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার মতলবে বললাম, আচ্ছা মুখাজীর্দা, বাড়ীর সকলকে অর্থাৎ আমি বিশেষ কবে বৌদির কথাই বলছি কি সেই সুদূর বোম্বে ফেলে এসে এখন দেশ বিদেশ চযে বেড়াচ্ছেন ?

ফল হল বিপরীত। সেই প্রচলিত চপল হাসির রেখা ওষ্ঠাধরের মাঝখানে ধরে মুখাজীর্দা বললেন, ও তোমার বুঝি জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে এই বয়সে সুড়সুড় করে কিনা ? অবশ্যই তিনি শরীরের গোপন অঙ্গের নাম ক'রেই অনুভূতির কথা জিজ্ঞেস ক'রলেন। আর প্রশ্নের উত্তর পাবার অপেক্ষা না করেই বললেন, তা সেজন্যে বউ-এর অপেক্ষায় বসে থাকবার দরকার করে না হে ব্রাদার! লাইনে এসেছ ওসব আপনি দেখতে পাবে। যদি শিলং যাও ওখানে ওয়ালটন হোটেল এ গিয়ে উঠবে। সেখানে বেয়ারাদের বলে দেবে রোজী-মেরী দু-বোনের এক বোনকে চাই। অন্য মাল দিলে নেবে না, দেখবে পৃথিবীতে বিউটি কাকে বলে। আমি শালা অনেক দেখলাম এই দুই বিউটির তুলনা হয়না।

ওঁকে উস্কে দেবার জন্যে আগ্রহের ভান ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলাম, বলেন কি!

ঠিকই বলেছি ভায়া, ঠিকই বলেছি। প্রথম দীক্ষাতে এত সন্ধান কেউ দেবে না। অন্য সবাই এক রাত্তিরের খরচা খেঁচে নিয়ে তবে রাস্তা দেখাবে।

মানে ?

মানে এক রাত্তির তোমাকে পথ দেখাবার নাম ক'রে নিয়ে বেরিয়ে তোমার পয়সায় ফুর্তি ক'রে দরজা চিনিয়ে দেবে।

মুখাজীর্দা নিজের মত ক'রে বলে যাচ্ছেন তার মধ্যে আমি কথা বলাটা ভাল মনে করলাম না। হাজার হলেও মুখাজীর্দা বয়োজেষ্ঠ্য, তাঁর সঙ্গে এই রকম আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সঙ্গত মনে হচ্ছিল না, যে জন্যে আমি শুধু নির্বাক শ্রোতা হয়েই শুনছিলাম। আর বিস্ময়ের এই যে আমার কথা না বলা মুখাজীর্দাকে আদৌ নিরুৎসাহ কর'ছিল না। তিনি একইভাবে তাঁর কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আপনমনেই বললেন, এবার জামা কাপড় ছাড়া যাক।

এ কথায় চট ক'রেই সায় দিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। আরাম করুন।' সন্ধেবেলা

আর কি কাজ ?

যা বলেছ ব্রাদার। এই জীবনে সন্ধেটা অত্যন্তই বাজে কাটে। যেখানেই থাক না কেন দেখবে সন্ধেবেলাটায় করবার কিছু নেই, বড় একঘেয়ে।

কেন, সন্ধেবেলা দোকান খোলা থাকে না ?

পূব দিকে এলে কোথাও আর সন্ধেবেলা দরজা খোলা দেখবে না। এসব দেশে ঘরে ঘরে শুঁড়িখানা থাকে বাইরে যাবার দরকার তো নেই।

তাঁর বাকভঙ্গীতে আমি হেসে বললাম, শুধু কি শুঁড়িখানার জন্যেই লোকে রাত্রে বাইরে যায় ?

তবে আর কোন কর্মে যাবে ? হরিনাম ক'রতে ? কলকাতায় দ্যাখনি রাত অবধি চরে বেড়ায় কারা ?

আমার অজ্ঞতার জন্যে চুপ ক'রে রইলাম। তবে বাইরে যেদিকে চলছি সে সব দিকের সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল হল, জিজ্ঞেস করলাম। ঘরে ঘরে শুঁড়িখানা মানে এই শিলিগুড়িতে ?

মুখাজীর্দা এবার কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, শিলিগুড়ি আবার আলোচনার মত একটা জায়গা নাকি! এ তো সদ্য গড়ে উঠছে—একটা শহর হতে চলেছে, দশবিশ বছর বাদে দেখবে এখানে কাক, কুকুর মাছি, শকুন সবসময় ভ্যানভ্যান ক'রছে।

মানে ? —আমি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম।

মানে এটা হয়ে উঠছে পূর্ব-ভারতের ব্যবসা কেন্দ্র, হবে পয়সা লেনদেনের পীঠস্থান। তাছাড়া এটা হচ্ছে গেট। সমস্ত পূর্ব-ভারতে ঢোকবার গেট। কাজেই এখানে সব সময়েই ভীড় হবে।

বেশ সুন্দর একটা সিল্কের নীল লুঙ্গি বের ক'রে পরে, গায়ে দিলেন লক্ষ্ণৌ নক্সার পাঞ্জাবী। তারপর নিজের খাটে বসে খাটের তলা থেকে একটা বোতল টেনে বের ক'রে বললেন, তুমি কিছু মনে ক'রবে না তো ?

তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, না না, মনে করবার কিছু নেই।

মুখাজীর্দার মত মনখোলা মানুষেরও দেখলাম সংকোচ হয়, আমাব আশ্বাস সত্ত্বেও বললেন, অনেকে অসুবিধা অনুভব ক'রে তো! অভ্যেস ক'রে ফেলেছি ভাই—

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। মুখাজীর্দা দেখলাম একটা বোতল থেকে সোডা বের করে জলের গ্লাসে ঢেলে খানিকটা হুইস্কি মিশিয়ে নিয়ে পান করতে লাগলেন। অচিরেই বললেন, তুমি ইচ্ছে ক'রলে একটু নিতে পার।

আমি হেসে বললাম, না থাক। আমার অভ্যেস নেই।

হয়ে যাবে এ লাইনে সবাই দেখছি সন্ধ্যার নিঃসঙ্গতা কাটাতে অভ্যাস করে ফ্যালে। তাছাড়া খদ্দেরদের মনোরঞ্জন ক'রতে ক'রতেও এটা রপ্ত হয়ে যায়।

এর পরও নানা রকম কথা মুখাজীর্দা অনবরত বলতে লাগলেন। সময় যত বেশী হতে লাগল বেশ বুঝছিলাম, তাঁর কথা ততই অর্থ হারাতে লাগল। একসময় শুধু বলার মত কথা বলতে শুনলাম, জান ব্রাদর, মাল তুমি আমাকে যতই দাওনা কেন টেনে যাব তা বলে বেচাল পাবে না। আসলে কি জান মদ খাওয়ায় কোন দোষ নেই যদি মদে না খেয়ে ফ্যালে। কি ঠিক কিনা?

ঠিক! —আমি বেশ বুঝছিলাম মদে ওঁকে খেয়েছে। তাই এখন সায় না দিয়ে আমার উপায়ই বা কি? বরং প্রথমেই সায় দিয়ে দিলে কথা বাড়বার আর সম্ভাবনা থাকবে না। শান্তি রাখবার সেটাই পথ। এইভাবে তাল দিয়ে চলতে চলতে রাত একটু গভীর হলে দেখলাম হোটেলের পরিচারককে ডেকে মুখাজীর্দা বললেন, আমাদের খাবার এই ঘরেই দিয়ে যাও।

দুজনেরই?

পরিচারক ছোকরাটি জিজ্ঞাসা কবামাত্রই খেঁচিয়ে উঠলেন মুখাজীর্দা, তোমাকে এঘরে কে পাঠাল? লালু কই?

ছেলেটি দেখলাম ওঁর ভাবগতিক জানে, বলল, লালু আজ নেই। তার আজ ছুটি আপনার জন্যে তো মুরগী আলাদা তুলে রাখা হয়েছে। সেই জন্যেই বলছিলাম।

এই সায়েবএর জন্যেও মুরগী নিয়ে আসবে। না থাকে তো তোমার বাবুর ঠ্যাং কেটে রেঁধে নিয়ে আসবে।

আচ্ছা স্যাব।

স্যাব কি রে শুয়ার। আমি শার্লির মুখাজী।

আচ্ছা স্যাব। সোডা কি আব আনব?

সোডা কি হবে, চান ক'রব? হুইস্কি খেতে কোনদিন সোডা লাগে রে গান্ডু?

ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে একটু হেসে আস্তে বলল, কোনদিন খেয়ে দেখিনি তো—

মুখাজীর্দার যে নেশা হয়না তার প্রমাণ পাওয়া গেল ছেলেটির কথার জবাব না দেওয়ায়; তাঁর কানে গিয়ে থাকলে জবাব না দিয়ে ছাড়বার পাত্র যে তিনি নন একথাটা এতক্ষণে আমি বুঝেই গিয়েছিলাম। তবে অতবড় বোতল প্রায় শূন্য ক'রে যে তিনি শূন্যে উঠে যাবেন তাতে আর বিস্ময়ের কি থাকতে পারে?

পরদিন সকালে উঠে মুখাজীর্দা প্রথম কথা বললেন, কাল রাতে একদম ঘুম হয়নি।

তার কারণ বুঝলাম, মনে মনে বললাম এ তো খুবই স্বাভাবিক; মুখেব কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বললাম, শরীর ঠিক না থাকলে ঘুমেব ব্যাঘাত হয়ই।

হ্যাঁ। যা বলেছ। শরীরটা খুব খারাপ ছিল, অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল পেটে।

কই বলেন নি তো!

বেশী রাত্রের দিকে হচ্ছিল।

আমি খুব মৃদু স্বরে বললাম, আপনার বোধহয় কাল হুইস্কি খাওয়াটা বেশী হয়ে গিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন মুখাজী'দা, আরে দূর! অমন পুরো বোতল আমি এক জায়গায় বসে ফিনিস ক'রেছি!

যাক এখন বিশ্রাম করুন—

না ভাই এবেলা একবার বেরোতে হবে। নাথানী ব্রাদার্স-এ যাবার দরকার। ব্যাটারা ড্রাফট দেবে বলে আজ পর্যন্ত আটকে রেখেছে। তুমিও তো আজ বেরোবে?

হ্যাঁ। একবার যাব। এই আমার প্রথম কাজ।

প্রথম কাজ মানে?

পাটনায় ট্রেনিং ক'রেছিলাম, সেখানে তো শুধু সঙ্গে থাকতে হ'ত। কাজ-কর্ম কায়দা-কানুন দেখতাম মাত্র। একা কাজ তো এই প্রথম।

তিনি আমার সাফল্য কামনা করলেন। মোটামুটি উপদেশ দু-একটা দিলেন, তারপর বেরোবার আয়োজন ক'রতে লাগলেন।

মুখাজী'দা বেরিয়ে যাবার অনেক পরে আমি খাওয়া দাওয়া ক'রে বেরোলাম আমার কাজে। সমস্ত দিনের ঘোরাঘুরির পর, সন্ধ্যার একটু আগে হোটেলে ফিরলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম পাশের চৌকিটা খালি পড়ে আছে, মুখাজী'দা নিশ্চিহ্ন।

হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম বিকেলের ট্রেনে আসামের দিকে গেছেন নেপালী টুপি পরা মুখাজী'বাবু।

আমাকে কাজ দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি শহর এবং ডুয়ার্সের ভেতরে যত ডাক্তার আছে এবং ওষুধের দোকান আছে সব জায়গায় যাওয়া সকলের সঙ্গে কথা বলা আর আমাদের ওষুধের গুণাগুণ বুঝিয়ে অর্ডার জোগাড় করা। এর জন্যে এদিক দিয়ে আমার বিদ্যা যেটুকু আমি গত চার বছরে অর্জন করেছি অনেক কাজে লাগবে। বিন্দেশ্বরীও আমাকে সেই কথা বলেছিল, শারীর বিদ্যা যার আয়ত্তে তার পক্ষে এই কাজ খুবই সহজ। আমাদের ওষুধগুলো মানুষের শরীরে কি জন্যে ভাল কাজ ক'রবে সে কথা আমার চেয়ে ভাল আর কে বোঝাতে পারবে?

সেইটুকুই ভরসা ছিল আমার আর আমাকে এক কথায় এমন খাতির করে কাজে লাগানোর কারণও ছিল তাই। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমিও মনে ক'রলাম ভালই লাগবে। প্রথম পথে নেমে ভার্মা সায়েবের বলে দেওয়া জায়গাতেই পা দিলাম। তখনকার শিলিগুড়ি ছোট-ই জায়গা, চিনতে সময় লাগেনি আদৌ। বর্মণ মেডিকেল স্টোরে প্রথম পদার্পণ ক'রে পাটনায় আমার ট্রেনার লাল যেভাবে কথা বলত সেই ভাবেই কথা বলব মনে মনে স্থির ক'রলাম কিন্তু প্রথমেই লক্ষ ক'রলাম যে দোকানের লোকেরা অন্য সব লোককে যেমন আগ্রহ ক'রে কথা বলছে আমাকে সেই পরিমাণ উপেক্ষা

ক'রল। বুঝলাম অন্য সকলে খদ্দের বলেই তাদের আপ্যায়ণ হচ্ছে। আমি খদ্দেররা সরে যাবার অপেক্ষায় এক পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমার নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ল। খদ্দের তো যেমন একজন যায় অন্য একজন আসে, আমি তাহ'লে কথা বলব কখন? লাল-এর কথা মনে হ'ল, সে উপযাচক হয়েই এমন ভাবে কথা বলতে চাইত যেন সে একজন বিরাট ব্যক্তি। তার সঙ্গে দোকানের মালিকের যেন কত দিনের কত গভীর আলাপ। লক্ষ্য ক'রেছিলাম তার মধ্যে কেমন একটু হামবড়া ভাব আছে। সেই ভাবটুকু আমার ভাল লাগত না। তাই তার কাছে ট্রেনিং ক'রলেও তাকে অনুকরণ করব না সেটাই স্থির ক'রেছিলাম। তা ছাড়া তার একটা সুবিধে ছিল যে তাকে সবাই চেনে। সে পুরানো কর্মী। সে যেটা পারে সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি আমার কোম্পানির একটা কার্ড বের ক'রে দোকানের যে লোককে সামনে পেলাম তার হাতেই এগিয়ে দিলাম। লোকটি কার্ডটি দেখে ভেতর দিকে অপর জনকে দিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি নাম পত্রটি পড়ে পথম লোকটিকেই বলল, একটু পরে আসতে বল। যার হাতে প্রথমে কার্ড দিয়েছিলাম, সে বলল, এখন তো বিক্রির সময় আপনি দুঘণ্টা বাদে আসুন।

এই আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার সুরু।

ভার্মা বলে দিয়েছিলেন শিলিগুড়িতে এরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খদ্দের। আমাদের সমস্ত জোরটা এদের ওপরেই দিতে হবে। তাই দ্বিতীয়বার গেলাম একেবারে ঘড়ি ধরে দু-ঘণ্টা বাদে। কিন্তু আমি প্রথমবারকার মতই ভীড় দেখলাম দোকানটিতে এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে সেই একইভাবে দোকানের কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছে। আমাকে কেউ দেখলই না। বেশ কিছুটা সময় দাঁড়িয়েই কাটাতে হ'ল আমাকে, আমার তখন খুবই খারাপ লাগছিল। আমার ধারণা ছিল যে আগে থেকে স্থির করা সময়ে মানুষ দেখা ক'রতে এলে যার সঙ্গে দেখা করতে আসা সে তৈরী হয়েই থাকে। আমার সেই ধারণার মিল না দেখে খুবই বিরক্ত হলাম, কারণ আমার অপমানিত বোধ হচ্ছিল। একবার মনে হল, দূরে চলে যাই অন্য সময় আসব, পরক্ষণেই মনে হ'ল এখানকার হাল জানি না, যদি পরে ভীড় আরও বেশী হয়? অথবা দোকান বন্ধ হয়ে যায় পরে? অতএব হোক যা হোক একটা কথা বলে যাওয়া উচিত। এখন যদি সময় এরা না-ই পায় তাহ'লে আবার একবার সময় করে নিতে হবে কারণ ট্রেনিং-এ বারবার বলেছে গরজটা আমারই—আমাকে জিনিস বিক্রি ক'রতে হবে। একবার না হ'লে দশবার চেষ্টা ক'রতে হবে, একটা ইংরিজি প্রবাদ বাক্য দিয়ে ভার্মা সাহেবও কথাটা বুঝিয়েছিলেন, দরজায় টোকা দাও ওটা খুলবেই। অতএব যতক্ষণ না খুলবে আমাকে ধাক্কা দিয়ে যেতেই হবে। তবে আর ফিরি কেন? কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে যদি এখন আমি কথা বলতে চেষ্টা করি রাগ ক'রবে না তো? একদিকে বিরক্তি অন্যদিকে সংকোচ—দুই-এর মধ্যে পড়ে আমার অস্বস্তি শুধু বেড়েই চলছিল। তা থেকে অব্যাহতি পাবার

জন্যে আমি নিজেই নিজের ধৈর্য পরীক্ষা করবার সিদ্ধান্ত ক'রলাম। কিছুক্ষণ বাদে একজন আমাকে জিজ্ঞেস ক'রল, আপনার কি চাই?

আমি জবাবে মুখে কিছু না বলে ইশারায় প্রথমবারের দ্বিতীয় জনকে দেখিয়ে দিলাম। তাতে প্রশ্ন কর্তা বিশেষ যেন সমীহ করেই বলল, ভেতরে আসুন না?

ভেতরে অর্থাৎ কাউণ্টারের একেবারে ডানদিকে যে ফাঁকটুকু আছে সেই পথ দিয়ে পেঁছোতে হবে সামনে টাকার বাক্স নিয়ে বসে থাকা সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে, যে প্রগাঢ় গাম্ভীর্যে বলেছিল, পরে আসতে বল।

পেঁছালাম। কি একটা হিসেব করছিল ভদ্রলোক লম্বা একটা কাগজে, সেটি শেষ হতে মুখ তুলে বলল, আপনি কি চান? আমি বললাম, আমি পাটনার নালন্দার ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে এসেছি।

ও—নিরাসক্ত ভাবে ব্যক্তিটি শব্দটুকু উচ্চারণ ক'রল। তারপব যেন দয়া ক'রেই কথা বলল, আপনাদের ভার্মা আসত না? ভার্মা গতবার যে কফ সিরাপ চাপাইয়া দিয়া গেছেল তা বিক্রি হয় না!

এ কথার কি জবাব দিতে হবে তা তো শিখে আসা হয়নি! কি বলা যে উচিত হবে তাও তো বুঝছি না! উপায়ন্তর না দেখে চুপ ক'রে রইলাম। ব্যক্তিটি নিজেই বলল, আপনেরা আমাদের উপরে চাপাইয়া বইসা থাকলে কি আর বিক্রি হইব? ডাক্তারগ ক'ন গিয়া—তারা লেখুক। তবে শ্যেন দোকানগুলি নিতে আইব! গেছেন, ডাক্তার মুখাজীর কাছে গেছেন?

আমি তো এখনও যাইনি, ভার্মা সাহেব গেছেন কিনা জানি না।

আরে আপনে যান। আজই যান। ডাক্তার মুখাজী লেখলেই দুই চার পেটি মাল যাইব গা। তারপর দেশবন্ধু পাড়ায় ডাক্তার রায়ের কাছে যান, আশ্রম পাড়ায় ডাক্তার মৌলিক-এর লগে দেখা করেন, ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির ডাক্তারগো কন তবে শেন মাল বিকাইবো!

ভদ্রলোকের পরামর্শটা আমাদের কাজের গূঢ়মন্ত্র সে কথা ট্রেনিং-এই জেনেছিলাম। ভার্মা সায়েব সামান্য রসিকতা ক'রে বলেছিল, কোন তীর্থে গেলে অনেক মন্দিরের মধ্যে প্রথম তো মানুষ সেখানকার প্রধান মন্দির দর্শন করে নেয়? এ-ও তেমনি, আমাদের যে প্রধান খরিদ্দার তার সঙ্গে আগে দেখা করে নেবেন। সব জায়গাতেই তাই ক'রবেন জলপাইগুড়ি গিয়ে আগেই দেখা ক'রবেন জলপাইগুড়ি মেডিকেল স্টোর্সের মালিক শ্যামাদাস বাবুর সঙ্গে, মানুষটা ভাল।

কথাগুলো সব আমার মনে ছিল। ডায়রীতে টুকে নেবার মত ক'রে মনের মধ্যে লিখে নিয়েছিলাম। স্থির ক'রেছিলাম একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রব।

হোটেলে ফিরে দেখি আমার ঘরে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। মুখাজীদার জায়গায় কৃশকায় ভদ্রলোককে দেখে ভাল লাগল না। বরং মনে মনে একটু বিরক্ত বোধ করলাম।

অমন রসিক ব্যক্তির পর এমন এক বেরসিক সিঁটকে প্রৌঢ়র চেহারা দেখে মনে হচ্ছে স্বভাবটাও খিটখিটেই হবে—। বিরস মনে নিজের বিছানায় বসে প্রথমে জুতো তারপর মোজা খোলায় মন দিলাম। ব্যস্ত এবং অন্যমনস্ক থাকার ভাণ ক'রলাম সহবাসীকে এড়িয়ে যাবার জন্য। ভদ্রলোক কি করছেন দেখলাম না, চোখের পাশ দিয়ে যেটুকু দেখা যায় তাও এড়িয়ে যাচ্ছিলাম অনেক চেষ্টায়। ছোট্ট ঘরের মধ্যে দুজন লোক অথচ নিরবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতায় দুজনেই ব্যস্ত থাকছি কাজই নয় এমন সব কাজে। আমার যেন মনে হ'ল সঙ্গী ভদ্রলোকও আমার মতই এড়িয়ে যাওয়ার গাম্ভীর্য পরে আছেন মুখের ওপর। তাহ'লে উনিও আমাকে সমান অপছন্দ ক'রছেন যতটা আমি ওনাকে ক'রছি! আমাকে কেউ অপছন্দ করুক এটা কোন মানুষই সহ্য ক'রতে পারে না, আমিও পারলাম না। অনেকটা জয় করার জন্যেই মাথা গলানোর মনোভাব নিয়েই জিজ্ঞাসা ক'রলাম, আপনি কি কলকাতা থেকে এলেন?

শীর্ণকায় ভদ্রলোক আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, হ্যাঁ। তারপর সুটকেশটা খুলে দাড়ি কামাবার যন্ত্রপাতিগুলো বিছানার ওপর নামিয়ে জানতে চাইলেন, আপনিও তো কলকাতা থেকেই?

না ঠিক তা নয়। পাটনা। —জানালাম। দেখলাম ভদ্রলোক আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, বললেন, পাটনা আমাকে যেতে হয়। পাটনাতেই বাড়ী?

ভদ্রলোক খুব নরম আর আন্তরিক ভাবে কথা বলছিলেন কিন্তু আমার ভাল লাগল না। আমার কোথায় বাড়ি তার কি দরকার? তবু নেহাৎ ভদ্রতা রক্ষার জন্যে বললাম, হুঁ।

আমার জবাবের সংক্ষিপ্ততার জন্যে বা অন্য কোন কারণেই হোক ভদ্রলোক আর বাক্যালাপ করলেন না। আমিও আর কথা বলার প্রয়োজন অনুভব ক'রলাম না। কিন্তু মুস্কিল হ'ল বাড়ীর কথা বলায়। যে চিন্তা থেকে আমি অব্যহতি পেতে চাইছিলাম সেটাই ফিরে ফিরে এসে ঘাড়ের ওপর চেপে বসবার চেষ্টা ক'রতে লাগল। ঠিক এই সময় নমুনা ওষুধের ব্যাগটা তুলে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়তে পারলে ভাল হ'ত কিন্তু ভরা দুপুরে ভোজনান্ত অবসাদে সবাই যখন বিশ্রামরত কোথায় ঘুরব আমি? না কোন ডাক্তারের দেখা পাব, না পাব কোন দোকানের মালিককে! সামনে প্রৌঢ় লোকটি তার গায়ের রঙে নষ্ট কালচে গেঞ্জিটা খুলে চামড়াঢাকা পাঁজরগুলো গুনতে দিলেন। আমার মনে এবার কেমন ঘৃণা হ'ল, মনে হ'ল একটা মৃতকল্প পোকা আমার সামনে নড়াচড়া ক'রছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। সকালবেলা স্নানটা ক'রে বেরিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ঘরেই ভাতটা খেয়ে নেব তার বদলে ঘর থেকে বেবিয়ে এলাম খাবার ঘরের উদ্দেশ্যে। ভদ্রলোককে এড়ানোর জন্যে খাওয়া সেরেই শুয়ে পড়লাম দুই চোখ বন্ধ করে। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গল ভদ্রলোকেরই ডাকে। চোখ মেলতেই উনি বললেন,

বেলা পড়ে এল। কোন কাজে যাবার থাকলে উঠে পড়ুন। যে অপ্রসন্নতা নিয়ে শুয়েছিলাম উঠতে সেটা কেটে গেল অথবা হয়ত কেটে গিয়েছিল ঘুমন্ত অবস্থাতেই। বিছানায় বসেই হাত ঘড়িটা টেনে নিলাম, সত্যিই তো বেশ বেলা পড়ে এসেছে! এখন এই পড়ন্ত বেলায় কি কাজ হবে? অথচ রাত্রেই চিঠি লিখতে হবে কোম্পানীতে, কাজের অগ্রগতির বিবরণ জানাতে হবে। কি জানাব? সারাদিনে কোন কাজই হয়নি তাই কি জানাব? চটপট উঠে উপস্থিত ভদ্রলোকের কাছেই জানতে চাইলাম, এখান থেকে সব চেয়ে কাছে ডাক্তাব কে আছেন জানেন নাকি?

প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়বার পর মুহূর্তে বুঝলাম বোকার মত কাজ হয়েছে। ভদ্রলোক প্রথম যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন, পরেই বললেন, হঠাৎ শরীর খারাপ হ'ল নাকি?

আমি একটু সামলে নিয়ে বোকামীটা মুছে ফেলবার জন্যে বললাম, না মানে আমি জানতে চাইছিসাম এখান থেকে দেশবন্ধু পাড়া কতদূর? সেখানে এক ডাক্তার আছেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই। সময় পার কিনা তাই জানতে চাইছি।

শিলিগুড়ি খুবই ছোট, তবে ভাল জায়গা নয়।

কেন?

আমি যতদিন আসছি এখানে, দেখছি শিলিগুড়ি বাড়ছে। কিভাবে বাড়ছে জানেন? এটা বাজার হিসেবে গড়ে উঠছে। একদিন আসবে যখন সমস্ত পূর্বভারতের পাইকারী বাজার হয়ে উঠবে এই শিলিগুড়ি শহর। ঘন জঙ্গলের মধ্যে থেকে একদিন এই ষ্টেশন কচ্ছপের মুখের মত উঁকি দিত। আজ ডুয়ার্সের সে অরণ্য অনেকটাই নেই, চারদিকে জনপদ বাড়ছে তাই শহরও উঠছে বেড়ে।

ওই রকম শীর্ণকায় কদাকার মানুষটা অল্পকথায় যেন ইতিহাস বলতে চাইলেন। খারাপ লাগল না কিন্তু জামাকাপড় পরা হয়ে গিয়েছিল বলে আর দেরী না ক'রে বেরিয়ে পড়লাম, বললাম, সন্ধেবেলা আপনার কাছে গল্প শোনা যাবে।

ভদ্রলোক শুভানুধ্যায়ীর মত বললেন, যদি শিলিগুড়িতে আজ প্রথম দিন হয় তবে তবে শুনে রাখুন রাত না হতেই ফিরবেন।

অচেনা অজানা এক আচমকা সঙ্গী কুদর্শন বৃদ্ধ তাঁর পরামর্শ কিন্তু সর্বক্ষণ মনে থাকল এবং শেষকালে মানলাম। অন্য কথা বললে কি হ'ত জানি না ভয়ের কথা বলেই তা আর অগ্রাহ্য করা গেল না। ভয়ের ব্যাপারটাই এরকম, যে কোন সূত্র থেকেই সে আসুক না কেন মনের ওপর তার ছায়াপাত কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

হোটেলে ফিরে আসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওই অনুভূতিটা আমার মনের মধ্যে আটকে ছিল বাদুড়ের মত, ঘরে আসা মাত্র মনের অবস্থা বদলে গেল। এ বেলাকার সাক্ষাৎকারগুলো আমাকে যে অভিজ্ঞতা দিল তাই চরম বিরক্তির রূপ ধরে আমার মনের ঠিক সামনেটাতে গরুর মড়ার সামনে সার দিয়ে বসে থাকা কুকুরের মত বসে

রইল। অনেক কষ্টে যদিবা ডাক্তার মৌলিক-এর বাড়ী মিলল, তাঁকে মিলল না সহজে। অনেক রোগীর পেছনে আমাকে রোগী না হয়েও বসে থাকতে হ'ল প্রতীক্ষায়। কখন অনুগ্রহ ক'রে আমাকে একটু সময় দেবেন দুটো কথা বলবার সময় যখন দিলেন তিনটে কথা বলবার পরই যেন একটা থাপ্পড় দিলেন, আচ্ছা আমার একটা কথার জবাব দিন তো? যে বেকার, ফাইজার, স্কুইব, এলেম্পিক—এসব বড় বড় কোম্পানী থাকতে আপনাদের ওষুধ কে এবং কেন কিনবে? দেখছেন বেঙ্গল পর্যন্ত মারখেয়ে যাচ্ছে—

আমি চট ক'রে বললাম, পৃথিবীতে কি শুধু বড়রাই চলছে, ছোটরাও তো সব সময়েই সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

জবাব শুনে তিনি স্বগতোক্তির মত বললেন, জ্বরে যেমন পেটের অসুখের ওষুধ কাজ করে না তেমনি আপনার উপমাও এক্ষেত্রে অচল। মানুষের জীবনের দায়িত্ব আমাদের হাতে থাকে, তা নিয়ে আমরা খেলা ক'রতে পারি না। আজে বাজে ভূঁইফোড় কোম্পানীর ওষুধ দিয়ে—

আমি প্রতিবাদ ক'রলাম, এ কথাটা আপনি ঠিক বলছেন না। প্রত্যেকটি ওষুধ কোম্পানীরই ওষুধের মান এক। প্রোডাকসন ক্যাপাসিটির তফাৎ থাকতে পারে গুণের কোন তফাৎ থাকে না। বলে আমি লম্বা বক্তৃতায় ওষুধ তত্ত্ব তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রলাম। কিন্তু আসলে ভদ্রলোক রক্ষণশীল মানসিকতার মানুষ। যা কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত তার দিকেই তাঁর ঝোঁক, বিশ্বাসও সেই সবের প্রতিই। নতুনকে বা অল্প প্রতিষ্ঠিত কাউকে নির্ভর করা এঁদের মানসিকতার বিরুদ্ধ। যুক্তির প্রতি যুক্তি খাড়া করা যায়, বিশ্বাস-যোগ্য এবং প্রতিপাদ্য হলেও সে যুক্তি গ্রহণ করানো অনেক সময়েই অসম্ভব।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা ক'রেছি সে নেহাৎ প্রাণের দায়ে অর্থাৎ চাকরীর দায়ে। তখন কি জানি কেন মনে হচ্ছিল কাজটায় সফল আমাকে হতেই হবে। মনের মধ্যে হচ্ছিল ডাক্তার মৌলিক-এর কাছে ব্যর্থ হয়ে ফিরলে আমার চলবে না।

আমাদের ওষুধ লিখবেন কিনা জানি না কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ক'রে তাঁকে বুঝিয়ে এসেছি আমার কথার সারবত্তা। জানিয়ে এসেছি রোগ এবং ওষুধ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যতদূর ছিল। হয়ত মনে মনে তাঁকেও বুঝতে হয়েছে তাঁদের আসলে শরীর বিদ্যা যা শিখেছেন তার চেয়ে পরিধি এখনকার কালের শিক্ষায় অনেকটা বেশী। আসলে ব্যাপারটা একটা ব্যাক্তিগত মর্যাদার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমার মনে প্রশ্নটা এসে গিয়েছিল অভিমানের। কোম্পানী নয় আমিই যেন ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে তাই পরাজয়ের পর্যায় অতিক্রম ক'রে এসেছি। কিন্তু আজ চিন্তা ক'রে দেখছি ডক্তোর ভদ্রলোকের অতিরিক্ত আত্মম্ভরিতা এবং আমার মর্যাদায় আঘাত লাগা দুটোই সমান অর্থহীন। কি প্রয়োজন তাঁরই বা ছিল অকারণ আমার মানসিকতাকে আঘাত ক'রে দমিয়ে দিতে চাওয়ার আর আমিই যদি সেটা গায়ে না

মাখতাম তাতেই বা এমন কি ক্ষতি হ'ত? বড়মানুষী! তাই কি? উনি যে বড় মানুষ সে তো সত্য, নইলে আমি কেন প্রার্থী হয়ে ও'র দ্বারস্থ হবো? অহমিকা? কি তার মূল্য? সেই ঘটনার দিন থেকে হিসেব ধরলে আমরা যাকে বছর বলি অর্থাৎ প্রতি তিনশত প'য়ষট্টিটি দিন রাত্রির হিসেবে কেটে গেছে যত বছর নিশ্চয়ই সেই জমিটুকুর ওপরে সেই স্বরটুকুর মধ্যে স্টেথোস্কোপ হাতে ক'রে বসে নেই সেই ডাক্তার মৌলিক! আমারও নেই সেই কাঁচা রক্তের যৌবন। অথচ অর্থহীন এক ঘটনা দুজনেরই নীচতার সাক্ষী হয়ে আছে কালস্রোতের স্মৃতি রেখায়। আমি আরও যে কদিন আছি সেই স্মৃতি নিয়েই থাকব। অথচ সত্যিই যদি সাধারণ কীট পতঙ্গের থেকে কোন স্বতন্ত্র জীব হতাম তাহ'লে এই অকারণ আঘাত এবং আঘাত জনিত প্রত্যাঘাত কোনটাই করতাম না কেউ কাউকে। আসলে আমরা সেই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত অভ্যাসগুলোর ওপর দিয়েই হে'টে চলি!

ঘরে আমার সহবাসী বৃদ্ধ নেই। আমাকে বলেছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরতে উনি নিজেই তাহ'লে কোথায়? যাকগে। একটা রিপোর্ট লিখতে হবে কোম্পানীতে। নির্দেশ আছে প্রত্যেকদিনকার কাজের খবর দৈনিক দিতে হবে। জানাতে হবে কাজ কতদূর হ'ল। কি জানাব? ক'জনের সঙ্গে দেখা ক'রলাম, ক'জন কি অর্ডার দিল এই সব কি লিখব? একটাও অর্ডার পাইনি, ডাক্তার মৌলিক প্রসঙ্গ এই সব? থাক। আরও একটা দিন বাদে চিঠি লিখব যাতে একটা অর্ডারও অন্তত খামটির মধ্যে থাকে।

দরজায় একটু শব্দ হ'ল। সামান্য ফাঁক দিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঢুকে পড়লেন, জিজ্ঞেস ক'রলেন, এসে পড়েছেন! আমি ভাবছিলাম কোথায় গেলেন।

আপনি যে বলে দিয়েছিলেন শীঘ্র আসতে!

কথাটা আপনার মনে থাকবে কিনা তাই ভাবছিলাম। অপরিচিত জায়গায় সব সময়েই সাবধানে চলাফেরা করা উচিত।

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে কাঁধের গামছা এবং হাতের সাবানদানী নামিয়ে রাখলেন তাঁর টেবিলের ওপরটায়।

এই সন্ধেবেলায় স্নান ক'রলেন নাকি?

বললেন, স্নান নয় হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। আপনিও যান মুখ হাত ধুয়ে আসুন।

আমি সটান বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে বললাম, একটু পরে যাব।

ভদ্রলোক হাতের সামনে থেকে জিনিষপত্র সরিয়ে গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন অনেক দূরে কোথাও গিয়েছিলেন নাকি?

না। দূরে আর কোথায় যাব!

কোন চা বাগানে! ওদলাবাড়ী, চালসা বা কালচিনি? এখানে চারপাশে বনের মধ্যে এই বাগানগুলোই তো মাত্র জনপদ বা গ্রাম বা গঞ্জ যাই বলেন।

তাই নাকি? আমি এ অঞ্চলটা সম্পর্কে কিছুই জানি না।

আগে কখনও এদিকে এসেছেন ?

না।

তাহ'লে আর কি ক'রে জানবেন ? আপনারা তো ছেলেমানুষ—তবু মনে হয় ছেলেবেলার ভূগোলে ডুয়াসের্র অরণ্যের কথা পড়েছেন। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি নেপালের গভীরতম তরাই অরণ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ডুয়াসের্র ঘন অরণ্য। কত কি গাছের নাম পড়তাম মনেও নেই। তারপর সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ফাঁক ক'রে ক'রে বসে পড়ল ইংরেজরা তাদের চা বাগান বানিয়ে। শুরু হ'ল জনপদ। আজ যা দেখছেন বা দেখবেন আমরা যা দেখেছি তার কল্পনাও তাতে নেই, আমার সামনে একদিন ভালুক পড়েছিল গয়েরকাটা দিয়ে সাইকেলে যাবার সময়।

কবে ? —আমি জানতে কৌতূহলী হলাম।

সে বহু আগের কথা। তা বোধহয় বছর চল্লিশ হবে। তখন আমি সদ্য এসেছি, চা বাগানে এক কাকা কাজ ক'রতেন, তাঁরই কাছে উঠেছি দেশ থেকে এসে ; সবাই বার বার সাবধান ক'বে দিতেন দিনে যা ঘোরা-ফেরা কর কোন আপত্তি নেই, সন্ধেব পর ঘরেব বাইরে পা-টি দেবে না। দিতাম-ও না। একদিন কি কাবণে ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেছে তখন তো আর এখনকার মত রাস্তা-ঘাট হয়নি চাবাগানের রাস্তাই যা রাস্তা। সেই সরু প্রায় পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে সাইকেল ক'রে যাচ্ছি, অন্ধকার তখনও হয়নি সদ্য সূর্য ডুবছে, গাছের ছায়ার জন্য যা অন্ধকার সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে মনে হ'ল পাশের মোটা শাল গাছটার গোড়ায় অন্ধকার যেন পুঁটলি পাকিয়ে আছে। নড়ছে। আমি যে গ্রামের ছেলে সেখানে ঝোপঝাড় জঙ্গলে রাশি রাশি বুনো শুয়োর, ভালুক আর ছোট ছোট বাঘ। কাজেই জন্তু জানোয়ারের ছায়া চিনি ছেলেবেলা থেকেই। ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না, ঝট ক'রে মনে পড়ে গেল গতকাল চাংড়াবান্ধায় একজন চা-কুলিকে ভালুকে চিরে ফালা ফালা ক'রে ফেলেছে। কিন্তু উপায় নেই, দ্বিধার অর্থই মৃত্যু, অতএব প্রাণপণে সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলাম। মরে তো গেছিই, যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু পেছন থেকে লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে। কিন্তু শত আতংক সত্ত্বেও পেছন দিকে তাকালাম না। চোখের সামনে একটা আলো টিমটিম ক'রতেই সেই আলোর দিকে ছুটে চললাম। তখন হাতির ভয়ে প্রত্যেক কোয়াটারের চারপাশে যে কাঁটা গাছের বেড়া থাকত তাতে কোন দরজা থাকত না। কারণ ওই ঘন জঙ্গলে যেখানে হাতিব দঙ্গল চলে দিনরাত্তির, সেখানে সামান্য দরজার কি দাম ?

কেন ? —অনভিজ্ঞ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কেন ! ভদ্রলোক আমাকে স্কুলের ছাত্রকে পড়াবার মত করে বোঝাতে লাগলেন, হাতির একটা লাথিতে অমন একটা দরজা দেশলাই কাঠির মত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আপনি বুঝি চা বাগানে যান নি ?

না। এতক্ষণে আমি ভদ্রলোকের কাছে মনে মনে নতি স্বীকার ক'রলাম তাই

সহজ ভাবে বললাম, এদিকে আমি জীবনে এই প্রথম এলাম।

ওঃ। তাহলে দেখবেন এখন সব কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা আর মাঝে মাঝে একটা জায়গায় সামান্য ফাঁক রেখে সিমেন্ট দিয়ে সিঁড়ি তৈরী করা। সেই সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওপিঠে আবার একই রকম সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমি তখনই সিঁড়ির কাছে পেঁাছে সাইকেলটা ফেলে কোন ক্রমে সিঁড়ির ওপরে গিয়ে সেইখানেই পড়ে গেলাম। মৃত্যুভয় তখনও আমাকে তাড়া করে আসছিল পেছন থেকে।

তারপর কি হ'ল? প্রচণ্ড কৌতূহলে তাঁর কথা শেষ হবার আগেই প্রশ্ন করলাম।

সেটা ছিল অন্য একজন বাবুর কোয়ার্টার। সন্ধের পর যেহেতু ঘর থেকে কেউ বেরোয় না তাই আমার যতক্ষণ জ্ঞান না ফিরল আমি একাই ওই ঘাসের ওপর পড়ে ছিলাম। জ্ঞান ফিরে দেখি অতি ঘন কালো কিছুর মধ্যে পড়ে আছি। সেই অন্ধকারে উঠে কোথায় যে যাব সে বোধ আমার নেই। বুঝতেই পারছি না যে বেঁচে আছি কি মরে গেছি। তবে উঠে বসেছি। চুপচাপ বসে আছি এমন সময়ে অনেকগুলো আলো ছোট ছোট ফোঁটার মত দূর থেকে আসছে এটা স্পষ্ট বুঝলাম। আমি যে চেঁচাব তাও ভুলে গেছি। তবে আলোগুলো কাছে আসবার আগেই শুনলাম অনেক লোক জোরে জোরে কথা বলছে। কি কথা বোঝা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, আলো আর শব্দ দুয়ে মিলিয়ে আমাকে বুঝতে সাহায্য ক'রল যে আমি বেঁচে আছি। হঠাৎ শুনলাম কে একজন বলে উঠল, এই তো বাইক। কার একটা বাইক পড়ে আছে। পরেই কাকার গলা শুনতে পেলাম, এই তো, এটা তো আমারই বাইক। জলধরবাবু, ও জলধরবাবু!

কাকার গলা শুনে চেঁচিয়ে উঠলাম, এই যে আমি এখানে। শব্দশুনে সবাই দৌড়ে এসে আমাকে পেয়ে অনেক আশ্বস্ত হলেন, জলধরবাবু নামক কাকার সহকর্মীর কোয়ার্টারের এলাকায় ঢুকে পড়েছিলাম আমি সেটা প্রথম পেয়ে। সে অনেক কথা। মোটকথা এমনই ছিল সে সময়কার ডুয়ার্স।

অতি বিস্ময়ে ভদ্রলোকের কথা শুনছিলাম, শুধু তাই নয় ওঁর বয়সটা কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলাম না তাই জানতে চাইলাম, আপনি তাহ'লে খুব ছোট বয়েসেই এখানে এসেছিলেন?

হ্যাঁ, আমার বয়েস তখন উনিশ।

ভদ্রলোককে মোটামুটি খারাপ লাগছিল না তাই আলাপ জমানোর জন্যেই বললাম আপনার বয়েস কিন্তু বোঝা যায় না।—

শীর্ণ খর্বাকৃতি ভদ্রলোক বললেন, এখন আমার উনষাট চলছে। আর কয়েকমাস বাদেই ষাটে পড়ব। দাঁতগুলো কষ্ট দিচ্ছে। নইলে শরীর আমার সুস্থ।

সুস্থ নিশ্চয়ই হবেন কিন্তু ও'কে দেখলে মনে হয় চিররুগ্ন, অসুস্থ। আমি প্রথম দেখে তাই মনে ক'রেছিলাম সেকথা আর বললাম না। তাঁর কথাগুলো কেবল শুনতে

চাইছিলাম, কারণ গল্পবলার মত করে স্মৃতি থেকে যে সব কথা বলছিলেন শুনতে আমার ভালই লাগছিল। যে অতীতকে চোখে দেখা যাবে না অন্য এক দেখা চোখের বর্ণনা তাই ভালোই লাগে শুনতে। তাঁকে উস্কে দেবার মত ক'রে বললাম, আপনি কি এখানে অনেক দিন ছিলেন?

ভদ্রলোক বিছানার চাদরটা টান ক'রে দিতে দিতে বললেন, ছিলাম কেন, আছি বললেই ঠিক হবে। কারণ এই ডুয়ার্স আর তার চৌহদ্দির মধ্যেই আমার বেঁচে থাকার রসদ—আমার বাণিজ্য।

বাণিজ্য! আপনি কি ব্যবসা করেন?

বাণিজ্য যখন বলছি তখন ব্যবসা করি বলতে পারেন।

কিসের?

এই গাছপালা লতাপাতা—

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম, তার মানে?

মানে এই সব পাহাড় জঙ্গল থেকে আনা নানা রকম গাছগাছড়া নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বিক্রি করি। ওষুধ তৈরীর কাজে লাগে।

ও, হার্বস বলুন!

ইংরিজীতে তাই বলে, তবে আমার তো ছোট্ট ব্যবসা, হার্বস কথাটা ব্যবহার করলে বড্ড বড় শোনাবে বলে ছোট করেই বলছিলাম।

কতদিন করছেন?

প্রায় ত্রিশ বছর।

তিরিশ বছর! বলেন কি? আমার কেমন অবিশ্বাস হচ্ছিল এই শীর্ণকায় ভদ্রলোককে ব্যবসায়ী বলে ভাবতে। আমরা অতি সাধারণ অব্যবসায়ী মানুষ ব্যবসায়ী বলতে সব সময় এমন লোককেই বুঝি যাদের হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, তেলচকচকে সুখী মুখমণ্ডল এবং দামী পোষাকে সুসজ্জিত। তার বদলে এমনই একটা দীন বেশ অপুষ্টিজনিত শীর্ণ চেহারার মানুষকে আর যা-ই ভাবি ব্যবসায়ী ভাবতে মন চাইছিল না। তাছাড়া ভদ্রলোক আবার ত্রিশ বছরের ব্যবসায়ী। হয়ত আমার কথার ভেতর ফুটে উঠেছিল অবিশ্বাস, ভদ্রলোক তা ধরলেন না, বললেন, তা তো হবেই। কিছু বেশীও হতে পারে।

এখানে কি পাওয়া যায়?

বিস্তারিত তালিকায় গেলেন না ভদ্রলোক, বললেন, কি না পাওয়া যায়? এই যে বিশাল হিমালয় আর তার নিচের এই বিস্তীর্ণ বনভূমি কি নেই এখানে! বরং এমন বহু গাছপালা আছে যার গুণাগুণ এখনও আমরা জানি না। —ভদ্রলোক একটু থেমে আবার বললেন, ভগবানের কি বিধান দেখুন আমার তো মনে হয় প্রত্যেকটি গাছেরই এমন এক একটি গুণ আছে যার দ্বারা সে মানুষের উপকার করতে পারে।

আসলে সেই গন্ধটা খুঁজে নিতে হয়।

ভাল লাগছিল কথাগুলো। বলার মধ্যে চমৎকারিত্ব ছিল না, স্বরের মধ্যেও না কিন্তু তাঁর কথায় ছিল আন্তরিকতা এবং কথাগুলো ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ। আজ এই দীর্ঘ সময়ের পরও আমার মনে আছে সেই আন্তরিক শব্দগুলো। আর সত্যি কথা বলতে কি আমি জীবনের সেই প্রকৃত উন্মেষের সময় তাঁর কথাগুলো শুনে বিস্মিতই হয়েছিলাম। যে অভিজ্ঞতা মানুষের অন্তরে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় সেই অভিজ্ঞতাতেই তিনি ছিলেন জীর্ণ। আসলে একজন অতি সাধারণ মানুষের মুখ থেকে যে কথা বেরোচ্ছিল তার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না সে সময়ে। কারণ আমার তরুণ মন সেদিন বার্ধক্যকে চিনত না, জানত না বার্ধক্যের নিজস্ব ভাণ্ডার থাকে, তাতে থাকে অনেক ঐশ্বর্য—যা একজন মানুষের সারা জীবনের সঞ্চয়। অনেক দ্যাখে সে, অনেক ঠকে সে, অনেকই সে শেখে। আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যার বয়স সে নংথু। অনেক জানে নংথু, অনেক কথা বলে, যেমন বলেছিলেন সেই বৃদ্ধ শিলিগুড়ির একখানা ছোট্ট ঘরের মধ্যে বসে। তাঁর নাম মনে নেই কিন্তু কথাগুলো মনে আছে এই জন্যে যে তিনি আমাকে নতুন এক পৃথিবীকে চিনিয়েছিলেন। আমি একজন নাগরিক যুবক, নগর জীবনের অংশীদার কিন্তু তাঁর বাড়ী ছিল গ্রামে, মেদিনীপুরের কোন যেন এক গ্রামে যার কিছু দূরেই আরম্ভ হয়েছে ময়ূরভঞ্জের অরণ্য অঞ্চল। তাঁর গ্রামের কথাও বলেছিলেন ভদ্রলোক, গল্প ক'রেছিলেন, আমরা তো মশাই জঙ্গলেরই মানুষ। যে গ্রামে থাকি সেই গ্রামটা দিনে আমাদের রাত্রে বাঘ-ভালুকের। অন্ধকার হলেই যে যার ঘরে সেঁধোই আর ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে আসে দলে দলে বুনো শুয়োর, হাতি, ভালুক, বাঘ।

ভালুক! —আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাই, আপনার গ্রামে আছে?

আছে কি বলছেন, বললাম তো রাতের বেলায় গ্রামের বাসিন্দা হ'ল তারাই। আমরা পায়খানা পেলেও ঘর থেকে বেরোই না। সকাল হলে তারা আবার গ্রাম ছেড়ে বনের ভেতর চলে যায় তাদের নিজের নিজের ঘরে, তখন আমরা চাষবাস ক্ষেত-খামার করি। এই তো আমার ছোট মেয়েটিকে সে বছর জখম করেছিল ভালুকে।

কেমন করে? —আমি জানতে চাইলাম।

একটা ভালুক দিনের বেলাতেই ক্ষেত-এর মধ্যে এসে পড়েছিল। গ্রামের লোকজন তাড়া করাতে সে পালায়। পথে আমার মেয়েটি ছুটছিল তার পিঠের ওপর দিয়েই দৌড়ে যায় ভালুকটা। পায়ের নখে কেটে সমস্ত ঘা হয়ে অনেকদিন ভুগল মেয়েটি।

কবে হয়েছে?

এই বছর ছ'সাত হ'ল।

এখানে কি জঙ্গলে গেছেন আপনি?

সবই তো জঙ্গল। শিলিগুড়ির ভেতরেই কি রকম দেখছেন না? বাইরে গেলেন

মানেই তো আপনি জঙ্গলে গেলেন। যেমন ধর্‌ন ঠাকুর্দার কলকাতা দেখার গল্প শ্‌নেছিলাম, তাঁর যখন কুড়ি বছর বয়েস প্রথম কলকাতা যান মাকে কালিঘাটের মন্দির দর্শন করাতে। সে সময় কলকাতার রাস্তায় ছিল সব বড় বড় গাছ, মাঠ, একতলা বাড়ী, চৌরঙ্গী রোড ধরে যেতে ডান দিকে ঝোপঝাড় জঙ্গল আর কিছ্‌টা প্‌ব দিকে গেলেই আরম্ভ হত ঘন জঙ্গল, সেই জঙ্গল গিয়ে মিশেছে স্‌ন্দরবন পর্যন্ত। ঠাকুর্দার কলকাতা আমি দেখিনি তবে হ্যারিসন রোডের উত্তর দিকটায় রাস্তার ধারে ধারে অনেকগ্‌লো বট অশ্বত্থের গাছ ছিল যার ওপর অসংখ্য শকুনের বাসা; সে আমার ভালই মনে আছে।

আমার মনের মধ্যে কলকাতার প্‌রানো স্মৃতি ছায়া ফেলতে পারল না, সেখানে ছড়িয়ে আছে ওই ভদ্রলোকদের গ্রাম, মেদিনীপ্‌র জেলার সেই অজানা অচেনা অদেখা, অখ্যাত এক গোয়ালতোড়। বললাম, এইভাবে বিপদের মধ্যে আপনারা থাকেন?

ভদ্রলোক বললেন, বিপদ আমাদের চেয়ে ওদেরই তো বেশী। সাহেবরা আগেকার দিনে দলে দলে বনের মধ্যে ঢুকে বাঘ, ভাল্‌ক, শ্‌য়োর মারত গ্‌লি করে, গ্রামের লোকেরাও যখনই পায় মারে। ওরা আর মান্‌ষ মারে কোথায়? মাঠে ফসল-টসল নষ্ট করে মাঝে মধ্যে। তার জন্যেও ব্যবস্থা আছে মাঠ পাহারা দেবার। এখন ধর্‌ন যে চাষী বেশী লোভ করে বেশী জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে জঙ্গলের জমিতে চাষ বসায় তার ফসল তো যাবেই। তবে ফসল বেশী নষ্ট করতে পারে হাতিরা। তারা যে সব সময় নষ্ট কবে তা এমন কথাই বা বলি কি করে? আমাদের দেশে বলি হাতি ঠাকুর, হাতিকে আমরা গড় করি, প্‌জো করি। বলি, হাতি ঠাকুর রক্ষা কর!

রক্ষা করে? —আমি একটু বিদ্রূপ করেই জিজ্ঞাসা করি।

করে বই কি? হাতিরা অনেক রক্ষা করে। নইলে কি আর সব বেঁচে থাকতে পারতাম? হাতিরা অকারণ হিংসা করে না জানবেন। আমার ছেলেবেলায় দেখা ঘটনা শ্‌নলে আপনি ব্‌ঝতে পারবেন ব্যাপারটা। হাতির থেকে ফসল বাঁচাবার জন্যে একজনেরা তারকাঁটা বিছিয়ে রেখেছে গাদা করা ফসলের ওপর। কোনদিন কেউ বিছায় না তাই হাতিরাও বোঝেনি, একটা হাতির পায়ের চাপে তো সেই তারকাঁটা বিঁধে গেছে রাতের অন্ধকারে। আপনি ছেলেমান্‌ষ শ্‌নলে হয়ত বিশ্বাস করবেন না সেই পা নিয়ে হাতিটা সেই রাত্রেই এসে হাজির হয়েছে কামার বাড়ীতে। কামার কুমোর সব গ্রামে থাকে জানেন তো? কুমোর অনেক ক'ঘর আছে কিন্তু কামার আমাদের গ্রামে ওই এক ঘরই ছিল দক্ষিণ পাড়ায়। সকালে ঘ্‌ম থেকে উঠে তারা তো অবাক! ঘরের সামনে এক হাতি দাঁড়িয়ে! হাতজোড় করে গড় করে ভয়ে ভয়ে বলে, হাতি ঠাকুর হেথা কেন! হাতি বেচারা আস্তে আস্তে পা তুলে দেখাতে সেই কামার তার সাঁড়াশি টাঁড়াশি দিয়ে খাতির যত্ন করে তার পায়ের তলা থেকে কাঁটা বের ক'রে দিতে হাতি ঠাকুর চলে গেল। গ্রামে যারা কামার বাড়ীতে গেছে তারা কামারের

কর্ম শুনে কেউ বলে ভুললি কেন, কেউ বলে ভালই করেছিস। এ তো হ'ল। পরের রাত্রি ভোরে ঘুম থেকে উঠে কামার দ্যাখে কি তার বাড়ীর সামনেই দুনিয়ার ফসল গাদা দেওয়া। কোথাকার কোথাকার মাঠ থেকে ফসল তুলে এনে কারা পাহাড় ক'রে রেখেছে সারা রাত ধরে। কামার বুঝেছে এ সেই হাতিঠাকুরের কাজ, বেলা হতে গাঁয়ের লোক কিছুতে মানবে না! তারা বলে, শালা কামার চোরের দলে নাম লিখিয়েছে। রাতভোর কামার ব্যাটাই চুরি ক'রেছে এখন বলে হাতিঠাকুর দিয়েছে। হাতিঠাকুর আর কাউকে দেয় নি ওকেই দিল! সব ব্যাটার বানানো গল্পকথা, ব্যাটাকে গাঁয়ের থেকে বার ক'রে দাও। মাতব্বরদের নিয়ে বিচার বসল, সেখানে কামার আর কামারবউ কেঁদে পড়ল তারা করেনি। অনেক মিনতির পর ঠিক হ'ল যার যার ফসল সবাই তুলে নিয়ে যাবে আর কামার জরিমানা দেবে পাঁচ টাকা। তবে গ্রামে থাকতে দেওয়া হবে। তখন বুঝলেন কিনা বারোআনা মন ধান তাতেই জরিমানা পাঁচ টাকা সে ব্যাটা কামারের ঘটি বাটি বিক্রি হয়ে যায় আর কি! কি কাকুতি মিনতি কামারের তা কেউ সে কথা মানল নি! বিচারে যা সাব্যস্ত হ'ল তাই মানতে হবে তাকে। কারণ বিচারের মাতব্বরদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেনি যে কামার চুরি করেনি। আমরা তখন ছেলেমানুষ কামার বাড়ীর বিচারের ফলাফল জানতে খুবই উৎসুক থাকতাম। আমাদের মধ্যেও আলাপ আলোচনা চলত এ নিয়ে। যাই হোক বিচার তো হ'ল, সাজাও হ'ল, যার যার ফসল কামারবাড়ী এসেছিল সব ফিরেও গেল আসল মালিকের বাড়ী। এসবই সন্ধের আগে হয়ে গেল। গোল বাধল মাঝ রাত্তিরে। হাতির উৎপাত শুরু হ'ল গ্রামে, সে কি ব্যস্ততা আর তাদের দাপাদাপি ছুটোছুটি, মনে হ'ল বুঝি মহাপ্রলয় চলছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। আমার বেশ মনে আছে ঠাকুর্দা বাবা মা ঠাকুমা সবাই ঘুম থেকে উঠে নিঃশব্দে ইষ্ট নাম জপ ক'রতে লাগলেন ভয়ে ভয়ে। সব কাঁপতে কাঁপতে দুর্গা দুর্গা বলতে লাগল আর আমার এক দিদি ভয়ে তো কেঁদে কেটে কাপড়ে পেচ্ছাব ক'রেই দিয়েছিল। সকাল বেলা উঠে দেখা গেল গতকাল বিচারে যে সব মাতব্বর কামারের শাস্তির ব্যবস্থা ক'রেছিল তাদের কারও ঘর বা ফসলের গাদা আর অবশিষ্ট নেই। প্রাণে কেউ মরে নি কিন্তু হাতিতে আশ্চর্যভাবে বেছে বেছে তাদের সব কিছু গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। এত বড় গ্রামে আর কারও কোন ক্ষতি হয়নি।

আমি ভদ্রলোকের গল্প বিশ্বাস ক'রব কি ক'রব না ভাবছি এমনি সময় ভদ্রলোক বললেন, আপনারা শহরের ছেলে হয়ত একথা বিশ্বাস হবে না মনে হবে গল্প কথা কিন্তু এ আমার নিজের চোখ থাকতে দেখা, কোন শোনা কথা নয়। হাতিঠাকুরের গল্প— শোনা কথা তো অনেক আছে, যা দেখি নাই তা বলে কি লাভ?

বলেন নি ভদ্রলোক। আমি ওখানে দিন তিনেক ছিলাম সেই ভদ্রলোকও ছিলেন। কদিনে অনেক কথা শুনেছিলাম, শহরে বসে অরণ্যের কথা প্রথম শুনেছিলাম

তাঁরই কাছে। ভদ্রলোক একটা কথা বলেছিলেন যার গুরুত্ব আমি এত দিনে বুঝতে পারছি। জীবনে আর কোনদিন তাঁর দেখা পাইনি, চাইও নি, কিন্তু এখন আমার মনে হয় যদি তাঁর দেখা এখন একবার পেতাম তাহ'লে তাঁর সেই অদ্ভুৎ দূরদৃষ্টির জন্যে শ্রদ্ধা জানাতাম তাঁকে। লাভ ক্ষতির মূল্যে জীবনকে মাপে বলে মানুষ সমস্ত কিছুরই একটা হিসেব তৈরী ক'রে নিয়েছে। যেমন কতগুলো দিন রাত্রিকে জুড়ে ক'রেছে মাস, কতগুলো মাসকে জুড়ে ক'রেছে বছর। হিসেব রাখে কিন্তু সে হিসেব এখানে চলে না, কে মনে রাখবে ক'টা দিন গেল, প্রয়োজনই বা কিসের? দিনের পর রাত আবার রাতের পর দিন এমনি ভাবে চলতে চলতে একদিন এক বিশাল অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া, এর মধ্যে হিসেব নিকেশ-এর কোন স্থান নেই। প্রয়োজন যেখানে অসীম, সেখানে আয়োজনও সীমাহীন। এখানে প্রয়োজন সীমিত তাই অত্যন্তই সীমিত জীবনের জন্যে আয়োজন বা উদ্যোগ। আজ থেকে বহু বছর আগে যখন আমি সামান্য এক যুবকমাত্র ছিলাম তখন যে প্রয়োজন আমার ছিল এখন সে তুলনায় কত সামান্য! কিন্তু কি বিরাট পরিবর্তন আমি প্রত্যক্ষ ক'রছি! আমার মনে হচ্ছে বিশাল একটা প্রয়োজন বর্বর বিশ্বগ্রাসী ছায়ার মত ধেয়ে আসছে, ধীরে ধীরে গ্রাস ক'রছে সমগ্র বনভূমি—আমাদের আশ্রয়স্থল। পরিবর্তনের ধাক্কায় নদীর কূলের মত ধসে পড়ছে পুরানো ঐতিহ্য, স্বকীয়তা। আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পার্বত্য জীবন এখন যেন ত্রিশঙ্কু। আমার ঘরের ওপরের বাড়ীটায় থাকে খোংতা, তার ছেলে তম্বু—সে যে কি ধরণের কে তা বুঝতে পারবে? একদিন খোংতাকে বলে বিপদেই পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম সে তার পুরানো ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব ক'রে দুঃখ করবে ছেলের মতিভ্রমের জন্যে, তা সে ক'রল না, উপরন্তু বলল, দিন তো সব সময়েই বদলাচ্ছে বিদেশী, আমরা সবাই কত না বদলে গেছি। বদলাচ্ছি প্রতি মুহূর্তেই। প্রতি বর্তমানই প্রতি নিমেষের অতীত থেকে আলাদা।

কথাটা বড় চমৎকার বলেছে খোংতা। পৃথিবীর সুরু থেকেই চলছে এই পরিবর্তন। মুহূর্তে মুহূর্তে বদলাচ্ছে। আমরা অতীতকে জানি না! যতটুকু জানি সে অতি সামান্যই, ঠিক এই যে জায়গাটায় আমি বসে আছি, আমি আসবার আগে এখানটিতে যে কি ছিল, কেমন ভাবে ছিল জানা নেই আমার। তারও আগের কথা জানা একান্তভাবেই অসম্ভব। আমরা অতীতকে জানি একটা সামগ্রিক ধারণায়—মোটামুটি জানা। বিশদ ভাবে যথাযথ ভাবে জানিও না দেখতেও পাইনা। কখন কখন আমার মনে হয় আমার আগে ঠিক এই পাহাড়ের এইখানটায় যদি কেউ বাস ক'রে থাকে যদি তাকে দেখতে পেতাম এই সময়ে! যদি হঠাৎ সে এসে আমার সামনে দাঁড়াত! যদি হঠাৎ তাকে চলে ফিরে বেড়াতে দেখতাম আমার সামনে দিয়ে! অথবা কে জানে ঠিক এইখানটায় বা এই অঞ্চলটাতেই কেউ ছিল কিনা! হয়ত মহাশূন্যের অঙ্গন ভরে রাখত এখনকার চেয়ে ঘন আরও অসংখ্য গাছ-গাছালি। এক

গাছ থেকে আরও কম আয়াসে অন্য গাছে লাফ দিত আমাদের সঙ্গী দু-চারটে বানরের অসংখ্য পূর্বপুরুষ। আজ সংখ্যায় মানুষ যখন বহুগুণ বেড়েছে তখন কমেই চলেছে এরা যারা এখানকার আদি বাসিন্দা! অথচ আমি একলা থাকলে মাঝে মাঝেই ভাবি এ জমি এই বনভূমি তো তাদেরই যারা আজ ক্রমাগত কমেই চলেছে সংখ্যায়। সাংমার মন ভাল থাকলে সে পুরানো দিনের গল্প বলত যে জানতো জন্তু জানোয়ারদের কথা, বলত তাদের কাহিনী, নিজের কথাও বলত, 'তখন বন ছিল আরও ঘন গভীর, একটা গাছের গায়ে একটা গাছ যেন লেগেই ছিল। আমি তো গাছের ওপর দিয়েই যাতায়াত ক'রতাম অল্পবয়সে। একটা গাছের ওপর উঠলেই হ'ল, এ গাছ থেকে ও গাছে, ও গাছ থেকে সে গাছে—যেতে সময় লাগত অনেক কম। পাহাড়ের ঢালু ধরে অন্য সকলে যখন একটা জায়গায় পেঁছাত তার অনেক আগে আমি পেঁছে যেতাম গাছের ওপর দিয়ে লাফিয়ে।' তা ছাড়া সাংমার আর একটা কাজ ছিল বানরের বাচ্চা ধরা, বানরের বাচ্চা তো দিনের বেলাতেই ধরে ফেলত সাংমা ধাড়ী বানরদের তাড়িয়ে, পাখি ধরত রাতে—অন্ধকারে। অন্য সবাই শিকার ক'রত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, সাংমাকে ওসব ব্যবহার ক'রতে হ'ত না। গাছের ওপর ধরে ওখানেই গাছের গায়ে আছড়ে মেরে ফেলত বানরের বাচ্চা তারপর দুপায়ে চেপে মুণ্ডুটা টেনে ছিঁড়ত দুহাতে। রক্তটা সে কোন ভাগীদারকে দিতে রাজী ছিল না বলে সেটুকু গাছের ওপরেই শেষ ক'রে শুকনো ধড়গুলো কোমরে বা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নিচে নামত। আমি এখানে এসে পেঁছানোর পর যতদিন সাংমা বেঁচে ছিল আমার সঙ্গে গল্প ক'রত—কারণ তখন সাংমার দুচোখ ভর্তি পিঁচুটি আর মুখমণ্ডলের সমস্ত চামড়া বুঁচকে ঝুলে ভাঁজে ভাঁজে জমাট ময়লা, হলুদ দাঁতের অনেকগুলোই নেই, অবিন্যস্ত মাথা ভর্তি চুল মিলিয়ে তাকে তখন দেখাত একটা বুড়ো সিংহের মত। সাংমা একদিন হঠাৎ মারা গেল। ব্যাপারটা অতি সাধারণ—নিঃশব্দে নির্জনে। সকাল বেলায় দেখা গেল সাংমা একটা পাথরের ওপর পড়ে আছে। ব্যস্। শেষ। আমিও দেখলাম। কিন্তু না দেখলেই ভাল ছিল। যদি শুধু শুনতাম মনে ভাবতাম সাংমা গাছের ওপর দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে পাহড়ের নিচে অনেক নিচে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। মিলিয়ে গেছে। কিন্তু গল্পের দুরন্ত সাংমা এমন শান্ত হয়ে মাটির ওপর শুয়ে আছে এ যেন কেমন দুঃসহ।

রাজা তখন জিম্বা। তার কাছে খবর যেতে সে এল দশটা বানরের খুলির মালা গলায় দিয়ে। বৃদ্ধ জিম্বার পোষাকটা আমি সেই প্রথম দেখলাম। সে এসে দাঁড়াতেই আমি সরে গিয়েছিলাম সেদিন, কারণ আমি জানতাম কোন বিজাতীয় প্রাণীর উপস্থিতি সে অপছন্দ ক'রতে অভ্যস্ত। আমি এই পাহাড়েই থাকি কিন্তু যতদূর সম্ভব এড়িয়ে থাকি তাকে। জিম্বা শুনেছি প্রকৃতিগত দিক থেকেও একটু ক্রুর স্বভাবের। যার জন্যে তার থেকে বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও নিয়ম অনুসারে যার প্রধান হবার কথা সেই

সাংমা না হয়ে সেই হয়েছে এখানকার প্রধান ব্যক্তি—রাজা। অবশ্য একথাও সত্য যে সাংমার প্রকৃতির জন্যেই কেউ তাকে কোন দিন মানত না। সে ছিল ক্ষুদ্র এবং অল্পে সন্তুষ্ট। পেট ভরলেই ভুলে যেত দুনিয়াকে। এই ক্ষুদ্রত্বের জন্যেই শুনেছি এই পৃথিবীর রাজা হওয়ায় তার অধিকার থাকা সত্ত্বেও সে তা হ'তে পারে নি। একথা আমাকে বলেছে খোংচাং এখন রাজা—যে আমার বয়স্য এবং অনুমান করি আমার বয়স্ক। অবশ্য কেমন যেন শিথিল হয়ে এসেছে সব। এখন আর রাজার সে প্রতাপ নেই যা আমি এখানে এসেই দেখেছিলাম। এখন যুবকেরা মানে না, শৃঙ্খলার এক্তিয়ার তাদের জন্যে যেন নয়।

আগে তো আগের কথাই বলি পরে বলব পরের কথা। ভদ্রলোক শিলিগুড়ি ছাড়বার পরের দিনই আমিও চলে গেলাম জলপাইগুড়ি। সেখানেই পেলাম প্রকৃত জনপদ। ভারী সুন্দর লাগল। বাগান ঘেরা আঙিনায় টিনের চালা দেওয়া ছোট ছোট বাড়ীর ছোট্ট সুন্দর শহর জলপাইগুড়ি। যতটুকু দেখায় তার চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যে। চা-এর শহর। কিন্তু সম্পদ সত্ত্বেও তা বোঝবার উপায় যথেষ্ট নেই কারণ যত অর্থই ঘরের মধ্যে জমা থাক ঘর সেই খুঁটির ওপর দোতলায় কাঠ দিয়ে তৈরী। এই বিচিত্র স্থাপত্যশৈলী সেই প্রথম যেদিন শিলিগুড়ি ষ্টেশনে পা দিয়েছি সেদিন থেকেই দেখছি। প্রথম বাড়ীটি যখন চোখে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল বন্যজন্তুদের থেকে বাঁচবার জন্যে দূর অতীতে কোন একদল মানুষের মনে এইভাবে বাসস্থান তৈরীর পরিকল্পনা এসেছিল। পরে জেনেছিলাম শুধু বন্যজন্তুর থেকে আত্মরক্ষা নয় হিমালয় থেকে নেমে আসা অজস্র জলধারা প্রায়শ করে যে বন্যার বিস্তার সেই জলস্রোতের থেকে বাঁচার জন্যেও এই খুঁটির ওপর বাড়ীর প্রয়োজনীয়তা। বর্ষা ঋতুতে যখন তখন ভেসে চলে সমস্ত এলাকা, সমস্ত ভূমি হয়ে ওঠে জলময়। শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল বর্ষার মরশুমে এখানে এসে থাকি, একবার সেই দৃশ্য দেখি কেমন ক'রে সমস্ত এলাকাটা একটা সমুদ্রে রূপান্তরিত হয়। তার অবকাশ ছিল না, একদিনের জায়গায় তিন দিন কাটিয়ে চলে আসতে হ'ল জলপাইগুড়ি, কিন্তু মনে হচ্ছে সেই বাড়ীগুলো আমার সঙ্গে এখান পর্যন্ত চলে এসেছে! দৃশ্য সেই একই কিন্তু তারতম্য আছে, এখানে শহর অনেকটাই শহর এবং বসতি অনেকটা নিবিড়। বাড়ীগুলোতে এখানে লতাবিতান, তুলসী মঞ্জরী আর ফুলসম্ভার। তবু শহর জলপাইগুড়ি। এখানে বেশ কিছু ঘরবাড়ী পাকারাস্তা সব মিলিয়ে একটা জমাটবাঁধা জনবসতি আছে। মনে তুলনা এল আপনা থেকেই শিলিগুড়িতে তো স্টেশনকে ঘিরে গড়ে ওঠা একটা বাজার, তবে কি কারণে জানি না সে বাজার বেশ জমে উঠছে মনে হ'ল। সেই বাজার ঘিরে কিছু বাড়ীঘর তারপরই ঝোপ-জঙ্গল-জলা। আর সেই সব ঝোপ-জঙ্গল-জলাকে ডিঙিয়ে পাশ-কাটিয়ে গ্রামগ্রাম অংশ হাকিমপাড়া।

সেইসব খণ্ডাংশগুলোকে সবাই একসঙ্গে ধরে, ইচ্ছে ক'রলে আলাদা ক'রেও এক একটা গ্রাম হিসেবে ধরা যায়। এখানে কিন্তু তা নয় এখানকার হাকিমপাড়া একটা পাড়াই। সে সব অবশ্য প্রথম দেখাতেই দেখিনি দেখলাম একদিন থাকার পর। শিলিগুড়িতে হোটেল নামে যে কাঠের বাড়ীটায় উঠেছিলাম সেটি এতই নড়বড়ে যে রাত্রে কেউ হাঁটা চলা ক'রলে ঘুমের মধ্যে মনে হ'ত যেন নৌকায় চলেছি। এখানে হোটেল নামক আশ্রয়স্থলটি সে তুলনায় অনেক ভাল। আর ভাল এই হোটেল-এর মালিক। ভদ্রলোককে দেখলাম আন্তরিক এবং সহানুভূতিশীল। আমাকে দেখে কি তাঁর দয়া হ'ল কে জানে, বললেন, নতুন কোম্পানীগুলোর পা ফেলবার জায়গাই হ'ল এই ডুয়ার্স আর আসাম। আমরা সব এই বনে জঙ্গলে পড়ে থাকি বলেই পৃথিবীর নতুন নতুন পরিবর্তনের কোন খবরই সময়মত পাই না। আপনারা বাইরে থেকে যা নিয়ে আসেন বিপদে আপদে তাকেই বন্ধু হিসেবে ধরে নিই।

প্রথম সম্বোধনের কথাগুলো শুনে মনে হয়েছিল ভদ্রলোক বুঝি আমাকে নিন্দাই ক'রছেন। পরের কথাগুলো শুনে বুঝেছিলাম তা নয়। বলেছিলেন, এতদিন ধরে যা দেখেছি তাতে এইরকম নতুন কোম্পানী থেকে পুরানো লোকেদেরই পাঠায়। এরকম কচি ছেলেকে পাঠাতে এই প্রথম দেখছি। দেখবেন নিরাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়বেন না, তাহ'লে সারা জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এ এক এমন দৌড় যে সুরুতেই যদি পেছিয়ে যান তো আর শেষে সামলাতে পারবেন না। কাজেই খুব সাবধানে কাজ ক'রবেন। বিকালের দিকেই এসে পৌঁছালেন, এখন বিশ্রাম করুন সকাল থেকে শুরু করবেন।

আমিও রাজী হয়ে গেলাম আমাকে দিলেন তাঁর আবাসের সবচেয়ে ভাল ঘরটি। বললেন, আমাদের এই শহরে ক'জন লোকই বা আর আসে, ঘর ক'খানা ক'রে রেখেছি তারই সব রোজ ভাড়া হয় না।

আমি ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বললাম, এখানে হোটেল কি শুধু এটাই?

না, আর একটা হোটেল বিপিন বাবুর আছে সেই বাজারে। হাটুরেদের থাকবার জায়গা আরও দু-চারটে এখানে সেখানে আছে বটে তাকে হোটেল বলা যায় না।

আমি আর কোন কথা বললাম না। হঠাৎ অন্য একটি স্বর শুনলাম ঘরের এক কোণ থেকে, দেখলাম একজন রোগা কালো ভদ্রলোক বসে পঞ্জিকা দেখছিলেন, তিনিই বলে উঠলেন, সাহেবদের জন্যে আছে প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব। সেখানে থাকার ব্যবস্থা রাজকীয় এবং এ অঞ্চলের রাজাদের জন্যেই সেটা রিজার্ভ করা। আপনার আমার সেখানে জায়গা—বলে বড় অদ্ভুতভাবে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা উঁচুর দিকে তুলে মোটর গাড়ীর সামনের কাঁচের বৃষ্টি সরাবার কাঠি যাকে ওয়াইপার বলে তারই মত ক'রে নেড়ে বোঝাতে লাগলেন—'নেই'। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বড় গম্ভীর সেই মুখ, রসিকতার চিহ্নমাত্র নেই। তবু তাকে আমার রসিক বলে মনে

হ'ল। কিন্তু আর একটি কথাও ভদ্রলোক বললেন না পরন্তু হাতের সেই পত্রিকার মধ্যেই মগ্ন হয়ে পড়লেন।

সর্বোত্তম ঘরটি আদপে উত্তম হোক আর না হোক আমার কিন্তু বেশ ভালই লাগল কারণ বাড়ীর পেছনের অংশের দোতলা ঘরটির জানালায় একটা সবুজ কদম গাছ উ'কি দিচ্ছিল। যদি তাতে ফুল তখন থাকত, আমি আমার বিছানা থেকে উঠেই একটা হাত পেতে নিতে পারতাম। বস্তুত ঘরটিতে ঢুকে আমি নিজেকে আর একভাবে আবিষ্কার ক'রলাম, প্রথম জানলাম যে আমি একজন তেমনই প্রেমিক মানুষ যে গাছ এবং ফুল ভালবাসে। কারণ এর আগে জীবনে কেবল সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দেওয়া আর অলকানন্দাকে উপহার দেবার প্রয়োজন ছাড়া কখনও ফুলেব পাপড়িতে হাত দিইনি। অথচ এখানে এসে এই গাছের ডালটিকে ঘরের জানালায় সংলগ্ন দেখে কি সুখই যে হ'ল কি বলব। বোধকরি এই নির্বান্ধব নিঃসঙ্গতার জন্যেই এরকম হচ্ছে। একটা গাছ—সে-ও তাহ'লে কখনো সঙ্গী হতে পারে! ছোট্ট চৌকির ওপর সামান্য বিছানাটা পেতে দিয়ে কাজের ছেলেটি চলে যেতেই আমি জানালার কাছে দাঁড়ালাম। ওপাশে অনেকটা জমি এমনি পড়ে আছে নানা গাছগাছালি আর সবুজ ঘাস বুকে নিয়ে। আমার মনে হ'ল বড় গাছগুলোর মধ্যে মাঝখানে একটি আমড়াগাছ বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। এছাড়া যা চেনা গেল তা একটা কাঁঠাল, একটা বেল। আর গুলোকে চিনলাম না, বোধহয় কোন ফলের গাছ নয়। ওটা তাহলে বাগান কিন্তু বাগান যদি হয় তাহলে তো ওই গাছগুলোও ফলের গাছ হবে? তা তো নয় কিন্তু যে গাছই হোক ঘরের পাশে এই সবুজ জায়গাটুকু সুন্দর। কিন্তু জানালার নিচেই দেখলাম ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা বোতল, আরও কত কি নোংরা হয়ে পড়ে আছে ছিটিয়ে। সবই ওপর থেকে ফেলা এই সব ঘরে যারা থাকে তারা ব্যবহার করা জিনিষের খোলশগুলো ওই বাগানেই ফেলে দেয় অতি অবহেলায়। ওগুলো গিয়ে ঘাসের ওপর পড়ে, জমে থাকে বিকৃত হয়, বিবর্ণ হয়, বীভৎস ভাবে পড়ে থেকে একটুকরো সুন্দর সবুজকে করে বিকৃত। কি বিশ্রীই না দেখাচ্ছে! এগুলো না ফেললে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘন সবুজ এই জায়গাটুকু কি সুন্দরই না দেখাত!

একটু বাদেই ছোট্ট ছেলেটি ফিরে এল, জানতে চাইল, চা খাবেন?

আমি বললাম, পরে বলছি। হাতের ইশারায় কাছে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, এইসব নোংরা কে ফ্যালে বলতে পার?

কেন, কি হয়েছে? —ছেলেটি বেশ বিস্মিত হয়েই প্রতিপ্রশ্ন করল আমাকে। সত্যিই তো কী বা হয়েছে? ওখানে তো আবর্জনা ফেলবারই জায়গা, ওখানটা দেখতে খারাপ লাগুক বা ভাল লাগুক সামনেটা পরিষ্কার থাকলেই হল। পেছনটা আর কে কবে দ্যাখে! বুঝে আমি চুপ করে গেলাম। ঘাসগুলো প্রতিবাদ করে না, না করুক আমি তবু ফেলব না। তাতেই বা কি আমি যেদিন ঘর ছেড়ে যাব

আমার পরিত্যাক্ত জিনিষগুলো এই ছেলেটাই ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে ফেলে দেবে এই জানলা দিয়ে, ওইখানেই। আমি ফেলবার মত কিছু রেখেও যাব না, মনে মনেই স্থির করলাম। ঘাসেদের উপর আমরা বড় অবিচার করি। কি প্রচণ্ড সহনশীলতা নিয়ে যে ওদের সৃষ্টি ভাবলে আমি অবাক হয়ে যাই। সামান্য একটু অনুকূল অবস্থা পেলেই সেখানে জন্মে যায়। সবুজ করে রাখে সেখানটাকে। লোকে মাড়ায় সহ্য করে, মুরগীতে আঁচড়ায় সহ্য করে, কি না সহ্য ক'রে বেঁচে থাকে বেচারীরা। মাটি যদি সর্বংসহা হয় তাহ'লে ঘাসও তাই। ধরিত্রীর কন্যা। সুকন্যা।

সে রাত্রিটা আমাকে একদম একা বাস ক'রতে হ'ল। রাত্রিতে শুধু একগ্লাস জল আর খাবার দিতে ঘরে এসেছিল সেই বাচ্চা চাকরটা। আবার সেই নিবিড় একাকীত্ব, সেই শূন্যতা। আমি হোস্টেলে থাকার সময়ে অনেকদিন দেখেছি একা থাকতে ভাল লাগত, এক এক দিন বা এক একটি সন্ধ্যায় অকারণেই এমন হত যে কারও সঙ্গই ভাল লাগত না, একা থাকতে চাইতাম, মনে হত আলো নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকি বিছানায়। আজ সেই সুযোগ অভাবিত ভাবেই এসেছে কিন্তু একাকীত্ব যেন ভয়ঙ্কর এক বোঝার মত ভারী, এ যেন আমার দম বন্ধ ক'রে দেবে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল নিদেন পক্ষে সেই বাচ্চা চাকরটা যদি একবার আসে তবু বোধহয় আমি শ্বাস নিতে পারি। দিনের বেলা সঙ্গী ছিল যে কদম ফুলের গাছ সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেছে—যেন বিকালের শেষে খেলার সঙ্গীরা চলে গেছে যে যার বাড়ী আমি একা কাদামাখা বলটা কোলে নিয়ে ঘরে ফিরছি। দুচারবার অসহায় ভাবে জানলার দিকে তাকালাম আবার সে ফিরে এসেছে কিনা। তার সেই সবুজ সৌন্দর্যের বদলে সেখানে জমাট কালো অন্ধকার। তবে শুধু ভেসে আসে কিছু ঝিঁঝিঁ পোকার অক্লান্ত পাখার বিরামহীন শব্দ যা থেকে নিশ্চিত হতে পারছি যে বেঁচে আছি। কোনদিন চোখে দেখিনি যাদের সেই অতি গুরুত্বহীন পোকা ঝিঁঝিঁদের প্রতি মনের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রতে লাগলাম। কি জানি কেন বেশ ভাল লাগল ঝিঁঝিঁদের সঙ্গে একটা সংযোগ হওয়াতে। এই অচেনা ভূমিতে রাত্রে কোন স্বজনই যখন সাহচর্য দিতে অপাবগ তখন ওই অসংখ্য ঝিঁঝিঁ এসেছে সঙ্গ দিতে। ভালই হয়েছে, আমি নিজের সমস্ত সংস্কারের বাইরে দাঁড়িয়ে আজ মিশে গেছি সেই তাদের সঙ্গে প্রকৃতই আমি যাদের স্বগোত্র। বুদ্ধির অভিমানে যাদের থেকে পৃথক করে রাখি নিজেকে সেই নগন্য পোকাগুলোই আমাকে মুক্ত করতে এল অবসাদ থেকে।

তৃতীয় দিন, আমার এখনও বেশ মনে আছে, পরিচয় হল ওই নিরেট চেহারার মানুষটার সঙ্গে। গর্দানটা মোটা অথবা বলা উচিত মাথাটা গর্দানের তুলনায় ছোট আর মোটা হলেও মজবুত শক্ত তার শরীর। আলাপ হবার আগে দেখে আমার মনে হয়েছিল এতদঞ্চলে এখন মহাভারতের কোন অংশ নাটকাকারে অভিনীত হলে ভীমের ভূমিকায় অভিনেতার অভাব এই ব্যক্তিটির জীবদ্দশায় হবে না। স্বল্পক্ষেপে ত্রুটি যদি

থেকেই যায় তা ঢেকে যাবে দৃশ্যগত যথাযথতায়। তবে যদি প্রশ্ন ওঠে সত্যযুগের ধৈর্যের তবে পরিচয় লিপিতে লিখে দিতে হবে যুগোচিত অসম্পূর্ণতা মার্জনীয়। সাদা একটা পাঞ্জাবীতে সেই পেটা শরীর ঢাকা। হলে কি হবে পাহড়ের নদীর তলা থেকে যেমন বড় পাথরের আভাস ফুটে ওঠে, ফুটে ওঠে তলার দৃশ্য তেমনই তার শক্তির পরিচয় আর রোদে পোড়া রঙ জামায় ঢাকা পড়েনি। পরিচয় ওই হোটলেই। নাম হরিনন্দন সাউ। হোটেল মালিকই পরিচয় দিয়ে জানিয়েছিলেন, সাউজী এখানকার কাঠের ব্যবসায়ী। ওই অঞ্চলের বন সে ইজারা নিয়ে কাঠ কেটে বিক্রি করে। হরিনন্দন চুপচাপ। পরিচয় করিয়ে দেবার পরও তার কোন কথা নেই বা আমাকেও বলল না সৌজন্যমূলক কোন শব্দ। আমি ভেবে পেলাম না লোকটি বোবা কিনা। আমিই আমার স্বভাবের থেকে বিচ্যুত হয়ে জানতে চাইলাম, আপনার বাড়ীটা কোন দিকে ?

এবার জবাব দিল সেই হরিনন্দন, আমার আসলী ঘর তো গয়া জিলা ডোভি। ইখানে বড়াজোতে থোড়া ঘর বানাইছি।

ব্যাপারটা বুঝেই দেশী হিন্দিতে আরম্ভ করলাম, আমারও বাড়ী পাটনা।

হাঁ, আমি শুনলাম কি পাটনার ওষুধ কোম্পানী এসেছে তাই চৌধুরী বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার কথা। এদিকে জ্বরের ওষুধ খুব দরকার, ওইটা অনেক বেশী আনবেন। —দেশের লোক পেয়ে উৎসাহিত হয়ে আমাকে উপদেশ দিয়ে বসল হরিনন্দন সাউ। পরক্ষণেই জানতে চাইল, কতগুলো জ্বরের ওষুধ আমি সঙ্গে এনেছি। বেশী নয় শুনে পরামর্শ দিল চিঠি লিখে অনেক বেশী আনিয়ে নিতে। আমায় কোন ঝামেলাই করতে হবে না সব ওষুধ তার কাছে দিয়ে টাকা নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরে বললাম, সাউজীর নিশ্চয়ই আরও কারবার আছে।

খুব ম্লানভঙ্গীতে স্বীকার করল হরিনন্দন, সামান্য কিছু টাকা পয়সা দেওয়া আছে বাবুদের, কিছু কিছু পাওয়া যায় তা থেকে।

আর ?

আর কি—পাহাড় অকস্মাৎ যেন নত হল, এমনি লাজুক ভাবে হরিনন্দন সাউ জানাল, ছোট একটা দোকান আছে জঙ্গলের মধ্যে তার বাড়ীতেই। শহর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে রাখে সে এলাকার লোকেদের সুবিধার জন্য। বহু মদেশীয়া আছে চা বাগানে, বনেও আছে কিছু মানুষ তাদের কাজে লাগে।

বাঃ—প্রকাশ্যে তারিফ করলাম শুধু এই শব্দটুকু দিয়েই, মনে মনে বললাম বুদ্ধিমান লোক বটে! আমাদের দেশী বাক্যালাপ হোটেল মালিক চৌধুরী বাবুর কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না বুঝে তাঁকে তাঁর বোঝার মত ভাষায় বললাম, সাউজীর ব্যবসার হিসেব নিচ্ছিলাম আর কি!

চৌধুরীবাবু আলোচনার মত প্রসঙ্গ পেয়ে বললেন, ব্যবসার কথা কি বলছেন

মশাই, সাউজী জন্ম ব্যবসায়ী। প্রতি বছর কিছু মদেশীয় চা বাগানে কাজের জন্য দেশ থেকে এদেশে আসে, একদিন তাদেরই দলে স্রোতে ভেসে আসার মত সাউজী এসেছিল এই জঙ্গলে। ক বছর হবে সাউজী ?

হরিনন্দন বাংলা বোঝে, কাজ চালানোর মত কিছু বলতেও পারে, বলল, সাত সাল হ'ল।

কথা কম বলে হরিনন্দন। একটা দুটো বলেই থেমে যায়। তখন চুপ করে গেলে আলাপচারিতা শেষ হয়ে যায় হয়ত সেই মাঝ পথেই। আর যদি কেউ বিশেষ উৎসাহী হয় তো নিজেব গরজে সে কথা জুগিয়ে আলাপটা সচল রাখবে। সেদিন সে গরজ অনুভব করিনি বলে কথা ওখানেই থেমে গিয়েছিল। কেবলমাত্র উঠে যাবার সময় হরিনন্দন সাউ বলেছিল, আমার বাড়ী বড়াজোতে একবার আসবেন। আপনার ওষুধ নিয়ে এলে খুব ভাল হবে।

আর হরিনন্দন উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হোটেলওয়ালা চৌধুরীবাবু বলেছিল, বড় করিৎকর্মা লোক মশাই। আমার মনে হয় গঙ্গাশরণ সিং-এর থেকে হরিনন্দন সাউ কিছু কমতি যায় না।

আমার কাছে তুলনাটা একেবারেই অর্থশূন্য কারণ গঙ্গাশরণ সিং নামক ব্যক্তিটি আমার একেবাবেই অজ্ঞাত। কথাটা চৌধুরীবাবুকে জানাতে তিনি বললেন, গঙ্গাশরণ সিং হচ্ছে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জোতদার। তাকে জমিদারও বলতে পারেন।— কথাটা ওখানে না থামিয়ে এগিয়ে চললেন, আগে দেশ ছিল উত্তরপ্রদেশে বহুদিন হল এখানে এসে লোকটা বহু জমিজমা করেছে। অনেক জমির মালিক।

এই লোকটা তো শুনেছি মাত্র সাত বছর এসেছে। এর মধ্যে এও তো অনেক কবেছে বুঝছি ? —আমি প্রশ্নের আকারে বললাম কথাটা।

তবে আর বলছি কি ? আমার তো মনে হয় গঙ্গাশরণ সিং-এর কাছাকাছি চলে গেছে এই সাউ। অথচ আমি এই লোকটিকে প্রথম দেখেছি চা বাগানের মাল পত্তর বইত একটা ঠেলাগাড়িতে করে !

বলেন কি ! —সত্যিই আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

ঠিকই বলছি। শোনা কথা নয়, চোখে দ্যাখা। এই আমার হোটেলেই কত কয়লা বেচে গেছে ঠেলা গাড়িতে করে।

কয়লারও ব্যবসা করত ?

মশাই বাগানের কয়লা। এনে বেচে দিত।

ব্যাপারটা ঠিক ব্যুৎপত্তি হল না আমার! তাই জানতে চাইলাম, সেটা কিরকম করে সম্ভব ছিল ?

ছিল ছিল মশাই, এখনও কিছু আছে। চা বাগানের সাহেবরা দরাজ মনের মানুষ। ছোট খাট জিনিসকে নজর করে দ্যাখে না। চাকর বাকর ক্লাশের লোকেরা

ওরকম সুবিধে সুযোগ তাই অনেকই পেয়ে থাকে।

একটু আগে যার সম্বন্ধে বললেন সাউজী তাকে বলছেন চাকর-বাকর! আমি একটু ঠাট্টা করেই বললাম, চৌধুরী মশাই জবাব দিলেন, ঘোড়ার পিঠ চাপড়ালেই যদি ঘোড়া মানুষ না হয়ে যায় তবে ওই সব প্ল্যান্টার সাহেবদের কাছে আমরা চাকর বাকর ছাড়া আর কিছুই নয়। মুখে আমাদের বাবু বাবু বলে বটে তার মানে কী? মানে কেরাণী। আর ওই হরিনন্দনের ইতিহাস! কুলিদের সঙ্গে এসে ঠেলা চালাত সাতবছর আগে। এখন মার্চেন্ট—টিম্বার মার্চেন্ট। ভাগ্য মশাই সবই ভাগ্য।

হয়ত হবে—কথাটা আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল।

হয়ত হবে কি মশাই? সতের বছর এই হোটেল নিয়ে পড়ে আছি যেমন সুরু ক'রেছিলাম তেমনই চলছে। চলছে, এই যা।

ইচ্ছে হ'ল বলি যে আপনার চালাবার ব্যবস্থায় নিশ্চয় ভুল আছে, বললাম না। ভদ্রলোকের কথার মধ্যে যে আক্ষেপ ছিল সে জন্য সহানুভূতিও কি জানি কেন হ'ল না আমার। আমি শুধু কৃতি লোকটির কথা জানতে চাইলাম, একজন দরিদ্র ঠেলাওয়ালা মাত্র সাতটা বছরের মধ্যে এত টাকা আর যা বলছেন অত জমি ক'রল কি ক'রে?

ওই তো, ওইজন্যেই বললাম ভাগ্য। ভাগ্যের জোরেই সব হওয়া করা হয় ভাগ্য প্রসন্ন হলে কিছু করতে হয় না, হয়ে যায়।

কি জানি কেন আমার মন ঠিক স্বীকার ক'রতে পারল না তাঁর কথা। সায় দিতে পারলাম না। বললাম, মানলাম আপনার কথা, হয়ত ভাগ্য সাহায্য করল কিন্তু আপনা থেকে তো কিছু হবার নয়!

তা হতে পারে। তবে সাহায্য না ক'রলে হয় না। এই যেমন ধরুন এখন যেখানে হরিনন্দনের বাড়ী সে তো গভীর জঙ্গলের মধ্যে। চা বাগানের সীমানা পেরিয়েই বন সেই বনের মধ্যেই বসত ক'রল হরিনন্দন। বাঘ, হাতি কিসের সঙ্গে না ঝগড়া ক'রেছ? একটু একটু করে বন কেটে ফাঁকা ক'রেছে আর চাষ। এই ভাবেই যত জমি চাষ ক'রে আসছে তার মালিক হরিনন্দন সাউ। যদি ওই বন কেটে বসত আমি ক'রতে পারতাম লড়তে পারতাম জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তাহ'লে অত জমি আমিও করতে পারতাম। ডুয়ার্সের জঙ্গলের কি শেষ আছে মশাই, না জমির শেষ আছে?

আমি বেশ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম চৌধুরী বাবুর কথাগুলো। এমনও কি হয়? এখন বুঝি হয়। মানুষ তো এমনি ভাবেই পৃথিবীর সমস্ত মাটি ছিনিয়ে নিয়েছে সে মাটির আসল সন্তান বনচর প্রাণীদের কাছ থেকে। ক্রমাগত বন কেটে প্রকৃতির সীমা ক'রেছে সংকীর্ণতর। অথচ আজ থেকে বহু আলোআঁধারির, যাকে আপনারা দিন রাত্রি বলেন, আগে সেই জলপাইগুড়ি নামক শহরের একটা কুঠুরীতে বসে চৌধুরী-বাবুর কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল এও কি সম্ভব? এই ভাবে হঠাৎ ভূস্বামী হয়ে যাওয়া। এখন বুঝি সম্ভব, অমন ভূস্বামীই তো সবাই। যে যতটা দখল ক'রে

নিতে পারে। কিন্তু আখেরে তার থাকেটা কি, সেই ছফুট জমি? তাও কি থাকে শেষ পর্যন্ত? দুহাজার কি দশহাজার বছর আগে যে লোকটির ভাগে যে ছফুট জমি পড়েছিল আজও কি আছে সেটা তার? তবু মানুষ জমি দখল করে, জমি বাড়ায়। আসলে ক্ষিধে মানুষের মনে। অবশ্য এই মনের ক্ষিধেই অসীম ক'রেছে মানুষকে, বিশাল করেছে তার ক্ষমতার এক্তিয়ারকে, বিরাট করেছে তার ব্যাপ্তি। মনের ক্ষিধেই মানুষের শক্তিকে ক'রেছে প্রচণ্ড। অথচ আমি নিশ্চিত যে জন্মের মধ্যেই থাকে মৃত্যুর নিশ্চয়তা, সফলতার সঙ্গেই থাকে ধ্বংসের ধ্রুবতারা। শরীরের ক্ষিদে তো সমস্ত প্রাণীরই আছে—মনের ক্ষিধে নেই। আবার মনের ক্ষিধের মধ্যেও তারতম্য আছে। একজন পন্ডিতের ক্ষিধে আর হরিনন্দন সাউ-এর ক্ষিদে একরকম নয়। ক্ষিধের চিন্তাটাকে বাস্তবে এনে জানতে চাইলাম, অনেক জমি করেছে হরিনন্দন?

যদি কোনদিন যান তো দেখতে পাবেন। আসলে এই ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বের কাজ, বা বিক্রির কাজ এসব বোঝবার ক্ষমতা ওর হয়নি। ও আপনাকে হাটের ওষুধ বিক্রেতাদের মত ক'রে দেখছে। তাই অত করে যেতে বলল আর আপনার কাছে যত ওষুধ আছে কিনে নিয়ে বেচতে চাইল ওর মুদির দোকানে।

ব্যাপারটা ঝাপসা ছিল, স্পষ্ট হ'ল। নিঃসন্দেহে খুবই মজার। মনে হল মজা দেখার জন্যেই একবার যাওয়া উচিত লোকটার বাড়ী, তা ছাড়া এ রকম লোকের কায়দা-টাও দেখে আসা উচিত। চৌধুরী বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, কি ভাবে যেতে হয়?

ভদ্রলোক প্রতিপ্রশ্ন ক'রলেন, আপনি তাহলে সত্যিই যাবেন ভাবছেন?

অসুবিধে আছে?

যাবার ছাড়া আর বিশেষ কি অসুবিধে হবে?

সেটা অনুমান করেই তো জানতে চাইছি।

পথ প্রায় হাঁটা। যদি আপনার সাইকেল থাকত তাহ'লে অসুবিধেটা কম হত। কিছুটা পথ সাইকেলে কিছুটা হেঁটে কোনভাবে পৌঁছাতে পারতেন।

শুনে চুপ ক'রে রইলাম।

চৌধুরীবাবুই বললেন, সে মশাই দুর্গম জঙ্গল। অমনি কি আর ফোকটে জমিদার হয়েছে? চায়ের সাহেবরা একদিন যেতে পারেনি, নইলে তো চাবাগানই বসে ওই জমিতে। ওই জঙ্গলে যে জানোয়ার থাকে উৎপাতও করে। কখন কখন হাতিতে ফসল খেয়ে নেয় ভালুক এসে ফসল নষ্ট করে, হরিণ পড়ে জমিতে—

বাঘ—

সে তো আর ফসল খায় না!

ওদেরও তো খেয়ে নিতে পারে!

না। তা পারে না। পারলে এতদিন ওরা থাকতে পারত না। কবে শেষ হয়ে যেত। মশাই-যার মৃত্যু নেই তাকে মারবে কে? নইলে কোথা থেকে এসে এই গভীর

জঙ্গলে এতদিন কাটিয়ে দিতে কেউ পারে ?

আসলে সাহসই হ'ল সব।

চৌধুরী বাবু সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই সাহস বস্তুটার মূর্খদেরই একমাত্র অধিকার বলে জেনে এসেছি। এখন দেখছি কিছু চতুর লোকও সাহসী হয়।

মূর্খের অধিকার কেন ? আমি জানতে চাইলাম।

কারণ মূর্খ মানে বোকারা ভাবনা চিন্তার বিশেষ ধার ধারে না। একটা কিছুর মধ্যে দুম করে লাফিয়ে পড়তে তাদের কোন বাধা থাকে না। বুদ্ধিমানরা কোন কিছু করবার আগে অনেকবারই ভাবে। আর ভাবে বলেই সাহসিকতা নামক হটকারিতা তারা সহসা ক'রে ফ্যালে না। এটা হ'ল সূত্র, আর এই হরিনন্দন সাউ হচ্ছে সেই সূত্রের একটি নিটোল ব্যতিক্রম।

কথাটা আমি নিঃশব্দে মেনেছিলাম। কারণ সত্যিই হরিনন্দন সাউ নামের লোকটির মুখে এমন একটা প্রলেপ লাগানো আছে যার জন্যে সেই নিকষ কালো অতি সাধারণ গ্রাম্য মানুষটাকে অত্যন্তই চতুর বলে মনে হয়। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যেটাকে আলগা চটক বলা হয় এও অনেকটা তেমনি, যেন একটা প্রলিপ্ত চাতুর্য।

অথচ পরবর্তীকালে সেই হরিনন্দন সাউ নামে আমার অপছন্দের লোকটির সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল আমার নিবিড় সম্পর্ক। এবং সত্যি বলতে কি এই যে আমার জীবনান্তরের পথ এর বিরাট একটা বাঁকের মুখের প্রশস্ততা সেই খর্বাকৃতি ঘোরকৃষ্ণ ভারবাহক হরিনন্দন সাউ বাবুজী। যে কোনও সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে যেমন দুটো দিকই এক সঙ্গে দেখা যায় তেমনি ছিল আমার হরিনন্দন এর সঙ্গী থাকার কালটুকু। তখনও আমি হয়ত ফিরতে পারতাম কারণ তখনই আমি কার্যত এক বিশাল পরিবর্তনের মুখোমুখি। আপনাদের এবং অলকানন্দার সঙ্গে আমার প্রকৃত বিচ্ছেদ কিন্তু বাস্তবিক ভাবে সেই সময়টিতেই। তখন আমি যদি মুখ ফেরাতাম তাহলেই আমার অতীত—সেই অতীত যেখানে দাঁড়িয়ে আপনারা—আমার বহুদূরে ছেড়ে আসা আজন্ম চেনা পরিবেশের মানুষ, প্রিয় এবং একালের পৃথিবীর বাস্তব সম্মত পরিবেশ আর অলকানন্দা। কিন্তু মুখ ফেরাতে পারিনি বলেই আপনাদের জগৎ থেকে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ দূরে অন্য এক জগতে আমি। যদিও একই পৃথিবীতে তবু আমি আর ফিরতে পারিনা সেই নভশ্চরের মত যে অন্যগ্রহে পৌঁছে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তার নষ্ট হয়ে যাওয়া মহাকাশ যান থেকে। অবশ্য সে আমি চাইও না। আমি তৃপ্ত, নির্বি-কল্প আনন্দে নিবৃত্ত। যদিও ইদানীং ভাঙ্গা দরজা দিয়ে বাধাহীন ভাবেই এসে ঢুকছে পশ্চিমের বাতাস তাতে সমাহিত শান্তি অনেকাংশেই বিঘ্নিত এতে ক্ষুব্ধ আমি কিন্তু ক্ষতি আমার বিশেষ নেই কারণ এখন আমার চোখে শেষ প্রহরের আলো। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, নিভবে। আর খুব অল্প দিনই এই যন্ত্রণার সঙ্গে সংগ্রামে নিজেকে

ব্যাপৃত রাখতে হবে। অথচ আমি সবসময়েই চেষ্টা করি ভুলে থাকতে, তাই আরও একটু ওপরে উঠে এসেছি, অপেক্ষাকৃত গভীরে এবং এমন এক জায়গায় যেখানে আগে কোনদিন আমরা বাস ক'রতাম না হয়ত কেউই কখনো করেনি। জারোমথাঙ্গর ইচ্ছে নয় এখানে আসে, নিচেই সে থাকতে চায়, সে মেনেই নিতে চায় পরিবর্তন, কারণ অন্য অনেকের মতই পরিবর্তন ব্যাপারটাকে সে বিশেষ বুঝতে পারে না এটা বিবর্তিত বলে আমি বুঝি কারণ আমি যেখান থেকে এসেছি এ হাওয়া সেখানকারই। আমার মনে হয় বাড়ীর লোকেরা খুঁজতে এলে যেমন হয় এ তেমনি। সেই পরিবেশ আমার পেছনে ধাওয়া ক'রে এতদিন বাদে খুঁজে পেয়েছে আমাকে। ধরতে চাইছে, আমি পালাতে চাইছি। ক্রমাগত সে উঠে আসছে পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে এই পাহাড়ের ওপরে যেখানে আমার শেষ আশ্রয়।

জলপাইগুড়িতে সেদিনটা আমার সপ্তম। অফিসে বেশ মোটা খাম পাঠিয়েছি এক গোছা আভারে ভরে, আর জানিয়েছি টাকার প্রয়োজন। যে ক'দিন টাকা না আসবে বসে থাকতে হবে এখানেই তারপর নতুন যাত্রা হবে গৌহাটি। গভীর অরণ্যের সবুজ ভেদ ক'রে যে দুজোড়া সরু লোহার বিম পড়ে আছে তারই ওপর দিয়ে সেদিন দেখে এসেছি বেগে ছুটে যায় এক লোহার সাপ—বিশাল, ক্ষিপ্রগতি। সমস্ত বনাঞ্চল কাঁপিয়ে চারিদিকের তরুবীথিকায় তুলে ধ্বনির তরঙ্গ, সে চলে। আমার মনে হয় পৃথিবীর আদিমতম অন্ধকার চিরে ছোটে সভ্যতার আলোর বল্লম—ধ্বনি তার তূর্যনাদ। চারিদিকে কি আশ্চর্য নিঝুম নীরবতা, সুবিশাল মহীরুহের ঋজু দেহে কি গভীর প্রশান্তির প্রলেপ। সূর্যের খরতাপকে আত্মস্থ ক'রে যেমন স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীরণ করে চাঁদ তেমনই এবনভূমিও পৃথিবীর কাছ থেকে প্রতিনিয়ত সংগ্রহ করে যে অভিজ্ঞতা তাকেই পরিবর্তিত করে প্রশান্তিতে—ফিরিয়ে দেয় পৃথিবীকে পুনর্বার। এ হয়ত চলেছে সেই অজ্ঞাত অতীত থেকে হয়ত সে অতীত অনুমিত কিন্তু অদেখা, অজানা, অপর্যালোচিত। এই অরণ্য—এই বনস্পতি তেমনি প্রাচীন যেমন এই পৃথিবীর আলো বাতাস জল। আমার তো মনে হয় এ অরণ্য পৃথিবীর কোল। আপন গর্ভজাত সন্তানদের যেমন জননী আশ্রয় দেয় কোলে তেমনি ধরণীও তার প্রাণ থেকে প্রণীত প্রাণীদের লালন করে আনন্দে এই অরণ্যের আশ্রয়েই। এখানেই তো প্রাণরস সন্তানের দুগ্ধভাণ্ডার।

কদিন ঘুরে বেড়িয়ে কিছুটা ধারণা হয়ে গেছে, করলা নদীর ধারে ধারে অথবা তিস্তার আস্তরণ—পর্যন্ত আপন মনেই ঘুরে বেড়াই। শহর বটে কিন্তু চারিদিকেই সবুজ, সবুজ শহরের মধ্যেও—এখানে সেখানে, যেখানে সেখানে। বেশ ভাল লাগে। কলকাতার চোখে নতুন হলেও আমার যা শৈশব ভূমি সেখানে গাছও আছে সবুজও আছে। কিন্তু এমন অঢেল নয়। সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গাছ বেশীর ভাগই শিশু

কিংবা শাল্মলী। বসত এলাকার বাইরে গেলে আছে বেশ কিছু শিমুল পলাশ মহুয়া। একমাত্র আম ছাড়া সব কাট গাছই যেন পত্রসম্ভারে দীন। এখানে প্রকৃতি অকৃপণ। তাঁর দান এখানে অসীম। তাই হাতের কাজ যখন ফুরিয়ে গেল জলপাইগুড়ি জয়ের পরে, তখন বড় খারাপ লাগছিল ঘরের মধ্যে বসে। একদিন দুপুরে শুয়ে আছি চিঠি এল। কোম্পানী লিখেছে আসামের কাজ বন্ধ ক'রে ফিরে যেতে হবে আমাকে, বিশেষ প্রয়োজনে। আমার পাঠানো সমস্ত অর্ডারই পেয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু ফিরে যেতে হবে কেন? এই যেন আমার প্রথম ধারণা হ'ল যে একদিন যে জায়গা ছেড়েছিলাম সে জায়গাতে আবার ফিরতে হয়। যেন সম্বিৎ ফিরল হঠাৎ। এখান থেকে পাটনা, সেখান থেকে বাড়ী, বাড়ী থেকে কলকাতা—আবার আবার আবার। স্মৃতির মধ্যে গুঞ্জন—গুঞ্জরণ। এই বিশাল শ্যামলিমার মধ্যে এসে কি জানি কেমন ভাবে কেন যেন আমার মনে নতুন স্নিগ্ধতার উন্মেষ হয়েছিল। সমস্ত অতীত মুছে গিয়ে মুছে ফেলা স্লেটের মত হয়েছিল মন। সেখানে আবার যেন হঠাৎ ফুটে উঠল একটা ছোট রেখা, আর একটা, আবার একটা। একটু বাদেই সেই সরল রেখাগুলো বাঁকা হয়ে উঠল। এলোমেলো ভাবে জটিল পথ ধরল সেগুলো অচিরেই। আবার সেই পুরানো জীবন যেখানে ঘোলা একঘেয়েমী, বহু শত বছরের প্রচলিত অভ্যাসের গতানুগতিক জীবনযাত্রা, সামান্য বেঁচে থাকার জন্য অসামান্য আয়োজন উদ্বেগ! আবার মনে হ'ল এখানে এই যে জিনিস বিক্রি করার জন্যে লোকের দরজায় দরজায় ঘোরাঘুরি, এই যে কাজ এর মধ্যেই বা বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য আছে? হোটেল এর দরজার সামনে পাতকুড়ানো খাবারের আশায় যে কুকুরগুলো বসে থাকে তাদের সঙ্গে আমার কোথায় তফাৎ? তারা সারাদিন ল্যাজ উঁচু ক'রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আমিও ঘুরি ব্যাগ হাতে ক'রে। উদ্দেশ্য একই, জোগাড় ক'রে খাওয়া। শুধু এক ওই কুকুর কেন, পৃথিবীর এমন কোন পোকামাকড় কীট পতঙ্গ আছে যারা সারাদিন শুধু খাবারের জন্যে ব্যস্ত নয়? খাবার বাইরে তারা যা প্রবৃত্তির বশে ক'রে থাকে তা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার। সেখানেই বা কি পার্থক্য তাদের সঙ্গে আমার? এই চাকরী এও সেই খাবার জন্যেই তো!

মাথার মধ্যে পুরানো দিনের সেই বেয়াড়া চিন্তাটা ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি উঠে পড়লাম, বাইরে এসে চারধারে তাকিয়ে দেখলাম পথে মানুষ চলছে আমারই মত সব। তাদের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল কতগুলো পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার সামনে দিয়ে এমন ভাবে একটা রিকসাগাড়ী দৌড়ে গেল যে আমি ভয় পেয়েই ছিটকে গেলাম পেছন দিকে। মদেশীয় রিকসাওয়ালা কি যেন আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলল শুনতে পেলাম না। কথাটা যে খুব মধুর নয় তা থেকেই বুঝলাম দোষটা নিশ্চয় আমারই হয়েছিল। যা হোক সামান্য মানসিক ধাক্কা দেওয়া এইটুকু ঘটনা আমার মনের ভার কমাবার পক্ষে যথেষ্ঠ ছিল না বলে আবার পথ ধরে চলতে লাগলাম।

কদিন ধরে মনের মধ্যে ঘুরছিল যে এবার তো এখান থেকে চলেই যাব, অনেকটা সেই মানসিকতার বশেই জায়গাটাকে শেষ দেখার মত ক'রে হেঁটে চললাম পথ যেমন চলছে সেই অনুসারে। এমনি ভাবে একসময় ফুরিয়ে এল শহর। বাড়ীঘর কমে গেলে পথের ধারে ধারে। দৈবাৎ দু একটা ঘর দূরে কোথাও হয়ত বা দেখা দেয় এমনি তৃণভূমি ভাঙ্গা চাষের জমি দুপাশে ক'রে অনেকদূরেই চলে এসেছিলাম হঠাৎ একটি লোক বিপরীত দিক থেকে আসতে আসতে তার ছেড়ে আশা পথের দিকে দেখিয়ে বলল, ওদিকে হাতি বেরিয়েছে। —লোকটা আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যেই বলল। আমি জানতে চাইলাম, কতদূরে?

ওই সামনেই। বাঁকটার কাছে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন।—

বনের হাতি দেখতে পাবার ইচ্ছা একদিকে যেমন অদম্য অন্যদিকে তেমনি শংকা। লোকটি চলে গেল, আমার চলার গতি যেন আপনা থেকেই কমে গেল। কিন্তু এগিয়ে চললাম। শুনেছিলাম হাতিরা নাকি একসঙ্গে একদল বেরোয়, একজন দলপতি থাকে তাদের সঙ্গে। শিলিগুড়িতে বসে অনেক কথা জেনেছি হাতি সম্পর্কে। তাই সাহস ক'রে উঠতে পারছিলাম না। বেশ কিছুটা দূরে দেখছি পথ শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ বাঁকটা ওইখানেই। ওখানে দাঁড়ালেই দেখা যাবে একদল হাতি বন থেকে বেরিয়ে পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যদি এদিকেই এসে থাকে! যদি এমন হয় যে ওরাও এদিকেই আসছে! আসে আসুক, যদি হাতির পায়ের তলায় চাপা পড়ে মরি তো মরব, কত পোকামাকড়ই তো রোজ কত ভাবে পিষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছে, না হয় আমিও গেলাম, কি ক্ষতি তাতে? আর যদি কোনক্রমে ওদের চোখ এড়িয়ে যায় তা'হলে এই দুর্লভ দৃশ্য দেখা তো হয়ে যাবে! চললাম। এলাম সেই বাঁকটায়, কোথায় হাতি? যতদূর দৃষ্টি যায় চেষ্টা ক'রলাম, চারিদিকেই সেই সীমাশূন্য শূন্যতা। সবুজ আর নীল। অতএব চললাম। ধানের ক্ষেত কখন নিঃশব্দে ফুরিয়ে গেছে তার হদিশ রাখিনি, দেখি দুপাশে জলা আর বড় বড় খড়-উলুখাগড়ার বন। দুদিকে অনেকদূর পর্যন্ত শুধু ওই গুল্মভূমি। তারও পরে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে পিছু মহীরুহ ঘনসন্নিবিষ্ট দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু ক'রে। সবুজ, ঘন সবুজ, কালো হয়ে আছে রঙের ঘনত্বে। কিন্তু হাতির বাহিনী নেই কোন সীমানায়। যে লোকটি চলে গেল তার পরণে এক ফালি গামছার মত কাপড়, খালি গা রোদে পুড়ে নিকষ কালো। অতএব এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা, ওর তো ভুল দেখার কথা নয়। মিথ্যে ভয় পাবার কথাও নয়! তাই সন্তর্পণেই এগোতে লাগলাম। যদিও জানি মিথ্যে সতর্কতা তবু প্রাণী মাত্রের স্বভাব ধর্মেই সতর্ক হয়ে চলতে লাগলাম। বেশ কিছুটা গিয়ে বাঁদিকে অনেকটা দূরে ঝোপঝাড়ের মাঝে দেখতে পেলাম বিশাল একখণ্ড পাথরের মত একটা হাতি জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। তার আগেও নড়ছে ঘন ঘাসের বন। অর্থাৎ ওর সামনে আরও অনেকগুলো ছোট সাইজের হাতি চলছে

যাদের দেখা যাচ্ছে না। বড় হাতিটার শুধু পিঠ আর মাথাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রচণ্ড হতাশায় মনে হ'ল যেন একটা বহু ঈপ্সিত দৃশ্য চোখের সামনে থেকে ফস্কে গেল। যেন এই দৃশ্য দেখবার জন্যেই অনেকদিন ধ'রে এখানে ক্রমাগতই আসছিলাম আমি। কেবলই সংবাদদাতা লোকটির কথা মনে হতে লাগল, কোন জায়গায় দেখেছে লোকটি হাতিগুলোকে? পথের ওপরেই? পথের পাশেই? জলার ধারে? সবকটিকে একসঙ্গে দেখেছে যূথবদ্ধ? ওকে যখন হাতিরা কিছু বলেনি আমাকেও নিশ্চয়ই বলত না। অথবা লোকটি এই বনাঞ্চলবাসী বলে বন্যচতুষ্পদ প্রাণীদের থেকে বাঁচবার প্রক্রিয়া জানে, স্বভাব জানে বন্যপ্রাণীদের। ও বেঁচেছে সামনে পড়লে আমি হয়ত বাঁচতাম না। এই কাশ ঘাস আর উলুখাগড়ার জঙ্গল বহুদূর প্রসারিত তাই অনেকক্ষণ ধরে সেই হস্তীযূথকে গম্ভীর গতিতে চলতে দেখা গেল। অবশ্য আমিও চলছিলাম। চলতে চলতেই দেখছিলাম, দেখছিলাম অন্যপাশেও।

অকস্মাৎ একটা বিরাট পাখি বিকট শব্দ ক'রে উঠল আমার প্রায় পাশটাতেই। একটা ঝোপের মধ্যে থেকে বিশাল ডানা ঝাপটিয়ে মুখে কর্কশ শব্দ ক'রতে ক'রতে উড়ে গেল। আচমকা সেই শব্দে কিছুটা চমকেও উঠলাম। হঠাৎ মানুষের যেমন বুক ধড়ফড় করে তেমনি ধড়ফড়িয়ে উড়ে গেল পাখিটা। যেখান থেকে সে উড়ল সেই জায়গাটা দেখতে চাইলাম। আগাছায় ভরা ঝোপঝাড়ের মধ্যে জঙ্গলের ওপাশটায় থাকতে পারে একটা ছোট্ট জলা, আর হয়ত সেখানেই বসে ছিল পাখিটা বা এসেছিল কোন কাজে। কিন্তু কি পাখি যে ওটা তাই বোঝা গেল না। হতে পারত শকুনি কিন্তু তা নয়। অন্য রঙ আর অন্য রকম। গলার শব্দ এত তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ যে মনে হ'ল সেই স্বর সমস্ত কাশফুল ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আর তার বিস্তীর্ণ দুই ডানার ঝাপটায় কাঁপছে সারা বন। মানুষকে পাখিরা চিরদিন ভয় পেয়ে এসেছে কিন্তু ওই অরণ্য অঞ্চলে তার স্বভূমিতে বলেই হয়ত আমি একজন মানুষ হয়েও নিমেষের জন্যে পাখিটাকে ভয় পেলাম। সে তার মত উড়ে গেল, আমি থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত তারপর পা চালাতেই নজরে এল দূরে আমার সোজাসুজি কেউ একজন লোক আসছে। ভাল ক'রে দেখার চেষ্টা ক'রতে মনে হ'ল যেন চেনা আর একটু কাছাকাছি হতেই দেখলাম, এ তো সেই হরিনন্দন সাউ! এই বনের মধ্যে দিয়ে ফিরছে কোত্থেকে?

জবাব পেলাম কাছে আসতে, কাঠমামারির জঙ্গলে গিয়েছিল গাছ কাটতে। আমাকে স্বভাষী পেয়ে বড় হৃদ্যতার সঙ্গেই বলল, আপনি এদিকে কোথায় চলেছেন?

কোথাও না—জানাতে সে যেন চমকে উঠে জানতে চাইল, কোথাও না মানে? শহর থেকে তিন ক্রোশ রাস্তা চলে এসেছেন আর বলছেন কোথাও না! আরে ভাই এই জঙ্গলে বাঘ সাপ হাতি কোন্ জানোয়ার নেই!

হাতি তো দেখলাম ওদিক দিয়ে যাচ্ছে।

সামনে পড়েননি বেঁচে গেছেন। ভাগ্য ভাল।

সামনে পড়লে কি মেরে ফেলত?

সে ভগবানই জানে। ওরা নিজেরাও জানে না। যত জানোয়ার আছে তার মধ্যে এই হাতিই সবচেয়ে বিপদজনক। ওদের মর্জি ওরা নিজেরাও সব সময় বুঝতে পারে না। কখন যে কি মতলব হবে কেউ বলতে পারবে না।

আপনি যে এই একা চলাফেরা করেন হাতির সামনে পড়েন নি কখনও?

আমি ওদের দেখলেই সাবধান হয়ে যাই। এখানকার জঙ্গলে এত হাতি আছে যে তার কোন গোণাগুনতি নেই। অজস্র।

আপনি কতদূরে গাছ কাটাতে গিয়েছিলেন?

পেছন ফিরে হাতের ইশারায় হরিনন্দন দেখাতে চেষ্টা ক'রল, ওদিকে প্রায় আধক্রোশ গিয়ে এই পথ ছেড়ে ডানদিকে জঙ্গলে নেমে যেতে হবে সেও প্রায় একক্রোশ।

আমি বেশ বিস্মিত হয়ে বললাম, এই দুর্গম বনে আপনি একা যাতায়াত করেন।

জঙ্গলেই যে থাকি। আমাদের কাছে ও সব কিছু নয়। আপনারা শহরের লোক জঙ্গল চেনেন না, জানেন না। আমরা কিছুটা এলাকা জানি এর মধ্যে কোনখানে বাঘের ডেরা আছে, কোনখানে আজ হাতিরা আসতে পারে বা গতকাল এসেছে এইসব। সব খবর রাখতে হয় নইলে জঙ্গলে চলাফেরা করা যায় না।

আমি দুচার সেকেন্ড চুপ ক'রে থেকে জানতে চাইলাম, কি ক'রে রাখেন?

এবার এই প্রথম সামান্য হাসতে দেখলাম হরিনন্দন সাউকে, বলল, আপনি এখানে থাকলে দেখবেন এসব খবর আপনিও পেয়ে যাচ্ছেন। চলুন এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

সেদিন সেই হরিনন্দনের সঙ্গেই ফিরে আসা। তবে সেদিন হরিনন্দনকে দেখে আমার খারাপ লাগল না। লোকটা কিভাবে বন কেটে বসত ক'রেছে, কিভাবে জমি দখল ক'রেছে, কত সুদে টাকা খাটিয়ে পয়সা রোজগার করে সে সব গৌণ মনে হ'ল। মানুষটা মন্দ নয়। সাহসী। চৌধুরীবাবুর কথাও মনে পড়ল, স্বীকার করেছিল যে সব সাহসীই বোকা নয়, উদাহরণ এই হরিনন্দন। যা শুনেছি রোজগার অনেকই ক'রেছে লোকটা কিন্তু কত সরল অহংকার নেই একবিন্দু। আমি যে সমাজের মানুষ সেখানে বিত্তের সঙ্গে বিলাস ও অহংকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আমাদের মানসিকতায় বিত্তবান নিরহংকার হলে বিশেষ প্রশ্রয় পায়। আর এই দুর্বলতার সুযোগে অনেক চতুর-ও তাই ছলনার সারল্যে আমাদের জয় ক'রে ফ্যালে এবং পরবর্তী কালে স্বচ্ছন্দেই করে আমাদের পদানত। এ ঘটনা বারবার ঘটে। আমরা ভোগ করি আবার বারংবারই করি সেই একই ভুল। মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল এবং হৃদয়াবেগ সম্পন্ন এক প্রাণীগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী আমিও তাই বিশ্লেষণ করি না, ঘটনাকে দেখি ঘটনার চোখ দিয়ে, ঘটমানকে দেখি বর্তমানের আলোতেই। সেখানে

অতীতের ছবি কাজ করে না, ছায়া এসে পড়ে না ভবিষ্যতেরও। তাই হরিনন্দনেরা পায় প্রাধান্য, শঠতার আর অন্যায়ের সিঁড়ি বেয়ে তারা ওঠে সমাজের চূড়ায় আমরা স্তব করি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যেকোন একটা চতুষ্পদ সমাজে বা আর দশটা পোকাদের মধ্যেও সত্য তো এই একই—যে বলশালী হয়ে উঠতে পারে অন্য সবাইকে বঞ্চিত করতে পারে, সেই হয় প্রধান, দলপতি অথবা ভীতিপ্রদ।

হরিনন্দন শহরে এল কিসের যেন টাকা জমা দিতে। আমিও ফিরে এলাম আমার হোটেলে। বেশ কিছুক্ষণ সময় এদিক সেদিক ক'রে কাটালাম। সময় যে এত দীর্ঘ তা আগে কে জানত! এসময় একজন সঙ্গী পেলে ভাল হত। কিন্তু সঙ্গী হিসেবে বিশেষ কারও কথা মনে হ'ল না, এমন কি অলকানন্দার কথাও নয়। মনে হচ্ছিল পাশের ঘরটিতে যদি কোন লোক থাকে তো যাই তার সঙ্গে কথা বলে আসি, অথবা যাই গিয়ে বসি চৌধুরী বাবুর কাছেই কেউ না কেউ নিশ্চয় থাকবে, হয় গল্প বলছে নয় আলোচনা ক'রছে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে, আমি না হয় নির্বোধ শ্রোতার মত বসে বসে শুনবই। সময় তো তবু কাটবে। কিন্তু তাও ঠিক মনঃপুত না হওয়ায় শুয়েই পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙ্গল অনুভব ক'রলাম আমার খুব শীত লাগছে। এদেশে এরকম হয় কিনা শুনিনি। কাউকে যে জিজ্ঞাসা ক'রব উপায় নেই। একা ঘরে নিঃসঙ্গ আমি। চারিদিক কাঠের দেয়াল ওপরে টিনের ছাদ। দু একটা টিকটিকি বা পোকা মাকড় হতে পারে আমার সহবাসী, দেখতে পাচ্ছি না তাদের কাউকে। সেদিন একটা বেজী কি করে ঘরে এসে ঢুকে পড়েছিল দৌড়ে, এখন যদি সেটাও অন্তত আসত হয়ত তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রতাম এমন এখানে হামেশাই ঘটে কিনা। উঠে একটা চাদর বা তেমনি কিছু জোগাড় করে গায়ে দেবার পরিকল্পনা ক'রতেই অনুভব ক'রলাম শুধু শীতই লাগছে না ব্যথাও শরীরটাকে বেশ দখল ক'রে বসেছে। ঘুমের মধ্যে আক্রমণ ক'রে সবাই কাবু ক'রে ফেলেছে আমাকে। উঠতে তো বটেই নড়াচড়া ক'রতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। কাজেই অতিকষ্টে বিছানার চাদরটাকেই জড়িয়ে নিলাম গায়ে। আরাম তাতে হবার কথা নয় তবু কোনমতে গুড়িসুড়ি মেরে পড়ে রইলাম উপায়ন্তর না থাকার জন্যই।

মনে আছে মধ্যে একবার কেউ আমাকে একটু জল আর বড়ি খাইয়েছিল ওষুধের। পরে শুনেছিলাম হোটেলের একমাত্র চাকর ছেলেটিই চৌধুরী বাবুর নির্দেশ মত ওষুধ খাইয়ে আরোগ্য ক'রেছিল আমাকে তৃতীয় দিন। সেদিনই ভাত খেলাম। কোম্পানীর যা আশা ক'রছিলাম তার পরিবর্তে পেলাম একখানা টেলিগ্রাম। ফিরে এসো। সেটি দেখে আমার কেমন যেন বিরক্তি এল এসবই তো অর্থহীন। এইসব কাগজপত্র, এই ব্যাগ বয়ে বেড়ানো সবই সমান নিরর্থক। এই কাজকর্ম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট উদ্যোগ সবই কেমন অকারণ মনে হ'ল। পৃথিবীর অন্যান্য রাশি রাশি কীট পতঙ্গের মত

আমিও জন্মমৃত্যু ব্যবধানের জীব। এই প্রাণটুকু রাখার জন্যেই এত আয়োজনের কোন মানে হয় না, বরং প্রতিমুহূর্তে আমাকে ছোট হতে হয়। অন্যের কাছে এত ছোট আর কোনপ্রাণীকে হতে হয় না। আর সব পোকা মাকড় জীবজন্তু সবাই স্বাধীনভাবে বিচরণ করে আপন মনের ইচ্ছায়। আমি বা আবদ্ধ থাকি কেন? আর আমার জন্যে কারই বা কি আসে যায়! নিজের ঘরে ঢুকে অফিসের কাগজ পত্র যত ছিল সব এক জায়গায় জড় ক'রে পুড়িয়ে দিলাম। কাছে সামান্য যা টাকা ছিল তা দিয়ে দেনা শোধ ক'রলাম হোটেলের, তারপর কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লাম আমার সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে। চৌধুরী বাবু বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, হঠাৎ চললেন নাকি?

আপাতত, জানালাম।

তার মানে? দু এক দিনেই ফিরবেন?

বলতে পারি না। অবস্থা যেমন হবে সেই রকমই ক'রব। হয়ত ফিরে আসতেও পারি নাও আসতে পারি।

চৌধুরী বাবু ভদ্রতা ক'রে বললেন, এদিকে এলে আবার আসবেন।

অকারণ এর উত্তর না দিয়ে পথে বেরিয়ে এলাম। পথে নেমে প্রথমেই মনে এল হরিনন্দনের কথা। কেন জানি না মনে হ'ল ওই লোকটির সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন। কিসের প্রয়োজন ভাবতে চেষ্টা ক'রলাম না, তার কাছে গিয়ে কি বলব তাও ভাবলাম না। কিছু করার নেই, কোথাও যাবার নেই এই জন্যেই যেন শুধু হরিনন্দনের কাছে যাওয়া।

খুঁজে নিতে বিশেষ কষ্ট হ'ল না, কষ্ট হ'ল পেঁছোতে।

চাংরাবাঁধা চা বাগানের এলাকায় পেঁছোতে লাগল সাড়ে চার ঘণ্টা, আর বাগান ঘুরে বাগানের এলাকা পার হয়ে কুলি বস্তি পার হয়ে হরিনন্দনের বাড়ী পেঁছোতে সময় আরও একঘণ্টা পার হয়ে গেল। ক্ষেত খামার ঘেরা বিশাল এক এলাকায় একটা কি দুটো হবে ঘর ক'রে নিয়ে তাতেই বাস করে যে হরিনন্দন সাউ, তার অবস্থান দেখলেও এ কথা বিশ্বাস করা যে কোন বাইরের লোকের পক্ষে নিশ্চিতভাবেই কঠিন যে ওই মানুষটারই পশ্চাৎপটে আছে অর্থের বিরাট একটা বল্মীক। আমি ওর কাছাকাছি পেঁছে খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করায় খুবই নোংরা এবং কদর্য চেহারার একটি নারী এসে আপন ভাষা খড়িবোলীতেই জানতে চাইল আমি কি কারণে খোঁজ ক'রছি।—আমি তার ভাষা জানি কি না জানি সে সব দুর্ভাবনা না করেই সে আমার দিকে প্রশ্নটা এমন ভঙ্গীতে ছুঁড়ে দিল যেন আমি তাকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। অথচ এইখানেই আমার সবচেয়ে দুর্বলতা। আমি নিজেই জানতাম না কি কারণে খুঁজতে এসেছি। কিন্তু এরকম একটি নিরক্ষর গ্রাম্য মহিলার প্রশ্নে বিড়ম্বিত হয়ে যাওয়া যেহেতু অতি লজ্জার অতএব আমি চট ক'রে বললাম, আমার আসবার কথা ছিল।

টাকার জন্যে? অনুমান ক'রে প্রশ্ন ক'রল মহিলাটি।

আমি অনুমান ক'রলাম টাকার জন্যে আমার মত ভদ্রজনেরা হয়ত মাঝে-সাঝে এই দুর্গম অরণ্য পর্যন্ত হাজির হয়। আমি একটু হালকাভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, টাকার জন্যে ছাড়া বাবুরা এখানে আসে না নাকি ?

মহিলা কথাটার সরাসরি জবাব না দিয়ে বলল, বাগানের বাবুরা আসে দরকার পড়লে টাকা নিয়ে যায়।

আমি বাগানের বাবু নই। পাটনা থেকে এসেছি।

কয়েকটা কথার যে কি শক্তি থাকতে পারে সেদিন আমি দেখেছিলাম আজও ভুলিনি। আমার কথা ক'টি শোনামাত্র মহিলার শরীর বিদ্যুতের মত গতিশীল হয়ে গেল। চট ক'রে কোথা থেকে নামিয়ে আনল একটা খাটিয়া, বলল, আপনি দেশের লোক, অতিথি; বসুন।—পরক্ষণেই বলল, আমি কথা শুনেই বুঝেছি। এখানের লোবেদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলা যায় না, বোঝা যায় না কি বলে। চা বাগিচায় দেশোয়ালী মদেশীয়রা কাজ বরে তাদের সঙ্গেই যা কথা বলি। এখানে লোকই নেই তায় দেশের লোক—

আমি তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, এ তো একেবারে জঙ্গল।

মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার ক'রল এ তো, জঙ্গলের ভেতরেই বাস। বাঘ-ভালুক হাতি সব আশেপাশেই আছে। গতকাল একটা হাঁস গিলে নিয়েছে ময়াল সাপে।

কার হাঁস ?

আমার ছোট ছেলে সখ ক'রে পুষেছে বাবু।

কি ক'রে খেল ?

আমি যত না আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন ক'রলাম ততোধিক আশ্চর্য হ'ল সেই। যেন আমার বোকামীকে বিদ্রূপ করার জন্যেই বলল, গিলে খেল !

আমি বললাম, ময়াল সাপ তো বিরাট। এখানকার বনে জঙ্গলে আছে বুঝি ?

এখানকার বনে জঙ্গলে !—বথাটা কেমন ভাবে যেন উচ্চারণ ক'রল মহিলাটি, তারপর একটি ফুৎকারের ভঙ্গীতে বলল, এখানে তো সবই জঙ্গল। আপনি তো এখন ঘন জঙ্গলের মধ্যেই আছেন। ময়াল সাপ তো আমাদের বাড়ীর আশেপাশেই থাকে, আমাদের সঙ্গেই বলতে পারেন।

মহিলাটি অতি গ্রাম্য এবং অশিক্ষিত। দেশে এই সব মেয়ের মুখ দেখতে পাওয়া একমাত্র মহিলাদের ও স্বামীর পক্ষেই সম্ভব। এত কথা যে এই হাঁসুলীবতী কোথায় শিখল এ রহস্য উদ্ঘাটন একান্তভাবেই অসম্ভব। আমি এরকম কোন মেয়েমানুষকে জীবনেও এভাবে কথা বলতে দেখিনি। আমার ভাবনাকে অবসর না দিয়ে মহিলা বলল, আপনি এখানে থাকুন বাবুজী, উনি এসে যাবেন।

কতক্ষণে আসবে ?

ও তো বলতে পারব না। এখনও এসে পড়তে পারে আবার কালও আসতে পারে—

অবলীলাক্রমে বলা এই কথা ক'টি শুনে আমি বেশ ভাবিত হলাম। বলে কি! জানতে চাইলাম, এরকম হয় নাকি?

হামেশা হয়। দূরে অন্য কোন জায়গায় কাজের জন্যে চলে গেলে এক দু'দিন আসতে পারে না তো।

কথাটা শুনে আমি মুষড়ে পড়লাম। তাহ'লে উপায়। এখন যদি না-ই আসে হরিনন্দন কি তাহলে উপায় হবে! সে এলেই বা কি এমন পথ খুলে যাবে তাও জানতাম না তবু সে না থাকাটাই যেন বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। হরিনন্দনের বাড়ী বলতে তো দেখছি ওই একটা মাত্র ঘর—বিরাট বিরাট কতগুলো শাল গাছের খুঁটি ক'রে বোধহয় সাধারণ দোতলার চেয়ে উঁচুতে একখানা ঘর। নিচে কিছু নেই—রাত্রে জন্তুজানোয়ারদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। অপ্রতিহত গতিতে তারা ঘুরতে পারে। ঘরের চারপাশে অনেকটা দূর পর্যন্ত ক্ষেতখামার ক'রে পরিবেশ এমনি ক'রে রেখেছে যে দেখলে মনে হবে হরিনন্দনের বাড়ীটা আসলে ক্ষেত পাহারা দেবার ঘর। তা অবশ্য দিতে হয় মাঝে মাঝে। সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়, হাতির দল কোন রাত্রে এসে পড়লে সেই আগুন থেকে মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে সমানে তা নাড়তে থাকে হরিনন্দন আর তার বউ। ছেলেগুলো টিন পেটাতে থাকে ঘুমন্ত পাখিদের হৃৎপিণ্ডে ধড়ফড়ানি জাগিয়ে। সংবাদটা পেলাম আরও কিছুক্ষণের ঘনিষ্ঠ আলাপের পর হরিনন্দনের স্ত্রীর কাছ থেকেই। সেই জানাল, অন্য জন্তু জানোয়ার থেকে ভয় প্রাণের সে তো আগলানো সহজ, সম্পত্তি আগলানো কঠিন। তবে হ্যাঁ ভালুকেও মাঝে মাঝে ক্ষেত নষ্ট করে।

আমি আমার সহজাত সংস্কার বশে প্রশ্ন ক'রে ফেললাম, এই গভীর বনে এত অসুবিধের মধ্যে থাকেন কি ক'রে?

প্রতিপ্রশ্ন ক'রল মেয়েটি, কি ক'রব বলুন? না থাকলে এত জমি দেখব কি ক'রে? বন কেটে যে সব জমি বের করা হয়েছে না দেখাশোনা ক'রলে তো আবার বন হ'য়ে যাবে।

দেশে যাওয়া হয় কিভাবে?

এখানে আসবার পর দুবারই গিয়েছি প্রথম দিকে, তারপর আর যাওয়া হয়নি। উনি তো প্রায়ই বলেন একবার দেশে গিয়ে গ্রামের কিছু লোককে নিয়ে এসে বসাবেন তাও যাওয়া হচ্ছে না! গ্রামের লোক আর কয়েকজন এলে তবু একসঙ্গে থাকা যাবে।

আসবার মত লোক আছে?

কত আসবে! প্রচণ্ড বিশ্বাসের সুরে বলল মহিলা, আবার যোগ ক'রল, ওখানে অনেক লোকই আছে যাদের এক কাহনমা জমিও নেই। এখানে এলে তারা বিশ-পঁচিশ বিঘার ক্ষেত করতে পারবে, আসবে না কেন? জঙ্গলের ভেতরে ওই পশ্চিম দিকে কত নেপালী এসে বসে গেছে জানেন? বহু নেপালী।

আপনি কি করে জানলেন ?—আমি জানতে চাইলাম।

বাবুজী এসে গল্প করে। ও সব শুনে আসে শহরে, বহুত খবর শুনে আসে, আমাকে এসে বলে।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মহিলাটি তার হাতের কাজ সারছিল, এবার ঢুকে গেল ক্ষেতে। তার কাজ করার অনায়াস ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারছিলাম হরিনন্দন সাউ নামক কপর্দকশূন্য ভাগ্যান্বেষী লোকটির হরিনন্দনবাবু হবার পেছনে এই মহিলাটির অবদান অনেকটাই। সে লোকটা এই বিশাল ভূসম্পত্তির দায়িত্ব ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে সুদ আদায় ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারে শহরে চা-বাগানে। মানুষ তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সূত্রে বিশেষ যা লাভ করে তার নাম অবিশ্বাস এবং অনির্ভরতা। নির্ভর করতে পারার মত সঙ্গী পাওয়া আর বিশ্বাস ক'রতে পাবার মত মিত্র পাওয়া তাই মানুষের পরম সৌভাগ্যগুলোর মধ্যে একটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষ আমি, বিশ্বাস করি বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কের মধ্যে কার্য-কারণ এবং যৌগিক প্রক্রিয়ার মূল সূত্র। আমি কোন ভাবাবেগবাদে বিশ্বাসী নই যে বিশ্বাস ক'রব ভাগ্য, বিধিলিপি বা এবম্বিধ অতিপ্রাকৃত ভিত্তিহীন ঘটনা। তাই এ বিশ্বাস আমার ধ্রুব যে হরিনন্দনের যে অর্থার্জনের যন্ত্র তার দুটো অংশ—সে নিজে আর একটা তার স্ত্রী। এক আর এক যোগ ক'রলে যেমন দুই নামক একটি অমোঘ সত্যের সৃষ্টি হয় তেমনি হরিনন্দন আর স্ত্রী বোধকরি তখন ছিল সমান দুটি সংখ্যা। বাইরে থেকে কারও বোঝবার উপায় ছিল না। কিন্তু আমি সেই অবসর সময়ে গিয়ে বুঝে গিয়েছিলাম মহিলার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়ে। আর সে আলাপ ছিল একেবারে আপন জনের মত—যেমন বাপের বাড়ীর লোককে দীর্ঘদিন পরে স্বামীর ঘরে পেয়ে আলাপ করে দূরে বিয়ে হওয়া কোন গ্রামীন মেয়ে। এও তো তাই। হরিনন্দনের স্ত্রীর কাছে আমিও তো সেই রকমই ; বরং বেশী, বাপের বাড়ী এবং শ্বশুর বাড়ীরও। দেশের লোক। বিদেশে, বিশেষত ওই বিজন বনে দেশের লোকের মূল্য বাপের বাড়ীর লোকের চেয়ে অনেকাংশে বেশী বলেই অল্পক্ষণ বাদে জমি থেকে ছিঁড়ে আনা ভুট্টা আগুনে সেঁকে এগিয়ে দিয়ে হরিনন্দনের স্ত্রী বলল, বিদেশে এসেছেন কোথায় কি খাবার জুটবে ঠিকানা নেই এটা খেয়ে নিন। অল্পক্ষণ বাদে একবাটি দুধও এসে গেল।

সব তো হ'ল আমি সংকটে পড়লাম হরিনন্দনকে নিয়ে, যদি সে না আসে তাহ'লে এই বনের মধ্যে কোথায় যাব এখন ? মনে হ'তে লাগল কেন এলাম ? এই বনের মধ্যে আসবার কি এমন প্রয়োজন ছিল ! রাগ হতে লাগল নিজের খামখেয়ালীপনার জন্যে, নিজের ওপরেই। দুধের বাটি আমার সামনে নামিয়ে রেখে সেই যে হাঁসুলি পরা দেশোয়ালী বউটা উধাও হ'ল গাছ-গাছালির মধ্যে, আর তার দেখা নেই। একা আমি বসে আছি আর ভাবছি যত আজগুবি সব কথা। হঠাৎ কোত্থেকে দুটো

ছেলে এসে হাজির এক এক বোঝা কাঠ মাথায় ক'রে। ঘরের নিচেটায় দাঁড়িয়েই ডাকল, এ মাঈ!

চেহারা দেখে অনুমান ক'রলাম ছেলে দুটি হরিনন্দনেরই হবে। কারণ হরিনন্দনের বউকে দেখে বুঝেছিলাম পয়সার ছায়া তার পরিবারের ওপর পড়েনি। বাইরে লোকালয়ে হরিনন্দন বাবু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পরিবারবর্গের অজান্তেই। আর সব মিলিয়ে বাইরে কিছু পরিবর্তন এলেও মানসিকতায় তারা সেই পুরাণো অবস্থাতেই রয়ে গেছে। কাজেই জঙ্গলের ঠিকাদার এবং ভদ্রলোকের মহাজন হলেও হরিনন্দনের ছেলেদের পক্ষে মাথায় কাঠের বোঝা বয়ে আনা সম্ভব, এখনও নিজের এলাকায় এই বিজন বনে সম্ভব হয়ত হরিনন্দনেব পক্ষেও। বড় ছেলেটি মাথার বোঝা ধপ ক'রে মাটিতে ফেলে ছোটটিকে সাহায্য ক'রল মাটিতে ফেলতে, তারপর আমার দিকে নজর পড়তে কেমন যেন বিস্মিত হয়ে পড়ল, আর একবার যে তাদের মাকে ডাকবে তাও তাদের হয়ে উঠল না। তারা ঘবের ওপবে উঠে ঢুকে গেল আমি বুঝলাম না সেটা আত্মগোপন করবার জন্যে কিনা। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল ছেলে দুটো আর একবার অমনি ক'রে ডাকলে ভাল হয়। নির্জনতা যদিও বা সহ্য করা সম্ভব কিন্তু অসম্ভব এই একাকীত্ব। ওদের মা সেই যে কোথায় ঢুকে গেল আর বেরোচ্ছে না কিছুতেই। এদিকে বেলা পড়ে আসছে, সূর্য ঢলে আসছে, ক্রমাগত ছায়া হচ্ছে দীর্ঘতর। আমি আসলে উতলা হচ্ছি হরিনন্দনের জন্যে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সেটা গিয়ে তার স্ত্রীর ওপরে পড়ছে কারণ আমি যাকে খুঁজছি সে প্রেক্ষাপটের বাইরে। আমার অনিশ্চিত অবস্থা কাটাবার জন্যে ভরসা এখন ওই মহিলা যার হাতে গলায় পায়ে অতি কদর্য-মোটা হাঁসুলি, যাব চেহারা রুক্ষ্ম রস শূন্য, যাকে আমরা সভ্য মানুষেরা ভদ্র বলব না কোনদিন আমাদের সামাজিক এক্তিয়ারের মধ্যে পেলে। অথচ মনে হচ্ছে তারই করুণা এখন আমার অত্যধিক প্রয়োজন।

আমি যেদিক দিয়ে এসেছিলাম তার বিপরীত দিকে, এখানে বসেই বোঝা যাচ্ছে বিশাল গাছের বন। ক্ষেতটার ওপর দিয়ে সবুজ হয়ে আছে গাছগাছালির মাথাগুলো, দেখা যাচ্ছে। সে সব বিশাল মহীরুহ, এত ঘন তাদের রঙ যে সবুজ না হয়ে কালো মনে হচ্ছে। আসবার পথে দেখেছি চা বাগানের ভেতরেও অমনই বড় বড় গাছ অনেক সঙ্গী হারিয়ে মাঝে মাঝে এক একটি ছন্নছাড়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও নিশ্চয় ছিল তাদের গোত্রজরা। নেই। হরিনন্দন তাদের হত্যা এবং শেষকৃত্য ক'রেছে। কারণ তার জমির প্রয়োজন ছিল সে যতটা পেরেছে দখল ক'রেছে অরণ্যভূমি, উৎসাদিত ক'রেছে প্রকৃতির সন্তান সেই সব সুবিশাল বিটপীকে যারা হয়ত সৃষ্টির আদিকাল থেকে বংশানু-ক্রমিক ধারাবাহিকতায় বাস ক'রে এসেছে এই অঞ্চলে, আশ্রয় দিয়ে এসেছে অসংখ্য কীট-পতঙ্গ পাখি আর ভূচর প্রাণীকে। যেদিকে বন ঘন, ফসল ফলানো ওষধিগুলোর মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘন সবুজ জমাট অন্ধকার সেই দিকেই চেয়েছিলাম

কারণ আমার সাম্ভাব্য আশ্রয়দাত্রী শ্রীমতী সাউ কৃষি ভূমি পেরিয়ে গেছে সেই বনভূমির দিকেই। হঠাৎ দেখলাম বড় ছেলেটা ঘর নেমে আসবার জন্যে সিঁড়িতে পা রেখেছে, ডাকলাম। সে আমার কাছে আসতে জিজ্ঞেস ক'রলাম, তোমার নাম কি ?

মিশ্র উচ্চারণে সে জবাব দিল, জগদীশ।

ভাই-এর নাম কি ?

সে প্রতিপ্রশ্ন ক'রল, কোন ভাই-এর ?

একটু আগে যাকে দেখলাম ?

নরেশ।

আমার আন্দাজ তো মিলেই গিয়েছিল তবু বুঝতে চাইলাম, তোমার বাবা কোথায় ?

এক কথায় জানাল, চা বাগানে।

কখন আসবে তার জবাব দিল না। হয়ত জানে না। খুবই সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় ছেলেটি। অতটুকু ছেলে আর কি বা আলাপ করা যায় তার সঙ্গে ? হঠাৎ একটা দরকারী কথা মনে পড়ে গেল, জানতে চাইলাম, তোমরা কি ওপরে ওই ঘরেই থাক ?

মাথা নাড়ল।

ক'খানা ঘর ওখানে আছে ?

এক।

আমি মুষড়ে পড়লাম। মনে মনে আশা ক'রে এসেছিলাম রাত্রিবাস এখানেই ক'রব। অন্তত একরাত্রি। কি ক'রে তা হবে ? হরিনন্দন না থাকলে তো কথাই নেই সে থাকলেও তো সম্ভব হ'ত না, থাকতে দেবে কোথায় ? আমার আসাই তো বোকামী হয়েছে। এখন যে ফিরে যাব সে পথও বন্ধ। ফিরবই বা কোথায় ? হোটেল ? ক'দিন বা থাকব সেখানে ? কি ক'রে থাকব ? সূর্য নেভার আগেই সামনে নেমে এল অন্ধকার। নাঃ এভাবে চাকরীতে ইস্তফা দেওয়াটা ঠিক হয়নি। ঠিক অনেক কিছুই হয়নি, এখন মনে হচ্ছে, ঠিক হয়নি অমন আচমকা কলকাতা ছেড়েও। হ'লই বা পোকার মত জীবন তাতে কি ? কি ক্ষতি তাতে ? কে পারে সেই প্রকৃতি প্রদত্ত জীবনযাত্রার বাইরে যেতে ? আমি এই ছিটকে বেরিয়ে এসেই বা কি পেয়েছি ? সেই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যেই ঘুরছি, আজ ঘুরছি আশ্রয়ের সন্ধানে। আর আজ দীন ভাবেই ঘুরছি। যে কোন নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবের চেয়ে দীন অবস্থা আজ আমার। সে তো তবু যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় অক্লেশে কাটিয়ে দিতে পারে তার বেঁচে থাকার কাল, আমি পারছি কই ! যেটুকু স্বাধীনতা একটা পোকার জীবনে আছে তার সিকিমাত্র ভাগ থাকলে এখন আমি বিরাট অ-সুখ থেকে বাঁচতে পারতাম, স্বস্তি পেতাম। এখন পরাশ্রয় এবং অনুগ্রহই একমাত্র পথ আমার। এই আশ্রয় অথবা অনুগ্রহ আবার এমনই লোকের কাছে আশা করছি যার কাছে তা পাওয়া হয়ত একান্তভাবেই অসম্ভব।

অথবা এমন লোকেরই অনুকম্পা প্রার্থনা ক'রতে এসেছি 'অনুকম্পা' বস্তুটির সঙ্গেই যার অপরিচয় আজন্ম। তার চেয়ে ভাল কলকাতাতেই ফিরে যাওয়া। সেখানে এখনও সব হারিয়ে যায়নি, এখন পর্যন্ত ফিরে পাওয়া যেতে পারে সেই পুরানো জীবনের ধারাবাহিকতা। তবে কি ফিরেই যেতে হবে? আবার সেই জীবনে যেখানে অলকানন্দাকে ঘিরে সেই পোকাটির মত রতিসুখমগ্ন বেঁচে থাকা আর পৃথিবীর শস্যধ্বংসী সার্থকতায় পেলব মেদবৃদ্ধি? সেই ছোট্ট বদ্ধ ঘরে একটি পিঁপড়ের গর্তের মত চট ক'রে ঢুকে পড়া আবার বেরিয়ে আসা? এই উদার মুক্ত বনভূমির মধ্যে বসে আমার মনে পড়ল কলকাতার কথা, সরুগলির মধ্যে ছোট্ট দরজা দিয়ে এঁদো ঘরে টুপ ক'রে কেমন ঢুকে পড়ে মানুষগুলো, চট ক রে কেমন বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। বর্ষার আগে ছোট ছোট লাল পিঁপড়েগুলো যেমন মুখে কিছু খাবার নিয়ে সারবন্দী ঢুকতে থাকে আপন বিবরে, কলকাতার জীর্ণ শীর্ণকায় মানুষগুলোকে দেখতাম হাতে একটা শালপাতায় মোড়া কয়েকটুকরো মাংস নিয়ে কিংবা চারটে ফুলুরী চলত নিজের ঘরের দিকে, যেগুলোকে ঘর না বলে ঘুলঘুলি বললেও কোন দোষ হবার কথা নয়। সে যেন কেমন লাগে আমার, মনটা কেমন যেন ক'রে, অনেকটা গা ঘিন ঘিন করারই মত। সে যেন কেমন ভাবে বেঁচে থাকা যা আমি ব্যাখ্যা ক'রতে পারছি না। অনুভব করি কিন্তু বোঝাতে পারি না, এ কি শুধু গতানুগতিকতার বিরোধিতা? তা নয় কারণ জীবন মাত্রেই তো মৃত্যু পর্যন্ত গতানুগতিক, আবার জন্মানো মরা জন্মানো মরা—এই যে পৌনপুণিক আবর্ত এও তো গতানুগতিক, অতএব এর বাইরে যাবার কি পথ? এই যে বিশাল বিশ্ব এও তো গতানুগতিক। অবশ্য যদি মহাকালের দৃষ্টিতে দেখবার ক্ষমতা কারও থাকে তবে হয়ত দেখবে এ এক নিত্যপরিবর্তনশীল গতিময় চিরনূতন বিশ্ব। ব্যাপ্ত দৃষ্টি দিয়ে ক্ষুদ্র বস্তুকে দেখলে যেমন দেখা যায় তেমন কি দেখা যাবে বিশালকে ক্ষুদ্র ক্ষমতায় দেখলে? অংশমাত্রই যেখানে দৃশ্য সেখানে দেখাটাও অন্যরকম। আমরা পৃথিবীকে যেটুকু সময়সীমায় দেখি আমাদের পৃথিবী ততটুকুই, সেইটুকুতেই আমাদের আলোচনা এবং সেইটুকুতেই আমাদের বিচার। তাও আবার ভাগ করা থাকে অতি সামান্য আয়ুর পরিপ্রেক্ষিতে। আমাদের কাছে এটাই সত্য। হঠাৎ মনে হ'ল সত্য তো তাহ'লে আপেক্ষিক! ধ্রুব নয়। এই পৃথিবীতে আপেক্ষিক তো সবই। তাতে তারতম্য কি ঘটে পৃথিবীর? আর সমস্ত কিছু আপেক্ষিক এবং অস্থায়ী বলেই বোধহয় পৃথিবীতে আছে বৈচিত্র এবং সৌন্দর্য। নইলে এই পৃথিবী বৃদ্ধ হয়ে যেত আমরাও বিরক্ত হয়ে পড়তাম, বিব্রত হতাম নিজের ওপরেই বিতৃষ্ণার ভারে।

আমার ভাবনাকে ছিঁড়ে হরিনন্দনের স্ত্রী সামনে এসে দাঁড়াল এক মানুষ উঁচু ভুট্টা গাছগুলোকে ঠেলে সরিয়ে, ফাঁক ক'রে। নিজেই বিস্মিত হলাম নিজের তন্ময়তায়, গাছ সরানোর খসখস, ঝরাপাতা মাড়ানোর মর্মর কিছুই কানে যায়নি আমার। এমনি ভাবে অকস্মাৎ যদি সামনে এসে দাঁড়াত কোন বুনো জানোয়ার! কিছু একটা কথা

বলবার জন্যেই প্রশ্ন ক'রলাম, এইভাবে একা বনের মধ্যে চলাফেরা করেন ভয় করে না ?

মহিলাটি নিজেকে হরিনন্দনের যোগ্য সহধর্মিণী বলে প্রমাণ করবার জন্যেই যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রতিপ্রশ্ন ক'রল, ভয় করবে কেন ? ভয় করবার মত মানুষ এখানে কোথায় ?

এই বিচিত্র জবাবে এবার বিস্মিত হবার পালা এল আমার, ভয় কি শুধু মানুষেই বনের জন্তুদের নয় ?

আমি তো তাদের বাসের এলাকায় যাচ্ছি না।

এটাও কি তাদের এলাকার মধ্যে পড়ে না ?

তারা জানে এদিকটায় অন্যরকম একরকম প্রাণী থাকে অতএব নিঃসংশয়ে যাতায়াত করা মুস্কিল। মানে ওরাও মানুষকে ভয় পায় বলেই এদিকটায় আসে না। পরস্পরকে ভয় করি বলেই অবিশ্বাস করি আর অবিশ্বাস করি বলেই সহঅবস্থিতির সর্ত মেনে নিয়েছি আমরা।

আমি অবাক হলাম এই নিরক্ষর মহিলার কথাগুলো শুনে। এমন গুছিয়ে এমন সুন্দর কথা বলতে পারার জন্যে যে মুন্সীয়ানা প্রয়োজন তা কি ক'রে আয়ত্ব ক'রল এই বনবাসিনী ! সমস্ত দিনে যে লোক বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ কদাচিৎ পায় সে কেমন ক'রে কথা বলে এমন সাজিয়ে গুছিয়ে ! আমি কোন জবাব দিতে না পেরে জানতে চাইলাম, বনের প্রাণীদের এতটা বিশ্বাস কি করা যায় ?

বিশ্বাসের কথা তো বলিনি, অবিশ্বাস করি আমরা সবাই সবাইকে। সজাগ হয়ে থাকি, তাই টিকে থাকি। তবে এই এত বছরের দেখায় আমার কি মনে হয় জানেন, ওদেরকে আমরা যতটা ভয় করি ওরা আমাদের তার চেয়ে অনেক বেশীই করে।

কেন ?

ওরাই জানে। কি ক'রে যে এই ভয় ক'রতে ওরা শেখে কে জানে ?

এ কথার আমি কোন জবাব দেবার আগেই মহিলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। আমার মনে হ'ল ভয় জিনিষটা প্রাণীর স্বভাবগত, চেতনার ক্ষণ থেকেই এটা সবাই মনের মধ্যে লাভ ক'রে থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণার মতই স্বভাবজ এটা। পরক্ষণেই মনে হ'ল সত্যিই কি স্বভাবগত এটা ? চেতনার ক্ষণ থেকেই কি মনের মনে জন্ম হয় ভয়েরও ? তাহ'লে একদম ছোট্ট যে শিশু সদ্য জন্মেছে অথবা যে শিশু পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত নয় তাকে তো কই ভয় পেতে দেখিনা ! অনেক সময় লক্ষ্য ক'রেছি ছোট্ট শিশুকে ভয় দেখাবার চেষ্টা ক'রলে, যেমন বকলে বা ধমকালে বা চড় দেখালে সে অপলক চোখে চেয়ে থাকে, যেন কিছুই হয় নি। সে তো ভয় পায় না ! গরুর ছোট্ট বাছুর কে দেখেছে যেদিকে সেদিকে নির্দ্বিধায় চলে যায়। কোন কিছুকেই ভ্রুক্ষেপ করে না, ভয় থাকলে সে কি ক'রে পারত ? কিন্তু ভয় তো ভিতরের অভিঘাত, বাইরে তার প্রকাশ পরবর্তী স্তরে। শিশু যে ধমকালে বা চড় দেখালে ভয় পায় না, কি ক'রে বুঝছি ?

হয়ত সে প্রকাশ ক'রতে শেখেনি বলে তার ভয়টাকে প্রকাশ ক'রতে পারে না, অথবা সে সদ্য আসা জায়গার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত নয় বলে আনন্দ ও বেদনা কিছুরই উৎস চেনে না। তাই যে ঘটনায় ভয় পাওয়া অন্যের পক্ষে বা পরবর্তীকালে তার পক্ষেই সম্ভব সেই ঘটনায় ভয় সে অপরিচিতির জন্যে এখন পায় না। ভয় সম্পর্কিত ভাবনার মধ্যে কোনও এক অবসন্ন ক্ষণে আমার পুরানো ভয়টা বুকের মধ্যে চেপে বসল বেশ শক্ত হয়ে। দিনের আয়ু আর বেশীক্ষণ নয়, যদি এর মধ্যে ফিরে হরিনন্দন না আসে তাহ'লে কি ক'রব আমি? হরিনন্দনের কথা যে আর একবার তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস ক'রব সাহস হচ্ছিল না। অথচ অনেকক্ষণ ধরেই মনের মধ্যে সেই একই ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন যেন সেটা আর নড়ছেই না। যদি না ফেরে হরিনন্দন কোথায় এই রাতটা কাটাব তাহ'লে? সে এলে যা হোক একটা ব্যবস্থা যে হবেই অন্তত একটা ব্যবস্থা তার অনিচ্ছা থাকলেও ক'রে নিতে পারব এ যেন অনেকটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই ভাবছি এখন। অথচ এইসব স্তরের লোক যে কি পরিমাণ রক্ষণশীল তা আমার অজানা নয়, খুঁটির ওপরে দেখছি একখানাই ঘর আছে। ওই ঘরে ওদের সঙ্গে থাকতে দিতে কিছুতেই রাজী ওরা হবে না। কুলি বস্তির মধ্যেও এমন কোন অতিথিশালা কেউ বানিয়ে রাখে নি যে হরিনন্দন এসে অতটা পথ নিয়ে গিয়েও অন্তত আমাকে সেখানে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে! তবু কেন যেন জোর ক'রেই বিশ্বাস ক'রছিলাম তার ওপরে এই জন্যেই যে, যে লোক এই গভীর বনের মধ্যে এসে বসত ক'রতে পারে, খুঁজে বের ক'রে নিতে পারে গুপ্তধন, সে আরও অনেকিছু পারে, তার পক্ষে আমার জন্যে এক রাত্তিরের শোবার ব্যবস্থা করা অনায়াসেই সম্ভব। তার কাছে যেন সমস্যা সমাধানের জাদু দণ্ড আছে, ঘোরালেই মুস্কিল আসান।

হরিনন্দনের স্ত্রীকে ঘর থেকে নামতে দেখে রসনা উত্যক্ত হ'ল, ফস ক'রে জিজ্ঞেস ক'রে ফেললাম, আচ্ছা ওপরে ঘর ক'টা আছে?

একটাই তো ঘর।

ও—বলে থামলাম কিছুক্ষণ। মনের মধ্যেকার দুশ্চিন্তার চাপে আবার প্রশ্ন ক'রে ফেললাম, কোন অতিথি এলে থাকতে দেওয়া হয় কোথায়?

অতিথি! শুনে যেন হাতের কাজ হাত থেকে খসে পড়ল মহিলার, বলল, এই জঙ্গলে অতিথি কোথা থেকে আসবে? আমি প্রশ্নটা শুনে লজ্জিত হয়ে পড়লাম, যেন খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। শহরের মার্জিত মানুষ হলে যেভাবে জবাব দিত হরিনন্দনের বউ তার বিপরীত জবাব দেওয়াতেই বেশী লজ্জার কারণ ঘটল আমার। এখানে আমার আসবার যে কোন যুক্তি থাকতে পারে না এবং এদের আতিথ্য গ্রহণ করতে চাওয়া যে আমার তরফে সর্বৈব অসঙ্গত এই ক'টি সত্য যেন হরিনন্দনের গৃহিণী আমাকে স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিল তার সামান্য কথাতেই। পৃথিবীতে আলো সরলভাবে জ্বলে, বাতাস সরলভাবেই বয়, পাখি সরলভাবেই ওড়ে, গাছ সরলভাবেই

বাড়ে তবু আমার মনে হ'ল মানুষ সরলভাবে কাজ ক'রলে তার অভীপ্সা পূরণ কিছুতেই হয় না। জটিল তাঁকে হতেই হয়, কখন ইচ্ছায় অনিচ্ছাতেই কখন হয়ত বা। আমিও মনে মনে একটা প্রয়োজন খাড়া ক'রতে লাগলাম। এমন একটা প্রয়োজনের কথা হরিনন্দন আসা মাত্র বলতে হবে যার দ্বারা সে ভাববে যে আমি আসায় তারাই কৃতার্থ হয়েছে, আমি অনুগৃহীত হইনি। মনে পড়ল প্রথম আলাপের দিন ওষুধ চেয়েছিল হরিনন্দন। আমার ব্যাগে নানারকম ওষুধের মধ্যে নমুনা দু চারটে পড়ে থাকতে পারে, কি আছে কি নেই কে জানে, আছে কি নেই তারই বা ঠিক কি? এখনই একবার দেখে নেওয়া দরকার। বিছানা আর ব্যাগ একপাশে রেখেছিলাম সাজিয়ে, ব্যাগটা খুললাম। হাতড়ে প্রথমেই পেলাম তিন পাতা ঘুমের বড়ি, সভ্যতার সঙ্গে যার সম্পর্ক ওতপ্রোত। এখানে, এই প্রকৃতির রাজত্বে ঘুম এবং জাগরণ যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত, সেখানে কি হবে এই সভ্যতার অভিশাপের প্রতিকারের মাদুলী জড়িয়ে। আর পাওয়া গেল ক' শিশি পেটের গোলমালের ট্যাবলেট। যাক এটা তবু কাজে লাগবে, তবে আসল যা সে চেয়েছিল তা হচ্ছে জ্বরের ওষুধ। হরিনন্দন চেয়েছিল না জেনে, কারণ এখানে যে জ্বর তার ওষুধ আমাদের কাছে নেই। এখানে প্রয়োজন ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের অমোঘ ওষুধ সেই কুইনাইন এবং ডাঃ ইউ এন ব্রহ্মচারীর আবিষ্কারটি। সে আমার নেই। আসলে সেটাই চায় হরিনন্দন। তাহ'লে? এখন উপায়? ভরসা কেবল ওই পেটের অসুখ সংক্রান্ত ওষুধ ক'টি। কিন্তু সেও তো আবার সাধারণ পেটের গোলমালের ব্যাপারে কার্যকর নয়—জটিল ধরণের গোলমাল এবং যদি গুরুতর হয় তবেই বিশেষ ক্ষেত্রে এ ওষুধ ক্রিয়াশীল হবে। কিন্তু মিথ্যাচার ক'রতেই হবে আমাকে, শুধু বলতে হবে পেটের গণ্ডগোলের ওষুধ এটা। ঘুমের ওষুধকে বলতে হবে বেশী কোন যন্ত্রণার ওষুধ, গর্ভযন্ত্রণা ছাড়া। আর একটা কথা কখনই তাকে বলা যাবে না যে ওষুধ কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছি আমি। সে কথা বলে ফেললে আমার দাম থাকবে না কানাকড়িও। চট ক'রে অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল, এ একরকম ভালই হ'ল পাটনার কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে যখন আর যাচ্ছিই না তখন কি প্রয়োজন এই ওষুধগুলো বয়ে বেড়ানোর, যা আছে ঝেড়ে ঝুড়ে হরিনন্দনকে দিয়ে হালকা হবো। এ পর্যন্ত যা বয়েছিলাম এখানেই উপুড় ক'রে দেব সেই মনের ভার। মুক্তি, তার স্বাদ প্রকৃত মুক্তির মতই হবে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই যে লম্বা পথটা—এটা কোনভাবে শেষ ক'রতেই যখন হবে তখন যেভাবেই হোক পেরিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে আসল। ক'লকাতায় আমাদের হোস্টেলের সামনে দিয়ে এক পাগলকে দেখতাম বিশাল দুটো পোঁটলা বয়ে বেড়াত। বহুদিন তাকে ওই ভাবেই পথ চলতে দেখেছি কোনদিন সে বোঝা কমতে দেখিনি বরং দিনের পর দিন, লক্ষ ক'রেছি, তা বেড়েই গেছে। শেষ দিকে দেখতাম সেই বোঝার ভারে সে খুব কষ্ট ক'রেই পথ চলত। সে-ও তো এই পথটুকুই চলছে,

এখনও আছে হয়ত, চলছে সেই একই ভাবে। আবার জীবন ব্যানার্জীকে দেখেছি বেহালা বাজিয়ে সংসারের কোন দায় না ধরে চালিয়ে গেল হালকা জীবন। মা মরল পুড়িয়ে এসে বেহালা নিয়ে বসল। তার ছিল ধানের জমি, কে একদিন পাকা ধান কেটে নিয়ে গেল। খবরটা যখন এল তখনও বেহালা বাজাচ্ছে জীবন ব্যানার্জী, শুনে মাথাটা নাড়ল মাত্র। সে-ও তো চলছিল সেই জন্মমৃত্যুর মাঝখানের পথটুকু! সবাই তাই। মানুষ থেকে সুরু করে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই ভাবে চলেছে। এই একই কারণে অনেকে অসামান্য আয়োজন করে, কিন্তু তাতে কি লাভ? কি হবে সামান্যের জন্যে অসামান্য আয়োজনে? সে তো জীবন যাপনের জন্যেই জীবনটাকে খরচ করা, জীবনকে উপভোগ করা নয়। পোকাদের মধ্যেও একরকম বোকা পোকা আছে নিজেকে আড়াল ক'রতেই তারা সারাজীবন ব্যয় ক'রে ফ্যালে, আড়াল করা যখন হয় চারপাশে তৈরী আবরণের মধ্যে তারা মারাও যায় ঠিক তখনই। জীবন কাটানোর জন্যে মানুষ উপকরণ গড়ে তুলতে থাকে কিন্তু সেই উপকরণ গড়ে তুলতে তুলতেই এক সময় শেষ হয়ে যায় সে। তাহ'লে ওই জাতের পোকা আর মানুষে কি তফাৎ? এই যে হরিনন্দন নামের লোকটা—বেঁচে থাকার জন্যে এত কী লাগে ওর? অথচ নেশা—অবোধ নেশার ঘোরে ও যেন ক'রে চলেছে এই বিশাল আয়োজন। সুন্দর মুখে একটা বিশ্রী ব্রণ হলে যেমন হয় তেমনি এই বিশাল প্রকৃতির মধ্যে এসে বসেছে দুষ্ট ক্ষতের মত। এক রাশি সবুজের মধ্যে ফুটো ক'রে ঢেলেছে খানিকটা রঙ যার নাম হতে পারে পাংশুটে। আদিতে ও যেখানে ছিল সেখানে নিশ্চয়ই ছিল কিছু মানুষ, ওর আত্মীয়, স্বজন, আজন্ম পরিচিত একদল নিবিড় মানুষ! ও কিন্তু সব ছেড়ে এসেছে অবলীলায়, অবহেলায়, এসেছে লোভে, এসেছে লালসায়। যার রিরংসা তীব্র সে যেমন পরনারী গমন করে যার লোভ তীব্র সে অপহরণ করে অন্যের ভোগ্য। সেখানে প্রয়োজন কোন ভিত্তি নয়, প্রয়োজন লালসার সেবাদাস। এই লালসাতেই ফুল ধ্বংস হয়, ফুলের মত মেয়ে ধ্বংস হয়, ধ্বংস হচ্ছে এই অপরূপা প্রকৃতি।

সত্যিই কি অপরূপ শোভা! যে পথ দিয়ে এসেছি, রয়েছি যেখানে—সেই পথের এবং এই অবস্থিতির চারপাশে কি বিশাল সব গাছ। মাথা তুলে দেখলে আকাশের সোজাসুজি। কি বর্ণনা দেব, কি ব্যাখ্যা ক'রব! কি এক গভীরতম তৃপ্তি অপার এক আনন্দ এসে সমস্ত মন প্রাণ এমনভাবে প্লাবিত ক'রে ফেলেছে যে আমি সেই অসীম আনন্দের অতল গভীরে ডুবে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। মাঝে মাঝে যখন ভেসে উঠি তখন দেখি মন শংকিত—হরিনন্দন এখনও আসে নি। সে এক এমনই বেদনাদায়ক উৎকণ্ঠা যে এতক্ষণের অপার নির্মল নির্লিপ্ততা উবে যায় নিমেষেই।

আমার সকল উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে হরিনন্দন যখন এসে পৌঁছাল তখন চারিদিকের গাছের ছায়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর। আমি দোতলায় উঠে বসবার অনুমতি গৃহকর্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোগাড় ক'রে নিয়েছি। গাঢ় অন্ধকার ফুটো ক'রে একটা

সরু আলোর রেখা আসছিল সেটা উঠে এসে আমার ওপর পড়ল এবং বুঝলাম সেই আলোর উৎস আমাকে ঠিক ঠাহর ক'রতে পারছে না আঁধারের গভীরতার জন্যে। তাই আলোটা স্থির ভাবে আমার ওপর রেখে অনেকক্ষণ নজর ক'রে বোঝবার চেষ্টা ক'রল আমাকে। সারাজীবনে মাত্র বার দুয়েক অপ্রয়োজনে আকস্মিক ভাবে যার সঙ্গে দেখা, বিশেষ ক'রে সে একজন বাবু লোক, বিনা প্রয়োজনে এই বিজন বনে আসবে এবং এভাবে বসে থাকবে দ্বারপ্রান্তে, এটা বিশ্বাস ক'রতে হরিনন্দনের সময় লাগছিল। এবং এই অবিশ্বাসের জন্যেই সে ঠিক ঠাহর ক'রতে পারছিল না তাই রুক্ষস্বরে জানতে চাইল, কে তুমি ?

আমি পরিচয় দেবার বদলে বললাম, আমি সেই দুপুর থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছি।

কেন ? আবার সেইরকম রুক্ষস্বরেই প্রশ্নটা সে ক'রল। বুঝলাম আমার আসায়-এবং এইভাবে অপেক্ষা করায় সে অসন্তুষ্টই হয়েছে। সেটা সে প্রকাশ ক'রছে কণ্ঠ, স্বরে। আলো থাকলে নিশ্চয় দেখতে পেতাম তার মুখমণ্ডলও সমান রুক্ষ, বিরক্তির অভিজ্ঞাপূর্ণ। তার সেই ভ্রূকুটিকঠোর মুখমণ্ডলকে সরল করবার অভিপ্রায়ে বললাম আপনি বলেছিলেন ওষুধ নিয়ে আসতে তাই ভাবলাম—

আমাকে কথা শেষ ক'রতে না দিয়েই সে বলল, এখন, এইসময় ওষুধ কে কিনবে !

আমি এবার আমার চূড়ান্ত এবং অমোঘ অস্ত্রটি প্রয়োগ ক'রলাম, বিক্রি ক'রতে তো আসিনি সাউজী। চলে যাবার আগে ভাবলাম ওষুধগুলো আপনাকে দিয়ে চলে যাই, এই জঙ্গলে অনেক উপকারে লাগবে।

জিনিষ বেচতে গিয়ে মানুষ চেনা যায় সবচেয়ে ভাল, মানুষকে জয় করার কৌশলও শেখা যায় অল্প সময়ে তাই আমার অস্ত্র প্রয়োগ নির্ভুল হয়েছিল। সামান্য ক'দিনের অভিজ্ঞতা দিয়েই আমি হরিনন্দনকে ঠিক চিনে নিলাম এবং জবাব পেলাম, ও আপনি সেই দিনের কথা মনে রেখেছেন ? তা এত কষ্ট ক'রে জঙ্গলে না এসে আমাকে খবর দিলেই হ'ত !

আমি বললাম, জঙ্গল যে কি রকম আমরা তা জানিই না। তাই ভাবলাম দেখে আসি বিকালেই ফিরব। তা এখানে আসতে গিয়ে দেখি অনেক সময় লেগে গেল।

এ তো বহুৎ দূর। কিন্তু কাজটা আপনি ভাল করেন নি। এই রাতে ফিরে যাবেন কি ক'রে ?

হাতের টর্চ জ্বেলে রেখে কথা বলবে সে পাত্র হরিনন্দন নয়। অন্ধকারেই কথা হচ্ছিল বলে আমি কিছুটা যেন সুবিধা পেলাম। বললাম, না এই রাত্তিরে ফিরে যাওয়া অসুবিধে। ফিরে যাওয়ার কষ্টের চেয়ে এখানে কোথাও কাটিয়ে দেওয়া অনেক ভাল।—

এখানে। থাকা ! থাকবেন ! কথাগুলো অস্বাভাবিকভাবে কেটে কেটে বলতে লাগল হরিনন্দন, তারপরই নিজেকে ফিরে পেল, বলল, এখানে এই বনের মধ্যে কে

আপনার জন্যে হোটেল বানিয়ে রেখেছে ?

শহরে তো হোটেলেই থাকি, এই জঙ্গলে থাকবার সুযোগ আর কোথায় পাব ?

হরিনন্দন চুপ ক'রে থেকে তার বিরক্তি হজম ক'রছিল সেটা অন্ধকারে তার মুখ না দেখেও অনুমান ক'রে নিতে পারলাম। তবে আমি সেদিন মরীয়া রকমের নির্লজ্জ হয়েই গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম। কারণ আমার উপায়ন্তরও ছিল না। যাব কোথায় ? এই দীর্ঘ বনপথ পেরিয়ে যাওয়া রাত্রে আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব বরং পথে কোথাও বাঘের বা ভল্লুকের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যে প্রতীক্ষা করা আমার পক্ষে অনেক সহজ। সে কাজে ঘন অন্ধকারে এবড়ো খেবড়ো পথে হাঁটতে অন্তত হবে না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হরিনন্দন প্রবল অনিচ্ছা ভাষার মধ্যে ঢুকিয়ে বলেছিল এখানে তো ঘর আর নেই, আপনাকে এই বাইরেটাতেই শুতে হবে তাহ'লে রাত্তিরে। অবশ্য এই উঁচুতে জন্তুজানোয়ারের ভয় তেমন নেই।

আমি যেন পায়ের তলায় মাটি পেলাম, হরিনন্দনের কথাটুকুকেই সর্বস্ব ধরে অন্তর্নিহিত ভাব যে কিছু আছে তা উপেক্ষা ক'রলাম। সোৎসাহে বললাম, এই তো আমি চাইছিলাম। বরং মাথার ওপর চালাটা না থাকলে খোলা আকাশের নিচে কেমন লাগে দেখতে পারলে ভাল হ'ত।

হরিনন্দন কোন জবাব দিল না। আমার মনের সঙ্গে তার অবস্থিতি বিপরীত বিন্দুতে। সে একান্তভাবেই বাস্তবচেতনা সম্পন্ন এবং বস্তুতান্ত্রিক। যেখানে বস্তুগত প্রাপ্তির কথা নেই সেখানে তার মনঃসংযোগ নেই একেবারেই। আমার চালচলন ব্যবহার তার পক্ষে ভাল না লাগা খুবই স্বাভাবিক। সে অর্থমূল্যে বিচার করে সমস্ত কাজের, অর্থ তার কাছে বিনিময়ের মাধ্যম নয়, প্রাণরস। জীবনের জন্যে যে বস্তুর প্রয়োজন এবং বস্তুর জন্যেই অর্থের প্রয়োজন সেসব সূত্র তার মনে বিপরীত ভাবে ক্রিয়া করে। অর্থের জন্যে তার বস্তুর প্রয়োজন, এমন কি অর্থের জন্যে তার জীবন। ঠিক এতটা অর্থ মানসিকতার সামনে আগে কখনও আর আসিনি। তবু আমি যতটা না থমকে গেছি হরিনন্দন আমার সামনে পড়ে থমকেছে সে তুলনায় অনেক বেশী। সে হয়ত ভাবছে আমি মতলব-বাজ বা কোন ফিকিরে আছি, বিশেষ কিছু নেবার চেষ্টায়। তা সত্য কিন্তু সে যে ভাবনায় ভীত তা আমার অভিপ্রায় নয়। তার সঞ্চিত অর্থে নেই আমার কোন আগ্রহ, তার আহরিত শস্যে নেই আমার বিন্দুমাত্র লোভ, তার অসীম বিস্তারে নেই আমার অহেতুক ঈর্ষা বা লোলুপতা। আমি চাই সামান্য একটু আশ্রয়, বিনিময়ে কাজ ক'রে দেব, যতটুকু নেব মিটিয়ে দেব তা হিসেব ক'রে। হিসেবে ভুল ক'রে কম কম নিতে পারি কম দেব না। যে ভুল ক'রে কম দেয়, কম নেয় না সে ভুল করে না, গরমিল করে। করে সে ইচ্ছায়।

আমার এখনও বেশ ভালভাবেই মনে পড়ে হরিনন্দনের স্ত্রীর দেওয়া ভাত আর অড়হড়ের ডালে পেট ভরিয়ে সে রাত্রিটা কুকুরকুণ্ডলী হয়ে কাটিয়েছিলাম ওদের

বারান্দাতেই। সে রাত্রে ঠান্ডা ছাড়া আর কোন অভিজ্ঞতা আমার ঘুমকে ব্যহত করে নি। নাগরিক জীবনে চির অভ্যস্ত আমার ওই প্রথম অরণ্যবাসের রাত্রিতে যে ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা উচিত ছিল তার কিছুই হ'ল না বলে কোন ক্ষোভ কিন্তু পরদিন সকালে মনের মধ্যে পেলাম না। বরং ভোর বেলাতেই আমাকে চমকিত ক'রে কয়েকটি হরিণ দ্রুত পায়ে চলে গেল আমাদের মাচা ঘরের তলা দিয়ে। ঘুম চোখে হরিণ বলে বুঝি নি, চলে যাবার পর বুঝলাম ওগুলো হরিণ ছিল। হরিণ না হয়ে বাঘ বা অন্য কোন হিংস্র জন্তু হলে কেমন লাগত জানি না তবে হরিণ বলেই মনটা বেশ প্রসন্ন লাগল। একটু বাদেই হরিনন্দনের স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেল আরও একটু বাদে ঘুম চোখে এল হরিনন্দন। আমি তখনও ঘুম ভাঙ্গা আলস্যে গুড়ি মেরে বসে আছি ঠান্ডা ঠান্ডা অনুভূতি থেকে বাঁচতে। হরিনন্দন বাইরে এসে কোন কথা বলল না, আমিও তার সঙ্গে কথা বলা এড়ানোর জন্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ক'রে রইলাম। দেখলাম সে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তখনই আমি উঠে বসলাম এবং প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলাম এবার সে বেরোলেই কথা বলব। প্রায় তখনই হরি-নন্দন বেরোল, বুঝলাম প্রাতঃকৃত্য সারতে নিচে যাবে, আমার প্রতি তার মনোভাব বোঝবার জন্যেই আগের বার কথা বলিনি, আমাকে সহ্য ক'রে নেবার মত সময় দিয়েছি, এবার বললাম, রাতে তো কোন জন্তু-জানোয়ার এ দিকে আসেনি।

হরিনন্দন জবাব দিল, রাত্রে তাহ'লে আপনার ঘুমটা ভালই হয়েছিল।

কেন ?—আমি জানতে চাইলাম।

এখান দিয়েই একদল বনগরু একবার দৌড়ে গেছে। ঘুম ভাল না হ'লে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন। তবে আর কোন শব্দ আজ রাত্রে শুনি নি। চলুন ময়দান যাবেন তো ? এখানে তো আর বানানো পায়খানা পাবেন না জঙ্গলেই যেতে হবে—

সে তো নিশ্চয়ই। আপনি সেরে আসুন আমি যাচ্ছি—

বেলায় হরিনন্দনের সঙ্গে একটা রফা হ'ল। প্রথমটা সে বিশ্বাসই ক'রতে পারে নি, আমার প্রস্তাব শুনে ভেবেছিল ঠাট্টা করছি বুঝি। তারপর যখন তাকে বিশ্বাস করাতে পারলাম সে বলল, আপনার মত শিক্ষিত লোক এসব কাজ পারবে কেন বলুন ? বয়স কম আছে বুঝতে পারছেন না এ জীবন বড় কষ্টের। জঙ্গলে দিন রাত পড়ে থাকা—আপনারা পারবেন না।

যখন তাকে দৃঢ়ভাবেই বোঝাতে চেষ্টা ক'রলাম যে পারব, তখন আধোবিশ্বাসে বলল, ঠিক আছে যে ক'দিন পারেন থাকুন। আপনার মত একজন সঙ্গে থাকলে তো খুবই ভাল। মালের তো কোন অভাব নেই, আমার মুস্কিল বিক্রি করা। শহরে যাবার সময় বিশেষ পাইনা, একা লোক। আপনি থাকলে বহুৎ জঙ্গল কেটে ভাল ভাল কাঠ পাঠাতে পারব। এই যে দেখছেন চারিদিকে তামাম জঙ্গল শুধু

জঙ্গল। আর বিরাট বিরাট সব গাছ। এখানে আর কি দেখছেন—হাতের নির্দেশে পূবদিকে দেখাল—ওদিকের গাছগুলোর মাথা দেখা যায় না। ওদিকে মাটি সব সময়েই ভিজে, কোনদিন রোদ পড়ে না সেখানকার মাটিতে। কিন্তু গাছ, হ্যাঁ সে সব গাছ বটে। এক একটা গাছ কাটলে বিশ পঁচিশ গাড়ী কাঠ হবে। —কথাগুলো বলার সঙ্গে প্রচন্ড লোভ ফুটে উঠেছিল তার চোখে মুখে। চোখ দুটো এমন চকচক ক'রছিল যে তাতে বিশ্বগ্রাসের ক্ষিধে। মনে হচ্ছিল ওর ওই দুই চোখে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে ডুয়ার্সের সমস্ত অরণ্যভূমি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, এখানে কিসের কিসের গাছ আছে ?

শাল। লাখ লাখ গাছ আছে। বাজে গাছ কত যে আছে, কি হিসেব তার ?

গাছ অথবা কাঠ দুটো সম্বন্ধেই ধারণা আমার সংখ্যার হিসেবে শূন্য। কিন্তু লোকটির সঙ্গে আলাপ করবার জন্যেই আমার গাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। কিন্তু তার সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে না পারলে চলে কি ক'রে ? তাই তার কথা বলার সুযোগ ক'রে দিতে জানতে চাইলাম, সামনের ওই বিশাল উঁচু গাছটা কি গাছ ?

হরিনন্দন দেখে নিয়ে বলল, গোকুল। এ সব বাজে গাছ। জংলী।

জংলী তো জঙ্গলে সব গাছই। আর বাজে হবে কেন দেখতে তো গাছটা বেশ সুন্দর।

হরিনন্দন এবার বেশ জোর দিয়ে বলল, আরে মশাই বাজে মানে হচ্ছে ও গাছের কাঠের কোন দাম নেই। লোকে কেটে জ্বালানী করে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা অনুমান ক'রতে পারলাম। যে কাঠের দাম বেশী সেই গাছই হ'ল ভাল। তাই বললাম, এর মধ্যে শাল গাছ কোনটা ?

চারপাশে অনেকগুলো গাছ সে দেখাল কিন্তু আমি দূর এবং অদূরের অসংখ্য গাছের মধ্যে কোনটাকেই যেন আলাদা ক'রে দেখতে পারলাম না। সব মোটামুটি একই রকম মনে হতে লাগল। ফলে গাছ চেনবার ইচ্ছায় ইস্তফা দিয়ে বসে রইলাম হরিনন্দনের আরও কিছু কথা শোনবার আশায়। এবং অচিরেই সে তার কথা সুরু ক'রল, ফরেস্ট অফিসে আপনাদের ভাইরা সব আছে তো আপনি একটু গেলেই অনেক কাজ হয়ে যাবে।

আমি ঠিক 'আমাদের ভাইরা' ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। জানতে চাইলাম, আমার ভাই তো ফরেস্ট অফিসে কেউ নেই।

এই প্রথম সে একটু গোঁত খেল, বলল, অফিসের বাবু তো সব আপনার জাতি—

ব্যাপারটা বোধগম্য হ'ল। ভাবলাম সব অফিসের বাবুদের দিয়ে যতটুকু কাজ পেয়েছে তার ফলে তো কুলি থেকে জমিদার আর কাঠব্যবসায়ী পর্যন্ত এই সামান্য দিনেই উঠেছে সে। তার বুদ্ধিকে আরও গতিশীল ক'রে তোলবার জন্যে সে যা ভাবতে পারে ততদূর ক'রতে পারা তার নিজের প্রবেশেই কি সম্ভব ছিল ? অথবা ওর

চাহিদা মত কাজ ক'রতে পারত কি ওই সব অফিসে তার নিজের ভাইকে বসিয়ে দিলে? ভাবলাম কথাগুলো ব্যঙ্গ ক'রেই বলি, বিরত হ'লাম নিজের স্বার্থের কথা ভেবে। কিছুটা পথ এই লোকটির সঙ্গে চলতে হবে তো!

চলেও ছিলাম। অল্পদিন কি বেশীদিন সে বিচারে আমার ক্ষমতা বেশীদূর এগোতে পারে না। যতদিন চলেছি কারও বিচারে তাকে দীর্ঘকাল বলা যাবে আবার কারও বিচারে হয়ত তার মেয়াদ অত্যন্তই কম সময়ের। কালের নিরিখে দেখলে সে কিছুই নয় তবে আমরা যেহেতু স্বল্পায়ু প্রাণী, আমরা দেখি সব নিজেদের আয়ুর মাপ-কাঠিতে, তাই বলব অনেকদিনই ছিলাম হরিনন্দনের সঙ্গে। সঙ্গে না বলে কাছে বলাই ঠিক হবে কারণ সে আমায় যে বাবু বলে ডাকত সে বাবু মানে 'গোমস্তা' বা ওই ধরনের কিছু যাকে ওর স্বপ্রদেশীয় হলে ডাকত মুন্সীজী বলে আর সেটা হয়ত হ'ত আমাকে এই বাবু বলে ডাকার চেয়ে বেশী সম্মানজনক। তবে সে প্রশ্ন হয়ত কখনও মনে এলেও তাকে এগিয়ে আসতে দিইনি। জানতাম বেশী প্রশ্রয় দিলেই সে ঘাড়ে চেপে বসবে। তা ছাড়া আমি চিন্তা ক'রে দেখেছি সম্মান বা অসম্মান দুটোই সমান, অর্থহীন। সম্মান নামক মনোভাবটির কি মূল্য আছে? জীবনকে সে কি দেয়? শুধু দেয় বন্ধন, জীবনের গণ্ডিকে ক'রে দেয় সংকীর্ণ। আমার মনে হয়েছে সম্মানটা একটা মুখোশের মত, মুখের ওপর পরলেই দৃষ্টির পরিধি যায় কমে! একটুতেই ছোট হয়ে যাই বলে স্বাভাবিকতা বর্জন ক'রে চলতে হয় অনেক অস্বাভাবিকতার ঘোরা পথ দিয়ে। অসম্মান? সে তো মনের একটা অভিঘাত মাত্র, আমরা ভাবি অসম্মান তাই অসম্মান। নইলে ক্ষতিবৃদ্ধি কি? জীবন কাটানোর জন্যেই যদি পেশা হয় তবে একজন বিচারপতির চাকরী করি অথবা চাকরী করি হরিনন্দনের কাছে কি যে তারতম্য আছে আমি বুঝি না। যদি আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধরতে হয় তবে বলব অর্থ লাভের তারতম্য যেটা আছে সেটা বাস্তব। তবে আমার প্রয়োজন যদি কেবলমাত্র জীবনধারণ হয় তাহ'লে কি থাকছে কোন তারতম্য? বরং সম্মান যা করায় তা হচ্ছে সামান্য ক'দিনের জীবন যাপনের জন্যে অসামান্য আয়োজন। চারিপাশে অহেতুক সামগ্রীর স্তূপ, অপ্রয়োজনীয় বস্তুর পাহাড়। হাতিরা, বাঘেরা, পাখিরাও তো জীবন কাটায়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টা তো তারাও এই পৃথিবীতে অতিক্রম করে তাদের তো কই এত আয়োজন লাগে না! প্রথম যুগের মানুষেরা—যারা আমাদের বহু পূর্বপুরুষ—তারাও তো তাদের জীবন কাটিয়ে গেছে, তাদের তো প্রয়োজনের পরিধি ছিল না এত বিস্তৃত, তাদের দেহের চারপাশে ছিল না এত সামগ্রীর আয়োজন। কাজেই এত সব আবশ্যিক নয়, অতিরিক্ত। যা না হ'লেও চলে তারই জন্যে হাহাকার ক'রে জীবনকে বিড়ম্বিত করার নাম সভ্যতা কিনা জানি না তবে তাকে অশান্তি বলে সিদ্ধান্ত ক'রতে আদৌ দ্বিধা হয় না আমার। অতএব হরিনন্দন আমায় যা বলেই

তৃপ্তি পাক না কেন আমি অখুশী নই, আমি পরম আনন্দেই তার সঙ্গ করেছি, অম্লান তৃপ্তিতে কাটিয়েছি অনেকটা সময়ের কাল।

হরিনন্দন প্রথম রাত্রির পরদিনের আলোচনার পর আমাকে চিকিৎসক বলে ধরে নিয়েছিল, বলত ডাক্তারবাবু। তাই বলল, দু-চারদিন ভাল লাগে ডাক্তারবাবু। শহর থেকে এলে দু-চারদিন সকলেরই ভাল লাগে। জঙ্গল কেটে সমানে বসতি বানাচ্ছে মানুষ সে কি জঙ্গল ভাল লাগলে হয়? জঙ্গল কি ভাললাগার জায়গা? তবে হ্যাঁ যদি ঝটপট পয়সা কামাতে চান তবে জঙ্গলে তা হ'তে পারে।

কথাগুলো বলে খুব সন্তর্পণে গোপন পরামর্শ দেবার মত ক'রে আমাকে সে বলল, ডাক্তারী করবার ইচ্ছা যদি করেন তো আমি আপনাকে ভাল জায়গা বাতলাতে পারি। বহু দূরে পর্যন্ত কোন ডাক্তার নেই, কেবল চা বাগানের ডাক্তার। তবে কি জানেন মানুষও তো বেশী নেই—

আমি বুঝলাম সে যে আমাকে প্রথম থেকেই সন্দেহ ক'রে আসছিল, সে সন্দেহ এই যে আসলে আমি ডাক্তারী করবার জায়গা খুঁজছি। আমি তার অমূলক সন্দেহের চৌহদ্দি দিয়ে না গিয়ে বললাম, আমি ডাক্তারী ক'রতে চাই না। অন্য কোন কাজ ক'রতে চাই। আপনার যে কোন কাজ আমি ক'রে দেব তার বদলে আমি শুধু বনে ঘুরতে চাই। —আমার এই কথা যে সে বিশ্বাস ক'রছে না তার মুখ দেখেই তা বোঝা গেল কিন্তু সে আমাকে তার কাছে রাখতে গররাজী হ'ল না। মনে হয় সেই সময় একজন কর্মসঙ্গী তার দরকার ছিল। সে তা অনুভব ক'রছিল। কারণ তার সামনে যে বিশাল সম্ভাবনা তা কুড়িয়ে নিতে হ'লে আরও দুটো হাতের সাহায্য তার প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। আমার অযাচিত আগমনে সে অখুশী হচ্ছিল না আবার সন্দেহও দূর হচ্ছিল না তার মন থেকে।

এবং এই দ্বিধা নিয়েই সে আমাকে সঙ্গী ক'রল সেটা নেহাৎই প্রয়োজনের তাগিদে। আমাকে বলল, শহরে খদ্দের জোগাড় ক'রতে হলে তো আপনাকে কাঠের ব্যাপারে কিছুটা শিখে নিতে হবে?

সে তো নিশ্চয়। আমি কাঠের কিছুই জানি না।

তাহ'লে চলুন একসঙ্গেই যাই। গাছ কাটা তো হয়ে গেছে তাকে এখন মাপ ক'রে কেটে আনতে হবে। মাপ শিখে নিতে সময় লাগবে না।—কথাগুলো বলতে বলতেই বোধহয় তার মনে অন্য কোন ভাবের উদয় হ'ল তাই সে বলল. কি যেন বলছিলেন জঙ্গলে ঘুরতে চান? এই যে এতদূর বনের মধ্যে এসেছেন এই তো জঙ্গলে ঘোরা হ'ল।—ওর কথার মধ্যে প্রশ্ন ছিল, আমি সেই প্রশ্নের সামনে যেন থমকে গেলাম, জবাব দিতে গিয়েও ভেবে পেলাম না কি বলতে হবে। কি বলা উচিত মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম। অচিরেই নিজেকে অসহায় মনে হ'ল। আমি যে কি চাই সেই কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারছি না হরিনন্দনকে। অথচ আমার মনের কথাটা

তাকে বলতে পারা একান্ত প্রয়োজন। এই বলার ওপরেই নির্ভর ক'রছে আমার ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ? কথাটা বহুদিন পরে হঠাৎ মনে এল। ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকতে পারে সেটা যেন এতদিন ভুলেই ছিলাম। ভুলে গেছি। ভবিষ্যৎ! মনে পড়ে বিস্মিত হ'লাম নিজেই; সে আবার কি? পৃথিবীর প্রাণীরা জন্মায় না মরা পর্যন্ত বেঁচে থাকে এর মধ্যে ভবিষ্যৎ-এর প্রশ্নটা কিসের? ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকা প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তুর জন্যে ব্যতিক্রমহীন সত্য, প্রাণীর জন্যেও। অতএব ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ভাবনা নেহাৎই অমূলক, অর্থহীন। তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা ক'রব আমার এই টিকে থাকবার ভাবনাকে? কিভাবে টিকিয়ে রাখব আমার অস্তিত্ব? এখানে অরণ্য, মানুষ এখানে অসহায়। এ বাসভূমি তাদের যারা মানুষের সঙ্গে বাস ক'রতে অভ্যস্ত নয় বলেই করে অবিশ্বাস, করে ভয়। মানুষও তাদের কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত প্রতিপন্ন ক'রতে চেষ্টা করেনি কোনদিন বরং অহেতুক হিংসায় চিরকাল করেছে আক্রমণ। তাই অবিশ্বাস তাদের রক্তের উত্তরাধিকার বয়ে চলে, ভয় বাস করে তাদের জন্মগত চেতনায়, আত্মরক্ষার প্রাণীজ প্রেরণায় থাকে আক্রমণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যাস।

আর সেই জন্যেই আমার ভয়। বনবাসীদের সঙ্গে, আমরা যারা বনত্যাগ ক'রেছি অর্থাৎ মানুষদের, একটা বোঝাপড়া থাকলে এই ভয় থাকত না কিন্তু বহুজন্মের প্রচেষ্টায় আমরা ওদের শিখেছি ঘৃণা ক'রতে, ওরা শিখেছে ভয়। কখনও সেই ভয় ভয়ঙ্কর হয়ে বাড়িয়ে দেয় তার আয়তন। যে চোখে বনের সবুজ প্রতিবিম্বিত হয় সেই চোখই হয়ে ওঠে ঘোলাটে, ক্রুর। তাই একা এই অরণ্যে কি ক'রে থাকব? কোথায় থাকব? বাইরে? কোথায় যাব? কিসের জন্যে? সেখানে জীবন যাপনের আয়োজন বিশাল অপরিসীম সামগ্রীর প্রয়োজন সেখানে। বালিমাটির দুর্গে অযুত আয়ুধের সমাবেশ। সেই অকারণ ব্যস্ততা থেকে একবার পেয়েছি নিস্তার। এখানেও তো বেঁচে থাকে প্রাণীরা। পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রকৃতি তার এই সবুজ কোলেই লালিত ক'রে আসছে সন্তানদের। মানুষের এই সভ্যতা যাকে বলি সে আর কতদিনের? আলো অন্ধকারের হিসেবে মাপলে কি হিসেব মিলবে? তবে সে অভ্যাস থেকে আমরা এখন অনেক দূরে বলেই পাহাড়ের গুহায়, গাছের তলায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মধ্যে আকাশের তলায় বাস করা অসম্ভব যা এখনও করে বনের প্রাণীরা। তাই চাই আশ্রয়। নিজেকে শুধরে নিলাম ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমানের জন্যেই চাই আশ্রয়। বললাম, চলুন কাজ শিখব।

আমার এই কথা শুনে হরিনন্দন যে চোখে সেদিন আমার দিকে চেয়েছিল তা আমার আজও মনে আছে। সেই চোখের দৃষ্টিতে ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। সন্দেহ। অথচ আমি যেহেতু কোন উচ্চাকাঙ্খাজাত লোভের বশবর্তী হয়ে সেদিন তার কাছে যাই নি তাই বুঝিনি তার সন্দেহের কারণ। পরবর্তী কালে সে একদিন নিজেই আমাকে

বলেছিল, আমি আপনাকে বিশ্বাস ক'রতে পারিনি। ভেবেছিলাম আপনিও আমারই মত। আমার কাছে কাঠের কাজ শিখে আমার ব্যবসা কব্জা ক'রে নেবেন। তারপর ভাবলাম এত বড় জঙ্গল শিখে যদি কাজ ক'রেন তাতেই বা কি ক্ষতি। এতবড় জঙ্গল এ কি আমি একা সারাজীবনে কাটতে পারব ? আপনি শিখে কাজ ক'রলে তবু আমার নামটা তো নেবেন !

কথাটা শুনে সেদিন আমার মনের মধ্যে হাসির উদ্রেক হয়েছিল এই হরিনন্দনও তাহ'লে নাম চায়! অর্থ ছাড়াও তাহ'লে তার আর একটা বস্তু চাওয়ার আছে! অথচ এই সম্পূর্ণই মুর্খ স্বাভাবিক ভাবেই জানে না এই পৃথিবীতে ওর এই অর্থ—এবং নাম কোনটা চাওয়ারই কোন মানে নেই। লোকটা জানে না পরেরদিনই ও কোন বাঘের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনে লাগবে কিনা অথবা অন্য কোন ভাবে ওর কার্যকাল শেষ হবে কিনা এই পৃথিবীর। হতেও তো পারে। তখন কি হবে ওর এই বন কেটে দখল করা জমি নিয়ে? আর নাম! সে তো আরও মূল্যহীন। কি তার লাভ ? কি তার প্রাপ্তি ? আর'নাম' বা 'সম্মান' বস্তুটা এই বিশাল পৃথিবীর তুলনায় কতটুকু ? ক'টা লোক জানতে পারে ? জেনেই বা কি হয় ? আমি ওর নাম ক'রলে কি হবে ওর ? এই যে আমার কথায় একবার ওর নাম বললাম একবারও কি শুনল ? কোথায় সে আর কোথায় আমি। আপনাদের কাছে যে বলছি আপনারাও সেই লোকটাকে জীবনে দেখেন নি তবে হ্যাঁ পথ চলতে হয়ত অমন অনেক হরিনন্দনের সামনে এসেছেন, পরিচয় পেলে চিনবেন এও এক হরিনন্দন—অপরিসীম লোভ বুকের মধ্যে ক'রে এরা কাঁকড়ার মত ক'রে পৃথিবীর মাটি কুরে ভোগ ক'রতে চায়। মানুষ ছাড়া অন্য কোন পোকার কিন্তু এত বহুমুখী লোভ নেই। এই বিশাল পৃথিবীতে অর্থলাভ যশোলাভ জয়লাভ সবই অতি অকিঞ্চিৎকর। লাভ শব্দটাই অর্থহীন। কারণ একদিকে যেমন লাভের লোভ অপরিসীম অপরদিকে আবার সেই 'লাভ' বস্তুর সংকীর্ণতা দেখলে লাভের নিস্ফলতাই প্রকট হয়ে পড়ে। হরিনন্দন চায় আমি তার নাম করব—ক'জনের কাছে ক'রব ? ক'জন জানবে ? এই যে কয়েককোটি বছর ধরে চলছে এই পৃথিবী—কত কালে কত লোক নাম ক'রেছে, এব এক এক প্রান্তে এক এক কালে এক এক লোক হয়েছে খ্যাত-নামা, অন্য অংশে কেউ সে নাম জানেনি। এক একজনের নাম হয়ত আরও বড় অংশে হয়েছে পরিব্যাপ্ত, তাতেই বা কি ? সে নামও হয়ে গেছে বিস্মৃত। এ কথা কি জানে না হরিনন্দন ? জানে নিশ্চয়ই কিন্তু সব কিছুর স্থায়িত্ব সম্পর্কে বোধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ তো কোন কিছুর আকর্ষণই এড়াতে পারে না! আসলে মোহ। মানুষ মোহগ্রস্ত। তার খ্যাতির মোহ' সার্থকতার মোহ, সেই মোহ হরিনন্দনেরও।

আপন মানসিকতার প্রেক্ষিতে বিচার ক'রেই সে নির্ধারিত করে আমাকে। বিধান দেয়। অনুগ্রহ করে নিজের লাভ লোকসানের সম্ভাব্যতার মনানুগ হিসেব কষে নিয়ে। অর্থাৎ আমাকে অনুগ্রহ ক'রলে ভবিষতে অর্থনৈতিক ক্ষতি তার কতটুকু হতে পারে। আমার

প্রয়োজন মত প্রাপ্তির ব্যবস্থা সে যা ভেবেই করুক, ক'রে দিলেই হ'ল। আমার প্রয়োজন কত সে তো আমি জানি। আর জানি বলেই লোভকে আমি ভয় পাইনা। বরং লোভের রূপের মধ্যে যে দৈন্য আছে তা দেখে আমার হয় করুণা। আমি লক্ষ ক'রে দেখেছি লোভ আর দীনতা দুটো এমন ভাবেই মিশে থাকে যে চেষ্টা ক'রলেও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দেখে আমার হাসি পায়। প্রকাশ্যে না হ'লেও মনে মনে হাসি। কারণ কোন সময়েই বাস্তব অবস্থাটাকে উপেক্ষা ক'রতে তো পারি না। ভুলতে তো পারি না যে আমার পারানির কড়ি ট্যাকে বাঁধা নেই! সে আমার নিত্য পথে সংগ্রহ ক'রতে হয়। প্রত্যেকটি পোকাকেই ক'রতে হয় তা। তবে অন্য পোকাদের তা সংগ্রহ ক'রতে আদৌ কোন অসুবিধে নেই—অসুবিধে মানুষদের। সে কি প্রয়োজনটার মাত্রা বেশী বলে? ধারা অন্য বলে। কারণ প্রয়োজন তো হাতিদেরও বেশী কিন্তু কি সহজলভ্য তাদের দিন যাপনের পাথেয়! দিন যাপনের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে হয় তাদেরও তাই বন থেকে বনান্তরে তাদের নিত্য আবর্তন। আমাদের চাই নিশ্চিন্ত একটি আশ্রয়। এক এক জন এক ভাবে তা ক'রে নেয়। ইঁদুর গর্ত তৈরী ক'রে নেয়, সাপ গর্ত খোঁড়ে না সে বাস করে অন্যের খোঁড়া গর্তে। মানুষও তেমনি, কেউ আশ্রয়স্থল গড়ে নেয়, কেউ আশ্রয় নেয় অন্যের তৈরী বাসায়। আমি খুঁজছি অন্যের আশ্রয়ে মাথা গুঁজতে। তাই বলে সাপের মত ইচ্ছা আমার নেই, যে যার কাছে আশ্রয় নিচ্ছি বিনাশ ক'রব তাকেই! প্রাণীমাত্রেই সে ভয় পায় যেমন পাচ্ছে হরিনন্দন—তাকে যদি উচ্ছেদ করি আমি? তা ক'রব না। প্রতিষ্ঠা যদি আমার কাম্য হ'ত তবে সে সম্ভাবনা ছিল, আমি তো প্রতিষ্ঠা চাই না! আমি চাই আশ্রয়, টিকে থাকতেও চাই না, চাই অবশ্যম্ভাবী দিন গুলো কাটাতে।

তাই লেগে পড়লাম। নেপালী কাঠুরিয়ার দল হাত করাত কুড়ুল নিয়ে বিশাল বিশাল গাছগুলোকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধরাশায়ী ক'রে ফ্যালে, নিজেরাই বিশাল গাছটিকে খণ্ড খণ্ড করে করাত দিয়ে কেটে তারপর দুটি মোষের কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, সামনের মাথা তারা টেনে নিয়ে চলে ছেঁচড়ে। আমার শিক্ষানবীশী সুরু হ'ল সামান্য পূব দিকেই। সে বোধহয় হরিনন্দনের ঘর থেকে মাইল খানেক হবে। ভোর বেলা উঠে—অবশ্য ভোর বলে ঠিক বোঝানো যাবে না কারণ সূর্য তো গাছের মাথাগুলো ছোঁয় মাত্র, মাটিতে বা মাটির কাছাকাছি কোনদিনই নামে না। তা সেই গাছের মাথায় সূর্যের প্রথম রশ্মি স্পর্শ করবার অনেক আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার হয় উৎকণ্ঠায় নয় কিছুর চিৎকারে। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসবার পর কোন চিৎকার আর আমার কানে এল না। আমার নড়াচড়ার শব্দেই বোধহয় একটু বাদেই ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল হরিনন্দন। তার মুখ চোখ থেকে ঘুমের চিহ্ন অনেক আগেই মুছে গেছে। মনে হ'ল রাতেও বুঝি ঘুমোয় নি লোকটা—। সে বেরিয়ে এসেই বলল, উঠে পড়েছেন? ভালই হ'ল। ময়দান সেরে আসুন। বেশী

দূরে যাবেন না যেন। ভোর বেলা জানোয়ার কাছাকাছিই আছে।

নিচে নেমে দেখলাম সামনেই হরিনন্দনের গৃহিনী বসে গেছে প্রাতঃকৃত্য ক'রতে। বনে লজ্জার কারণ কিছু নেই বলেই সেসব সে বর্জন করেছে সহজেই। আমাকে সে লজ্জা পেল না, লজ্জা আমিই তাকে পেলাম। সরে গেলাম অড়হড় গাছের মধ্যে খানে। এমনিতে ভয় নামক পদার্থটির সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা আমার নেই বলেই মনের সুখ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা ক'রছি ইতিমধ্যেই মনে হল কে যেন অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে মটমটিয়ে গাছপালা ভেঙ্গে আমার দিকেই আসছে। মনে হ'ল আমার মত উদ্দেশ্যেই আসছে। যে একজন ওপাশে বসে সে ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি তো আছে একমাত্র হরিনন্দন। তবে কি সে-ই? মনে মনে প্রস্তুত হলাম নির্লাজ হবার জন্যে এবং সেই ভাবে থাকার জন্যে যাতে লজ্জা পাবার দায়টা যে আসছে তার ওপরই বর্তায়। ফলে একাগ্রতাটা বেশী হ'ল এবং অচিরে বুঝলাম যে শব্দ নিকটতর হচ্ছে সেটা মানুষ বাদে অন্য কোন প্রাণীর। তবে সে প্রাণী যে খুব বিশাল নয় এ অনুমান সহজ হ'ল। কিন্তু সেই অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে নির্বিকার বসে থাকা এই অরণ্যে অসম্ভব। কারণ স্বভূমিতে শিয়ালও শার্দুল। এমতাবস্থায় কি করণীয় সে জ্ঞান আমার থাকবার কথা নয় কিন্তু বিপদে বুদ্ধি যেহেতু হারাতে নেই তাই ভাবতে চেষ্টা ক'রলাম এবার কোন দিকে যাওয়া উচিত। উঠে যে ছুটব সে ভরসা হচ্ছে না আগমনকারীর পরিচয় জানি না বলে। যদি ছোটবার ক্ষমতা আমার চেয়ে তার বেশী হয়। যদি তার খাদ্যাখাদ্য বিচার না থাকে তবে বসে থেকে তার খাদ্য হয়ে যাওয়াতেই বা কি সার্থকতা? অবস্থা কোনভাবেই অনুকূল নয় তবু বুদ্ধিটাকে পালাতে না দিয়ে আটকে রাখলাম কিন্তু সে এমনই অসহযোগিতা আরম্ভ ক'রে দিল যে কিছুতেই কোন সাহায্য ক'রতে চাইল না। বনে অনভ্যস্ত আমি, বনবাসীদের কারও পায়ের শব্দও চিনি না যে কে আসছে আন্দাজ ক'রব। বসে থাকলে আগন্তুক দূর দিয়ে চলে যায়। হতেও তো পারে! অতএব যতক্ষণ না গায়ের কাছে এসে পড়ে বসে থাকি। তারপর যদি একেবারে লাফ দিয়ে গায়ের ওপরেই পড়ে? অভিজ্ঞতা হয়ত হবে কিন্তু কোন কাজে লাগবে না তা। তাছাড়া অকারণ মরতে কে চায়? আমিই বা কেন চাইব? আপন প্রাণের গরজেই তাই উঠে দাঁড়ালাম। একেই বলে বোধ হয় 'ইনস্টিংক্ট'। ওঠবার সময় জলের শৌচ পাত্রটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব। কিন্তু আগন্তুকটি কে, আমার শৌচপাত্রটি আদৌ কোন কাজে লাগবে কিনা সে সম্পর্কে কোন বোধ তখন আমার কাজ ক'রছিল না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তার গতিবিধি নিরীক্ষণ ক'রছি হঠাৎ হুক ক'রে একটা শব্দ ক'রে কালো একটা বাছুরের মত তীব্র বেগে অড়হর গাছ ভেঙ্গে ছুটে এল। আমিও বাঁচার তাগিদেই চট ক'রে সরে গেলাম একটা পাশে, জানোয়ারটা সোজা বেরিয়ে গেল কিছুটা। একটা ছোট সাইজের শুয়োর। সর্বনাশ! এ যদি পূর্ণ বয়স্ক হ'ত তাহ'লে হয়ত

চিরে-ই ফেলত আমাকে! বাচ্চা বলেই যা বাঁচলাম। কিন্তু দেখতে যখন আমাকে পেয়েছে তা সে ধাড়ীই হোক আর বাচ্চাই হোক আরও একবার চেষ্টা কি আর না ক'রবে? এই ঘন অড়হর গাছের মধ্যে দেখতে তো তাকে পাচ্ছি না। সে হয় আমাকে দেখছে নয় ঘ্রাণ পাচ্ছে অতএব এবার অব্যর্থ লক্ষ্যেই এসে লাফিয়ে পড়বে আমার ওপর। হয়ত মরব না কিন্তু শরীর তো চিরে দেবে সে, এই গহন বনে ধীরে ধীরে পচে মরব। চট ক'রে যা-ই বা কোন দিকে? বাঁ দিকে না ডান দিকে? ওর তো সাড়াও পাচ্ছি না! আগের বার সাড়া পেয়েছিলাম বলে সাবধান হতে পেরেছি; এবার? মনে হ'ল আমি একটা পরিকল্পিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, আর সেই অনভিপ্রেত কদর্য মৃত্যু আমার অত্যন্ত নিকটেই নিঃশব্দে ঘাপটি মেরে আছে আমার নিমেষমাত্র অন্যমনস্কতার সুযোগেই আমার ওপর লাফিয়ে পড়বে বলে। অচিরেই শুয়োরদের সম্পর্কে পাল শব্দটা মনে এল। ওরা তো দলে দলে ঘোরে তবে কি আরও সব আছে? নিঃশব্দে আমাকে চারিধার থেকে ঘিরে ফেলছে ওরা? তারপর মোক্ষম মুহূর্তে একসঙ্গে লাফ দিয়ে পড়ে আমাকে এক সঙ্গেই ফালা ফালা ক'রে চিরবে? চারপাশে চেয়ে দেখতে চেষ্টা ক'রলাম সরু সরু অড়হর গাছের ফাঁক দিয়ে কদর্য চেহারাগুলো চোখে পড়ে কি না! দৃষ্টিতে যতদূর তীব্রতা প্রক্ষেপ করা সম্ভব ক'রে দেখলাম, কিছুই গোচরে এল না। হিসেব ক'রে দেখলাম হরিনন্দনের বউটা যেখানে বসে তার সকালের কাজ সারছিল শুয়োরটা তো সেইদিকেই ছুটল। তবে কি তার ঘাড়েই পড়েছে? তাহ'লে কি কোন শব্দ হ'ত না? এমন নিঃশব্দে কি আত্মদান ক'রত হরিনন্দনের বনবাসিনী আওরতোয়া? ব্যাপারটা যাই হোক এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে শুয়োরদের সমবেত আক্রমণের প্রতীক্ষা করার কোনই মানে হয় না বরং যাবার চেষ্টা দেখি। বাঁ দিকে খুব সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম শব্দ বাঁচিয়ে। আকাশে বেশ আলো ফুটে উঠেছে তাকেই যেন প্রাণ বলে মনে হ'ল। অন্ধকার আর আলোর মধ্যে ব্যবধান বিপদসঙ্কুল জায়গায় যত বোঝা যায় অন্য কোথাও তত নয়। প্রতি মুহূর্তে উৎকণ্ঠিত থেকে কোনক্রমে অড়হর ক্ষেত এর বাইরে এসে দেখি প্রচণ্ড ধারালো একখানা টাঙ্গি হাতে ক'রে হরিনন্দন আসছে। আমাকে দেখেই সে জানাল, আমরতিয়ার মা বলছিল আপনাকে নাকি শুয়োরে তেড়েছে তাই আমি যাচ্ছিলাম! স্থান এবং অবস্থান দেখে আমি অনুমান ক'রে নিতে পারলাম শুয়োরটা হরিনন্দনের বউ-এর শরীর নির্গত বস্তু সামগ্রী পেয়ে যাওয়াতেই আমার দিকে আর অকারণ আক্রোশে ফিরে যায়নি। নইলে এত তাড়াতাড়ি লক্ষ্যচ্যুত হবার মত বৈরাগ্য অন্য কোন প্রাণীর থাকলেও থাকতে পারে শুয়োরের থাকবার কথা নয়।

আমাকে সশরীরে দেখতে পেয়ে হরিনন্দন হতোদ্যম হ'ল। ঘরের দিকে ফিরে চলল টাঙ্গি রাখতে। আমাকে বলল, বাবু সদরে দরখাস্ত লিখে একটা বন্দুকের ব্যবস্থা করুন তো! এই জানোয়ারদের মধ্যে থাকতে হ'লে বন্দুক না হ'লে একদম চলে না।

ব্যাপারটা তাহ'লে আগেই বুঝেছে কেবল দরখাস্ত লিখতে না পারার জন্যেই তাহ'লে এতদিন আটকে ছিল যা বুঝলাম। কারণ অচিরেই সে জানাল, রেঞ্জার সাহেব তাকে অনেক দিন আগেই অর্ডার ক'রে দেবে বলেছে, শুধু হয়ে উঠছে না আর কি!

শুয়োরটার প্রতি রাগের কারণে আমিও এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলাম সেইদিনই লিখে ফেলব বলে। এখনই যা দেখছি এই গহন বনে বাস ক'রতে হলে বন্দুক অপরিহার্য। এতদিন যে হরিনন্দন এই জিনিষটার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি কেন সেটাই জিজ্ঞাসা ক'রলাম। সে জানাল, এই সব জানোয়ার মানুষের থেকে দূরে থাকতে চায়। কাজেই ওদের এড়িয়ে চললে ওরা সাধারণত গায়ে এসে পড়ে না। বিস্তর বন আমরা তো একটুখানি এক টুকরোয় আছি বাঘভালুক হাতিদের জন্যে পড়ে আছে সমস্ত দেশ—হরিনন্দনের বক্তব্য;

বুঝলাম সত্যিই হরিনন্দন বন্দুকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। তবে এখন যে সে বন্দুক কিনতে আগ্রহ প্রকাশ ক'রছে এর নিশ্চয়ই অন্তর্গূঢ় কোন কারণ আছে। যা-ই থাক আমার তা জেনে কোন পরমার্থ লাভ হবে না। বরং হরিনন্দনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হলে আমার কিছু লাভ থাকতে পারে। দু একদিন শিকার-টিকার হবে হলে খাদ্যবস্তুর পরিবর্তনও হবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই শুনে নিয়েছি কাছের চাকুলি বস্তিতে সপ্তাহে একদিন ক'রে হাট ও বাজার বসে, সেদিন গোটা তিনেক ছাগলের মুণ্ডচ্ছেদ হয়, অনেকগুলো মুরগীর মুণ্ডহীন দেহ শূন্যে ডিগবাজী খায় চারদিকে রক্ত ছিটিয়ে। আর সেই রক্ত শুষে নেয় ডুয়ার্সের মাটি। কোথা থেকে কোথা থেকে মাছ ধরে নিয়ে এসে সেদিন বেচতে বসে কুলি বস্তির সোনাভাঙ-এর মত লোকেরা বা তাদের বউরা। কোন কোন হাটে হরিণের মাংস, খরগোশের মাংস বা বনবরাহ স্বয়ং মাংস রূপে আবির্ভূত হয়ে পড়ে। সেদিন সকলেরই মুখ বদল হয়। তবু নিজেদের বন্দুক থাকলে অন্য কথা। বনে পাখি আছে, খরগোশ আছে, হরিণ আছে মেরে খেলেই হ'ল। মাছটার ব্যবস্থা অবশ্য যা শুনি ভালই কারণ ওই পাশেই একটা বড় জলাশয় আছে যেখান থেকে মাছটা প্রায় রোজই ধরে নিয়ে আসে হরিনন্দনের বউ-বা ছেলেরা। জলাশয় মানে কারও কাটানো পুকুর নয়, অনেকটা জায়গা জুড়ে অগভীর জলা, বনভূমিরই একটা প্রকার ভেদ। সেই বিশাল জলাভূমি লতাগুল্মে কচুরীপানায় ঢাকা। সেখানে অসংখ্য মাছ আপন আনন্দে ঘর সংসার করে, অসংখ্য বক, মাছরাঙা, সাপ খুঁজে বেড়ায় তাদের আপন ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায়, আর হরিনন্দনের অবতংশেরা খোঁজে লালসায়।

আর বোধকরি সেই লালসার কারণেই আমি হরিনন্দনের বন্দুক আনায় তৎপর হয়ে উঠলাম এবং উৎসাহিত। বোধহয় হরিনন্দনের নেপথ্যের তৎপরতা তীব্র হবার জনেই আশাতীত দ্রুত বন্দুকটা পাওয়া গেল। আমরা দুজনেই গিয়ে বন্দুকটা নিয়ে

এলাম শহর থেকে। আমরা অর্থে আমি তার সঙ্গী ছিলাম আর কি। সে-ই হাতে ক'রে গ্রহণ ক'রল টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আবার বিশাল আগ্রহে বুক উঁচু ক'রে পিঠে ঝুলিয়ে নিল দোনলা বিলিতি বন্দুকটাকে। বনের পথে ঢুকেই সে প্রশ্ন ক'রল, আপনি নিশ্চয়ই বন্দুক চালাতে জানেন ?

তার এ হেন বিশ্বাসের কারণ জানি না কিন্তু হরিনন্দনের অন্নদাসত্বের দীনতায় তার চেয়ে নিজেকে উঁচু ভাবতে সব সময়েই ইচ্ছে করে বলে জানি না বলতে পারলাম না। সে তাই বলল, তাহ'লে যাবার পথেই চলুন কিছু শিকার ক'রে নিয়ে যাই। হরিণের অভাব নেই, চলতেই চোখে পড়ে যাবে।—আমি মনে মনে ভাবলাম চোখে পড়লেই তো হ'ল না নেহাৎ মৃত্যু যার বরাতে আজ লেখা আছে একমাত্র তারই তো মৃত্যু হবে। চালানোটা তো বিক্রেতাই শিখিয়ে দিয়েছে তাছাড়া পুরানো বন্দুক চালুই আছে অতএব যেমন শিখেছি তেমনি ভাবেই দেগে দেব তারপর যা হবার হবে। তাছাড়া এই গহন বনের মধ্যে যখন বন্দুক চালানো তখন হরিণ মরতে মানুষ মরবার ভয় তো আর নেই! বড় জোর গুলি ছিটকে কোন অন্য প্রাণী মরতে পারে। তাতে ক্ষতি কি ? এক গুলিতে না মরে পরের গুলিটাও চালিয়ে দেব ভাবনা কি ? আর ভদ্রলোক টিপ করার কায়দা যেভাবে দেখিয়ে দিল তাতে অতবড় একটা জন্তু নিধন খুব বেশী কষ্টের হবে বলে মনে হয় না। সেই ভরসাতেই কার্টিজগুলো ভরে নিলাম। বেশ কিছুটা পথ চলবার পরই হঠাৎ মনে হ'ল ডানদিকে জঙ্গলের মধ্যে কার একটা লুকিয়ে পড়বার শব্দ শুনতে পেলাম। হাতে বন্দুক না থাকলে মনের যে কি অবস্থা হ'ত জানি না তবে ওটির জোরেই দাঁড়িয়ে পড়লাম সেখানে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটু লক্ষ্য ক'রতেই দেখতে পেলাম কালো মত কি যেন একটা চলে যাচ্ছে। শুয়োর। সেদিন সকালের শুয়োর দেখা থেকেই কেমন একটা জাতক্রোধ এসে গিয়েছিল শুয়োরের প্রতি। সেটা এখনই প্রচণ্ডভাবে অনুভব ক'রলাম এবং নিমেষমাত্র চিন্তা না ক'রেই বন্দুকটা নিশানা ক'রে ঘোড়া টিপে দিলাম। বন্দুকের শব্দের প্রায় সঙ্গেই অঁাক করে একটা আর্তনাদ কানে এল। জীবনে সেই প্রথম বন্দুক ধরা এবং ওরকম আর্ত-নাদও জীবনে প্রথমই শুনলাম। আমি কিন্তু একটু হকচকিয়ে গেলাম। কি যে হয়ে গেল বুঝে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল আমার তার মধ্যেই শুনতে পেলাম হরিনন্দন বলছে, লেগে গেছে। ঘায়েল হয়ে গেছে। পালাল। মারুন।

আমার নজরে পড়ে নি, হরিনন্দন দেখল গুলি লাগা মাত্র শুয়োরটা একটা লাফ দিয়েছে সামনের দিকে মুখ ক'রে। তাই সে আর একটা গুলি ক'রতে বলল। কিন্তু আমি যাকে দেখতেই পাচ্ছি না তাকে গুলি করি কি ক'রে ? আমার পূর্ণ সম্বিত ফিরে আসতে আমি দুঃখ বোধ ক'রলাম আমার আংশিক অকৃতকার্যতার জন্যে। আনাড়ী হবার জন্যেই গুলিটা লাগল কিন্তু মরল না শুয়োরটা। আমার ইচ্ছে হ'ল যেদিকে শুয়োরটা লাফ দিয়েছে বা যেখানটায় ছিল সেখানটায় গিয়ে দেখি। বাধা-

দিল হরিনন্দন, বলল, জখম হওয়া জানোয়ার বড় খারাপ। তার কাছে যেতে নেই। সায়েব লোক শিকার খেলতে আসে তারা সবাইকে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়।

কাজেই সেই আহত অথবা হতেও পারে নিহত শুয়োরের সন্ধান থেকে বিরত হয়ে আমরা আপন পথ ধরলাম। হঠাৎ হরিনন্দন হাত টেনে ধরল। ইশারা ক'রে সামনের একটা বড় পানিসাজ গাছের ডালে দেখাল বড় বড় কতগুলো সুন্দর পাখি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। ওদের দেখে অনেকটা ধ্যানস্থ সাধুর মত মনে হয়। হরিনন্দন ফিস ফিস ক'রে বলল, মারুন। ধনেশ। বড় কাজের পাখি। খুব দামী।

সেই মুহূর্তে আমার একবারও মনে হ'ল না যে কাজের আর দামী পাখিই যদি হয় তবে মারব কেন? আমি চট ক'রে গুলি বদলে নিয়ে নিশানা ক'রে মেরে দিলাম ছর্‌রা। পাখি মারবার জন্যে সদ্য শুনে এসেছি, ওগুলোই ব্যবহার ক'রতে হয়। আমার শিক্ষাকে নির্ভুল প্রমাণ ক'রতে গাছের থেকে ঝরা পাতার মত ঝুপ ঝুপ ক'রে অনেক ক'টি পাখি ঝরে পড়ল। হরিনন্দন দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে নিল কয়েকটা, আমিও একটাকে তুললাম। বেশ বড জাতের পাখি। সবুজ রঙ। ঠ্যাং ধরে তুলে দেখি তখনও তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হচ্ছে আর বন্ধ হচ্ছে। আর দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জিবটা একটু একটু বেরোতে চাইছে। নড়ছে। গুলি লেগেছিল ডানায়। সেখানে কাঁচা রক্তের দাগ। ছোট বেলায় মনে আছে ঝড উঠলেই গাছের তলায় আম কুড়োতাম। তেমনি ভাবেই কুড়িয়ে নিলাম মরা পাখিগুলো। হরিনন্দন পেয়েছিল দুটো আমি একটা। কোন ঝোপ ঝাড়ে যদি পড়ে থাকে কোনটা অথবা খসে পড়তে গিয়ে আটকে থাকে গাছটার ডালেই তবে সে কথা জানিনা। সে সব আশা আর ক'রলাম না, পাখি গুলোকে নিয়ে চললাম। হরিনন্দন খুব খুশী। অর্থপ্রাপ্তিতে হরিনন্দন খুশী হয় দেখেছি সাধারণ ক'টা পাখি মেরে এত খুশী হবে ধারণা ছিল না। যা হোক বুঝলাম প্রাপ্তি মাত্রেই খুশী হবার লোক হরিনন্দন।

বাকী পথটুকু হরিনন্দন দুঃখ ক'রতে ক'রতে ফিরল একটা হরিণ সামনে পড়ল না বলে। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। এক সঙ্গে এতগুলো পাখি মরল আমি দুটো ট্রিগারকে প্রায় এক সঙ্গেই টেনেছিলাম বলে। আসলে হরিনন্দনের কাছে নিজের বড়ত্ব প্রমাণ করেবার প্রয়াসেই আমার যা কিছু প্রচেষ্টা। আমার হাতে ধরা পাখিটাকে একটু উঁচু ক'রে দেখলাম মরে গেছে। হরিনন্দনের হাতে দিয়ে দেবার ইচ্ছে হ'ল আমার সেটাকেও। কারণ তখনই আমার মনে হ'ল আমি এটাকে অকারণ বয়ে চলেছি। হরিনন্দনের লাভালাভের বোঝা আমার বয়ে বেড়ানোটা নেহাৎ বোকামী। তাছাড়া যে বড়ত্ব প্রমাণ করবার জন্যে এতগুলো পাখিকে মারলাম সে বড়ত্বই বা কি অর্থ হয়? সে সে তো এক মুর্খামী মাত্র। এই পাখিগুলোর সঙ্গে আমার প্রাণের তো কোন পার্থক্য ছিল না। তবে কেন ওদের কাছে ছোট হ'লাম আমি? আমার মনে হ'ল হাতে ধরা পাখিটা ক্রমাগত ভারী হয়ে উঠেছে। তার খশখশে পা দুটো আমার মুঠোর ভেতর

নড়ছে। হরিনন্দনকে বললাম, এই পাখিটা ধরুন তো। সে ভাবল আরও কিছু মারব বুঝি তাই হাত খালি ক'রতে চাইছি। বলল, মাংস যদি খেতে হয় তবে অন্য কোন পাখির চেয়ে তিতির অনেক ভাল। —হাতের পাখিগুলো সে মাটিতে নামলে। মাটি মানে ঝোপঝাড় আর পায়ের পাতা ডোবানো ঘাসের মধ্যে দিয়ে কাঁটা গাছ বাঁচিয়ে আমরা চলছিলাম। সেই আমাদের প্রতি দিনের পথ। আর সেই পথের ওপর জমিয়ে পাশ থেকে একটা লতা ছিঁড়ে নিয়ে এল হরিনন্দন। সেই লতা দিয়ে তিনটে পাখির পাগুলো বাঁধল। তারপর একটা ছোট গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে সেই ডালটির মাথায় সেগুলোকে বেঁধে কাঁধে ফেলে বলল, চলুন।

আমি ভারমুক্ত হতে চাইলাম কিন্তু মনের ভার বেড়েই চলল। হঠাৎ গুলি লাগা শুয়োরটার কথা মনে পড়ল। মনে হ'ল ওকে গুলি ক'রে কাজটা ঠিক করিনি। বেচারী যদি না মরে আহত হয়ে থাকে তাহ'লে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে! সময় যত কাটবে ততই যন্ত্রণা বাড়তে থাকবে তার শরীরে। আর প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে পালিয়েছে সে, নইলে আর একটা গুলি ক'রে ওকে যন্ত্রণা থেকে বাঁচানো যেত। সব চেয়ে বড় কথা ওকে মারাটাই ঠিক হয়নি। অকারণ এভাবে মারা খুবই অন্যায়। ও তো আমার কোন ক্ষতি করে নি! প্রাণের মূল্য আমার থেকে ওই শুয়োরটার যে কোন অংশে কম আমি তা বুঝতে পারছি না। আমি পাঠ নিয়েছি চিকিৎসাশাস্ত্রে। মানুষের যন্ত্রণার উপশমই তো আমার কর্তব্য। শুধু মানুষ কেন বিশাল যে প্রাণী সমাজ তার যন্ত্রণাও তো মানুষের থেকে কিছু কম নয়। প্রাণচেতনায় কি পার্থক্য মানুষ আর অন্য প্রাণীতে! কি পার্থক্য জীবনবৃত্তে? কিছুই না! তাহ'লে কোন প্রাণীকে যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করাই যেখানে আমার ধর্ম হওয়া উচিত যন্ত্রণা দেওয়া সেখানে কতটা অধর্ম? আর না-ই যদি আমি চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র হতাম মানুষ যদি নিজেকে অন্য প্রাণীর থেকে উচ্চতর জীব বলে ভাবে তা হ'লে তো তার দায়িত্ব হওয়া উচিত নিম্নতর শ্রেণীর জীব বলে যারা তার কাছে পরিগণিত তাদের রক্ষা করা! তাদের আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়া তো বড়র কাজ নয়? অথচ মানুষ কোন-দিনই তো অন্য প্রাণীকে রক্ষা করেনি! ছলে বলে কৌশলে তাদের হত্যা ক'রেছে মাত্র। যখন বিবেক আপত্তি ক'রেছে তখন যে কোন একটা উপলক্ষ খাড়া করে নিজের বিবেক-কে নিজেই ফাঁকি দিতে প্রয়াস পেয়েছে। হরিনন্দনের পেছন পেছন যখন এই সব হাজার চিন্তা মগজে নিয়ে চলেছি বনভূমি তখন আশ্চর্য রকম নিঝুম। দু চারটে ঝিঁঝিঁর পাখা নাড়ার শব্দ ছাড়া কিছুমাত্র শব্দ নেই। যাকে বলে নিঝুম দুপুর সম্পূর্ণ তাই। অথচ গাছের গায়ে গাছ কোথাও কোথাও এমন এক একটি লতা এক একটা বিশাল গাছকে এমন ভাবেই জড়িয়ে আছে, যে আসল গাছটিকে সেই আকাশের সীমায় ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাবারই উপায় নেই। মনে হচ্ছে গাছটার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে লতার আলিঙ্গন ছাড়িয়ে সে আকাশের দিকে মাথা তুলে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা

ক'রছে। কিন্তু এক বন্দুকের শব্দেই কি সারা জঙ্গলের পাখি বাস্তু ছেড়ে পালাল? নইলে একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি না কেন? আমার যেন এই নিস্তব্ধতা ভাল লাগছিল না। এই নৈঃশব্দ যেন ধীরে ধীরে ভারী হয়ে চেপে বসছিল বুকের মধ্যে আমার সমস্ত অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দুতে চুপচাপ পথ চলতে বোধহয় হরিনন্দনেরও ভাল লাগছিল না। সে বলে উঠল, একদিন ওদিকটায় চলুন। ওদিকে দুটো বাঘ আছে, মারা যাবে।

বাঘ আছে মানে? বাঘেরা আবার এক জায়গায় ঘর ক'রে থাকে না কি? আমি জানতে চাইলাম।

তাই তো থাকে—জানাল হরিনন্দন, বলল, ঘর ক'রে থাকে না বটে তবে অন্য জানোয়াররা যেমন এক সঙ্গে এক দল থাকে বাঘেরা তা থাকে না। বাঘ একসঙ্গে দুটিতেই থাকে। বাচ্চারা বড় হয়ে অন্য জায়গায় সরে যায়।

ওদিকটায় তো দেখি ঘাসই বেশী।

গেছেন তো? ওই ঘাসের মধ্যেই থাকে। কোন কোন দিন দেখি হোগলার বনের আড়ালে আছে। মানুষখেকো নয় বলেই যা রক্ষে।

তাই বা কি বলা যায় যদি দৈবাৎ একদিন ভয় পেয়ে মানুষের ওপর আক্রমন ক'রে বসে তাহ'লেই হয়ে গেল। তবে কি জানেন বাঘকে যত না ভয় তার চেয়ে ভালুককে। এই এক জানোয়ার আছে যার থেকে খারাপ পৃথিবীতে আর কিছু নেই!

আমি হরিনন্দনের কথাটা শুনলাম মাত্র। ভল্লুক সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। প্রত্যক্ষ তো নেইই পরোক্ষও নেই। অর্থাৎ কারও কাছে বিশেষ শুনিও নি। তার কারণ বাঘ বাংলাদেশের প্রাণী বলে তার কথা আমাদের দৈনন্দিন গল্পের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেখানে ভল্লুক সিংহ এরা সব বিদেশী। উত্তর বাংলায় এই ডুয়ার্সের অরণ্যে তো আমাদের কারও নিত্যবাস ছিল না কাজেই এখানকার প্রাণীরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের অভিজ্ঞতার বাইরে। হরিনন্দন কেন যে ওদের ওপর এত ক্ষেপে আছে সেই কথাটা জানতে চাইলাম। সে জানাল নিছক কোন কারণ নেই তবে বন্য জন্তুরা সবই বিপদজনক।

আমি ওর কথা মানতে পারলাম না, প্রতিবাদ ক'রতেও পারলাম না। মানতে পারলাম না এইজন্য যে মানুষের চেয়ে বিপদজনক প্রাণী কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। কথাটা বলতে পারলাম না এই জন্য যে হরিনন্দনের সঙ্গে মত পার্থক্য ঘটাবার সাহস আমার ছিল না। হঠাৎ একটা পাখির শব্দে আমি হরিনন্দন প্রসঙ্গ ভুলে গেলাম। এমন তীব্র পাখির ডাক এর আগে কখনও আমি শুনিনি। এই জঙ্গলের মধ্যেও নয়। আরও একবার ডেকেই পাখিটা থেমে গেল। হরিনন্দনের কাছে জানতে চাইলাম, এইমাত্র যে পাখিটা ডাকল এর কি নাম?

কোন পাখি? —হরিনন্দন জানতে চাইল।

শুনলেন না ?   এই তো মাত্র দুবার ডেকে উঠল।

হরিনন্দন তাচ্ছিল্যের সুরে জানাল, বনের মধ্যে কত রকম পাখি আছে। তার 'হিসেব-কিতাব' কে রাখে। ডেকেছে কোন একটা পাখি।

এ উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। অথচ যে ব্যাপারে আদৌ উৎসাহী নয় তার কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল উত্তর আর কি পাওয়া সম্ভব ? এই ক'দিন যতটুকু বুঝেছি হরিনন্দন চায় সমস্ত বন কেটে বসত তৈরী ক'রতে। এই পাখির ডাক, হরিণের দৌড়, বাঘের ক্রুর দৃষ্টি এর কোন সৌন্দর্য তার চোখে পড়ে না।

আমি এখনও বনে বাঘ দেখিনি। পশুশালায় দেখেছি। লক্ষ্য ক'রে দেখেছি তার দৃষ্টি সেখানেও হিংস্র। কি বনে কি বাগানে সর্বত্রই তার স্বভাব ফুটে ওঠে দৃষ্টিতে। কিন্তু হিংস্রতা সত্ত্বেও তার চোখেরও একটা সৌন্দর্য আছে। আসলে যে যেমন দেখতে পায় আর কি। আর এই দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যের জন্যেই তো পৃথিবীতে যত অশান্তি। মানুষে মানুষে সংঘাতও তো এই কে কি ভাবে একটা ঘটনাতে দেখেছে সেই জন্যেই। আমি অবশ্য চুপ ক'রে রইলাম। দুপাশে বিশাল সব গাছ, যাকে মহীরুহ বলে তাই। সেই সব মাথা দেখতে না পাওয়া গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় দুপুরের পথ চলতে আমার ভালই লাগছে। মাঝে মাঝে ছোট কোন ঝোপে আটকে পথ দিচ্ছে নইলে পায়ের তলায় ঘাস কোথাও কোথাও একটু ধারাল হলেও চলার পক্ষে সহায়কই হচ্ছে। একা হ'লে নিশ্চয়ই ভয় লাগত সংগে অতিসাহসী হরিনন্দন আছে আর আছে বন্দুক। কাজেই সতর্ক নিশ্চিন্ততায় পথ চলছি। হঠাৎ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়-এর কথা মনে পড়ল। উনি প্রায়ই বলতেন, আমাদের দেশের জঙ্গলে এখনও বহু ভেষজ গাছ আছে যার ব্যবহারই জানা হয়নি। সব বনই বনৌষধিতে ভরা। কে জানে এই যে অসংখ্য ছোট গাছ কি গুণ আছে এগুলোর! আচমকা একটা কথা মনে এল আমার, যে প্রাণীরা এখনও বনে আছে তারা কি এই সব গাছগাছালির গুণ জানে ? আমার মার একটা পোষা বিড়াল ছিল। দেখেছি তার কোনদিন শরীর খারাপ হ'লেই দৌড়ে গিয়ে ঘাস বা পুরানো খড় চিবিয়ে খেতো! বনের প্রাণীরাও কি এই সব গাছের গুণাগুণ জানে ? হঠাৎ আমার বোঝা যেন হালকা হয়ে গেল। মনে এল প্রকৃতি মানুষকে কিছু বেশী শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির জোরেই সে সারা পৃথিবীকে করায়ত্ত করেছে। কাজেই অন্য প্রাণীর থেকে নিশ্চয়ই মানুষ স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার আবার একটু যেন জোর পেলাম। বন্দুকটা বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম এবার সেটা হাতে ধরে নিলাম। কিন্তু বন্দুকটা হাতে নিতেই মনে হ'ল যদি মানুষ শ্রেষ্ঠই হবে তবে তার কাজও তো তেমনই হওয়া উচিত। একজন শ্রেষ্ঠ কি কখনও অন্যকে হত্যা করে ? শক্তির পরিচয় কি ধ্বংসে ? অশক্তের ওপর অত্যাচারে ? নিকৃষ্ট চলে স্বভাবে, উৎকৃষ্ট চলে মানসিকতায়। এই যে কতগুলো নিরপরাধ, প্রাণীকে হত্যা ক'রলাম এর মধ্যে মানসিক উৎকর্ষতার

প্রকাশ কোথায়? একটা বিড়াল ইঁদুর থেকে কতটা উৎকৃষ্ট? একটা বন্য কুকুর কি একটা হরিণের থেকে উৎকৃষ্ট? বরং আমাদের থেকে উৎকৃষ্ট তারা এই জন্যে যে তারা আমাদের মত অপ্রয়োজনে হত্যা করে না।

আমার চিন্তাকে ব্যাহত ক'রে হরিনন্দন হঠাৎ বলে উঠল, চামগুড়ির গাছ কাটা সুরু ক'রতে হবে। কবে করা যায় বলুন তো? ক্ষেম বাহাদুরকে বলেছি আরও দশজন লোকের জোগাড় ক'রতে।

আমি বললাম, চামগুড়ির জঙ্গলে কি গাছ কাটা হবে? শুধু শাল?

অকাঠ কাটবার জন্যেও খুব বলছে। কিন্তু অকাঠ কেটে তো লোকসান। মানদানী ছাড়া তো আর কোন কাঠ বিক্রি হবে না। কত আর জ্বালানী করা যায়? জ্বালানী বিক্রি করে তো গাড়ী ভাড়া কাটাই খরচ সব ওঠে না! আমি ভাবছি শুধু শাল আর মানদানী কতগুলো আছে কাটব বাকী যা থাকে থাক।

আমি কোন মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে ক'রলাম না কারণ আমার মত দেবার মত অভিজ্ঞতা হয়নি। ব্যবসার ভালমন্দ আমি কি ক'রে বুঝব? তা ছাড়া চামগুড়িতে কোনগাছ কতগুলো আছে সে ধারণাও আমার নেই। আমরা যেখানে আছি তার দক্ষিণে মাইল পাঁচেক গেলে চামগুড়ি তা আমি জানি কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বনভূমির কতটা এলাকাকে চামগুড়ি বলে তা আমার জানা নেই। শীঘ্র যে ধারণা গড়ে উঠবে সে সম্ভাবনা এখন দেখছি।

আমার চিন্তার গতিপথ বদলে দিয়ে হরিনন্দন আবার বলল, শিলিগুড়ির ব্যাপারী-দের ওপর নির্ভর ক'রে থাকলে কাজ হবে না। কলকাতার মহাজনদের সঙ্গে কাজ ক'রতে পারলে সুবিধে হ'ত।

আমি চুপচাপ শুনলাম। সে আবার বলল, আপনি একবার চলে যান না কলকাতা।

এবার নারকেলটা মাথার ওপরেই পড়ল। আর চুপ ক'রে থাকার উপায় রইল না। কলকাতা যাওয়াটা এড়ানোর কৌশল হিসেবে বললাম, কলকাতার বাজার সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণা নেই।

ধারণা নেই বলেই তো যেতে বলছি। আপনি গেলেই বাজারটা বুঝতে পারবেন। আমি তো মূর্খ লোক, আপনাদের মত লেখাপড়া জানা নই, আমি গিয়ে কোন হদিশ ক'রতে পারব না। তাছাড়া কলকাতাতে কোনদিন যাইনি—

সেই কলকাতা যাকে আমি ছেড়ে এসেছি, ফেলে এসেছি, সেই শহরে ফিরতে হবে আবার! যে নাগরিক জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়েই চলে এসেছি বলা যায়, যেখানে মুহূর্তের জন্যে যাওয়া অসম্ভব সেখানেই যেতে হবে কয়েকদিনের জন্যে! আমি যে পালিয়ে এসেছি, হিসেবপত্তর চুকিয়ে আসিনি, বলে আসিনি—চললাম! কারণ বিদায় তো আমি নিইনি। আসলে আমি হারিয়ে গেছি, নাগরিক জীবন থেকে হারিয়ে

গেছি, আমি। হারিয়ে গেছি অলকানন্দার জীবন থেকেও। সেই অলকানন্দা—আমার অন্যতম প্রিয় ব্যক্তি, এখনও তার পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য ক'রে নাগরিক জীবনকে গড়ে তুলছে, আমাকে ছেড়েই প্রস্তুত হয়েছে সে পথ চলতে। চলার পথে আবার কোন সঙ্গী জুটে যাবে তার কারণ জীবন সে তো জীবনই! তাকে বোঝাপড়া ক'রে নিতে হয়, সব পাথেয় জুটিয়ে নিতে হয় তাকে চলতে চলতেই। কিন্তু আমি তো অলকানন্দাকে ভয় করি। ভয় করি তার সান্নিধ্য, তার অস্তিত্ব। কারণ আমি তাকে ক্ষুদ্র ক'রতে পারি না। পারি না তার সঙ্গে জান্তব মৈথুনে মগ্ন হতে মাত্র। কিন্তু এত কথা বোঝাবার পাত্র এই হরিনন্দন নয় বা বোঝবার মানসিকতাও তার নয়। সে তার স্বকীয় চিন্তায় মগ্ন। জীবনের মূল্য তার কাছে টাকা আর জমি। আর যত গোল এখানেই। জনে জনে ইচ্ছার ভিন্নতা। মতের গরমিল। তাই সংঘাত, আবার সেখানেই বৈচিত্র। এই সংঘাত মানুষকে যেমন ধ্বংস করে আবার পৃথিবীকে গড়েও তোলে এই চিন্তার পার্থক্যতেই।

যাই হোক তাকে নিবৃত্ত করবার জন্যে বললাম, আগে চামগুড়ির কাজ চালু হোক তারপর গেলেই হবে। এখন গিয়ে তো লাভ হবে না শুধু শুধু কতগুলো টাকা খরচ হবে মাত্র!

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল হরিনন্দন, তারপর বলল, চামগুড়ির কাজ তো দু-একদিনের মধ্যেই সুরু হবে। পাঁচ দল কাজ ক'রলে তিন দিনে কত কাজ এগিয়ে যাবে! অনেকটা বিরক্ত হয়েই মনে মনে বললাম যাক্। তবে প্রকাশ্যে বললাম না। হরিনন্দনই আবার বলল, কলকাতার মহাজনদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে পারলে কাঠের দামটা ভাল পাওয়া যাবে। তিস্তার ধারে যা শাল গাছ দেখে এসেছি সে আপনাকে কি বলব! সে তার দুই বাহু প্রসারিত ক'রে আকৃতিগত বিশালত্ব বোঝাতে চাইল, মুখে বলল, লম্বা যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। আমি জীবনে অত বড় গাছ দেখিনি। এসব গাছে পয়সা পাওয়া যেত!—শেষের কথাটি হরিনন্দন বলল বেশ আক্ষেপের সুরে। যে গাছ এখনও কাটাই হয়নি তার জন্যে এই আক্ষেপের কারণ বুঝলাম না। আগে গাছ কাটা হোক, বিক্রির উপযোগী করা হোক, তখন না প্রশ্ন উঠবে কি দাম পাওয়া গেল। এ লোকটা যে না মরতেই ভূত হতে পারে এ ধারণা তো আমার ছিল না। তবে কি অভিনয় ক'রছে? হতে পারে! আমি কলকাতা যাবার মত ক'রছি না বলেই হয়ত ওর এই কায়দা! যাই হোক এ বিষয়ে শেষ কথাটি এখনও শোনার বাকী, তাই চুপ ক'রেই রইলাম। তাছাড়া এই অল্প ক'দিনেই লক্ষ ক'রে দেখছি যে ওর এই অর্থ লোভের তীব্রতা আর তার দরুণ সব সময়ের এই টাকা টাকা মন্ত্র-এ যেন আমার ভাল লাগছে না। অকস্মাৎ আমার মনে হ'ল ওকে থামানো দরকার।

আমি আর কিছুই বললাম না। ও আমার কাছে কতদূর আশা করে সেটা মেপে দেখা প্রয়োজন। তারপর আমি আমার পক্ষে কতটা যাওয়া সম্ভব তা বুঝিয়ে বলব।

যে নাগরিক জীবন ছেড়ে এসেছি সে জীবনে ফিরতে পারলে এই অরণ্যে আর ফিরে আসব না এটা জানে না হরিনন্দন। আমি লক্ষ করে দেখেছি ও আমাকে বুঝতে চেষ্টা করে না। সেটা করে না বলেই আমি নিশ্চিন্ত এবং নির্বিঘ্ন। ওর যদি কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা থাকত তাহ'লে আমার এখানে থাকা সম্ভব হ'ত না।

যাই হোক সেদিন বা তার পরের দিন সকালে হরিনন্দন কলকাতা যাবার জন্যে আর কোন কথার বদলে বলল, ডাক্তার সাব চলুন চামগুড়ি থেকে ঘুরে আসি।

দেখলাম হরিনন্দন বন্দুকটা হাতে ক'রে নিল। বুঝলাম ওকে বন্ধুকের নেশায় পেয়ে বসেছে। নইলে জঙ্গলকে ও ভয় করে না। আশ্চর্য দক্ষতা অর্জন ক'রেছে ও জঙ্গলের প্রাণীদের সম্পর্কে। তাদের চলফেরা, স্বভাব-চরিত্র যেন ওর কাছে ছবির মত। আমি কৌতুক করে বললাম, বন্দুকটা শুধু শুধু বয়ে কি লাভ?

সে বলল, রাস্তায় কত জানোয়ার পড়বে। তা ছাড়া চামগুড়িতে বাঘও আছে।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, তা বাঘের ঘরে বাঘ থাকবে না?

আমার কথাটা হয়ত ঠিক ধরতে পারল না হরিনন্দন, সামান্য হেসে রসিকতা উপভোগ করবার মত ক'রে বলল, বাঘের ঘর থাকে নাকি ডাক্তার সাব?

এই কথায় এমন এক নিবুদ্ধিতা ছিল যে আমি চট ক'রেই রেগে গেলাম। বললাম, এই যে জঙ্গল দিয়ে আমরা চলছি এ তো সবই বাঘ ভল্লুকের ঘর। আমরা তো জন্তু জানোয়ারের ঘরের মধ্যই ঢুকেছি।

তা যা বলেছেন, হরিনন্দন বিজ্ঞের মত বলল, গোটা দেশটাই যেন বাঘ ভাল্লুকের ঘর হয়ে আছে। সেই জন্যেই তো বন্দুকটা কিনলাম। নইলে এত টাকা নষ্ট করার কোন কারণ আছে?

কথা বলতে বলতে আমরা অনেকদূর চলে এসেছিলাম হঠাৎ মনে হ'ল আলোর মধ্যে এসে পড়েছি। সেই যে ঘন গাছের মধ্যে দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় হাঁটছিলাম, সামনেই ফাঁকা। ভাবলাম ওদিকটায় হয়ত গাছ নেই। কিন্তু শেষ গাছের ছায়াটা ছেড়েই দেখলাম ঘন ঘাসের মধ্যে চারপাশেই বহু কাটা গাছের নিচের অংশ শিকড় সুদ্ধ পোঁতা আছে। অর্থাৎ এদিকের গাছগুলো সব কাটা হয়ে গেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকেই ফাঁকা, ওপরে দুরন্ত রোদে ঝলসানো আকাশ। আরও কিছুদূর যাবার পর দেখলাম কয়েকটা উঁচু উঁচু ঘর, যাকে চাঙ্গ ঘর বলে। এই গভীর জঙ্গলে কোন রসিক যে ঘর ক'রল কে জানে। জানে হরিনন্দন। সে নিজে থেকে বলে উঠল, নতুন নেপালী এসেছে দেখছি। বস্তি ক'রেছে।

মানে। আমি জানতে চাইলাম, আগে এই ঘরগুলো ছিল না নাকি?

বিলকুল নয়। হরিনন্দন জানাল, বলল, মাস পাঁচেক আগেও এদিকে আমি গেছি, তখন ঘরগুলো ছিল না।

তাহ'লে কি হঠাৎ গজিয়ে গেল? দেখে যদিও নতুন বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু এত-

গ্নলো ঘর হঠাৎ গজিয়ে ওঠে কি ক'রে? আমি যখন এই সব প্রশ্নে ভরপ্নর তখনই যেন ঘাসবন থেকে উঠে এল একটা নেপালী, ব্নঝলাম আমাদের দেখেই দৌড়ে এসেছে, সে প্রায় নিজের ভাষাকেই হিন্দিতে বলল, এ মহাজন, হাতি বড় অত্যাচার ক'রছে—।

হরিনন্দন বলল, হাতির সঙ্গে পারা যাবে না। হাতি বড় সাংঘাতিক জীব। ওরা ফসল কিছ্ন খাবেই। আগ্নন জ্বালাতে হবে।

লোকটি জানাল, শ্নধ্ন ফসল খেয়েই তো ছ্নটি দিচ্ছে না, ঘরগ্নলোও ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা ক'রছে।—

হরিনন্দন আবার বলল, হাতিকে জব্দ করা যাবে না। ওরা সব দলে দলে থাকে—

লোকটি নাছোড়বান্দা, বন্দ্নকটি দেখিয়ে বলল, ওটি তাদের কাছে থাকলে তারা হাতি সব মেরেই ফেলত।

আমি এতক্ষণে ব্নঝলাম দ্নর থেকে ওই বন্দ্নকটি দেখেই লোকটি দৌড়ে এসেছে। আসলে এই বন্দ্নক আবিষ্কার ক'রতে পেরেই মান্নষ অন্য প্রাণীদের ওপর আধিপত্য সম্প্নর্ণ ক'রতে পেরেছে। কাজেই প্নথিবীতে এখন বন্দ্নকই শক্তির উৎস। ব্নঝলাম ওরা বন্দ্নক গোত্রীয় সব অস্ত্রকেই এক বলে জানে। নইলে এই বন্দ্নক দিয়ে হাতি মারতে যে মারককেই মরতে হবে সেই কথাটা ওদের জানা নেই। কিন্তু লোকটির আবেদনে এবং বন্দ্নকের সাহসে হরিনন্দন যেন নরম হয়ে গেল, আমাকে জিজ্ঞেস ক'রল, কি করা যায় বল্নন তো ডাক্তার সা'ব!

কিছ্নই করা যায় না, আমি বললাম। য্নক্তি হিসেবে বললাম, হাতিদের রাজত্বে এসে ওরা বসেছে আর হাতিরা একটু অত্যাচার ক'রবে না এটা কি হয়?—আমার য্নক্তি হরিনন্দনের মনে নেবে না আমি জানতাম, কারণ ও মান্নষ ছাড়া অন্য প্রাণীর অধিকার স্বীকার ক'রতে চায় না। ও চায় প্নথিবী থেকে সব বন কেটে বসতি হোক মান্নষের জন্যে। তাই সে লোকটিকে বলল, দ্নচার দিন যাক তারপর এর ব্যবস্থা করা যাবে।

আর একটু এগিয়ে এসে হরিনন্দনকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, এই যে বন কেটে ওরা সব বসে পড়েছে বন বিভাগ কিছ্ন বলবে না?

বন বিভাগ মানে কি? —হরিনন্দন প্রতিপ্রশ্ন ক'রল এবং আমি সে প্রশ্নের অর্থ না ব্নঝে ওর ম্নখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার নীরবতার মধ্যে যে জিজ্ঞাসা ছিল তা ব্নঝে হরিনন্দন বলল, এই যে নেপালীরা যারা দিনরাত বনেই থাকে, বনে কাজ করে, বনেই বাঁচে আবার বনেই মরে তারাই তো বনবিভাগ। ওই দ্ন চারজন বাব্ন যারা শহর থেকে চাকরী নিয়ে অনিচ্ছায় বনবাসী হয় অথচ হ'তে চায় না, তারা কি বনবিভাগ? আমরা বনের মধ্যে ঘর ক'রেছি, জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই ক'রে বাস ক'রছি বন তো আমাদেরই।

হরিনন্দনের কথাগ্নলো শ্ননে অবাক হয়ে গেলাম। খাটো গলায় বললেও দেশনেতাদের বক্ত্নতা দেবার মত দ্নঢ়স্বরে সে কথাগ্নলো বলছিল। সত্য হোক মিথ্যা

হোক কথাগুলো সে বিশ্বাস করে বলেই মনে হোল। আমার কথা না বলার সুযোগে সে আবার বলল, আসলে কি জানেন? ওই জঙ্গলবাবুরা নেপালীদের ভয় করে। কারণ বনের মধ্যেই তো বাবুদের কাজ আর সে কাজ এরা ছাড়া চলবে না। তাছাড়া প্রাণের ভয়ও তো আছে? এই জঙ্গলে প্রাণের মালিক তো এরাই!—কথাগুলো বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হরিনন্দন। তারপর বোধকরি আমাকে ভাল ক'রে বোঝাবার জন্যেই বলল, এই জঙ্গলে কারও প্রাণ যদি যায় তবে তা বেঘোরেই যায়।

আমি বললাম, তাই বলে লোকে আইন মানবে না?

আইন তো বাবুদের সমাজের জিনিস। জঙ্গলে ওসব আইন কানুন চলে না।— কথাগুলো বলতে যেন বেশ গর্ব অনুভব ক'রল হরিনন্দন, বলল, এই তো এলেন, যদি থাকেন তো নিজেই বুঝবেন আপনাদের আইন এখানে সামান্যই চলে। ওই আইন মনে রাখলেও আমাদের চলে না।

মনে মনে বললাম, বুঝব তো নিশ্চয়, এখনই কিছুটা বুঝছি। কারণ যেভাবে জমি দখল ক'রে চাষ ক'রছে হরিনন্দন আইনে তা করা চলে না। এই গভীর জঙ্গলে আইন এসে পেঁছায় না বলেই সম্ভব। আরও গভীরে এসে ঘর ক'রেছে নেপালীগুলো। এখানে হয়ত বনবিভাগের বাবুরা দৈবাৎই এসে পেঁছায়। যদিবা কখনও আসে প্রাণ হাতে নিয়েই আসে, আর বনের প্রাণীদের চেয়ে মানুষেরা অনেক বেশী হিংস্র, ঘাতক হিসেবে অনেক নিপুণ, কাজেই বনবিভাগের বাবুরা নিশ্চয় এই বিশাল বনভূমিতে অল্প কয়েকটা কুঁড়ে ঘরকে সামান্য ব্যাপার হিসেবেই দেখবে।

আমি হরিনন্দনের কথার জবাব দিচ্ছি না দেখে সে কি ভাবল কে জানে, হঠাৎ বলল, কিন্তু এই নেপালীরা খুবই ভলে মানুষ। ওদের ক্ষতি না ক'রলে ওরা কিছু ক'রবে না। এখানে যারা বস্তি ক'রেছে এর সবাই আমার কাজ করে। গাছ কাটে, কাঠ টানে, নাংলো ক'রে বয়ে নিয়ে যায়। এদের সঙ্গে কাজ ক'রে দেখবেন মানুষ এরা খুবই ভাল।

একথাতেও আমি কিছু বললাম না। হরিনন্দন এবার আমাকে সরাসরি প্রশ্ন ক'রল, বাবু চুপ ক'রে আছেন কেন?

শুনছি, আমি জানালাম, তারপরই বললাম, কিসের যেন একটা খসখস শব্দ শুনছি—!

দাঁড়িয়ে পড়ল হরিনন্দন। কান পেতে শুনল, বলল, মনে হচ্ছে সাপের শব্দ।

বলতে বলতেই একটা বড় আকারের সাপ দেখতে পেলাম। হরিনন্দন বন্দুক তাক করার আগেই সাপটা সরে পড়ল। ওর অনুভূতিকে প্রশংসা ক'রে বললাম, শিকারের উদ্বোধন হিসেবে সারটা মন্দ ছিল না।

ও বলল, আমি কথা বলছিলাম বলে শুনতে পাইনি আপনি যে সময় শুনেছেন সে সময় শুনতে পেলে শালাকে মেরে দিতাম। আর আওয়াজ চেনার কথা বললেন, এত

দিন জঙ্গলে বাস ক'রছি জন্তুদের চলার আওয়াজ না চিনলে চলে ?

আমি একথার সূত্রে কোন কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রলাম না। হরিনন্দন নিজেই আবার বলল, ওই যে নেপালীদের দেখলেন ওরা এক মাত্র হাতি ছাড়া আর কোন জানোয়ারকে ভয় করে না। ওই টাঙ্গি, কুকরী আর বল্লম দিয়ে ওরা যে কোন জানোয়ারকে খতম ক'রতে পারে।

এটা বিস্মিত হবার মতই কথা। জানতে চাইলাম, বাঘকেও ?

বাঘ তো কোন কথা, কত ভল্লুককে এরা মেরে সাফ ক'রে দিল তার ঠিকানা নেই।

ভাবলাম সে কি ক'রে সম্ভব ? ওই রকম হিংস্র জন্তুদের শুধুমাত্র টাঙ্গি বল্লম দিয়ে মারা যায় কি করে ? প্রশ্নটা ক'রতে চাইলাম তার আগেই হরিনন্দন বলল, জঙ্গলে পথ চলবার একটা নিয়ম আছে। শব্দ না ক'রে চুপচাপ হাঁটতে হয়।

কিন্তু হঠাৎ-ই আমাকে একটু বেশী শব্দ ক'রে ফেলতে হ'ল। কিসে যেন কামড়ে ধরেছে পায়ে। দাঁড়িয়ে পড়ে পা তুলতে নজরে এল জোঁক। একটা জোঁক বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে রক্ত শুষে বিশাল আকার ধারণ ক'রেছে। আমি চট ক'রে হাত দিয়ে টানতে যাচ্ছিলাম হরিনন্দন আমার হাতটা ধরে আটকাল। তার পকেট খৈনির কৌটো থাকে তা থেকে একটু চুন বের ক'রে যেখানটা কামড়ে ধরেছিল সেইখানটায় টিপে দিয়ে আমাকে বলল চেপে ধরে থাকতে। আমি জোঁকের বিরাটত্ব দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। মনের ভাব প্রকাশ না ক'রে তার কথামত চুণটা চেপে ধরে রাখবার কিছুক্ষণ বাদে মনে হ'ল জোঁকটা খুলে পড়ে গেল আর ক্ষতস্থান দিয়ে সমানে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। হরিনন্দন ঝোপের মধ্যে থেকে কি একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে এনে ক্ষতমুখটার ওপর লেপটে দিল, বলল, চলুন আর রক্ত পড়বে না।

আমি নিঃসন্দেহ হ'তে পারছিলাম না কিন্তু চলতে লাগলাম। হরিনন্দন বলল, ডাক্তার সা'ব এই জঙ্গলে ওষুধ কোথায় পাওয়া যাবে ? এখানে আপনাদের বিদ্যা অচল। এখানে আমরা সবাই ডাক্তার। এই বনে এমন লতাও আছে যা ভাঙ্গা হাড় জুড়ে দিতে পারে। আপনি দেখুন রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

সত্যিই তার আত্মবিশ্বাস মূল্যবান। চেয়ে দেখলাম পাতাটা আশ্চর্যভাবে আটকে আছে পায়ের সঙ্গে। রক্ত ঝরছে না। এই পৃথিবীতে সবকিছুই তো আছে দরকার মত চিনে নিতে পারাই হচ্ছে আসল কাজ। ঠিকমত যারা চিনে নিতে পারে তারা জেতে যারা না পারে চিরদিনই ঠকে যায়। হঠাৎ পাশের গাছের ডালে বিকট একটা শব্দ হ'ল, আমি সন্ত্রস্ত হয়ে সরে আসছি হরিনন্দন নির্বিকার ভাবে বলল, বাঁদর লাফাল। এই এলাকায় অনেক বাঁদর।—তার নির্বিকার অভয়বাণীও আমাকে সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে পারল না আমি দৃষ্টি দিয়ে বিশাল গাছটার মধ্যে ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের চলার গতিতে পাশের গাছটার আড়ালে পড়ে গেল সেই গাছ। তবে অন্য একটা গাছে দেখতে পেলাম একটা নয় অনেক ক'টি বাঁদর

বসে আছে। নিচে দিয়ে আমরা যাচ্ছি বলে নেহাৎ যে দেখবে তাও দেখছে না।

সূর্য সোজাসুজি মাথার ব্রহ্মতালুর ওপর তখনই হরিনন্দন বলল, দেখুন। দেখুন কি অদ্ভুৎ গাছগুলো! কি বিশাল! এই গাছটায় কত টন কাঠ হবে? আচ্ছা ওটায়। বাঁ পাশেরটা দেখুন আরও মোটা। —আপন মনের আবেগে আরও এগিয়ে গেল হরিনন্দন, সামান্য দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, এত লম্বা গাছ আর কোথাও একটু বাঁক নেই! —এমনই অনর্গল বকে চলল সে। তার লোলুপতার আর এক রূপ দেখলাম আজ। সে যেন বিকারগ্রস্থের মত বকছে। আমি সেই বিশাল মহীরূহের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম না জানি কত বছর ধরে নিঃশব্দে আপন মাতৃভূমিতে বেড়ে উঠেছে এই বনরাজি। কি দীর্ঘ কাল রোদ বৃষ্টিতে সঞ্জীবিত হয়ে বিনা বাধায় প্রাণধারণ ক'রে এরা হয়ে উঠেছে বিশাল, যেন মহিমাময়! বেশ লাগছে। জোঁকের কামড় আর বনবাসীদের সম্পর্কে আতংক না থাকলে বেশ সুন্দর আজকের এই পদযাত্রা। আমার সেই চিন্তার বেগ ভঙ্গ ক'রে হরিনন্দনের কথাগুলো ফুটে উঠতে লাগল, কাল থেকেই কাজ আরম্ভ ক'রব। ফেববার সময় ওই দলটাকেই বলে যাই কাল থেকে কাটা আরম্ভ ক'রতে। আপনি দাঁড়িয়ে একটু দেখে নেবেন কেমন হচ্ছে।

আমাকে দেখে নিতে বলেছিল কিন্তু হরিনন্দনও পরের দিন না গিয়ে পারল না। বেশ কিছু দূরে থেকেই অনেকগুলো কুঠারের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম সমস্ত বনভূমিকে যেন চিৎকার ক'রে সজাগ করছিল প্রতিটি আঘাতের শব্দ। পথে দেখলাম একটা বড় ধরণের পাখি একটা নাম না জানা গাছের ডালে বসে ওই শব্দ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে যে আমরা গাছের নিচ দিয়ে যাবার মুহূর্তে উড়ে গেল ঝটপট ক'রে। তার ডানা ঝাপটানোর শব্দে হরিনন্দন দেখতে পেয়ে যেন আপসোস ক'রল, আহা ধনেশটাকে দেখতে পেলেন না ডাক্তার সা'ব? পালিয়ে গেল! বন্দুকটা তৈরী রাখবেন।

আমি একথার জবাব দিলাম না। গাছে একটা পাখি বসেছিল তাকে মারতে হবে। কেন মারতে হবে? কেন মারব তাকে? শুধু মাত্র আমার হাতে বন্দুক আছে বলেই মারব? কেন? সে তার আপন এক্তিয়ারের মধ্যে বাস ক'রছে তাকে মারতে যাবে কেন? না মারতে পারার জন্যে এত আপসোসই বা কেন? হরিনন্দনের পেছন পেছন ভাবতে ভাবতে চলতে লাগলাম। বাস্তবিকই এরকমভাবে অকারণ হত্যার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ভেবে পেলাম না। একসময় আমার বরং ভালই লাগল পাখিটাকে মারা হয়নি বলে। প্রকৃতির সৃষ্টি এই সব পাখিরা আকৃতি এবং প্রকৃতিতেও মানুষের চেয়ে অনেক সুন্দর। ধনেশটাকে আমি দেখতে পাইনি, আমাদের দেখেই সে উড়ে গেছে কিন্তু কই আমাদের দেখে তো তার মনে জিঘাংসা এল না যেমন আমাদের মনে এল! তাহ'লে কি মানুষের চেয়ে সুন্দর ওরা হ'ল না? ভাবতে ভাবতে শব্দের সামনে এসে পড়লাম। ওই বিশাল গাছগুলোর গায়ে কুঠারের কোপ পড়ে অদ্ভুত একটা

শব্দ উঠছে। সেই শব্দ ধ্বনি হয়ে দূরে চলে যাচ্ছে, প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরেও আসছে আপন উৎসের কাছাকাছি। কিছুক্ষণ শুনতে শুনতে কুড়ালের কোপ লাগবার শব্দ-গুলো আমার কানে কাতরানোর মত বাজতে লাগল। একসঙ্গে অনেকগুলো গাছ কাটা হচ্ছিল। মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে দু-পাশ থেকে দুজন লোক একের পর এক নিয়মিতভাবে কোপ মারছিল। কিছুক্ষণ বাদে লক্ষ ক'রলাম আমাদের সবচেয়ে কাছে যে গাছটা কাটা হচ্ছে তাতে একজন লোক কোপ মারা বন্ধ ক'রে দিল। অপর পক্ষের লোকটি একা আর অল্পক্ষণ কোপাতেই ভয়ঙ্কর একটা আর্তনাদ ক'রে হুড়মুড় ক'রে পড়ে গেল সেই সুবিশাল বৃক্ষ। চারপাশের গাছ গাছালি ভরে যে সব পাখিরা শুনছিল গাছকাটার আওয়াজ আকাশ জুড়ে উড়তে উড়তে তারা ছড়াতে লাগল শব্দময় আতংক। তাদের ভয়ার্ত চিৎকারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল বনস্থলী। শংকিত গাছের পাতায় পাতায় লাগল শিহরণ। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না ছোট বড় বনচর প্রাণীরাও হয়ত সেই শব্দের আঘাতে ছুটে সরে গেল দূরে, যেখানে অন্তত এই শব্দ পৌঁছাবে না সেই নিরাপত্তায়। সেই বিশাল গাছের অমনিভাবে আছড়ে পড়ার দৃশ্য এবং শব্দ আমার মনের মধ্যে কেমন যেন মোচড় দিল। মনে হ'ল আমি যেন ব্যথা পেলাম। একের পর এক গাছগুলো পড়ে পড়ে খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল। সেখানে সূর্যের আলো তৃণগুল্মের মাথা ছুঁতে পারল, কেবল কিছু অনামী গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল ধ্বংস স্তূপের মত। মাথার ওপর অসংখ্য ছোট বড় আতংকিত পাখি উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। তাদের চিৎকারকে পেছনে ফেলে আমরা ফিরলাম।

কিছুটা দূর আসবার পর হরিনন্দন বলল, চলুন একটু সোজা পথে যাই নইলে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

আমি মনে মনে ভাবলাম এবং হরিনন্দনকে বললামও, এ তো গভীর বন। এখানে পথটা কোথায় যে ঘুর পথ আর সোজা পথের তফাৎ বোঝা যাবে? আমি তো পথই দেখছি না। বনের মধ্যে দিয়ে আমি শুধু অন্ধের মত পেছন পেছন হাঁটছি।

বনের মধ্যে পথ চিনে চলা সত্যিই মুস্কিল, হরিনন্দন জানাল। প্রথম দিকে আমার কতবারই যে দিক ভুল হয়ে গেছে তার কোন হিসেব নেই। এখনও যে হয় না এমন নয়। নতুন এলাকায় ঢুকে পড়লে সব সময় ঠিক রাখতে পারি না। খ্যাদামারির জঙ্গলে ঢুকে ঠিক পথে আসতে আমাদের বহু সময় লেগেছিল। তাও তো সঙ্গে ছিল মনবাহাদুর—যে জানোয়ারদের চেয়ে জঙ্গলকে ভাল চেনে।

সোজা পথে চলতে গিয়ে সেই ভুলটা আবার না হয়ে যায়—আমি মনে মনে আশংকা ক'রলাম। মুখে কেবল বললাম, এ পথটা জানা তো?

এ দিক দিয়ে চলি না কারণ জানোয়ারের উৎপাত বেশী। তবে পথ অনেক কম। সূর্য থাকতে থাকতে বাড়ী পৌঁছে যাব।

অন্ধের যেহেতু রাত্রিদিনের তারতম্য নেই আমি চুপ ক'রে রইলাম। চলুক যেদিক দিয়ে খুশী। ওর কাছে তো ওর প্রাণও দামী এবং আমার থেকে কমদামী নয়। অতএব চল।

চলতে চলতে বুঝলাম সত্যিই এ দিকটার বন ঘন। বিশাল শাল গাছ এদিকে বিশেষ কম। বেশীর ভাগ ছোট ধরণের গাছ—জাম, আমলকী, মাদার, চালতা, গোকুল, ডুমুর, আর আছে পাণিসাজ, চাঁপা, কদম, বনকাঁঠাল, তাছাড়া বহুরকম নাম না জানা অচেনা লতাগুল্ম গাছ-গাছালি। বিশেষ ক'রে লতাগুলো একটা গাছের সঙ্গে আর একটা গাছকে জড়িয়ে এমন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছে যে সেই সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ভাবাও কষ্ট সাধ্য। অথচ সেই দিক দিয়েই আমাদের যেতে হচ্ছে। কোন কোন কোন লতা থেকে ঝুলছে গোছা গোছা বেগুনী, সাদা বা গোলাপী ফুল, কোনটা থেকে ফল আবার কোন কোনটা সুন্দর শুধু তার সবুজ পাতার গঠনগত সৌন্দর্যের জন্যেই। কিন্তু তাদেরকেই দলিত মথিত ক'রে চলতে হচ্ছে। আমাদের পথ ক'রে নিতে হচ্ছে ওই সব লতাগুল্মের বন্ধন ছেদন ক'রেই, তাদের লুটিয়ে দিয়ে শুকনো পাতার ওপর। মনে লাগছে না এমন নয়, ওই সবুজ পাতাগুলোর ওপর শক্ত জুতোর চাপ দিতে কেমন যেন মায়াই লাগছে। তা হ'লে কি হবে চলার পথে অমন কত সবুজ কত নরম গুঁড়িয়ে যায়, কত সত্য কত ন্যায় চেপ্টে যায় কে-ই বা তার আর খেয়াল রাখে! রাখলে কি চলে? চলা যায়? জীবন নির্মম। সে সব মাধুর্য শুষে নেয়। কখনও কখনও তা ভয়ংকর নির্মম, তখন সমস্ত ধ্রুবকে সে হত্যা করে কঠিন ভাবে শ্বাসরোধ ক'রে।

আমার ভাবনাকে চমকে দিয়ে হরিনন্দন আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ইশারা ক'রে সামনের দিকে দেখাল। সামান্য কিছুটা দূরেই একটা অল্প বয়স্ক বাঘ হেঁটে যাচ্ছে। আমাদের বার চোদ্দ বছরের ছেলে যেমন বাঘটারও সেই ধরণের বয়েস। অর্থাৎ ওই বয়সের ছেলেদের যেমন দেখায় তেমনি দেখাচ্ছে কিশোর বাঘটিকেও। হরিনন্দন ঠোঁটের আগায় তর্জনী ঠেকিয়ে শব্দ না ক'রতে ইঙ্গিত ক'রল। মানলাম। যাত্রা থামিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাকে বেশ কিছুটা দূরে সরে যাবার অবকাশ দিয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু ক'রলাম। হরিনন্দন ফিসফিস ক'রে বলল, বাঘবাচ্চাটার সঙ্গে ওর মা থাকতে পারে ভেবেছিলাম।—পরমুহূর্তেই সে আপসোস ক'রল, শালাকে না মেরে খুব ভুল হ'ল। নাঃ আপনি সত্যিই কোন কাজের নন ডাক্তার সা'ব। আর কারও হাতে এমন বন্দুক থাকলে কতগুলো জানোয়ার কোতল হয়ে যেত।

আমি কোন জবাব দিলাম না। সে আমার জবাবের জন্যে হয়ত অপেক্ষা করেনি শুধু শুধুই একটু থেমেছিল, আবার যেন নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে বলল, দূর! এতদিনে একবার বন্দুকটার ক্ষমতা পরীক্ষা করা পর্যন্ত হ'ল না।

সত্যি বলতে কি নির্দোষ প্রাণীগুলোকে অকারণ মারতে আমার ইচ্ছা ক'রছিল না। সে কথা না বলে হালকা ভাবেই হরিনন্দনকে বললাম, ব্যাপারটায় একটা গোলমাল আছে। আমাকে কষ্ট ক'রে যা শিখতে হয়েছে সে বিদ্যার উদ্দেশ্য প্রাণ রক্ষা. প্রাণ হত্যা নয়। দ্বিতীয়টা শেখাই হয়ে ওঠেনি।

আমার কথা শুনে কিছু বুঝল কিনা সে-ই জানে, বলল, জঙ্গলে জানোয়ার মারাকে তো শিকার খেলা বলে, সে আবার শিখতে হয় নাকি?

আমি জবাব দিলাম না। আসলে প্রসঙ্গটা আমার ভাল লাগছিল না। আমি এই নিবিড় গভীর গা ছমছম করা বনের আবহাওয়াটা অনুভব ক'রতে চাইছিলাম সমস্ত মন দিয়ে। সব সময় মনে হয় লক্ষ লক্ষ ঝিঁ ঝিঁ'র শব্দ চারপাশ থেকে ভেসে আসছে, সেই শব্দের সবটুকু শুনতে চাইছিলাম সমস্ত কান পেতে। তাছাড়া যে জানোয়ারদের মারবার কথা বলছিল হরিনন্দন তাদের সম্পর্কে ভীতির প্রচণ্ডতা সত্বেও দেখা পেতে চাইছিলাম আমি। আমার বরাবরই মনে হচ্ছিল বন্য প্রাণীরাও বনের সৌন্দর্যের অঙ্গ। প্রাণী-হীন অরণ্যও প্রাণহীন। তাই বাঘের কিশোরটি আমার মনে এক প্রচণ্ড ভীতি কম্পিত পুলকের স্পর্শ রেখে গেল।

মনের সেই মধু-স্বাদ বারংবার কষায় হয়ে উঠতে লাগল হরিনন্দনের বাক বিস্তারের আধিক্যে। আবার সে বলল, বনে বাঘ চলাফেরা ক'রলে হনুমানরা বা বাঁদররা গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়। মুখে একরকম শব্দ করে। পাখিরা উড়তে থাকে। এই সব লক্ষণ দেখে হয়ত অন্যান্য প্রাণীরা আত্মরক্ষার জন্যে সাবধান হতে চেষ্টা করে। বনে জঙ্গলে চলাফেরা ক'রতে হ'লে এগুলো জেনে রাখা দরকার।

আমি জেনে নিলাম। প্রতিদিনের পথ চলায় অনেক কিছুই তো জানছি। সব জায়গাতেই কিছু না কিছু নিয়ম থাকে, তেমনই আছে বনেও। লোকালয়ের থেকে প্রকৃতির রাজত্বের নিয়মের পার্থক্য এই, যে লোকালয়ের নিয়ম লিখিত, প্রকৃতির রাজ্যে তা অলিখিত। এখানে অনেক ছোট ছোট গাছ আছে যা এড়িয়ে পথ চলতে হয়। তাদের নাম লিখে বনের বাইরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়না কিন্তু প্রতিদিনের চলার পথে মানুষ বা অন্য বনচরেরা তাকে আপনি যায় চিনে। এখানে এমন গন্ধ আছে সেই গন্ধ ফুলের, তবু তা এড়িয়ে যেতে হয় নইলে তা প্রশ্বাসে ঢুকিয়ে দেয় বিষ। এসব নিয়ম মেনেই জীবনের ধারা বহমান।

চলতে গিয়ে সামনেই পড়ল একটা অদ্ভুৎ গাছ যার মাথায় লাল রঙের অবিকল আনারসের মত ফল। সুপারী গাছের মত গাছ, এক মানুষের চেয়ে একটু বেশী লম্বা, ওপরটায় তাল গাছের মত ঝাঁকড়া পাতা। পাতার গোড়া থেকেই সেই আনা-রসের মত ফল ঝুলছে। মোটা শিকড় গুলো অনেকটা উঁচু থেকে আলাদা ভাবে নেমে এসে চারপাশে ছিটিয়ে মাটিতে নেমেছে। বিচিত্র ধরণের এই গাছটাকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতে বলল, ওই গাছটার নাম কেউড়া। ওই ফলগুলো বানরে খুব ভালবাসে,

লোকেরাও অনেকে খায়। এদেশের লোকেরা বলে বোধহয় মউয়া।

এখানটায় চারিদিকে অনেকগুলো মউয়া গাছ এদিকে ওদিকে ছেটানো। আরও কতরকম গাছগাছালি যে এই বনে আছে তার আর হিসেব নেই। সে হিসেব ক'রবেই বা কে আর কি জন্যে ক'রবে? বনদপ্তর বা তাদের পোষ্যপুত্র এই হরিনন্দন-শ্রীদাম-ঘোষেরা হিসেব রাখে শুধু শালের, মানদানীর, পাকাসাজ-এর, পানিসাজ-এর। কারণ ওই কাঠগুলো টাকা এনে দেয়। তাও কেবল শাল আর মানদানীর ওপরই তাদের নজর। কারণ লোকেরা ঘরবাড়ী ক'রতে ওই দুটাবেই খোঁজে। যেখানে অজস্র শাল সেখানে কি দরকার পাকাসাজের? তাই পাকাসাজ দুনম্বরে। সমস্ত বাড়ীর দেয়াল পাটাতন সবেরই জন্যে মানদানী। তাই আর সব গাছগাছালি কেটে অকারণে শ্রম নষ্ট করে না কেউ জ্বালানীর প্রয়োজন না থাকলে। সে দরকার থাকলে গোটা কয়েক গাছ কেটে কাজে লাগিয়ে দেয়। বনের মাঝে মাঝে বসত করা মানুষেরা, কুলি, ঠিকাদার, দোকানদারেরাই দরকার মত সে কাজ করে, ইচ্ছামতও। মানুষের প্রয়োজনের হাত থেকে ছিটকে যাওয়া ওইসব অগুনতি গাছের বনের মধ্যে দিয়ে পথ চলছি হঠাৎ হরিনন্দন বলল, আপনি ক'লকাতা গেলে খুব ভাল জাতের পটকা নিয়ে আসবেন তো! এমন পটকা আনবেন কি সমস্ত বন কাঁপবে, বুঝলেন? শালা হাতি আর ভাল্লুক—এই দুই সর্বনেশে জীব থেকে বাঁচতে হ'লে পটকা ছাড়া পথ নেই।—তারপরই গলার স্বর একটু খাটো ক'রে বলল, একটু আগে কেমন গন্ধ ছাড়ছিল দেখলেন? ভালুকের গন্ধ। শালা ছিল কিনা বুঝতে পারলাম না, থাকলে খুব প্রাণে বেঁচেছি! ভালুক কাউকে ছাড়ে না।

ভল্লুক কেন, কোন জীবজন্তুর চরিত্র সম্পর্কেই আমি কিছু জানি না। সবে শুনছি, হয়ত নিজের অজ্ঞাতে কিছু শিখছিও তবে আগেও ভল্লুক সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে মনে হয় ভল্লুকেরা একটু বেশী রকম নিষ্ঠুর। কিন্তু কেন? এমনও তো হতে পারে যে তারা ভীতু বলেই নিষ্ঠুর। ভয় পায় বলেই ভয়ের উৎসকে বিনাশ ক'রতে চায়।

হরিনন্দনকে বোকা বানিয়ে পথেই অন্ধকার হয়ে এল। বলল, পা চালিয়ে চলুন। রাত হলে বনের মধ্যেই মরতে হবে। পথ হারিয়ে যাবে।

আমার মনে হ'ল হরিনন্দন এর মধ্যেই পথ হারিয়েছে। নইলে সে এর আগে যখন এ পথে গেছে তখন সন্ধের আগেই পেঁাছে গেছে নিজের ঘরে। আর এখন ঘরের দেখা পাওয়া তো দূরের চা বাগানের এলাকাতেই পেঁাছানো গেল না! আমারও কেমন যেন ভয় লেগে গেল, বন যেন আর ফুরোয়ই না। আমরা বোধহয় অন্যদিকে চলে এসেছি। মুখে সে কথা প্রকাশ ক'রলাম না। উপায় যখন নেই দেখাই যাক। আমার তো এখানে দিক সম্বন্ধে ধারণা করাও মুশকিল। সূর্য যে কোন দিকে অস্ত যাচ্ছে বুঝতে পারছি না সমস্ত বন জুড়ে কেমন যেন একটা শীতলতা নেমে আসছে, ঝিম ধরে আসছে সমস্ত পরিমণ্ডল। দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণে থমথম ক'রছে বিশ্বপ্রকৃতি। ভয়? নিজের

মনকেই যেন প্রশ্ন ক'রলাম, কিসের ভয়? কেন ভয়? আমি কি ভয় পাচ্ছি? অস্বীকার ক'রতে পারলাম না ভয় পাচ্ছি। ভয় জীবনের। এই বন অন্ধকারে যেন ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ভয় সেই ভয়ংকর হয়ে ওঠাকে, সেই অন্ধকারকে। নইলে দিনের আলোয় এই বনের মধ্যেই তো আমাদের সদা যাত্রা। এই বনেই তো আমাদের চব্বিশ প্রহরের জীবন। তবে কেন তাকে ভয় ক'রব? দৈনন্দিন পরিচয়ের জগৎকে কে কবে ভয় করে? ভয় তো অপরিচয়ের ভূমিকা। তাই। দিনেব আলোর পরিচিতি রাতের অন্ধকারে মুছে যায়। এই বনভূমি তখন সমস্ত পরিচয় অস্বীকার করে। প্রবল অপরিচয় আমাদের চোখের দুহাত দূরত্বে এসে দাঁড়িয়ে যায়। সারাদিনের চেনা ঝাঁকড়া গাছটিকে একেবারে অচেনা মনে হয়—যেন তার মধ্যে কি গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। তার অসংখ্য পাতার ফাঁকে যেন সমস্ত দিন ঘাপটি মেরে বসে ছিল কি এক গোপন দুরভিসন্ধি যা এখন লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবার মতলব ক'রছে! চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার যেন জীবন্ত কোন অপসত্তা যা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সব সময় আমার দিকে চেয়ে আছে উদগ্র বাসনায়। আমার এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় আমার ওপর লাফ দিয়ে পড়বে। অথচ এই ভয়ের মধ্যে একবারও ভাবতে পারি না যে আমি এই অন্ধকারেই ডুবে আছি। সমর্পিত আমি। যার ভেতরেই আছি তাকে আবার কিসের ভয়? কেনই বা ভয়? তবু ভয়। ভয় স্বাভাবিক উৎসকেন্দ্র থেকে সমস্ত যুক্তির পথ পরিহার ক'রে আতংকের হাত ধরে উঠে আসে মনের গর্ভ থেকে। সেই ভয় নিয়ে আতংকিত স্বরে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন ক'রে ফেললাম, আমরা আবার অন্য পথে চলে আসিনি তো?

হরিনন্দন হাঁটছিল আমার আগে। বলল, না। আমাদের হাঁটা সুরু ক'রতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। যাক চলুন। সামনেই একটা ঝোরা তার পরই চা বাগানের এলাকা পড়ে যাবে। ওই আশ্বাসে ঝোরার আশায় আবার চলতে লাগলাম। প্রায়ান্ধকার বনভূমি। এখন আর কাঁটাঝোপকে ঘাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিসে বেধে একবার মনে হ'ল প্যান্টটা যেন একটু ছিঁড়ে গেল। দেখতে পেলাম না, দেখবার অবসর নেই, চলতে হবে, দ্রুত চলতে হবে। হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়াল হরিনন্দন। আমার হাত চেপে ধরল, ফিসফিস ক'রে বলল, শুনছেন? আমি কিছু একটা শুনতে চেষ্টা ক'রলাম কিন্তু কি যে শুনতে হবে বুঝতেই পারলাম না।

অল্পক্ষণ কান পেতে থেকে তেমনই ফিসফিস ক'রেই জানতে চাইলাম, কি?

শব্দ শুনছেন না? ডালপালা ভাঙ্গার শব্দে হরিনন্দনের গলার স্বর আতংকিত শোনাচ্ছিল! আমি খুব একাগ্রতা সত্ত্বেও কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। সে আবার বলল, কোনদিক থেকে আসছে আন্দাজ করবার চেষ্টা করুন তো? মনে হচ্ছে হাতি আসছে। সন্ধের সময় তো ঝোরার দিকেও যেতে পারে।

হাতি! সে তো তবে দূর্বা ঘাসের মত মাড়িয়ে যাবে আমাদের! এখানে তো আর

-পথ নেই যে সরে দাঁড়াব! ওদের পথ তো সবটাই, মায় ছোটখাট ঢিবি কিংবা আমরা যে ঝোরার দিকে যাচ্ছি সেই ঝোরা পর্যন্ত। এখন উপায়? সেটা আর ভেবে পেলাম না। এই গহন বনে বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে বাঁচবার পথ এবং পদ্ধতি কিছুই আমি জানি না। জানে হরিনন্দন, তার ওপরে প্রাণ সমর্পন করার গতান্তর যখন নেই তখন রুদ্ধশ্বাসে তার নির্দেশের জন্যেই জড়বস্তুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তাছাড়া এই অরণ্যে লোকমুখে শুনেছিলাম হাতিরা নাকি আপন এলাকায় প্রচণ্ড গতি। অতএব বনের মধ্যে ছুটে পালাবার প্রশ্নই ওঠে না। লুকোব? কোথায় লুকোব? গাছ যার হেলায় ফেলার সামগ্রী তার ইচ্ছা থেকে মুক্তি কি গাছে উঠলেই পাওয়া যাবে? তবে এ কথাটাও শুনেছিলাম যে অকারণে ক্ষতি করার অভ্যেস হাতিদের নেই। নিষ্প্রয়োজন হত্যাও তাদের স্বভাবের বাইরে। কিন্তু তাদের চলার পথের সামনে পড়ে গেলে না জেনেই যদি হেঁটে যায় তাহ'লেও তো চেপ্টে মিশে যাব মাটির সঙ্গে।

গেলে যাব, উপায় কি? হঠাৎ হরিনন্দন আমার গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়াল, বলল, বন্দুক ঠিক রাখুন, অন্য জানোয়ার হ'লে মেরে দেবেন, ছাড়বেন না। হাতি হ'লে খবরদার! খুব আস্তে শব্দ হচ্ছে কোন জানোয়ার ঠিক বুঝতে পারছি না।

হরিনন্দনের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই শব্দ বেড়ে আমার শ্রুতি গোচর হ'ল। সত্যিই মনে হ'ল যেন দূরে ঝড় উঠেছে বনপ্রান্তে প্রথম ছোঁয়া লেগেছে তার, গভীরে এবার এসে পৌঁছাবে। ভেঙ্গে পড়ছে ডালপালা, লুটিয়ে পড়ছে নাতিদীর্ঘ কিছু কিছু গাছ। এবার আর আতংক নয় নিজের সত্তাকেই হারালাম আমি। শেষ প্রহরের ঘণ্টা যেন অমোঘ অস্তিমের বাণী বহন ক'রে নিকটতর ক'রছিল একটি সত্যকেই যার নাম সমাপ্তি। হাতে যে একটা অস্ত্র আছে এবং সেই অস্ত্রটি যে মানুষকে অন্যসব প্রাণীর ওপরে প্রভুত্ব বিস্তারে সাহায্য ক'রেছে সেই কথাটি সেই মুহূর্তে স্বাভাবিক ভাবেই মনে ছিল না। কেন যেন ওই অমোঘ ঘাতকটির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললাম। অথবা ওই প্রচণ্ড শব্দময় আয়োজনের সামনে এই বন্দুক আত্মরক্ষার উপকরণ হিসেবে মনে করা সম্ভবই ছিল না। সামান্য কয়েক মিনিট আগে হরিনন্দন আমাকে বন্দুকটার কথা মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সেটিকে আমি সম্পূর্ণই ভুলে গেলাম। সামান্য সময়ের মধ্যেই বোঝা গেল আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকেরই বাঁ কোণ থেকে শব্দ আসছে। শব্দ এগিয়ে আসছে। আচমকা দেখলাম বিকট কালো অন্ধকারের স্তূপ যেন অরণ্য ভেদ ক'রে সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা একটা বিশাল গাছের গুঁড়ির সঙ্গে লেপটে বসেছিলাম নিজেদের আড়াল করবার ঐকান্তিকতায়। সামনে যাকে দেখলাম সে এক বিশাল হাতি, মনে হচ্ছে যেন এক ছোট-খাট পাহাড়। আমরা তার থেকে মাত্র চার-পাঁচ হাত দূরেই এমন সময় সে শুঁড় উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে শিঙ্গা বাজানোর মত শব্দে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে সমস্ত জঙ্গল যেন দুলে উঠল, দুলে উঠল চাপ চাপ ভৌতিক অন্ধকারের কিছু পুঞ্জীভূত অস্তিত্ব। সামনের সেই বৃহত্তম স্তূপ দুপাশে মাথা

নাড়ল, কান দুটো নাড়ল তারপর সবকিছু স্বাভাবিক রেখে যে পথে যাচ্ছিল চলে গেল ডালপালা দুলিয়ে ছোট গাছপালাগুলো আপন পায়ের চাপে দলিত মথিত ক'রে। তাদের অস্তিত্বের শব্দ গাছগাছালির আড়ালে মিলিয়ে গেলে আমরা দুজনে উঠে দাঁড়ালাম, বিশ্বাস ক'রতে চাইলাম আমরা বেঁচে আছি। কথা বলবার চেষ্টা ক'রল হরিনন্দন কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম তার গলার বাইরে কোন শব্দ আসছে না। সে বারদুয়েক গলা ঝেড়ে, ঢোঁক গিলে সামান্য একটু শুকনো শব্দে বলল, হাতি মহারাজ চ'লে গেছে। উঃ আমি এতক্ষণ হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা ক'রছিলাম, ভগবান বাঁচিয়েছেন। হা রামজী! রামজীর কৃপায় বেঁচে গেলাম।

অরণ্য এবং অরণ্যচারীদের সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকা সত্ত্বেও আমি কিন্তু এই বেঁচে যাওয়াটাকে কোন রামজীর কৃপা বলে মনে ক'রতে পারলাম না, আমার মনে হ'ল এ বেঁচে যাওয়া নেহাৎ ওই হাতিদের কৃপায়। বিশেষ অনুকম্পা সেই যূথপতিরই যে আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়ে ধ্বনি সংকেত ক'রেছিল। আমরা সে সংকেত বুঝিনি, হয়ত বুঝেছিল তার গোষ্ঠীর সদস্যেরা। সেই সংকেত মেনে তারা আমাদের সম্পর্কে নিরুৎসাহ হয়ে চলে গেল আপন পথে। নইলে আমরা সেই বনভূমিতে পিষ্ট হয়ে মাটির পরিমাণ সামান্য কিছু বাড়াতাম হয়ত।

বাকি পথটুকু যে কিভাবে এসেছিলাম, কিভাবে পার হয়েছিলাম বাগানের প্রান্তের মাতলা ঝোরা সে আর মনে নেই কারণ এক আচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে ওই পথটুকু পার হয়েছিলাম বলে মনে হয়।

আপন ঘরে ফিরেই হরিনন্দন বলল, হাতির সামনে পড়লে হাতজোড় ক'রে গনেশজীর দয়া চাইবেন। গনেশজী সন্তুষ্ট হলে জীবন বাঁচতে পারে। যখনই বুঝলাম হাতিরা আসছে আমি হাতজোড় ক'রে জয় বাবা গনেশজী বলতে লাগলাম নিজের মনে, তবেই না হাতিরা আমাদের ছাড়ল! জীবনে আমি একরকম ভাবে হাতির সামনে পড়িনি। নইলে শালা হাতির মত বিপদজনক জানোয়ার আর দুনিয়াতে নেই।

এতক্ষণ হরিনন্দনের নির্বোধ কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলাম এবার অসহ্য লাগল। যে হাতিরা দয়া ক'রে আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে গেল, পরম মহানুভবতায় যারা অসীম শক্তিকে রাখে সংহত ক'রে, অকারণ হত্যা যাদের চরিত্রকে ক্ষুদ্র করে নি, সেই মহান প্রাণীগুলোকে অকারণেই গালাগালি দিচ্ছে হরিনন্দন। এটা আমার খুবই বিরক্তিকর মনে হ'ল। তার কল্পিত গনেশজী যে সেই চরম মুহূর্তে ওই হাতিগুলোই ছিল এখন এই বেইমান তা ভুলে গেছে। এক সময় যাদের অনুগ্রহ চেয়েছে পরম ঐকান্তিকতায়, তারা দয়া ক'রে প্রাণ রক্ষা করবার পরই তাদের গালাগালি দিতে পারে এমন অকৃতজ্ঞ জানোয়ার মনে হ'ল একমাত্র মানুষই হতে পারে।

ইচ্ছা হ'ল প্রতিবাদ করি, নিষেধ করি এরকম কথা বলতে, তারপর ভাবলাম কি হবে? এই মূর্খ, স্বার্থপর, লোভী জন্তুটিকে কি হবে সে সব কথা বোঝাবার চেষ্টা

ক'রে? প্রত্যেকটি প্রাণী চলে আপন স্বভাবে। অন্য ভাবের পরিবর্তন সম্ভব, স্বভাবের নয়। হরিনন্দনেরও স্বভাব তার জীবিত অবস্থায় বদল হবার নয়।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই হরিনন্দন বলল, আপনি কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করুন। গাছ তো অনেকগুলো কাটা হয়ে গেল আমি নাংলো দিয়ে নলবান্ধা সড়কের ধারে আনবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলছি। তাছাড়া এই ক'দিনে আরও অনেক গাছ কাটা হয়ে যাবে। এখন না গেলে সমস্ত কাজেই দেরী হয়ে যাবে।

আমি যে কলকাতা যেতে পারব না সেই কথাটি জানানোতে হরিনন্দন বেশ অসন্তুষ্ট হ'ল বুঝতে পারলাম। কিন্তু নিজের অসুবিধের কথাটা বোঝাতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার অসন্তুষ্টির প্রকাশও আমার ভাল লাগল না। আমি যে তার অন্নদাস এই কথাটা তার কথার ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমার মনের মধ্যে থেকে চট ক'রে ফুঁসে উঠল ক্রোধ। নিমেষের মধ্যে সে সাপের মত ফণা তুলে উঠল কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার মনে হ'ল, থাক। কি হবে অকারণ বাকবিতন্ডায়? আমি আমার মত আছি হরিনন্দন ওর নিজের মত। একদিন এসেছিলাম আর একদিন চলে গেলেই ফুরিয়ে যাবে। না হয় পাথেয় নেই পা তো আছে!

অবশেষে সিদ্ধান্ত হ'ল জলপাইগুড়ির মহাজনদের কাছেই আমি আজ যাব, সেখানের কথাবার্তা কি হয় বুঝে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। জলপাইগুড়ির মহাজনেরা যদি ন্যায্য দাম দিতে রাজী থাকে তো সেখানেই দিয়ে দেওয়া যাবে যা কিছু কাঠ আছে। শোনা যাচ্ছে ফুলচাঁদ মাড়োয়ারী—যার পাটের ব্যবসা আর তেলকল আছে আজকাল নাকি কাঠ কিনতে সুরু ক'রেছে। তার সঙ্গেও একবার কথা বলবার জন্যে বলে দিল হরিনন্দন।

জলপাইগুড়িতেই আলাপ হ'ল জিতেন বাবুর সঙ্গে। ভদ্রলোকের বাড়ী গোয়ালপাড়া। অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, সে কোনদিকে?

আসামের দিকে। ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে যেতে হয়।

কথাটা শোনবার বেশী কিছু করার আমার ছিল না কারণ তাঁর জবাব আমার বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সবদেশে যেতেই নদী পড়ে তাতে বিশেষত্ব কি থাকতে পারে? ভদ্রলোকও আমাকে বোঝাতে না পেরে ওই কয়েকটা শব্দ ব্যবহার ক'রলেন। আরও বিস্তারিত জানতে চাইলাম বলে জানালেন, এখান থেকে দেড়দিনের পথ।

কাঠের মহাজনদের কাছে উনিও কি একটা কাজে এসে জলপাইগুড়িতে ক'দিন ধরে ছিলেন। কাঠের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত দেখে পরামর্শ দিলেন, আমাদের ওই দিকে জঙ্গল এরও চেয়ে বেশী। শুধুই জঙ্গল। যদি জীবনে কখনও যান দেখবেন শুধু নদীর জল বাদ দিয়ে আর সবই গাছে ঢাকা। মাটি হয়ত কোথাও দেখতে পাবেন না।

আমি বললাম, এখানেও তো চারিপাশে শুধু জঙ্গলই দেখি। এক এই শহর ছাড়া আর তো যেদিকে তাকাই শুধু বন আর জঙ্গল।

এ আর কি দ্যাখেন। বললাম তো ওদিকে জঙ্গল কাটবার কোন দরকার হয় না। কে কাটবে অত? সেই কোন অতীত সময় ধরে যে সব গাছ জন্মেছে তেমনই আছে। একটা মরে আর দুটো জন্মায়। গাছ খালি বাড়েই, কমে না।

আমি শুনে কেবল বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললাম, সেখানে গাছ কাটে না কেউ?

একজন বিহারী মানুষ কেমন ক'রে বয়েক বছর হ'ল আরও ভেতরে সেই কুক্কাই তে গিয়ে বসেছে। সেই যা গাছটাছ কাটে। সে শাল কাঠ চেরাই ক'রে ওইদিকেই বিক্রি করে।

জিতেন বাবু বোঝেননি যে আমি কেবল জানার জন্যেই কথাগুলো জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম, তিনি ভাবলেন আমি কাঠের ব্যবসার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে চাই। তাই তিনি বললেন, আপনাকে বিশেষ সাহায্য এখনই ক'রতে পারছি না কারণ এবিষয়ে আমি কিছুই জানি না। তবে যদি আপনি চান চলে আসতে পারেন গোয়াল পাড়া। আমাকে নাম ক'রে খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। নইলে সদর বাজারই গুপী সাহার গদীতে গিয়ে আমার খোঁজ পাবেন।

আমি জানালাম, আমি ও ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী নই। আমি শুধু জায়গাটা কেমন তাই জানতে চাইছিলাম।—আমার কথা শুনে ভদ্রলোক যেন একটু সংশয়ী হয়ে উঠলেন, বললেন, না বলছিলাম এখানের ব্যবসা যদি ভাল না মনে করেন তাহ'লে— যার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ হরিনন্দনের কাঠের সাম্ভাব্য খরিদ্দারটি যেন আমাকে খাটো করবার ইচ্ছাতেই বললেন, উনি তো ব্যবসা করেন না, আমার যে মহাজন সেই শেঠ এর ঘরে কাজ করেন।—

কথাটা বলাতে আমার লাভক্ষতি কিছুই হ'ল না, কেবল আমার মাথায় একটু চিন্তা হ'ল, কি লাভের উদ্দেশ্যে কথাটি বললেন ভদ্রলোক?

আমিও অকারণেই বিশ্লেষণ ক'রতে লাগলাম কথাটিকে। কথাটি থেকে কি লাভ ক'রতে চাইলেন ভদ্রলোক? এক হতে পারে আমাকে ছোট ক'রে নিজের দর কোন কারণে বাড়াতে চাইলেন। হরিনন্দনের মত লোককে 'শেঠ' আখ্যা দেওয়ায় সে ভাব ফুটে উঠেছে অথবা ভদ্রলোক হরিনন্দনের সম্পর্কে সামান্যই জানেন বলে তাকে অনেক বড় মনে ক'রে সেই ভাবেই জাহির করলেন। আর আমার সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক কথাটি, সে-ও ওই নিবুদ্ধিতারই ফসল। তৃতীয় হতে পারে পাছে জিতেনবাবু আমার মত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে কোন অর্থকরী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তাই তাঁকে সাবধান ক'রে দেওয়ার ইচ্ছে—। এসবের মধ্যে যে কোনটা অথবা আর কোন উদ্দেশ্যে —যে জন্যেই বলে থাকুন আমি বেশ কিছুক্ষণ মাথা ঘামিয়ে অবশেষে জিতেন বাবুকে বললাম, দেখছি ব্যবসা করার প্রচুর সুযোগ এখানে। আমার মত হাজারখানেক লোক যদি এখানে ব্যবসা ক'রতে বসে তা হ'লে সারাজীবন নির্বিঘ্নেই ক'রে খেতে পারবে। কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কথাটা শুনে জিতেনবাবু আমার মুখের দিকে

এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা জীবনে আর শোনেন নি। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি পরামর্শ দেবার মত ক'রে বললেন, আপনার এই সামান্য বয়েস, আপনি যদি এখন সুরু করেন—অবশ্য ব্যবসা ক'রতে হ'লে কিছু টাকা তো লাগবেই।

সেটাও ব্যাপার নয়—আমি জানালাম।

তবে ?

অর্থাৎ কেন আমি ব্যবসা ক'রতে চাইনা সেইকথাটা জিতেনবাবু জানতে চান. তাঁর এই আন্তরিকতাটুকু ভাল লাগল। মনে হ'ল ভদ্রলোকের মধ্যে সহানুভূতি জাগবার মত একটু হৃদয় তবু আছে। কিন্তু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি তাঁকে আমার মনের কথা ব্যাখ্যা ক'রতে পারলাম না। কারণ তা সম্ভব নয়। সে সব আমার মনের একান্তই নিভৃত চিন্তা, অন্যের পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয় অন্যকে বোঝানোও আমার পক্ষে সমান অসম্ভব। মাঝখান থেকে হবে শুধু কেবল অহেতুক কিছু কথার বিস্তার। কারণ লোভে মোহে আকর্ষণে মানুষের সমাজের ভিত্তিভূমি বাঁধানো। কাজেই সিমেন্ট বা চুন সুরকি যাই হোক না কেন মশলা ছাড়া ইঁটের গাঁথনির কথা যেমন অচিন্ত্যনীয় তেমনি আমার মনের ব্যাপারটাও। যে মশলা দিয়ে আমাদের এই মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা চলছে সেই মশলাই যে আমার মনের মধ্যে থেকে কবে আস্তে আস্তে ক্ষয়ে গেছে কেউ তা বুঝবে না, জানবেও না। তবে কি আমি নির্লোভ ? মোহশূন্য ? আকর্ষণহীন ? বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে চাইলাম নিজের মনকেই। যদি আকর্ষণহীন হবো তাহ'লে কেন জিতেনবাবুর কথা মত কল্পনা ছুটছে ? এ কি আকর্ষণ নয় ? দেখার আকর্ষণ, জানার আকর্ষণ ? চিন্তা ক'রে দেখলাম—না। তেমন ইচ্ছের দেখা পাচ্ছি না যে ওই দেশকে দেখতে বা জানতে যাব। কি বা আছে দেখবার ? যতটুকু পৃথিবী আমি ঘুরেছি অনেকগুলো নদীই পেরোতে হয়েছে আমাকে, তেমনি কোন এক নদী পেরোলে এমনই কোন এক জনপদ যার নাম হয়েছে গোয়ালপাড়া। এ নাম কে রেখেছে কেন রেখেছে কে জানে উত্তর, তার কি প্রয়োজন ? এই যে মাটিতে আমরা জন্মেছি আরও অসংখ্য কীট পতঙ্গের সঙ্গে এই জন্মভূমির নাম আমরা কে যেন কবে দিয়েছি পৃথিবী। তাকেই টুকরো টুকরো ক'রে নামকরণ করেছে মানুষেই আবার তাদের ইচ্ছামত, কি জানি অন্য প্রাণীরাও আবার নিজের নিজের মত নামকরণ ক'রেছে কিনা ! কি বা আসে যায় তাতে—এই জন্মস্থানের যেখানেই যাও না কেন মাটি পাথর জল, এ ছাড়া আর কি আছে ? ওই যে গোয়ালপাড়া—সেও তো এমনি মাটি দিয়ে গড়া জল দিয়ে ঘেরা—পাহাড় আছে ? শেষ কথাটুকু জানতে চাইলাম।

জিতেনবাবু জানালেন, আছে। অনেক পাহাড়। তিনদিকেই পাহাড়।

তবে তো সবই এক—মনে মনে বললাম। জিতেন বাবু কি ভাবলেন জানি না বললেন, এখানে তো পাহাড় নেই কিন্তু গোয়ালপাড়া যেতে পাহাড়, পার হতে পাহাড়,

তার গায়েই পাহাড়।

হ্যাঁ, এখানে অবশ্য একটু দূরে, আমি স্বীকার ক'রলাম। কিন্তু তাতে কি। আমার আদৌ কোন আগ্রহ নেই সেখানে যাবার। যে কোন সচল প্রাণী তার বেঁচে থাকবার মত একটু আশ্রয় খুঁজে নেয়, যেখানেই সেটা সে নিতে পারে সেখানেই তার আনন্দলোক। পাহাড়ে জন্মানো প্রাণী পাহাড়ে, সমুদ্রে জন্মানো প্রাণী সমুদ্রেই খুঁজে পায় তার আশ্রয়। কদাচিৎ দেখা যায় একস্থানে জন্মানো প্রাণী আশ্রয় খোঁজে অন্য ভূমিতে। কাজেই আমার পাহাড় খোঁজার তো বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই! জিতেনবাবু সরল ভাবেই কথা বলছিলেন, এমন ভাবে যেন আমার গোয়ালপাড়া যাওয়া তাঁর পক্ষে বিশেষ জরুরী। কিন্তু তার কিছুই নয়। হয়ত তাঁর কথা বলার ভঙ্গীই ছিল অমনি। শুনলে মনে হবে যে আগ্রহ করে আমাকে তাঁর কাছে ডাকছেন কিংবা উপদেশ দিচ্ছেন ওখানে যেতে। আদতে তা নয়, ওটা তাঁর কথা বলার ভঙ্গী। ওই ভাবেই কথা বলে থাকেন। সকলের সঙ্গেই বলেন। তা হলে তো আরও সুন্দর। আর সেই সৌন্দর্যের জন্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে ভাল লাগল। জানতে চাইলাম, আপনার কিসের ব্যবসা?—

সে আর জিজ্ঞেস ক'রবেন না। যা পাই তাই করি। ভূষিমাল কিনি, পাট কিনি, লবণ কিনে নিয়ে যাই এদিক থেকে, ওখানে বেচি।

সেই অনাবিল সরলতা। আবার বললেন, ওইখানে সব কাজেরই অনেক সুযোগ। দোকানদারী ক'রলেও খুব ভাল চলে। ভাবছি আমার বড় ছেলেটাকে একটা দোকান ক'রে বসিয়ে দেব।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। পরামর্শ বা সম্মতি দেওয়া আমার এক্তিয়ারের বাইরে। ওটা সাধারণত বড় মানুষের কাজ। আমি দেখেছি সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত, যারা উঁচু পদে আসীন উপদেশ বা পরামর্শ দেবার অলিখিত অধিকার চিরদিন তাদেরই আয়ত্তে। কেউ গ্রহণ করুক বা অপছন্দ করুক অকৃপণ ভাবে ওটা দান করার অভ্যেস তাদেরই। আমার তুলনায় জিতেনবাবুও বড়মানুষ, কাজেই তাঁকে পরামর্শ দেবার সাহস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর পরামর্শ বা সমর্থন তো উনি চাইছেনও না উনি খালি আপন পরিকল্পনার কথা বলছেন। এই যে বলা এ একরকম তৃপ্তি। মনের কথা গাছকে বলেও অনেক সময় হালকা একটা সুখ পাওয়া যায়। আমিও অনেকবার পেয়েছি। আমার মনে পড়ে অলকানন্দার সঙ্গে প্রথম আলাপের সুখের কথা একদিন হোস্টেলের পরিচারক নীলমণিকে বলে ফেলেছিলাম; মনে আছে তাতে যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম সে অতি রমণীয়, গভীর। অথচ পরবর্তী কালে সেই কাজকেই মনে হয়েছিল নিবুদ্ধিতা। সে অবশ্য সত্যিই বোকামী ছিল। নীলমনি হয়ত মনে ক'রে বসে নেই কিন্তু সেই বোকামীর কথা আমার স্মরণে আছে।

প্রসঙ্গটা থাক। কারণ এই জবানবন্দী অলকানন্দার কাছে দৈবাৎ পেঁছালে সে

আবার সেই মূঢ় চপলতার জন্যে নতুনতর ভৎসনা ক'রবে আমায়। অবশ্য সে আমায় বাজবে না, কারণ এখন আমি স্থানগত দূরত্বেই শুধু নেই কালগত দূরত্বে আছি অনেক। জীবনের সূর্য এখন, চোখ না তুলেও দেখতে পাচ্ছি অনেকটা পশ্চিমে। তার পূর্বগামিনী ছায়ার সামনেই তো বসে আছি। হয়ত অলকানন্দাও। অস্বাভাবিক চিন্তা তো ক'রতে পারি না তাই যা আমার জীবনে সত্য সেই আলোতেই চিন্তা করি অন্য জীবনকেও। কিংবা হয়ত এও হয়ে থাকতে পারে তার জীবনের সূর্য—যদিই অস্তমিত হয়ে থাকে প্রচণ্ড দাহে জলে গিয়ে, তাতেই বা ক্ষতি কি? একটু আগে বা পরে নিভে যাওয়াই যখন সত্য তখন সেই সত্য মাথা নত ক'রে স্বীকার ক'রে নেওয়াই তো শান্তির। মানুষের চলতি আয়ুর হিসাবে যেহেতু আমি এখনও বেঁচে আছি, শরীর একেবারে অচল নয় কাজেই মনে হয় সে ও বেঁচে আছে এখনও। এবং ভালোই আছে। ভালই থাক। আমিও আমার মত, সেও তার মত থাক। পৃথিবীর প্রত্যেকেই নিজের মত ক'রে থাকতে চায়। তাই এত মতান্তর। এক পরিবারে, পরিবারে কেন দীর্ঘ কাল এক সঙ্গে থেকেও স্বামীস্ত্রীতে মতান্তর, মনান্তর, সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে কখন কখন। সংঘর্ষ মানুষে মানুষে, গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে, জাতিতে জাতিতে, এর সবের মূলেই ওই এক চিন্তা, আমি যেভাবে বাঁচতে চাই সেটাই সত্য। আসলে প্রত্যেকেই নিজের ভাবনাটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই অথচ এর কোনই অর্থ হয় না। অন্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ না করে, যেভাবে খুশী থাক এবং থাকতে দাও। যদি মনে কর দৈনন্দিন ঘর্ষণের তাপ দগ্ধ ক'রবে তবে সরে যাও। এই আমি আমার মত ক'রে বেঁচে আছি, অলকানন্দা আছে তার মত ক'রে। সে নিশ্চয় শান্তিতে আছে, আমি? দিনযাপনের নিত্য অশান্তির ওপরে তো নিশ্চয়ই। আসলে যে সংগ্রাম মতাদর্শের তা থেকে আমি মুক্ত। সে সংগ্রাম যাকে সংঘর্ষ বললেই ঠিক হবে সভ্য সমাজে যত তীব্র এবং ব্যাপক আমাদের এই প্রকৃতির রাজ্যে তত নয়। এখানে মোটামুটি ভাবে আমরা মেনে নিই প্রকৃতির নিয়ম। সভ্য সমাজ প্রকৃতিকে তোয়াক্কা করেনা বরং তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করে। তীব্র ভাবেই ক'রতে চায়। তারা যাকে সভ্যতা মনে করে এখানকার মানুষ তাকে সভ্যতা বলে ভাবে না। এদের জীবনযাপনের পদ্ধতিই এদের কাছে সভ্যতা। কাজেই আর এক সংকট আমি প্রত্যক্ষ করি মানুষের জীবনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

কি বলতে কি সুরু করলাম। আসলে পরের কথায় এসে পড়লাম প্রত্যাশিত সময়ের অনেক আগেই। এ যেন এক লাফে সমুদ্র পেরোনোর মত হ'ল। সেই জলপাইগুড়িতেই যাই যেখানে জিতেন বাবু আছেন, আমি আর তিনি একই মহাজনের ঘরে রাত কাটাচ্ছি পাশাপাশি বিছানায়। এক সময় জিতেন বাবু বললেন, যাই বলেন টাকা ছাড়া কিছুরই কোন দাম নেই। টাকা রোজগার করুন দেখবেন জীবনের সব কিছু অন্য রকম মনে হবে।

অনেক কথা থাকে যার জবাব দেওয়া যায় না। মনে হয় যে অনেক ওপর থেকে

কেউ দান ক'রছে, যা আর ছ‍ুড়ে ফেরৎ দেওয়া অসম্ভব। সে সব কথা কেবল গ্রহণই ক'রতে হয়। সে কথার জবাব না পেয়ে জিতেনবাব‍ু বললেন, ব্যবসা, তা সে যে জিনিষেরই করেন না তাতেই লক্ষ্মী। আমার বাবা বলতেন মাটিতেই লক্ষ্মী তাই মাটি দিয়ে লক্ষ্মীর ম‍ূর্তি গড়া হয়।

ওঁর কথা উনি যখন বলছিলেন তখন উনি আদৌ ভাবতে পারছিলেন না যে আমি লক্ষ্মীর একমাত্র ত্যাজ্যপ‍ুত্র এবং লক্ষ্মীলাভের বাসনা আমার একেবারেই নেই। তব‍ু যেহেতু বয়স্ক লোকের উপদেশ তাই মাথা পেতে না নিতে পারলেও কান পেতে শ‍ুনছিলাম। কিন্তু অচিরেই আমার মনে হ'ল জিতেনবাব‍ু সেই শ্রেণীর একটা পোকা যে কেবল নিজের চারপাশে মাটির স্ত‍ূপ জমা ক'রতেই ভালবাসে। আমি তঁার কাছ থেকে অন্য কোন কথা শ‍ুনতে পেলে খ‍ুশী হতাম কিন্তু তিনি আমাকে যত কথাই বললেন প্রত্যেকটার মধ্যেই সেই অর্থচিন্তা। আমরা ছেলেবেলায় শ‍ুনতাম মান‍ুষ বনে যায় তপস্যা ক'রতে কিন্তু আজকাল দেখছি মান‍ুষ যায় টাকা তৈরী ক'রতে!

কি জানি কেন টাকা তৈরীর এই পদ্ধতিটিকে আমার ইদাণীং কেমন যেন মনে হচ্ছে। কি স‍ুন্দর সব‍ুজ বনভূমি, বিশাল সব গাছ, কোন ব্যাংকে জমানো বা টিনের বাক্স ভর্তি ক'রে রাখা কাগজের চেয়ে কি এগ‍ুলো স‍ুন্দর নয়? আমি যখন পথ চলি আমার চেয়ে বিশ পঁচিশ ত্রিশ গ‍ুণ উঁচু গাছগ‍ুলো আমাকে ঢেকে রাখে প্রচণ্ড স‍ূর্যের দাহ থেকে। তারা দেয় শীতলতা, দেয় শান্তি। বিনিময়ে আমরা কি দিই তাদের? কিছ‍ুই না। কিছ‍ু প্রত্যাশাও করে না তারা। এমন যে নির্লোভ দান, নির্মোহ সেবা, এ অপরিমেয়। অথচ এভাবে দেখিনা আমরা। ও গ‍ুলো গাছ। ওদের সম্বন্ধে চিন্তা কখনও করিনা, চিন্তা করবার কথাও ভাবি না। বরং সত্যি বলতে কি ওদের কিছ‍ুটা অবজ্ঞাই করি। গাছ, অর্থাৎ জঙ্গল। কাটো। পরিষ্কার কর। সেখানে তৈরী কর অট্টালিকা। মাটি থেকে আহরণ করা পাথর থেকে লোহা তৈরী ক'রে সেই লোহার যন্ত্রে পিষ্ট কর ধরণী। তার সন্তানদের কর ধ্ব‍ংস। মথিত কর তাদের অস্তিত্ব।

কিন্তু তব‍ু তারা জাগে। আমি কলকাতার মত বিপ‍ুলকায় শহরে দেখেছি জীর্ণ প্রাসাদ ফ‍ুঁড়ে উঠেছে শিশ‍ু বিটপী, পাথর বাঁধানো পথের ফাটলে উঁকি দিয়েছে দ‍ূর্বা। তখন এর তাৎপর্য ব‍ুঝিনি। নাগরিক চোখে বিশাল বাড়ীর ফাটলে চারা গাছ বা কোথাও কোন নবদ‍ূর্বার কণ্টকর আশ্রয় দেখে ব‍ুঝিনি তার তাৎপর্য। আজ মনে হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে মান‍ুষের নিঃশব্দ সংগ্রাম চলছে অহরহ। প্রকৃতি তার সীমানা প‍ুনর্দখল ক'রতে চাইছে প্রত্যেক ম‍ুহ‍ূর্তে আর মান‍ুষ তার অসীম ক্ষ‍ুধায় প্রকৃতির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে আরও মাটি। পৃথিবীর যথেচ্ছ অধিকার পেয়েও ক্ষ‍ুধা তার অসীম। এই ক্ষ‍ুধা হরিনন্দনের চোখে ম‍ুখে—যেন সারা গায়ে ফ‍ুটে বেরোচ্ছে। একদিন সন্ধে বেলায় কোন কাজ না থাকায় সে আমাকে নত‍ুন পেয়ে বোঝাচ্ছিল এত যে জমি বনজঙ্গল হয়ে নষ্ট হচ্ছে তাদের ম‍ুল‍ুকে হলে তা হ'ত না।

লোকে তামাম জঙ্গল কেটে ক্ষেত বানিয়ে ফেলত। এখানে তো মানুষ নেই খালি জঙ্গল আর জানোয়ার।

আমি বললাম, বনে তো বনের প্রাণীরাই থাকবে—

আমার কথাটা যেন মনঃপূত হ'ল না হরিনন্দনের। সে বনের প্রাণীদের বেঁচে থাকবার অধিকারই স্বীকার ক'রতে চায় না, বলল, ওসব তো জানোয়ার। দেশ থেকে জানোয়ার খতম ক'রতে না পারলে মানুষ থাকবে কোথায়?

মানুষের জন্য কি কম জায়গা আছে?

হরিনন্দন তার দূরদর্শিতা দেখাতে বলল, জায়গা কমই আছে বাবুজী। ধরুন আমার যদি দশটা বাচ্চা হবে তবে দশটা বাড়ী তো চাই—।

জীবনের স্বপ্ন গুলো হরিনন্দনের খুবই সুন্দর! মুখে তারিফ করবার মত না হলেও মনে মনে ঘৃণা করবার মত বটে। কিন্তু তাতেই বা লাভ কি? যার যেমন মানসিকতা। অর্থাৎ পোকারও মানসিকতা থাকে। দশটা বাচ্চার স্বপ্ন থাকে পোকা মাকড়ের মনে!

হরিনন্দনের কথাগুলো মনে আসতেই অসহ্য হ'ল আমার। কোন সংঘাত নয়, কোন মনোমালিন্য নয় অকারণেই মনে হ'ল এতদিন এই প্রচণ্ড লোভের সঙ্গে থেকে নিজেই কেমন যেন কুঁকড়ে গেছি। এভাবে আরও কিছুদিন থাকলে আমার দৈর্ঘ কমে যাবে, ওজন কমে যাবে, প্রসারতা কমে যাবে—আমি ছোট্ট একটি ঘাসের পোকায় পরিণত হয়ে যাব। আমার প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতা এই সময়ের কৃচ্ছসাধনের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষিত। সেদিক থেকে হরিনন্দন সুখী। সত্যি বলতে কি আমারও কোন অসুখ নেই। যেদিন দূরে কাজের মধ্যে সময় কেটে যায় সেদিন হরিনন্দনের গামছার পুঁটলি থেকে ছাতু আর লংকা বেরোয় দুজনেই খাই পরম তৃপ্তিতে। গণ্ডুষে পান করা ঝর্ণার জলের সঙ্গে মিতালি ক'রে সেই ছাতু পেটের মধ্যে ফুলে ফেঁপে যে বিশাল আকার ধারণ করে তা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু উপলব্ধি ক'রতে পারি। অত্যন্ত বুদ্ধিমান হরিনন্দন আমাকে তার মত ছাতুভুক্ দেখতে কোনদিন বিস্ময় প্রকাশ করেনি আমার উৎসাহ নিবৃত্ত হবার এবং তার কাজের এই উপরি সুবিধেটুকু নষ্ট হয়ে যাবার আশংকায়। কিন্তু সে তার প্রখর বুদ্ধি সত্ত্বেও অপরকে বুঝতে না পারার স্বাভাবিক দুর্বলতা বশেই বুঝতে পারেনি আমার মানসিকতার পর্যায়। ঘটনার পারম্পর্য ভাবতে সে চেষ্টাও করেনি, নইলে অতি সহজেই বুঝতে পারত যে লোক শহরের প্রতিষ্ঠিত জীবন ছেড়ে এসে বনবাসী হয়েছে স্বেচ্ছায়, খাদ্য বাছাই তার কাছে কোন বড় ব্যাপার নয়। পেটের ক্ষিধে মেটানো আর শরীরের চলবার মত শক্তি ঠিক রাখা, এর জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর পোকার বা প্রাণীর আছে ভিন্ন ধরণের খাবার। যা হোক একটা খেলেই হ'ল যাতে শরীর চলে। মানুষ তার লোভের জন্যেই সন্তুষ্ট হতে পারে না, সে চায় নিবৃত্তির চেয়ে বেশী কিছু, তৃপ্তি। বাঘ মাংস খায় গাছগাছালি খায় না আবার সেই বনেরই

হরিণের ক্ষুন্নিবৃত্তি সামান্য দুটো ঘাসে। তাতেই তার উদর পূর্তি, ক্ষুধার নিবৃত্তি। কাজেই আমার চাহিদা বেশী না থাকাতে সংঘাত কোন ঘটেনি, তবু মন টিকল না।

সেই দিনই জিতেনবাবুর ফেরবার ছিল ত'ার সঙ্গ নিলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে ত'ার সঙ্গী হওয়াতে ভদ্রলোক আশ্চর্যই হলেন। জানতে চাইলেন, আপনার জিনিষপত্র? অত্যন্তই সামান্য যা অবশিষ্ট ছিল দেখাতে বললেন, সে আপনাকে দেখেই বুঝেছি চলুন দেখে শুনে আসবেন, ভাল লাগলে চলে যাবেন।

চলে আবার যাব কি? চলেই তো যাচ্ছি—মনে মনে জানতাম, কথা বললাম না। আসলে উনি ভাবছিলেন আমি জায়গাটা দেখতে যাচ্ছি। যা ভাবছেন ভাবুন আমি আর ও'র ভাবনাতে কোন সংশোধন ঘটাতে চাইলাম না।

ছোট্ট শহরে এসে উনি আমাকে জানালেন ধুবড়ী। কি আশ্চর্য সুন্দর জায়গাটাই না বেছে নিয়েছে এখানকার বাসিন্দারা। সারা পথ ঘিরে আছে বিরাট চ'াপা আর ক'াঠাল গাছ। চারিদিকে অজস্র স্বর্ণচ'াপার সমারোহ। টিনের বাড়ীগুলোকে ছায়াময় ক'রে রেখেছে কোথাও ক'াঠাল, চ'াপা, কোথাও জাম। পৃথিবীতে এত গাছ ক'টা গাছেরই বা নাম জানি? নাম যাদের শুনে শুনে জেনেছি চিনি না তাদের অনেককেই। তেমনি সব গাছের ছায়া-স্নিগ্ধ জনপদের মধ্যে দিয়ে কিছুটা চলে এসে সত্যিই হতবাক হলাম। নদী। অতি মোহনরূপে এক বিশাল বিস্তৃত জলধারা আপনাকে প্রসারিত ক'রে রেখেছে এই সবুজ শ্যামল ভূমিকে নিবিড় গৈরিকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অপার মুগ্ধতায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। জিতেনবাবু জানালেন, ব্রহ্মপুত্র। আমাদের ওপারে যেতে হবে।

এই তাহ'লে ব্রহ্মপুত্র। নদ। হ'্যা তাই বটে, নদী নয় ছেলেবেলায় ভূগোল বইতে পড়েছিলাম ব্রহ্মপুত্র নদী নয় নদ, তার কারণ বুঝলাম। এর সমস্ত সত্তা জুড়ে পৌরুষ। সৌন্দর্য আছে, সে সৌন্দর্য ললিত ব্রততী সুলভ নয়, বীর্যবত্তায় ঋজু, বলিষ্ঠ। মোহিত হয়ে কিছুক্ষণ দেখার পর জিতেনবাবুর কথার জবাব দেবার শব্দ উঠে এল ভেতর থেকে, বললাম, ওপারে যেতে হবে বলেছেন, কিন্তু ওপারটা কোথায়?

আছে। দেখা যাচ্ছে না। ওই যাচ্ছে। ওই দেখুন লক্ষ ক'রে, আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে।

আমি এ কূলে দ'াড়িয়ে অকূল দরিয়ার অপর দিকের কিনারা খুঁজতে চাইলাম। আমার চোখের সামনে বড় বড় মহাজনী নৌকা, বিশাল আকৃতির মালবাহী গাধাবোট, জেলে পানসী ভেসে বেড়াতে লাগল আর ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগল লালচে হলুদ ঘোলা জলের সীমাহীন সমাবেশ।

জিতেনবাবু আমাকে স্টীমার ঘাটে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন। অসীমের বুকে সীমাবদ্ধ আয়োজন! এর বেশী আর কতটুকই বা পারে মানুষ! কিন্তু তাই দিয়েই তো কাজ চলছে, মানুষের প্রয়োজন তো মিটে যাচ্ছে সেই আয়োজন দিয়েই। যে বিপুল

জলরাশি বিশাল বাধার সৃষ্টি ক'রেছে চলার পথে, তাকে অতিক্রম ক'রে কার্যত প্রকৃতির ওপরই ক'রছে প্রভুত্ব।

স্টীমারের ওপর উঠে সেই বিপুল জলরাশি পার হবার সময় মনে হ'তে লাগল বহুদিন মানুষ যা পারে নি এখন হঠাৎ কি ক'রে পারল ? বহুলক্ষ বছর তো সে একই অঞ্চলে আটকে থেকেছে প্রাকৃতিক বাধাকে বাধা বলে স্বীকার ক'রে নিয়েই! কিন্তু এখন কেমন করে পারছে? এত লক্ষ বছর ধরে মানুষ পারল না হঠাৎ এখনই বা পারল কি ক'রে? জলের ওপর দিয়ে পার হওয়া তো কিছুর ওপর দিয়ে যাওয়া, শূন্য দিয়ে যাওয়া? তাও তো পার হচ্ছে মানুষ! শূন্য দিয়ে বরং দূরত্ব ক'রে নিয়েছে সংক্ষিপ্ত।—এই সব অপ্রয়োজনীয় ভাবনার মধ্যদিয়ে ওপার দেখা গেল। পৌঁছোলাম। তখন মনে হ'ল কোথায় যাচ্ছি? কেন? এই তো বেশ ছিল ওই অসীম জলরাশির ওপর দিয়ে পারাপার যদি চলতেই থাকত, মন্দ কি? বরং সেই ছিল ভাল। আবহমান বহমান নদীর ওপর আজীবন পারাপার তবু কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই যে একরকম পোকা আছে স্ববৃত্তে ঘোরে, শুধু ঘোরে; পৃথিবীর সঙ্গে তার আছে সাযুজ্য, আত্মিক সংযোগ, কারণ পৃথিবীও তো ঘুরছে! আমারও একটা প্রাকৃতিক ভাবে যদি সংযোগ থাকত এই নদীর সঙ্গে জলধারায় সঙ্গে, যদি খেয়া পারাপারের নিত্য দিনের দায়ে আমি জড়িয়ে যেতে পারতাম কোন এক পানসী নৌকার দাঁড়ের দোসর হয়ে!

সব কিছু যেমন হয় না তেমনি হল না এটাও। অবশ্যই মনের দিক থেকে তেমন কোন দায়ও তো ছিল না যে হতেই হবে! শুধু চকিতে একবার মনে হওয়া। মনে হওয়াই তো আর শেষ কথা নয়! তাই চললাম সেই জিতেন বাবুর পেছনে। চললাম মানে তিনিই এক অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে টেনে চলছিলেন আমায়। আগে যত কথা হয়েছিল সেই কথাগুলোই পরে আর হয়নি, হচ্ছিলও না। কারণ কথার কোন প্রয়োজন তো ছিল না! বহুদর্শী মানুষ তিনি, ব্যাপারী মানুষ। বোধহয় ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন যে আমি অকুল দরিয়ার ভেলা। আমার ভেসে চলার মধ্যে দিক নির্ণয়ের কোন তাৎপর্য নেই। দক্ষিণের বাতাস লাগলে ঢেউয়ের ঘায়ে উত্তরে যাব আবার উত্তরের বাতাস বইলে ভাসব দক্ষিণ দিকে। আমি কোন দিগন্তের যাত্রী নই। আর যদি হাওয়ার তোড়ে, জলের ধাক্কায় দৈবাৎ কোথাও কূল জুটেই যায় তবে ভেড়বার জন্যে ঘাট লাগবে না, আঘাটা হলেও চলবে। সেই জন্যেই প্রাথমিক আমন্ত্রণের পর আমার জন্যে আর কোন আপ্যায়ণ ছিল না জিতেন বাবুর। পেছন দেখবারও প্রয়োজন ছিল না যে আমি আছি কি না! আমি থাকব এটাই ছিল ধরে নেওয়া এবং সে ধারণা তাঁর ব্যাপারী জীবনের কালো পাথরে কষে নেওয়া। চারিদকেই গাছ, সবুজ গাছ। অরণ্য নয় তবু যেন বনময় পরিবেশ। বিজন ছায়া। কাছের গাছ বেশীর ভাগই কাঁঠাল, দূরে যে ঘন গাছের সারি এখান থেকেও দেখে চিনছি তারা শাল। এছাড়াও আছে, বহু অপরিচিত, আধাপরিচিত নাম না জানা গাছ। সত্যি এক একসময় বিস্মিত

হয়ে যাই কত রকম গাছই না আছে। এত কি চেনা জানা সম্ভব একটা জীবনের পক্ষে? ক'টিকেই বা চিনে রাখতে পারি? যারা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োজন মেটায় প্রতিদিনের সঙ্গীর মত চিনে রাখি তাদের। যারা ঘনিষ্ঠ হয়ে জনজীবনের কাছে কাছেও টিকে থাকে অদম্য প্রাণশক্তিতে চিনে যাই তাদেরও। কিন্তু যারা দূরে, যারা আপন আনন্দে লোকালয়ের বাইরে দূরে বিজনে জন্মায়, মানুষের নিঃশ্বাসের তাপ বাঁচিয়ে থাকতে চায় একান্তে, অথবা আপন প্রাণের আনন্দে এক থেকে হয়ে উঠতে চায় অসংখ্য তাদের আমরা বলি আগাছা, করি বর্জন। চিনি না, চিনতে চাইনা। সেই অসংখ্যদের আপন বাস এই বনভূমি। এখানে ওরা চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। অজস্র সবুজ পাতায় সূর্যের আলোকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে করে প্রতিফলিত।

ঘণ্টায় সময়কে ভাগ করবার উপায় নেই বলে জানি না কতক্ষণ পথ হাঁটলাম, প্রয়োজনও ছিল না জানবার। শুধু জানি একসময় এ পথ ফুরোবে, কোন একটা সময় আসবে যখন আমরা পেঁছাব এমন একটা জায়গায় যেখানে নির্ধারিত আছে আশ্রয়, আছে খাবার ব্যবস্থা। শরীর ঘেমে গায়ের ভেতরের জামা ভিজে গিয়েছিল অনেক-ক্ষণই, ভিজে উঠল বাইবের জামাও। শেষ কালে মাথার চুলগুলোর গোড়া থেকে জল বেরিয়ে মনে হ'ল আমি স্নান ক'রে এলাম। গোল গোল পাথরে তৈরী পথের ওপর দিয়ে চলেছি, মাঝে মাঝে এক একটা গরুর গাড়ী পাশ দিয়ে চলেছে ফসল নিয়ে, পাটের গাঁট নিয়ে অথবা জ্বালানী কাঠের বোঝা নিয়ে। গাড়ীটানা বলদ-গুলো ভাবলেশহীন মুখে কারও দিকে না তাকিয়ে চলেছে। চালকদের কেউ কেউ আমাদের দিকে তাকাচ্ছে কখনো কখনো। আমি সবার দিকেই দেখছি। বলদ-গুলোকেও। বলদগুলোব জন্যে আমার অনুকম্পা হ'ল। কিভাবে অন্যের বোঝা টেনে চলে ওরা! আমরাও চলি, সকলেই চলে কিন্তু বলদগুলোর বেলায় এটা যেন একটু বিশেষ রকম। ওদের যে প্রাণধারণের বিনিময়ে এই কাজ তা কখনই মনে হয় না ওদের গাড়ীটানা দেখলে। মনে হয় জীবনেব ভার যেন ওবা বয়ে চলেছে। ওরই মধ্যে একটা গাড়ীর চাকায় ক্যাঁ-য়্যাঁ-য়্যাঁ ক'রে একটা টানা শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দ নিয়েই চলেছে গাড়ীটা, যেন একটা যন্ত্রণা বাঙময় হয়ে বিবাগী মানসিকতায় মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে কোন প্রান্তরেখার দিকে। হঠাৎ মনে হ'ল এমন কোন বিন্দু কি আছে যেখানে এই যন্ত্রণার শব্দগুলো গিয়ে জড় হয়? এমন কোন শব্দলোক আছে যেখানে গিয়ে থেমে থাকে এই একটানা আওয়াজগুলো জড় বস্তুর ছবির মত? তবে কোথায় যায়? যেতে যেতে যেতে শেষে—শেষে কোথায় যায়? মিলিয়ে যায়? মিলিয়ে যাওয়াটা কোথায় যাওয়া? আজগুবি চিন্তার ভিড়ে ঢেকে গেল চেতনা, কতক্ষণ যে তন্ময় হয়ে পথ চলছিলাম হিসেব নেই। একটা বিরাট তেঁতুল গাছের নিচে দাঁড়িয়েই জিতেন বাবু বললেন, বিশ্রাম করা যাক। বিশ্রাম, তা মনে হ'ল করা যাক। যা হোক একটা কিছু জেগে থাকা অবস্থায় প্রাণীকে যখন ক'রতেই হবে তখন বিশ্রামটা

শব্দ কি ? জিতেন বাবু একটা বড় শিকড়ের ওপর বসে পড়লেন আমি তেমন কিছু না পেয়ে মাটিতেই বসে পড়লাম ঘাসের ওপর। একটা বিড়ি ধরিয়ে আমার দিকে একটা এগিয়ে ধরে প্রথম জানতে চাইলেন, আপনার দেশ কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করা হয়নি—।

আমিও এ প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিলাম না। না শোনার ভান ক'রে থেকে সময় নিতে চাইলাম ভাববার জন্যে। সেই অবসরে জিতেনবাবু বললেন, নেন বিড়ি খান। হাত বাড়িয়ে নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিলাম। ভাল লাগে না। আসলে আমি জিতেন বাবুর অপ্রিয় প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছিলাম। তাই প্রতিপ্রশ্ন ক'রলাম, আর কতদূর আমাদের যেতে হবে ?

আকাশের দিকে দেখে উনি জানালেন, বেশী নয়। তিনপোয়া চলে এসেছি।

শুনে আর কথা বলা প্রয়োজন মনে ক'রলাম না। পাহাড়ী এলাকার মানুষদের চেহারায় যে রকম ফোলা ফোলা চোখ মুখ হয়ে থাকে তেমনি ধরণের মানুষ এখানে সব, দুচারজন যা কখনও পথে পড়ছে তাদেরই নজর ক'রে দেখছিলাম। খুব সাধারণ একটা ছোট সাইজের কাপড় পরা বেশীর ভাগেরই খালি গা মানুষ সব।

সেই মানুষগুলো চারপাশের পাহাড় থেকে নেমে আসে। বহুদূরের পাহাড় থেকেও আসে প্রয়োজনের টানে। সেই প্রয়োজন মেটায় জিতেনবাবুরা। তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখলাম ছোটখাট জিতেনবাবুর গদীটি ছোট নয়। বেশ বড় একটি ঘর বহু রকমের সামগ্রীতে বোঝাই। লবণ থেকে সুরু ক'রে লোহা পর্যন্ত সবই আছে যা কিছু সাধারণ জীবনযাত্রায় লাগে। পাহাড় থেকে নেমে আসা সমতলে বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে বন কেটে গড়ে তোলা হয়েছে যে বসত তারই এক বাসিন্দা উনি। আম কাঁঠাল নারকেল আর প্রচুর সুপারী গাছের ছায়ায় তাঁর টিনের বিশাল ছয়-চালা সামনের দিকে ওই গদী, পেছন দিকে বসবাসের ঘর। অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। সেই গদীঘরেই উঠলাম আমরা। তখন কয়েকজন পাহাড়ী লোক ধান এনে ওজন বুঝিয়ে দিচ্ছিল ওই গদীতেই। জিতেন বাবুকে আসতে দেখেই কি যেন তারা বলে উঠল আর উনিও সেই ভাষাতেই কি জবাব দিলেন বুঝতে পারলাম না। কিছু শব্দ ছুটে এসে আমার কানে ছিটকে পড়ল মাত্র। আমার অবশ্য বোঝবার প্রয়োজনও ছিল না তবু নেহাৎ কৌতূহলের বশেই সব জানতে ইচ্ছা করে, বুঝতে ইচ্ছা করে, যেখানেই যা কিছু রহস্য দেখেছি তাকে ভেদ করবার ইচ্ছা করে।

সব হয় না। সব রহস্য উদ্ঘাটিত হয় না, জীবনে সব না জানা জানাও হয়ে ওঠে না, ইচ্ছা থাকলেও নয়। যেমন জিতেনবাবুর আমাকে নিয়ে যাবার পেছনে কি ইচ্ছে ছিল তা কোনদিনই জানা হয়নি। কারণ অল্প কিছুদিনই আমি ছিলাম সেখানে এবং সেই সময়ের ভেতরেও তাঁর সঙ্গে কোন সংযোগ ছিল না আমার। যেদিন আমি পেঁছালাম তার পরদিনই সূর্যকান্ত নাথ বলে এক স্থানীয় ভদ্রলোকের হেফাজতে দিয়ে দেওয়া হ'ল আমায়। আমার কাজ হ'ল সেই ভদ্রলোকের জঙ্গলের ঠিকায় কাজ

করা। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখলাম বহুদূর পর্যন্ত এলাকায় নাথবাবুর কাঠকাটা, মধুপাড়া, মোম সংগ্রহ, বেতকাটার কাজ চলে। নাথবাবু অভিজ্ঞ এবং পুরানো ঠিকাদার। প্রথম দিন আমাকে কাছের জঙ্গলে নিয়ে গিয়েই একটা হরিণ মারল। জানতে চাইল, হরিণের মাংস কখনও খেয়েছি কি না।

বনে বাস ক'রে এসেছি হরিণের মাংস খাইনি এমনটি হবে কি ক'রে? কিন্তু সত্যি বলতে কি হরিণের মাংস খাওয়ায় আমার একটুও আগ্রহ ছিল না। আমি কেবল লক্ষ ক'রলাম হরিণটার সেদিনই মৃত্যুর দিন ছিল নইলে ওই মাত্র একটাই হরিণ ওখানে অমন নিশ্চিন্তে ঘাস খেয়ে বেড়াবে কেন? জঙ্গলটা বেশ ফাঁকা। শুধু শাল গাছ, লতাগুল্মের নাম মাত্র নেই। আমার নজরে পড়েছে কি পড়েনি নাথবাবু দেখা মাত্রই গুলি ক'রে দিতে এক সেকেণ্ড আগের দাঁড়ানো প্রাণীটা যাকে দেখছিলাম লেজ নাড়তে, পড়ে চার পা ছুঁড়েই থেমে গেল। নিথর। সামান্য পাতা পড়ার শব্দে যে হরিণ ভীত হয়ে চঞ্চল পায়ে পালাত আমরা কাছে পৌঁছে দেখলাম সে শুয়েই আছে। নাথবাবুকে প্রশ্ন করলাম, এমন সহজে হরিণ কি আগে কখনও মেরেছেন?

মূঢ় আত্মশ্লাঘার সঙ্গে খুব বড় রকমের আত্মতৃপ্তি প্রকাশ ক'রে নাথবাবু বলল, জীবনে হরিণ যে কত মেরেছি তার সীমা নেই। মনেও নেই। তবে প্রথম যে হরিণ মেরেছিলাম সেটার কথা মনে আছে। আমাদের গ্রামের বগার মাঠ বলে একটা মাঠ আছে প্রথম হরিণ মারি সেখানেই। বাবার বন্দুক নিয়ে ঘুরতাম তার অবশ্য একটা কারণ ছিল—চারিদিকে শুধুই বনজঙ্গল বলে বিনা হাতিয়ারে চলা মুস্কিলও ছিল ভালও লাগত না। বন মোরগ, বেলে হাঁস, হরিয়াল, শামকুল প্রভৃতি নানা জাতের খাদ্যপাখি সব সময়েই সামনে দিয়ে উড়ে যেত হাতে বন্দুক না থাকার দুঃখে কতদিন অনুশোচনা ক'রেছি তাই সব সময়ই বন্দুক নিয়ে চলি যাতে আর পশ্চাত্তাপ না আসে।

আমি কোন কথা না বলায় সূর্যনাথ আবার বলল, হরিণ মেরে আরাম আছে। কোন ঝামেলা নেই। মাংসও কাজে লাগে।

ওই কথা শুনে আমার হঠাৎ মনে এল পৃথিবীর এটাই বোধহয় নিয়ম, সরল এবং উদার যারা, যারা প্রকৃতিগত কারণে দুর্বল তাদের কাছ থেকে প্রত্যাঘাত আসে না বলেই দুর্জনেরা তাদের বিনাশে বিলাস পায়। আমার মনোভাবের কোন প্রকাশ ছিল না বলেই তা কোন প্রভাব ফেলতে পারল না সূর্যনাথের ব্যবহারের ওপর। সে তার নিজস্ব গতিতেই হরিণটার একটা পা ধরে টেনে ওজন বুঝতে চেষ্টা ক'রে ছেড়ে দিল। নিথর দেহের যে অংশটুকু উঁচু হয়েছিল ধপাস ক'রে মাটিতে আছড়ে পড়ল। দৃশ্যটা খারাপ লাগতে আমি অন্য দিকে সরে গেলাম। একটা শাল গাছের গোড়ায় গিয়ে সোজা ওপর দিকে তাকিয়ে তার উচ্চতা দেখতে চাইলাম অকারণেই, কিংবা হয়ত সূর্যকান্তকে উপেক্ষা করবার জন্যেই। সূর্যকান্ত আমাকে গাছের গোড়ায় দেখে জানতে চাইল, গাছটা কত ফুট হবে বলুন তো?

আমার হঠাৎ যেন মনে হ'ল এই বিশালতা ফুট দিয়ে মাপা যায় না ; কিন্তু পরিস্থিতি এবং পরিবেশ বিবেচনা ক'রে সে কথা বললাম না, বললাম, আন্দাজ ক'রতে পারব না।

কাঠের কাজে, বিশেষ ক'রে জঙ্গলের কাজে, এই আন্দাজ বিশেষ জরুরী— নাথবাবু আমাকে জানাল। আমাকে কি তাহ'লে কাঠের কাজের শিক্ষানবীশ ক রে নিয়োগ ক'রেছে জিতেন বাবু ? যা-ই ক'রে থাক ক'রেছে। মাথা ঘামানো বন্ধ ক'রলাম। মাথা ঘামাব না বলেই কোন গাছ কত লম্বা সে হিসেবেও দরকার নেই আমার। সূর্যকান্ত বলল, এই গাছগুলো সব কেটে ফেলতে হবে, এখানে ক্ষেত হবে। এখানে রাভাদের বস্তি। তাদের চাষের জমি দরকার। শাল ছাড়া অন্য যে সব গাছ ছিল জ্বালানীর জন্যে কেটে নিয়ে গেছে বস্তির লোকেরা। শাল গাছও যে একদম কাটে নি এমন নয় তবে শাল গাছ কাটা নিষেধ আছে বলে ভয়ে বেশী কাটে না।

তাহ'লে এখন যে সব কেটে ফেলা হচ্ছে ? আমি প্রশ্ন ক'রলাম।

এ তো সরকারী হুকুম। সরকার এই সব জমি উপজাতি মানুষদের মধ্যে বিলি ক'রে দিতে চায় চাষ বাসে তাদের সুবিধে ক'রে দেবার জন্যে।

তাহ লে এই বন আর থাকছে না, মনে মনে বুঝলাম। আর সেদিনই পরে জানতে পারলাম আমাকেই সেই অরণ্যোচ্ছেদের তদারকি ক'রতে হবে। জেনে গেলাম বিশাল এলাকা জুড়ে যত গাছ আছে সব কেটে মাঠ ক'রতে হবে। আমরা, অর্থাৎ নাথবাবু ছাড়াও অনেক ক'জন ঠিকাদার এলাকা ভাগ ক'রে গাছ কিনেছে, কেটে নিয়ে যাবে। তার মধ্যে বড় ঠিকাদার হিসেবে নাথবাবুর ইজারাই সব চেয়ে বড়।

পরের দিনই বনদেবীর পুজা পাঠ ক রে বন বিনাশ সুরু করা হ'ল। উনিশ দল কাঠুরিয়া এক সঙ্গেই কোপ লাগাল উনিশটা গাছে। আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম কোনও দল কম কাজ ক'রছে কিনা। অর্থাৎ কাটো। দ্রুত কাটো। তাড়াতাড়ি শেষ কর। সমস্ত বনাঞ্চল জুড়ে আমরা যেন এক বিনাশের উৎসাহে মেতে উঠেছি। ওই বিশাল গাছ রাশি রাশি সবুজ পাতা নিয়ে প্রতি কোপে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে যেন শিহরিত হচ্ছে বারংবার। ঠকাঠক কুঠারের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শূন্যের মঞ্চ থেকে, যেন আকাশ থেকে নেমে আসছে ধ্বনি। ও পাশে বিহারী সিং-এর লোকেরাও হৈ চৈ ক'রে কাজ আরম্ভ ক'রেছে সে আওয়াজও পাওয়া গেল। হঠাৎ দেখলাম আমার সামনে দিয়ে একটা বাচ্চা শিয়াল দৌড়ে যাচ্ছে। আমি কিছু না বুঝেই আরে আরে ক'রতে সামনের লোকটা হাতের কুড়ালটা ছুঁড়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে মেরে দিল বাচ্চাটিকে। অল্প দূরেই রক্তে রঙিন হয়ে ছিটকে পড়ল বাচ্চাটি। মার কুড়ুল সে বিকারহীন ভাবে গিয়ে কুড়ুলটা কুড়িয়ে আনল ; আবার লেগে গেল গাছ কাটার কাজে। আমার চোখ কিন্তু ঘুরে ফিরে ওই রক্ত মাথা শিয়াল শিশুটির দিকে পড়তে লাগল যে দেহটি ক্রমাগত যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে একটা লাল বিড়াল বিক্ষত দেহে পড়ে আছে। ধীরে ধীরে নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল।

আমি যদি না চেঁচিয়ে উঠতাম তাহ'লে তো ওকে পালিয়ে যেতে দেখত না কেউ! অমনি ভাবে কুড়ুলটা ছুঁড়ে মারত-ও না লোকটা। হঠাৎ ওভাবে মারতেই বা গেল কেন? একটা শিশু প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে, ছুটে যেতে চাইছে নিরাপদ কোন আশ্রয়ে, তাকে ওভাবে মারবার কি প্রয়োজন? কি লাভ হ'ল বাচ্চাটাকে মেরে? আমি এদের ভাষা জানি না, নইলে লোকটিকে তার কাজের কারণ জিজ্ঞসা ক'রতাম। মনে মনে বড়ই বিরক্ত হলাম ওর প্রতি। বিরক্ত নিজের প্রতিও হ'লাম চেঁচিয়ে ওঠবার বোকামীর জন্যে। বুঝলাম আমি যে চেঁচিয়ে উঠেছি সে নেহাৎ অভ্যাসের বসেই আরও একটু ভাবতে গিয়ে দেখলাম ওই লোকটিও অভ্যাসের বসেই মেরে দিয়েছে বাচ্চাটিকে। আসলে আমরা বনের প্রাণীদের সহ্য না করবার অভ্যাস ক'রে ফেলেছি। চিরদিন. মানুষ তার সহবাসী প্রাণীদের হত্যা ক'রে আসছে এবং পৃথিবী থেকে বহু প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে এই মানুষেরাই।—

অনেকদিন আগে যে সব গাছ কেটে নেওয়া হয়েছে তার নিচের অংশ মাটিতে পোঁতা আছে, আমি বসেছিলাম তেমনই একটা গুঁড়ির ওপরে। দাঁড়ানো গাছ-গুলোকে কাটা হচ্ছে। সামনের গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম অল্প দূরেই একটা গাছ হুড়মুড় ক'রে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল, আমার কানে এল তার বিশাল নিপাতনের আর্তনাদ। সেই শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবার একটা শব্দ। সে দিকে চেয়ে দেখলাম আর একটা গাছ পড়ল, আর একটু বাঁ দিকে আর একটা। এমনি ক'রে এক এর পর এক হুড়মুড়িয়ে পড়তে লাগল গাছগুলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে ফাঁকা হয়ে গেল। ছায়াচ্ছন্ন জগৎ হ'ল আলোময়। যে মাটিতে দীর্ঘ কাল পড়েনি সূর্যের আলো সেই মাটি ঘাস আর মৃতপ্রায় গুল্মের ফাঁক দিয়ে পেল সূর্যালোকের তাপ। শুধু সেই বিশাল মহীরুহগুলোর গভীরে প্রোথিত নিম্নকাণ্ড গুলো ভীষণ এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে মাটির ওপর বসে রইল অনড় সংকল্পে কঠোর হয়ে। আমি সেগুলোর ফাঁক দিয়ে গাছকাটা এলাকা দেখতে এগোলাম। কিন্তু বিশাল গাছগুলো ঝাঁক ঝাঁক পাতা আর ডালপালা ছড়িয়ে পড়ে আছে সমস্ত চলার পথ জুড়ে। ডিঙিয়ে যাওয়া অসম্ভব, পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম একটা গাছের ডালে একটা বড় জাতের পাখি আটকে আছে। পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে দেখলাম সে মৃত। আমি পাখিটাকে দেখছি দেখে কাঠুরেরা একজন বলল, পাখিটা কিছুতেই গাছটা ছাড়ছিল না। গাছে কুড়ুলের কোপ পড়ায় শেষের দিকে গাছটা যখন ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠছিল তখনই উড়ে গিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে বসছিল পাখিটা। যার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ওরা দেখেছিল ওকে। শেষকালে হয়ত আর ওড়ে নি গাছ পড়ার সঙ্গেই চাপা পড়ে মরেছে।—যে লোকটি ঘটনার বর্ণনা ক'রছিল তার অপর সঙ্গী জানাল জীবনে বহু গাছ কেটেছে সে এমন-ভাবে পাখিকে মরতে দেখে নি। কথাটায় সায় দিল তার জুড়িদারও।

এ কি মায়া? আমি ভাবতে চেষ্টা ক'রলাম। মায়া কি নীড়ের জন্যে? অথবা নীড় বাঁধতে দিয়েছিল বলে গাছটার জন্যেই? এমন মায়া কোথায় পেল পাখিটা? যে মায়া মানুষের সেই মায়া ওই ছোট্ট প্রাণী কোথায় পেল? আকাশের পাখি যে প্রাণী হিসেবে শূন্যের পথিক সে তো তার জন্ম সূত্রেই জানে আকাশ তার নিরুপদ্রব আশ্রয়, আপন মানসিক প্রবৃত্তিতে আপনি তার ডানা মেলে যায়, আপনি তার পাখায় এসে পড়ে গতি, তার তো থাকে না কোন বন্ধন, তবে? কেন তবে এই আত্মদান? আমার মনোগত প্রশ্নের মধ্যেই একজন কাঠুরিয়া বলল, পাখিদের বাচ্চা থাকলে অনেক সময় এমনিভাবে বাসা ছাড়ে না ওরা। হয়ত হবে। আমি আলোচনায় অংশ না নেওয়ায় সে আর কোন কথা বলল না। আমি মুখে কিছু না বললেও লোকটির কথার ওপর ভাবতে লাগলাম। মা—সে তো প্রাণী মাত্রেরই একই প্রেরণায় চলে—। মায়ের স্নেহ সব জীবেই সমান। পাখি, হোক সে আকাশচারী পার্থিব তো। এই মাটির সঙ্গেই সে সম্পৃক্ত। এই মাটির আশ্রয়েই জন্ম তার, মাটির আশ্রয়েই তার বৃদ্ধি, তার বিকাশ। অতএব সে-ও আমাদের মত তো হবেই। তারও থাকবে মায়া, মমতা, স্নেহ প্রীতি এবং মোহের বন্ধন। এ তো স্বাভাবিক। সে ক্ষুদ্র বলে আমরা তার মূল্যায়ণ না করতে পারি, না দিতে পারি উপযুক্ত মর্যাদা তাই বলে আমাদের বুদ্ধির মধ্যে পেলেও তাকে অস্বীকার করি কি করে? কিন্তু সেই আত্মত্যাগী পাখিটির জন্যে যেহেতু আমার আর কিছুই করবার ছিল না আমি ব্যথা পেলাম মাত্র; ভাবলাম কাঠুরিয়া দুজন যখন দেখেই ছিল তো আগেই একটা কিছু ক'রল না কেন যাতে পাখিটি এভাবে মৃত্যুবরণ ক'রে আমাকে ব্যথিত হওয়া থেকে রক্ষা ক'রতে পারত! কি বা ক'রত ওরা? গাছ না কেটে তো পারত না! আমিই কি পারতাম আগে দেখতে পেলে? আমিও তো হুকুম তামিল করার যন্ত্রমাত্র! নাথ বাবু? ঠিকাদার সূর্যকান্ত নাথ? সে ইচ্ছা ক'রলে না কাটতে পারত এই গাছ। পারত কি? রক্ষা কি ক'রতে পারত এই অসহায় পাখির নীড়? হয়ত কিছুদিনের জন্যে পারত। কারণ কাটার মূলে আছে সমস্ত মানুষদের সমাজ। প্রয়োজন। প্রয়োজন কাটাচ্ছে। নিজেদের প্রয়োজনকেই দেখছি আমরা, অন্যের প্রয়োজনকে দেখবার অভ্যাস তো করিনি! কাজেই পশু পাখি কীট পতঙ্গ কারও স্বার্থের দিকে নজর দেবার অবকাশ হয়নি আমাদের। হবেও না। প্রয়োজনের নাম ধরে জেহাদ ঘোষণা ক'রেছি পৃথিবীকে তোলপাড় ক'রে ইচ্ছাপূরণের। যেখানে যা আমাদের ইচ্ছাপূরণে সহায়ক সংগ্রহ কর। মাটির ওপরে, জলের নিচে, পর্বতে—যেখানে যা পার আনো; খুঁড়ে নাও, তুলে নাও, ভেঙ্গে নাও। নাও, নাও, নাও। যেভাবে পার নাও—ছিনিয়ে নাও, চুরি কর। যেভাবে হোক মেটাও প্রয়োজন।

তবু আমার মনটা কেমন ভার হয়ে উঠল। আমি আর ওখানে না থাকবার জন্যে ধীরে ধীরে ডানদিকে সরে গেলাম যেখানে কয়েকটি গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে

শেষ প্রহরের আশায়। তাদের ওপর মৃত্যুর পরোয়ানা যে ঝুলছে তারা যেন জেনেই গেছে সেই কথা। আমার মনে পড়ে গেল এক হাটের দৃশ্যের স্মৃতি, কলকাতার কাছেই এক গ্রামের হাটে এক মাংস বিক্রেতাকে দেখেছিলাম কতগুলো ছাগলকে খুঁটির সামনে বেঁধে রেখে এক একটাকে ধরছে আর অন্যগুলোর সামনেই কাটছে। যেটা কাটা পড়ল বাকিরা অসহায় ভাবে তাকিয়ে আছে। সেই চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে আঁতকে উঠেছিলাম। অমন নীরব বেদনা আমার জীবনে আর দেখা ছিল না। সহ্য করতে না পেরে সরে গিয়েছিলাম। আজও এই চড়া রোদের দুপুরে ওই গাছ ক'টির ছায়ায় দাঁড়াতে যেন ধাক্কা বোধ করলাম। কিছুক্ষণ বাদে আমরাই যাকে কুঠারাঘাত করে হত্যা ক'রব তাদের কাছে অনুগ্রহ নেবার মত মানসিক বল আমার ছিল না। আমি সেখান থেকেও সরে গেলাম। কিন্তু যাই কোথায়, কি করি? মৃত পাখিটার স্মৃতি আমাকে যেন ছায়ার মত অনুসরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। সামান্য একটা পাখি এতবড় একটা মন জুড়ে নিজেকে বিস্তার ক'রল কিভাবে? কি ক'রে এত বড় সে হ'ল যে তার দুই ডানায় মহাজাগতিক পরিধি সম্পন্ন মনের অঙ্গন জুড়ে ছায়া ফেলে। কোথায় যাব আমি? কোথায় যেতে পারি? বনময় ভূমি। ভেতরে ভেতরে জনবসতি আছে, তবে সে বিশাল সহরে যেমন দু চারটে গাছ থাকে তেমনই। মানুষের প্রয়োজনের মানচিত্রে এই এলাকা ঢুকে গেছে বলে অরণ্য গভীর নয়। ছোট গাছ জ্বালানীর জন্যে অনবরত কেটে নিয়ে অরণ্যকে নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে বসবাসকারীরা, প্রয়োজন মত ঘরবাড়ী বানাতে ইচ্ছামত বড় গাছ কেটে পাতলা করে দিচ্ছে বনত্ব। কমে আসছে আরণ্য সীমা। তবু সমস্ত এলাকাকে এখনও বলা চলে বনাঞ্চল। একটা সরু পথরেখা পায়ে চলে চলে সৃষ্টি হয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই দুপাশে গাড়ীর চাকার দাগ। সেইটুকু কোন গাছ নেই বলে ফাঁকা, জায়গাটুকু যেন দুভাগে ভাগ ক'রেছে এই বনভূমিকে। ওই রেখার ওপর দিয়ে উদ্দেশ্যহীন আমার অলস যাত্রা। কাঠুরিয়া বাহিনীকে পেছনে ফেলে চলতে চলতে ক্ষীণতর হ'তে লাগল তাদের কুঠারাঘাতের ঠকাঠক শব্দ। দূরাগত ধ্বনির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে প্রতিধ্বনি চারপাশ থেকে আমাকে সঙ্গ দিচ্ছিল তারাও পেছিয়ে পড়ল, আমি চলতে লাগলাম। দুপাশে গাছ দু একটা অচেনা গাছ গায়ের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মাথার ওপর ছায়া দিচ্ছে। তাদের মায়ায় না ভুলে আমি রোদের মধ্যেই ঢুকে পড়ছি, চলছি।

সামনে পথ ঢালু হয়ে গেছে সেখানে ছায়া শীতল। অনেকক্ষণ রোদের তাপ না থাকায় সেই পথজুড়ে শীতলতা নেমে এসেছে আকাশ থেকে। আমার হঠাৎ কেমন আশ্চর্য লাগল, যে আকাশ থেকে তাপ আসে সেখান থেকেই আসে শীতলতা। কেমন ক'রে আসে? এটা কেমন করে হয়? জীবনের সামনে এমন বিস্ময়কর সব

আয়োজন প্রকৃতির করা আছে যে প্রতিনিয়ত চলার মধ্যেও বৈচিত্র্য ফুরায় না। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তই বৈচিত্রে ভরা। তাই তো জীবন এমন সুধারসে পূর্ণ। তাই এই জীবনকে এত ভাল লাগে, আসলে আমরা ভালবাসি এই পৃথিবীকেই কারণ জীবন তো পৃথিবীরই অবদান। পৃথিবী জীবনের।

হঠাৎ দূরে নজরে এল একটা সরু গাছ পড়ে আছে পথের ওপর। এভাবে লম্বা-লম্বি পথ জুড়ে কে ফেলল ওই বাঁশজাতীয় গাছটাকে? ক্রমাগত ঢাল বেয়ে অনেকটা নেমে এসেছি বলে অন্ধকার এখানে এবং সামনেটায় আরও অনেক বেশী। প্রায় যেন সন্ধ্যার আঁধার। তবু আকস্মিক ভাবে দেখলাম সেই আড়াআড়ি পড়ে থাকা গাছটা নেই! যেন মিলিয়ে গেল পথের মধ্যে, অথবা সরে গেল একপাশে। শেষ লহমার স্মৃতি—মনে হ'ল যেন মিলিয়ে যাওয়া দেখতেও পেলাম! তবে কি সাপ! সাপ। বিরাট লম্বা এবং মোটাও তো তা হ'লে বেশ বিশাল! থমকে দাঁড়ালাম। পাহাড়ী সাপের গল্পের স্মৃতি মনে ফুটে উঠল। সে নাকি সাংঘাতিক। তার নাকি নিশ্বাসে বিষ, দৃষ্টিতে বশীকরণ। তার নাকি ল্যাজে হাতির শক্তি নিষ্পেষণে অথবা আঘাতের কাজে। ওরই কি নাম অজগর? জানতে যাবার সাহস আমার হারিয়ে গেল। এগোতে পারলাম না, কি জানি যদি ঝোপের মধ্যে বা পাশটাতেই থাকে সে? যদি ওখানেই হয় তার বাসা? কারণ দেখতে পাচ্ছি আমার দুপাশে বন ঘন হয়ে উঠেছে। এদিকটা খুব ঢালু বলে কেউ চাষের ক্ষেত করে নি, জনবসতিও ওপাশেই থমকে আছে। সামনে বনের গভীরতা নিশ্চয়ই বেশী হবে, হয়ত সে বন এখন কুমারী—অর্থাৎ মানুষ এখনও ওই এলাকায় বৃক্ষছেদন করে নি, জনপদভারে হয়নি ওখানের ভূমি কলুষিত। অথচ যে ক'জন দ্বিপদ বনবাসীর সঙ্গে আলাপ হ'ল সবারই ধারণা মানুষ নামক প্রাণী বনভূমিতে পেঁছালে নাকি সে জায়গাটার উন্নতি হয়! বনই যখন আর না থাকে তখন তার উন্নতিটা হয় কিভাবে?

এতদিন অরণ্যে আছি কোনদিন এমন ভাবে ভয় পেয়ে থমকে যাইনি। আসলে সাপকে বোঝা যায় না বলেই ভয়টা বেশী। তাছাড়া তার আকৃতিগত কারণেও এই আবছা অন্ধকারে ভয়টা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফিরে এসে দেখি কাঠকাটার লোকেরা সব কাজের শেষে তাদের জিনিসপত্র গুছোচ্ছে। ওদের কাছে সাপটার কথা বলতেই জানতে চাইল ওটাকে মেরে ফেললাম না কেন? অতি উৎসাহী একজন তো কুড়ুলটা কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে ইসারা ক'রে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে বলল। ওদের মধ্যে কয়েকজনকে আমার কথা বুঝিয়ে বলতে পারছিলাম তারা আমাদের ভাষা অল্প স্বল্প জানত বলে। তাদেরই একজন বলল, ওই সাপের সাপের মাংস নাকি খুব ভাল। অনেকে খায়। পুবের দিকে প্রায় অসীম শূন্যে হাত দেখিয়ে জানাল, ওই দিকের পাহাড়ের মানুষরা খায়।

এরা তো তাহ'লে খাদ্যের প্রয়োজনেও মারছে না! তবে কেন মারতে চায় সাপটাকে? শুধু মনে করে? ভয় পায়? ভাবে ওকে না মারলে ও-ই মানুষকে মারবে? তবে কেন সেই শিয়াল শিশুটিকে হত্যা ক'রল এরা? বাচ্চাটি কি ক্ষতি করত মানুষের? সে বড় হলেই বা কি করতে পারত? শিয়ালের মত ছোট্ট একটা প্রাণী যে আপন প্রাণের ভয়ে ঝোপের আড়ালে গর্ত ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে বাস করে, যে দিনের আলোয় বাইরে আসতে ভয় পায় বলে ভীরু পায়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে খুঁজে পেতে চায় নিজের পৃথিবী, সেই অতি দীন প্রাণী—কী ক্ষতি করবে? প্রকৃতি তো তাকে সেই রকম স্বভাব দেয়নি যাতে সে প্রাণ হনন ক'রবে মানুষের! কিংবা তেমন কোন অনিষ্ট করবে যার তুলনায় তার জীবনমূল্য সমান!

আসলে মানুষের চেয়ে হিংস্র প্রাণী পৃথিবীতে আর নেই। মানুষ হিংসা করে অকারণ অভ্যাসে, বিবেকহীন স্ফূর্তি'র আনন্দে। আমরা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি যাদের হিংস্র প্রাণী বলে প্রচার ক'রে এসেছি তাদের হিংস্রতার সঙ্গে তাদের প্রাণের প্রশ্ন ওতপ্রোত ভাবে জড়ানো আছে, তাদের হিংসা তাই প্রয়োজনের পরিবর্তহীনতায় মানুষের কাছে হিংসার প্রয়োজন তেমন বিকল্পহীন নয়। মানুষের হিংসার প্রকাশ হয় সেখানেই যেখানে তার নিতান্তই বে-এক্তিয়ার অনুপ্রবেশ, যেখানে পরস্বাপহরণই তার একান্ত ইচ্ছা। বাঘ, সিংহ, সাপ বা অন্য কোন বন্যপ্রাণী মানুষের এলাকায় এসে অকারণ বিলাসে হিংসা করে না, মানুষ অন্য প্রাণীর বাস সীমানার মধ্যে গিয়েই তাদের আঘাত করে পৈশাচিক পুলকে।

সময় কাটে তার আপন চলার বেগে। দিন রাত্রি তার ক্রমান্বয় পদক্ষেপ। আমরা সেই কালচক্রের মধ্যে থাকি বলে কালের এই যাত্রা দীর্ঘ মনে হয়, কিন্তু এই মহাকালের পর্যটন পর্যায়ের মধ্যে না থাকলে আমরা লক্ষ ক'রতে পারতাম এর দ্রুতবেগ। শহরে মানুষ এই গতি নির্ধারণের জন্যে কালযন্ত্রের কল্পনা ক'রেছে, তৈরীও ক'রেছে। তাতে মহাকালের চলার একটা আংশিক হিসাব আপন কার্য-নির্বাহের সুবিধা মত ধরা হয়েছে কিন্তু সেই বছর-মাস-ঘণ্টা-মিনিটে সত্যিই কি ধরা পড়েছে তার যাত্রার হিসাব? এই অরণ্যে সেসব ব্যবস্থা রাখা হয় না। এখানে দিন আসে তার নির্ধারিত পরিক্রমায়, আবার তা শেষ হলে আসে রাত। দিন রাত্রির নিয়মিত আসা যাওয়ার তাৎপর্য আমাদের কাছে আলো অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যূষে প্রথম আলোর আভাস পায় পাখিরা। সারারাত্রির ক্ষুধায় অথবা তাদের চোখের পর্দায় আলোক প্রতিফলনের বিশেষ ক্ষমতা থাকায়, কিসের কারণে জানিনা প্রত্যূষে আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা জাগে এবং কলরব শুরু করে। আমরাও প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ি। আপনা আপনিই আমাদের ঘুম ভাঙে—অনেকটা অভ্যাসে, অনেকটা এক অজ্ঞাত প্রেরণায়। যে প্রেরণায় সূর্য

ওঠে, যেন সেই রকমই। সারা আকাশ জুড়ে আলো জেগে ওঠে, সমস্ত ভূমিতল জুড়ে প্রাণ। সকাল আমরা বুঝি জেগে ওঠার কাল। আমরা যেখানে থাকি বন নেই। কিছুকাল আগে ওখানে বন কেটে বসত করেছে মানুষ। এখানে পানীয় জল আছে, সমতল ভূমি। তাই মানুষ বন থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এই জায়গাটুকু। আমাদের কুঠারের আঘাতে এই জনভূমি ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে চারি পাশে। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে বনোচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছে। সূর্যের আলো মাটির ওপর ঘাসের বুকে মেলে দেয় তার প্রাণ প্রেরণা। ফসলের সময় মানুষের রোপন করা ওষধির ওপর বর্ষিত হয় সেই আশীর্বাদ। আমার মনে পড়ে ছেলেবেলার একটা স্মৃতি। আমাদের পাড়াতে এক বৃদ্ধ থাকতেন সবাই বলত পণ্ডিতজী। সুন্দর চেহারা, লম্বা সাদা চুলে মাথা ভর্তি, একমুখ সাদা দাড়ি বুকের ওপর এসে পড়েছে, একখানা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরণে আর একটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে সকাল হলেই তিনি পথে বেরোতেন। কোথায় যেতেন জানিনা। চলার পথে অনেকেই তাঁকে বলত, প্রণাম পাণ্ডিতজী। তিনি সকলকে সমান ভাবে হাত তুলে আশীর্বাদ করতেন, বেঁচে থাক বাছা, সুখে থাক। আমার এখনও মনে পড়ে সেই প্রশান্ত দর্শন বৃদ্ধের উদার আশীর্বাদের ভাব এবং ভাষা। এই সর্বব্যাপ্ত সূর্য কিরণের সামনে মনে পড়ল সেই বৃদ্ধের আশীর্বাদের দৃশ্যও ছিল এমনই সার্বজননী, সর্বাঙ্গীন।

আমারই মত বিদেশী এখানে আর একজন আমার চেয়েও আগে এসে জুটেছে নাম রামনিবাস। রামনিবাস বলেই সবাই জানে তবে পরেও নাকি একটা আছে—আগরওয়ালা। কবে কিভাবে হঠাৎ এসে বসেছিল মানুষটা অজানা অচেনা এই এলাকায় তারপর ধীরে ধীরে সকলের চেনা এবং জানা হয়ে গেছে—সবাই বলে শেঠ, শেঠজী। যা শুনি প্রথমে এসে কাটা গাছ কিনত নগদ টাকা দিয়ে সেই কাঠ যে কোথায় নিয়ে যেত কি করত কেউ জানে না। তবে এখানে বনভূমির মধ্যে যে গাছ অফুরন্ত আর অযথা, তার বিনিময়ে যে ব্যক্তি টাকা দেয় তার চেয়ে বন্ধু আর কে হ তে পারে? তাই খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে গেছে রামনিবাস আগরওয়ালা।

এখানে গাছ ছাড়া আর আছে কিছু মধু। কেউ কখনও তাও নিয়ে এসে হাজির ক'রলে কৃপাপরবশ হয়ে তার বিনিময়েও কিছু অর্থ প্রদান করে রামনিবাস। এসব দেখে পাহাড়ের মানুষগুলো মুগ্ধ। তাদের কাছে তার আবির্ভাব এবং অবস্থিতি অনেকটাই অপার্থিব। এবং এই অসাধারণ অস্তিত্বকে আরও দৃঢ়মূল করে তার পরবর্তী কালের কর্মগুলো। সে তার অচিন্তনীয় ক্ষমতায় বনবাসীদের জোগান দেয় প্রয়োজনের সব সামগ্রী। লবণ, সুতো, লোহার ছোট খাট জিনিসপত্র। এসব বহুদিন ধরে হয়ে আসছে বলে প্রচণ্ড আস্থার জন্যে এখন সে-ই এই জনপদের বৃহত্তম মহাজন। এই বনভূমির বাইরে কারও না জানা যে পৃথিবী আছে সেই

অচেনা বিশ্ব থেকে হরেক রকম বস্তু তার সঞ্চয়ে পরিমাণে বিপুল। এখন প্রয়োজন শুধু মাত্র লবণ, সুতো আর লোহার সরঞ্জাম নয়, মিলের কাপড়, কলে তৈরী ডাল, কেরোসিন,—নদীর মোহনায় যেমন সমুদ্রের নোনা জল অনেকদূর ঢুকে পড়ে তেমনি সভ্যতার ধাক্কা প্রয়োজনের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিয়েছে এই নতুন গড়ে ওঠা জনপদেও। প্রকৃতির জগৎ মুছে মানুষ নিজের জগৎ গড়ে তুলতে চাইতেই তার স্বসৃষ্ট সামগ্রীর স্থান হয়ে যাচ্ছে উৎসাদিত প্রকৃতির শূন্যতার মধ্যেটায়। সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে রামনিবাস শেঠ। টাকা নামক যে বস্তুটির কোন অস্তিত্বই ছিল না এই বনান্ধকারে, তাকে সে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছে বললেও খুব অতিরঞ্জিত হয় না। বনের প্রাণীদের মধ্যে যে দ্বিপদ প্রাণীরা কথায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ্যে সক্ষম তাদের ভাষাও রামনিবাসের আয়ত্তে। ফলে সবের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে দাঁড়িয়ে সে এখানকার প্রধান ব্যক্তিত্ব। এখন সে আর কাটা গাছ কিনে নিয়ে অজানা মুলুকে চলে যায় না, এখানেই চলেছে তার বিশাল জায়গা জোড়া কাঠ চেরাই'র কল। সারাদিন আকাশে একটানা শব্দ ছুঁড়ে দিয়ে চারপাশ থেকে কেটে আনা গাছগুলোকে ফালফালা করছে। তারপর তা নিয়ে যাচ্ছে জনে জনে, যার যেমন প্রয়োজন। একদা যেখানে আকাশ দেখা যেত না সেই এককালের অসূর্যম্পশ্যা ধরিত্রীর ওপর দাঁড়িয়ে দূরে দেখা যায় বনরেখা। তারও উৎখাত চলছে, একদিন তাও দেখা যাবে না।

মানুষটাকে দেখলাম। ভগবানের কৃপা জানলাম। শুধু হিসেব পেলাম না কত মহীরুহ তার এই চেরাই কলে ফালফালা হয়ে গেছে। এখানে এসে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম পৃথিবীর সব বস্তু আখেরে টাকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। মানুষের এক অদ্ভুত স্বভাব বস্তুকে যতক্ষণ না টাকায় রূপান্তরিত করতে পারে তার তৃপ্তি হয় না। ব্যাপারটা রামনিবাসকে দেখে মনে এলেও সকলের বেলাতেই এটা সত্য। এখানে হরিনন্দনে জিতেনবাবুতে রামনিবাসে কোন পার্থক্য নেই। সবাই যেন সেই এক সাধনাতেই মগ্ন।

রামনিবাসের কাঠকল জনপদের প্রান্তে। কাঠকলে ঢোকবার মুখে বাঁদিকেই উঁচু করে তৈরী দোতলার ঘরগুলোয় রামনিবাস শেঠ-এর সপরিবার বাসস্থান। তারপর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে পড়ে থাকে কাটা গাছের বিশাল বিশাল গুঁড়িগুলো। আমরা থাকি একেবারে বিপরীত দিকে, সেই শেষ প্রান্তের ঘরগুলোয়। সেখানে শাল গাছের খুঁটির ওপর সারি সারি চারখানা ঘর আছে, দুখানায় থাকে মিস্ত্রিরা একখানায় আমি। আমাদের ঘরগুলোর নিচেই কাঠ দিয়ে তৈরী বেড়া। সীমানা। এই কাঠের পাঁচিলের কি কারণ থাকতে পারে আমি ভেবে পাইনা। কারণ এই চৌহদ্দির বাইরে ফাঁকা মাঠ। যে পারে সে-ই বোধকরি চাষ করে। মানুষই নেই। আর মানুষই যেখানে নেই সেখানে চোর থাকবে কি ক'রে? হয়ত রাতের অন্ধকারে

জন্তু জানোয়াররা চলতে চলতে এসে পড়তে পারে। তা এলে আসবে! যেমন আসবে তেমনি তো আবার চলেও যাবে? থাকতে তো আর আসবে না। তবে আর কেন এই বেড়া দেওয়া? একি বনের প্রাণীদেরকে তাদের সীমানা বোঝানোর জন্যেই? শেঠ-এর বাড়ী থেকে এই ঘরগুলো দেখা যায় না—দূরত্বের জন্যেও বটে আর মাঝখানে বিরাট উঁচু ঘরটা পড়ে যাবার জন্যেও বটে। তাই আমি থাকি আমার মত, মিলে মিশে থাকি মিস্ত্রিদের সঙ্গে। ওদের সুখ দুঃখের মধ্যে অংশীদার হিসেবেই থাকি। তাছাড়া ওই থাকা বাদে শেঠ-এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার কাজ যার সঙ্গে তার দায়বদ্ধতা আছে রামনিবাস-এর কাছে। আর সেই দায়বদ্ধতার জন্যে কখনও দু একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় আমাকেও, এড়িয়ে যাই। ওই এড়িয়ে যাই বলেই পরবর্তী বহু প্রশ্নের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নিজের মত থাকতে পারি। কারণ বেশী ঝামেলা আমার ভাল লাগে না। শুধুমাত্র দিন যাপনের জন্যে প্রাণ ধারণের আয়োজন আমাদের প্রত্যেকের সারাদিন। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমি জঙ্গলে চলে যাই, রামনিবাস বসে গদীতে, মিস্ত্রিরা যায় মেশিনে, রামনিবাসের বউ রান্নাঘরে—প্রত্যেকেই শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে উপকরণ জোগাড় করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি মাত্র। সারাটা দিন কাটে এই প্রাণ ধারণের কাজে। সূর্যের দেখা না পেলে আমরা বুঝি আর আয়োজনের অবসর নেই। যে যার নিজের কোটরে ঢুকে পড়ি আর দশটা প্রাণীর মতই। পাখিরা ফেরে আপন কুলায়, পোকামাকড়রা আপন আপন আশ্রয়ে। চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁর পাখার শব্দ ছাড়া পরিমণ্ডল নিস্তব্ধ হয়ে যায়; চাঁদ আকাশে থাকলে আমি ওই চাঙ ঘরের দরজা খুলে রাখি জেগে থাকার সময় পর্যন্ত। তখন কেমন একটা মায়াবী আলো রহস্যের সৃষ্টি করে। সেই রহস্য প্রতিরাতেই আমার কাছে অনুদ্ঘাটিত থেকে যায়, মনে হয় কি যেন একটা দৃশ্য এখনই চোখের সামনে ফুটে উঠবে যা আমি জেগে না থাকলে দেখতে পাব না। শুয়ে পড়লে মনে হয় এই বুঝি আমার অলক্ষ্যে এই ঘরের স্তব্ধ অন্ধকারের বাইরেটাতেই মায়াময় আলোয় কি যেন ঘটে চলেছে, চলেছে কোন এক অজানা দৃশ্যের উৎসব যা থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে পড়ছি, যতক্ষণ জেগে থাকা যায় খোলা দরজা দিয়ে চেয়ে থাকি। একসময় আলো ঝাপসা লাগে, চারদিকে সাঁই সাঁই শব্দ অস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠতে থাকে, হয়ত বা দূরে অরণ্যে হুংকার দিয়ে ওঠে বাঘ নয়ত কোনদিন শুনি শব্দ তরঙ্গে ভেসে আসছে কোন মত্ত মাতঙ্গের বৃংহিত। দৈবাৎ কোন শিয়াল কোন রাতের প্রথম দিকে, সন্ধ্যাবেলার ঐকতান থেমে যাবার পরও, ডেকে ওঠে কোন প্রয়োজনের প্রেরণায়। একরকম পাখি আছে রাতের গভীরে বুক চাপা কান্নার মত ডেকে ডেকে ওঠে। ডাক চিনে গেছি, পাখিটাকে চিনতে পারিনি দিনের আলোয় তাকে ডাকতে দেখিনি বলে।

ক্লান্তিকর চেয়ে থাকার মধ্যেই ঘুম এসে যায়। এখানে কোন রাতের অন্ধকারে

মনে হয়না পৃথিবীতে এই সময় কোথাও জেগে আছে কোন প্রাণ, এমন কোন দেশ আছে যেখানে এখন আলোর বন্যায় জীবন উজ্জ্বল, চঞ্চল জীবজগৎ। তবে এখানে রাত্রে তারাগুলো কি দারুণ চকচকে দেখায়! কলকাতায় উড়ন্ত ধুলো আর শূন্যে ঝুলন্ত চাপ চাপ ধোঁয়ার আস্তরণ ভেদ করে দৃষ্টি যখন আকাশে পেঁছায় তখন তারার উজ্জ্বলতা ম্লান, আকাশের নীল রঙ ঝাপসা। এখানে অন্ধকার মাখা সবুজ অরণ্যের কালো পটভূমিকায় আকাশের রঙ কি গভীর নীল। সেই নীল আকাশের পটে উজ্জ্বল তারাদের সোনালী দ্যুতিময়তা রচনা করে এক অনৈসর্গিক স্বপ্নের পরিমণ্ডল। কৃষ্ণপক্ষের রাতে গভীর অন্ধকারে শুয়ে আকাশের তারাগুলোকে দূরের ইসারা বলে মনে হয়, মনে হয় ওদের আহ্বান অনন্তকাল এই পৃথিবীকে নিরন্তর ডাকছে। তখন জ্যোতির্বিজ্ঞান মনে থাকে না, গ্রহনক্ষত্রের অতি আয়তন মনে আসে না, সত্য হয়ে ওঠে ওরা তারা, ওরা ঝিকিমিকি আলোর চুমকি, ওরা মায়ামাত্র।

মাঝে মাঝে রাত্রে কেমন যেন ভয় লাগে, অকারণ ভয়। কোন কারণ খুঁজে পাইনা শুধু গা ছমছম করে। সেটা অকস্মাৎ কোন কোন দিন। মনে হয় চারিদিকের নিঃশব্দতায় এমন কিছু ঘটছে যা অশুভ, চারিদিকের গভীর অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত সতর্কভাবে ওতপেতে আছে কোন গোপন অভিসন্ধি। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দের আড়ালে ফিস ফিস করছে তার গোপন পরামর্শের আওয়াজ। এই বুঝি সেই অজ্ঞাত অশুভ আবির্ভূত হয়! এমনই এক সদাজাগ্রত আতংক ততক্ষণ আমাকে ঘিরে আমার বুকের মধ্যে ঢুকে বসে থাকে যতক্ষণ না আমার স্নায়ু ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

এটা দৈবাৎ হয়। সেই রাতগুলোয় আমি শুয়ে পড়ি। চেষ্টা করি যাতে ঘুম এসে আমাকে মানসিক অবসন্নতা থেকে মুক্তি দেয়। একরকম পোকা ভয় পেলে যেমন মাটির তলায় দ্রুত গর্ত করে বা সামনে পাওয়া গর্তে ঢুকে যায় আমিও তেমনি ঢুকে পড়ি আমার বিছানার বিবরে। আমাদের এই জনপদ গড়ে উঠেছে অনেকটা বনমুক্ত এলাকার মাঝখানে। বনের প্রাণীরা এই এলাকা থেকে বিতাড়িত, কিছু কিছু নিহত। চারপাশের বনে আশ্রিত হরিণ, বাঘ, হাতিদের কেউ কেউ কোন কোন রাত্রে বিচরণের পথে এসেও পড়ে এখানে, অন্য প্রাণীর গন্ধ পায়, ঘরে ঘরে ঘুমন্ত প্রাণীদের সন্ধান পায় না, ভোরের আলোর আভাসে ফিরে যায় আপন অন্ধকারের সীমায়, প্রকৃতির আশ্রয়ে। কোন রাত্রে হয়ত বা অকস্মাৎ জেগে ওঠে বন্দুকের শব্দ কোথাও কেউ কোন আগন্তুককে অপছন্দ করছে তারই পাই পরিচয় সেই বন্দুকের বারুদ কাকে বিদ্ধ ক'রল ভাবতে চেষ্টা করি—কোন বাঘ? হরিণ? কোন হাতি? পরক্ষণেই সেই অপ্রয়োজনীয় গবেষণা বাদ দিয়ে অন্য কোন চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ি। বস্তুত আমরা অন্য কারও সম্বন্ধে চিন্তা করতে অভ্যস্ত নই।

সামান্য একটা বাঘ, সামান্য একটা হরিণ অথবা একটা হাতি। নেহাৎই ইতর শ্রেণীর জীব ভাবি ওদের। ওদের প্রাণ এতই মূল্যহীন যে চিন্তার বিষয়ই নয়। বিনা প্রয়োজনে অথবা প্রয়োজনের মিথ্যা একটা অজুহাত লাগিয়ে যখন তখন হত্যা করা চলে তাদের। আর তাদের হত্যার জন্যেই তো এই বারুদ, এই বন্দুক, আগেও গড়েছি তীর, ধনুক, বল্লম।

আমার ওপর ভার পড়ল এখান থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে নোবাইতে একটা ক্যাম্পে কাজ করাতে হবে। পথ বলতে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার রেখা, ঘাসগুলো আহত হয়ে ম্লান। সেই রেখাও কিছুটা দূর পর্যন্ত গিয়ে নিশ্চিহ্ন। একটা সরু নালা ওখানেই কোথাও আছে, সারা বছরই সেই নালা দিয়ে জল বয়। সেই নালা ধরে বাঁদিকে মাইল চারেক গিয়ে নালা ছেড়ে দিয়ে খাড়া পূব দিকে যেতে হবে। বনের পথ, যদিও অনেকদিন বাস করছি তবু হারাতে কোন সময় লাগবে না। তাছাড়া একটা মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এসব হচ্ছে আদিম অরণ্য, মানুষের কোন প্রবেশ ঘটেনি এসব এলাকায়, শুধু মাত্র বনবিভাগ ইদানীং জরিপ করে এসেছে। কাজেই ঘন লতাগুল্মে পথ হারানো অত্যন্তই সহজ ব্যাপার।

সেদিন নোবাই যাব ভোরে উঠব মনস্থ করেই শুয়েছিলাম কিন্তু কাঠকলের মিস্ত্রি গৌরীশ-এর ডাক শুনে মনে হ'ল এটা যেন একটু বেশী ভোর, কারণ অন্ধকার তখন বেশ ঘন। বাইরে থেকে দরজায় আঘাত করছে গৌরীশ কিন্তু ঘরের মধ্যে ঘন অন্ধকারে আমি কিছু ঠাহর ক'রতে পারছি না। অভ্যাস বশে দরজা খুলতেই উৎকণ্ঠিত স্বরে সে জানাল, দেখুন কত হাতি! আমাদের কাঠের বেড়ার সীমানার ওধারে যেখানে ক্ষেত ক'রেছে মিলের ঠিকা শ্রমিক আর অন্যান্য লোকেরা রামনিবাসের সাহায্যে, সেখানে যেন অনেকগুলো কালো কালো স্তূপ নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। ক্ষেতে ফসল ভর্তি, সবে পেকে উঠেছে ধান। সারারাত তার গন্ধে ভারী হয়ে থাকে বাতাস, সেই গন্ধময় ফসলের রাজ্যে চলমান গভীরতর অন্ধকারগুলোই যে হাতি এ একমাত্র বনবাসী বলেই আমরা ঘুম চোখে বুঝতে পারি; পারলাম। চোখের থেকে ঘুম পুরো কেটে যেতে বুঝলাম হাতির সংখ্যা অনেক। বিশ, ত্রিশ, কি পঞ্চাশও হতে পারে। গৌরীশ বলল, বাবু, ফসল খাচ্ছে। সব ধান খেয়ে নেবে।

দেখে শুনে তাই তো মনে হচ্ছে—জবাবটা আমি মনে মনে দিলাম। মুখে কোন শব্দ ক'রলাম না। গৌরীশও খুব সামান্য শব্দ ক'রে কথা বলছিল কারণ ওই হাতিদের কাছে আমাদের এই কাঠের ঘর দেশলাই-এর বাক্সের চেয়ে বেশী শক্ত নয়। আমাদের কোন শব্দে ওরা যদি ভেবে নেয় ওদের ভোজনে ব্যাঘাত হচ্ছে তাহ'লে আমাদের এই ঘরসহ সকলের অবস্থা যে কি হবে সেটা অনুমান করাও আমাদের সাহসসীমার বাইরের ব্যাপার। ওই যে সামান্য বাতিল কাঠের বেড়া—সেই

বেড়া দিয়ে শিয়ালকে সাবধান করা যায় তার এক্তিয়ারের এলাকা বুঝিয়ে, দরিদ্র মানুষকে ওই সীমানা দিয়ে বড়লোক দাঁড়করিয়ে রাখতে পারে বাইরে, কিন্তু হাতিকে! তাদের চলার পথের অনায়াস পদক্ষেপে ওর চেয়ে অনেক শক্তিশালী গাছ পড়ে যায় মুচড়ে। তারপর তাদের একটুখানি ক্রুদ্ধ ইচ্ছায় এরকম একটা পলকা মাচা ঘর নিমেষে মাথা লুটিয়ে প্রণাম ক'রবে বিশ্ব প্রকৃতিকে। আমরা তার মধ্যে কোথায় যে ছোট্ট একটু মাংস পিণ্ড হয়ে আটকে থাকব অনস্তিত্বের নির্ভাবনায়, তার কোন প্রাক্‌ঠিকানা এখনই পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই নিঃশব্দে পর্যবেক্ষণ করা আত্মরক্ষা মূলক সাবধানতারই নামান্তর। গৌরীশ তবু জানতে চাইল, শেঠকে খবর দেব ?

কি প্রয়োজনে ? আমিও প্রতিপ্রশ্ন ক'রলাম।

শেঠ-এর বাড়ীতে রাইফেল আছে—গৌরীশ সংবাদ জানাল। আমি মনে মনে বললাম, আছে থাক সেটা এনে বিপদ বাড়িয়ে আর কাজ নেই। একটা রাইফেল এতগুলো হাতির জন্যে যথেষ্ট নয়। মুখে কোন শব্দ না করে তার গায়ে হাত ঠেকিয়ে সংকেত করে আমি নিবৃত্ত ক'রলাম তাকে। ঘন অন্ধকারে ঠিক প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওরা গভীর তৃপ্তিতে সেই ধান খাচ্ছে। গৌরীশকে বললাম, গঙ্গেয়াকে ডাক। টিন বাজাও। —টিন বাজানোটা সংকেত। আমরা সবাই জানি টিন বাজানো শুনলেই শেঠরা জেগে উঠবে। ওদের ঘরে শব্দ করার বহু ব্যবস্থা আছে। বিকট শব্দ হবার মত পটকা আছে, সেই সব ফাটাতে শুরু ক'রবে।

আমার মুখের কথা ফুরোবার আগেই মিস্ত্রিরা সব কজন উঠে বিশেষ ভাবে সংগ্রহ করে রাখা টিনগুলোকে এমন ভাবে পেটাতে সুরু ক'রল যে আশেপাশে মৃতব্যক্তি থাকলেও তার ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠবার কথা। সে প্রমাণ মিলল কয়েক মিনিটের মধ্যে রামনিবাসদের ঘর থেকে আকাশের দিকে ছোঁড়া রাইফেল-এর শব্দ ছুটে আসাতে। তার পরই নেপালী দারোয়ানের হাত দিয়ে চলে এল একগাদা পটকা। আগুন লাগিয়ে গৌরীশ সেগুলো এক একটা করে ছুঁড়ে দিতে লাগল ক্ষেত-এর মধ্যে। বিকট শব্দ করে সেগুলো ফাটতে লাগল আগুনের বড় বড় ফুলকি ছড়িয়ে। সব মিলিয়ে এমন এক প্রচণ্ড শব্দের ঐকতান সেখানে সৃষ্টি হল যে অল্পক্ষণ বাদেই সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল মনে ক'রে হাতির পাল বনের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। ওদের চলে যাওয়াটা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল কারণ ততক্ষণে উষার আলো অন্ধকারের মোটা পর্দা সরিয়ে সেই বহু পুরাতন পৃথিবীর নব উন্মেষ ঘটাচ্ছিল। বীজের গভীরে যেমন তার সারাজীবন ধরে চলে অংকুরোদ্‌গমের প্রচেষ্টা তেমনি রাত্রির গভীর বুকের মধ্যে সেই সন্ধ্যালগ্ন থেকেই সুরু হয়ে যায় প্রত্যুষের প্রস্তুতি।

আমি সেই কৃষিভূমির ওপর দিয়ে মাতংগ পথের পরিপ্রেক্ষিতে বনভূমির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঊষা পেরিয়ে প্রত্যুষ পেরিয়ে প্রভাতের রাঙা আলোর বেলা এসে সামনে দাঁড়াল। আমি দেখলাম আমার অবস্থিতির অল্প নীচেই পড়ে আছে ধ্বস্ত ধান ক্ষেত ওপড়ানো দোমড়ানো মোচড়ানো কবন্ধ ধান গাছের দলিত গলিত দেহ। যতটা দূর পর্যন্ত ধান ক্ষেত আছে এই একই বিধ্বস্ত অবস্থা। তার পরে বনের সীমানা, সেখানে হাতিরা হারিয়ে যেতে পারে বিনা আয়াসেই। বিশাল বিশাল গাছের ছায়ায় তাদের শান্ত চলার পথ আচ্ছন্ন, মায়াময়। সেখানেই তাদের বাসস্থান হয়ত তা সরে গেছে আরও কিছুটা দূরে জনসমাগমের থেকে দূরে কারণ তারা পছন্দ করে শান্ত নির্জনতা, বিজন বনভূমি। মানুষ যতটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে তা তো নিয়েছেই, এখন খুঁজে নিতে হবে অন্য কোন প্রান্ত যেখানে এখনও পদক্ষেপ পড়েনি মানুষের, ঘাতকের। অতএব এখন আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে পারি যে হাতিরা আর নেই। খুব রক্ষা পাওয়া গেছে যে ওরা টিনের বাদ্য পছন্দ ক'রতে না পেরে এদিকেই চলে আসে নি বাদ্যকারদের দেখে নিতে! গৌরীশকে বললাম, চল যাই। ধান ক্ষেতটা ভাল ক'রে দেখে আসি। —সকলেই আগ্রহী ছিল। ওই হাতির পালের চলে যাওয়া সম্পর্কে নিঃসংশয় হবার পর আমরা নেমে এলাম। সেই ধান ক্ষেতে। ধানগাছগুলোর যেগুলো আছে সেগুলো লেপটে আছে মাটির সঙ্গে। বেশীর ভাগই নেই, হাতিরা উপড়ে গেছে। গৌরীশ এতগুলো ফসল নষ্ট হবার জন্যে দুঃখ প্রকাশ ক'রল। আমি কিন্তু সত্যি বলতে কি চেষ্টা করেও মনে কোন দুঃখবোধ জাগাতে পারলাম না। সমবেদনা বা কিছু একটা হ'লে ভাল হ'ত কিন্তু দেখলাম কিছুই হচ্ছে না আমার। বরং বিপরীত ধরণের কথা মনে হ'তে লাগল। জঙ্গল সাফ ক'রে এখানে মানুষ আপন ইচ্ছামত চাষ করে যদি অন্যায় না ক'রে থাকে তাহ'লে হাতিরা-ই বা কি দোষ ক'রেছে সে ফসল খেয়ে? এ ফসলে তাদের পূর্ণ অধিকার আছে একথা জেনেই খেয়েছে তারা। কারণ এ জমি তো অরণ্যেরই অংশ! তাদেরই নিজস্ব ভূমি।

নোবাই যেতে হলে তো এখনই রওনা হ'তে হয়—তাই ফিরে এলাম নিজের ঘরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাগো এসে ঢুকল। তার কাঁধে টাঙ্গি। যাবার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছে। আমি কিছু বলার আগেই সে বলল, নোবাই-এর দিকে প্রচুর হাতি বেরিয়েছে কাল রাতে।

বেরিয়েছে মানে? —জানতে চাইলাম।

জাগো বনবাসী। মানুষ। তবে বনেরই মানুষ। বনেই তার জন্ম, বনেই বৃদ্ধি, মরণও বনে, যেমন তার বাপঠাকুর্দা বা আরও আগের পূরুষেরা মরেছে—। এখন হয়ত তা মরবে না কারণ তারা তাদের বসত এলাকা এখন বনমুক্ত করে ফেলেছে। তবু বনের প্রাণীদের গতিবিধি জাগোর জন্মসূত্রে জানা। সে আমার

প্রশ্নের জবাব দিল, হাতিরা যেদিকে খাবার পায় সেদিকেই চলতে থাকে। মাইলের পর মাইল ওরা একদিনেই হাঁটে। যেখানে পেট ভরে সেখানেই ঘাঁটি করে। খাবার ফুরোলে আবার অন্যদিকে যাবে।

আমি প্রশ্ন করলাম, নোবাই-এর দিকে কতদিন যে থাকবে কে জানে?

মাথা নাড়ল জাগো, বলল, এখানে বেশীদিন নয়। আসলে ওরা পূব দিকে যাবে। সংসাঙ-এ বিরাট জলাশয় আছে তার কাছেই ওদের আসল ঠিকানা। সেখানে থাকবে অনেক দিন—বেশ কয়েকমাস হাতিরা ওই অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে।

আমাদের যাবার তাহ'লে কি হবে?

আজ তো কিছুতেই নয়। নিপ জঙ্গলে গেছে। সে খবর নিয়ে সন্ধের আগেই ফিরবে। সে যদি বোঝে হাতিরা সংসাঙ-এর দিকে যাচ্ছে তাহ'লে কালই আমরা যেতে পারব।

আমি চুপ করে রইলাম। যার মাথাব্যাথা সে চিন্তা করুক। জাগোকে বললাম, মালিককে বলো গে।

মালিকই আপনার কাছে আমাকে পাঠাল। বলে দিল, সামনের জঙ্গলে যে সাতটা গাছ কাটার কথা আছে আজ সেটা করাতে হবে।

সামনের জঙ্গলে অর্থ আমাদের বাসস্থান এই বনমুক্ত এলাকার গায়েই যে গাছেদের অবস্থিতি আরম্ভ সেইখানে। সেখানে আমাদের কোন গাছ নেই কিন্তু বনবিভাগের কর্মীদের সঙ্গে বখরার চুক্তিতে সাতটা গাছ কাটার কথা আছে। যা দাম রামনিবাস দেবে তার অর্ধেক পাবে আমাদের মালিক আর অর্ধেক দিতে হবে জঙ্গলের বাবুদের। এই সব দুনম্বরী গাছের হিসেব রামনিবাসও রাখে বলে দাম দেবার সময় সে প্রথমেই বেশ কিছু কম দেয়, কম দরে হিসাব করে। এমনি ভাবেই চলে আসছে। আমি বললাম, তোমরা যাও। গাছ কাটতে আরম্ভ কর আমি একটু পরে যাচ্ছি।

জাগো চলে গেল। কারণ সে-ও জানে গাছ কাটার ব্যাপারে আমার কোন ভূমিকা নেই। আমি লম্বা গাছটা মাটিতে পড়লে কেবল মাপ ক'রে দেখিয়ে এবং দাগিয়ে দিই কোনখানটা কাটতে হবে, গুঁড়িগুলো কতবড় টুকরো করা হবে ইত্যাদি। এ কাজটা হরিনন্দনের কাছে থাকতেই প্রায় শিখেছিলাম এখানে অভ্যেস ক'রে ফেলেছি। আসলে তো কাজটা কিছুই না, দরকার কেবল মাপ জানা আর সামান্য সাধারণ বুদ্ধি। গাছ কাটার দলই এটা ক'রতে পারে আমার কেবল কাজ না থাকার জন্যে এই কাজ করা। মাঝে মাঝে নিজের ভূমিকা খুঁজতে চাই, অবাক হয়ে ভাবি, অর্থহীনতার ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আবার মনে হয় অর্থহীন তো সবই রামনিবাস যে এত কিছু কল বসিয়েছে, সারাদিন ধরে এত ছোটাছুটি ক'রছে, তারই বা কি অর্থ হয়? এক এক সময় আমার মনে হয় বিরাট শূন্যের ওপর

বসে আমরা সবাই অসংখ্য সংখ্যা সাজিয়ে যাই একের পর এক। সেই সব সংখ্যার যে কোন মানে হয় না তা একবারও আমরা ভাবতে চাই না। কাজেই আমার কাজের অর্থহীনতার জন্যে বিচলিত হতে হয় না আমাকে। আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজনে খাওয়া পরার বিনিময়ে যা বলে তাই করে দিই। অধিকে আমার কি প্রায়োজন? রামনিবাস প্রথম প্রথম নানা ভাবে আমাকে যাচাই ক'রতে চাইত ইদানীং কি হয়েছে কে জানে সে সব চেষ্টা করে না এবং এমন এমন বিপরীত কাণ্ড করে যাতে আমি বিরত হই। জাগো চলে যেতেই রামনিবাসের বাড়ীর চাকর একটা রেকাবীতে ক'রে কিছু লুচি আর হালুয়া এনে আমার সামনে রেখে বলল, শেঠজী আপনার জন্যে পাঠাল, খেয়ে নিন।

এর আগে কয়েকদিন এমনি অযাচিত খাবার এসেছে। ফেরাতে চেষ্টা ক'রে দেখেছি ফেরৎ যায়নি বরং পরবর্তী সময়ে রামনিবাসের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই সে অনুযোগ করেছে ফেরৎ দিতে চেয়েছি বলে। ফলে আর ফেরৎ দিতে চাইনা কিন্তু চাকরটাকে অর্ধেকগুলো দিয়ে দিলাম বললাম, আমার সামনে খাও আমি দেখতে চাই। মিস্ত্রিরা কাজে না চলে গেলে ভেবেছিলাম ওদের সঙ্গেই ভাগ করে খাব। বাকীটুকু খাবার আগেই চাকরকে বললাম, শেঠিনীকে ব'লো আর কোন দিন পাঠালে আমি খাব না।

শেঠিনীর কোন হাত নেই বাবু। শেঠজী হুকুম ক'রলে শেঠিনী পাঠাবেই। আপনি বাবু এমন করেন কেন বলুন তো?

জবাব দিলাম না। আসলে আমি এই সব দামী খাবার খেতে অভ্যস্ত নই এবং অভ্যাস ক'রতেও চাই না এ কথাটা তো কাউকে বোঝাবার নয়, নিজের, একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া রামনিবাসের মত ধূর্ত লোকের যে কাজের কারণ বুঝি না সেই কাজকে সন্দেহ করি কি এক স্বাভাবিক ভয়ে।

আমি যখন গিয়ে পেঁছালাম তার অনেক আগেই জাগো তার দলবল নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। দুটো গাছকে একসঙ্গে কাটতে লেগেছে তারা দুটো দলে ভাগ হয়ে। আমি থাকলে যা কাজ হবে না থাকলে তার চেয়ে কম কিছু হবে না। তবু আমি যেহেতু বেকার তাই এদের সঙ্গে থাকতে হয় আমাকে। প্রথম প্রথম কাজের সময় আমার হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে কেমন অস্বস্তি লাগত, এখন সয়ে গেছে। এতদিনে আমি বুঝে গেছি যে ওদের মধ্যে আমার কোন ভূমিকা নেই। আমি একজন দর্শক মাত্র। এই বনে জাগোদের একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে। সব সময়েই সে তার টাঙ্গিটা কাঁধে নিয়ে ঘোরে। তাকে যখনই দেখি সে বনের দিক থেকে ফিরছে। তার সঙ্গে প্রায় সময়েই কেউ থাকে না, কখনো কখনো কেউ কেউ থাকে। আমার মনে হয়েছে বন থেকে কিছু আনতে বললে জাগো যেন খুশী হয়। আমি দেখেছি সে নিয়মিত মধু এনে জোগান দেয় রামনিবাসের

গদীতে। আর রামনিবাস সেই সব মধু অতিথি সৎকারের কাজে লাগায়, উপঢৌকন হিসেবে পাঠায় তার দেশের আত্মীয় স্বজনদের। আরও কি করে কেউ জানেনা। যতটুকু সে নিজে মুখে বলে জানা যায় শুধু ততটুকুই।

জাগোর কিন্তু সবটাই জানা যায় কারণ সভ্য জীবনের গোপনীয়তা তাকে খর্ব করে না, কুঁকড়ে দেয়না তার মনের সজীবতা। সে কাঠ কাটে, মধু ভাঙ্গে আর সুযোগ পেলেই হরিণ, খরগোস, পাখি মেরে পিঠে ঝুলিয়ে আনে বনের ভেতর থেকে। একদিন একটা হরিণের বাচ্চাকে তাড়া ক'রে গিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে মেরে এনেছিল। সে গল্পও বলেছে সবাইকে সরলভাবেই। ওইটুকু একটা হরিণ শিশুকে মারতে পারার মধ্যে কৃতিত্বের কিছু না থাকলেও সেদিন কি আনন্দ জাগোর, কি উন্মাদনা! সে যেন শিশুর মত নাচতে লাগল। যে বনভূমির বাসিন্দা সে, সেখানে জাগোর সহবাসী ছিল তো ওই হরিণ শিশু। সেই নির্বিরোধ শিশু হত্যার আনন্দে সে শিশুর মত! আমরা সবাই বিদেশী, তার অপরিচিত, অথচ আমাদেরই নির্দেশে সে স্বচ্ছন্দে কেটে ফ্যালে তার আজন্ম সঙ্গী তার স্বজন ওই বিশাল মহীরুহগুলোকে, যারা হয়ত আজীবন তাকে ফল দিয়েছে, জল দিয়েছে, ছায়া দিয়েছে। এই হল জাগো। তার সঙ্গীরাও এই রকম। অমনই সরল, অমনই আত্মবোধশূন্য, অমনই আত্মদ্রোহী স্বার্থবোধসম্পন্ন। নিজেদের বন কেটে ওরা স্বচ্ছন্দে গাছ তুলে দেয় অন্যের গাড়ীতে, ওদের জমির সীমানা অন্য লোকে মেপে দেয় নিজেদের সুবিধা মত; ওরা তাই নিয়ে থাকে সন্তুষ্ট। ওরা বিনিময় সামন্যই বোঝে, বোঝে শুধু প্রয়োজন। সামান্য সেই প্রয়োজনের সর্তে অনেক মূল্যবান ঐশ্বর্য বহিরাগত চতুরদের হাতে দেয় তুলে। মৌমাছি যে অত ক্ষুদ্র প্রাণী তারা পর্যন্ত নিজেদের মৌচাক পাহারা দেয়, আগলে রাখতে চায় নিজের সম্পদ, আর এরা কিনা সেটুকু স্বার্থও বোঝে না!

সঙ্গী হিসেবে জাগো অত্যন্তই মনোরম। পরের দিন ভোরবেলা সেটা বুঝলাম নোবাই যাবার সময়। ভোরে এসে জাগোই আমার ঘুম ভাঙ্গালো। বলল, হাতিরা কালই পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। এখন আর নামবে না। চলুন, নোবাই যাবার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সবাই অপেক্ষা ক'রছে। আমি শুধু জামাটা গায়ে দিয়ে নিলাম, বেরিয়ে পড়লাম। একটু এসেই দেখি গাছ কাটার দল সব তৈরী। জাগোরই সঙ্গী সাথী সব, এক সঙ্গেই থাকে। আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম আর কেউ আছে কিনা। কারণ নতুন জঙ্গল বিনা অস্ত্রে যাওয়া হয় না, নিয়ম নেই। নিয়ম মানে অবশ্যই পদ্ধতি এবং অভ্যাস। আমার চোখ দেখেই জাগো বোধহয় আন্দাজ করতে পারল, বলল, অন্ধকার থাকতেই আমাদের মালিক আর বনবিভাগের সাহেব শিকার করবার জন্যে ওই রাস্তাতেই গেছে। তারা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

কিসে গেল ?

হাতিতে। —অর্থাৎ বোঝা গেল গাছ কাটার পর গুঁড়িগুলোকে টানবার জন্যে হাতিও আগেই চলে গেছে। পথ নেই, হাতিরাই শিকল বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসে গুঁড়িগুলোকে। এখানে এনে ফাঁকা মাঠে জড় করবার পর হাতিদের ছুটি। দুর্গম বনের মধ্যে থেকে ওই বিশাল কাঠগুলো বের করে আনা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এর জন্যে শেখানো হাতি কিনতে পাওয়া যায়। এখানে আছে আলিহোসেন-এর। সে লোকের কাঠ বয়ে দেয় ওই হাতিদের দিয়ে। নিজে বাড়ীতে বসে থাকে, হাতিদুটো খেটে এনে খাওয়ায়। দেখে শুনে আমার মনে হয় পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে তার মধ্যে মানুষই একমাত্র শোষক। এই আলি হোসেনকে চিনেছিলাম এখানে আসবার দিন কয়েক বাদেই। লোকটি নাকি এখানকার কাঠের কাজের চাবি হাতে নিয়ে বসে আছে। কথাটার তাৎপর্য বুঝিনি, থাকতে থাকতে এবং কাজের মধ্যে মিশে যাবার পর বুঝেছি। অন্য আর দশটা কর্মহীন বিকালের মতই সেদিন বিকালেও জিতেন বাবুর গদীতে একটা লোক এসে দাঁড়াতে জিতেন বাবু বলে উঠল, আরে! তোমাকে যে সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে!

সেই আমার প্রথম দেখা লোকটিকে, বেঁটে পাতলা চেহারা। গায়ের রঙ যেন রোদে পোড়া। মাথায় পাতলা সাদা টুপি। পাতলা পাঞ্জাবীর তলা দিয়ে গায়ের রঙের বাহার ফুটে বেরোচ্ছে। চৌখুপী রঙের লুঙ্গিটা বেশ উঁচু করে পরা। মোটকথা তাকে দেখলে আন্দাজ করা মুস্কিল যে অত লোকের ওকে খোঁজবার কোন কারণ থাকতে পারে। জিতেনবাবুর কথা শুনে লোকটি অম্লান বদনে বলল, কি করি কন হাতি পালাইছে।

কোথায় পালাল ? কাল না কবে যেন দেখলাম।

কাল নয় পরশু সকালে শামসুন্দীন ভায়ের গাছ টানতে বলদমারি পাঠিয়েছিলাম, ফেরে নি।

কে ছিল হাতিতে ?

ভাইজান আর নিয়ামত। ওরা খাবার জন্যে হাতি দুটাকে ছেড়ে দিয়েছিল বলদমারির কাঠ টেনে। আর হাতি ফেরেনি। বলদমারি, দলঙ্গী, চাৎরা সব খুঁজে এসেছি হাতি পাওয়া যায় না।

জিতেনবাবু যেন হতাশ হয়ে বলল, দেখ তো কি আকামটা হ'ল! এখন মরশুমের সময় এসময় কাজের ক্ষতি হ'লে চলে কি করে ?

লোকটি অসামান্য ঔদাসীন্যে জবাব দিল, তা হাতি না পাওয়া গেলে কি করা যাবে ?

জিতেনবাবু বোধহয় অপ্রয়োজনীয় বিধায় আর কথা না বলে চুপ করে গেল।

লোকটি যেমন ধীরে এসেছিল তেমনি ভাবেই চলে গেল।

সে চলে যেতেই জিতেনবাবু বললেন, ব্যাটা শয়তান আসলে শাহাবুদ্দিনের কাজের জন্যে হাতি পাঠিয়ে দিয়েছে গোয়ালপাড়া।

লোকটা কে? আমি জানতে চাইলাম।

আর বলবেন না। নাম আলিহোসেন। ওর হাতি দুটোই এখানকার জঙ্গলের সব কাঠ টানে। হাতির গরমে ব্যাটা বাদশার মত চলা ফেরা করে। আমিও রামনিবাস শেঠকে ধুবরীতে লালজীর কাছে হাতি কিনতে লোক পাঠাতে বলেছি। অন্য একজন হাতি না কিনলে ওর গরম আর কমছে না।

তখনও এখানকার জঙ্গলগুলোর মধ্যে ঢুকিনি। তাই কোন কথা বলা আমার সম্ভব নয়। আমাদের ওদিকে আমরা জঙ্গল থেকে তো নাংলো দিয়ে কাঠ টেনেছি। এখানে বুঝলাম তার চলন নেই।

আলিহোসেন চলে যেতে জিতেনবাবু আপন মনেই বলতে লাগলেন, দুনিয়ার লোকের কাটা কাঠ জঙ্গলে আর ব্যাটা বলে কিনা ছেড়ে দিয়েছে চরতে। আসলে হারামখোর নিজের লোকেদের কাজটা করিয়ে দিয়ে তারপর সবাইকে হাতি দেবে।

তাতে কি? —আমি নেহাৎ আনাড়ীর মতই প্রশ্নই ক'রে ফেললাম। জিতেনবাবু লেখাপড়ার কাজ করছিলেন বলে একটা নিকেলের ফ্রেমের চশমা আঁটা ছিল তাঁর চোখে, সেটি খুলে আমার দিকে সরাসরি দৃষ্টি মেলে আমাকে যাকে বলে নিরীক্ষণ ক'রলেন। এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সেই নিরীক্ষণ যে মনে হ'ল উনি আমার এই খোলসখানার একেবারে মধ্য বিন্দুতে যে মুর্খামী আছে সেইটাকেই অতিসুক্ষ্ম দৃষ্টির শলাকা বিদ্ধ ক'রে প্রত্যক্ষ ক'রতে চাইছেন। করুন। আমার তাতে আপত্তির কিছু নেই। অস্বস্তিও নেই। বিকিকিনি আর বিনিময়ের যে জগৎ সেখানে আমার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা হয়নি। করিনি। হয়ত নিজের অযোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম বলেই চেষ্টা করার দ্বিতীয় মুর্খামী আর আমি করিনি। তাই না জানার আদিম মুর্খতার অবোধ সুখে আমি স্বচ্ছন্দ। উনি সেই অর্বাচীনতাকে আঘাত না করে যেন একটু হতাশ হয়েই বললেন, এখানে এখন বাজার দর ভাল যাচ্ছে। বেশী কাঠ জঙ্গল থেকে এসে পড়লেই দাম পড়ে যাবে। প্রথম যারা আনতে পারবে তারাই ভাল দামে বেচবে।

মনে মনে ভাবলাম, সেই একই ব্যাপার, লাভ আর লোভ। এখানেও হরিনন্দন। সবাই হরিনন্দন? লোভের পিণ্ড? কিন্তু অন্য যত প্রাণী আছে তাদের লোভ তো এত অসীম নয়। তাদের লোভ প্রয়োজনভিত্তিক। তারা ক্ষিধের জন্যে খায়, খাবারটুকুর প্রতি তাদের লোভ থাকে তার বেশী আর নয়। জৈবিক তাড়নার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের চলাচল। কিন্তু পৃথিবীর তাবৎ পোকামাকড়, খেচর জলচর, ভূচর সবার থেকে এইখানেই কি তফাৎ মানুষের? এই তারতম্য?

এইটুকু। মাত্র এইটুকু ব্যবধানে একজন দ্বিপদ জন্তুকে অন্যনামে ডাকতে হয়, মানুষ? নামে কি আসে যায়? নামতো প্রত্যেকটি আলাদা প্রাণীরই আলাদা হবে, তাতে কি আসে যায়? আকাশে উড়লে পাখি, জলে সাঁতরালে মাছ, বিশাল দেহের সঙ্গে শুঁড় থাকলে হাতি—তেমনি ভাবে মানুষও আর কি। কিন্তু তারতম্য যদি শুধুমাত্র লোভের মাত্রা বৃদ্ধিতে হয় তবে তো মানুষ নিকৃষ্ট!— ভাবনাটা একটা দূরত্ব পর্যন্ত এসে থেমে গেল জিতেনবাবুর কথায়। তিনি বললেন, রামনিবাসজী সন্ধেবেলায় থাকে তো?

থাকে।

তাহলে আজই সন্ধেবেলায় যাব। আজই বলব হাতি কেনার জন্যে।

আমি একথার উত্তর দিলাম না। যাক। যা খুশী করুক আমার তাতে কি এসে যায়? এদের প্রয়োজন ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পৃথিবীতে এই একমাত্র বস্তু যা কখনও কমে না। প্রয়োজনবোধ তো লুব্ধতার নামান্তর। এই লুব্ধতা-তেই একজন আর একজনকে বঞ্চিত করতে চায়, একজন তার অতিপরিচিত হয়ত আপনজনকেও ঠকাতে চায। কিন্তু এ কি শুধুমাত্র মানুষের স্বভাব? এই স্বভাব তো সমস্ত জীবজগতের! প্রাণীমাত্রেরই স্বভাবধর্ম নিজেরটা বুঝে নিতে গিয়ে অন্যকে বঞ্চিত করা। সেখানে তো কোন প্রাণীর সঙ্গে কারও তফাৎ নেই! কি আশ্চর্য সাজুয্য সবার! একটা পিঁপড়ে আর একটা পিঁপড়ের মুখ থেকে পর্যন্ত টেনে নেয় তার প্রাপ্ত খাবার, আবার মানুষ তো নেযই। মানুষ তো সব সমযেই বঞ্চনা আর প্রতারণার মধ্যে দিয়েই বেড়ে ওঠে। শিশু অবস্থা থেকেই এই তার শিক্ষা—গাভীর দুধ সে তার বাচ্চাকে বঞ্চিত করে কেড়ে খেয়ে জীবন শুরু করে, তারপর ক্রমাগত সেই শিক্ষাতেই সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে জলের মাছের প্রাণ হণন করে, নিরীহ ছাগল, ভেড়া, মুরগী এমনি বহু প্রাণীর প্রাণহরণের মাধ্যমে তার পুর্তি আর বিকাশ। এরই বৃহত্তর চর্চা তার সারাটা জীবন। শুধু দুর্বলতর প্রাণীকুলকে কেন সমপ্রাণীকেও সমানে বঞ্চনা আর শোষণ করি আমরা প্রতিদিনের জীবন চর্যায়।

আর দৈনন্দিন বঞ্চনা যার অপহরণের কাজগুলো নিখুঁতভাবে করতে পারার মধ্যে দিয়ে রামনিবাসরা সৃষ্টি হয়। ওর বাসের অংশটিকে চেরাই কাঠের তক্তা দিয়ে একমানুষ মত উঁচু করে বেড়া দেওয়া আছে। আড়াল। সেই আড়াল দিয়ে মাটিতে দাঁড়ানো মানুষ ভেতরটাকে দেখতে পায় না। দেখতে কেউ চায়ও না। কারণ রামনিবায় এখানকার সব মানুষের তুলনায় অনেকটা ওপরে। সবাই তাকে সমীহ করতে অভ্যেস করে ফেলেছে, ভয় করতেও। কাজেই তার সেই কাঠের পাঁচিলের আড়ালে কি ঐশ্বর্য জমা হ'ল তার কোন প্রকাশ না ফুটে ওঠার জন্যে ভেতরে উঁকি দিতেও কেউ আগ্রহী নয়। অথচ সবাই জানে ওই সামান্য

আড়ালের ভেতরেই তার দৌলত জমা হয়ে আছে। আমারও স্বাভাবিক ভা.বই ঔৎসুক্য ছিল না ভেতরকার ব্যাপারটায়। রামনিবাস ভেতরটাকে একদম আলাদা করে রাখে। ওই চাকরটি ছাড়া একমাত্র নেপালী দারোয়ান যদি কখনও দু একবার প্রবেশধিকার পায়।

সেদিন সন্ধের অনেকটা পর নিজের ঘরে শূন্য চৌকির ওপর শুয়ে আছি এমন সময় রামনিবাসের চাকরটা দৌড়ে এল। সে বেশ হাঁপাচ্ছে। তার উৎকণ্ঠা দেখে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে?

একবার আসুন শেঠিনী আপনাকে ডাকছে। শেঠজীর শরীর ভীষণ খারাপ।

শরীর খারাপ! মনে মনে ভাবলাম তা তো হতেই পারে কিন্তু রামনিবাস যে রকম নিয়ম নিষ্ঠার মধ্যে থাকে তাতে তার শরীর তো বেশ মজবুতই আছে। কি খারাপ হ'ল কে জানে। —দু একদিন রামনিবাসের সঙ্গে খেলেও এই ঘরটায় কখনও আসিনি। বড় শেজ জ্বালানো আছে, সেই আলোয় দেখলাম বিশাল বিছানায় রামনিবাস শুয়ে বেশ ছটফট ক'রছে। কাছে গিয়ে লক্ষ ক'রলাম তার কপালে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাঝে মাঝে মুখে ফুটে উঠছে যন্ত্রণার প্রকাশ। মাথার কাছে বসে যে মহিলা, বোঝা গেল এতক্ষণ তাঁর সাধ্যমত সেবা করছিলেন, ঘোমটা খসে পড়া মুখমণ্ডলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা। অসহায়তা মহিলাকে প্রচণ্ড ভাবে ঘিরে ধরেছে দেখে নিয়েছিলাম। প্রশ্ন ক'রলাম, কি হ'ল?

দ্বিধা জড়তাহীন স্বরে মহিলা বললেন, এই ঘণ্টাখানেক আগে বলল বুকে ব্যথা ক'রছে। তারপরই ছটফট করতে লাগল। এই দেখুন না—বলে মহিলা চুপ ক'রে গেল।

আমি এক লহমায় তাঁকে যা দেখলাম তাতেই কেমন মায়া লাগল। কোনদিন দেখিনি কিন্তু এখন এই ভীত সন্ত্রস্ত মুখ দেখে মনে হল মহিলা সুন্দরী। কোমল মায়া কেমন ক'রে যে একটি মুখের ওপরে প্রলিপ্ত থাকতে পারে তা এই মুখ না দেখলে জানা যাবে না। কি হয়েছে না বুঝেও শুধুমাত্র মহিলাকে তাঁর গভীর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করবার জন্যে বললাম, চিন্তা ক'রবেন না। ভাল হয়ে যাবে।

মহিলা কোন প্রত্যুত্তর না করায় বুঝলাম আমার কথা তাঁকে প্রভাবিত ক'রতে পারে নি। স্বাভাবিক। আমিও তাঁর আশ্বস্ত হবার মত কিছু ক'রে দেখাতে পারিনি। তাই আমি রামনিবাসের দিকে মন দিলাম। রোগীর দিকে নজর রেখে মহিলাকে প্রশ্ন ক'রলাম, কোন দিকটায় ব্যথা বলছিল? —সাধারণত এই ধরণের উত্তর চল্লিশ মানুষের বুকের ব্যথার ব্যাপারে প্রথমেই দেখতে হয় ব্যথা হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত কিনা। কারণ লক্ষণ দেখে মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। এই বনকাটা বসতে এই রাতের অন্ধকারে না পাওয়া যাবে ওষুধ না প্রয়োজন মত

চিকিৎসক। উপস্থিতদের মধ্যে চাকরটিকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, এখানে কোন ডাক্তার আছে?

উত্তর দিলেন মহিলা, ডাক্তার আছেন। ঘোষ সাহেব।

ডাকতে পাঠান—আমি বললাম।

মহিলা বললেন, তিনি খুব বুড়ো মানুষ। রাত্রে ডাকলে আসেন না।

তবু চেষ্টা করুন। বলে আমি রোগীর নাড়ি দেখলাম। বুকের ওপর হাত রেখে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বোঝবার চেষ্টা ক'রলাম। স্টেথোস্কোপ থাকলে যে কাজটা হ'ত সেটা আমাকে আন্দাজে সারতে হচ্ছে। রামনিবাসকে প্রশ্ন ক'রলাম, কি কষ্ট হচ্ছে আমাকে একটু বলুন তো? বুকের কোন দিকটা ব্যথা ক'রছে?

কোন জবাব পেলাম না। কাজেই তার স্ত্রীকে প্রশ্ন ক'রলাম, আগে আর কোনদিন এরকম হয়েছে?

না—মুখে সামান্য শব্দের সঙ্গে ঘন ঘন মাথা নেড়ে জানালেন মহিলা, আগে কোনদিন হয় নি।

আজ দুপুরে কি খেয়েছিল?

রোজ যেমন খাওয়া হয়। ভাত, রুটি, তরকারী, দই।

আর কিছু নয়ত?

আমি প্রথমেই হৃৎপিণ্ড ঘটিত কোন গোলমাল কিনা বুঝতে চেষ্টা ক'রে হৃৎপিণ্ডের অভিঘাতে কোন অস্বাভাবিকতা না পেয়ে অন্য কিছু কিনা ভাবতে চেষ্টা করলাম। কয়েক মিনিট লক্ষ ক'রে আমার মনে হ'ল রামনিবাসের শরীরে যন্ত্রণা যতটা হচ্ছে তার তুলনায় বেশী ভয় পেয়ে গেছে সে, যার জন্যে কথা বলছে না। আসলে ঘাবড়ে গেছে। প্রথম প্রয়োজন তাকে চাঙ্গা করা তাই তার ঘরণীকে প্রশ্ন ক'রলাম, ঘরে কোন ওষুধ আছে? যদি থাকে নিয়ে আসুন। আর এক কাপ গরম দুধ নিয়ে আসুন জল মিশিয়ে পাতলা ক'রে।

চাকরকে দুধ আনতে বলে নিজে ওষুধ খুঁজতে লাগলেন একটা কৌটোর ভেতরে। আমাকে এনে দিলেন 'দর্দদমন' 'সর্দিদমন' প্রভৃতি কতগুলো দেশী ওষুধ যেগুলো কানপুর, কাটিহারের আজে বাজে কারখানার ঠিকানা দিয়ে কোথায় কোথায় তৈরী ক'রে দেশময় বেচে বেড়ায় একদল লোক। বনে জঙ্গলে গ্রামেগঞ্জে এই সব 'দর্দদমন দাওয়া কারখানার' ফলাও কারবার। ওগুলো হাতে নিয়ে বললাম, এখনই এসব ওষুধ ফেলে দেন। এগুলো একদম বাজে।

এই রকম উৎকণ্ঠার মধ্যেও মহিলা বললেন, কেন মাথা ধরলে শরীরে ব্যথা হ'লে বা সর্দি-জ্বর হলে এগুলো খেলেই তো সেরে যায়।

একথার উত্তর দিলাম না। সেরে হয়ত যাত্রনা কমে যেতে পারে বা চাপা দিতে পারে। যা উপশম করায় তাই ওষুধ নয় এই কথাটা মহিলাকে বোঝাবার

মত অবকাশ তখনই ছিল না। রামনিবাসকে ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রছিলাম। মনে হচ্ছিল তার যন্ত্রণার মধ্যে অস্থিরতার ভাব কম, তা ছাড়া মুখে তেমন কোন বিকৃতি নেই। চাকরটা দুধ নিয়ে এলে রামনিবাসকে সেটুকু খাইয়ে দিলাম। ইতি মধ্যে লম্বা একটা জোরালো টর্চ-লাইট হাতে নিয়ে কর্তব্যের খাতিরেই বেরিয়ে গেল চাকরটা আর তিনজন মিস্ত্রিকে ডেকে নিয়ে। হয়ত সবাই জানে যে ডাক্তার ঘোষ নামক ব্যক্তিটি আসবেন না তবু তো চেষ্টা করাটা হবে। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। আমি রোগীর হাতের চেটো পায়ের পাতা পরীক্ষা ক'রে গরম দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। হাতের পাঞ্জা আর পায়ের পাতা যখন গরম তখন যন্ত্রণার কারণটা কম মারাত্মক। আমার মনে আশার সঞ্চার হ'ল যে ব্যাপারটা হৃৎপিন্ড সংক্রান্ত না হয়ে বায়ুজনিত হতে পারে। অনেক সময়েই পেটে জমা বায়ুর উর্ধ চাপ বুকের যন্ত্রণার কারণ হয়। আমার অনুমান ঠিক হ'লে এখনই বোঝা যাবে, গরম দুধটা তার ব্যথা উপশমের সহায়ক হবে। যা হোক অপেক্ষা করা ছাড়া করনীয় কী বা থাকতে পারে? ডাক্তার ঘোষ আসা পর্যন্ত রোগীর অবস্থা ঠিক রাখার চেষ্টা করা ছাড়া আমার আর কি করনীয় থাকতে পারে আমি ভাবতে পারলাম না। বিশেষ ক'রে এই অসহায় মহিলার উদ্বেগ-এর জন্যে আমার দায়িত্ব যতক্ষণ না যোগ্য কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারছি আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। তাই আমার আশা ভরসার কেন্দ্রবিন্দু সেই ডাক্তার ঘোষ নামক ব্যক্তিটির পথ চেয়ে আছি এরই মধ্যে রামনিবাস একটু নড়ল। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন রোগীকে নড়তে দেখে তার পাখা আপনি থেমে গেল।

আমি আশ্বস্ত হলাম। কোন রকম ওষুধই নেই যাতে কিছু সাহায্য হতে পারে, তাই ভয়টা হয়েছিল বেশী। এবার আমি প্রশ্ন ক'রলাম, কখনও কি অম্বলের কথা রামনিবাসজীর মুখে শোনেন?

মহিলা চুপ ক'রে রইলেন। আমিও অপলক দৃষ্টিতে মহিলার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মহিলার কোন কথা শোনবার আশাতেই চেয়ে থাকা কিন্তু তাঁর স্নিগ্ধ সুন্দর মুখশ্রীও আমাকে আকর্ষণ করছিল। বস্তুত দীর্ঘকাল বাদে এমন একটি মুখ আমি দেখলাম যার দিকে তাকিয়ে দেখা তৃপ্তিকর। কারণ এই দীর্ঘ কালপথ পরিক্রমা পর্যায়ের সবটাই কাটল অরণ্যের গভীরে যেখানে মানুষের মুখই সীমিত, তায় সুন্দর মুখ। হয়ত তাই নীরব চেয়ে থাকায় আমি সুখবোধ ক'রছিলাম। হঠাৎ মহিলাটি আমার চোখের ওপর নিমেষের জন্যে তাঁর দৃষ্টি স্থাপিত করে বললেন, ও'র কাছে ক'টা কথাই তা শুনি? —সামান্য এই কটি কথা বলার এবং চোখে মেলে তাকানোর মুহূর্তে তাঁকে একটি লাজনম্র কিশোরীর মত দেখাল। আমার বুকের মধ্যে এমন এক চঞ্চলতা এক লহমার জন্যে চমকে

গেল যে আমি বেশ কষ্ট ক'রে নিজেকে আত্মস্থ রাখলাম। নিজেকে সাহায্য করবার জন্যেই আমিও নিজের চোখ সরিয়ে রামনিবাসের দিকে ফিরে গেলাম। মহিলাও ধীরে ধীরে হাত পাখা নাড়তে লাগলেন। বহুদিন বাদে আমার নিজের কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল আমার পোষাকের মধ্যে সম্বল বলতে পরণের প্যান্টটা অতিরিক্ত জীর্ণ, পোষাক হিসেবে অত্যন্তই দীন। এই পোষাকে আমাকে হযত কাঙ্গালের মতই দেখাচ্ছে। এই কবছরে ধীরে ধীরে সব কটি প্যান্টই ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতিল হযে গেছে, আছে এই একটাই। মহিলাব সামনে বলেই বোধহয় নিজেকে কেমন কুণ্ঠিত মনে হতে লাগল। সে ভাব কাটিয়ে ওঠবার জন্যে রাম-নিবাসের প্রতি মনযোগী হযে পড়লাম। তার বুকের ওপর আর একবার হাত রাখলাম, তার কব্জিতে নাড়ীর গতি অনুভব করবার চেষ্টা ক'রলাম, তারপর তার পেটের ওপর হাত রেখে বুঝতে চেষ্টা ক'রলাম বায়ুর চাপ কতটা তীব্র। এসবের মধ্যেই রামনিবাস যেন একবার ঢেঁকুর তুলল। আমি তার সুস্থতা সম্বন্ধে অনেকটা আশান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে বললাম, জল মিশিয়ে পাতলা করে আর একটু দুধ তৈরী রাখুন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিল যে দলটি ফিরে এসে জানাল, ডাক্তারবাবু সকালে আসবেন বললেন। এখন আসতে পারবেন না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সকালে কি করতে আসবে? সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি মনের বাকী কথাগুলো আর বলতে পারলাম না চরম অপ্রিয়তার জন্যে। রোগী সেরকম হ'লে পরের সকালে মৃতদেহ দেখতে আসার কথাই আমি বলতে চাইছিলাম। সে কথা বলা যায় না। গৃহকর্ত্রীকে বললাম, আপনি আর একটু দুধই আনুন।

মহিলা উঠে গেলেন, একটু বাদেই দুধ নিয়ে এসে রামনিবাসের মাথার পাশে বসলেন। তাঁকে দেখে মনে হল আমার কোন নির্দেশের অপেক্ষাতেই আছেন। আমি বললাম, খাইয়ে দিন।

রামনিবাসের মাথাটিকে যেভাবে ধরে উনি দুধটা খাওয়ালেন যে আমার ঈর্ষা হচ্ছিল। আমার অহেতুক ঈর্ষার অর্থহীনতা সম্পর্কে সজাগ আমি নিজেকে সম্বরণ করতে চেষ্টা ক'রছিলাম। ফলে দৃশ্যটির মায়াময়তা এক অতুল সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে আমাকে এমন আকৃষ্ট করে রাখল যে আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না। রামনিবাস ভাগ্যবান। বস্তুত ওইরকম একজন সলাজ মহিলা আমার অবস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই বাঁ-বাহু দিয়ে রামনিবাসের মাথাটি সযত্নে বেষ্টন ক'রে আধশোয়া অবস্থায় তার মুখে দুধের পাত্র ধরে থেকে ধীরে ধীরে তাকে পান করাতে লাগলেন। আমি তাঁর এই কাজের কারণ অনুমান করতে পারলাম না। একবার ভাবলাম আমার দুর্বলতার কথা বুঝতে পেরে হয়ত আমাকে সচেতন

করবার জন্যে এই ব্যবহার করা আবার ভাবলাম আমার মত একটা অপদার্থের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বলেই তার স্বচ্ছন্দ এই ব্যবহার। পরবর্তী দিনগুলোর অনেক ঘটনার মধ্যেও মহিলার সে রাত্রের ব্যবহারের কোন তাৎপর্য আমি আমার বোধের আয়ত্তে আনতে পারিনি।

আমার অনুমানকে যথার্থ প্রমানিত ক'রে সে রাত্রে অল্পক্ষণ বাদেই কথা বলল রামনিবাস। আমাকে ওষুধ না থাকার অসহায়তা থেকে মুক্তি দিল। তার স্ত্রী নিজেদের ভাষায় প্রশ্ন করলেন, কেমন লাগছে ?

ভাল, অস্পষ্ট স্বরে সংক্ষেপে জবাব দিল রামনিবাস। মহিলা তাঁর আপন জনের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন পরম যত্নে। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আমার প্রতি একটা ধন্যবাদসূচক কথা পর্যন্ত মহিলা বললেন না। মনে হয় রাম-নিবাসের এই আরোগ্য হওয়া হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার মতই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে ক'রে আমার মত একজন ইতরজনের কোন ভূমিকা থাকতে পারে তা মনে করলেন না। আমার প্রাথমিক অভিমান বশে আমি তাই নিবেদন ক'রলাম, উনি তো সুস্থ হয়ে উঠেছেন মনে হচ্ছে, এবার তাহলে আমি যাচ্ছি। পেটে অম্বল থেকে বায়ু জমে বুকে ধাক্কা দিচ্ছিল বলেই এটা হয়েছিল। আর ভয় পাবেন না, এবার কমে যাবে।

কথা কটি শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই মহিলা তাঁদের দারোয়ানকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, বাহাদুর, বাবুকে বাতি দেখাও।

প্রয়োজন নেই। আমি এমনি চলে যাব।

বাহাদুর আমার কথা শুনল না। প্রভুপত্নীর নির্দেশ পালনের জন্যে আমার পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে তার হাতের টর্চ থেকে আলো দেখাতে দেখাতে চেরাই কাঠের গুদাম ঘরের মধ্যে এসে বলল, বাবু, আপনি কি ডাক্তারী জানেন ?

তার এই প্রশ্নে দীর্ঘকাল বাদে আমি চমকে গেলাম। বহুদিন ধরে তেমন কোন ঘটনা না ঘটবার জন্যে চমকাতে ভুলে গিয়েছিলাম। অতি ঘন চিরহরিৎ অরণ্যের মধ্যেকার ক্ষুদ্র এই জনপদে আমি সাধারণ এক ব্যবসায়ীর কাছে বোধকরি বিশ্বের নিম্নতন বেতনে চাকরী ক'রতে আসা অশিক্ষিত এই পাহাড়ী মানুষটা কি করে বলল আমি ডাক্তারী জানতে পারি। এ অনুমান সে ক'রল কি ক'রে ? কথাটা তার কাছে জানতে চাইলাম। সে বলল, জানি না বাবু। তবে দেখেছি ডাক্তারবাবুরা যেমন ক'রে রোগী দ্যাখেন আপনিও তো তেমনি ক'রেই দেখছিলেন। তার কথা শুনে আমি যেন আশ্বস্ত হ'লাম। কি কারণ জানিনা মনে মনে ওর কথাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছিলাম। এখন সেই অকারণ গুরুত্ব দেবার দরুন নিজেকে কেমন বোকা মনে হ'ল। আমি ওর কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, এবার আমি যেতে পারব, তুমি যাও।

আমার ঘরে উঠে এলাম। আমার খাবার ব্যবস্থা মিস্ত্রিদের সঙ্গেই। সূর্য ডুবে যাবার পর বেশীক্ষণ সময় আমরা নষ্ট করিনা, খাওয়ার কাজটা শেষ করে ফেলি। মিস্ত্রিরা তাই সে কাজ শেষ করবার জন্যে আমার খাবারটা আমার ঘরে রেখে গিয়েছিল। খাওয়ায় আজ কোন উৎসাহ পেলাম না। ওপাশে ক্ষেতের দিকে মুখ ক'রে বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ বাদে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ ম্লানিভাবে আত্মপ্রকাশ করল। তার সেই কৃপণ আলোয় বর্ষার নদীর ঘোলাজলের মত মত আবছা ভাবে ফুটে উঠল ক্ষেতভরা সর্ষে গাছের সারি ধারাস্নান ক'রছে। আমার মনে হ'ল রামনিবাস গিন্নী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওই পঞ্চমীর চাঁদের আলোকে আমার ওই মহিলার বাহুর মত কেন যে মনে হ'ল জানি না। চকিতের জন্যে বিভ্রান্ত হ'লাম। বিহবল হ'লাম। সামনে দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত সেই ম্লান আলোর প্রবাহ। সেই বিহবলতা কেটে যাবার পরও সেই আলোকে সামগ্রিক ভাবে আমার মনে হতে লাগল ওই মহিলার দেহের মত।

আমি অলকানন্দাকে মনে করবার চেষ্টা ক'রলাম। সে এখন আমার স্মৃতি-চর্চিত অস্তিত্ব মাত্র। অনুভব ক'রলাম তার অস্তিত্বের অবস্থিতি এত দূরত্বে যে বহু চেষ্টায় তাকে আয়ত্ব ক'রতে হয়। অলকনন্দাকে যত স্মরণে আনতে চাই ততই সামনে এসে দাঁড়ায় রামনিবাসের ঘরণী। কেন? এ কি প্রত্যক্ষ বলে? দীর্ঘকাল চোখের বাইরে যে বস্তু তার থেকে প্রত্যক্ষের নৈকট্য অনেক বেশী বলে? তাছাড়াও কিছু কি আছে? কোন পার্থক্য, কোথাও কোন? উত্তর তিরিশ এই মহিলার শরীরে যে রঙ তার চেয়ে কম কিছু উজ্জ্বলতা তো অলকনন্দার নয়! বরং শহরের উজ্জ্বলতা প্রতিবিম্বিত হয়ে সে কিছু বেশী উজ্জ্বলও হতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রসাধন তাকে দিতে পারে আরও অনেক বেশী চাক্ষুস সৌকুমার্য, তবে? পড়ন্ত বেলায় শেষ সূর্যের আলোর একটা অন্য মাধুর্য থাকে, মায়াময়তা। তাই কি প্রলিপ্ত হয়ে আছে এই শ্রীমতীর শেষ যৌবনের অঙ্গে? পরিমিত মেদ দিয়েছে ভরন্ত পরিপুষ্টি। তাই মহিলাকে বর্ষার নদীর মত দেখাচ্ছিল, অমনি ঢলঢলে, অমনই গৈরিকে সিক্ত, পূর্ণা। রূপ নয় অপরূপ। জ্যোৎস্নার মত অসঞ্চয়ী ধারায় ঢলে পড়া সৌন্দর্যে অমলিন।

আমি তাকে ভুলতে চাইছিলাম। কোন স্মৃতি আমাকে উত্যক্ত করুক এ আমি কখনই চাই না। পেছনে যা পড়ে থাকে ফিরে তার দিকে তাকানোর নাম মায়া। সে শুধু বিড়ম্বিত করে সাহায্য করে না। এই সামান্য সাধারণ জীবন, এই আলোর স্পর্শ, বাতাসের স্পর্শ সবই চলমান। আমরাও এই চলমান কালের শরিক। মায়া পেছন ফেরায়, জড়াতে চায় তাই সে এই জগৎসত্যের বিরুদ্ধাচারী, গতিভঙ্গে প্রগতিকে ক'রতে চায় প্রতিহত। মায়ার শক্তি মাধ্যাকর্ষণের মত—যতই তাকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা হোক, যতই শক্তি প্রয়োগ ক'রে তার শক্তিকে

অস্বীকার করে উত্তরণের করা যাক আয়োজন, শেষ অবধি অসাফল্য অবধারিত হয়। যেমন ভাবে আমার মনে পড়ছে অলকনন্দার কথা, সে কি নিছক মায়া নয়? তবে কি? কেন, অলকনন্দার থেকে মানসিকতায় বহু যোজন দূরে আমার অবস্থান, বাস্তব দূরত্বও দূরতিক্রম্য তবু এই মনে আসা—কি তার নাম? এই তো মায়া। সে থাকে পেছনে, পেছন থেকে টানে।

শুক্লা পঞ্চমীর সেই মায়াময় চন্দ্রালোক আমাকে কেবলই ছলনা ক'রতে লাগল বলে আমি দৃষ্টির প্রান্তে অরণ্যের দিকে লক্ষ্য করবার চেষ্টা না ক'রে সামনেই দৃষ্টির অদূরে কর্ষিত ভূমির ওপর সর্ষে গাছের সারির দিকে দেখতে লাগলাম। এমনি চাঁদের আলোর ধারাবর্ষণে সর্ষের ফুলের সমারোহ দেখতে বড় ভাল লাগে। হরিনন্দনের ক্ষেতে একবার এমনি সর্ষেফুল দেখেছিলাম। সে রাতে অবশ্য ছিল পূর্ণিমা, মনে হচ্ছিল আমি মানুষের বহুকল্পিত স্বর্গরাজের নন্দন কাননে এসেছি। সর্ষে ফুলের এমন সৌন্দর্য কোনদিন দেখিনি। বর্ণময়, গন্ধময় সেই রাত্রি আমাকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে আজও তা মনে পড়ল এবং শুধু যে মনে পড়ল তাই নয় সেই দৃশ্যের স্মৃতি আমাকে প্রবল এক মায়ালোকের কুহক থেকে নিয়ে এল সরিয়ে।

পরদিন সকাল বেলা উঠেই আমি রামনিবাসের খবর নিতে তার বাড়ীর দরজায় যখন পেঁছালাম তখন রামনিবাসের স্ত্রীর স্নান পর্যন্ত হয়ে গেছে। আর আশ্চর্য এই যে প্রথমেই মহিলা আমার সামনে পড়ে গেল। কাল রাতে প্রথম পরিপূর্ণভাবে দেখেছিলাম আজও দেখলাম, তবে আজ মনে হ'ল ভোরবেলাকার বৃষ্টি ভেজা গন্ধরাজ। তেমনি ভরাট চেহারায় নিটোল সৌন্দর্য—তাজা। আমাকে দেখে তাঁর যে কি রকম অভিব্যক্তি হল ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমাকে ঢুকতেও বললেন না অভ্যর্থনাও ক'রলেন না। গতরাত্রে তাঁর ওই বিপদের মধ্যে আমার যে একটা ভূমিকা ছিল তার জন্যে কোন কৃতজ্ঞতাও তাঁর ব্যবহারে কোথাও লক্ষ ক'রতে পারলে হয়ত সেই মুহূর্তে আমি একটু তৃপ্তি পেতে পারতাম। কিন্তু আমাকে তৃপ্তি দেবার কথা তো বাদ কোন সৌজন্যসূচক আবাহন ও না করে সামান্য শব্দে বললেন, বাবুজী ওই ঘরে আছে। —ইশারায় সামনের ঘরটি দেখিয়ে দিলেন আমাকে। আমার একটু কথা বলবার ইচ্ছা ছিল, প্রশ্ন ক'রতে চাইছিলাম কেমন আছে—সুযোগ পেলাম না। আমাকে কোন সুযোগ না দিয়েই মহিলা তাঁর সামনের ঘরটিতে ঢুকে গেলেন। আমি গুটি গুটি আমার বাঁদিকের ঘরটিতে ঢুকে পড়লাম। মাটির ওপর নিচু চৌকিতে বিশাল গদির ওপর বসে রামনিবাস একখানা মোটা খাতায় কি যেন তন্ময় হয়ে পড়ছিল। আমি ইচ্ছে ক'রেই মেঝের ওপর পা দিয়ে একটু শব্দ করলাম। তাতে তার দৃষ্টি আমার দিকে পড়ল। আমাকে দেখে বলল, আসুন। —তার কণ্ঠস্বর আবেগহীন।

এত নিস্পৃহ সে আহ্বান যে তাকে সৌজন্য প্রকাশ পর্যন্ত ভাবা যায় না। বরং বলা যায় চূড়ান্ত আন্তরিকতা শূন্য সেই কথাকে আহ্বান বলাও ভুল। তবে আমি তার নিস্পৃহতা গায়ে মাখলাম না, প্রশ্ন করলাম, কেমন আছেন ?

ভাল—রামনিবাস জানাল। আমি কথা বলবার সুযোগ পেয়ে বললাম, কাল আপনি আমাদের ভয় পাইযে দিয়েছিলেন।

রামনিবাস এবার সম্পূর্ণভাবেই বেরিয়ে এল তার খাতার মধ্যে থেকে, বলল, কাল আমার জ্ঞান ছিল না।

আগে কি কখনও এরকম হয়েছিল ?

না।

আচ্ছা আপনি এখানে কতদিন আছেন ?

আসামে আছি সেই ছেলেবেলা থেকে। আগে গৌহাটিতে এক মামার কাছে ছিলাম। এখানে বছর পনের হ'ল এসেছি। কেন বলুন তো ?

আমি ওর কথা মন দিয়েই শুনছিলাম, বললাম, তা হ'লে আর বোধহয় প্রয়োজন হবে না নইলে বলতাম আজই শহরে গিয়ে বড় কোন হার্টস্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখিয়ে আসুন।

রামনিবাস আমার দিকে এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল। সেই দৃষ্টিবিদ্ধ আমি কৈফিয়তের মত ক'রেই বললাম, রোগ হ'লে চিকিৎসার উপায় নেই। আমি তো কাল ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। আজ কোন অসুবিধা নেই তো ?

না।

যাক। লক্ষণগুলো দেখে মনে হ'ল বায়ুর চাপ ওপর দিকে উঠছে বলেই ব্যথাটা হচ্ছে। আমার আন্দাজ তাহলে মিলেছে। নইলে যে কি হ'ত ? রামনিবাস বোধকরি আমাকে অনুমান করার চেষ্টা ক'রল। ইতিমধ্যে ভেতর থেকে কিছু ভাজাভুজি আর একগ্লাস দুধ এসে আমার সামনে নামল। চাকরটা নিঃশব্দেই করল সব, রামনিবাস বলল, নিন খেয়ে নিন।

আমি বেশ হকচকিয়ে গেলাম। রামনিবাস বিজ্ঞের মত বলল, দুধ আমাদের শরীরের অর্ধেক রোগ সারিয়ে দেয়।

আমি প্রতিবাদ করলাম, সব সময় নয়। কাল যদি আপনার বায়ু ছাড়া অন্য কোন কারণে ব্যথা হ'ত তাহলে ওই দুধ বিপরীত কাজ ক'রত।

এবার অবাক হ'ল রামনিবাস। তাকে আর একটু অবাক হ'তে দিয়ে বললাম, এখানে দরকারে ওষুধ পর্যন্ত পাওয়া যায় না ?

যায়। ওপাশে ভজনলালের দোকান আছে। সন্ধেতে বন্ধ হয়ে যায়।

ডাক্তার তো নেই কাছাকাছি ?

আছেন ডাক্তার ঘোষ। বুড়োমানুষ।

একটুকরো কাগজ দিন। আমি একটা ওষুধ জানি সেটা আনিয়ে রাখুন। আবার এরকম হ'লে খেয়ে নেবেন। কিছুদিন খেতে থাকবেন সেরে যাবে।

আবার হবে ? —রামনিবাস যেন ভয় পেয়ে গেল।

কিছু একটা হলে কি এত তাড়াতাড়ি সেরে যায় ? আসলে রোগ প্রথমে হয় শরীরের ভেতরে। যতদিন তা ভেতরে থাকে তার প্রকাশ না হয় বোঝা যায় না। বাইরে ফুটে বেরোলে তখন বোঝা যায়। তেমনই বাইরে চাপা পড়লেই ভেতরে সেরে যায় না। তাকে সারিয়ে তুলতে হয়।

আমার কথাটা বোধহয় রামনিবাসের ভাল লাগল না। লাগে না। মনের অনুকূল নয় এমন কোন কথাই কোনদিন কোন মানুষের ভাল লাগে না। তাই বলে ওকে সাবধান করবার দায়িত্ব পালন না করি কি করে ? অপ্রিয় হলেও কথাটা কর্তব্যের খাতিরেই বললাম। বিকাল হলেই বন্যজন্তুর ভয়ে যেখানে পথ জনশূন্য হয়ে যায় সেখানে রাতবিরেতে আবার এমনি হলে যাতে প্রতিকার ওরা ঘরে বসেই ক'রতে পারে তার ব্যবস্থা ক'রে দিলাম আর কি।

রামনিবাস অল্পক্ষণ বাদেই বলল, পেটের ভেতরটা কেমন ব্যথা হয়ে আছে।

ওটা মিলিয়ে যেতে এক দু দিন সময় লাগবে। আমি জানালাম, বুঝিয়ে দিলাম, ওটা কিছু নয়। ওই ব্যথার জন্যে চিন্তা করবেন না।

হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে যে এটা কালকের যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া।

ঠিকই তাই। অত্যন্ত যন্ত্রণার জন্যে ব্যথা হয়ে আছে। দু চারটে দিন বিশ্রাম করুন। চলাফেরা কম ক'রবেন।

আমার উপদেশ শুনে রামনিবাস চিন্তিত হয়ে পড়ল। তার চিন্তার কারণ জানবার কোন প্রয়োজন আমার ছিল না তবু সে স্বতপ্রণোদিত হয়েই জানাল, কাল যে রাঙাবিলে রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবার কথা আছে।

থাকলেও আপনার যাওয়া উচিত হবে না। এখন তো আপনার বিছানায় শুয়ে থাকা উচিত।

আজ যদি সারাদিন শুয়ে থাকি তাহ'লে কাল যেতে পারব না ?

আমি মনে মনে অসন্তুষ্ট হলাম। সে মনোভাব গোপন ক'রে বললাম, আজ তো বিশ্রাম করুন তারপর দেখি। আমার কথাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে রামনিবাস বলল, ডাক্তার ঘোষকে জেনে দেখি কি বলে। ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস করে শুধু শুধু কাজ নষ্ট কেন করি।

তা তো ঠিকই। তাই জেনে নিন না।

আমার কথা শুনেও তার চিন্তা দূর হল না। একটু বাদেই সে বলল, কিন্তু ডাক্তার ঘোষ তো ডাকলে আসবে না।

কেন ?

বুড়ো মানুষ ভাল চলতে পারে না।

তাহ'লে ?

রোগ দেখাতে হলে ও'রই কাছে যেতে হয়।

আপনি কি ক'রে যাবেন ?

তাই ভাবছি।

তার ভাবনাকে চাপা দিয়ে আমি বললাম, বরং আমাকে বলে দিন কোথায় তিনি থাকেন। আমি দেখা করে সব বলে আসছি।

সে বরং মন্দ হয় না। লিখিয়ে নিয়ে আসবেন। —শেষ নির্দেশটি আমার বড়ই খারাপ লাগল। আসলে রামনিবাস আমাকে বিশ্বাস করে না। হয়ত কাউকেই করে না। একদল মানুষ আছে যারা অবিশ্বাস করেই তৃপ্তি পায়। মনে করে সার্থক হতে পারছে তারা, বিশ্বাসে যে রমনীয়তা আছে তার মাধুর্য সম্পর্কে তারা জন্মসূত্রেই হয়ত পায়নি কোন সচেতনতা। তাই আত্মতৃপ্তির আতিশয্যে ভোগোস্পহার অমিতাচাবে তারা হয়ে থাকে অবিশ্বাসী। বৈষয়িক লাভ লোকসান পরিমাপ করে তারা জীবনের হিসাব করে না। জীবন—তারা হয়ত মনে করে ভূসম্পদ আর কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে মূল্যায়িত হওয়া সম্ভব। এই যে জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই যে সময়টুকু, এর তাৎপর্য তারা হয়ত বোঝেই না। নয়ত তাদের বোঝবার দৃষ্টিকোণ অন্য। ছোট্ট একটা ফুটোতে চোখ রেখে যদি কেউ পৃথিবীকে দেখে সে-ও নিশ্চয়ই দেখবে পৃথিবী গোল কিন্তু সে কতটুকু ? এই আলো তার চোখেও পড়ে কিন্তু কতটুকু ? এই বিশালতা এই যে বিপুল আয়োজন জীবনকে ঘিরে আলোড়িত অথবা জীবন যে বিপুল আয়োজনের মধ্যে সঞ্চরমান, এর ক্ষুদ্রাংশেই সে তৃপ্ত থাকে মাত্র। ক্ষুদ্রর মাধ্যমে কোনদিন ব্যাপ্তিকে আশ্রয় করা যায় না। তা হয়ত চায়ও না রামনিবাস। সে তার ওই খাজাঞ্চিখানা আর বেড়ে যাওয়া কাগজী মুদ্রার মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত সার্থকতার পায় সন্ধান। আমি তার অবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বললাম, আপনার বাহাদুর তো ডাক্তার ঘোষের বাড়ী চেনে। ওকেই পাঠিয়ে দিন। কি হয়েছিল তা বরং আমি লিখে দিচ্ছি।

ঠিক আছে। বলেই সে তার হাতের খোলা খাতার মধ্যে মগ্ন হবার চেষ্টা ক'রল। আমি তার গিন্নীর পাঠানো খাবারগুলোতে মন দিলাম।

এর দিন কয়েক বাদে আবার কাজ না থাকার জন্যে দুপুরবেলা ঘরে শুয়ে আছি এমন সময় রামনিবাসের চারকটা এসে খবর দিল শেঠিনী আমাকে খবর দিয়েছে এখনই একবার যাবার জন্যে। হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে শেঠনী।

বিপদের কথা শোনামাত্রই উঠে গিয়ে দেখি রামনিবাসের স্ত্রী ঘরে নিজের বিছানার ওপর বসে আছে। আমি ঢুকতেই বলল, দেখুন না কি বিপদ। হঠাৎ

আমার পেটে কেমন ব্যথা হতে আরম্ভ করল।

পেটে? আমি জানতে চাইলাম, পেটের কোন জায়গায়? আমার প্রশ্ন শুনে সে শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল যেন আমার প্রশ্ন সে বুঝতেই পারছে না। আমি আমার প্রশ্ন আবার বললাম। তাতে সে তার পেটে হাত দিয়ে বলল, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না, এই এখানেই হবে।

কি রকম ব্যথা?

আগে কোনদিন তো হয়নি, ঠিক কেমন বুঝছি না।

এ তো বড় মুস্কিলে পড়া গেল, মনে মনে বললাম। তারপর দ্বিধা ছেড়ে কর্তব্য মনে ক'রে বললাম, শুয়ে পড়ুন তো। কেমন রহস্যময় দৃষ্টি ফুটে উঠল মহিলার চোখে, বলল, শুয়ে পড়তে হবে?

নইলে দেখব কি করে?

ব্যথা কি দেখা যায়? বলে রহস্যময় একটু হাসি মুখে মেখেই শুয়ে পড়ল। আমি বললাম, চিৎ হয়ে শুতে হবে, কাত হয়ে নয়।

আমার কথা মেনে নিয়ে তীব্র গতিতে চিৎ হয়ে চট ক'রে কাপড়ের আঁচলটা টেনে নিয়ে মুখের ওপর চাপা দিয়েই তামাসার সুরে বলল, এবার আর কি ক'রতে হবে বলে যান।

আমি কথাটা উপলব্ধির করবার জন্যে এক মুহূর্ত থমকে রইলাম। পরক্ষণেই শুনলাম সে বলছে, আমার শরীরে কোন ছোঁয়াচে রোগ নেই।

কথাটা শুনে সত্যিই কেমন লজ্জা লাগল। আমি তার শরীরের ব্যাধি পরীক্ষা ক'রতে গিয়েও যে অহেতুক সংকোচ করছি সেটি বুঝতে পেরেই যে কথাটি বলা তা আমি বুঝলাম। তাই দ্বিধা আর জড়তা নিমেষের মধ্যে কাটিয়ে উঠে তার দুই হাঁটুর তলায় হাত দিয়ে পা দুটো মুড়ে দিলাম। তার মুখটা পাতলা শাড়ীর আঁচলে ঢাকা আছে তবু সে দিকে তাকালাম না। আর আঁচলটা এক ঝটকায় চাপা দেওয়াতে পেট বুক সমেত সমেত সারা উর্ধ্বাঙ্গ থেকে কাপড় সরে গিয়েছিল বলে তার সুসমৃদ্ধ স্তনযুগ্মের সৌন্দর্যও আমার চোখে পড়ছিল। শুধুমাত্র একটা জামা গায়ে আছে বক্ষবন্ধনী ছাড়া এও বেশ দেখা যাচ্ছিল। মহিলার সারা শরীরে যৌবন ঝকঝক করছে আমি সে দিকে উদাসীন থাকবার চেষ্টা ক'রে পেটে আমার আঙ্গুলের আগাগুলো দিয়ে চাপ দিয়ে জানতে চাইলাম, এখানে ব্যথা আছে?

জবাব নেই।

আর একটু নীচে পাকস্থলীর কাছাকাছি চাপ দিলাম, এখানে?

জবাব নেই।

অবশেষে জানতে চাইলাম, ব্যথাটা কি রকম বলুন তো?

তুমি একটি বন্ধু—বলেই মুখের চাপা খুলে দিলেন মহিলা, উঠে বসে বললেন, এতবড় একটা ব্যথা যে দেখতে না পায় সে আবার কি জানবে ?—আমি আশ্চর্য হয়ে সেই রূপসী রমণীর রমনীয় মুখের ওপর কি যেন এক রহস্যের প্রলেপ দেখতে পেলাম। বুঝলাম অসীম প্রশ্রয়ে সে আমাকে এমন কিছু দেখাতে চাইছে যা সত্যিই আমার দৃষ্টি ক্ষমতার বাইরে। আমি মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম তীব্র হীনমন্যতার দাসত্বে আমি এমনই আবদ্ধ যে আমার অধিকারবোধ পর্যন্ত ভুলে গেছি। অন্য যে কোন একজন থেকে আমি যে কোন অংশে ছোট নই এই বোধ জাগতে এত দেরী হয়ে গেল যে আমাকে মহিলার ভৎসনা শুনতে হ'ল। আর সেই ভৎসনাতে আমি ফিরে পেলাম আমার পৌরুষ, আমার ব্যক্তিত্ব। চট করে তাকে ফের শুইয়ে দিলাম। তার বুকে হাত রাখলাম। বলল, ব্যথা ওরই তলায় বুকের ভেতর। অনেকটা ভেতরে, বলেই সে আমাকে দুবাহু দিয়ে জাপটে ধরে টেনে শুইয়ে দিল। একসময় শারীরবিদ্যার ছাত্র ছিলাম। দীর্ঘদিন শরীরের ভেতরের যন্ত্রপাতি সবই চিনি। সেখানে কোন গোলমাল হলে জানি তার মেরামতের কেরামতি। সেই বিদ্যা আয়ত্ত ক'রতে গিয়ে বহু মৃতদেহের ওপর শল্য প্রয়োগ ক'রে পেঁছেছি দেহের অভ্যন্তরে কিন্তু সুস্থ সবল সুন্দর একটি শরীর পরিক্রমণ আমার জীবনে এই প্রথম। সত্যি বলতে কি সে অস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি আমাকে কোন এক মায়াময়লোকে নিয়ে গেল যে আমি স্বপ্নেও তা যাইনি কখনো। বহুদিন বাদে অকস্মাৎ আমার মনে হ'ল অলকনন্দার কথা। অলকনন্দার দেহের ছিল একটা সুঘ্রাণ, তার স্পর্শে ছিল মাদকতা যা আকর্ষণ ক'রত কি এক অজানা মোহের দিকে। সে কি তবে এই ? এমন সম্মোহন! তার নরম বিছানায় শুয়ে সম্বিৎ ফিরে পাবার পর আমার মনে প্রশ্ন হ'ল এই স্বাদ কি তবে অলকনন্দার শরীরেও ? আমি স্তব্ধতার গভীরে আচ্ছন্ন বিশ্রামে শুয়ে রইলাম ওঠবার কোন চেষ্টা না করেই। সে-ও যেন ক্লান্ত দুহাতে আমাকে জড়িয়ে রয়েছে আমার শরীরের মধ্যে তার মুখটাকে গুঁজে দিয়ে। নড়ছেনা। আমাকে মাধুর্যের চূড়ান্ত উচ্চতায় পেঁছে দিয়ে গেল সে যখন বিছানা ছেড়ে উঠে বসল, আমার গালে আলতো ক'রে একটা চড় মেরে পরম সোহাগী স্বরে বলল, আনপঢ়।

আমি শুধু দুচোখ ভার তার অপরূপ শ্রীময়ী মুখের চঞ্চল হাসিটির দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম। যাবার সময় সে কেবল দরজাটার টেনে দিতে দিতে ঘরে এসে প্রীত মুখে দুহাতের তালুতে আমার মুখটা ধরে আদর ক'রে গেল। তাতেই আমার জ্ঞান ফিরল। অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হ'লাম আমি। আরে! রামনিবাস! তার পরিচারক! দারোয়ান! এতক্ষণ তবে দরজা খোলা ছিল! সর্বনাশ! কিন্তু তা হয়ে থাকলে হয়েই গেছে! এখন আর কি উপায় ? তেমনি ভাবে শুয়েই রইলাম অন্য কিছু করণীয় কর্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিয়ে। অল্পক্ষণ

বাদেই শুনলাম নেপথ্যে গৃহকর্ত্রীর স্বর বোধহয় চাকরটাকেই বলছে, ভজনলালজীর দোকানে পেলে না ? তবে আর কি করা যাবে ? তুমি বরং একটা কাজ কর ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে বল আমার খুব মাথার যন্ত্রণা করছে একটা ওষুধ দিন। তোমার কাছে যে টাকা দিলাম সেই থেকে দাম দিয়ে দেবে।

বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে আমি উঠে পড়লাম। মহিলার আর দেখাটি নেই। ঘরের বাইরে আসবার সাহস হচ্ছিল না পাছে রামনিবাসের মুখোমুখি হয়ে যাই সে নিশ্চয় মনে ক'রবে। কেউ ঘরে নেই আমি তখন ঢুকেছি—। অতি সাবধানে ঘরের ভেতরেই ঘুরতে লাগলাম। মেঝে ছাড়া সবই কাঠ। মাথার ওপর টিন। কড়ি কাঠ গুণে সময় কাটানো যায় শুনেছি তারও তো উপায় নেই—এ কি মহা জ্বালায় পড়া গেল! আগে শুনেছিলাম এদিকে নাকি মেয়েরা বন্দী করে রাখে পুরুষদের মন্ত্র তন্ত্র দিয়ে। এও তো সেই কামরূপ কামাখ্যার দেশ! কিন্তু এ মেয়ে তো সেই সব মেয়ে নয়! এ তো রাজস্থান থেকে এসেছে—তবে ? কে জানে আমাকে আবার এমনি ক'রে বন্দী রাখল কেন ? নাকি বাইরেটা সামলে নিচ্ছে ? আমার এই সব দুর্ভাবনার মধ্যে সে এসেই একখানা শাড়ী টেনে নিয়ে আমাকে বলল, তুমি বস আমি এখনই কাপড়টা বদলে আসি। আমি চেয়ে দেখলাম সে পরে আছে শুধু তার শাড়ীখানা, তলার শায়াটা কোথায় খুলে রেখে এসেছে।

একটু বাদেই সে কাপড় বদলিয়ে ঘুরে এল ঘরে। আমি প্রশ্ন ক'রলাম, শুধু কাপড় বদলাবার জন্যেই তুমি এঘর ওঘর করছ ?

আর কি কারণ থাকতে পারে তুমি মনে কর ?—রহস্য ক'রে সে উত্তর দিল প্রগলভ্ চপলতায়। আমি আর কোন কথা বললাম না। মুখের সামনে যে কথা এসে গিয়েছিল তাকেও ফিরিয়ে দিলাম। তার বদলে বললাম, আমি এখন যাই।

আজ তো তোমারও কোন কাজ নেই, একা আছি না হয় আমাকে পাহারাই দিলে!

মহিলাকে আগেও তো দেখেছি কিন্তু তার যে এমন সহজ স্বাভাবিক সাবলীল ব্যবহার হতে পারে দূর থেকে দেখে কোন দিন ভাবতে পারিনি। শেঠ-এর স্ত্রী শেঠিনী হবে এটাই যেন স্বাভাবিক তাই শেঠ নামক টাকা গোনার যন্ত্রের পরি-পূরক হিসেবে তাকে রুটি বানাবার যন্ত্র বলেই ভাবতাম। আজ যে কি ক'রে তার মধ্যে থেকে এমন এক চপলা যুবতীর অভ্যুদয় হ'ল ভেবে অবাক হয়ে গেলাম। বাস্তবিকই জীবন কত বিচিত্র। বিশ্বসংসারে আমার মনে হ'ল সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী হ'ল মানুষ। আমি জানতে চাইলাম, একা হয়ে গেলে কি করে ?

বাবুজী সেই ভোরে উঠে গৌহাটি চলে গেল। আজকে যাবার জন্যে কত বারণ ক'রলাম শুনল না, বলল কাজ আছে।

এতক্ষণে আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তাই শুধুমাত্র চাকরটাকে সরিয়ে দিয়েই ও নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। আমি যে আশ্বস্ত হ'লাম এটা বোধহয় ওর চোখে ধরা পড়ে গেল কিন্তু তার কোন অভিব্যক্তি ওর চোখে মুখে কোথাও প্রকট হ'ল না। বুদ্ধিমতী মেয়ে অথবা মেয়েরা বোধহয় ক্ষেত্র বিশেষে বুদ্ধিমতীই হয়। তবে ওর কোন কাজেরই কোন হিসেব আমি পাচ্ছিলাম না, বিশেষ ক'রে সামান্য কাপড় ছাড়ার ব্যাপারে ওর আড়াল করবার কোন কারণ আমি ভেবে পেলাম না। ইতিমধ্যে পরিচারকটি এসে ওষুধটা দিতেই ও আমাকে বলল, এই যে ওষুধ এসে গেছে। আমিও ওষুধটা পরীক্ষা করবার অছিলায় হাতে নিয়ে বাহককেই জিজ্ঞেস ক'রলাম, কখন খেতে বলেছে? সে জানাল, সারাদিনে তিনবার খাবার জন্যে ডাক্তার সাহেব বলে দিয়েছে।—গিন্নিকে চলে যেতে দেখে পরক্ষণেই বলল, বাবু, বই বুড়ো ডাক্তার বড় মুখ করে। গেলেই খিচ খিচ করে।

কেন? —আমি জানতে চাইলাম।

কি জানি। সকলকেই করে। সেদিন তো শেঠজীকে আপনিই ভাল ক'রে দিলেন, আজ তো দেখছি মাইজীও অনেক আরাম আছে, ওই পাগলা ডাক্তারের চেয়ে আপনি ওষুধ ভাল জানেন। আসলে ওই পাগলা ডাক্তারের ইংরিজি দাওয়াই বলে সবাই ওর কাছে যায়। আমাদের দিশি দাওয়াই অনেক ভাল, বলুন ঠিক কি না?

সায় দিলাম। আর বললাম, যাও তোমার শেঠনীকে ওষুধটা দাও গিয়ে, আমি চললাম।

ঘরে এসে শুয়েছি তার কিছু পরেই বিশাল এক থালায় রকমারী খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসে পরিচারকটি বলল, মাইজী এই জল খাবার পাঠিয়েছে।

তাকে কি বলব ভেবে না পেয়ে শুধু তার দিকে তাকিয়েই রইলাম। সে আমার ভাবলেশহীন মুখ দেখে বলল, আপনি খেয়ে নিন আমি পরে এসে বাসনগুলো নিয়ে যাব।—

আমার শুধু প্রশ্ন ক'রতে ইচ্ছে হ'ল এত খাবার ক'বারে খাব। তা আর বললাম না, আমাকে ভাবনার মধ্যে রেখেই সে চলে গেল। আমি তখনকার মত শুয়েই রইলাম।

আমার চোখের ওপর দিয়েই সূর্যের আলো কমতে কমতে নিভে গেল, সন্ধ্যা হ'ল, চারিপাশের শব্দ থেমে গেল, অসংখ্য ঝিঁঝিঁর পাখায় ভর ক'রে নেমে এল গাঢ় কালো অন্ধকার। আমি সেদিন আর উঠলাম না। শরীরে কোন অনুভূতির স্মৃতি ছিল না কিন্তু মনের মধ্যে কি এক ভাবের বন্যা তার অনগুনতি তরঙ্গমালা নিয়ে আছাড়ি পাছাড়ি ক'রছিল যার আমি কোন হিসেব নিকেশ পাচ্ছিলাম না। সেই অনুভূতি আমার অচেনা। অলকনন্দা আমার প্রেয়সী ছিল, তার উপস্থিতিতে

ছিল এক অনুপম আনন্দ, তার স্পর্শে ছিল এক অলোকসামান্য সুখ, কিন্তু এই রমণী আমাকে আজ এমন এক বিস্ময়কর অনুভবে প্লাবিত ক'রে দিয়েছে যে আমি যেন সেই প্রাণবন্যার প্লাবনে ভেসেই চলছি, কিছুতেই স্বাভাবিকতার কূলে পৌঁছোনো আমার পক্ষে হয়ে উঠছে না। তার দেহে কী যে মাদকতা আছে আস্বাদিত আমিই কি তার সবটুকু পারলাম বুঝতে? এ যেন কোথায় হারিয়ে যাওয়া, তলিয়ে যাওয়া।

সেই স্মৃতি আমাকে আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল, অন্ধকার এসে তাকে ক'রল প্রোজ্জ্বল। এ কি কখনও হয়? অন্ধকার কি কখনও কিছুকে উজ্জ্বল করে? কিন্তু ক'রল আমি দেখলাম। সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে হয়ত কয়েক লক্ষ, কয়েক কোটি ঝিল্লির শব্দের মাধ্যমে স্মৃতির নূপুর বেজেই চলল অবাঙ্ময় বাঙ্ময়তায়।

আমার সেই পরম রমণীয় স্মৃতি-সুখ ব্যাহত হ'ল রামনিবাস-এর পরিচারকের উপস্থিতির কারণে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি যে জেগেই আছি সেটা ঠাহর ক'রতে না পেরে অনুমানেই সে আমাকে ডাকতে লাগল খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে। তার থালা-বাটিগুলো সে ফিরে চায়। আমি একটু রসিকতা করেই বললাম, তোমার মাইজীকে গিয়ে বল গে যে বাবুর এত ক্ষিদে লেগেছিল বাসনগুলো সুদ্ধ খেয়ে ফেলেছে।

আলো জ্বালুন না—বলল সে। অর্থাৎ আলো জ্বাললে সে বাসনগুলো নিয়ে যেতে পারে। তার কথার ভাব বুঝে বললাম, তাতে বিশেষ লাভ হবে না। তুমি সকালে এসে বাসনগুলো খুঁজে দেখো।

তাকে ওই কথা বললাম কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড লোভ আমার মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠল, অসম্ভবের কল্পনা আকস্মিক ভাবেই উঠল ফুটে, যদি এ না এসে সে নিজে একবার আসত বাসন নেবার অছিলাতে। পারত না কি? কি এমন হ'ত? একই প্রাচীর—সীমানার মধ্যেই তো। কি এমন অসুবিধে হ'ত? এই অন্ধকার তো সাহায্য ক'রত তাকে। কেউ দেখতে পেত না, জানতেও পারত না। কে জানে হয়ত আমি আছি কি নেই জানে না বলেই ঝুঁকি নেয়নি। এমনও তো হ'তে পারে এ লোকটি ফেরত গেলে সে নিজেই আসবে বাসন ফিরিয়ে নেবার অছিলায়। মনের মধ্যে সেই আশা এমনই চাড়া দিল যে আমি প্রায় বলেই ফেলতে যাচ্ছিলাম, শেঠনী এলে বাসন পাবে, নইলে এগুলো হজম হয়ে যাবে—শেষ মুহূর্তে সেই হটকারিতা থেকে রক্ষা হ'ল। অন্ধকারের গভীরে আমার গভীরতর চিন্তা-গুলোকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে আমি পাশ ফিরে শুলাম। আমার শরীরের নিচে মাচাটা একটু শব্দ ক'রে উঠল মাত্র। পরিচারককে উদ্দেশ্য ক'রে বললাম, যাবার সময় আপনাকে বলে দাও রাত্রে আমি খাব না।

সকালে ঘুম ভাঙতেই খবর পেলাম রাত্রে বাঘ এসে একটা গরু ধরে নিয়ে গেছে।

কার গরু ? না ঘাসিরামের। ঘাসিরাম বলে লোকটা কিছুদিন যাবৎ এসে এখানে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। নানা কাজের মধ্যেও দু চারটে গরু রেখে সে বেশ জমাটি সংসার করে ফেলেছিল তা ভাল গরুটাই চলে গেল—এমনি ধরণের খেদোক্তি ক'রতে লাগল রামনিবাস দাঁতন করতে করতে। কে যে ঘাসিরাম আর কোথায় তার গরু থাকত জানি না। কখনও তার নাম এর আগে আলোচিত হয়নি বলে আমিও জানতাম না। এত ভোরে খবরটা এলো কি করে? কতটা দূরে থাকে সেই ঘাসিরাম নামের লোকটা? অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন বলে রামনিবাসকে তা আর জানালাম না। শুধু তার পেছন পেছন চলে এলাম তার বাসগৃহের সামনেটায়, আমাদের এলাকার সদরে। আমিও একটা আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙ্গে নিয়ে দাঁত ঘষতে লাগলাম।

একটু বাদেই একজন স্থানীয় লোক যেন পথ চলতে চলতেই দাঁড়িয়ে পড়ল, রামনিবাসকে বলল, ইস বড় গাইটাকেই নিয়ে গেছে বাঘে।

তুমি গিয়েছিলে? —রামনিবাস দাঁতনটাকে হাতে ধরে জানতে চাইল। লোকটি জানাল, আরও অনেকে সেখানে আছে।

রামনিবাস আমাকে বলল, চলুন, এই তো সামান্য দূর, ঘুরে আসি।

আমার কোন আগ্রহও নেই আপত্তিও হ'ল না। শুধু অহেতুক প্রশ্ন ক'রলাম, ঘাসিরামজী কোন দিকে থাকে ?

উত্তরে। কানুবাবুর বাড়ী চেনেন ?

না।

কানুবাবুর বাড়ীর পরেই।

আর কথা বাড়ালাম না। কাঁচা রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। এদিকটা সবই মানুষের বসতি। ফাঁকা ফাঁকা বাড়ী সব। দু একজন লোক নানা রকম ফুল গাছ লাগিয়ে আকর্ষক ক'রেছে নিজের বাসের এলাকা। বাঁ দিকে ঘুরতেই চোখে পড়ল বেশ নতুন একটা ঘর। সাদা রঙ কালো বর্ডার দেওয়াও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। আসলে কাঠের ফ্রেম করে দর্মা দিয়ে তৈরী করে তার ওপর ভাল মাটির প্রলেপ দিয়েছে কাঠগুলো বাদে। মাটির দেয়ালে চূণকাম করায় সাদা আর কাঠের ফ্রেমে আলকাতরা দিয়েছে বলে কালো কুচকুচ করছে। বেশ দেখতে। রামনিবাস জানাল বন বিভাগের দপ্তর হচ্ছে। দু এক দিনের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে।

সেই বাড়ী ছেড়ে কিছুটা গিয়ে ডানদিকে বাঁক নিতেই বসতি কমে এল, অনেকটা ফাঁকা জমির পর একখানা বাড়ী দেখা গেল। আমরা সেখানেই এলাম। কাঠের ঘর ওপরে টিন দিয়ে ছাওয়া। বেশ কয়েকজন লোক জটলা ক'রছে কিন্তু আমরা পেঁছোতেই একজন লোক রামনিবাসকে স্বদেশীয় ভাষায় দারুণ আন্তরিক ভাবে অভ্যর্থনা ক'রল। কথা খুবই সামান্য বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখের ভাবে যে

আগ্রহ ফুটে উঠল তাতে মনে হচ্ছিল যেন খুব আপন কাউকে পেয়ে গেছে ঘাসিরাম। তার পরই রামনিবাসকে নিয়ে গেল বাড়ীর ভেতরে, পেছন দিকটায় সেখানে একটা বড় চালার নিচে গরু রাখার ব্যবস্থা। সেখান থেকেই বড় একটা গরুটাকে ধরে নিয়ে গেছে বাঘ। সবচেয়ে বিস্ময়ের এই যে বাঁশের বেড়া যেমন কার তেমনই আছে অথচ বাঘ গরুটাকে নিয়ে গেছে। এই রহস্য নিয়ে আলোচনা চলল, একজন আদিবাসী এসেছিল সে জানাল বাঘে ভারী শিকার পিঠে করে বয়। এ দৃশ্য সে তার নিজের চোখে দেখেছে। অনেকদিন আগে এক জ্যোৎস্না রাত্রে সে একটা বাঘকে সম্বর মেরে সেটার গলাটা কামড়ে ধরে দেহটা পিঠে ফেলে পাহাড়ের নিচের দিকে একটা নালার ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে যেতে দেখেছে। ঘটনাটা শুনে রামনিবাস বলল, এখন ভাবনা হচ্ছে এই, যে বনের বাঘ যদি আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উৎপাত করে তাহ'লে রাত্রে ঘুমোনো যাবে কি ক'রে?

সকলের কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে স্থির হ'ল বন বিভাগের সাহেবকে এর একটা বিহিত করবার জন্যে বলতে হবে।

ঘণ্টা খানেক বাদেই রামনিবাসের গদিতে একটা সাইকেলে এসে নামল রহিম সাহেব, বনের মালিক—রেঞ্জার। রামনিবাস অসমীয়া ভাষায় জানতে চাইল, শুনেছেন?

হুঁ। ময় শুনিছু—পান চিবোতে চিবোতে রহিম রেঞ্জার জানাল।

একটা কিন্তু ব্যবস্থা না ক'রলে কোনদিন আমাদেরই খেয়ে ফেলবে।

রহিম রেঞ্জার রসিকতা ক'রে বলল, মাড়োয়ারী মানুষদের খেতে পারবে এমন প্রাণী এদেশে নেই। নিজের রসিকতায় নিজেই খুব হাসল রহিম। রামনিবাস পান সুপারী মেলে ধরতে আধখানা পান নিয়ে তাতে একটু চুন মাখিয়ে মুখে পুরে কাঁচা সুপারীর একটা আধলা টুকরো নিয়ে সামনের দাঁতে তার থেকে আধখানা কেটে নিল। সেগুলো মুখের মধ্যে একসঙ্গে ক'রে বারকয়েক চিবিয়ে অতি কসরৎ ক'রে বলল, ব্যবস্থা এটা করিম্। —কি যে ব্যবস্থা সেটা জানতে ইচ্ছা প্রকাশ ক'রল রামনিবাস। আবার একটু রহস্যময় হাসি ছিটিয়ে দিয়ে রহিম বলল, লাহে লাহে বুঝিব লাগে। —অর্থাৎ ধীরে ধীরে বোঝা যাবে।

বোঝা সত্যিই গেল পরের দিন ভরা দুপুরে। পর পর দুবার রাইফেল ছোঁড়ার আওয়াজ শুনে চমকে উঠল গ্রামসুদ্ধ মানুষ। এত কাছে বন্দুকের গুলি অনেকদিন চলে নি। কারণ ইদানীং মানুষ বেশী জমে যাওয়ায় বন্য প্রাণীরা দূরে পালিয়ে গেছে, কিছু নির্বোধ কেবল হয়ত পিতৃভূমি ছাড়তে চায় নি বলেই প্রাণ দিয়েছে বারুদে। এখন কেবল সন্ধের অন্ধকারে চারিদিক থেকে মনুষ্যসমাজকে উদ্দেশ্য ক'রে অভিশাপ আর গালাগালি দিতে থাকে বাস্তুহারা শিয়ালের দল।

তাদের শব্দ শুনে মনে হয় লোকালয়টিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তারা। দূর থেকে কাছে শব্দ যেন এগিয়ে আসতে থাকে, শুনতে শুনতে একসময় মনে হয় ওরা বুঝি ওদের বেষ্টনী ক্রমাগত কমিয়ে আনছে, ছোট হয়ে আসছে ওদের অবস্থান বৃত্তের পরিধি। তারপর, অনেক পর এক সময় সেই হুক্কাহুয়া যেন ঝিমিয়ে পড়ে, থেমে যায়। আর মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে বৃংহতি আকাশের শূন্যতা ফাটিয়ে বিদ্যুতের মত চমকে চমকে ওঠে বার কয়েক, তাও থেমে যায়। দিনে শুধু মানুষেরই অস্তিত্বের পাওয়া যায় প্রকাশ। তবে কেন দিনের যৌবন বেলায় এমন মারণস্বর? অতি উৎসাহীরা শব্দের উৎস লক্ষ করে পথ ধরে ছুটে গিয়ে পথ হারালো দক্ষিণ দিকের ঢালু অংশে যেখান থেকে গভীর অরণ্য এলাকার আরম্ভ অর্থাৎ মানুষের বন কাটা যেখানটায় পেঁছে আপাততঃ থেমে আছে। তারপর এক কোমর ঘাস পেরিয়ে শুরু ক'রল অরণ্য যাত্রা। ওদের মধ্যে ছিল রিয়াং। অল্পবয়সী ছেলে সে। আপন ভাষায় সংকেত ক'রল উচ্চকিত স্বরে। সেই শব্দ বাতাসের পিঠে চড়ে ঘাস বনের ওপর দিয়ে ভেসে চলল বিশাল বনস্পতির তলা দিয়ে, ওপর দিয়ে, অসংখ্য ডালপালা পাতা লতার ফাঁক ফোকর দিয়ে। অল্প বিরতির পর আর একটি যুবকও অনুরূপ সংকেত করল। এবার নীচের দিকের থেকে গাছপালার জমাট সবুজ ফুটো ক'রে শূন্যে উড়ে এল একই ধরণের শব্দ জমাট সংকেত। সেই সংকেত লক্ষ ক'রে সামান্য বাঁয়ে ঘুরে কিছুটা ফাঁকা সমতল। সেখানে এসে দেখা গেল ফাঁকায়, ছোট ঘাসের বনে পড়ে আছে হলুদের ওপর কালো দাগ টানা মৃত এক অরণ্য সন্তান। বাঘ। একটু দূরেই তার ভুক্তাবশিষ্ঠ নিহত গরু।

সেই মৃত বাঘ আর আধখানা গাভীর মাঝামাঝি পিঠে পুরানো বন্দুক ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাগো। রেঞ্জার রহিম তার রাইফেল বাঁ হাতে ঝুলিয়ে আগন্তুকদের হাত নেড়ে আহবান জানাল। সকলে কাছে পেঁছালে মরা বাঘটাকে একটা লাথি মেরে বলল, এটা নিয়ে চল। —রহিমের চোখে মুখে গর্বিত ঔদাসীন্য। মৃতদেহের কাছে পেঁছে আপন ভাষায় একজন বলে উঠল, এতো মাদী বাঘ। দেখে মনে হচ্ছে বাচ্চা আছে। রেঞ্জার রহিম বলল, কাছেই কোথাও আছে। বাচ্চাগুলোকে ধরব। জাগো আর আমি খুঁজছি, তোমরা এটাকে গ্রামে নিয়ে যাও। উৎসাহী লোকেরা লম্বাজাতের ঘাস তুলে এনে বাঘটার চারটে পা দুজোড়া ক'রে বাঁধল। কয়েকজন মিলে সরু দুটো শালের চারা কেটে আনল। তারপর সেই দুটো নিহত শাল শিশুকে বিদ্ধ বাঘটির বাঁধা পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে কাঁধে ক'রে নিয়ে চলল বাঘটাকে ঝুলিয়ে। চার পা আকাশের দিকে ক'রে বাঁধা বিশাল মাথাটা অসহায় ভাবে ঝুলছে। একটু আগে যে দেহ ছিল অসীম শক্তিতে দুর্মদ সেই দেহ নিমেষে নিথর একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত!

আমি উৎসাহী জনতাকে অনুসরণ ক'রে অনেকটা এসে একটা বড় পাথরের

ওপরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে দেখছিলাম ওদের কাজকর্ম। সেখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলাম জাগো আর রেঞ্জার দুজনে ঘাস বনের মধ্যে হারানো পয়সা খোঁজার মত ক'রে বাঘের বাচ্চা খুঁজে বেড়াতে লাগল। ব্যাপারটা আমার আদৌ মনঃপূত হ'ল না। বাঘ মারার ব্যাপারে সবাই খুব উৎসাহিত এবং উত্তেজিত হ'লেও ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনাটা আমার মনে যেন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার ক'রতে লাগল। আমার বারবার মনে হ'তে লাগল বাঘটিকে মারা অন্যায় হয়েছে। রেঞ্জার রহিমের সঙ্গে আমার কাজের সূত্রে দু চারদিন কথাবার্তা হয়ে থাকলেও আলাপ যাকে বলে তা ছিল না বলে তার সম্বন্ধে আমার কোন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এই বাঘটিকে হত্যার জন্যে আমার তাকে কেবলই ঘৃণা হ'তে লাগল। কি প্রয়োজন ছিল তাকে মারবার? সে এসে গরু ধরে নিয়ে গেছে? সে তো সাধারণ প্রাণী আপন জৈবিক তাড়নায় তার চলাফেরা, প্রাণ ধারণের প্রয়োজনে তার আহার সন্ধান, সেখানে সে বোধশূন্য। আমরা যারা বিচার সম্পন্ন বলে নিজেদের মনে করি তারাই কি আগে থেকে অন্যায় করি নি অন্য প্রাণীর ভূমি গ্রাস করে? যে অরণ্যে তার বাস সেই অরণ্যের উৎসাদন ক'রে আমরা কি করিনি অপরাধ? তবে সেই অবুঝ আরণ্যক প্রাণী কি দোষ ক'রেছে তারই এলাকা থেকে আপন প্রাণ ধারণের জন্যে একটা গাভী বধ ক'রে? আসলে যারা অসহায়, প্রতিবাদে অসমর্থ তারাই নির্বিচারে হয় নিহত, শোষিত, বঞ্চিত এবং অথবা উৎপীড়িত। বাঘটির শিশু-শাবক আছে বলে যখন এরা অনুমান ক'রছে তখন তা নিশ্চয়ই আছে কারণ বন সম্পর্কে এরা বিশেষ ওয়াকিবহাল। তাহ'লে কি হবে সেই অসহায় শিশুগুলোর? তারা নিশ্চয়ই মাকে খোঁজাখুঁজি ক'রতে ক'রতে অনাহারে নয়ত কোন রকম অপঘাতে হবে অকালমৃত! আমি সেই পাথরের টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সম্মুখের আদিগন্ত সবুজ বনভূমির মধ্যে অসহায় কটি বাঘশিশুর মুখচ্ছবি যেন প্রত্যক্ষ করতে পারছিলাম। আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছিল উজ্জ্বল ক'টি বড় বড় চোখ, তাতে অপরিসীম অসহায়তা। কি এক বেগবান আবেগে যেন সেই চোখগুলো বোঝাতে চাইছে তাদের অসীম বেদনা।

মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল বলেই নিজেকে মুক্ত ক'রতে নড়ে চড়ে উঠলাম। আমার খুব কাছাকাছি বড় পাথরটার নিচ দিয়েই বাঘটাকে বয়ে নিয়ে চলে গেল গ্রামবাসীরা, আমি ধীরে ধীরে নেমে এলাম। নিজের পা দুটো বেশ ভারী লাগল। এদের পেছনে এখানে না এলেই হ'ত। এলাম বলেই না এই দৃশ্য দেখতে হ'ল! নইলে এই বিশাল বিশ্বজুড়ে নিয়ত কত হত্যা কত বিনাশ চলছে, দেখছি না বলে ব্যথাও বোধ করছি না। স্থির ক'রলাম নিজের ঘরে ফিরে যাব।

সেই মত পথ ধরলাম। ধীরে ধীরে চলছিলাম যাতে মৃতদেহবাহীরা এগিয়ে যেতে পারে, আমার সঙ্গে তাদের দূরত্ব ক্রমাগত বেড়ে যায়। অল্পদূরে এসে একজন

মুখচেনা লোক উৎসাহিত স্বরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বলল, বাঘ নিয়ে সবাই বনদপ্তরে গেল।

যাক—যেন বিরক্ত হয়েই মনে মনে উচ্চারণ ক'রলাম আমি। তাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আপন লক্ষ্যে চলতে লাগলাম। যে যা করে করুক, যেখানে যায় যাক, একটা অসহায় প্রাণীকে মেরে যদি আনন্দ হয় তার ভাগীদার আমি হ'তে পারিনা। যার জন্যে কারও কোন সহানুভূতি হবে না, সমবেদনা হবে না, তার মৃত্যুর জন্যে আমার বেদনা নিয়ে আমি নিভৃতে চলে যেতে চাইলাম। কিছুদূর যেতেই রামনিবাসের সঙ্গে দেখা। সে বনবিভাগের বাংলোর দিকে যাচ্ছে—খবর পেয়েছে বাঘটাকে মারা হয়েছে। সেখানেই আনা হচ্ছে।

আমাকে প্রশ্ন ক'রল, কত বড় বাঘ?

যান, এতক্ষণ এনেছে—জবাব দিলাম।

রামনিবাস গেল। আমি বাড়ীর প্রায় কাছেই পেঁছৈছিলাম, সামনে পেঁছেই দেখলাম রামনিবাসের গৃহিণী জানলার গরাদ ধরে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সামনে এসে পড়া মাত্রই সরে গেল। অথচ একে যে দিনরাত খুঁজছি! স্বপ্নে এবং জাগরণে যাকে সর্বদা খুঁজছি তাকে সামনা সামনি দেখামাত্র শরীরের রক্ত যেন ছলাৎ ক'রে উঠল। কিন্তু ও কি আমাকে দেখতে পেল না? তা কি ক'রে সম্ভব? রোদের আলোর এত তেজ, দিনের এখনও যৌবন তবু কি সে দেখতে পাবে না আমাকে? কি ভাবে তা হয়? আর যদিই দেখেই থাকে তবে কেনই বা এমন ভাবে চলে গেল! আমাকে দেখে চলে গেল বলে বিশ্বাস হল না বলেই সদর দিয়ে ঢুকে সোজা না গিয়ে বাঁ দিকে গেলাম রামনিবাসের বাড়ী। প্রথমের ঘরটি গদি। তারপরের দুটো ঘরে ওরা খায় ঘুমোয়। তিনটে ঘরের পাশ দিয়ে টানা বারান্দা চলে গেছে রান্না ঘর পর্যন্ত। আমি বারান্দাতেই তাকে দেখতে পেলাম। সে যেন ভাবলেশহীন চোখে আমাকে দেখল। উপরন্তু তার দৃষ্টিতে অপরিচয়ের অস্বাভাবিকতা। আমি অবাক হলাম। এ কি?

হঠাৎ—! আমার বিস্ময়ের প্রথম আঘাত মিলিয়ে যাবার আগেই সে আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পেছন ফিরল। আমি তাকে কিছু একটা বলব ঠিক সেই মুহূর্তে আমার দিকে ফিরে সে বলল, বাবুজী একটু বাইরে গেছে আপনি যদি কোন দরকার থাকে তবে ঘুরে আসতে পারেন।

আমাকে হতভম্ব ক'রল তার ব্যবহার। আমি ভাবতে চেষ্টা ক'রলাম নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে ওর এই ব্যবহারের, কোন আত্মীয় স্বজন এসেছে ঘরে আছে, নয়ত এমন কিছু ঘটেছে যার জন্যে এমন অস্বাভাবিক ব্যবহার ক'রছে। চাকরটা বা বাহাদুর—কেউ কি ব্যাপারটা জেনে গেছে? জানিয়ে দিয়েছে রামনিবাসকে? কই রামনিবাস তো তেমন ব্যবহার ক'রল না। সে তো বেশ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলল! তবে? তবে কি চাকরটাই জেনে গিয়ে সুবিধা আদায়ের জন্যে

চাপ দিচ্ছে ? না কি দারোয়ানটা ? কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। তার শেষ কথাগুলো যেন নির্দেশের মত শোনাল অথচ দুটো রাত্রির ব্যবধানে কি এমন ঘটল ? সামান্য কয়েক মুহূর্তের চিন্তার পরই দেখলাম আমি একা। ও রান্না ঘরের দিকে চলে গেছে।

ফিরে এলাম। নিজের ঘরে শুয়ে ওর এই ভাবান্তরের কারণ অনুসন্ধানের ভাবনায় পড়লাম। ও কি তবে আমায় ওপর অভিমান ক'রে রকম ক'রছে ? কি জন্যে অভিমান ? কি করিনি আমি, কি সে চেয়েছিল বরং আমি তো সমস্ত সত্য মিথ্যা কর্তব্য অকর্তব্য বিস্মৃত হয়ে ওর প্রতি উপগত হয়েছি। ও যা করিয়েছে আমি তাই ক'রেছি সম্পূর্ণ ওর ক্রীড়নক হয়ে। তবে কেন এই অভিমান ? আমার তো আর কিছু দেবার মত ছিল না। এমন ব্যবহার তো আমি করিনি যা ওকে অভিমানী—ক'রতে পারে। আজকে এমন ব্যবহার ক'রল যেন আমি ওর অপরিচিত। আমার সঙ্গে জীবনে কোনদিন বাক্যালাপ হয়নি ওর। অথচ একটি দিনের নিবিড় আসঙ্গের পর আমি তো ওকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। নিজের মনের সঙ্গে মিথ্যাচার না ক'রলে একথা স্বীকার করতেই হবে আমি ওর সঙ্গ পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি। আমার সমস্ত শরীর ওর আকাংখায় উদগ্রীন হয়ে আছে। আমার দেহের যন্ত্রে এমন এক সুর তুলেছে ওর সঙ্গ যা আমার অশ্রুতপূর্ব—যা আমি চিনিনি, জানিনি, যা আমি অনুভব করিনি। সে এক মাদকতা। এই মাদকতা আমাকে ভুলিয়ে রাখছে সর্বক্ষণ। আমাকে নেশায় ক'রে রাখছে আচ্ছন্ন।

তবু আমি তার মনের হদিশ পেলাম না। সেদিন তো নয়ই পরদিন নয়, তার পরদিন নয়, অপেক্ষা ক'রে থেকে তার পরের দিনও নয়। এই ক'দিনের মধ্যে তার যে দেখা পেলাম না এমন নয় বা দেখা হ'লে যে সে লজ্জিত হচ্ছিল এমনও নয়, তার চাউনিতে স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল অপরিচয়। আমাকে তার এই অস্বীকারের কারণ কি হ'তে পারে ? প্রথম দিন যা আমি অভিমান মনে ক'রতে চেয়েছিলাম আজ তো স্পষ্ট যে তা অভিমান নয়। যদি বিরূপতা হয় তবে কি তার কারণ ? ছলনা ক'রে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া, সেই প্রচণ্ড আবেগ— সব কি ক'রে মিথ্যে ভাবি ? সমস্ত ঘটনা ছবির মত মনে পড়ছে—কি ক'রে সেসব অস্বীকার ক'রছে সে ? তবে কেন বিরূপতা হবে আমার প্রতি, কেন ? তার মাখনের মত কোমল শরীরে মন কি ক'রে এমন কঠোর হবে ? সমস্ত ব্যাপারটাই এমন জটিল আর রহস্যময় হয়ে উঠল যে আমি তার অন্ধিসন্ধি খুঁজে পেলাম না। তার সঙ্গে একবার মুখোমুখি হবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। একটিবার তাকে শুধু একটি প্রশ্ন ক'রতে হবে, জেনে নিতে হবে তার এই ভাবান্তরের কারণ। তার মাখনের মত শরীরে হাত দেবার অবকাশ আর না

হোক তার মনের বিরূপতা থেকে উত্তীর্ণ হ'তে না পারলে যেন এই অকারণ অস্বস্তি কিছুতেই কাটছে না আমার।

অথচ কেন?—নিজেই একসময় ভাবলাম, ওর সঙ্গে কি সম্পর্ক আমার? এই চলার পথে কত তো সংযোগ হ'ল কি তার মূল্য? কতটুকু তার অবদান। একদিন মনে হ'ত অলকনন্দাকে ছাড়া সব অচল কিন্তু সবই তো চলছে। আমি চলছি, আমার চারপাশে সব কিছু চলছে, চলছে আমার চোখের বাইরে গোটা বিশ্ব। কাজেই কেন এই মোহ? যা একেবারেই অর্থহীন কেনই বা সেই আকর্ষণ? শরীর তো প্রাণীমাত্রেরই ধর্ম। শরীরের আকর্ষণে মত্ত হওয়া তো সেই কীট-পতঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়া। আমিও যখন সেই জৈব চাহিদার ওপরে উঠতে পারিনা, আমাকে যখন নিয়ন্ত্রণ করে সেই আদিম আসক্তি তখন আমি? আমিও তো সেই কীটমাত্র যাকে আমি সেই এক বিকালে ইডেন উদ্যানে জলের ধারে দেখেছিলাম মৈথুন রত। তবে কি ও আমাকে অতিক্রম ক'রে গেল? আমি পারলাম না? ও কত স্বাভাবিকভাবে সেই সুখস্মৃতি বিস্মৃত হ'ল। ও অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'ল দেহের উত্তেজনা? আমি কি হেরে যাচ্ছি? নিজের কাছে? ওর কাছে? আমার কি তবে কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই?

পরে এক সময় অনুভব ক'রলাম নেই। আমার মন নিয়ন্ত্রণহীন। কিছুতেই তাকে আমি মোহমুক্ত করতে পারছি না। আমি হেরেই গেলাম। কিন্তু মাথা নিচু ক'রে সেই পরাজয় স্বীকার ক'রে নেবার আগে শেষ চেষ্টা হিসেবেই উঠে দাঁড়ালাম। সামান্য যা টাকা পয়সা ছিল শুধুমাত্র সেইটুকুকেই বাঁধলাম আমার গামছায়। কোনদিকে? জানি না। এখানে প্রতিমুহূর্তের পরাজয় এড়িয়ে অন্য কোন—সে যে কোন হোক একটা দিকে আমার যাত্রা সুরু ক'রতে হবে। এখনই। এই মুহূর্তেই। নইলে বুঝি লগ্ন বয়ে যাবে। যাত্রাভঙ্গ হবে, আর যাওয়া হবে না; এই পরাজয়ের মধ্যে, গ্লানির মধ্যে, অন্তহীন হতশার মধ্যে, হাহুতাশের মধ্যে, আমাকে এক এমন বাল্মীক রচনা করে বাস ক'রতে হবে যার মধ্যে থেকে আমি হয়ত আর কোনদিনই বের হতে পারব না।

ওপর থেকে নেমে এসে সদর পেরোবার সময় কেউ পেছন থেকে টানল। সে আমার মন। আমি তাকে কি তবে ছেড়ে যাচ্ছি? থামলাম। না। এবার অন্যভাবে। ওকে হারিয়ে দিতে হবে, হারাতেই হবে। যে কোন মূল্যে এ বিজয় অর্জন ক'রতে হবে আমাকে। লজ্জা নয়, সম্ভ্রম নয়, লোকভয় নয়—সব মুছে আমি সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম ওর সামনে। বললাম, আমি আজ চলে যাচ্ছি। সত্যিই একদিন ডাক্তারী পড়েছিলাম। শেষ বছর পর্যন্ত পড়েছিলাম। শেষ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি বলে কিছু শিখিনি এমন নয়। —আমার কথা শেষ হবার আগেই গদি ঘর থেকে হুড়তে পড়তে এসে হাজির হ'ল রামনিবাস। আমাকে

দ্রুতবেগে সে আসতে দেখেছিল। অসন্তুষ্ট স্বরে জানতে চাইল, কি ব্যাপার ?

বললাম, চলে যাচ্ছি। আপনারা আমাকে অনেক ক'দিন যত্ন করে খাইয়েছেন তাই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলাম। আর জানিয়ে গেলাম, চিকিৎসা আমি জানি। ডাক্তারী পড়া শেষ করেই আমি একদিন কলকাতা ছেড়েছি।

রামনিবাস প্রথমে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপরই প্রশ্ন করল, কেন ? কোথায় যাবেন ?

এখানে আসবার আগে তো জানতাম না এখানেই আসব। —জবাব শেষ ক'রেই পেছন ফিরলাম। আর কথা বলার সময় দেওয়া যায় না ওকে। যেতে হবে।

বাইরে সুবিশাল মহীরুহেরা এখনও আকাশ ছুঁয়ে আছে তারা যেন আমারই জন্যে অপেক্ষমান। আরও কিছু কথা মহিলাকে বলতে পারলে ভাল হ'ত। সে সুযোগ হ'ল না। কি কথা যে বলতাম তাও জানা নেই, তবু সময় পেলে যা হয় কিছু বলতাম। থাক। যা বলা হ'ল না তা না বলাই থাক। জীবনে কথার কখনও শেষ হয় না। কথা আচমকা থামলেই থামে নইলে নয়। ভালই হ'ল। আবার পথে নেমে পড়লাম।

এখানে আকাশ মহান, বাতাস মনোহর, সূর্য এখানে অকৃপণ ঔদার্যে পরম করুণাময়। চারিদিকে মহীরুহেরা স্বাধীন, অসীম আকাশ জুড়ে তাদের ব্যাপ্তি অবারিত। সৌন্দর্যের সীমারেখা ছাড়িয়ে নিবিড় তাদের অবস্থান। সে অবস্থিতি অসীমের প্রতিচ্ছায়ে নীলিম ; শ্যামল সে ততটুকুই যতটুকু তার সবুজ। চারিদিকে ঘন সবুজের এমন সীমাহীন সমারোহ যে দেখতে দেখতে পৃথিবীর রঙ বদলে যায়। নগরবাসী জীবনে আমরা যে পৃথিবীকে চিনেছি সে পৃথিবীর কারিকর মানুষ। আমরা তাকে গড়ে তুলেছি আমাদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহারের মত ক'রে। কিন্তু এখানে প্রকৃতির কারিগরি স্বগর্ভা ভূমিকে ক'রে রেখেছে সবুজে সমাচ্ছন্ন। নিজের চারিদিকে এই যে গভীর সবুজের অবস্থিতি এর মধ্যে থাকা যেন ডুবে থাকা। সমুদ্রের গভীরে ডুবে থাকলে যেমন নিবিড় নীলিমায় আপ্লুত হয় সমস্ত অস্তিত্ব, এও তেমনি সবুজের সমারোহে ডুবে থাকি। নেই সবুজের মধ্যে দিয়েই পথ। পথ মানে পায়ে চলার দাগ, পদ রেখা। মানুষ সহজ দূরত্বটুকু বেছে নিয়ে একদিন সুরু করে তারপর সবাই সেইখানেই পদক্ষেপ ক'রতে থাকে। এই ক্রমাগত পদক্ষেপে সেখানকার ছোট ছোট উদ্ভিদ আর ঘাসগুলো আহত হয়। ক্রমাগত ঘষর্ণে ধর্ষণে হয় নিহত। মাটি জেগে ওঠে— সেই আমাদের পথরেখা। পরীক্ষিত ভাবে সংক্ষিপ্ত দূরত্বে সেই আমাদের গন্তব্য নিয়ে চলে। তেমনি ভাবেই সুরু ক'রলাম। জনপদটুকু শেষ হ'তেই সে-ই পথরেখার

সুরু হ'ল। জানতাম এইদিকে একটা বস্তি আছে কিন্তু সেটা যে কতদূরে জানিনা। এই দিক থেকেই হাটের দিন লোকেরা কাঁধের বাঁকে বয়ে আনে তাদের জুম ক্ষেতের ফসল। অনেকে পাখির পালক আনে, হরিণ মেরেও নিয়ে আসে কেউ, কখনো বুনো মুরগীও কোন কোন হাটে এসে পড়ে দৈবাৎ। সামান্যই জিনিষ আনে তারা কারণ বিনিময়ে সামান্য বস্তুরই তাদের প্রয়োজন—লবণ। আর আমি দেখেছি সামান্য একটু লবণ দিয়ে তার শতগুণ দামের জিনিষ বিনিময় করে হাটুরেরা। বেশীর ভাগ লবণই আমদানী করে গঞ্জের কয়েকজন ব্যাপারীতে মিলে। সেই লবণ দিয়ে দেয় এখানকারই আর একদল ছোট ব্যাপারীকে যার মধ্যে আছে রামলগন, সীতাপ্রসাদ, অযোধ্যা এমনি আরও অনেকে যারা আমারও আগে একদিন মুঙ্গের, ভাগলপুর, আরা, ছাপড়া থেকে পয়সার লালসায় ছুটে এসেছে এই ঘোর অরণ্যে, এসেছে হরিনন্দন হবার আশায়। লবণ ছাড়াও ইদানীং সুতোর চাহিদা বেড়েছে। হাটের শেষে এদিকেই একদল মানুষকে ফিরতে দেখেছি অতএব কোথাও তাদের বসতি আছে। হাটে তাদের দেখেছি বটে, আকারণেই দর ক'রেছি জিনিষের কিন্তু তার বেশী আলাপ পরিচয় কাবও সঙ্গে হয়নি। বেঁটে খাটো শক্ত মানুষগুলোর মধ্যে ব্যাপারীসুলভ যোগ্যতা বিন্দুমাত্র দেখিনি। শুধুই প্রয়োজনের কারণে ওদের আসা, প্রযোজনীয় জিনিষটুকু পেলেই চলে যাওযা। যেদিন প্রয়োজনের বেশি কিছু পয়সা জুটে যায় যেদিন শুঁতির মালা কিংবা গালার বালার মত ঠুনকো অপ্রয়োজনীয় জিনিষের হয়ে পড়ে একান্তই প্রয়োজন। ওদের কোন সওদার দাম জিজ্ঞেস ক'রলে বেশীর ভাগই বলে, কত দেবে? কত নিতে হবে তা ওরা জানে না। কাজেই আমি সেই সরলতার উৎসের সান্নিধ্যে যেতে চাইলাম তাদেরই পদচিহ্ন ধরে। কোথায় কতদূরে যে যেতে হবে জানিনা, জানতে চাইনি কারণ দেরীর চেয়ে দ্রুততা আমার কাছে প্রেয় নয়। দ্রুততায় কিংবা প্রয়োজন? জীবনও তো একটা পথ চলা। বরং বলা যেতে পারে আসল চলা এই জীবনটাই, পায়ে হেঁটে চলা সেই আসল চলার একটা অংশ মাত্র, হয়ত তাও নয় নেহাৎ সময় কাটানো। কারণ পথ চলতে গিয়ে পা ফেলে ফেলে আমরা আসলে কোথাও পেঁছাই না বরং পেঁছাই জীবনেব শেষে, অন্য দেশে অন্যকোন দেশে। হদিশবিহীন হলেও নিশ্চয়ই সে কোন দেশ নইলে এখান থেকে উধাও হয়ে যাই কোথায়?

কাজেই জীবনটা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ পা-কে চলতেও হবে। তাই চলতে লাগলাম। জনপদের পরেই মাঠ, ক্ষেত, তারপরই সুরু হ'ল বন। সবুজ গাছ গাছালির বন। বিশাল বহেড়া, শাল, জাম, হরিতকী, গোকুল, শিমুল আরও কত রকমের অজস্র গাছ, তলায় তলায় ছোট ছোট গাছ নানা জাতের এবং অজাতেরও। কোন কোন গাছের গায়ে প্রীতির বন্ধনে জড়ানো লতা, কোথাও কোথাও লতা ঝুলছে ডালে। অচিরেই বুঝলাম পদচিহ্ন অনির্ভরযোগ্য। কারণ

মাঠের ওপর ঘাস ক্ষয়ে ক্ষয়ে যে সাদা পথরেখা ক্রমাগত পথ চলায় প্রকট হয়ে থাকে এখানে তা নেই। এই বিজন অরণ্যে পদচিহ্নের স্মৃতি রাখে না স্বাধীন ভূমি। ক'জনই বা আসে এ পথে? ক'দিনই বা আসে? মাসে একবার হয়ত এল দশজন, তাতে কি পদচিহ্ন হয়? সামান্য একটু আভাস মিলছিল তাও ঘুলিয়ে গেল। এটা সমতল ভূমি। এখানে অরণ্য প্রতি পদক্ষেপেই প্রাচীর গড়ে রাখে চোখের সম্মুখে। সামনে পেছনে, বাঁয়ে ডানে কোথাও দেখা যায় না কিছু। একার নিঃসঙ্গতায় বড়ই অসহায় মনে হতে লাগে নিজেকে। অসহায়তা থেকে উৎপন্ন হয় ভয়। এই ভয় আমাকে গ্রাস ক'রতে চাইল আকাশের আলো কমে যাচ্ছিল বলে। অথচ এখনো বেলার অনেকটাই অবশিষ্ঠ আছে। সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে একটু বেশী ঝুঁকে পড়লেই গাছেরা মাথা দিয়ে আলো আটকায়, চট করেই নেমে আসে অন্ধকার। দিনে রাত্রে অরণ্যে তাই আলোর চেয়ে আঁধার অধিক।

অন্ধকারে স্বাপদেরা অবাধে বিচরণ করে। তখন তারা দ্বিধাহীন নিঃশঙ্ক। সূর্যের অপরিমিত জ্যোতির প্রকাশে আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি বন্য প্রাণীরা থাকে ভীত। কেউ নেই কিছু নেই তবু ভয়, সামান্য শব্দেই ভয়, মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতাতেও দেখেছি তাদের চকিত প্রেক্ষণ। শুধু যে দুর্বল প্রাণীরাই ভয় পায় তা নয় ভয়, পায় হিংস্র সবল প্রাণীরাও। রাত্রে কোন বন্য প্রাণীকে ভয় পেতে দেখি নি আমি, ও শুনেছি রাতে কোন প্রাণীই বিশেষ ভয় পায় না, এমন কি দুর্বলতর প্রাণীরাও নয়। যারা শিকার ক'রতে যায় তাদের কাছেও শোনা।

কাজেই সেই শ্বাপদসঞ্চারী অন্ধকার নেমে আসবার আগেই আমার আশ্রয় চাই। তাই চারদিকে চেয়ে আশ্রয়ের সন্ধান ক'রতে লাগলাম। এই অরণ্যে আশ্রয় বলতে কি থাকবে? কিছু যে থাকবে না সে তো আমিও জানি তবু এই প্রাণটা বিসর্জনের বাসনা যখন নেই তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই আশ্রয় একটা পেতে হবে, যেমনই সে আশ্রয় হোক চোখে যেন সকালের রোদ পাই। আর কিছুটা চলতেই পাওয়া গেল এক বিশাল শিরিশ। ভাল ভাবে লক্ষ ক'রে দেখলাম কোন বড় দরের জন্তু। অনেক সময় চিতা গাছের ওপর উঠে বসে থাকে। কিন্তু ডালে বসে আসে কিনা এত মোটা তার ডালগুলো যে ওপর শুয়ে থাকলে নিচে থেকে দেখতে পাবার কোন উপায় নেই। যদি কোন সাপের বাসা থাকে তাহলে তো ওপরে উঠেও দেখা যাবে না। ময়ালরা অবশ্য গাছের ওপরে বিশেষ থাকে না এই একটা ভরসা, তবে শুয়ে তো থাকে। পাখি ধরতে অনেকসময়েই গাছে উঠে বসে থাকে সাপেরা—তেমন যে নেই তার ঠিক কি। কিন্তু কি উপায়? এখন তো আর ফিরে যাবারও সময় নেই। তাছাড়া চলতে যখন হবে সামনে তখন ফিরে যাব কেন? যা হয় হোক রাতের আশ্রয় এই গাছেই নেব। পকেটে হাত দিয়ে দেখে

নিলাম ছুরিটা আছে। ও-ই আমায় ভরসা জোগাল। আক্রমণ এলে আত্মরক্ষার কাজে যা হোক ছুরিটাই হতে পারবে অবলম্বন। বানরদের থাকার সম্ভাবনা তো আছেই কিন্তু রাতে তাদের ভয় নেই। সন্ধের পর ওরা নড়াচড়া করে না। কাজেই বানরের আক্রমণ এড়ানোর জন্যে চিন্তা নেই, চিন্তা প্রধানত সাপকে আর চিতাবাঘ শ্রেণীর কোন প্রাণীকে যারা স্বাভাবিক ভাবে হিংস্র। ওদের জন্যেই ভয়। কিন্তু ব্যাপকতর ভয়ের ভাবনার চেয়ে কম সম্ভবনাটাই গ্রহণ যোগ্য বলে ঠিক করতে লাগলাম কোন দিক দিয়ে উঠব গাছটায় এবং কোন ডালটায় বসব। রাতটা ডালে বসেই কাটাতে হবে যতক্ষণ ভোর না হয়। উত্তর প্রদোষের অন্ধকার ঘনীভূত হবার আগেই আমাকে স্থান নির্বাচনটাও সেরে নিতে হবে।

চেষ্টা ক'রে দেখলাম এমন বিশাল কাণ্ড বয়ে ওঠা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। বেশ কয়েকবার প্রদক্ষিণ ক'রে ফেললাম গাছটিকে। নাঃ কোনদিক দিয়েই হচ্ছে না। অথচ আকাশের আলো খুব দ্রুত অপসারিত হচ্ছে। প্রায় তিন মানুষ খাড়া উঠতে পারলে তবে ধরবার মত ডাল পাওয়া যাবে। আশ্রয় হিসেবে অতি সুন্দর আর নির্ভরযোগ্য হলেও আশ্রয় পাওয়া সম্ভব হবে কিনা সেটাই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। চারপাশে চেয়ে দেখলাম সংলগ্ন এমন কোন গাছ নেই যাতে চড়ে এটির ডালে এসে নামা যায়। এখন এই গাছ ছেড়ে আবার কোথায় যাই যেখানে এমন আশ্রয়স্থল পাওয়া সম্ভব? মানুষের জীবনে সমস্যাগুলো কিছুতেই যেন কাছ ছাড়তে চায় না! অথচ আমি সমস্যাশংকুল জীবন ছেড়ে এই বিজনে চলে এসেছি নীরবতায়! সামান্য সমস্যার সূত্রপাত হলেই চলে যেতে চাইছি এমন জীবনের সন্ধানে যেখানে মানুষের তৈরী করা সমস্যার বিশালতা আমাকে গ্রাস ক'রবে না। আমি আর দশটা প্রাণীর মত প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস ক'রব স্বাভাবিক নিত্যতায়। এই যে অসংখ্য পোকা মাকড়, জন্তু জানোয়ার আছে আমি তো জেনেছি মৌলিক কাঠামোয় আমি তার থেকে পৃথক কিছু নই। তবে সেই রকম অনায়াস জীবনে আমার কেন অসুবিধা? অভ্যাস? অনভ্যাসের অস্বস্তি? এই এখানেই তফাৎ। এখানেই মানুষ আর অন্য অন্য প্রাণীতে প্রভেদ। আমি যেন পরিত্রাণ পেলাম। পরমুহূর্তে'ই মনে হ'ল অনেক প্রাণীই তো চলে আপন অভ্যাসে। হাতি কি গাছে উঠতে পারে, পাখী কি ঘুমোয় নদীর জলে ডুব দিয়ে? প্রাণী মাত্রকেই নিয়ন্ত্রণ করে তার জীবন যাপনের অভ্যাস। না আমাকে এই দাসত্ব অতিক্রম ক'রতেই হবে—অকস্মাৎ জেদ চেপে গেল। মাথায় কৌশল এল। ছুরিটা খুলে নিলাম হাতে। অল্প একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল সেই লতা। মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে একটা ডাল থেকে ঝুলছে। আস্তে আস্তে সমস্ত লতাটাকে খুলে ফেললাম টেনে ছিঁড়ে নামাতে চেষ্টা করে না পেরে দু মাথা কেটে তাকে বাগে আনতেই আমার বেলা বয়ে গেল। সেই লতা ছুঁড়ে আটকালাম সবচেয়ে নীচের ডালটায়। তারপর হাতের ছুরি

দিয়ে গাছের এক পাশে ছাল কেটে কেটে ছোট ছোট গর্ত ক'রলাম যতটা উঁচু পর্যন্ত পারা যায়। কাঁধের ঝোলাটা লতার প্রান্তে বেঁধে রেখে ঝুলন্ত লতা ধরে ওই কাটা গর্তে পা দিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম অনেকটা। কিন্তু প্রায় দু মানুষ উঠে আর পারলাম না। গাছের গায়ে পা পিছলে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে দেখলাম লতা ধরে ঝুলে থাকাও আর সম্ভব হচ্ছে না। হাতের পেশী ব্যথা হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই পড়ে যাব বলে মনে হ'ল। অথচ পড়লে কিছুতেই চলবে না। হঠাৎ আবার বুদ্ধি জোগাল মাথায়। ঝুলন্ত অবস্থাতেই পায়ে পায়ে ঘষে জুতো খুলে ফেললাম। দুই পায়েরই আঙ্গুলের ফাঁকে চেপে ধরলাম লতার জোড়া। একটু একটু করে উঠতে লাগলাম।

ওপরটায় যখন উঠলাম মনে হ'ল আমার হাতদুটো আর নেই। এমন যন্ত্রণা হচ্ছে যে মনে হ'ল হাত দুটো বুঝি খসেই গেছে বাহুমূল থেকে। শরীরও বেশ অবশ হয়ে পড়েছে। আমি কোনকিছু না দেখেই চওড়া ডালটার উৎসমূলে বসে পড়লাম। মনে হচ্ছিল শুতে পারলে ভাল হয়। শরীরের বৈকল্যে মনেরও এমন জোর ছিল না যে ঝোলাটা টেনে ওপরে তুলি

আমার হতচেতন ভাবটা কেটে গেল তীব্র এক যন্ত্রণার স্পর্শে। কিসে যেন কামড়ে ধরেছে আমার ঘাড়ে অথবা হুল ফুটিয়েছে কোন পতঙ্গ। চোখ মেললাম অন্ধকার। আলো নেই। সূর্য নেই। ডান হাতটিও আপনা থেকেই পেঁছে গিয়েছিল আঘাতের স্থানে। কি একটা আটকে ছিল টিপে ধরে টেনে তুললাম। মনে হ'ল বড় জাতের কোন পিঁপড়ে। অন্ধকারে সেটাকে দেখতে পেলাম না, দু আঙ্গুলে টিপে পিষে ফেললাম কিন্তু জ্বলুনি তাতে তো থামল না বরং সেই জ্বালা সারা দেহে বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত অনুভূতির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রল। সেই অনুভূতি ক্রমাগত যেন বেড়ে চলতে লাগল। প্রতিকার কিছু ছিল না শুধু সাবধান থাকতে চেষ্টা ক'রলাম পাছে আবার কামড়ায়। কিন্তু কি ভাবেই বা সাবধান হওয়া সম্ভব? অন্ধকারে ওগুলোকে দেখতেই পাচ্ছি না সাবধান কি হবো? আলো থাকতে থাকতে একটা অপেক্ষাকৃত বড় ডালে বসলে ভাল ছিল। অবসন্ন হয়ে কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নইলে অকস্মাৎ অন্ধকার হয়ে গেল কি ক'রে? আমি যখন উঠে এসেছি ক্ষীণ আলো তখনও ছিল। দু পাশে হাত দিয়ে বুঝে নিলাম রাত্রে ঘুমানো এখানে একেবারেই অসম্ভব, কোনক্রমে বসে রাত কাটাতে হবে। ঝিমুনি এলেও বিপদ। একেবারে নিচে পড়ে যেতে হবে। আর পতন মানেই—মৃত্যু না হলেও এমনই আঘাতই পেতে হবে হবে যে তার থেকে মৃত্যু ভাল। এতবড় একটা রাত চোখ মেলে বসে থাকাও তো সহজ সম্ভব নয়। কিন্তু কি উপায়? নিচে আমার ঝুলিতে কিছুটা ছোলার ছাতু আছে। এক দুদিন চলবে। থাক। ঝোলাটা আর তুলে কাজ নেই—ভাবলাম—বরং ক্ষিধে থাকলে ঘুম আসবে

চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁর শব্দ শিয়ালের ডাক। হঠাৎ কি একটা পাখি চেঁচিয়ে উঠল। ভয় পেয়ে থাকতে পারে। বড় ধরণের একটা পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে-ও গেল আমার গাছটার ওপর দিকের কোন ডাল থেকে। হঠাৎ সব চুপচাপ। শিয়ালের ডাক যেন অকস্মাৎ থেমে গেল। শুধু ঝিঁঝির শব্দ। অবিরাম। নিথর নিস্পন্দ মহীরুহেরা। একটি পাতাও নড়ছে না। সমস্ত অরণ্য যেন কিসের সংকেতের প্রতীক্ষা করছে। ঝিঁঝির একঘেয়ে সুর অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়ায় শব্দহীন বর্ণহীন গন্ধহীন এক আশ্চর্য অনভূতি আমাকে নতুন অভিজ্ঞতা দিল। অরণ্যে অনেক দিন ধরেই আছি কিন্তু আজ অন্য রাত্রির থেকে পৃথক মনে হল। অরণ্যে রাত্রির নিঃশব্দতা আরও বহু প্রত্যক্ষ করেছি তবু যেন আজ অন্যরকম মনে হচ্ছে। অরণ্যকে অপরিচয়ের আতংক আর নেই কাজেই ভয়ের জন্যে যে অন্যরকম লাগছে তা নয় বরং রাত্রির এই বিশেষ রূপ আজ উপভোগ ক'রছি। একটু বাদেই আকাশের একপাশে সরু একফালি চাঁদ উঠল। তাতে আলো হ'ল না শোভা হ'ল। আমি সেই চাঁদের দিকে চেয়ে কাল কাটাবার অবকাশ পেলাম। এক ভাবে চেয়ে থাকতে মনে হ'চ্ছে চাঁদটা যেন চলছে, সরে যাচ্ছে। একবার চোখ বন্ধ করতেই সেই ভাব কেটে গেল।

হঠাৎ আমার নিচেটায় একটু খসখস শব্দ হতেই সামান্য ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা ক'রলাম। এমন জমাট অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তবু শব্দটা আসছে বলেই আমি অসম্ভব হ'লেও দৃষ্টি সরালাম না। সেই নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যেও একসময় মনে হল কালো কি একটা ছোট মাপের জন্তু নড়াচড়া ক'রছে। প্রথমত অন্ধকারের জন্যে আর ওপরে এতটা দূর থেকে বলেই আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছিলাম না ওটা কি। একটা জায়গাতেই ওটা ঘোরাঘুরি ক'রছে কি যেন এক ব্যস্ততায় এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। হঠাৎ আমার মাথায় আমার কাঁধ ঝোলাটাতো নিচে! ওটারই নতুনত্ব নিয়ে আবার মাথা ঘামাচ্ছে না তো জন্তুটা! তেমন যদি হয় কোন গাছে উঠতে পারা প্রাণী! নিমেষে সিদ্ধান্ত করলাম হোক। আমি তো ওপরে আছি সঙ্গী আছে আমার ছুরিখানা। টেনে তুলে ফেলি ঝোলাটা। নইলে হয়ত ছিঁড়ে দেবে। লতার প্রান্তে তো ওটা বাঁধাই রয়েছে। টানতে গিয়ে মনে হ'ল আমার ঝোলাটায় কেউ কিছু ভরেছে। অর্থাৎ নিচের ওই ব্যক্তি পরীক্ষা ক'রছে; ধরে আছে। দু একটা ছোট ঝাঁকানি দিতে হালকা হয়ে গেল। আসল বস্তুটা আবার রয়ে গেল না তো নিচে? যিনি নতুন জিনিষ পেয়ে পরীক্ষা করছিলেন তাঁরই দখলে হয়ত রয়ে গেল ঝোলাটা—। এমন সম্ভবনা মনে এলেও টেনে তুললাম। না ঝোলা আছে। তবে তার একটা জায়গা ভিজে ঠেকল। মনে হয় জিব দিয়ে ঝোলার স্বাদ পেতে চেয়েছিল। যে

ছাতুর গন্ধ পেয়েছিল সে বস্তুর স্বাদটা যে কেমন দেখবার লোভ বেচারী কি করেই বা সম্বরণ করে। অন্ধকারে ঠাহর করা সম্ভব ছিল না ভেতরে কোন বস্তু বিশেষ ক'রে ছাতুটুকু খোয়া গেছে কিনা। কারণ ওটুকু আরা জেলার জগদীশের প্রীতির নিদর্শন। সদ্য দেশ থেকে এসে বেচারী আমাকে পাটনার মানুষ পেয়ে স্বদেশবাসী প্রীতিতে দিয়েছে। সে মানুষটার ঘরের ছাতু। তাছাড়া ছাতুটা আমার এখন পরম সম্বল।

ঝোলা ফেরৎ পেয়ে অন্ধকারে সেটি পরীক্ষার বৃথা চেষ্টা না করে নিচের দিকে লক্ষ করবার চেষ্টা করলাম ঝোলার আকর্ষণে জন্তুটি আবার ওপর দিকে উঠে আসছে কিনা। কি প্রাণী—বুঝতে তো পারলাম না। যদি এমন কেউ হয় যে গাছে চড়তে পারে! তবে একটা ভরসা পেলাম যে গাছে চড়া প্রাণী হলেও এ গাছটিতে চড়া কারও পক্ষেই সহজ সাধ্য নয়। এর সুবিশাল কাণ্ডে হাতের বেড় পাবে না, দ্বিতীয়ত কাছাকাছি কোন ডাল পাবে না যে তাকে অবলম্বন করে উঠবে। আবার মনে হল বলা তো যায় না, ওদের যদি অন্য কোন রকম প্রক্রিয়া থাকে! নিচের দিকে তাকিয়ে এই রকম সাত পাঁচ ভাবছিলাম তারই মধ্যে মনে এল আমার জুতো জোড়ার কথা। ওগুলোকে পরিত্যাগ করেছি বলে ওগুলো আবার বেহাত হয়ে যাবে না তো! এই অরণ্যে আর যাই হোক জুতো চোর থাকবে না। এখানে জুতো পায়ে দেবে কে? জুতোর ভাবনা মাথায় আসতে মনে হল সামান্য বস্তুর জন্যে কি অসামান্য মায়া হচ্ছে! অসীম সামগ্রীকে অবহেলা করে এসে এত সামান্যের জন্যে এ কি মায়া! বিজ্ঞানের বইতে ছেলেবেলাতেই পড়েছিলাম কোন স্থান কখনো ফাঁকা থাকে না বায়ু এসে সর্বদা শূন্যস্থান পূরণ করে। মানুষের মস্তিষ্কও কখনও ফাঁকা থাকে না। কোন না কোন চিন্তা সেখানে থাকবেই। আমারও মাথার মধ্যে এক এর পর এক চিন্তা স্রোতের মত বয়ে চলল।

এ আমার পক্ষে মন্দ নয়, ঘুম কাটানোর ব্যবস্থা হিসেবে বেশ সহায়ক। অবস্থা যা তাতে এখন আমার নিদ্রা মহানিদ্রার পথনির্মাণ করবে। অর্থাৎ ঘুম এলেই ডাল থেকে মাটিতে আছড়ে এবং, তারপর কোন শ্বাপদের ক্ষুধা নিবৃত্তির কাজে আমি সচ্ছন্দেহ লেগে যাব। কাজেই জেগে আমাকে থাকতেই হবে।

আবার আমি চাঁদের দিকে মনযোগ দিতে চেষ্টা করলাম। চাঁদটা এখন অন্যদিকে সরে গেছে। মাথার ওপর দিকে আকাশের অন্য প্রান্তের দিকে তার গতিপথে সে যে চলমান তা বেশ প্রত্যক্ষ করতে পারছি। চাঁদটা এখন চাঁদ নয়, চাঁদের ফালি। ঘষে ঘষে ব্যবহার করা যে কোন বস্তুর অবশিষ্ঠাংশের মত। চাঁদের ক্ষয়ে যাওয়া পরিণতি নয়, সে ক্রমাগত বেড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে, পূর্ণতার পথে দিনে দিনে বড় হতে থাকবে। অনাদি কাল থেকে এই চলছে। কোন অনন্ত কাল থেকে কি প্রয়োজনে এই কমাবাড়া চলেছে এবং এবং চলবে কে জানে? আচ্ছা যদি চাঁদ রোজই

পূর্ণ চাঁদ থাকে, যদি নাই হয় তার হ্রাসবৃদ্ধি কি ক্ষতি তাতে ?

ভাবনায় ছেদ পড়ল কারও বা কোন কিছুর সান্নিধ্যের সম্ভাবনায়। মনে হ'ল কে যেন আমার খুব কাছাকাছি এসে নড়াচড়া ক'রছে। নিচেটায়। ঠিক আমার অবস্থিতির নিচটাতেই। ভ্রান্তি। আমার নিচে তো ফাঁকা, অনেকটাই শূন্যতা। সেখানে আসতে পারে কেবল শূন্যচারী প্রাণী, খেচর। এখন তো তাদের নিদ্রার কাল। নিশ্চয়ই আমার মনের ভুল। পরক্ষণেই মনে হ'ল আমার বসে থাকা ডালটার কিছু নিচেই যে কিছু একটা শূন্যে নড়ছে। যেন কারও দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। চট ক'রে মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার সেই সব গল্পের কথা যাতে অশরীরী প্রাণীরা গহন অন্ধকারে বনের পথে বা পুকুর ধারে কাজের পাশে এসে ফিসফিস ক'রত—ইত্যাদি। কারও জীবনেই যা ঘটেনি অথচ সবাই যে ঘটনার বর্ণনা দিত প্রত্যক্ষদর্শীর মত তেমনি কি কিন্তু তবে ঘটছে আমারই সামনে। ছেলেবেলা থেকে এ জীবনে আমি যত যা দেখেছি তার মধ্যে ভয় বলে কিছু মনে পড়ে না। ভয়ের সঙ্গে কোন পরিচয় আমার কোনকালেই হয় নি। আজ যেন আমি এমন কিছু অনুভব ক'রতে পারলাম যার নাম ভয় হলেও হতে পারে। কারণ আমি নিচের দিকে তাকিয়ে যে পরীক্ষা ক'রব এমন ইচ্ছা জোরদার ক'রতে পারছিলাম না। তবে অচিরেই আমি নিজেকে ফিরে পেলাম। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান যখন অনিবার্য ভাবেই ঘুচে যায় সেই মুহূর্তটির মত সুসময় বেপরোয়া হবার পক্ষে অন্য আর কিছু নেই। অতএব সাক্ষ্য দিতে না পারার মত সেই অমোঘ দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ না করার মূর্খামীর চেয়ে আমি কৌতূহলী হবার দিকেই পা বাড়ালাম। সত্যিই এক বিস্ময় আমার জন্যে জমা হয়েছিল সেখানে, আমার আশ্রয়স্থলটি নিচেই। সন্ধ্যে পর্যন্ত যেখানে সমতল অরণ্য দেখেছি সেখানটাতেই হঠাৎ একটা বিশাল কালো পাথর দেখলাম ঢিবি হয়ে আছে। ছোট-খাট একটা পাহাড় যেন উঠে এসেছে এই মহীরূহের নীচে। একটি বিশাল অবয়বের আভাস আমাকে সন্ধান দিল একটি সচল প্রাণীর। হাতি। বিশাল একটা হাতি তার শূঁড় তুলে আমার স্পর্শ চাইছে। কারণটা অনুমান ক'রতে পারলাম না। তার শূঁড়টা শূন্যে আন্দোলিত হচ্ছে। আমার বসে থাকা ডালটার কিছুটা নিচেই পৌঁছেছে। আমার নাগাল সে পাবে না এটা বুঝলাম। তবে আমাকে ধরবার চেষ্টা সে কেন ক'রছে বুঝলাম না।

হাতির ঘ্রাণ শক্তি তীব্র। অনুকূল বাতাসে সে বহু দূরের ঘ্রাণ পায়। তাছাড়া হাতিরা অনেক সময় খুব কৌতূহলী হয়। হয়ত কৌতূহল বশেই সে পরীক্ষা ক'রতে চাইছে গাছের ডালে কি আছে। ভাগ্য এই যে সে এই ডালের নাগাল পায়নি, নইলে আমাকে শুধু শূঁকে পরীক্ষা ক'রেই সে কি ক্ষান্ত হ'ত ? নামিয়ে নিয়ে আরও ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা কি আর ক'রত না ? আমি তাহ'লে এতক্ষণ

একটা মাংসপিণ্ড হয়ে শিয়ালদের ক্ষুধা নিবৃত্তির কাজে লেগে যেতাম। এই গভীর এবং আদিম অরণ্যে মানুষের ঘ্রাণ সে কখনও পায়নি বলেই হয়ত তার কাছে নতুন ঠেকছে, তাই এই পরীক্ষা। আমি শূন্যে আন্দোলিত শুঁড়টির দিকে সাবধানীর মত তাকিয়েই রইলাম নিজেকে যথাসম্ভব আড়ালে রেখে। এর পর সে কি যে ক'রবে তা তো জানি না। বিশ্বাস কিছুই নেই। কৌতূহল মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে, এখন এই হাতি কতদূর কি ক'রতে চাইবে ভয় সেখানেই।

হঠাৎ একটা বানর সেই সময়েই কোথাও চেঁচিয়ে উঠল। আমার মনে হ'ল চিৎকারটা এই গাছটারই অন্য একটা ডাল থেকে শোনা গেল। সেটা আবার একবার ডাকল। এতরাতে বানর চেঁচাছে কেন? এবার বেশ চেঁচামেচি জুড়ে দিল কয়েকটা বানর মিলে। তার ফলেই কিনা কে জানে হাতিটা দেখলাম শুঁড় নামিয়ে নিল। আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলেও গেল। আর সে চলে যেতেই বানরদের ডাকাডাকি থেমে গেল। দূরে একটা হরিণের ডাক একবার জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। এমনি ডাক রাত বিরেতে অনেকবারই শুনেছি। কেন যে এমনি ভাবে হঠাৎ ডেকে ওঠে জানি না। দুএকবার অন্যরকম ডাকে। অনুমান করা যায় আর্তনাদ বলে। সেই আর্তস্বর শুনে বুঝতে পারি কোনও প্রাণী আক্রান্ত। কিন্তু অন্ধকার অরণ্যে কোথা থেকে যে সেই স্বর এল অনুমান করা যায় না। ক'রতে পারলেই বা কি? একটি প্রাণী হয়ত আর একটির ক্ষুধা নিবৃত্তির কাজে লাগছে। প্রকৃতির নিয়মে একটা শৃঙ্খলা আছে ক্ষুধার প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রাণী অন্য একটির প্রাণ হনন করে না।

হাতিটি চলে গেলেও আমার আতংক কাটল না। তার অবয়ব অন্ধকারে ভালভাবে দেখিনি কিন্তু বিশালত্ব সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেছে। তবে ওই বিশাল প্রাণীটি যদি হাতি না হয়ে অন্য কিছু হ'ত তাহলে আজ রাত্রেই আমার ছিল আয়ুর শেষ। হাতিরা প্রাণী হিসেবে উঁচু স্তরের বলেই আমায় ধারণা। দেহের বিশালত্বের মতই মনের বিরাটত্ব আছে তাদের। তারা নিজেদের এলাকার বাইরে যায় না। শুধু তাই নয় বনের মধ্যেও ওরা নির্দিষ্ট পথেই চলে। শক্ত মাটি দেখে পা ফেলে ওরা। আশ্চর্য-স্মৃতিতে ওরা সেই পথ মনে রাখে। অনেকক্ষণ নিচে তাকিয়ে থেকেও আর কোন হাতিকে দেখলাম না। এ হাতিটা যতদূর মনে হচ্ছে নিঃসঙ্গ। তা'হলে পাগলা। গুণ্ডা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ভাগ্যিস তার আয়ত্বের বাইরে ছিলাম! না এভাবে জনপদ ছেড়ে বনের মধ্যে চলে আসার কোন মানেই হয় না। এতক্ষণে সেটা আমার বোধগম্য হ'ল। এদিকে পাহাড়ের ওপরে বসতি যদি কোথাও থাকেও সে বস্তি যে কাদের তা তো জানি না। যাদেরই হোক ববাহুতকে স্থান দেবার কোন প্রথা এদের নেই। তা'হলে? কোথায়

যাচ্ছিলাম আমি? যাচ্ছিই বা কোথায়? কেন? বেশ তো ছিলাম। এখানে ভাল লাগছিল না। কোথায় লাগবে? তা তো ভেবেই পেলাম না। আদৌ কোথাও ভাল যে লাগবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? নিজের মনের মধ্যেই এমনি চলল প্রশ্নোত্তরের দ্বন্দ। কোথাও যে থাকতেই হবে তারই বা কি সর্ত আছে? ভাল না লাগলেও থাকতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা তো নেই! কিন্তু যাবার জন্যে অন্য পথ খুঁজতে হবে। সকাল হলেই ফিরে যাব। সেখান থেকে যাত্রা ক'রব অন্যদিকে, অন্য কোন পথে। বনে ঢুকলে বন একসময় ফুরোয় ভাবনার রাজ্যে ঢুকলে তা আর ফুরোয় না। সেই ভাবনা চলতেই থাকে। আমি ভেবেই চললাম।

পাখিদের কলতান কানে যেতে চোখ খুলে গেল। আলো। অন্ধকার কেটে প্রাতঃসন্ধ্যার আলোর আভাস সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীতেও। চেতনার জন্ম হচ্ছে, প্রাত্যহিক নবজন্ম। আমরা বলি জাগরণ। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠলাম আমিও। তাহ'লে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চিন্তা ক'রতে ক'রতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম নিশ্চয়, তারপরই ঘুম এসেছে। ভাগ্যিস পড়ে যাইনি গাছের ওপর থেকে! অথবা ডাল বেয়ে নেমে আসেনি কোন কোটরবাসী সরীসৃপ! অমনি কিছু একটা ঘটে গেলে আর আমার সকাল হ'ত না। আর এই চোখে এসে প্রতিবিম্বিত হ'ত না উদার আলোর অকৃপণ বিস্তার। পাখিদের কাকলির অভিঘাতে মন উঠত না জেগে।

যা হোক আবার সকাল যখন হ'ল, আবার জেগে উঠলাম, তখন তো পথ খুঁজতেই হবে! কিন্তু কোথায় যাব? কোন দিকে? ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম আমার ডালের অনেকটা ওপরে পাতার জাফরির ভেতর দিকে অনেকটা উঁচুতে বসে আছে ক'টা বানর। একটা নিজের গা চুলকোচ্ছে। গাছটির ওপর দিয়ে ডান দিকে উড়ে গেল ক'টি সারস বা ওই রকমেরই পাখি। ফিকে গোলাপী রঙ, গোলাপী-কমলা মিশ্রিত রঙের লম্বা ঠোঁট। ভাল ক'রে দেখতে পাবার আগেই অন্য গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল। পাখি দেখার প্রয়োজনও ছিল না। আমি চারিদিকে চেয়ে চলার দিক ঠিক ক'রতে চাইছিলাম। ভাবলাম গাছের আরও ওপরে উঠে দেখি কোথাও পাহাড়ে কোন গ্রাম দেখা যায় কিনা। পশ্চিমে পাহাড়টা আড়াল ক'রছে, হতে পারে ওটারই গায়ে আছে কোন বসতি যা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না! কিন্তু বানরগুলো! ওদের কোনই ভরসা নেই। ওরা যদি আত্মরক্ষার কথা ভেবেই আক্রমণ করে বসে! খুবই স্বাভাবিক সেটা। ওপরের দিকে উঠতে চেষ্টা করা আদৌ নিরাপদ নয়। নিজের আপন এলাকায় সবাই শক্তিশালী, বনের আকারে মানুষের চেয়ে ছোট হলেও তাদের তাদের স্বভূমিতে আমাকে কাবু ক'রতে বেশী পরিশ্রম হবে না তাদের। অনেক নির্বুদ্ধিতা এর মধ্যেই ঘটে গেছে আর তার পরিমাণ বাড়াই কেন? মানে মানে নিচের দিকেই নামতে লাগলাম। প্রকৃতির

বিধান অনুসারে উন্নতির চেয়ে অবনমন সহজ। তাই সামান্য চেষ্টাতেই পায়ের তলায় মাটি পেয়ে গেলাম। যে উচ্চতায় উঠতে অনেক গবেষণার দরকার হয়েছিল সেই উচ্চতা থেকে নামতে বেগ পেতে হ'ল না সে তুলনায় সিকি ভাগও। নিচে আমার জুতো জোড়া পড়েছিল সেগুলোর দুর্দশা দেখে আমার দুঃখ করারও প্রয়োজন রইল না। আমার পাদুকার প্রতি পৃথিবীতে কারও এমন আগ্রহ থাকতে পারে এ এই প্রথম জানা গেল। সেই সৌভাগ্যেই বোধকরি জুতোর শোক গৌণ হয়ে পড়ল। এক পাটি জুতো চোখে পড়ল, সেটি মনে হল কোন বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে আর সেই পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে সেটি ক্ষতবিক্ষত। মনে হ'ল যে জন্তুর দেহের প্রাকৃতিক আবরণ দিয়ে জুতোটি প্রস্তুত হয়েছিল শেষ প্রাণীটি স্বকীয় আবরণ ফিরে পাবার প্রয়াসী হয়েছিল জুতোটি দেখতে পেয়ে। জুতোর আর আকৃতি নেই, ছিন্ন ভিন্ন চামড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে সেটি।

চারপাশে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম কোথাও কোন তেমন জন্তু ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা আমারই অপেক্ষায় যে আমার বিপদ ঘটাতে পারে। প্রথমটা নিঃশব্দে রইলাম তারপর ইচ্ছে ক'রেই একটু শব্দ ক'রলাম দু হাতের তালুতে চাপ দিয়ে। এই শব্দ করাটা আমি জাগোর কাছে শিখেছিলাম। এমন অদ্ভুত শব্দ করার পদ্ধতি জাগো যে কার কাছে শিখেছে জানিনা। শব্দটা কোন ছোট-খাট প্রাণীর বা বিশেষ কোন পাখির ডাকের মত। আরও অনেক রকম শব্দ ক'রতে পারে জাগো। মুখে হাত দিয়ে এক একরকম মুদ্রায় আলাদা শব্দ করে সে। শুনলে কখনো মনে হবে তিতির পাখি, কখনো মনে হবে বাঘ, কখনো বা বনগাই বুঝি ডাকছে। বানরের ডাকও সে জানে। আরও কত কি যে জানে আমার দেখা হয় নি।

আমি শব্দটা ক'রে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রলাম। শব্দের কোন প্রতিক্রিয়া হ'ল না। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম আমি একাই আছি। আমার জুতোর চামড়াটা হাতে নিয়ে তার পুনর্নির্মাণ সম্ভব কিনা খতিয়ে দেখতে চাইলাম। অসম্ভব। বিশ্বকর্মার দক্ষতা আছে এমন কোন কারিকর চেষ্টা ক'রলে মার্যাদা হারাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে মনকে উদার করবার প্রচেষ্টা হিসেবে জুতো জোড়া অরণ্যে বিসর্জন দিলাম।

ব্যাস। এবার মুক্তপদ। কিন্তু সে যাত্রা যে কেমন হবে ভাবতে গিয়ে প্রথম পদক্ষেপেই ব্যথিত হ'লাম। সব মানুষ যেমন সমান নয় সব পাথরও সমান নয় একটি পাথর আমাকে ব্যথা দেবে বলেই যেন সূক্ষ্মভাবে অপেক্ষা ক'রছিল। এ রকম বিপদের জন্যে প্রস্তুতি ছিলনা। শুরুতেই এই। তাহ'লে এবার পথ চলব কি ক'রে? এমন একটা বিপদ আসতে যে পারে তা আমার ভাবনার বাইরে

ছিল। তাছাড়া সত্যি বলতে কি সব রকম পূর্ব অনুমান বন্ধ রেখেই তো আমি পথ চলছি। এখন তো আর উপায় নেই। এখন আমাকে ফিরতেই হবে।

আবার ফিরে এলাম। রামনিবাসের বাড়ীর দিকে না গিয়ে ধরলাম ঘাটের পথ। স্থির ক'রলাম গুয়াহাটি যাব। নদী পথে বড় বড় মহাজনী নৌকা গুলো গুন টেনে টেনে ভেসে যায়। অনেকসময় উজানী বাতাসে পালতুলে দিয়েও আকাশের মেঘের মত ভাসতে থাকে নদীর ওপর দিয়ে। প্রায়ই তারা থামে যোগী ঘোপার বন্দরে। এপারেও এসে থামে কোন কোনটা। ইচ্ছে তারই একটায় সওয়ারী হবো গুয়াহাটির পথে।

ঘাটের ধারে এসে পেঁছেছি, দেখি নৌকা বলতে নেই। কতগুলো লোক ঘাটের কাছে একটা গাছ কাটছে। দেখেই বুঝলাম কাছাকাছি বস্তির লোক, জ্বালানীর জন্যে কাঠ জোগাড় ক'রছে। সামনেই গাছটা হুড়মুড় ক'রে পড়ল। ছোট একটা শাল গাছ। এমনি আপন ইচ্ছায় জন্মানো শাল শিমুল এ দেশের ভূমিময়। প্রকৃতির সৃষ্টির কোন পরিমাপ নেই, বৈচিত্রের নেই কোন সীমারেখা। কত গাছ গাছালির দেখা যে এই প্রকৃতির পৃথিবীতে পেলাম তার হিসেব রাখাই অসম্ভব। আর কে-ই বা মাতে এই অসম্ভবের নেশায়। প্রাণী মাত্রেই তার দিন যাপনের দায় নিয়ে ব্যস্ত। সে প্রকৃতির কাছ থেকে শুধু গ্রহণ করে, ইচ্ছামত হরণ করে। প্রকৃতির জন্যে তার কোন দায় নেই, যার অকৃপণ দানে সে পুষ্ট তার প্রতি নেই কোন কৃতজ্ঞতার অনুরাগ। তাই শিশু বৃক্ষটিকে মানুষ অনায়াসে ছেদন ক'রছে যেটিকে অসীম মমতায় সৃষ্টি ক'রেছে বিশ্বপ্রকৃতি তার আপন বক্ষে।

আমি একটু সরে নদীর ঢালুতে নেমে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসলাম। আর কী বা করবার আছে, কোথায়ই বা যেতে পারি? যে সময় কাটাতে হবে তা যেখানেই হোক। কাটালেই হ'ল। এখানে বরং আর একটা সম্ভাবনা আছে—এ পার দিয়ে কোন নৌকা গেলে উঠে বসার চেষ্টা করা যাবে তাতে। পেছন দিকে অনেকটা উঁচুতে গাছ কাটিয়ে লোকগুলো যে কথাবার্তা বলছে তার শব্দের রেশ এখানেও ভেসে আসছে আমার কানে। নদীর ছোট ছোট ঢেউ ভাঙ্গার শব্দের সঙ্গে ধাক্কা লেগে কম শোনাচ্ছে তা। কি একটা পাখি একাই তীর রেখা ধরে জলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে উজানের দিকে—তার অনবরত স্বরও শুনলাম কিছুক্ষণ ধরে। ওপারে দূরে কালো বিন্দুর আবছা নড়া চড়া ওটাই নিশ্চয় যোগীখোপা। কোনদিন যাইনি। শুনেছি নদীর ওপরটাতেই পাহাড়ের গায়ে পাঁচটা ছোট গুহা আছে, দেখা যায়। সেইখানে নাকি বনবাসের কালে পঞ্চপাণ্ডব কিছুদিন বাস করেছিলেন। হয়ত হবে, হয়ত শুধুমাত্র জনশ্রুতিও হতে পারে। আমার সংশয় হয়। এই সংশয় আমার কিছুতেই দূর হয় না, সব ব্যাপারেই কেমন একটা সন্দেহ

আমাকে জড়িয়ে থাকে। পাখিটা উড়ে যেতে নিঃসঙ্গতার অবসরে সেই সংশয় এসে দাঁড়াল আমার সমস্ত ভাবনাকে বেষ্টন ক'রে। আমি ওপারের কথা ভাবছিলাম। এই বিশাল নদ ব্রহ্মপুত্র পার হয়েছিলেন পাণ্ডবেরা? এখানে কি ক'রতে আসবেন তাঁরা? পঞ্চপাণ্ডবেরা তো আর মাতংগ ছিলেন না যে খাদ্যের প্রয়োজনে দেশব্যাপী বনভূমি চষে বেড়াতে হবে! তাঁরা নিশ্চয়ই এখানে আসতে চান নি লোকে এসব কল্পনা ক'রে বলে।

এইসব ভাবনার মধ্যে কানে এল, দাদা বিড়ি আছে?

পরিস্কার বাংলা স্বর। গোয়ালপাড়ার বাংলা নয়। শুনেই দেখি আমার পাশটিতে মাঝারি উচ্চতার রোগা একটি লোক দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে। তার হাসির ভঙ্গীতে এবং চেহারার কারণেই শুধু নয় নিঃশব্দে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর জন্যেই আমার তাকে প্রেতাত্মা বলে মনে হ'ল। মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। নইলে এসে দাঁড়াবার শব্দটুকু না হয় না পেলাম, বাতাসের শব্দ পর্যন্ত পেলাম না! বড়ই আপন ক'রে কথা বলছে লোকটা! সন্দেহ হ'ল আমার চেহারাটাও কি ওর মতই হয়েছে, নইলে অমন আপনার ক'রল কি ক'রে আমাকে? মনে পড়ল বহুদিন আয়নার সামনা সামনি হইনি, বিরক্ত হয়ে বললাম, বিড়ি নেই।

তবে তো বন্ধু—হঠাৎ উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়বার মত ভঙ্গীতে লোকটি বলল। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম ওর অসংলগ্ন কথার কোন ধারা না পেয়ে। সে আমার পাশটিতে বসে পড়ে বলল, আপনি যে গোয়ালপাড়িয়া নন যে আপনার চেহারায় বলছিল আবার অসমীয়া যে নন সে তো স্পষ্ট। তাই আন্দাজে ঢিল মেরেদিলাম আর কি—। তা ঢিল আমার ঠিক লেগে গেছে।

লোকটির কথায় পূর্ববঙ্গীয় টান সর্বত্র। আমি চুপ ক'রে রইলাম ওর পরের কথাগুলোর অপেক্ষায়। সে গুলো বেরিয়ে এল একটু পরেই, আমার নাম জীবনলাল ভট্টাচার্য। ভরদ্বাজ গোত্র। আপনি?

আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। নিজেরই বিয়ে হয়নি। সে প্রয়োজনও নেই। আমার জাত গোত্রে আপনার কোন প্রয়োজন থাকতে পারেনা, আপনারটাতেও আমার ছিলনা, আমি খুব রুক্ষস্বরে জবাব দিলাম। এই নির্জনতায় একজন সঙ্গী নিঃসন্দেহে অভিপ্রেত কিন্তু আমার তাকে কিছুতেই ভাল লাগছিল না। সে তবু গায়ে পড়ে বলল, আমি তেজপুরে থাকি।

তাতে আমার কি? —আমি জানতে চাইলাম।

লোকটি আদৌ না দমে বলল, আমার বিড়ি ফুরিয়ে না গেলে নিশ্চয়ই আমি আপনাকে নিজের বিড়ি এগিয়ে দিয়ে আলাপটা ক'রে নিতাম।

তো মহাসমস্যা—মনে মনে ভাবলাম। তবু লোকটির শেষ কথাগুলোর মধ্যে অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গী ছিল বলে বললাম, বিড়ি চাওয়াটা কোন ব্যাপার নয়।

থাকলে দিতাম।

আমিও তাই ভাবলাম। আপনাকে দেখে মনে হ'ল আপনার কাছে চাওয়া যায়।

নরম সুরে কথা বলছিল মানুষটা। কিছুটা মায়া লাগল। যত খারাপ লাগছিল দেখলাম অত খারাপ তাকে না ভাবলেও চলে। মনে মনে একটু লজ্জিত হলাম ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের জন্যে। তাই বললাম, সে জন্যে আমি কিছু মনে করিনি। আপনি কোথায় যাবেন ?

রাঙ্গাপাড়া—একটা জায়গার নাম বলল জীবনলাল। আমি সে জায়গা চিনি না, কোনদিকে তাও জানি না। তাই চুপ ক'রে রইলাম। সে-ই বলতে আরম্ভ ক'রল, এখান থেকে অনেক দূর। বঙ্গাইগাঁও হয়ে ট্রেনে যেতে হয়, আলাদা লাইন। উত্তর লখিমপুর নাম শুনেছেন ?

মাথা নাড়লাম, শুনিনি।

চলুন না। ওদিকটা বেশ ভাল। ওদিকে অনেক কাজ কর্ম পাওয়া যায়।

কাজ কর্মের জন্যে আগ্রহ থাকার কথা আমার নয় কিন্তু কোথাও একটা কিছু না ক'রলে বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত তো হয় না। তাই কোন একটা কাজের কথা ভাবতেই হয়। অনেকদিন এদিকে আছি অন্যদিকে যাবার কথা আর মনেই আসে না তাই জীবনলালের কথায় কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হ'লাম। মন্দ নয়। কোথাও একটা টিকে থাকার নামই জীবন। বনে বাঘ, হাতি, গণ্ডার, হরিণ, কুকুর, পাখি সবাই তো ওই টিকেই আছে, ঝোপ ঝাড়ে আছে কীট পতঙ্গ সরীসৃপ। সবারই তো ওই টিকে থাকা, মানুষেরও তাই। একটা যে কোন কোথাও যে কোন ভাবে। তার বেশী আর কি ? একটা কেঁচো মাটি খুঁড়ে তার ওপর মাটির স্তূপ তৈরী যে করে, অথবা পাখিরা করে গাছের ডালে বাসা সে সবের সঙ্গে মানুষের এই ঘরবাড়ী তৈরীর মৌলিক ব্যবধানটা কোথায় ? কিছু নেই। কিছু মাত্র নেই। হরিনন্দনই হোক কি রামনিবাসই হোক আর জাগোই হোক সেই এক টিকে থাকা—একই পদ্ধতিতে—ক্ষমতা অনুসারে আয়োজনে রকমফের মাত্র।

সিদ্ধান্ত করবার জন্যে ভাবতে চাইছিলাম সেই ফাঁকে জীবনলাল জানতে চাইল, এখানে কোথায় থাকেন ?

কোথাও নয়—পরিষ্কার জবাব দিলাম।

এখন তা'হলে কোথা থেকে আসছেন ?

এখান থেকেই। ওই ওপাশের জঙ্গল থেকে। বলদমারির ওদিকে ছিলাম কাল রাত্রে।

কি করেন ?

পালটা প্রশ্ন করে ফেললাম, কি করা যায় বলুন তো ?

কাজ ক'রবেন ?

কি কাজ ?

আমি আপনাকে ভাল কাজে লাগিয়ে দিতে পারি। আমাদের ওদিকে এখন অনেক কাজ।

আপনি কি করেন ?

আর বলবেন না মশাই—জীবনলাল একেবারে হতাশ সুরে বলল—কাজ করি এক ঠিকাদারের কাছে। রামেশ্বর সিং। বামডিলা জানেন ?—তর্জনী আকাশে তুলে উত্তর দিক দেখিয়ে বলল, ওই ওদিকে। অনেক কাজ নিয়েছে ঠিকাদার সিংজী। এত কাজ যে লোক পাচ্ছে না। আমাকে মশাই এখন লোকের জন্যে আসতে হয়েছিল।

এদিকে!

আরে হ্যাঁ মশাই। খবর পেলাম বিহারীদের একটা বড় দল নাকি দিন কয়েক হ'ল ধুবড়ী দিয়ে এদিকে এসেছে। তাদেরই খোঁজ করছিলাম।

পেলেন ?

পেলে কি আর একা একা ঘুরি ? কোনদিকে ব্যাটারা যে গেল! না কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কে জানে ? খুঁজে খুঁজে আমার প্রাণ যায়।—বলে জীবনলাল চুপ ক'রল। বেশীক্ষণ থাকতে পারল না আরম্ভ ক'রল, আসামের এক মহাব্যাধি কি জানেন ? কোন লোক ঘরের বাইরে যাবে না। এত উপজাতি আছে এখানে যার যার নিজের এলাকায় বাইরে এই আসামের মধ্যেই নিয়ে যান তো দেখি একজনকে ? নইলে মশাই কোন সেই বিহার থেকে লোক আসতে লাগে কাজ ক'রতে।

আপনার ঠিকাদারও তো বিহারী, সে নিজে কেন লোক আনছে না ?

কত আর আনবে ? জীবনলাল তার কথা বলার স্বকীয় হালকা ভঙ্গীতে বলল, দেশ উজাড় ক'রে এনেছে মশাই। সে দেশে আর লোক নেই। এখন সেই দেশের মেয়েমানুষগুলো যে কটাকে সদ্য পেট খালাস ক'রে নামিয়েছে সেই গুলোকে নিয়ে আসতে হয়। আরে মশাই আড়কাটি থেকে ঠিকেদার—লোক আনতে সে ভালই জানে। লোক আনাই তার জন্মগত ব্যবসা। কিন্তু এখন আর পেরে উঠছে না। দেশ জুড়ে কাজ নিয়েছে অত সামলানো কি মশাই চাট্টিখানি কথা ?

ব্যাপারটা বোঝা গেল। আর এক হরিনন্দনের গল্প। হোক। দেখাই যাক। আপাততঃ শোনা যাক কি বলে। যথাসময়েই সে বলতে শুরু ক'রল, তার মশাই 'ক' অক্ষর গোমাংস। অতি কষ্টে মাতৃভাষায় নিজের নামটা দাগতে পারে। তাও যে কলমটা দিয়ে একবার নাম লিখবে সেটি দিয়ে মা সরস্বতীও আর অক্ষর বসাতে পারবে না।—একটু থেমেই সে আবার বলতে আরম্ভ ক'রল, ওই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় মশাই এসব করবার লোক আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই নতুন সরকারী কর্তারা খালি ওকে ডাকে আর বলে, কামেশ্বর সিং এই দশটা বাড়ী অমুক

পাহাড়ের মাথায় বানাও। এই পঞ্চাশটা কোয়ার্টার বানাও ডাক্তাররা থাকবে দুটো, ধাত্রীরা আর অন্য কর্মচারী থাকবে বাকীগুলোতে। বানাও হাসপাতাল। কামতা জিনিষপত্র লোকজন জোগাড় ক'রে বানাতেই থাকে। তবু মশাই কখনো চিঠি-চাপাটি পড়তে লোক লাগে। লিখতেও হয় দু এক লাইন, সেই কাজই আমি ক'রতাম। দেশ থেকে এসে ওরই কাজ করি তা মশাই এখন বলে কি বাবুজী—আগে আদমী জোগাড় কর, দুচারশ আদমী। নইলে কাজ শেষ হবে না।

আমি যা শুনলাম তা যথেষ্ট। তাই বললাম, যা বলছেন সে তো বিরাট ব্যাপার।

আর কি বলছেন। জোগাড় যা হয় সব তো আর আদমি নয় তার মধ্যে বেশ কিছু থাকে প্রায় চতুষ্পদ। ওসব দিয়ে কাজ করাবারও লোকের দরকার। কাজ বুঝে নেবার লোক। সে কাজ যদি আপনি করেন তো আমি ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।

আমি মনে ভাবলাম আমার আর আপত্তির কি থাকতে পারে। বললাম, আপনি যাবেন তো?

এখন তো ইচ্ছে তাই।

তবে চলুন যাই।

বাঃ।—খুব খুশী হ'ল জীবনলাল। সে যেন বহু মূল্যবান কিছু হাতে পেয়েছে এমনই ভাব দেখাল। প্রশ্ন ক'রল, লেখাপড়া কিছুটা জানেন তো? মানে সংখ্যাগুলো লিখে রাখতে পারলেই হবে আর কি—

ওটুকু পারব— জানলাম।

ব্যাস ব্যাস। ওপাশে ঘাট আছে চলুন পার হয়ে পঞ্চরত্ন ঘাটে যাই। সেখান থেকে বঙ্গাই-গাঁও হয়ে ট্রেন ধরে চলে যাব। জানেন মশাই ওই ঘাটের ধারে পাহাড়ের গায়ে পাঁচটা ফোকর আছে বলে এরা বলে পঞ্চপাণ্ডবেরা ওখানে থাকত। তাই নাম দিয়েছে পঞ্চরত্নঘাট। যোগীদের খোপও বলত ব'লে যোগীখোপা। পঞ্চ পাণ্ডবদের মশাই খেয়ে দেয়ে আর কাজ ছিল নাএখানে আসবে বনবাস যেতে। দেশ পাকিস্থান না হ'লে কি মশাই আমরাই আসি এই বনবাসে?

লোকটাব সব কথা মন দিয়েই শুনছিলাম এবার কিন্তু একমত হ'তে পারলাম না। এই অরণ্য আমার ভাল লেগেছে। এই নিবিড় সবুজ বনভূমি এ কি মায়াময়। যে দিকেই চোখ যায় মন ভরে ওঠে। এমন নির্মল সবুজ কি পবিত্র, কি উজ্জ্বল, কি শোভাময়। আমার সমস্ত প্রাণমন আচ্ছন্ন করে রাখে। প্রতিবাদ অবশ্য ক'রলাম না। লাভ নেই। যে যেমন ভাবে। আমার তো মনে হয় প্রকৃতি এই অঞ্চলকে আপন মনের মাধুরী মিশিযে সাজিয়েছে। এ যেন প্রকৃতির আপন বাসস্থান। এ শোভা আর কোথাও দেখি নি। সেই শিলিগুড়ির পরই যে সবুজ বনভূমি সুরু হয়েছে তার চেয়ে স্বর্গ সুন্দর কি না অনুমান ক'রতে পারি না।

আবার আর একজনকে অনুসরণ ক'রলাম। জীবন। আমাকে যেদিকে নিয়ে

যাবে বিনা প্রশ্নে সেদিকেই চলতে থাকব। কোনও পূর্বসর্ত নেই, মামুলী যা প্রতিশ্রুতি তারও নেই কোন প্রত্যাভূতি। চাইবও না। কারণ জন্ম সূত্রে এই বিশ্বলোকে কেউ-ই বা কোন কিছুই প্রত্যাভূত নয়। তাই বিনা প্রশ্নে নিঃশব্দেই অনুসরণ ক'রতে হয়। সে অনুসরণ কখনো মানুষকে, কখনো ঘটনাকে, কখনো বা কোন অবস্থাকে।

সেই ট্রেন। ছোট ট্রেন। চাকার ওপর দিয়ে যেন পিছলে যাচ্ছে গতি। এক এক সময় ভুল হয়ে যায় গতিশীল আমরা না দুপাশের দৃশ্যাবলি? বিভ্রান্তি আসে তারাই বুঝি বিপরীত গতিতে ছুটে চলেছে পেছনের দিকে। আসলে কিন্তু কিছুই পেছন দিকে চলে না।

দু ধারে সবুজ গাছপালা—না, ঠিক তা নয়, সবুজ বনভূমি ভেদ ক'রে আমরা চলেছি ছুটে। অদ্ভুৎ এক নিবিড় সবুজের মধ্যে দিয়ে এমনই আমাদের পথ যে মনে হ'তে লাগল ওই রঙ যেন আমাদেরও গায়ে যাচ্ছে জড়িয়ে। আমরা একাকার হয়ে যাচ্ছি। কত রকম গাছ যাদের নামই জানি না, হয়ত কোনদিন দেখিইনি তাদের, ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া আছে কচি সবুজ রঙের খাড়া খাড়া ঘাস—অজস্র। সেই ঘন ঘাসের মধ্যে দিয়ে সরু রেখার মত জলধারা মাঝে মাঝেই বয়ে চলেছে যেগুলো আমার নগর দেখা চোখে মনে হচ্ছে শহরের জলনিকাশী পয়ঃপ্রণালী বলে। কিছুটা দূর থেকে গতিময় দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে মনে হচ্ছে ওগুলো এত সরু যে ডিঙ্গিয়েই পার হওয়া যাবে। ভাল ভাবে নজর পড়তে দেখলাম সেই জলধারা গুলো স্রোতস্বিনী। নদী। এত সরু নদী আগে কখনো দেখিনি। তবু বেশ ভাল লাগল। একেই বোধহয় ইংরেজরা স্ট্রীম বলে। ওদের দেশে কি তাহ'লে এমন সুন্দর দৃশ্য আছে! বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে এমনি জলের ধারা? এই সব ছোট ছোট স্রোতোধারার উৎস কি? মনে মনে এক গবেষক হয়ে উঠলাম। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত যে জলের চাপ মাটির ওপর ছড়িয়ে দেয় সেই জলই নিজের প্রয়োজনে নরম মাটি কেটে নিয়ে আপন যাত্রাপথ তৈরী ক'রে নেয়। এমনি অসংখ্য ধারায় সেই অজস্র জলরাশি চলে কোন বড় জলাশয়ের দিকে সেখানেই বিশালের মধ্যে বিলীন হয়ে লাভ করে আপন সার্থকতা। এক জায়গায় নজরে পড়ল মৃদু গোলাপী রঙের বহু সারস ঘাস বনের মধ্যে এমন ভাবে ছিটিয়ে রয়েছে যে মনে হচ্ছে সমস্ত বনভূমি জুড়ে ফুল ফুটেছে। রেল লাইনের কাছেই একটিকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখা গেল আমাদের দেশের বকের অনেকগুণ বড় সংস্করণ। রঙটায় গোলাপী আভা। ভারী সুন্দর। এখানে বুঝি সবই সুন্দর। দু পাশের দৃশ্যের এই নিরবচ্ছিন্ন সবুজের মধ্যে মাঝে মাঝে থেমে যায় ট্রেন। সেখানটা ক্ষত। মানুষ সেখানে সবুজের ক'রেছে উৎসাদন। সেখানে ঘর বাড়ী লোহা টিন পাথরের ঢিপ। কৃত্রিমতা।

এমনি ক'রে থামতে থামতে এসে এক থামাতে নামলাম। জীবন জানাল নামতে হবে। এখন তাকে অনুসরণ করছি। সে-ই চূড়ান্ত। স্টেশনের ধারেই একটা দোকানে সে নিয়ে গেল। দেখলাম সেই ছোট্ট দোকানদারের সঙ্গে তার গভীর আলাপ। দুজনে হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া সারলাম। এতক্ষণ বাদে কাজের কথা পাড়ল জীবনলাল নিজেই। বলল, আমি যে কোম্পানীতে কাজ করি সেখানে আপনার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

আমাকে কি ক'রতে হবে? জানতে চাইলাম।

দেখাশোনা ক'রতে হবে। লোকজনকে দিযে কাজকর্ম করিয়ে নেবেন আর কি। —বলেই হালকাভাবে বলল, আপনি তো আর পাথর ভাঙ্গতে ইঁট গাঁথতে পারবেন না! আমিও অবশ্য সেসব কাজের জন্যে আপনাকে সুপারিশ ক'রব না।

তার কথা বলার কায়দাব জন্যে আমি বিদ্রূপ করলাম, আপনার অশেষ অনুগ্রহ।

লোকটি সেই বিদ্রূপ ধরতে না পেরে বলল, না না, সে আমি কখনই ক'রব না।

তার কথার ভঙ্গী পরম করুণাময় ঈশ্বরের স্বরের মত। ইচ্ছে হ'ল সেটা তাকে বলি কিন্তু ভাবলাম কি হবে এই সরল অবোধ লোকটিকে আঘাত ক'রে? ও ওর নিজস্ব জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত যা বোঝাতে চাইছে বোঝাক, বলতে চাইছে বলুক। আমার কোন ক্ষতি তো সে ক'রছে না! বরং এক নতুন জায়গার সন্ধান দিচ্ছে সে, পেঁাছে দিচ্ছে নতুন আশ্রয়ে। এই সময়টায় এমনি আশ্রয়ের বিশেষই প্রয়োজন আমার। সেই আশ্রয় যে দেয় তাকে আঘাত করবার কোন মানেই হয় না। হোক না লোকটা একটু হালকা বুদ্ধির তাই বলে তার উপচীকির্ষাকে অসম্মান করি কেন? সাদামাঠাভাবে সে যা বলছে তাতে বুদ্ধির ঘাটতি থাকতে পারে কিন্তু সদিচ্ছার তো কোন অভাব নেই!

সেই দোকনটায় বসতে বলে সে কোথায় যেন গেল। জানিয়ে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরবে। চুপচাপ বসে থাকবার বদলে ভাবলাম আমিও একটু ঘুরে আসি এপাশে সেপাশে। ইচ্ছেটা দোকানীর সামনে প্রকাশ ক'রতেই সে বলল, এখানে কোথায় ঘুরবেন বলুন? এটা কি ঘোরবার মত জায়গা? চারদিকে জলা জঙ্গলা কোথায় যাবেন? দেশ কোথায় আপনার?

সামান্য একটু মিথ্যে বললাম, ছাপড়া। শুনে যেন লাফিয়ে উঠল লোকটি। এতক্ষণ বাংলা বলছিল নিমেষে বদলে গেল ঠেট হিন্দিতে। একেবারে দেশী হিন্দিতে বলল, আমার বাড়ী আজমগড়। ওই বাঙ্গালীর সঙ্গে কথা বলতে শুনে ভাবলাম আপনিও বাঙ্গালী। আর বলবেন, না এখানে দেশী ভাষা চলে না বাংলা বলতে হয়। —লোকটি খাতির জমাবার জন্যে আমাকে একটা চিনৌটি (টিনের কৌটো) এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন খৈনি বানান।

আমি সেটি হাতে না নিয়ে বললাম, আমার চলে না।

আজমগড়ের দোকানদার যেন অবাক হয়ে গেল, বলল, বিহারের মানুষ আপনি শুখা খান না। তারপরই বলল, আমার নাম রামসুখ তিবারী।

আমি বিহারী সৌজন্যে বললাম, গোড় লাগি পণ্ডিতজী।

উত্তরপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ আমার সৌজন্যে দেখলাম বেশ খুশী হয়ে আশীর্বাদ করল, জিয়ো জিয়ো।

এই অরণ্য ঘেরা জনপদে বিকিকিনির পেশায় নিযুক্ত লোকটির ব্রাহ্মণ্য অভিমান তার মুর্খামীর প্রকাশ হলেও সে আত্মসমীক্ষার ধার কাছ দিয়ে না হেঁটে আমার প্রতি অসীম করুনা বর্ষণ ক'রে বসল। তার আশীর্বাদ আমাকে কোন অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে যে পারবেনা সেই সত্য আমার মত ক'রেই যদি সে জেনে থাকে এবং তার পরেও যদি সে ওই আশীর্বচন উচ্চারণ করে থাকে তবে তার কথাকে আমি শুভেচ্ছা বলেই গ্রহণ ক'রব, নইলে যদি সে শুধুমাত্র আমার প্রণাম পাবার তৃপ্তিতেই ঢালাও আশীবাণী দিয়ে থাকে তবে তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে আমার অশ্রদ্ধা হবে অসীম। প্রথম দেখাতেই সিদ্ধান্ত করা অনুচিত বলে অপেক্ষা করে রইলাম পরের কথা শোনবার জন্যে। তবে এই দোকানদারটিকে বিশেষ ভাবে বিচার ক'রে দেখতে গিয়ে ওকে আমার একটি গুবরে পোকা বলে মনে হ'ল। শুধু বেঁচে থাকার জন্যে বেঁচে আছে। কারণ তার সারাদিনের কর্মসূচী জানলাম সকালে উঠে দোকান খোলা, একসময় স্নানটা ক'রে নিয়ে কিছুক্ষণ ভজন তারপর আবার এই দোকান।

জানতে চাইলাম, কি ভজন কর তেওয়ারীজী ?

রামজী কা ভজন—নিমেষের মধ্যে জবাব এল। এবং জবাবের সঙ্গে সঙ্গেই তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে মুখস্থ চারটি পংক্তি শুনিয়ে দিল আমাকে। কথায় কথায় আরও জানলাম বউ ছেলে পিলে কেউ এখানে নেই। মাঝে মাঝে আসে কিছুদিন থেকে চলে যায় কারণ এখানকার হাওয়া পানী অর্থাৎ জল হাওয়া খুবই খারাপ, বুখার কা বেমারী হয়ে যাচ্ছে বলে ছেলেদের এখানে রাখতে পারছে না রামসুখ। কিন্তু তার জন্যে সে যে কোন দুঃখে আছে এমন মনে হ'ল না। বরং দেখলাম গুবরে পোকা গোবরের মধ্যে যে সুখে থাকে তেমনি সুখেই সে আছে। আসেপাশে বিহার উত্তপ্রদেশের কিছু লোক আরও আছে আর বুঝলাম অবসরের সঙ্গী আছে ওই তুলসীদাজী।

বনভূমি না হ'লেও এই বনময়ভূমিতে মনোময় পরিবেশ ক'রে দেবার যে অসীম শক্তি সন্ত কবি তুলসীদাসের আছে তাকে গ্রহণ ক'রে এই রামসুখ সুখী। এই এক ঐশ্বর্য ব্যাতীত রামসুখ নামক প্রাণীটি নেহাৎই একটি বড় জাতের পোকা। দোকানের সামনে বাঁশ পুঁতে বাঁশের বাতা দিয়ে একটা বেঞ্চির মত করা আছে, তার ওপরেই বসে ভাবছিলাম। মনে হ'ল, আচ্ছা এই যে ঐশ্বর্যের কথা ভাবছি

এমনই কিছু তো পোকাদেরও থাকতে পারে। না হোক কোন কাব্য, সঙ্গীত তো থাকা সম্ভব। এই যে ঝিঁ ঝিঁ পোকা সর্বদা শব্দ করে, সব সময় ল্যাজ নাড়ছে ফিঙে, বা শিয়ালগুলো সন্ধে হ'লে ডাকতে থাকে অথবা মোরগ মাত্রেই ভোর হ'লে আকাশ লক্ষ করে সুর করে ডাকাডাকি, এর ভেতরে কি নেই কোন আনন্দের সন্ধান? অনভিপ্রেত যে কষ্ট সে তো জীবনে ব্যতিক্রম হিসেবেই চিহ্নিত, কারণ পৃথিবীর প্রাণরসকে যাতে ধরে রেখেছে তার নাম আনন্দ। নিখিল বিশ্বে যে সুরতরঙ্গ বয়ে চলেছে তা বিশ্বপ্রাণেরই অনুকূল বেগে, সেই প্রাণধারাকে অব্যাহত রাখবার আবেগে। সে আনন্দের স্রষ্টা যিনি তাঁর নাম প্রকৃতি। কখনো তিনি কালো কুচকুচে ফিঙের পাখায়, কখনো কোকিলের স্বরে, কখনো আকাশের রঙে কখনো বা কোন তুলসীদাসের দোহায়। এই জ্যোতির্ময় আনন্দস্বরূপ যে, তাঁর প্রকাশই তো মধুময় করে পৃথিবী। পোকামাকড়, কীট পতঙ্গ সবাই আপন হৃদয়ে সেই আনন্দস্বরূপের স্পর্শ পায় বলেই তো বেঁচে থাকে। রামসুখ তেওয়ারী হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, কি ভাবছ?

লক্ষ ক'রলাম তাকে নমস্কার জানানোর পর থেকেই সে আমাকে তুমি বলতে সুরু ক'রেছে। তা করুক। নাগরিক মানসিকতায় 'তুমি' 'আপনি'র তাৎপর্য আছে, আমাদের অরণ্য জীবন তার কিছুমাত্র মূল্য নেই। এখানে লঘুগুরু ভেদ বড় একটা নেই বললেই চলে। যেখানে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র বেঁচে থাকাই, যার অন্য আর কোন বিকল্প নাম নেই, সেখানে এই নাগরিক মানসিকতা অপরিচয়ে অপ্রচলিত। আমার আবার হঠাৎ এই চিন্তা এল কেন নিজেই ভেবে পেলাম না। পরক্ষণেই ঝেড়ে ফেলে মুছে দিলাম। জবাব দিলাম, ভাবছি তুমি কেমন ক'রে এখানে একা পড়ে আছ—। এভাবে থেকে কি লাভ?

লাভ কিছু নেই। —রামসুখ দাঁড়ি পাল্লায় ছাতু ওজন ক'রতে ক'রতে বলল, দেশে দুচার বিঘা জমি আছে আর দুবিঘা এবছর কিনেছি।—বুঝলাম ও লাভ বলতে অন্য কথা বুঝছে তাই বললাম, কি হবে জমি দিয়ে?

ছেলেপিলেরা খাবে কি?

তুমি তো একা এখানে পড়ে আছ। যে ছেলে বা সংসারের অস্তিত্ব কেবল স্মৃতি আর বিশ্বাস মাত্র সেই সংসারে কি কাজ মানুষের?

আমার কথা রামসুখ বুঝল না। বোঝবার জন্যে মাথাও ঘামাল না। সেই সময়েই একজন স্বভাষী লোক এসে কিছু খুচরো পয়সা দিতেই একটা খাতা খুলে বসল রামসুখ, বলল, আর দশপয়সা দাও।

লোকটা খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, আর বাবা কাল দেব।

নিমেষে যেন জ্বলে উঠল রামসুখ। বাবা বলাতেও কিছুমাত্র নরম না হয়ে বলল, সুদের পয়সা নিয়ে গোলমাল ক'রলে চলবে না। ওটা ঠিক ঠিক দিতে

হবে। আমি তো আগেই বলেছি সুদ ঠিক মত না দিলে টাকা দেব না।

লোকটি মিনতি ক'রে বলল, না বাবা এবার সময় মতই দেব।

বুঝলাম এব্যবসাও তেওয়ারীর আছে। কিন্তু এ কি জীবন? শুধুমাত্র পয়সার জন্যে! পয়সা মানুষের জীবনে যতটুকু কাজ করে তার চেয়ে জীবনের কাছে আদায় করে বেশী। সে জীবনের সমস্ত'প্রাণরস শোষণ ক'রে নেয়। একা নিভৃতে বিজনে একদিন মানুষ ক'রত ঈশ্বরের সাধনা—তপস্যা। এখন কি টাকা নিয়েছে ঈশ্বরের স্থান?

তুমি এত কি ভাবছ বলতো—রামসুখ প্রশ্ন ক'রল। এতক্ষণে তার কাছ থেকে লোকজন সব সরে গেছে। দোকানের ভেতরে সে বাইরেটায় আমি। তার সব আছে সে এসেছে সবাইকে যত্ন ক'রে গুছিয়ে রেখে, আমারও সব থাকার কথা আমি এসেছি সব বিলিয়ে দিয়ে। ও তো পেতে এসেছে, আমি কেন? সত্যিই তো কেন এখানে এসেছি আমি? কি জন্যে? জবাব পেলাম না। উদ্দেশ্যহীন এই আসা কিসের আশায়? আমার তো পেছনে নেই জমি কেনার তাগিদ, সামনে নেই বন কেটে নতুন বসত করার স্বপ্ন? তবে? তবে কেন? কেন এলাম?

জানিনা। আমারও তো ছিল মা বাবা ভাই বোন। আর অলকনন্দা—সে-ও তো প্রায় ছিল। কি জানি কেন সব মিলিয়ে কেমন বিশ্রী একটা অনুভূতি—এই জীবনটাই—দেখলে গা ঘিন্ ঘিন করে। আমি কি করি? এই রামসুখ তেওয়ারী নামের লোকটিকে দেখেও কি রকম বিরক্ত লাগছে আমার। বড়ই ঘৃণা হয়েছিল হরিনন্দন জিতেনবাবুদের দেখেও। কোথাও থাকা, তার জন্যে এত লোভের কি প্রয়োজন? রামসুখ আমার চিন্তাদূর ক'রতে চাইল তার ধারাণামত উপায়ে, বলল, ঠিকাদার কামেশ্বর সিং আমাদের দেশের লোক। খুব বড় লোক। ভূমি-হার। বহু লোক কাজ ক'রছে সব বন্দোবস্ত ওপরে আছে। কোন অসুবিধে নেই। আমি প্রতি সপ্তাহে এখান থেকে রেশন পাঠাই। চাল আটা ডাল। আসলে কোথায় যাব কার কাছে কি কাজে কিছুই জানি না, রেশনের গল্প শুনে কি ক'রব? কাজেই চুপ ক'রেই শুনতে লাগলাম শেষ পর্যন্ত লোকটি কি বলে।

সে বলতেই লাগল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে হাতি বাঘ সব জানোয়ার বন থেকে বেরিয়ে আসত। আশেপাশেই থাকত শুয়োর ভাম খাটাস। শিয়াল তো এখনও অজস্র, ওর তো কোন কথাই নেই। তবে অন্য জন্তু জানোয়ার এখন আর এই বসতির মধ্যে নেই, মেরে সব শেষ ক'রে দিয়েছে মানুষ। সংবাদটা সে বেশ গর্বের সঙ্গেই পরিবেশন ক'রল।

মারল কেন? আমি জানতে চাইলাম।

বাঃ সে অবাক হয়ে বলল, মারবে না? জানোয়ার মারবে না?

সে এমন ভাবেই বলল যেন বনের জন্তুদের মারা মানুষের অবশ্য কর্তব্যগুলোর

একটা। এ যেন এক অধিকারবোধের কথা। হত্যার অধিকার। এক জন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণীকে হত্যা করে শুধু তার প্রাণধারণের তাগিদে, যে প্রাণী অন্যপ্রাণীকে ভক্ষণ করে না হত্যাও সে করে না। মানুষ করে। মানুষ তার উদরের প্রয়োজন ছাড়াও হত্যা করে। তবে কি মানুষ আরও নিকৃষ্ট প্রাণী নয়? হিংস্র যে কোন জন্তুর চেয়ে নয় অপকৃষ্ট? আমি নিজের অসহায়তার জন্যে শুধু-মাত্র ব্যথিত হতে পারি। সেই ব্যথার চাপেই জানতে চাইলাম, এখানে আগে অনেক জানোয়ার ছিল?

রামসুখ বলল, ছিল কিনা জানিনা তবে সবইতো ছিল বন, বহু জানোয়ার এখানে মারা গেছে। আমার সামনেই একদিন সন্ধেবেলা একটা বিরাট ভালুককে রেঞ্জারবাবু গুলি ক'রে মারল। একজন বাঙ্গালী ছিল রেঞ্জারবাবুটা, সে যে কত জানোয়ার মেরেছিল তার ঠিকানা নেই। দু বছর এখানে ছিল—বলব কি এক গুলিকে হাতিও সাফ হয়ে যেত দেখেছি।

রামসুখ-এর কথাটির মধ্যে গর্বের ভাব ছিল প্রচ্ছন্ন ভাবে। তার সে গর্ব যে কারণে সেই কারণে আমি লজ্জিত হলাম। একজন মানুষ যে এক গুলিতে একটা হাতিকে পর্যন্ত মেরে ফেলতে পেরেছে এটা যেন একটা পরম বীরত্বের ব্যাপার, মানুষ হিসেবে রামসুখও তার অংশীদার। অথচ আমার লজ্জার কারণ নিরস্ত্র একটি প্রাণীকে বিনা কারণে অস্ত্রের সাহায্যে যে হত্যা ক'রছে প্রাণী হিসেবে আমি তার সমগোত্রীয়। আমাদের স্বার্থপর সমাজ নিজেদের জন্যে যে ব্যবস্থা ক'রেছে সেই আইনের রক্ষা ব্যবস্থা তো সব প্রাণীর জন্যে কই করে নি! কোন ব্যবস্থা করে নি যে বনের মধ্যে ঢুকে বনবাসী কোন প্রাণী হত্যা ক'রলেও হবে প্রাণদণ্ড।

জীবনলাল এসে আমার ভাবনাকে ফুটো ক'রে দিল। তার সঙ্গে জনা দশেক নেপালীর একটি বাহিনী। লোকগুলোর সারা অবয়বে দারিদ্র ফুটে বেরোচ্ছে। জীর্ণ পোষাক, ক্লিষ্ট চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে ওরা আসছে।

কি ব্যবস্থা আছে জানিনা রামসুখ দেখা মাত্র গুণে নিল লোকগুলোকে, আর সকলের হাতে কিছুটা ক'রে ছাতু, গুড়, লংকা দিয়ে একটা ঘটি ধরিয়ে দিয়ে সামনে জলের জায়গা দেখিয়ে দিল। লোকগুলো সারা মুখমণ্ডলে অনাহার ফুটে বেরোচ্ছিল। তারাও কিছুমাত্র শব্দ না ক'রে ঘটি ক'রে জল নিয়ে সারি দিয়ে বসে পড়ল ছাতু মেখে খেতে। অনেকেই লক্ষ ক'রলাম অনভ্যস্ত হাতে জড়িয়ে জড়িয়ে কোন রকম ক'রে মাখছে। একজন শুকনো ছাতুই মুখে দিয়ে দম আটকে মরে আর কি। স্বভাষায় তাকে অনেক কটু কথা বলে বকঝকা ক'রল জীবনলাল যার বিন্দুমাত্র সে বুঝল কিনা সন্দেহ। তবে ভাষা না বুঝলেও ভাব যে অনেক সময় বোঝা যায় এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পক্ষে তা যে যথেষ্ট কাজ করে তারই—

প্রমাণ পেয়েছিলাম আমি দিন তিনেক পরে। জীবনলালেরা না বুঝে যা করে তার ফল ভোগ ক'রতে হয় অনেক সময় গোটা জাতিকে বা একটা সম্প্রদায়কেই। আমাকে জীবনলাল বলল, এই লোকগুলো আপনার সঙ্গে যাবে। এরাও কাজ ক'রবে। চুপচাপই শুনলাম। মনের মধ্যে প্রশ্ন এল, যাবটা কোথায়?—সে প্রশ্ন বাদ দিয়ে জানতে চাইলাম, আপনি যাবেন না?

চট করে জবাব দিতে গিয়ে দেখলাম থমকে গেল সে, পরেই বলল, আরও কতগুলো লোক পাবার কথা আছে। তারা এসে গেলে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

কখন রওনা হবো আমরা? জানতে চাইলাম।

রাতটা এখানেই থাকুন, ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়বেন। রাতেই ট্রাক এসে পড়বে।

কোন দিকে যাব? উত্তর দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বলল, ওই দিকে। পাকা রাস্তা আছে তর তর ক'রে চলে যাবেন।

দূর কত, কি বৃত্তান্ত কিছুই আমি জানতে চাইলাম না চরিত্রগত অদূরদর্শিতার জন্যে। তাছাড়া কোন পূর্ব চিন্তা আমি ইচ্ছা করেই ক'রতে চাইনা। পূর্বচিন্তা বাধার সৃষ্টি করে।

জীবনলাল দেখলাম বেশ উদার প্রকৃতির মানুষ। বলল, চলুন এ জায়গাটা ঘুরে আসি। দেখিয়ে আনি আপনাকে। আপনার গাঁট্রি বোঁচকা এখানেই থাক। কোন চিন্তা নেই।

আমি চট ক'রে জবাব দিলাম, চিন্তা থাকলে কি মশাই আপনার সঙ্গে আসি?

কেন, কেন? —আমার কথাটাকে মর্যাদার প্রশ্নে ধরে নিল জীবনলাল। আমি হালকা ভাবেই বললাম, একবারও আমাকে জিজ্ঞেস ক'রতে দেখেছেন কোথায় যাচ্ছি, কি কাজে যাচ্ছি—

জীবনলাল খুব অমায়িক হেসে বলল, তা ঠিক। আমি ভাবলাম আপনি বোধহয় রাগ ক'রে বললেন। আমি বুঝি খারাপ কিছু করেছি।

না মশাই ওই ভাল খারাপ সম্বন্ধেও আমার স্পষ্ট কোন ধারণা নেই।

জীবনলাল এবার সরাসরি আমার মুখের দিকে চাইল। সে যেন তার দৃষ্টি খুব সরু ক'রে আমার ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রল যেভাবে ছুঁচ ঢোকানো হয়। আমি গ্রামের হাটে ফটো তোলানোর মত ক'রে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে আমাকে কয়েক মুহূর্ত ইচ্ছে মত নিরীক্ষণ ক'রল তারপর বলল, চলুন। ছোট্ট স্টেশনটার পাশেই তেওয়ারীর দোকান ছেড়ে আর মাত্র বিশ বাইশটা দোকান। কাঠের ঘরে হরেক রকম জিনিষ সাজিয়ে যারা বসে আছে তাদের একজনের সামনে দাঁড়িয়ে জীবন বলল, পাল মশাই, কিছু খবর আছে?

দোকানদার বলল, ভিতরে আসেন! দোকানের ভেতরটা অন্ধকার অন্ধকার। জীবন সেই আবছা আলোর দোকানে ঢুকে গেল। দু চারটে কথা বলেই বেরিয়ে

এসে বলল, এই যত দোকান এখানে দেখছেন সব আমাদের জানাশোনা লোকের। বাঙ্গালী। নেপালী দোকানদার যে ক'টা আছে তাদের ওই ওদের মত খাবার আর পানশালা। ঢাকা জেলার এক দেবনাথের হোটেলও চোখে পড়ল যেখানে গরম ভাত আর টাটকা মাছের রসাল সমারোহ। অমন পরিপাটি খাবার ব্যবস্থা ছেড়েও আমরা এগিয়ে গেলাম। যেখানে বাজারের শেষ, একটা বিরাট শিমুলের নিচে সেইখানে একটা মানুষের মাথার সমান উঁচু একটা অস্থায়ী খড়ের চালার সামনে এসে জীবন থামল। শিমুল গাছটার গোড়ায় একটা ছোট্ট মাচার ওপর খালি গায়ে একজন প্রৌঢ় বসেছিলেন। জীবন লাল তাঁকেই বলল, খুড়া মশাই আমাগো দুগা ভাত দ্যান।

আসেন আসেন। বইসা পড়েন—আহবান জানালেন সেই প্রৌঢ়।

অমন দরাজ আহবানে আমার কোন ভরসা হ'ল না। চারপাশে তাকিয়ে দেখে অনুমান করতে চেষ্টা করলাম কোন স্থানটিতে বসবার জন্যে এই উদার আহবান। কোন হদিস মিলল না। ছোট্ট সেই চালাটির স্বল্প পরিসরের মধ্যেই কি খাবার আয়োজন? না হ'লে আর কোথায় হবে? আমার জীবনলালের নির্বাচনের জন্যে খারাপই লাগছিল। অচিরেই জীবনকে জিজ্ঞেস ক'রতে শুনলাম, খুড়া মশায় আপনের জমিনে কি বুনছেন?

প্রৌঢ় লোকটি এবার সরাসরি জীবনের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ তুলে তাকানোতে আমি অনুভব ক'রলাম দৃষ্টিতে কি অসীম ক্লান্তি। তিনি জানালেন, আমাগো গ্রামের কয় ঘর চাষী আইয়া পড়ছে। তারাই কইলো কি কর্তা পাট লাগাই। তারাই অখন পাট বুনছে। দেখি এই দ্যাশে পাট কেমুন হয়। পরাইন্যা তো কইতাছে পাট হইবো।

জীবন জানাল, আজকাল তো দেখতাছি আমাগো দ্যাশের চাষীরা আইসা হগল জমিনে পাট বুতনছে। কয় সন তো পাট ভালই হইছে।

আইজকাল ক্যান বরাবরই তো আমাগো ওই দেশের চাষীরা আইয়া পাটের মরসুমে কাম কইবা যায়। এ তো চিরদিন চলতে আছে। তুমি শেন না জানতে পার ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, আর সিলেইট্টা চাষী গো অর্ধেক তো এই আসামে কাম কইরাই বাইচা থাকে।

জীবনলাল শুধু একা নয় আমিও শুনলাম। জানলাম। পরমুহূর্তেই জীবনকে বলতে শুনলাম, বাইরেই খামু।

দেখলাম একটি যুবক দুটো পথ পাতা হাতে ক'রে আমার পেছনটায় দাঁড়িয়ে। চট ক'রে সে গিয়ে পাতা দুটো এমন এক জায়গায় পাতল যেখানটা, এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, খুব পরিস্কার ক'রে নিকোনো। সিমেণ্টে তৈরীর মত ঝকঝক ক'রছে। বসবার জন্যে দুটো চাটাই এর আসনও এল। আমরা খেতে বসলাম। খেয়ে

বিরূপতা কেটে গেল। মনে হ'ল জীবনে এমন স্বাদু খাবার খাইনি। কেন যে কথাটা মনে হ'ল জানি না। হতে পারে সত্যিই পাচকের হাতের বিশেষ গুণ ছিল নইলে এও হতে পারে দীর্ঘকাল নানা জায়গায় কখনও খেয়ে কখনও না খেতে পেয়ে আমার জিব যে রসনাকে ভুলতে বসেছিল স্বদেশী মানুষের রান্নায় সেই স্বাদের পুনরাবর্তন ঘটার তৃপ্তিই আমাকে অমৃত স্বাদের সন্ধান দিল। জীবন লালই পয়সা দিল। দু চারটে কথা আরও বলল তার খুড়া মশাইকে। অনেক লোকের কথা জিজ্ঞাসাও ক'রল যার কোন সূত্রে আমার সন্ধানে ছিল না। যখন চলে আসছি খুড়া মশাই আমাকে কি ভেবে যেন দুঃখ প্রকাশ ক'রলেন। কোন ভূমিকা না ক'রেই বললেন, কখনও কোনদিন যে মুখের খাবার বিক্রি ক'রতে হবে নিজের পরিবার পরিজনের পেট চালাতে একথা জীবনে কোনদিন কি ভেবেছি ?

আমি অনুভব ক'রলাম কথাটা তাঁর অন্তরের। তাই সান্তনা দেবার জন্যে বললাম, তাতে কি ? এই আপনি আছেন বলে না খাবারটা ক্ষিধের সময় পাওয়া যাচ্ছে !

উনি প্রত্যুত্তর ক'রলেন না। অন্য কোন কথাও বললেন না। যেমন অভিব্যক্তি হীন মুখে এতাবৎ বসে ছিলেন তেমনি ভাবলেশহীন রইলেন।

অসংখ্য মশার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রতে ক'রতেই ব্যস্ত রাত কোনক্রমে কাটল। মাঝে গভীর রাতে আচ্ছন্নতার মধ্যেই একবার মোটরের গর্জনও কানে এসেছিল, প্রত্যুষে সেই গর্জনই ভাঙ্গাল অপরিণত নিদ্রা। উঠে বসলাম। স্মৃতি তন্দ্রার মধ্যেও জাগ্রত ছিল। মনে পড়ে গেল সূর্য ওঠার আগেই আমাদের যাত্রা সুরু হবে উত্তরাপথে। কোন এক বিজনে খালাকটাং নামে চিহ্নিত স্থানে আমাদের লক্ষ্য। আমার সেই জায়গা সম্পর্কে আবছা কোন ধারণামাত্র ছিল না। সেই জায়গা সম্পর্কে কোন কল্পনা করার মত আভাসও পেতে চাইনি কারও কাছে প্রশ্ন করে। ব্যাপারটা যখন কোথাও একটা যাওয়া তখন জায়গাটা যেমনই হোক জিজ্ঞাসা অমূলক।

আমার ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি রামসুখ সামনে দাঁড়িয়ে। জীবনলালের খোঁজ ক'রতে জানাল, আছে কোথাও। এসে পড়বে। —সে আদৌ গুরুত্ব দিল না।

দেখলাম দোকানের সামনে একটা জীর্ণ লরী দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপরে চড়ে বসল সেই নেপালী দিন মজুরের দল। আমিও চালকের পাশের শূন্য আসনে চেপে বসলাম রামসুখের নির্দেশে। কিন্তু যে চালাবে তারই তো দেখা নেই আমরা গাড়ীতে উঠে বসলে কি হবে ? আমাদের কোন ব্যস্ততা নেই দেখে সকলের হয়ে যেন ব্যাস্ত হয়ে পড়ল রামসুখ তেওয়ারী একা। দোকানে বসেই এক স্থানীয় নেপালীকে কি যেন নির্দেশ দিয়ে কোথায় পাঠাল। সে ঘুরে এসে কি একটা বলতেই আবার কি একটা বলল। আবার গেল লোকটি। কিছুক্ষণ বাদে জীবন

লাল কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হ'ল। নিজের মাতৃভাষাতেই জানতে চাইল, নরবাহাদুর আসে নাই।

রামসুখ বেশ ব্যস্ততা প্রকাশ ক'রে বলল, কাঁহা আসলো?

ইস এত বেলা হয়ে গেল—আপন মনেই বলে উঠল জীবন লাল। তারপর যে নেপালী লোকটা তাকে খুঁজতে গিয়েছিল তাকেই নেপালী ভাষায় কি যেন বলল। লোকটির জবাব আমি বুঝতে পারলাম না। তবে বুঝলাম যে জবাব শুনে জীবন সন্তুষ্ট হতে পারল না সে বেশ উত্তেজিত হয়ে কি সব বলে কোথায় যেন পাঠাল তাকে। আমার সামনে এসে যেন কৈফিয়তের সুরে বলল, এইসব জংলী নিয়ে হয়েছে যত বিপদ। কাল রাতে ব্যাটা সিরিঙ্গলামার দোকানেই শুয়েছে নিশ্চয়। ওখানে খেলে নেশার আর মাত্রা থাকে না। যেমন সিরিঙ্গলামা তেমনি তার বউটি।

ওরা কি? —আমি জানতে চাইলাম।

সেইটেই আপনাকে দেখানো হ'ল না। গেলেই খরচা মশাই তাছাড়া ওসব ভুটিয়া আপং খাওয়া যদি আপনার অভ্যেস না থাকে তো সহ্য ক'রতে পারবেন না। গাড়ীর বাঁ দিকের দরজা খুলে মাটিতে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল জীবন, আমাকে বলল, নব বাহাদুরের আসতে এখনো দেরী আছে মশাই। নেমে আসুন।

আমিও বাঁচলাম। সামনা সামনি হতেই জীবন জানাল, নেপালীদের সরাইখানায় খাবেন এক রকম, ভুটিয়াদের মাল আলাদা। তার মধ্যে আবার ওই হারামী সিরিঙ্গলামারটা আরও বিপদজনক। রাতে যদি খাবেন তো পরের রাতেও নেশা ছাড়বে না।

তাহ'লে ড্রাইভার গাড়ী চালাবে কি ক'রে—আমি শংকিত হ'লাম।

সে জন্যে মোটেই ভাববেন না। এই নরবাহাদুর—ও মশাই বোধহয় মোটর গাড়ীর স্টিয়ারিং হাতে নিয়েই জন্মেছে। আর ওই স্টিয়ারিং হাতে নিয়েই মরবে।

যে লোকটাকেই এখনো চোখে দেখিনি তার জন্ম দেখতে পাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু স্টিয়ারিং হাতে যে তার মৃত্যু হওয়া খুবই সম্ভব সে অনুমান জীবন এর কথা অনুসারেই ক'রতে পারছি। তবে আমি সে মৃত্যুটিও দেখতে চাই না। কারণ আজকের দিনটিতে যেন সেই মৃত্যু না হয়। কথাটা জীবন লালকে বুঝিয়ে বলতে সে আমার স্বাভাবিক ভয় লক্ষ্য ক'রে নিজের কথার ভুল ধরে ফেলল। আমাকে আশ্বস্ত করবার জন্যেই তাড়াতাড়ি বলল, না না সে ভয় আদৌ নেই। স্টিয়ারিং-এ হাত দিলে ওর আর নেশা-টেশা থাকে না।

না থাকলেই ভাল, আমি ভাবলাম কিন্তু ভরসা কিছুতেই হচ্ছিল না। শেষ কালে মাতালের গাড়ীতে চেপে প্রাণটা খোয়াব। ভাবলাম জীবনকে বলে দিই এ কাজ আমি ক'রব না, চললাম। মুখ দিয়ে বেরালো না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একজন নেপালী লোককে আর দুজন লোক দুদিক থেকে ধরে নিয়ে আসছে। সে যেন কোন ক্রমে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা ক'রছে ওই দুজনের সাহায্যে। ওই দুজনের একজনকে চিনলাম জীবনের পাঠানো সেই লোকটি, অপরজন অতি ময়লা জীর্ণ পোষাক পরা। ওদের দিকে নজর যেতেই জীবন বলল, ওই ব্যাটা আসছে। কেমন নবাবের মত আসছে দেখুন—

দৃশ্য যে দেখার মত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অমন দৃশ্য দেখেও আমার হৃদয়ে কোন পুলক হল না বরং ভয় হ'ল আজ মৃত্যু অবধারিত বলে। আমি প্রত্যক্ষ দেখলাম স্বয়ং মৃত্যু ড্রাইভার সেজে আমাদের সকলকে লরী চালিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। আমি যে কিছু বলব তা ভুলে গেলাম। বরং লোকটার রঙ্গ দেখতে লাগলাম। দুটো পা যার ঠিক মত মাটিতে পড়ছে না সেই লোক কি ক'রে গাড়ী চালাবে? গাড়ীর ব্রেক তো পায়ে টিপতে হয় ব্রেক টিপতে যদি য়্যাকসিলেটারে চাপ দিয়ে বসে তাহ'লে কত বেগে গিয়ে যে অস্থানে ধাক্কা খাব সে গবেষণাটা আমার মনে হ'ল আমি এখন স্বচ্ছন্দেই ক'রতে পারি। অন্য যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখলাম তারা নিশ্চিন্ত। যে যেমন ছিল তেমনই বসে আছে নিশ্চিন্ত ভাবে। দেখলাম এর মধ্যে আমি যদি ভয় প্রকাশ ক'রে ফেলি তাহলে সেটা— লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই সেই রসিক ব্যক্তিটির আগমণের এবং পরবর্তী ঘটনার জন্যে প্রতীক্ষিত হয়ে রইলাম।

গাড়ীর কাছে এসেই লোকটি একটা হুংকার দিয়ে কি যেন বলল আপন ভাষায় তারপরই পাখিরা যেমন ক'রে গা ঝাড়ে তেমনি ক'রে নিজের গা ঝাড়া দিয়ে নিল একবার বিপুল বেগে। নিজের প্রায়বন্ধ চোখ দুটোকে জোর ক'রে খুলে খোলা দৃষ্টিতে দেখে নিল উপস্থিত সকলকে, যেন একবার সে সব কিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বেশ আয়াসে উঠে বসল চালকের আসনে। লক্ষ্য ক'রলাম কেউ তাকে একটি কথাও বলল না। সে-ই কেবল সকলের উদ্দেশ্যেই একবার কি যেন বলে উঠেছিল হুংকার দিয়ে। আমিও বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে উঠে তার পাশে বসলাম—যাকে কোনদিন দেখিনি, যার সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানিনা তারই সঙ্গে সহমরণে চললাম বলে মনে ক'রে নিলাম সেই যাত্রার মুহূর্তে।

ভরসা করবার মত ছিল কেবল গাড়ীটা। ওটাই বোধহয় বিশ্বের প্রথম তৈরী লরী। তার চেহারা দেখে ভরসা হয়েছিল চূড়ান্ত দৌড়েও সে কোনসময় বলদটানা গাড়ীকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে যতই য়্যাকসেলে চাপ দিক মাতাল চালক ধাক্কার জোর খুব বেশী একটা হবে না। হয়ত প্রাণরক্ষা হয়ে যেতেও পারে। আমি গাড়ীতে উঠে বসতেই আমাকে একবার সরাসরি দেখে নিল নরবাহাদুর। তার

ছোটছোট চোখ দেখে মনোভাব বুঝলাম না। ব্যস সেই একটিবার মাত্র আমাকে দেখে নিয়েই আপন ভাষায় কি বলে যেন চেঁচিয়ে উঠল। শুনলাম তেমনি আমার না জানা ভাষায় অন্য কিছু বলে চেঁচিয়ে উঠল আমার পেছন থেকে অর্থাৎ লরীর পিঠ থেকে অন্য কে একজন। ভাষা না বুঝলেও এ যে প্রশ্ন এবং উত্তর তা বুঝলাম। উত্তর পেয়ে আবার কি একটা প্রশ্ন ক'রল নরবাহাদুর। আবার এল অদৃশ্য কণ্ঠের উত্তর। নরবাহাদুর তার ইতিহাস বইএর ছবি থেকে জ্যান্ত হয়ে আসা গাড়ীর ইঞ্জিনের পেছনে লাগল।

গাড়ীর ইঞ্জিনে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধের ঘুংড়ি কাশির মত শব্দ উঠল দুচারবার তারপরই যেন লাফ দিয়ে এগিয়ে চলল গাড়ীটা। প্রথমেই এক লাফ। সমস্ত শরীরটা ভীষণ রকম দুলে উঠল, ভাবলাম যাঃ। দৌড়োতে তাহ'লে আর বোধহয় হ'ল না। যা হোক মৃত্যুটা লোকলয়েই হচ্ছে। কিন্তু না, পরেই অনুভব ক'রলাম আমরা চলছি। গাড়ী তো এর আগেও চড়েছি এমন লাফ দিয়ে চলতে সুরু করা কই স্মৃতিতে তো নেই! গাড়ীও কি তাহ'লে দেশাচার অনুসারে চলে? এখানে কি সবই এমনি অদ্ভুত!

দু পাশে চা বাগান। তার মধ্যে দিয়ে বাঁধানো পথে গাড়ী তার মত চলছে। চা গাছের সারিগুলোর মাঝে মাঝে সুবিশাল ছায়াতরু। শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পিতা পথ চললে যেমন দেখায় তেমনই দেখতে লাগছে আমার চোখে। বিশাল বৃক্ষের পাশে পাশে অসংখ্য ছোট চা গাছ সাজানো, ছাঁটাই ক'রে রাখা। অথবা কোন শিশু শিক্ষালয়ে যেন শিক্ষিকার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ছাত্রশিশুরা, একসময় তেমনই মনে হলো চা বাগানগুলোকে।

বিশ্বজুড়েই প্রকৃতির এই বিধান। বড় ছোটকে রক্ষা ক'রবে এই বুঝি তার ধর্ম। সে দেবে ছায়া, সে দেবে মায়া, সে দেবে আচ্ছাদন। বড় হবে আশ্রয়। তাই মহীরুহেরা মহৎ। ভাবতে ভাবতে দু পাশের চা-বাগান ফুরিয়ে গেল। নরবাহাদুর সামনে ছাড়া আর কোনদিকে চাইছে না। একমনে গাড়ী চালাচ্ছে যেন নেশায় বুঁদ হয়ে। দু পাশে গাছ পালা ঝোপ ঝাড়; রাস্তা থেকে একটু দূরেই দুপাশে জঙ্গল। দু একটা বড় গাছ যেন সেই বন থেকে ছিটকে পালিয়ে এসেছে দৌড়ে, রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ী দেখবে বলে। আবার একবার নরবাহাদুরকে দেখে নিলাম আপন খেয়ালে সে গাড়ী চালাচ্ছে। ওকে দেখে বিস্ময় জাগছে আমার জীবনের কি গতি! তৃপ্তি খুঁজতে কি সে সিরিঙ্গ লামার দোকানে গিয়ে ডুব দিয়েছিল? না কি নেশায়? নেশা কি? সে কি শুধু মাত্র আকর্ষণ? তীব্র, তীক্ষ্ণ, অদম্য আকর্ষণেরই কি নাম তবে নেশা? আমি এই আবর্ষণ নামক ব্যাপারটির কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। এটা কি এবং কেন সেই প্রশ্ন বিশাল রহস্যের মত আমার সারা মন জুড়ে বসে রইল। এই লোকটা

যখন একজন গাড়ী চালক তখন সে তো সম্পূর্ণই একজন চালক—নিপুণ এবং ত্রুটিহীন। যখন সে সংসারের কর্তা হয়ত তখনও নিখুঁত। অসম্পূর্ণতা তাহ'লে কোথায়? এই আকর্ষণ তার কি পূরণ করে? এ যদি নেহাৎ অভ্যাস হয় তাহ'লে এ অভ্যাস তাকে দাসত্ব ছাড়া কি দিচ্ছে আর? আমার নানা রকম স্বগত প্রশ্নের মধ্যে হঠাৎ গাড়ীটা থেমে গেল। চলতে যেমন ঝাঁকুনি লেগেছিল থামতেও লাগল প্রায় তেমনি।

আচমকা ঝাঁকুনিতে ছিঁড়ে গেল চিন্তার জাল চেয়ে দেখলাম জলাজংলা আর বনভূমির মধ্যে কয়েকটা ঘর। অল্প একটু দূরেই বনের পটভূমিকায় সবুজ রঙের টিনের চালা সবুজ টিনের দেওয়াল অসংখ্য ঘর সারিবন্দী, সাজানো, সুশৃঙ্খল। দেখে বুঝলাম সৈন্যদের দপ্তর, ঘাঁটি। রাস্তার ধারে দেখলাম ছোট ছোট সিমেণ্ট-এর খুঁটি তৈরী করে ফৌজী সংকেত আঁকা। গাড়ী বন্ধ করে নরবাহাদুর নামল। সামনে একজন অস্ত্রধারী সৈনিক পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল পথের ধারে তার কাছে গিয়ে কি একটা কাগজ দেখিয়ে কি বোঝাতে চাইল। সেই পাথরের মূর্তিটা চুলমাত্র নড়ল না। নরবাহাদুর সরে এসে পথের ধারের একটা ছোট দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চিতে বসল। গাড়ীর পিঠ থেকে এক দুজন লোক নেমে এপাশে ও পাশে রাস্তার ধারে বসে পড়ল। আমি ভাবলাম কি করি, এখানে এমন একজনকেও পাওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না আমি যার কথা বুঝব বা আমার কথা যাকে বোঝাতে পারব। বৃথা পদচারণার কোনই ইচ্ছা নেই। তবু নামলাম। অল্প কয়েকটা দোকান। সবই কাঠের ঘর, কাঠেরই ছাউনি। এখানে উপকরণ তো আর কিছু নেই। বনের গাছ কেটে নিয়ে কাজে লাগানোর অভিজ্ঞতা মানুষের অনেকদিনের। গাছ চিনে ব্যবহার ক'রতে শিখেছে সেই আদিম কালের অভ্যাস থেকেই। এখনও ক'রে আসছে। দোকানগুলো সবই ভুটিয়াদের। মেয়েরাই পরিচালক। চা, একরকম গোল পাউরুটি এই তাদের সওদা। একটা দোকানে দেখলাম সামান্য কিছু আনাজ তরকারি দুচারটে পাকা কলাও ঝোলানো আছে। এক পাশের একটা দোকানে দেখলাম জাফরাণ গাদা ক'রে রাখা আছে। দোকানটারও একটু ব্যতিক্রম আছে। দোকানী ভুটিয়া নয়। আমি কৌতূহল বশত দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। দোকানদার আমার দিকে একবার তাকাল। তার দৃষ্টিতে কোন ঔৎসুক্য বা আগ্রহ ছিল না। আমার ধারণা হ'ল লোকটি আমার স্বভাষী। এই বিভুঁয়ে একটা কথা বলতে পাবার জন্যে গভীর উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলাম। সে যে কি আকুতি যার প্রকাশ সম্ভব নয়। আমি তীর্থের কাকের মত দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে লোকটার গতি লক্ষ্য ক'রছি এমন সময় একটি লোক এসে দোকানে ঢুকে কি যেন বলতেই আমার লক্ষ্যের লোকটি বাংলায় বলে উঠল, নরবাহাদুরকে বল ফেরবার সময় যেন নিয়ে যায়। —

কথা ক'টি সে পূর্ববঙ্গীয় কোন জেলার আঞ্চলিক টানে বলল। আমি সেই শব্দ ক'টি শুনে যেন পরম পরিতৃপ্তিতে রোমাঞ্চিত হ'লাম। তাড়াতাড়ি বললাম, আপনারা কি এইখানেই থাকেন ?

এই প্রশ্ন দোকানী কোনদিন বোধহয় শোনে নি, শুনতে হবে এমন সম্ভাবনাও ছিল না বলেই হয়ত কয়েকটি নিমেষ নিঃশব্দে আমার মুখ চোখের ওপর দৃষ্টিপাত ক'রে রইল। তারপর বলল, কেন বলুন তো ?

আমি এই দেশে নতুন তো! এই প্রথম এলাম। জায়গাটার নামও জানি না।

লোকটির চোখের জিজ্ঞাসায় যে রুক্ষতা ছিল কিঞ্চিৎ কমল। সে জানাল, আমরা এই দেশে বহুদিন আছি। আমার বাবা রাঙ্গাপাড়ায় সেই ছোটবেলায় দোকান ক'রেছিলেন। রাঙ্গাপাড়ায় তখন মাত্র দুইখানা দোকান। আমি এইখানে দোকান ক'রেছি তাও বছর তিন হয়।

থাকেন কোথায় ?

এই তো পিছনের ঘরে! আমার নাম সূর্য বণিক। —কথা ক'টি বলেই সূর্য বণিক দোকান ঘরের পেছনের দরজা ঠেলে সেই যে অদৃশ্য হ'ল আর তার দেখাই পেলাম না। যে লোকটি পরে ঢুকেছিল, তাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব সেই মুহূর্তে বিকট জোরে ভ্যাঁপু বেজে উঠল আমাদের স্বর্গরথের। স্বর্গ যাত্রায় আমার কোন তাড়া ছিল না তবু সেটা আমোঘ বলেই যেতে হ'ল। যে পরিণতির ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম থাকে না সেই অলঙ্ঘ্যের দিকে আমরা যে চলেছি সে বিষযে স্বরু থেকেই আমার কোন সংশয় ছিল না। আমি চড়বার অপেক্ষাতেই গাড়ী ছাড়া হচ্ছিল না। গাড়ীটা চলতে স্বরু ক'রতেই আমার মনে হ'ল আমাদের স্বর্গ যাত্রা নিশ্চিত হলেও এই যে ব্যাটা সারথি আমাদের পেঁছে দেবার জন্যে আবির্ভূত হয়েছে এব্যাটাকে দরজা থেকেই ফিরতে হবে। স্বর্গে ঢোকা এর মত পাপীর পক্ষে সম্ভব হওয়া উচিত বলে যীশু খ্রীষ্টও বলতে পারেন নি। পাপীর তো অনুশোচনা থাকা সম্ভব এই মহাপাপীর তো সেসব বালাই নেই। ওর ঘোলাটে লাল চোখে গভীর ঘুমের ছায়া। সেই ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই তার এই দুরন্ত পথযাত্রা। সাহসে মূর্খদের একাচ্ছত্র অধিকার জানতাম, আজ দেখলাম নেশাগ্রস্থেরও।

আমি বাস্তব অবস্থা ভুলতে চাইলাম। দুধারেই দৃশ্য এক, আমি যথাসম্ভব বাঁ দিকে দৃষ্টি আটকে রাখতে চেষ্টা ক'রলাম। এদিকটা ঘন অরণ্য। বোঝা যাচ্ছে এই পথটি এই ঘন অরণ্যের বিভাজক রেখার মত। দুপাশে অচেনা গাছগুলোর মধ্যে ভিড় ক'রে আছে অসংখ্য জাফরাণ, পিপুল আর আমলকী। আর একটু দূরে দেখলাম বিশাল হরিতকীর সারি কে যেন রেখেছে সাজিয়ে। আর যারা, সেই সব মহীরুহদের প্রায় সকলের নামই আমার অজানা। চলতি

গাড়ীর যাত্রী হিসেবে সবই আমার চোখে একাকার হয়ে যায়, পাতলা মোটা, হালকা ভারী কারও থাকে না কোন পৃথক পরিচয়। একইদৃশ্য দেখতে দেখতে একঘেয়েমী এসে গেছে এমনি সময় চমকে উঠলাম। আমাদের সামনে, সোজা পথ দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সেই দৃষ্টি সীমানার মধ্যেই সামান্য কিছুটা দূরে বানরের মত একরকম কয়েকটি প্রাণী দৌড়ে রাস্তার একদিক থেকে আর এক দিকে চলে গেল। তারা যে সম্পূর্ণভাবেই চারপায়ে চলছে তাও নয়, অনেকটা দুপায়ে এবং অনেকটা চারপায়ে—বিচিত্র ভঙ্গীতে ছুটে চলে গেল তারা। চোখের পলকে মিলিয়ে গেল বনের মধ্যে। গাড়ীটা যখন সেইখানে এসে পড়ল তাদের চিহ্নমাত্র নেই। যে দিকটায় তারা চলে গেল সেদিকে ব্যতিক্রমহীন নির্জনতা। গাছপাতা ঝোপঝাড় সমান নিথর। শুধু আমাদের যানটির শব্দ ছাড়া স্তব্ধতা চ্যুতিহীন।

ওই এক পলকে দেখা প্রাণীগুলো আমাকে অনুচিন্তায় ব্যস্ত ক'রে তুলল। যে বানর আমরা সচরাচর দেখি অর্থাৎ যে প্রাণীদের আমরা চিহ্নিত ক'রে বানর বলে নামকরণ ক'রেছি এবং তাদেরই অন্য যে শ্রেণীকে আমরা বলে আসছি হনুমান সেই দু শ্রেণী থেকে এরা পৃথক। অন্য কিছু। ওই গোত্রের বটে তবু পার্থক্য আছে। দুপাশের গাছে অনুসন্ধান ক'রতে ক'রতে চললাম যদি চোখে পড়ে—। আর পড়ল না। বহু জাফরাণ, হরিতকী, খোকন, শিমুল, ছাতিম পেছনে পড়ল, বহু নাম না জানা গাছ প্রতিমুহূর্তের দৃষ্টিতে ফুটে উঠে পিছিয়ে যেতে লাগল। আমরা চলছি। খুব কৌতূহলেও প্রশ্ন ক'রতে পারছি না, না জানার অন্ধকারে মূর্খের পরিতৃপ্তিতে পড়ে থাকছি ভাষান্তরের ভাবনায়। নরবাহাদুর আমার কথা বিন্দুমাত্র বুঝবে না, ও কিছু বললে আমাকেও অসহায় ভাবে চেয়ে থাকতে হবে ওর মুখের দিকে। তাছাড়া নরবাহাদুর এখন মানসিকতার কোন বিন্দুতে আছে জানিনা বলেই আতংক আমার অধিক। কি বললে কি জবাব কি তার ঠিকানা; যেচে অসম্মানকে আমার চিরকালই অপছন্দ। একময় বিপুল পিপুলের সারি শেষ হ'ল। দুপাশে সরে গেল বন। পথ থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল কৌতূহলী ভীরু শিশুর মত। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে যেন দেখছে পথটাকে। অথচ নানা রকম ফসলের সম্ভারে পথের দুধার হযে আছে শোভাময়। জনপদের দিশা। অনুমিত হ'ল লোকালয় নিকটবর্তী।

অনেকক্ষণ ধরেই দেখা যাচ্ছিল ঘন বর্ণের বিশাল অতি উঁচু অরণ্য। মনে হচ্ছিল মহীরুহেরা সব অদৃশ্য কোনও পথ বেয়ে আকাশ ছুঁতে চলেছে। অথবা কল্পিত স্বর্গারোহণের পথে চলেছে জীবন্ত ওই বৃক্ষরাজি তাদের অর্জিত পুণ্যের অতুল ঐশ্বর্য সহযোগে। সেই স্বর্গ গামিনী সোপান লক্ষ্য ক'রেই যেন আমরা চলেছি। ক্রমাগত সমীপবর্তী হচ্ছিল সেই অরণ্য আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী। আমরা তার একেবারে পাদদেশে এসে থামলাম। সূর্য তার মহানেত্রের রশ্মি ডানদিক দিয়ে

চালকের আসনের ভেতরে পাঠাল বুঝি কোন তত্ত্ব-তল্লাসীরই অভিলাষে। তাপ সহ্য ক'রতে না পেরেই যেন নরবাহাদুর লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। গাড়ীর সব যাত্রীই আমার পাশ দিয়ে হুড়মুড় করে নামতে লাগল। সব শেষে আমিও নামলাম।

স্থানীয় একজন নেপালী লোক দেখলাম গাড়ীর যাত্রীদের স্বভাষায় কি যেন জিজ্ঞাসা করছে। তার নির্দেশমত সব লোক এক জায়গায় জড় হ'তে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমাকে প্রথমেই নেপালী ভাষায় অনেকটা স্বগতোক্তির মত ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'রল, তুমি বাঙ্গালী মানুষ ?

আমি যেন অনেকটাই তার কথা বুঝলাম কিন্তু জবাব দেবার ভাষা জানিনা বলে চুপ করে আছি এমনি সময় সে ভাঙ্গা বাংলায় বলল, আপনি বাঙ্গালী ?

আমি শ্বাস ছাড়বার তৃপ্তিতে বললাম, হ্যাঁ।

আমির নাম শ্যাম বাহাদুর ছেত্রী বাংলাতেই বাড়ী। দার্জিলিং।

আমি খুব খুশী হবার মত ক'রে বললাম, এখানে কবে এসেছেন ?

অনেকদিন। এখানে দোকান আছে। ঠিকাদারের লোকজন সব আমার দোকানেই থাকে খায়। ভালুকপুং বাজারে পুরানো দোকান বলতে আমার এইটা। বাকি যারা এখন দোকানদার দেখছেন সব বাজারে সওদা ক'রতে আসতে আসতে দোকান বসিয়েছে।

আমি তার অপ্রয়োজনীয় পরিচয় জেনে বলললাম, আমি অল্প দিন হ'ল এদিকে এসেছি কিছুই চিনি না। এখানে তা আজই প্রথম।

থাকলেই চিনে যাবেন। এখানে আর আছে কি ? এই তিন হাত ফাঁকা জমি ছাড়ালেই পাহাড় আর জঙ্গল। ওই পাহাড় থেকে সওদা নিতে আসে মানুষ তাই এই ভালুকপুং।

জায়গাটার নাম আগেই শুনেছিলাম জীবনলালের কাছে। বলেছিল সেখানেই শেষ, তারপরই কাজের এলাকা স্বরু। তাহ'লে তো পেঁছেই গেছি। জানতে চাইলাম, ঠিকাদার কামেশ্বর সিং কি এখানেই থাকে ?

কামেশ্বর সিং! —শ্যামবাহাদুর যেন আকাশ থেকে পড়ল, বলল, কামেশ্বর সিং এখন কোথায় কেউ জানে না।

এবার আমিই যেন আকাশ থেকে পড়লাম। তবে ? আমি তবে কার কাছে এলাম ? আমাকে দেখে বোধহয় বিব্রত মনে হ'ল যার জন্যে শ্যামবাহাদুর বলল, সবাইকে নিয়ে চলুন দোকানে যাই, তারপর কথা হবে।

আমার আর তো কিছু করবার ছিল না তাই বাধ্য হয়েই তার দোকানে এসে হাজির হলাম। সেখানে পেঁছে আর মনেই হ'ল না যে এই দোকানটি শ্যাম-বাহাদুরের বা ওই দোকানে শ্যামবাহাদুরের কোন ভূমিকা আছে। বিশাল

দেহশালিনী এক মহিলা তার বিরাট অস্তিত্ব নিয়ে সমাসীনা। বেশ কয়েকজন খিদমদগার ব্যস্ত ভাবে তামিল ক'রে চলেছে তার রুক্ষ হুকুমগুলো, যার একটি শব্দবর্ণও আমি বুঝতে পারছিনা তার স্বরের ওঠা নামার ভাবগত তাৎপর্য ছাড়া। আমরা হাজির হওয়াতে শ্যামবাহাদুর নামক মালিকটিকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। তার আজ্ঞাবহদের একজনকে কি যেন নির্দেশ দিতেই সেই লোকটি আমাদের জনগণনা এমন ভাবে সুরু ক'রে দিল যে আমি বিব্রত বোধ করলাম। আমার মনে হ'ল আমাদের সঙ্গে সে বুঝি শ্যামবাহাদুরকেও গুণে ফেলবে। তবে কি লোকটা যা বলল তা সত্যি নয়? শহর বাজারে হোটেলের যেমন দালাল দেখেছি রেলস্টেশন থেকে খদ্দের ধরে নিয়ে আসে এ লোকটাও কি তবে তেমনি একজন?

আমার ভাবনার মধ্যেই শ্যামবাহাদুর বলল, আসুন। আমরা বসি। —বলে সে দোকানের পেছনের একটা পর্দা সরিয়ে ছোট একটা কুঠরীতে নিয়ে একটা চৌকির মত ছিল তার ওপর বসাল। তারপর বেশ জাঁকিয়ে বসে বলল, কামেশ্বর এর কথা আপনাকে কে বলল? আজ যারা এল কেউ তো কামেশ্বর সিং এর লোক নয়?

তবে?

কামেশ্বর সিং রাস্তা বানানোর ঠিকাদার। পাহাড়ের ওপর রাস্তা বানাতে বানাতে কোন দিকে চলে গেছে কেউ জানে না।

তাহ'লে এই লোকগুলো কোথায় যাবে?

এরা যাবে নরেন্দ্র বাহাদুর রানা আছে ঠিকাদার, তারই কাজে।

সে কাজ আবার কোথায়?

এই সারা দেশ জুড়ে।

কিন্তু রামসুখ যে বলল কামেশ্বর সিং এর কাজ চলছে সব!

রামসুখ—? দোকানদার? —বলে নিজের মনে খুব একচোট হেসে নিল শব্দ করে। তারপরই দোকানের উদ্দেশ্যে কি যেন হুকুম ক'রল গলা চড়িয়ে। আমাকে পরক্ষণেই বলল, কামেশ্বর সিং এর কাজ ক'রলে ভালুকপুং-এ পয়সা কোথা থেকে মিলবে জেনে নিলেন না কেন? ওই লোকরার তেওয়ারী ছাড়ালে কামেশ্বর এর আর কোন ঘাঁটি নেই। আর এই রাণাদের কুঠি সারা পাহাড় জুড়ে আছে। আটত্রিশ চৌকি এখানে রাণাদের। আর যা কাজ হবে আমাকে দিলে আমিও টাকা দিয়ে দিতে পারি নরেন্দ্র বাহাদুর বা শ্যাম বাহাদুর রাণার নিশানা দেখালে। পাহাড়ে জঙ্গলে সব জায়গাতেই রাণাদের কাজও যেমন আছে খাজাঞ্চিও তেমনই আছে।

সবই তো বুঝলাম তবু যেন কিছুই বুঝতে পারছি না। গভীর রহস্যের মধ্যে ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছি। এটা থেকে উদ্ধার পাওয়া বিশেষই প্রয়োজন। কোথায় যাচ্ছি না জেনে যাওয়ার মধ্যে রোমাঞ্চ যা-আছে তার চেয়ে দুর্ভাবনা থাকে অনেকই

বেশী। আমি কোন দুর্ভাবনারই ধার দিয়ে গেলাম না। ওসব আমার জন্যে নয়। ঠিকাদার যে-ই হোক না কেন আমার কিছু আসে যায় না। আমার চাই সদ্য আশ্রয়, আর সদ্য দিন যাপন। আগামী কালকের ভাবনা যার থাকে দুর্ভাবনা শুধু তারই সঙ্গী হতে পারে; যে শুভ কিছু কামনা না ক'রবে দুর্ভাবনার দূরত্ব তার কাছ থেকে বহু কোটি আলোকবর্ষের। আমি সেই দূরত্বে দাঁড়িয়ে শ্যাম বাহাদুরকে বললাম, যা হয় হোক, আমার চাই কাজ।

এই তো! র ণারাও তো কাজের লোকই চান—শ্যামবাহাদুর তুরুপের তাসটিকে মোক্ষম দানে ফেলবার মত ক'রে বলল। তারপরই বলল, এদেরকে তো এক বাঙ্গালী বাবু পাঠিয়েছে আপনাকে রামসুখ কোথায় পেল? লোকরাতে তো মানুষ কখন এমনি ঘুরতে আসে না?

কেন, আমাকেও তো সেই জীবনলাল ভট্টাচার্যই পাঠিয়েছে! আমি জানলাম। শ্যামবাহাদুরের দোকান থেকে একটা ছোট বোতল আর দুটো কাঁচের গ্লাস এনে দিয়ে গেল একটা ছোকরা। আমার বেশ ক্ষিধে লেগেছিল। অথচ শ্যামবাহাদুর সেই বোতল থেকে কিছুটা পানীয় একটা গ্লাসে ঢেলে দিয়ে বলল, নিন।

আমার কিছু খাদ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুতে আগ্রহ ছিল না। আমি বললাম, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। আমাকে কিছু খাবার দিন।

আবার কি যেন চেঁচিয়ে বলল শ্যামবাহাদুর। কার উদ্দেশ্যে বলা এবং কে যে শুনেছে কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু অল্পক্ষণ বাদেই দেখলাম এক থালা ভাত আর অল্প অল্প তরকারী এসে পড়ল একটি ছোট ছেলের মাধ্যমে। শ্যাম-বাহাদুর শেষবার যখন চেঁচিয়ে উঠেছিল আমি তার কথা গুলো লক্ষ্য করেছিলাম। তাতে ভাত ছাড়া যে সব শব্দ ছিল তা থেকে কিছু বোঝা সম্ভব। আসলে কান পেতে ধরলে শব্দগুলোকে চেনা চেনা ঠেকে। ভাষা কিছুটা বোঝা যায়।

খাবার সাবাড় ক'রে পৃথিবীটা সুন্দর মনে হ'ল। শ্যামবাহাদুর লোকটাও ভাল। সে শান্ত একাগ্রতায় বোতল থেকে গ্লাসে আর গ্লাস থেকে পেটে অনবরত চালান ক'রে যাচ্ছিল তরল পদার্থটুকু। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রলাম বোতল অর্ধেক হয়ে যাবার পর শান্ত হয়ে পড়ল শ্যামবাহাদুর। ক্রমাগত শান্ত হচ্ছিল। শেষটায় একদম চুপচাপ হয়ে পড়ল। আমি আগে কখনো কোন সুরার এত দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখি নি। হয় বলেও মনে হয় না। আমার মনে হ'ল এটা নেহাৎই শ্যামবাহাদুরের ব্যক্তিগত মানসিকতা। যাই হোক তার শান্ত নিরুত্তাপ চেহারাটি আমার বেশ ভাল লাগল। আমাকে সে একবার মাত্র অনুরোধ ক'রল তার সেই সুরা পান করবার জন্যে। তারপরই স্বভাষায় সেই একই অনুরোধ আর একবার ক'রল বলে অনুমিত হ'ল। পরমুহূর্তে সে এক অদ্ভুত কাজ ক'রে বসল, কাকে যেন ডাকল একটু চড়া গলায়। অবসর না দিয়ে পর পর কয়েকবার ডাকল। সেই

ডাক থামতে না থামতেই বিপুলদেহী মহিলাটি দোকানের পর্দা সরিয়ে সমস্ত ফাঁকটা জুড়ে আবিভূ'ত হ'ল এবং আমারই চোখ পড়ে গেল তার চোখের দিকে। দোকানে বসার সময় মহিলার যে কঠিন ভাব দেখেছিলাম এখন দেখে আশ্চর্য হ'লাম তা কেমন ভাবে যেন মুছে গেছে। বরং আশ্চর্য এক কমনীয়তার সেই বিশাল মুখাবয়ব যেন প্রলিপ্ত। শ্যামবাহাদুর তাকে দেখেই আমাকে দেখিয়ে নিজেদের ভাষায় বলল, আমার বন্ধু। বমডিলা যাবে। বাঙ্গালী বাবু হুনুছ।

মহিলার মুখের ওপর একটা করুণ ছায়া ফুটে উঠতে দেখলাম। সৌজন্য রক্ষার জন্যে যে কথা বলা প্রয়োজন ভাষার ব্যবধানে তার পক্ষে তা বলা যে সম্ভব হচ্ছে না তাই এই করুণ নীরবতা। আমি যেন সেই নীরববেদনার বাঙময় রূপটি দেখতে পেলাম তার চোখের তারায়। আমার মনে হ'ল পৃথিবীতে যত রকমের ব্যবধান আছে তার মধ্যে ভাষার ব্যবধানই সবচেয়ে তীব্র এবং বেদনাদায়ক। মহিলাটির দিকে চেয়ে দেখলাম বেশ অস্বস্তিতে ভুগছে। তার চোখে আমার চোখ পড়তেই ঈষৎ লজ্জিত হয়ে কি যেন বলল শ্যামবাহাদুরকে; ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মহিলা বিসদৃশ মোটা। ছেলেদের খেলবার বলের মত পূর্ণ-গোল মুখমণ্ডল। মহিলা চলে যেতে মনে হল কি আছে ওদের এই জীবনে? সামনে বসে কিছুটা ঝিমিয়ে আছে শ্যামবাহাদুর নামে যে লোকটি ওর নিজের ধারণায় অথবা ওর স্বজন পরিচিতদের চিন্তায় হয়ত ও কৃতী। কিসের কৃতিত্ব ওর? এই বিজন বনে বসে কিছু অর্থ-সঞ্চয়ের বাইরে কি আছে ওর জীবনে? আছে কোন বুদ্ধিযোগ, কোন জীবন চর্চার প্রেক্ষাপট? শুধুমাত্র জীবন কাটানোর জন্যে জীবন, দিন যাপনের আয়োজন কেবল মাত্র। এই জগতে দৃশ্যগত বা দৃষ্টির অগোচরে যে অসংখ্য জীব যেভাবে বেঁচে আছে সেই সব প্রাণীর সঙ্গে পার্থক্য কি আছে শ্যামবাহাদুর বা তার বিপুলায়তন স্ত্রীর? একদিন একটা টিকটিকির চোখাচোখি হয়েছিলাম আমি। হঠাৎ দেয়ালের দিকে চোখ পড়াতে দেখেছিলাম আমার মাথার কাছটিতেই একটি টিকটিকি স্থির লক্ষ্যে আমার দিকে চেয়ে আছে। অনেকক্ষণ আমিও তার চোখের ওপর আমার দৃষ্টি বিঁধে রেখেছিলাম কৌতূহলে। শ্যামবাহাদুরের বউ চলে গেলে তার চেয়ে থাকার মধ্যে আমি সেই টিকটিকিটাকেই দেখতে পেলাম যেন আবার।

শ্যামবাহাদুর এখনো ঝিমিয়ে আছে। আমি এই জীবটির দিকে চেয়ে হঠাৎ হতাশ হয়ে পড়লাম। কেমন একটা গভীর হতাশা—আমি লক্ষ্য ক'রতে লাগলাম—আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। আমার তো আশা কিছু ছিল না, তবে হতাশা কেন? অর্থহীনতা। মনে হতে লাগল সবই অর্থহীন। এই জীবন আর তার চারপাশে এই আয়োজন সবই সমান অর্থহীন। এসবের কিছুই মানে হয় না। অকারণ এই বয়ে চলা। সামনে এবং পেছনে দুদিকেই যার অন্ধকার তারই তো

নাম জীবন। শুধু এই আলোটুকুর কাল; তাতেই অলীক স্বপ্ন—অভিমান! বিশেষত্বহীন দিনযাপনের অন্য কোন নাম কি দেওয়া যায়? যায় না। কিঃ? য়্যাঃ?—হঠাৎ বলে উঠল শ্যাম বাহাদুর। আকস্মিকতায় আমিও যেন চমকেই উঠলাম। কিছুই নয় হঠাৎ ওর চেঁচিয়ে ওঠার কি কারণ? শুধুমাত্র নীরবতা কাটানোর জন্যেই বললাম, কি বন্ধু কি খবর?

ঝিমুনি ভাব কাটানোর চেষ্টা ক'রেই সে বলল, ভালুক পুং বাজার খুব বড় বাজার।—বুঝলাম নেশা ওকে ধরেছে। কোন জবাব দিলাম না। থাক। ও নিজের স্বপ্নের রাজত্বে থাক। আমি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম সেই পর্দা ঠেলে। বিপুল কায়া শ্যামজায়া গরীয়ান। মহিলাটিকে দেখে চিনতে পারলাম না। পর্দার ওপারের মহিলাটির সঙ্গে মেলাতে পারলাম না। কাকে যেন চড়া গলায় হুকুম দিচ্ছিল কি দেবার জন্যে আমাকে তাকিয়েও দেখল না। বোঝা গেল না সে আমাকে চেনে। আমি এক পলকে তার মুখটা দেখে নিলাম গম্ভীর এবং দৃঢ়। একটু আগের নমনীয়তার লেশমাত্র সেই মুখমণ্ডলে নেই।

আমি বাইরে এলাম। পাহাড়তলীর গ্রাম। এই অঞ্চলের তুলনায় গঞ্জ। পাথরের পথে দিনে মানুষজন সব দেখা যায়, পথের ধারে ফসলের ক্ষেত। কয়েকপা হাঁটলেই পাহাড়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাছপালা—ঘন বন এখান থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান। নেপালী কুলি যারা আমার সঙ্গেই নরব্যহাদুরের রথে চড়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেও পারেব কড়ি না পেয়ে এই ঘাটে এসে ভিড়েছে, তারা সব এদিক সেদিকে বসে আছে বড় বড় পাথরের ওপব। ছড়িয়ে ছিটিয়ে এমন নির্লিপ্ত ভাবে বসে আছে যে কাজ বলে যে একটা শব্দ পৃথিবীতে আছে তা যেন তারা শোনেই নি। অনেক সময় পথের ধারে, গাছের ডালে অকারণেই যেমন ভাবে বসে থাকে শাখামৃগের দল দেখতে ঠিক তেমনই লাগছে। তারা বসে এ ওর মাথার উকুন বাচছে, কেউ বসে নিজের গা-ই নিজের হাতে চুলকায় আবার কেউ শুধুই এদিক সেদিক দেখতে থাকে কোন কাজ না পেয়ে। নিছক সময় কাটানো, নিছক থাকা। এই লোকগুলোও তেমনি ভাবে আছে মাত্র। ওদের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম। পাশে একটা দোকানে ভুটিয়া রমণী কি নিয়ে যে বসে আছে বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। সামান্য সামান্য উপকরণ হয়ত সেই মান্ধাতার আমল থেকে পড়ে আছে তার টিনের তলায়, বিক্রি হতে হতে চলেছে। কি যে আয় আর কি ভাবেই কি এদের রোজগার চলে তার অনুমান করা মুস্কিল। পরেই একটা বড় আকারের ঘরে সামান্য কিছু ছিট কাপড় নিয়ে বসে আছে কাপড়ের স্বদেশী টুপি মাথায় এক নেপালী মহাজন। তার সামনে দুজন লোক দুনিয়ার ময়লা কাপড় জড়ানো গায়ে বসে আসে। মাথায় এক রাশ লম্বা রুক্ষ চুল। পেছন থেকে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসা মানুষ বলে স্পষ্টই

বোঝা যায়। পাশের দোকানটা এক ভুটিয়ার। বিক্রির সামগ্রী চা আর একটা টিনে কিছু গোল" পাউরুটি। যাকে সাধারণত আমরা বন রুটি বলে জানি। আমার মনে পড়ল যে ট্রাকে আমরা এসেছি তাতে অনেকগুলো টিন এসেছিল বিভিন্ন আকারের, বোঝাই বস্তাও অনেকগুলো ছিল সেই গাড়ীটায়। ওদিক থেকেই আসে এই সব রসদ। এইসব দোকানদারদের ঘরে ঘরে ঢুকে যায় সব। অন্তিমে ঢুকে যায় মানুষের জঠরে। রাস্তার একপাশে কয়েকটি ছোট সাইজের ঘোড়া দেখলাম বাঁধা আছে। এখানে ঘোড়া কি হয় ভাবতে চেষ্টা ক'রলাম। আমারও কোন কাজ নেই বলে ধীর পদচারণায় যে দিকে যাচ্ছিলাম সেদিকেই পাহাড়। পাশে পাশে দোকান আর কাঠের সারি সারি ঘর। দোকান গুলোও কাঠের। বাসের ঘর যা দোকান ঘরও তাই। সব ঘরের ভেতরেই একপাল ছোট ছোট ছেলে মেয়ের। সদ্যজাত থেকে সুরু করে সব বয়সেরই। অপেক্ষাকৃত বড়গুলো পথের ওপরেই খেলা করছে। পথের ওপরেই এক জায়গায় একটি পূর্ণগর্ভা মহিলা আর একটি ছেলেকে শুইয়ে তেল মাখাচ্ছে যার বয়েস নিশ্চিত ভাবেই বার মাস হয়নি। একটি বছর দুয়েক এর শিশুকন্যা তাদের মায়ের দেহ সংলগ্ন হয়ে কেঁদেই চলেছে। একটু দূরেই একটা মুরগী তার চারটে বাচ্চা নিয়ে চার বেড়াচ্ছে খাবার খুঁটে খুঁটে। আমি সেই নেপালী বউটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম ওর কোন অস্বস্তি বা দুঃখ আছে কিনা। এই ভার যে ও বইছে তাতে ওর কোন বিরক্তি আছে কি না? মুরগীটার প্রয়োজন শুধুমাত্র ডিম পাড়ার জন্যে বাচ্চা তৈরীর জন্যে, বউটার সঙ্গে মুরগীটার পার্থক্যটা কোথায় তাও যেন আমার চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ল। নেপালী বউটাকে শহরের চোখে মেয়ে বললেই ঠিক হয়। কৈশের পার হয়েছে সদ্য, যৌবনের সুরু। এই গুরুভার তাকে কোথায় নিয়ে যাবে ভেবে পেলাম না।

একটু এগোতেই দেখলাম একজন পাহাড়ী লোক সামনের দিক থেকে আসছে তার সঙ্গে একটা ঘোড়া। ঘোড়াটির পিঠে বস্তায় কি বোঝাই। লোকটির চলা দেখে মনে হল অনেকদূর থেকেই আসছে। ঘোড়াটিরও মুখ থেকে দেখলাম ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। ক্লান্ত সে-ও। লোকটির মাথায় একরাশ চুল, গায়ে নানা রকম পাথরের মালার সঙ্গে অনেকটা কাপড়ে তৈরী এক অদ্ভুত দর্শন জামা যাকে জোব্বা বললেই ঠিক বলা হয়। কোমরে বাঁধা একটি কুঠার পায়ের প্রায় পাতা পর্যন্ত ঝুলছে। আপন মনে পথ চলতে চলতে লোকটা আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি নিশ্চিত ভাবেই চিন্তা করে নিলাম ওর ঘোড়াটিও অল্পক্ষণ বাদেই বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ভালুকপং বাজারের একপাশে। বিশ্রাম। ওই দাঁড়িয়ে থাকতে পাওয়াই তার বিশ্রাম। তারপর আবার হয়ত অন্য বোঝা নিয়ে তাকে চলতে হবে ক্রমচড়াই পথে।

আর একটু এগিয়েই সামান্য একটু বাঁকের মুখে থেমে গেল ঘরের সারি। শেষ হয়ে গেল। পথ ধীরে ধীরে উঁচু হতে লাগল। বনের সীমানা প্রসারিত হয়ে পথের ধার পর্যন্ত এসেছে কিছু ছোট ছোট গাছের মাধ্যমে। মাঝে মাঝে বিশাল বৃক্ষেরা দাঁড়িয়ে আছে যেন তাদের পাহারায়। সেইখানটায় আমি থামলাম। বাঁধানো সড়ক বনের মধ্যে ঢুকে গেছে বনের বক্ষ ভেদ করে। কিছুক্ষণ সেই পথের দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরলাম আমি। একটাই তো পথ দেখছি। তাহ'লে এই পথেই আমাদের চলতে হবে? কিন্তু কোথায় যে আমাকে যেতে হবে তাতো আমি জানি না। এই ভাসুকপুংই কি আমার কর্মস্থল? ঠিক জানতে বা বুঝতে পারছি না। ওই শ্যাম বাহাদুর যখন নেশা হওয়ার আগেই বন্ধু বলে পরিচয় দিল নিজের স্ত্রীর কাছে তখন অকারণ দুর্ভাবনা নাই বা ক'রলাম। ওখানেই যখন সব জানা যাবে তখন কি হবে বৃথা চিন্তা ক'রে?

ওখানেই ফিরে এলাম। বাইরে যে নেপালী লোকগুলো বসেছিল কাউকেই দেখলাম না। কি ব্যাপার? সব কি ভোজবাজীর খেলা? কোথায় মিলিয়ে গেল সব? একজনও কোথাও নেই! শ্যামবাহাদুরের ঘরণী তেমনি ভাবেই বসে আছে দোকানে, দোকানের কর্মচারীরা ছোটাছুটি ক'রছে। আমি ইতস্তত ক'রছিলাম কি করি। হুট ক'রে দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়তে দ্বিধা হচ্ছে অথচ করিই বা কি? সামনে তো আর যাবারও নেই কোথাও। ওপাশটায় খানিকটা দূরে একটা বাড়ী যেন তৈরী হচ্ছে নজরে পড়ল। তাহ'লে কি ওখানেই কাজ আমাদের? এ বাড়ী প্রকৃতই বাড়ী। এইসবগুলোর মত কোন রকমে গাছ চিরে পেরেক মেরে রোদ বাতাস বৃষ্টি ঠেকানো খুপরি নয়। রীতিমত ইঁট বালি সিমেণ্ট পাথরের সমন্বয়। পাকাপাকি ভাবেই ইমারতের প্রস্তুতি। তবে কি একবার ঘুরে আসব ওখান থেকেই? কার কাছেই বা যাব? কি বলব? হঠাৎ মনে হ'ল হয়ত আমার সঙ্গের লোকগুলো ওখানেই চলে গেছে। আমি যখন ওদিকটায় গেছি সেই ফাঁকে হয়ত ঠিকাদার এসে নিয়ে গেছে ওদের ডেকে। আমি ছিলাম না বলেই আমার নামটা আবার খারিজ হয়ে গেল না তো? অকস্মাৎ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভয় হ'ল খারিজ হয়ে গেলে তো ফিরতেও আর পারব না। ফিরবই বা কোথায়? জায়গা কি কোন আছে? যাই হোক অপেক্ষা করবার জন্যে সামান্য দূরেই একটা বিশাল গাছের তলায় বসলাম। আমার পাশ দিয়ে দেখলাম মেটে রঙের মোটা মোটা একরম পিঁপড়ের সার চলেছে। সেই পিঁপড়ের সারির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। সামান্য এইটুকু প্রাণীরও সারাদিনের ব্যস্ততা শুধু তার প্রাণ ধারণের জন্যে। এই প্রাণ বলে বস্তুটা, যাকে চোখে দেখা যায় না, সেটা তাহ'লে কি বিশাল! পৃথিবীর প্রাণী মাত্রেই নিজের প্রাণের জন্যে সারাটা দিন ব্যস্ত, সারা জীবন ব্যস্ত। পৃথিবীতে বিস্ময়ের এটাই যে সবচেয়ে যেগুলোর শক্তি বেশী সেগুলোকে কখনোই

চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য। সেই অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণ প্রাণীকে ব্যাকুল করে, পাগল করে, বিশাল করে, ক্ষুদ্র করে, মহান করে, হীনও করে। অথচ প্রাণটুকুর অস্তিত্ব যে কি সামান্য সেকথা ভাবতে গেলেও বিস্মিত হতে হয়। মনে আছে মাঝে মাঝে হাসপাতালে আমাদের ক্লাস নিতেন অধ্যাপক ডাঃ রায়। আন্তরিক ভাবে চাইতেন ছাত্রেরা শিক্ষিত হোক তাই তাঁর অধীনে কোন বিশেষ রোগী ভর্তি হলেই আমাদের সেই রোগীর পরীক্ষায় সামনে রাখতেন। আমার এখনও মনে আছে একদিন এক যুবক ভর্তি হ'ল প্রায় অজ্ঞান। শুধু বলছিল যন্ত্রণা। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা। আমরা সামান্য সময় পেয়েছিলাম। সেই সময়টুকু মনে হচ্ছিল ডাঃ রায় সমস্ত যন্ত্রণা টেনে নেবার মত কোন সিরিঞ্জ খুঁজছেন। আমরা ছাত্র একসময় ডাঃ রায় আমাদের পর্যন্ত বলে উঠলেন, পা মালিশ করো। তাড়াতাড়ি। প্রিয় ছাত্রী অলকনন্দা, শান্তনু, আমি বেশ কয়েকজন পায়ের বিভিন্ন অংশে আলতো করে ঘষতে লাগলাম। তিনজন চিকিৎসকসহ ডাঃ রায় ওষুধ ইংজেকশন, রক্ত, অক্সিজেন নিয়ে গলদঘর্ম হ'তে লাগলেন। তারই মধ্যে টুপ ক'রে মরে গেল ছেলেটি। ভরা যুবক। আমাদের অত লোকের সচল ব্যস্ত হাতের মধ্যেই তার চঞ্চলতা থেমে গেল। চোখের পলক পড়ার অবসরেই সে নিশ্চল হয়ে গেল। অনেক মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়া চিকিৎসকরা সকলেই সেই মুহূর্তে আর একবার হতাশ হলেন। ক্লান্তি অনুভব ক'রলেন ডাঃ রায় তা বোঝা গেল তাঁর অবসন্ন ভাব দেখে। আমি জীবনে সেই প্রথম একটি মৃত্যুর সামনে পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একলহমায় একটি প্রাণের হারিয়ে যাওয়া, একটি মানুষের নিঃশব্দ সমাপ্তি, চোখের সামনে অথচ দৃষ্টির বাইরে ঘটে গেল।

ওইটুকু প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা দেখে আজ আমার অবাক লাগল। আগে কোনদিন এভাবে দেখিনি, লক্ষ্য করবার অবসর পাইনি বলেই বোধহয় দেখা হয় নি। জীবনচক্রে অবিরত আবর্তিত আমি আজ যেন চক্রের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ ক'রছি তার গতি, তার আবর্তন বেগ। পিঁপড়েরা চলেছে তো চলেইছে। অসংখ্য অজস্র। নদীতে যেমন স্রোত বয় অবিরাম জলের ধারায় এও তেমনি—কোথা থেকে যে পিঁপড়ে অবিরত আসছে কি জানি তার ঠিকানা। জীবন বুঝি এমনই অনন্ত। বিরামহীন গতিতে তার আসা আর চলে যাওয়া, তবে কি সত্যিই তার ঘুরে ঘুরে আসা? দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন যেমন চাকা ঘোরার মত ঘুরছে এও কি তেমনি? এই দিন কিন্তু সেই দিন নয়, অন্যদিন। অন্য কি? সেই দিনই তো। অন্য রূপে, অন্য ঘটনার আকৃতিতে। জীবনাবর্তনও কি তবে তেমনি? একই জীবন রূপ বদলে অন্য দেহ আশ্রয় ক'রে ঘুরছে? জানি না। এ এক এমন প্রশ্ন এখনো উত্তর যার মেলে নি।

ভাবনায় যে কত কাল কেটে গেল হিসাব নেই। ভাবনা যখন ভাঙল দেখি,

শ্যামবাহাদুর সামনে। চোখাচোখি হতেই জানতে চাইল, কি দোস্ত ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

জানি না তো! মনে মনে ভাবলাম। সত্যিই কি অনেক সময় কেটে গেছে? অনেক? পাশের দিকে চেয়ে দেখলাম পিঁপড়েরা প্রায়ই নেই। কিছু কিছু পথ হারা পিঁপড়ে দিকবিদিক দিশা না পেয়ে খুঁজছে। মনের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতেই জানালাম, ঘুমোই নি। তবে চুপচাপ বসে আছি তো—

ঘরের কথা ভাবছ বুঝি? ঘরওয়ালীর কথা? বন্ধুর মতই রসিকতা ক'রে জানতে চাইল শ্যামবাহাদুর। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম এই সামান্য সময়েই সে তার নেশা কাতর ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। এখন সে বেশ সুস্থ, স্বাভাবিক। আমাকে বলল, চল। ঘরে চল। এখানে বসে আছে কেন?

কেন যে বসে আছি ওকে বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গী, ভবিষ্যতের সহকর্মীরা কে কোথায় গেল লজ্জা পাচ্ছিলাম সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রতেও। নিজের ত্রুটির জন্যে যদি এখন দুটো কথা শুনতে হয়! কিন্তু ত্রুটি যে হয়েছে এমন তো বোঝা যাচ্ছে না শ্যামবাহাদুরের ব্যবহারে! আমার কোন দোষ ঘটে থাকলেও কি এমনি অমায়িক ব্যবহার ক'রত শ্যামবাহাদুর? যাই হোক ওকে অনুসরণ ক'রে সেই ঘরে ফের ঢুকলাম। আগের জায়গাতেই বসলাম। শুধু ভাবতে লাগলাম আমার সঙ্গের লোকগুলো কোথায় গেল! আমার চাকরীর জন্য খুব আগ্রহ যে আছে এমন নয় এই ভাবে যদি দিন কেটে যায় কোনও ক্ষতিই নেই তাতে, কিন্তু আমি তো জানি এভাবে কাটবে না, কারণ কাটে না, কাটতে পারেনা। নিষ্কর্মা একটা লোককে বসিয়ে শুধু শুকনো বন্ধুত্ব করবার জন্যে খাওয়াবে পুষবে এমন বাদশাহী মেজাজ বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে অসম্ভব। এখানে প্রত্যেক মানুষ আর একজনের প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী। যে জনসংখ্যা সমানে বেড়ে চলেছে সীমাবদ্ধ সম্পদই তাকে নিতে হবে ভাগ ক'রে। নিয়ত এই ভূমির অংশ ছোট হতে থাকবে, ভূমিজ সম্পদের হবে টানাটানি। এখানে হৃদয় হবে হিসেবী। ক্রমাগত সেই হিসেবে আঁকিজুঁকি বাড়বে, দশমিকের পরে বেড়ে চলতে থাকবে সংখ্যার পরিমাণ। স্বভাবতই প্রত্যেক কাজের পেছনে সুনিশ্চিত থাকবে কারণ। আমি তাই সংশয়ী হ'লাম। অবিশ্বাস করতে চাইলাম শ্যামবাহাদুরের আন্তরিকতা। সেই যে দীন হীন মানুষ গুলোর সঙ্গে মিশে এসেছিলাম তাদেরই সঙ্গে একাত্মতা অনুভব ক'রতে লাগলাম। সেই হতাশাখিন্ন অবসন্ন মুখ মানুষগুলো রোদের তেজ, দ্রুতযানের বেগ জনিত বাতাস সব নিয়ে বসেছিল গাড়ীর পিঠে, তাদেরই মনে হতে লাগল আমার আপনজন। ওদের সঙ্গেই যে আমার ভাগ্য জড়ানো আছে একথা বুঝেছিলাম বলেই অত করে ওদের ভাবছিলাম। আসলে আমি নিজের জন্যেই চিন্তিত। হয়ত বহুকাল পর নিজের জন্যে ভাবিত হ'লাম। স্রোতের কুটোর চিন্তা থাকার

কথা নয়, আমারও থাকবার কথা নয়, তবু হয়। প্রাণী মাত্রেই নিজেকে নিয়ে ভাবে যারা হয়ত না ভাবতে পারে তারাও স্বার্থধর্মে আপনাকে রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতেই কাজ করে প্রাকৃতিক নিয়মে। আমি এর ব্যতিক্রম কেমন ক'রে হবো।

শ্যামবাহাদুরের সঙ্গে বসবার অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন লোক এসে আপন ভাষায় কি সব বলল যার বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না। বেশ কিছুক্ষণ দুজনে কথাবার্তা বলল। সে চলে যেতে শ্যামবাহাদুর আমাকে বলল, তোমার সঙ্গে যে লোকেরা যাচ্ছে তাদের দায়িত্ব তোমার। সঙ্গে রেশন থাকবে, পথের জন্যে আলাদা ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে আলাদা। আমি সব বুঝিয়ে দেব। তোমরা ওখানে পেঁছালেই তোমাদের হাজিরা চালু হয়ে যাবে। তবে এ দিনের খাবার জন্যে তোমাদের পয়সা লাগবে না। —এই বদান্যতার জন্যে আমার তাকে ধন্যবাদ হচ্ছে হ'ল যদিও এই বদান্যতা আমার কোন কাজে লাগবে না।

ওই যে লোকগুলো দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে নিজের এবং নিজের প্রতিপালিতদের প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজনে এত দূরে এসেছে এ বদান্যতা তাদের উপকারে লাগতে পারে। যার চোখে আলোর কোন প্রতিক্রিয়া নেই তার রাত্রিদিন যেমন তারতম্য-হীন আমার কাছে শ্যামবাহাদুরের প্রস্তাবও তেমনই আর কি। আমার পিছুটান নেই বলে সঞ্চয়েরও নেই প্রয়োজন। আমার চাই দিন যাপনের আয়োজন মাত্র। সেটুকু জুটলেই যথেষ্ট মনে করি।

এবার হাঁটাপথ। রাতের অন্ধকার থাকতেই হৈ চৈ লেগে গেল। কে কোথায় শুয়েছিল জানিনা যাদুকরের কারসাজির মত দেখলাম সবাই হাজির।

আমার সঙ্গে যত লোক লরীতে চেপেছিল তারমধ্যে একমাত্র মন বাহাদুর ছাড়া সবাই বোধহয় আছে। অনেকগুলো মানুষকে সেই আবছা অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে চলে ফিরে বেড়াতে দেখছিলাম। জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি চলছে শ্যামবাহাদুরের দোকান ঘরে। শ্যামবাহাদুরের ব্যস্ততা এখন দেখবার মত। তার স্ত্রীও এটা সেটা প্রশ্ন করছে আসলে সে তত্ত্বাবধান করছে যা বুঝলাম। শ্যামবাহাদুর নিজেও ব্যস্ত। আমি শুধু নিষ্কর্মা দর্শকের মত ভূমিকাহীন, অতিরিক্ত অভিনেতা যেমন সকলের মধ্যে অথচ আলগা থাকে তেমনি দাঁড়িয়ে দেখছি।

হাতের কাজ শেষ করে শ্যামবাহাদুর আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আকাশে তখন আলোর আভাস। সামান্য আলোকিত ভূমিও। আমাকে বলল, বন্ধু, এবার তোমার পালা। সব বুঝে নাও। —বলেই লোকজনদের ডেকে সামনে জড় করে যা বলল, কথা সব না বুঝলেও ভাব বুঝলাম। আমার কথামত চলবার জন্যে সব লোককে নির্দেশ দিয়ে কড়া করে কি যেন একটা বলে দিল। তারপর আমাকে বলল, এই সাতটা বস্তায় যে চাল দিলাম তা সোজা বমডিলা যাবে। আর এক বস্তা লবণ। বাকী দুবস্তার চাল আর এই বস্তার আনাজ তোমরা পথে খাবার

জন্যে ব্যবহার করবে। লবণও তোমাদের আলাদা করে দেওয়া আছে। একটা প‍ুঁটলি দেখিয়ে বলল, এর মধ্যে আটা আছে। যেখানে জল ফুটবে না চাপটি বানিয়ে নেবে।

সব বুঝে নিয়ে যাত্রা সুরু করলাম আমরা সব নতুন পথিক। শ্যামবাহাদুরই বলল, যে লোকটির তোমাদেরকে নিয়ে যাবার কথা সে এখনও আসে নি। তাকে তোমরা পথেই পাবে। সে পথ সব জানে। তবে পথ তো আর দুটো নেই কাজেই হারাবার ভয় নেই। এই পথ ধরেই চলে যাবে। কেবল রাতটা আর ভোরবেলাতে সাবধানে থাকবে, জংলী জানোয়ারের খুব ভয়। অতি সংক্ষিপ্ত সাবধান বাণী সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা আঠারজন এমন যাত্রী যাদের কেউই পথ চিনি না, জনহীন পথে গন্তব্য লক্ষ্য স্থলের নামটুকু ছাড়া আর কিছুমাত্র জানিনা। ভালুকপুং বলতে ওই ঘরবাড়ীগুলো আর কিছু চষা জমি। সেটুকু পেরোতে বার কয়েক পা ফেলতে হল মাত্র, পথও ওইখানেই শেষ। পথ শেষ মানে পথ বলতে যা বোঝায় তার দেখা পেলাম না আসল চড়াই সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই। সেখান থেকে আরম্ভ হল পাথর ভেঙ্গে চওড়া করা পাথরেরই পাদানী। তাকে ঠিক রাস্তা বলা যায় না, বড় বড় পাথর আড়াআড়ি ফেলা ছোট ছোট টুকরো পাথর বিছানো পায়ে চলার ব্যবস্থা। দুপাশে বন। এক পাশে উঁচু বন এক পাশে নিচু। যত চলছি উঁচুর উচ্চতা আর নিচুর খাদ বেড়েই চলল। হঠাৎ নজর পড়ল ডান দিকে উঁচুতে একটা টিনের ঘর। বেশ বড় সড় ঘর খুঁটির ওপরে। ভাল ভাবে তৈরী ঘর। একটা ফলকে লেখা দেখলাম বন বিভাগ। বন বিভাগের বাড়ী পার হতেই বন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বে যেন পথটুকু ছেড়ে রেখেছে। তাও পথের ওপর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জন্মেছে ঘাস গুল্ম। কিছুক্ষণ চলার পর মনে হল আকাশে কোথাও সূর্য উঠেছে। পথে বা পথের পাশে কোথাও রোদের চিহ্ন নেই তবে আগে যেমন অরণ্যকে কালো ঝিম দেখাচ্ছিল এখন তা দেখাচ্ছে না। সেই জমাট অন্ধকারের মধ্যে এখন বোঝা যাচ্ছে অসংখ্য ফুটো, ফাঁক। মাথার ওপর কখনো বা কোন পাখীর ডাক সচকিত করে তুলছে নির্জনতা। আমরা আঠারোজন চলছি। আমাদেরও কোন শব্দ নেই। কেউ কখনো হঠাৎ কথা বললেও অন্যে শুনতে পাচ্ছি না কারণ আমরা আছি একের পর এক, প্রায় সারিবন্দী হয়ে। আমি মাঝখানটায় পড়ে গেছি। সামনে এবং পেছনেও দু একজন দেখছি গাছের ডাল ভেঙ্গে লাঠি করে নিয়েছে—। সামান্য একটুকরো কাঠ যা গাছের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ, সময় বিশেষে তাও কত নির্ভরতা দিতে পারে মানুষকে। অনেকেরই কোমরে ভোজালী যদিও আছে লাঠি তবু দিচ্ছে অতিরিক্ত নির্ভরতা। যারা পিঠে করে বস্তা বইছে তাদের আগে পেছনে দেখলাম একজন করে লোক আছে পাহারায়। ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আমি

ওদের কর্তা কিন্তু জানিনা ওদের ভাষা—কি করে কর্তৃত্ব করব ? আমি এক অদ্ভুত কর্তৃত্বহীন কর্তা। আসলে আমরা সকলেই ভেসে চলা আবর্জনা। নদীতে যেমন অসংখ্য জঞ্জালের সঙ্গে ভাঙ্গা নৌকার কাঠও ভাসে আমিও তেমনি, বিশেষত্বহীন বিশেষ বস্তুর মত।

কিছুটা পথ চলার পর এক জায়গায় অনেকটা ফাঁকা। কোন গাছগাছালি নেই। পাথর। শুধু পাথর। সেখানে পৌঁছাতেই চড়া রোদ এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুরু থেকে ঘণ্টা তিনেক হয়ত হাঁটছি আমরা চড়াই ভাঙ্গছি বলে জানি না কতটা এলাম। এখন তো বেলা বেশী হয়নি তবে রোদ এত চড়া কেন ? মনে হল গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। অল্প পথ চলার পর দেখলাম আমার সঙ্গীরা সবাই আমার সামনে চলে গেল। জায়গাটা দুরন্ত খাড়াই। আমার খালি হাতেই উঠতে এত কষ্ট হচ্ছে অথচ যারা পিঠে বোঝাই বস্তা বেঁধে উঠছে তারা উঠছে কেমন ক'রে ? আমার হাতে ছিল· আমার সামান্য কাপড় জামা ক'টা। মাথায় রোদ বাঁচানোর জন্যেই সেগুলোকে মাথায় নিলাম। পরক্ষণে মনে হ'ল সকালের রোদই যদি এই রকম বেলায় তাহলে কি হবে। হাঁটব কেমন ক'রে ? কিন্তু সে কথা ভেবে তো আর কোন লাভ ছিলনা। তাই মাথার ওপর রোদ নিয়ে হাঁটতে লাগলাম টানা খাড়াই পথে। কতদূর যে হাঁটতে হবে তার সুনির্দিষ্ট কোন হিসাব পাইনি। জিজ্ঞাসা করাতে শ্যামবাহাদুর জানিয়েছিল, যে যেমন যাবে তার ওপর সব কিছু নির্ভর করে। তবে কাউকে দল ছুট ক'রবেন না। একা চলার পথ নয়। আমরা যেখানটায় এসে পড়লাম তার ডানে বাঁয়ে দুদিকেই ফাঁকা। একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়েছি। দু পাশে দৃষ্টি যতদূর গেল দেখি শুধুই পাহাড়, বন, পাহাড়। চারিদিকে সবুজ। মাথার ওপর আকাশ যেমন সর্বব্যাপ্ত নীল চারপাশে তেমনি পরিব্যাপ্ত সবুজ। আমরা যেন সীমাহীন সবুজের মধ্যে একটা দ্বীপের ওপর রয়েছি, বিশাল একখণ্ড পাথরে তৈরী আশ্চর্য দ্বীপ এটা। কিন্তু দাঁড়িয়ে আমরা নেই। অচিরেই এক ঝলক ঠাণ্ডার মধ্যে এসে পড়লাম। আবার গাছ, গাছের ছায়া, মাটিতে ঘাস, ঘাসের শীতলতা। সব মিলিয়ে শান্ত আবহাওয়া, সুনিশ্চিত জীবনের মত। আমার ইচ্ছে হ'ল ওদের একটু থামতে বলি। কিন্তু পেছনের থেকে কি বলে চেঁচাব আর কি বললে যে ওরা বুঝবে দুটোই আমার কাছে অজানা। তাই ঈষৎ ঢালু পথ পড়ায় দ্রুত চলবার চেষ্টা ক'রলাম। আর, একটু দূরে গিয়েই দেখলাম ওরা একটা পাথরের ওপর ওদের বোঝা নামিয়েছে। আমি গভীর তৃপ্তিতে গিয়ে ওদের পাশে দাঁড়ালাম। ওই রোদ থেকে এসে এই ছায়া ঢাকা পথ বেশ তৃপ্তিদায়ক লাগল। আমার ইচ্ছে হ'ল একটু বসি। কিন্তু কেউ বসছে না দেখে আমার সংকোচ হ'ল বসতে।

দলপতিকে দুর্বল হ'লে চলে না। হুকুম করা হোক আর না হোক হাকিমকে নিজের মর্যাদা মত যা থাকতেই হয়। আমিও নিজের পদ মর্যাদা রাখতে স্বপদেই রইলাম। ওরা নিজেদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা বলছিল তাই আমি কান পেতে শুনছিলাম ওদের ভাষা অনুধাবন করবার প্রচেষ্টায়। কারণ ইতিমধ্যেই বেশ বুঝে নিয়েছিলাম এদের ভাষা জানা আমার কাজের প্রথম এবং আবশ্যিক যোগ্যতা।

অল্প সময় বিশ্রাম ক'রেই ওরা ভার বদল ক'রে নিয়ে চলতে সুরু ক'রল। এতক্ষণ যারা খালি হাতে চলছিল এবার তাদের পিঠে বোঝা উঠল। শৃঙ্খলা পরায়ণতার ওপরেই মানুষের জীবনের সবকিছু নির্ভরশীল। ওদের এই সুশৃঙ্খল ভার বদল এবং নীরবে দায়িত্ব পালনের মধ্যে আমি লক্ষ্য ক'রলাম এক পরিচ্ছন্ন নীতিবোধ এবং ন্যায়ানুগত্বের প্রকাশ যা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রল। আমি যে ওদের ভাষা জানি না এটা ওরা জানে বলেই আমাকে মুখে কিছু না বলেও আমার কাছে যেন অনুমোদন চাইছিল নিঃশব্দ এক জিজ্ঞাসায়। আমরা চলতে সুরু ক'রেছি এমনি সময় হঠাৎ দেখলাম ওপর থেকে দুজন লোক দুটো ঘোড়ার পিঠে চড়ে নেমে আসছে। একটা বাঁকের মুখে তাদের দেখা গেল। কাছে এলে বোঝা গেল লোক দুজন ভুটিয়া। আমাদের কাছাকাছি এসেই ওরা থেমে গেল, দলের সামনে দাঁড়িয়ে বিশেষ কাউকে নয় অথচ উত্তর চেয়েই ওদের একজন কি যেন বলল। আমাদের মধ্যে একজন তার জবাব দিয়ে হাত তুলে আমার দিকে দেখাতেই দুজন সবাইকে ছেড়ে আমার সামনে এসে ফৌজী সেলামের মত কায়দায় হালকা সেলাম ক'রে দাঁড়িয়ে আবার কি সব বলতেই দলের একজন তাকে কি বলে উঠল। কথাটা আমার সম্বন্ধেই হবে কারণ পরক্ষণেই খুব নরম মুখ ক'রে আমার দিকে বার দুই মাথা নেড়ে দু একটা আমার দুর্বোধ্য কথার সঙ্গে যা বলল তার মধ্যে বুঝলাম কেবল ব্যোমবাহাদুর শ্রেষ্ঠ। ওই নামটি জানা ছিল বলে বুঝলাম, তার আগের পরের একটি বর্ণও বোধগম্য হ'ল না। আমার সঙ্গীরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে লাগল। একটু বাদে লবণের বস্তা-গুলো ওরা ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে আমাদের সঙ্গেই হাঁটতে সুরু ক'রল। অনুমান ক'রলাম এরাই তাহ'লে শ্যামবাহাদুরের বলা পথ প্রদর্শক।

দু পাশে নানা জাতের বৃক্ষ। সবুজ—কোনটা ফিকে কোনটা গাঢ়। একেবারে মাটির সঙ্গে লেগে আছে কোনটা, কোনটার আবার মাথাই দেখা যায় না মনে হয় ওই নীল আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। বিশাল চওড়া পাতার গাছ আবার কোন গাছের পাতা ঝির ঝিরে সরু। হরেক রকম গাছের মধ্যে কোথাও দৈবাৎ কোন পাখির স্বর আমাদের চলার পথকে সজীব ক'রে রাখছে। আমরা ক'জন চলছি। দুজন ছাড়া আর কেউই বোধহয় জানি না এ পথের কোথায় শেষ। কোথাও একটু

ফাঁক পেলে যতদূর দেখা যায় শুধুই পাহাড়—অরণ্যাচ্ছাদিত সবুজ সুন্দর বর্ণময় পাহাড়। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এখন আমরা চলছি—কোন রকম নতুনত্বহীন একঘেয়ে পথ। চলছি তো চলছি। আর চলা মানে ওঠা, ক্রমাগত ওপর দিকে ওঠা। এই যে পথ দিয়ে চলছি মনে হচ্ছে এ পথ খুব পুরানো নয়। পথে ক'জায়গায় দেখলাম ঢিবি ক'রে পাথরকুচি জড় করা আছে।

ধীরে ধীরে আলো কমে এল। আমার মনে হ'ল আলোটা যেন বড় কম সময় রইল। যদিও শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি জমেছিল, পা বেয়ে উঠে আসছিল প্রবল যন্ত্রণা তবু অন্ধকার হবার সময় যে হয়নি সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ডাক্তারী পড়বার সময় একটা হাতঘড়ির খুব সখ ছিল। সেই সখ কাজে পরিণত হয় নি। ভেবেছিলাম পাশ ক'রে কিনব। অলকানন্দার বাবা যে একটা ভাল ঘড়ি যৌতুক হিসেবে দেবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম বলে নিজে একটা কমা জিনিস কেনবার জন্যে চেষ্টা করিনি। এখন মনে হ'ল একটা যে কোন মূল্যের ঘড়ি যদি থাকত তাহ'লে অন্তত আমার অনুমান পরীক্ষা ক'রতে পারতাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম—নির্মেঘ। আসলে দীর্ঘ মহীরুহেরা আমাদের আলো আড়াল ক'রছিল। ছায়ায় আচ্ছন্ন ক'রছিল ভূমিতল। ক্রমে এই ছায়া নিবিড় হবে, গভীর হবে অন্ধকার। বনভূমি হবে নিশ্চল। আমার মনে এক গভীর গোপন বাসনা বেশ কিছুদিন ধরে বল সঞ্চয় ক'রছে—গভীর রাত্রে বনের ভেতরটা তন্ন তন্ন ক'রে দেখব। যেমন ভাবে হাতিরা দ্যাখে, বাঘে দ্যাখে, হরিণ, শিয়াল বা বাইসনরা দ্যাখে সেইভাবে, সেই অন্তরঙ্গ রূপ দেখব। এ আমার একান্ত ইচ্ছা, আন্তরিক। গভীর বনের লতা গুল্মের মধ্যে দিয়ে যেভাবে অনায়াসে চলে হাতি, শিয়াল বা হায়না আমি সেই ভাবে বিচরণ ক'রব নিঃশঙ্ক, নিঃশব্দ।

গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন অপরাহ্নে যখন আমি এই ভাবনায় বিভোর তখনই দলের একজন আমার কাছ ঘেঁষে এসে প্রথম আমার বোধগম্য কথা বলল, বাবু, জলদি।

শুধু আমাকে বলাই নয় সবাই দেখলাম চলার গতি বাড়িয়ে দিল। পা দুটো যখন যন্ত্রণায় প্রায় অবশ হয়ে যাচ্ছে যে সময় গতি বন্ধ হওয়াই একমাত্র কাম্য, সে সময় জোরে চলা কি সহজ সাধ্যের ব্যাপার! তবু যখন দলের আমি একজন আর দলছুট হওয়ার ব্যাপারে সতর্কবাণী শুনে রওনা হয়েছি অতএব একা পড়ে করুণ মৃত্যুর চেয়ে কষ্ট সহ্য করাই কর্তব্য বলে আমি ওদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে সচেষ্ট হলাম।

শ্যামবাহাদুর আমাকে বলে দিয়েছিল পথে থাকবার ব্যবস্থা আছে। রাত্রে সেখানেই যেন আমরা রান্না খাওয়া ক'রে নিই। সেই আশ্রয়স্থল যে কোথায় এই চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল। তবে পথপ্রদর্শক যখন সঙ্গে আছে দুর্ভাবনার কারণ

নেই বলে সেটা থেকে বেঁচেছি। এই যে দ্রুত চলা এ নিশ্চয়ই সেই আশ্রয়স্থলে পেঁছানোর জন্যে—এটা আমি অনুমান ক'রে নিলাম। আর এই অনুমানই আমাকে শক্তি জোগালো। অন্ধকার কেমন বিস্ময়কর দ্রুততায় বাড়ছে। দূরের গাছপালা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কাছের বৃক্ষেরা হয়ে উঠছে রহস্যকেন্দ্র। একটু আগে যেটা সবুজ ছিল এখন সেটাই হচ্ছে মসীকৃষ্ণ। যা কিছুক্ষণ আগেও বুঝছিলাম এখন তা দুর্বোধ্য এবং ভয়াল হয়ে উঠছে। যে অরণ্যকে সুন্দর লাগছিল যার আনাচে কানাচে খুঁজতে চাইছিলাম বর্ণালী পাখি বা চিতল হরিণের সৌন্দর্য সেই অরণ্যকেই যেন অবিশ্বাস ক'রছি। বেশ অনুভব ক'রলাম বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অবিশ্বাস মনের মধ্যে এসে জমাট বাঁধছে। আমার মনের অবস্থাও বদলে যাচ্ছে শুধু মাত্র আলোর অভাবের জন্যে। আলো জীবন কিন্তু অন্ধকারও তো সত্য! সে তো আলোর চেয়ে কম সত্য নয়। তবে কেন সে এক লহমায় সব কিছু বদলে দেয়? কেন সে এত অনভিপ্রেত?

বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা এবং একটি ঘর। পথের ধারেই, জায়গাটা একটু উঁচু। পাহাড়ের গায়ে কিছুটা জাযগা কেটে নিয়ে ঘরটা বানানো হয়েছে। ওপরে খড়ের মত কিছু গাছ পাতা দিয়ে ছাউনি দেওয়া কাঠের বেড়ার ঘর, বড় মাপের। দরজা জানালা নেই, তার প্রয়োজনও থাকে না। আমরা সবাই সেখানে ঢুকে পড়লাম। প্রথমেই সবাই মোটঘাট নামাল। একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রলাম এমন জায়গাতে ঘরটা তৈরী যে পথের তুলনায় আলো সেখানটায় কিঞ্চিত বেশী। সে আলোয় ভেতরটাকে সম্পূর্ণ দেখা না গেলেও ভেতরের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কাঠের পাটাতনের মেঝের এককোণে কিছু কাঠ পড়ে আছে, এ ছাড়া আর কিছুমাত্র দেখা গেল না।

হুট ক'রে আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম একটা মশাল জ্বলছে। এ যেন আমার কাছে ভোজবাজী। মশালের আলোয় দেখলাম যেখানটায় কাঠ গুলো পড়ে আছে তার পাশেই একটা উনান। মশালও কি এখানেই ছিল? একটা লাঠির মাথায় কি যেন জড়ানো আছে তাতেই জ্বলছে আগুন। ভুটিয়া পথ প্রদর্শক দুজন কি যেন বলাবলি ক'রে একটা পোঁটলার মধ্যে থেকে আর একটা মশাল বের ক'রে জেলে ঘরের কোণে রাখা একটা মাটির কলসী তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার সহকর্মীদের কয়েকজন ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল নিজের কুকরী হাতে নিয়ে। বুঝলাম কোথাও জল আনতে গেল। বাকি সবাই লেগে গেল রান্নার কাজে।

যতক্ষণ রান্না খাওয়া চলল কথাবার্তার শব্দে বাইরটাকে আমার নিঃশব্দ বলেই মনে হচ্ছিল কিন্তু ঘরে সবাই শুয়ে পড়তেই অন্ধকার সজাগ হয়ে উঠল। যেন চারিদিক থেকে লক্ষ লক্ষ ঝিঁ ঝিঁর শব্দ আমাদের নিঃশব্দতাকে ঘিরে ধরল। ক্রমাগত শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল তারা যেন আমাদের গ্রাস করতে আসছে।

আস্তে আস্তে শব্দটা আমার মাথার মধ্যে চেপে বসতে লাগল। মনে হচ্ছিল অসংখ্য সূক্ষ্ম শব্দ সমস্ত কেশকূপ দিয়ে আমার মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কে অনবরত ঢুকছে। প্রতি নিমেষে লক্ষ লক্ষ শব্দ ঢুকে পড়ে মাথার ভেতরটাকে ভরে ফেলছে। আমার মাথাটা অমনি শব্দের একটা প্রবালদ্বীপ হয়ে উঠছে। শব্দগুলো জমাট বেঁধে শক্ত একটা কঠিন পদার্থের আকার ধারণ ক'রছে আমার মাথার খুলির নিচেই। আমি সেই জমাট শব্দের ভারে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

শব্দেই ঘুম ভাঙ্গল। অন্যশব্দ। একটা বনমোরগ তার প্রাকৃতিক অভ্যাসে প্রহর ঘোষণা ক'রছে। কানের কাছেই বলে মনে হ'ল। জাগতেই শুনলাম আরও কতগুলো স্বর। না না জাতের পাখির কণ্ঠ। কলধ্বনি। পাতায় পাতায় ছোট ছোট পাখিদের মাতামাতির শব্দ। উঠে পড়লাম। ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখলাম অনেকটা জায়গাই ফাঁকা। অনেকেই উঠে পড়েছে। আমিও ছাউনীর বাইরে এলাম। বাঁয়ে ডাইনে প্রসারিত রয়েছে পথ। শূন্য নির্জন পথ। কান পেতে শুনতে পেলাম কাদের যেন স্বর ক্রমাগত স্পষ্ট হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমার পেছনেও কয়েকজন উঠে এল ঘুম থেকে। তারা আমাকে পাশ কাটিয়ে ডান দিকে পথ ধরে কয়েক পা এগিয়ে ডানদিকে বনের পথে উঠতে লাগল উঁচুতে। আমি তাদের অনুসরণ ক'রলাম। আমাদের যারা আগে উঠে পড়েছিল তাদের কজন দেখলাম ফিরছে। কিছুটা গিয়েই পাওয়া গেল ক্ষীণ একটি জলের ধারা নেমে আসছে। বুঝলাম ওটি কেন্দ্র ক'রেই আমাদের প্রাতঃকৃত্য।

সূর্যের সন্ধান পাবার আগেই আমরা ছাউনি ছাড়লাম। আবার সেই চড়াই। আমরা কিছুটা ওঠবার পর সূর্য উঠল। এ পাশে গাছপালা ঘন জমাট নয়, বড় গাছেরা কিছুটা ফাঁকা। যারা বেশী উঁচুতে উঠতে পারেনি সেই গাছেরা সংখ্যায় এদিকে বেশী। তাদের স্থান দিতে গিয়েই বড়রা যেন সরে সরে দাঁড়িয়েছে সেই সব ফাঁকা ফাঁকা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আমাদের মাথায় এসে পড়ছে কোমল রোদ। সারাটা দিন যদি রোদটা এই রকমই থাকে—আমি একান্তে ভাবলাম। গতকাল রোদের জন্যে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা আজ মনে পড়ছে। ভয় হচ্ছে। এই চড়াই পথে ওইরকম তীব্র রোদ বড় কষ্টদায়ক। অল্পেই ক্লান্ত ক'রে তোলে। হাঁটতে কষ্ট হয়, শ্বাস টানতেও কষ্ট হয়। সবচেয়ে মুস্কিল হয় সঙ্গীদের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে। ওরা আমার চেয়ে দক্ষভাবে হাঁটে, আমি পেছনে পড়ি। ভয় পাই ক্রমাগত পেছনে পড়ে গেলে একা হয়ে যাবার, লজ্জা পাই ওরা পেছনে আমাকে খোঁজবার জন্যে ফিরে তাকালে। এখন প্রথম চলার বেগে আমি ওদের সঙ্গেই চলছি, কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

বাঁ দিকে রাস্তা থেকে সামান্য দূরে ঢালুতে একটা হরিতকী গাছে বিশাল একটা পাখিকে দেখলাম আনমনে বসে আছে। আমাদের দেখতে পায়নি অথবা

মানুষ সম্পর্কে সে অবহিত নয়। মানুষ যে কি হিংস্র জানবার সুযোগ হয়নি বলে সে পালাল না। আমি সবচেয়ে কাছের দূরত্ব থেকে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম অনেক রকম রঙ পাখিটির গায়ে। কোথাও সবুজ, কোথাও লাল, কোথাও হলুদ। নাম জানিনা। নিজেকে বড় অসহায় মনে হ'ল পাখিটির সম্পর্কে কিছুই জানিনা বলে। নিজের অজ্ঞতার জন্যে ছোটও মনে হ'ল নিজেকে।

এদিকটা বেশ বোঝা যাচ্ছে পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা তৈরীর কাজ চলছে। এই পথ কাটা হয়েছে, এখনও ঢের কাজ বাকি। এর ওপর বোধহয় পাথর বিছানো হবে। পাথরের স্তূপ জায়গায় জায়গায় সারা পথ জুড়ে আছে। হঠাৎ আমার মনে হ'ল রাস্তা কি ভূতে বানায়, রাত্রে? নইলে রাস্তা কাটা আছে দেখছি, সারাপথ ভাঙ্গা পাথরের ঢিবি দেখছি শুধু দেখছি না কারা এগুলো ক'রছে। এখন যে জায়গাটায় এলাম এখানটায় প্রচুর জাফরাণ গাছ। আরও যে কত মূল্যবান গাছ আছে চিনি না বলেই বুঝতে পারছি না। পৃথিবীর এই যে বৈচিত্র জ্ঞানের অভাবের জন্যে এই বৈচিত্রের মধ্যে নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করা গেল না। আমার দুঃখ হল। এত রকম গাছ, এত পাখি, এতরকম পাথর, মাটি, শুধু চোখে দেখায় তৃপ্তি কোথায়?

এক জায়গায় গোটা দল দাঁড়িয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি ক'রল তারপর ক'জন চলল এগিয়ে বাকি সকলে আপন বোঝা নামিয়ে দাঁড়ালি। পথ প্রদর্শক দুজনই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারা তাদের ঘোড়া দুটোর বোঝা নামিয়ে সে দুটোকে মুখের লাগাম ধরে নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে গেল। আমিও থামতে পেরে খুশী হ'লাম। সঙ্গীদের মধ্যে একজন এসে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রল জল খাব কিনা। আমি তার কথা বুঝলাম জবাব দিতে জানি না বলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

কিছুটা নিচেই ঝরণা আছে। নামবার কোন রাস্তা নেই বলেই মনে হচ্ছিল এখন দেখলাম বেশ জায়গা বুঝে পাথরের ওপর পা দিযে এঁকে বেঁকে নামবার পথ খুঁজে নিযে সবাই নেমে গেল, তার আগে ঘোড়া দুটোও এই পাকদণ্ডী বেয়ে নেমে গেছে। আমি ওদের অনুসরণ ক'রতে গলদঘর্ম হযে গেলাম। ওরা যে পাথরটায় অনায়াসে পা রেখে নেমে গেল আমি পা দিলেই হয়ত সেটা নড়ছে। আমাকে নামতে হ'ল সন্তর্পনে। আমরা সবাই ঝরণার জল খেলাম ওপরের দিকটায়, ঘোড়া দুটো একটু নিচে জল খাচ্ছিল। বুঝলাম এপথে যাদের নিত্য যাতায়াত তারা সব সন্ধান রাখে। তবে যে সব জায়গায় জল পাওয়া যায় সেখানটায় পেঁছাতে না পারলে যতই তৃষ্ণা পাক সহ্য ক'রতে হবে। বুক ফাটলেও উপায় নেই। এদিককার পথে হাঁটতে তৃষ্ণাও বেশী হয় কষ্টও খুব, কারণ পাহাড়ের গা কেটে তৈরী রাস্তা। কেটে কেটে তৈরী ঘুরতে ঘুরতে

চলেছে। কোন পাহাড়ের পশ্চিম দিকে, কোনটার পূর্ব, কোনটার তিন দিক ঘুরে রাস্তাটা পাহাড়টিকে প্রায় পেঁচিয়েই ধরেছে। পথের কোথাও ছায়া নেই। একদিকে ঢালু খাদ আর একপাশে দেয়ালের মত উঠে গেছে পাহাড়ের গা। পাহাড়ের গা বেয়ে যে সব গাছেরা তারা কেউ মানুষের এই পথ নির্মাণকে সমর্থন করে না বলেই অসহযোগী। ছায়াপাতে বিরত। যারা পিঠে ক'রে মাল বইছে তাদের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। লাল টকটক ক'রছে, মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত রক্ত এসে জমেছে মুখমণ্ডলে। ঘামে ভিজে সেই মুখ ভয়ানক দেখাচ্ছে। ভালভাবে দেখলাম যারা আমাদের জল পানের অবসরে এগিয়ে এসেছিল কিছুটা এগিয়ে তারা বিশ্রাম ক'রছে বোঝা নামিয়ে। আমরা সবাই তাদের কাছে এসে বসলাম। একটা বিশাল বাঁক সম্পূর্ণ ক'রে এই জায়গাটি সূর্যের আড়ালে। পূর্বদিকে পর্বত দেহ, পূর্বাহ্নে ছায়াপাত তাই পথের ওপরে। দুপুরে রোদ যখন চড়া তখন এই ছায়া পেলে ভাল হত। অথবা সারাটা পথ যদি এমনি ছায়াচ্ছন্ন হ'ত।

হবার নয়। নতুন পথ তৈরী হচ্ছে। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলেছে এই পথ। পাহাড়ের গা বেয়ে কখনো রাস্তা নামছে নিচে কখনো ওপরে উঠছে। কখনো পূবে যাচ্ছে, তারপরই একটা বড় বাঁক নিয়ে উত্তরে। যেদিকেই তাকানো যাক পাহাড় আর পাহাড়। নিবিড় সবুজে সমাচ্ছন্ন পাহাড়। অরণ্য। পথের ধারেই গভীর খাদ। তারই মধ্যে কোথাও হয়ত অনেক নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কলস্বনা নদী। কোথাও দুটো পাহাড়ের দূরত্ব বেশী বলে অনেকটা অঞ্চল জুড়ে গভীর বন। কোথাও দু পাহাড়ের দূরত্ব কম হওয়ায় খাদ সংকীর্ণ, স্বল্প পরিসর। সবে মিলিয়ে, এমন কি মাথার ওপরকার নিঃসীম নীল আকাশকে ধরে একটা বিশাল পরিবেশ। এই বিশাল পরিবেশে আমরা কজন প্রাণী চলেছি যারা এর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। এই পরিবেশের আমরা আপন নই। এখানে আপন আনন্দে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন কিশলয়, মহীরুহের বুকের গভীরে ছোট নীড়ে জন্ম নেয় হলুদ পাখীর ছানা, কোন বিশাল পাথরের আড়ালে ভূমিষ্ঠ হয় ভল্লুক সন্তান বা দাঁতাল আরণ্যক শিশু-সন্তান। তারা এই পরিবেশেই বেড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে। এ তাদের নিজস্ব জগৎ, তারাও এজগতের একান্ত আপন। আমরা নই। আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগল। এই বিশাল শূন্যময় পরিবেশে এই ক'জন এ তো এ কাকীত্বেরই সামিল। একদা মনে হ'ল এই পাহাড় বনস্থলীর সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে আমি যেন একা পথ চলছি। চলেছি কোন দিগন্তের দিকে যা আমি নিজেই জানিনা। আমার সামনে, পেছনে, ওপরে, নিচে সর্বত্রই শূন্যময় পরিবেশ। ওপরে নীল, নিচে সবুজ। নীলেরও শেষ নেই, সবুজেরও নেই সীমা। আমি একটা মানুষ, অথচ কি ক্ষুদ্র। কতটুকু আমার অস্তিত্ব?

একসময় পা দুটো খুব ভারী লাগল। নিজের পা অথচ নিজেই যেন ওঠাতে পারছি না। পায়ের দিকে তাকিয়ে যে দেখব সে অবসরও নেই। চলছি চলতে হচ্ছে। সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলতে হচ্ছে যাতে পেছিয়ে না পড়ি। যে ক'রেই হোক সঙ্গীদের সঙ্গে যেতে হবে, পিছিয়ে পড়া চলবে না। কাজেই ভারী পা দুটো টেনে টেনে চলতে লাগলাম। হাঁটুর ওপর ঊরুর মাংস পেশীতে প্রবল ব্যথা জমে উঠেছে। সেই ব্যথার জন্যে এখন মনে হচ্ছে কোন ছোট মাংসাশী প্রাণী যেন কামড়ে ধরে আছে। ঝুলছে। নিজের এই অবস্থায় যখন হতোদ্যম হযে পড়ছি সেই সময় আমাকে পাশ কাটিয়ে দুজন এগিয়ে গেল তাদের দুজনেরই পিঠে দুটো চালের বস্তা। নিজেকে কেমন ছোট মনে হ'ল। ওরা অত ভারী বোঝা নিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে? আমি ভার শূন্য হয়েও ওদের সঙ্গে হাঁটতে পারছি না? এ লজ্জা তো গোপন করবারও নয়! প্রাণ বাজী ধরেই তাই এগিয়ে চলতে চেষ্টা ক'রলাম যাতে ওরা আমায় ছাড়িযে যেতে না পারে। দুপুরে এক জায়গায় খাওয়ার জন্যেও তো অন্তত থামতে হবে! সে জায়গাটা যে কতদূরে চলার মধ্যে সেই চিন্তাটাই প্রবল হয়ে রইল।

সন্ধ্যাকে সবাই ভয পাই। আমি তো পাচ্ছিই আমার সঙ্গীরাও সবাই পায় দেখছি। কেন যে পাই বুঝি না। ব্যাখ্যা খুঁজি, ভাবি, হদিশ পাই না। দিনেও যে পথ রাতেও পথ তো সেই পথই থাকে! অন্ধকার হলেই যেন মনের মধ্যে কোথা থেকে এসে এক আতংক ঢুকে পড়ে। এক অজানা আৎতক যাকে চিনি না পর্যন্ত। এই আতংক অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। পথ চলার অসুবিধের জন্যে ঠিক নয় কারণ আমরা যে সময় চলছি এটা শুক্লপক্ষ। আকাশ আলোয় ভরে থাকে, সে আলোর প্রতিভাসে পৃথিবীর পথও বেশ ভাল ভাবেই চিনে নেওয়া চলে। কিন্তু তাতেও ভয়ের কোন তারতম্য হয় না। চাঁদের আলোর অবদান এখানে অতীব অপ্রতুল। অথচ আমি গত রাত্রে পরিষ্কার দেখেছি পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় চাঁদের আলোর মায়াময় অবস্থিতি। পাহাড়ের গভীর খাদগুলোয় তার রহস্যময় আলোকসম্পাত। জানি না সে আলোর কি ভূমিকা হরিণ কি নীলগাই-এর চোখে, তারা সেই আলোয় অরণ্যছায়ে পায় কিনা কোন মায়ার সন্ধান। এখানে তো ভল্লুকদের আবাস, এই নরম আলোর মায়ায় কি কোন শিশু ভল্লুক ঘুমোতে চায় না মাযের কোলে নিবিড় শয্যা পেযেও? শিশু মর্কট কি মায়ের বুকের মধ্যে থেকে মুখতুলে দেখে নেয় আকাশ? হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গা কোন পাখি কি জড়িত কণ্ঠে ডেকে ওঠে তার সঙ্গিনীকে?

আমাদের কিন্তু ভয় করে। ভয় কাটে না। সারারাত ভয়ের কাঁথা গায়ে জড়িয়ে চার পাশে আগুনের গণ্ডি দিয়ে ঘুমোই। ঘুম ভাঙ্গুক এটা কিছুতেই চাই না। কারণ অকস্মাৎ ঘুমভাঙ্গা চোখে ঝুপড়ি জাফরাণ গাছকেও গুঁড়ি মেরে

বসে থাকা কোন শ্বাপদ বলে ভ্রম হয়। আতংকিত হই। এই ক'দিন একসঙ্গে চলতে চলতে এদের ভাষা কিছুটা বুঝতে পারছি। বেশ কয়েকটা শব্দ বুঝে ফেলার দরুণ কিছু বাক্য অনুমিত হয়ে যাচ্ছে। আমি বলতে পারছি না ঠিকই কিন্তু বুঝতে যে পারছি এ-ও যথেষ্ট। তাই একসময় বুঝলাম সকলে শংকিত ভল্লুকের ভয়ে। এই এলাকায় নাকি বন ভরা ভল্লুক। যখন তখন তারা পথ চলতি মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যাকে নিয়ে যায় তার দেহ বহু বনবাসীরই কাজে লেগে যায় শেষ পর্যন্ত। কারণ ভল্লুকেরা রক্তের অধিক আর কিছু গ্রহণ করে না। বাঘ হিসেব ক'রে চলে। দলের মধ্যে আক্রমণ করে না। ভল্লুক কৌশলী। ভল্লুক ক্রূর। দু দিন ধরে ভল্লুক সংক্রান্ত অনেক কথাই শুনেছি এদের কাছে। যতটুকু বুঝেছি তাতে ভল্লুক চরিত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় হচ্ছে। এই লোকগুলোর দেখলাম হাতি সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধা। এরাও বনের মানুষ। অন্য বন। তরাই-এর বাসিন্দা এরা। এত উঁচু পাহাড়ে হাতি থাকেনা তবু পথ চলার ফাঁকে ফাঁকে কথা যখন উঠছে, ভল্লুকের কথাই বেশী উঠছে সদ্য আতংকের জন্যে। সেই সঙ্গে অন্য সব প্রাণীর কথাও উঠছে। তাই হাতির কথা জানছি। হাতি নাকি জ্ঞানত কারও ক্ষতি করে না, যদিনা তার কোন ক্ষতি করা হয়ে থাকে। তাও ছোট খাট ত্রুটির দরুণ হাতি অসন্তুষ্ট হয়ে রুষ্ট হলে মার্জনা চাইলে ক্ষমাও নাকি ক'রে দেয়। হাতির এ হেন চরিত্রের প্রত্যক্ষদর্শী এরা অনেকেই। যে যার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে। আমি সব শুনি। আমার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই নেই। যদিও আমি অনেকদিনই অরণ্যবাসী তবু আমার কোন সুযোগ আসে নি ওদের স্বভাব প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের। ইচ্ছে কিন্তু করে। খুবই ইচ্ছে করে অরণ্যের যারা আসল প্রাণী তাদের মধ্যে থেকে দেখি তাদের জীবনের প্রকৃত কি রূপ। হাতি সম্বন্ধে তো এর আগেও কিছু কথা শুনেছি, তবু যেন মনে হয় সব শোনা হয়নি। আসলে আমরা, এই মানুষ নামের প্রাণীরা অন্য প্রাণীদের কখনো বুঝতেই চেষ্টা করি নি। সামঞ্জস্যহীন স্বার্থপরতায় আমরা এত দিন যে অন্যের মহত্বগুলোকে পর্যন্ত বিচার করবার পাই নি অবকাশ। আত্মচিন্তা সুখস্পৃহা, লালসা, লোভ—আমাদের চালিত করে। প্রকৃতির দানে আমাদের শক্তি একদিকে যেমন বিশাল, আপন মানসিকতায় তেমনই আমরা ক্ষুদ্র। এই দুইয়ে সামজস্য হয় না। পরস্পর বৈপরীত্যে তৈরী এক বিচিত্র প্রাণী আমরা, স্বভাব বৈশিষ্টে অনেক প্রাণীর তুলনায় নীচ। অনেক নীচতা আমরা সঞ্চয় ক'রে রাখি জয় করার জন্যে, অধিকার করার ইচ্ছায়। অধিকতর ভোগ করবার বাসনায়।

ভয়ও বোধহয় আমরা অনেকটা ইচ্ছা ক'রেই পাই, অর্থাৎ জীইয়ে রাখি অন্যকে জয় করবার জন্যে, যাতে তাকে জয়ের ইচ্ছায় বিবেক এসে না প্রতিবন্ধকতা করে।

যাকে ভয় না পাই তাকে ধ্বংস করবার সহজ অছিলা আর কি পেতে পারি? ঘৃণা? সবাইকে, সব কিছুকে ঘৃণা করবার উপায় থাকে না। যে মহৎ তাকে ঘৃণা ক'রব কি ক'রে? কাজেই সহজ পদ্ধতি হিসেবে ভয়টাই পেতে হয়, সেটাই আমাদের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

এখানটায় বেশ ঠাণ্ডা। দিনের বেলা পথ চলার শ্রমে বুঝতে পারি নি এখন টের পাচ্ছি। সবাই পাচ্ছে কম আর বেশী। এখানকার ঘরটার সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা সমান মনে হচ্ছে। একটা বিশাল পাথরের ওপরটায় চাতাল তৈরী হয়েছে। তারই ওপর আমরা একটা কাঠের গাদা ক'রে আগুন জ্বালিয়ে ঘিরে বসেছি। গল্প হচ্ছে সেখানেই। সামনে অমন গনগনে আগুন তবু যেন ঠাণ্ডা কাটছে না। ওই ঠাণ্ডাটাকেই মনে হচ্ছে ভল্লুক—পিঠের দিক থেকে এসে কামড়াচ্ছে। চাঁদ আজ এখনও দেখা দেয় নি। আমি এই অন্ধকারকে বিশ্বাস ক'রতে পারছি না বলে চাঁদকেই চাইছি মনে মনে এমনি সময় আমাদের ঘরের পেছন থেকে দুটো অন্ধকার পিণ্ড যেন নড়ে উঠল। অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না অন্য অনেকের সঙ্গেই আমারও চোখ পড়েছিল প্রথম মুহূর্তেই চমকে উঠলাম। নিশ্চয়ই ভল্লুক। নইলে বেপথে পাহাড়ের গা বেয়ে বন ভেঙ্গে এভাবে আর কোন জন্তু আসবে! ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের পথ প্রদর্শক ভুটিয়াদের একজন মুখে একরকম শব্দ ক'রে উঠল। নিমেষের মধ্যে চলমান অন্ধকার থেকেও প্রায় অনুরূপ শব্দ ছিটকে এল। আগুনের কাছাকাছি এলে আঁধারের পিণ্ড দুটিকে দেখলাম। কি ধরণের প্রাণী বুঝলাম না। কাপড় চোপড়ে প্রায় সারাদেহই ঢাকা আসলে একটা জোব্বা বা আলখাল্লা ধরণের বিরাট পোষাকে গলা থেকে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঢাকা। মাথার ওপরেও একটা ক'রে টুপি—যেন ঝুড়ি উপুড় ক'রে দেওয়া আছে। জামার ওপর দিয়ে গলায় ঝুলছে একগাদা মালা। নানা রঙের, বিভিন্ন ঢঙের পাথরের তৈরী সেই সব মালাগুলোর মতই একটা মালা একজনের হাতে। অন্যজনের হাতে একটা বড় বল্লম, কোমরে ঝুলছে একটা চৌকো মাথা খাপহীন তরোয়াল যার দু দিকেই ধার। সেই লোকটা একটু ঝুঁকে আসছিল বোধহয় অনেকটা চড়াই ভেঙ্গে উঠেছে বলেই। ওরা দুজন সামনে আসতেই আমাদের সঙ্গের ভুটিয়া দুজন উঠে দাঁড়াল। কি সব কথা অনর্গল শব্দ ক'রে বলে গেল আগন্তুকদের উদ্দেশ্য ক'রে। যে লোকটি ঝুঁকে পথ চলছিল সে পিঠ থেকে কি একটা ভারী বোঝা দুম ক'রে ফেলল আমাদের সামনেটায়। একটা বিকট গন্ধ নিমেষেই এলাকার বাতাস দুঃসহ করে তুলল। অত ভারী বোঝাটা যে কি আমি অনুমান ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম। আগুনের পাশেই পড়ে আছে মুণ্ডহীন একটা চতুষ্পদ কোন প্রাণীর দেহ। সম্ভবত শুকর। চারটে পায়েরই নিচের দিকটা কাটা। কি একটা লতা দিয়ে বাকী অংশ বেঁধে ঝোলাবার ব্যবস্থা

করা হয়েছে যা লোকটির পিঠের সঙ্গে ঝোলানো ছিল। দেখে পরিষ্কার বোঝা যে শুয়োরটা সদ্য কাটা নয় কিছুক্ষণ আগেও নয়, কিছুদিন আগে কাটা বলেই মনে হচ্ছে যার জন্যে দুর্গন্ধটা বেরিয়েছে। তাহ'লে ওটা পিঠে ক'রে বওয়া কেন? আগুনের তেজ আলোর শিখাকে উজ্জ্বল ক'রেছিল বলে স্পষ্ট দেখা গেল লোকটার জামার পিঠে মৃত শুয়োরের রস গড়ানোর রেখা শুকিয়ে আছে। তাহ'লে কি ক'দিন ধরেই ওটাকে বইছে? কতটা পথ ভেঙ্গে যে এসেছে মুখ দেখে তার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। লোক দুজন আগুনের সামনে বসল। সমানে কথা বলছিল। একটা ক'রে বড় নলের মত বের ক'রল দুজনেই নিজের নিজের জামার ভেতর থেকে। তার এক প্রান্ত মুখে ঠেকিয়ে কুণ্ড থেকে আগুন তুলে অন্য প্রান্তে ধরাল। সবাই কথাবার্তা বলছিল আমারই কিছু করার ছিল না। একা চুপ ক'রে বসে শুয়োরের দেহটার ওপর অগ্নি শিখার প্রতিচ্ছায়া দেখতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ ওই শুয়োরটার দিকেই চেয়ে আছি একসময় মনে হ'ল ধড়টা কি একবার নড়ে উঠল না! ভাল ভাবে দেখবার জন্যে চোখের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ক'রে নিলাম। এই মনে হয় স্থির, এই মনে হয় নড়ে উঠল। নড়ে ওঠাটা যে ঠিক নয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হলেও সেই অলীক ভ্রান্তি মন্দ লাগছিল না। আমি একভাবে ওই দিকেই চেয়েছিলাম কারণ আমার তো আর কিছু করবারও ছিল না! এতগুলো মানুষের মধ্যে আমি একা। আমার সঙ্গী কেউ নেই অথচ সকলের সঙ্গেই আমার দিনরাত্রির চলা থাকা ঘুমোনো এবং খাওয়া। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে একসঙ্গেই মরব। আসলে ভাষার ব্যাপারটা এতই অমোঘ যে তার ব্যবধান ঘোচানো যায় না। ভাষাটা রূঢ় সত্য। জন্মগত এই পার্থক্য প্রকৃতির সৃষ্টি। একে অতিক্রম ক'রতে হয় আয়াসে। এই ব্যবধান দূর ক'রতে না পারলে মানুষের অবস্থানগত নৈকট্য সত্বেও দূরত্ব দূর করা যায় না।

একজন একটা লাঠি দিয়ে আগুনটা খুঁচিয়ে দিল। আমি নড়ে চড়ে বসলাম। ভাল লাগছে না। বসে থেকে থেকে শরীরে কেমন একটা বিরস ভাব এসে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ি। কেউ যাচ্ছে না দেখে যেতে পারছি না। কথাবার্তা বলতে পারি না কি জানি যদি এমনই পথ হয় যে রাতেই ওরা রওনা হবে! আমাকে হঠাৎ বাঁ পাশের লোকটি বলল, বাবু, যাও শুয়ে পড়ো। ওপাশে শোবে না, এদিকটায় শুয়ো।—তার অনেকগুলো কথার মধ্যে এইটুকু মাত্র বুঝলাম। তবে তার কথা বলায় যে কিছুটা প্রীতি ছিল তা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না। আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। দেখলাম আমি শুতে না শুতে আরও দু একজন উঠে এল। আমার ঘুম আসতে বিশেষ দেরী হ'ল না।

অন্যদিনের তুলনায় অনেক আগে ঘুম ভাঙ্গল প্রবল কলরোলে। উঠে বসেই দেখি সে কি উত্তেজনা! অন্ধকার ভাল ক'রে কাটে নি তবু বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে

সব মানুষই জেগে উঠেছে এবং উত্তেজিত। ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে কান এবং চোখ দুটোই সজাগ হ'ল। তারা যে কি বলাবলি ক'রছে ভাল বুঝলাম না। কজন দাঁড়িয়ে, ক'জন বসে প্রায় সবাই কিছু না কিছু বলছে। একজন দেখলাম দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গ'ুজে বসে আছে। একজন খুবই উত্তেজিত হয়ে মশাল জেলে ফেলল। সেই আলোয় ক'জনের মুখ দেখলাম থমথম ক'রছে। কারও চোখে আতংক। আর থাকতে পারলাম না, এই ক'দিনে যেটুকু ভাষা শুনে শুনে শিখেছিলাম তারই প্রয়োগ ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম, কি হয়েছে ?

আমার প্রশ্নের এমন প্রতিক্রিয়া হবে বুঝি নি। একজন প্রায় হাউমাউ ক'রে বলল, হুজুর ভল্লুক এসে রতনবাহাদুরকে তুলে নিয়ে গেছে।

কে রতন বাহাদুর জানি না কিন্তু ব্যাপারটায় এমনই আকস্মিকতা ছিল যে আমিও প্রথম ধাক্কায় বিমূঢ় হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেল ভল্লুক। এর চেয়ে ভয়াবহ বিস্ময় আর কি থাকতে পারে? তাহ'লে তো আমাকেও—। এই রতন বাহাদুরের অবস্থা তো আমারও হতে পারত। নিজের কথা ভেবেই আতংকিত ও বিমর্ষ হলাম। সেই মানুষটার জন্যে যতটুকু চিন্তা না হ'ল তার চেয়ে বেশী হ'ল স্বার্থ চিন্তা। নিজের কথাই ভাবছি। লজ্জিত হ'লাম। নিজের কাছেই যেন নিজে ছোট হয়ে গেলাম। তাই ভাবতে চেষ্টা ক'রলাম দলের কোন লোকটির নাম রতন বাহাদুর হ'তে পারে। ইতিমধ্যে মশাল হাতে ক'রে জন কয়েক ভোজালী লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ঘরের ওপাশ দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেল। ওদিক দিয়েই ভল্লুকটা নিয়ে গেছে রতন বাহাদুরকে। এতক্ষণ কি আর অবশিষ্ট কিছু আছে ? মনে মনে ভাবতে চেষ্টা ক'রলাম। এই অরণ্যে কোথায় তাকে খ'ুজে পাবে এরা ? তবু যে খ'ুজতে গেল এটাই সহযাত্রী সুলভ কর্তব্য। আমি ওদের প্রশংসা ক'রতে চাইলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আলো ফুটে উঠল অথচ আজ কেউ প্রাতঃকৃত্য ক'রতে বনগমনের উৎসাহ প্রকাশ ক'রল না। আমি প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে অনুমান ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম রতন বাহাদুরকে আন্দাজ ক'রতে পারি কিনা। সেই অনুপস্থিত মানুষটাকে মনে ক'রতে পারলেও যেন কিছুটা কর্তব্য করা হবে এমনি মনোভাব নিয়ে মুখ খ'ুজে চললাম। যে ক'জন মশাল নিয়ে বেরিয়েছে তাদের মুখ দেখে নিয়েছি। আগুনের হলকায় দেখেছি তাদের মুখমণ্ডলের ক্ষুব্ধ শপথ। এখানে যে কজন আছে তাদের মুখ দেখে কিছু অনুমান করবার আগেই ব্যর্থ অনুসন্ধানী দল ফিরে এল। তাদের সারা শরীরে হতাশা নিবিড় ভাবে প্রলিপ্ত। এবার আমি একে একে সমস্ত মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। ভোরের আলোয় দিনের আভাস। হঠাৎ যেন বড়ই নিষ্ঠুর ভাবে একজনকে মনে পড়ল। মনের মধ্যে ধক্ ক'রে উঠল। সেই যে লোকটি কালরাত্রে আমাকে বাঁ পাশ থেকে

বলেছিল, বাবু যাও শুয়ে পড়। ওদিকটায় শুয়ো না, এপাশে শুয়ো—সেই লোকটি তো নেই। সেই মুখটি তো আগুনের শিখায় স্পষ্ট দেখেছিলাম আমি। মনেও আছে। সেই মুখ তো অনুপস্থিত। আমি জানতে চাইলাম সবাই আছ তো?

আছে। সকলেই বুঝে নিয়ে জানাল। এবার ব্যথা পেলাম। যে ব্যথার জন্যে এতক্ষণ কোন প্রস্তুতি ছিল না সেই ব্যথা অকস্মাৎ বুকের মধ্যে অত্যন্তই তীব্রভাবে বাজল। যে মানুষটা সম্পূর্ণ অজাচিত ভাবে সতর্কিত ক'রে আমার মত অনাত্মীয় অপরিচিতের প্রাণরক্ষার চিন্তা ক'রেছিল সেই মানুষটাই হ'ল সেই ভবিতব্যের শিকার। সে তো সজাগ মানুষ তবে কেন এমন হ'ল? সে নিজে কেন ওই প্রান্তে শু'ল যেখানে শুতে সে আমাকে নিষেধ ক'রেছিল? সচেতন মানুষ হয়ে সে কি ক'রে বিপদে পড়ল? ব্যাপারটা আমার কাছে এক বিরাট রহস্য হয়ে রইল। একটু বাদে ওদের মুখে জানতে পারলাম কাল রাত্রের আগন্তুক দুজনও কখন যে উধাও হয়ে গেছে কেউ জানে না। ভোজবাজীর মত উবে গেছে তারা। তাদের কোন চিহ্ন নেই। আসলে ওরাই নাকি মায়া ভল্লুক। অমনি ভাবে এসে রতন বাহাদুরকে তুলে নিয়ে পালিয়েছে এই রকম একটা ধারণা অনেকের মনে বাসা বেঁধেছে বলে সেই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। শুনে দু একজন মন্তব্য ক'রল, তা নয় ওই লোক দুটি ভল্লুকদের দেবতা। ওরাই ভল্লুকদের হয়ে মানুষকে ভোলায়। ওদের কথামতই ভল্লুকেরা চলাফেরা করে। আর ভল্লুকদের মানুষ জোগাড় করার জন্যেই ওরা এমনিভাবে ঘুরে বেড়ায়। অপদেবতা ওরা।

কিন্তু ওরা তো কথাবার্তা বলেছিল—আমার সন্দেহ আমি প্রকাশ ক'রলাম।

ওরকম বলে। —একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলল, সে আরও বলল, আমাদের ভুল হয়েছিল ওদের শুয়োর নামাতে দিয়ে। ওটা মাটিতে নামাতে না দিলে ওদের ক্ষমতা কাজ ক'রত না।

আমি ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল লোকটা ফিরবে। হয়ত গেছে সকালের কাজ কর্ম ক'রতে, বনের মধ্যে পথ চিনে ফিরতে দেরী হচ্ছে আসবে এখনই। সে যে একেবারে হারিয়ে গেছে এ কথাটা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমি শুধু চারপাশে তাকাতে লাগলাম রতন বাহাদুর নামক এক পলকের চেনা বড় মাপের হৃদয় সম্পন্ন মানুষটার ফিরে আসবার শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায়। কেউ কোন পরামর্শ না ক'রেও আজ বহুক্ষণ অপেক্ষা ক'রলাম। অনেক বেলা পর্যন্ত রইলাম সবাই। আসলে আমার মতই সবাই মনে মনে চাইছিল তার আকস্মিক ফিরে আসা। কিন্তু সে এল না।

গভীর ব্যথা বুকে নিয়ে আমরা আবার পথ ধরলাম। বিচিত্র মানুষ দুটো যে রাত্রে কোথা থেকে এল এবং তারা যে কারা একাবনা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। আমি ভেবে পেলাম না ওদের কথামত ভল্লুক চলাফেরা করে বলে কে

সবাই বলছে সেটা আদৌ সত্যি হ'তে পারে কিনা। কি ক'রে তা হয়? অথবা আর একদলের মতটাও বিশ্বাসযোগ্য বলে আমার মনে হ'ল না যে ওরাই আসলে ভল্লুক, মায়ায় ছদ্মবেশ ধরে এসেছিল। তবে লোকদুটি বিশেষ কোনও জাতির যে নয় এ বিষয়ে সকলেই একমত। ওদের পোষাক পরিচ্ছদ একেবারেই নিজস্ব। আচার ব্যবহারও বিচিত্র। বিশেষ এক শ্রেণীর উপজাতির সঙ্গে পিঠে মাংস বেঁধে ঘোরবার রীতির মিল থাকলেও সে জাতিভুক্ত ওরা নয়। ভুটিয়াদের মত মালা থাকলেও ভুটিয়াও নয় ওরা। তবে কোথা থেকে হঠাৎ বন ফুঁড়ে এল আর সবার অলক্ষ্যে মিলিয়েই বা গেল কি ভাবে? আমার মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিল হয়ত ওরাই ভুলিয়ে নিয়ে গেছে রতন বাহাদুরকে। নরখাদক বা অনেক রকম লোকের কথা তো শুনেছি বনে জঙ্গলে আছে, হতে পারে এরা সেইরকমই কেউ। রতন বাহাদুর ওদের খাদ্য হতে গেছে!

আমরা রতন বাহাদুরের বদলে তার স্মৃতি নিয়ে ভয়ানক খাড়াই পথে চলতে লাগলাম। এখানে যে পথ তৈরী হচ্ছে তা অসম্পূর্ণ। এত চড়াই যে উঠতে দম বন্ধ হয়ে যাবার মত। একটু পথ উঠে থামতে হচ্ছে। কয়েক পা উঠেই পা ধরে যাচ্ছে। উরুর পেশীতে টান ধরছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছে রতন বাহাদুর বুঝি সকলের পেছনে অনেকটা দূরে আসছে। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখছি। মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা এখনও যেন আছে যে রতন বাহাদুর ভল্লুকের হাতে পড়ে নি সে হয়ত আসবে, আসছে। অনেকটা পেছনে পড়ে গেছে সে, ধীরে ধীরে একা হেঁটে আসছে অনেকটা নিচে। কোন বাঁকে হয়ত তাকে দেখা যেতেও পারে এমনি আশায় নিচের দিকেও দেখছি নিচের পথ দেখতে পেলে।

এমনি ক'রে চলতে চলতে একসময় ক্রমাগত জল পড়ার শব্দ শুনতে লাগলাম। যতই চলি জল পড়ার শব্দ বেড়েই চলে। দুবার বাঁক ঘুরে ডানদিকে মোচড় দিয়েই পথ ক্রমাগত নিচু হয়ে গেছে। অনেকটা উৎরাই। তবে এই নিচু হয়ে যাওয়া কিন্তু আকস্মিক নয় ধীরে ধীরে খুব সামান্য ঢালু। আর দেখলাম এই ঢালু জায়গা দিয়ে বয়ে চলেছে অবিরাম জল ধারা। ডান দিকে পাহাড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে জল বাঁ দিকে খাদে নেমে যাচ্ছে। খাদে যে পড়ছে সেটা প্রায় লাফ দিয়েই। তবে পরিমাণে সে জল কম বলে বলার মত প্রপাতের সৃষ্টি হয় নি বা নামডাক হয়নি। পায়ের পাতা ডুবে যাওয়া জল পার হতে হতে ভয়ে ভয়ে বাঁ দিকে চেয়ে দেখতে চেষ্টা ক'রলাম রুক্ষ পাথরের গা বেয়ে বেয়ে আরও ছিটিয়ে জল নিচের দিকে বনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। হয়ত গাছ গাছালির আড়ালে লোক চক্ষুর অন্তরালে একত্র জমায়েত হয়ে একটি শীর্ণ প্রাণবন্ত স্রোতোধারার মূর্তিতে যাচ্ছে কোন সমতলের সন্ধানে। ভাল ক'রে দেখতেও সাহস হচ্ছে না ভয়ে যে এই বুঝি ধসে পড়ে পাথর, ধসে পড়ে

পাহাড়, আমি তলিয়ে যাই। পায়ের তলা থেকে জলে ভেজা মাটি পাথর যে কোন মুহূর্তে খসে যেতে পারে। সন্তর্পণে পথ চলছি এদিকে ওই খাড়াই ওঠবার জন্যে শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। এখন শুধুই মনে হচ্ছে এভাবে এসে আদৌ ভাল করিনি। পথ এখনো বাকি। সেই পথ পার হতে পারবো এমন আশা আর কিছুতেই ক'রতে পারছি না। মনে হচ্ছে মরে যাব। পথেই কোথাও কোন দুর্ঘটনায় মরে পড়ে থাকব কোন অতলে। নইলে হয়ত চলতে চলতে একসময় শরীর অবশ হয়ে যাবে আমাকে ফেলে এগিয়ে যাবে এরা সবাই, আমি কোন আরণ্য প্রাণীর খাদ্য হবো। সে বড়ই বেদনাদায়ক নির্মম মৃত্যু। রতন বাহাদুরের নিখোঁজ হবার পর সেই ভাবনাই ভার হয়ে উঠল মনের মধ্যে। এই উতরাইটুকু শেষ হতে সময় আদৌ লাগবে না এর পরই আবার খাড়া পাহাড় ডিঙ্গানো পথ। সেই পথের কথা ভেবেই দমে যাচ্ছি। আর এক পা চলতে ইচ্ছে ক'রছে না। যা হয় হোক এখান থেকেই ফিরে যাব।

জলটা পার হয়েই পথ উঁচু হতে লাগল। ধীরে খুব সামান্য কিন্তু সামনে দেখা যাচ্ছে অনেকটা খাড়া। ওই খাড়াই পার হবার কথা ভেবে দমে গেলাম। ফিরব ভাবছি অথচ এ পথ একা ফেরার নয়। একা এপথে ফিরতে হলে ক'মিনিটের মধ্যে মৃত্যু নেমে আসবে সে অনুমান আগাম অসম্ভব। নিজের নিবুদ্ধিতার বোঝা নিঃশব্দেই বইতে লাগলাম নিরুপায় অসহায়তায়। পায়ের এক জায়গা হঠাৎ চুলকে উঠল। তীব্র চুলকানির জন্যে সেখানটা দেখতেই হ'ল। কি যেন একটা ছোট্ট পোকা কামড়ে ধরে আছে। হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রলাম। সহজে ছাড়ল না। এই নখ দিয়ে ধরে চিমটি দিয়ে ছাড়ালাম। রক্ত ঝরতে লাগল। আপন রক্ত দেখলে বোধহয় সবাই ভয় পায়। আমিও ভীত হয়ে পড়লাম ক্রমাগত রক্তক্ষরণ দেখে। বাধ্য হয়ে সঙ্গীদের মধ্যে মাতব্বর গোছের একজনকে ডেকে দেখলাম। সে দেখল। অন্য সবাই চলছে কিন্তু সে ওখানেই পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। ফলে আমরা দুজন পেছিয়ে পড়লাম। খুব ধীরে কি যেন খুঁজে খুঁজে আমরা চলছিলাম। কি যে খুঁজছি আমি নিজেই তা জানি না এমনই এক আশ্চর্য অবস্থা। অবশেষে একটা ছোট গাছালি ছিঁড়ে এনে তার পাতা টিপে লাগিয়ে দিল আমার ক্ষতস্থানে, রক্তক্ষরণের মুখে। বলল, চলুন। রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

আমরা অনেকটা পেছিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের একান্ত চেষ্টা হ'ল এগিয়ে গিয়ে মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলে যাওয়া। এই নির্জনতা যে আদৌ নির্জনতা নয় সেই ভীতি আমাদের সন্ত্রস্ত ক'রে রাখছিল। সব সময়ই মনে হচ্ছিল এই বুঝি খাদ থেকে উঠে আসে বিশাল কালো জন্তুটা, অথবা অন্য পাশের উঁচু পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ঘাড়ের ওপর। নিঃসঙ্গতা সময়ে সময়ে যে কি ভয়াবহ

হয়ে উঠতে পারে তা এখন যেমন ভাবে উপলব্ধি ক'রলাম তেমন আর আগে করিনি। বেশী জোরে চলার ভয় হচ্ছিল পাছে পাতাটা পা থেকে খসে পড়ে যায়, আবার রক্ত ঝরতে আরম্ভ করে। একবার দেখেও নিলাম, না আছে। মনে হচ্ছে ক্ষতের মুখে আটকে গেছে বেশ শক্ত হয়ে। কাজেই হাঁটা চলে। কিন্তু এই খাড়া চড়াই পথ চলা আমাদের মত সমতলভূমির লোকের পক্ষে খুবই কষ্টকর। দ্রুত চড়া তো অসম্ভবই প্রায়। আমার সঙ্গীরা সবাই পাহাড়ী মানুষ। তাদের পদযাত্রায় পাহাড় নিত্যদিনের পথ। তাল রাখতে আমার এমনিতেই তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে তাতে আবার পিছিয়ে পড়ে এগিয়ে গিয়ে ধরা। প্রাণের দায়ে অসম্ভবের চেষ্টায় আমাকে প্রাণপাত ক'রতে হচ্ছে। এই যাত্রার শেষপ্রান্তে পৌঁছাব এমন বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ প্রাণ নিয়ে পৌঁছান যে হবে না সেটা এখন আমার বদ্ধমূল ধারণা। আর আমার নিষ্প্রাণ দেহ যে এরা বয়ে নিয়ে যাবে না সেটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই দুর্গম পথে সবাই কষ্ট করে বইছে প্রাণ ধারণের উপকরণ। শুধুমাত্র মূল প্রয়োজনীয় বস্তু, যেটা না হলেই নয়। আমার মৃতদেহ কোন কাজে বইবে তারা? তা দিয়ে হবেই বা কি? কাজেই মৃত্যু যখন পথের মধ্যেই নিশ্চিত তখন কষ্ট ক'রে আর কি লাভ? এক সময় ভাবলাম কোথাও একটা বসে পড়ি। কষ্ট না ক'রে অপেক্ষা ক'রতে থাকি বিনা আয়াসে যে মৃত্যুই আসে আসুক।

কিন্তু এল না। আমিও আমার ভাবনা কাজে লাগাতে পারলাম না। চলতেই লাগলাম। প্রাণের বাজীতে মূল দলকে ধরেও ফেললাম এক সময়। মৃত্যু এল না পরিবর্তে এল ঝাঁক ঝাঁক ক্ষুদে মাছি। মাছির মত পোকা। এই এলাকাটা তাদেরই। কোথা থেকে কিভাবে যে উড়ে আসছে বুঝছি না, শরীরের সর্বত্র বিঁধছে তাদের কামড়। সহগামী বন্ধুরা বলল, ডামডিম। কিছু না কি করবার নেই। দেখলাম সবাই মুখ বাঁচাবার চেষ্টা ক'রছে। আমিও অনুকরণ ক'রলাম। খারাপ কাজ কখনও কখনও ভাল ফলও দেয়, আসলে ব্যবহারের ওপরই সব কিছু নির্ভরশীল। কখন কিভাবে প্রয়োগ হবে তার ওপরই ভাল মন্দ নির্ভর করে। অনুকরণ খারাপ হলেও এখন অনুকরণের গুণেই আমার মুখ রক্ষা ক'রল। পরের দিন গিয়ে যখন বমডিলা পৌঁছালাম তখন একমাত্র মুখ ছাড়া সারা শরীরে ডামডিমের কামড় ভালরকম ক্ষত সৃষ্টি ক'রেছে। হাতে ঘা, পায়ে ঘা, জামার নিচে পিঠে বুকে ঘা—এক বীভৎস অবস্থা।

সেই অবস্থায় যে স্বর্গে এলাম তার সঙ্গে ভালুক পুং এর তফাৎ সামান্যই। আবহাওয়াগত তফাৎটা বড়ই প্রকট। ঠাণ্ডাটা বেশী। পথের কষ্ট আমার সমস্ত উৎসাহ এমনভাবেই নিভিয়ে দিয়েছিল যে জায়গা সম্বন্ধে বা কাজ সম্পর্কে আগ্রহের লেশমাত্র আমার মনের কোথাও অবশিষ্ট ছিল না। আমাদের আস্তানার সামনে

পেঁছেই আরও অনেকের মত আমি প্রথমেই শুয়ে পড়লাম। শুয়েই মনে হ'ল আমি আর কোনদিন উঠব না, শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই উঠে বসবার মত।
কিন্তু একসময় উঠলাম। উঠে বসেই প্রথম যে জিনিষটা জানতে পারলাম সেটা পূর্ণ অনুমিত। আমাদের সংগ্রহের জন্যে ঠিকদারদের ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটাকা খরচ হয়ে গেছে। সেই জিতেন ভট্টাচার্য নামক ব্যক্তিটি ছাড়াও আরও কিছু আড়কাঠি আছে যারা সকলকে সংগ্রহ ক'রেছে জনপ্রতি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। সারা পথে এদের ব্যবস্থাগুলো অত্যন্তই নিখুঁত। আর একটা ব্যাপার বুঝে গেলাম যে এখানে সাধারণ কুলি হিসেবে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে আমার মূল্যগত তারতম্য কিছু নেই। কাজ কর্ম চলছে, যারা কাজ ক'রছে তাদের মধ্যে থেকে চালাক চতুর দেখে লোক বেছে নিয়ে পরিদর্শক করা হয়েছে। আসলে প্রতিটি কাজ ঠিকাদাররা দুজনের যে কোন একজন নিজেই দেখে নিচ্ছে প্রতি ঘণ্টায়। কাজ অনেকই। পাহাড়ের ওপরেই জায়গা বেছে নিয়ে নানা রকম ঘরবাড়ী গড়ে উঠছে। যারা ওইসব সুন্দর ঘরগুলো গড়ছে তারা নিজেরা থাকছে পাতার ছাউনীতে। কোন ছাউনীতেই মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ানো যায় না। তারা চিরদিন মাথা নিচু ক'রেই রয়ে গেছে। এমনি একটা ছাউনীর মধ্যে শোবার ব্যবস্থা হ'ল আমারও। আমি মতলব ভাঁজতে লাগলাম কি ক'রে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা যায়। যা বুঝেছি তাতে এদের বললে যেতে কিছুতেই দেবে না বরং কোন অসুবিধে সৃষ্টি ক'রতে পারে। কাজেই চুপচাপ পড়ে রইলাম প্রথম সুযোগটির প্রতীক্ষায়।

ব্যোমবাহাদুর রাণা বুদ্ধিমান লোক। প্রথম দেখেই আমাকে প্রশ্ন ক'রল, তুমি এখানে কি জন্যে এসেছ? কাজ ক'রবে তো?

আমি জবাব দিলাম, কাজের জন্যেই তো এতদূর এসেছি।—আমার কথা সে যেন কান আছে বলেই শুনল। তার মুখভাব দেখে বুঝলাম সে আমার কথা বিশ্বাস ক'রল না। শুধু বলল, ঠিক আছে। কি কাজ পারবে তুমি?

আমাকে তো বলে পাঠিয়েছে কাজকর্ম দেখা শোনা ক'রতে হবে।

কে বলেছে?

আপনাদের লোক জীবনলাল ভট্টাচার্য।

বাঙ্গালী? সে তোমাকে পাঠিয়েছে?—কথাক'টি বলেই স্বগতস্বরে একটা কটূক্তি ক'রল। কার সম্পর্কে ঠিক বুঝলাম না তবে যতদূর মনে হ'ল কটূক্তিটা জীবন সম্পর্কেই। যে কোন কারণেই হোক জীবনলাল সম্পর্কে ব্যোমবাহাদুর ঠিকাদার শ্রদ্ধাহীন। তাহ'লে কেন সে লোক ধরে পাঠাচ্ছে? পরক্ষণেই মনে পড়ল জীবনলাল তো আমাকে ধরেছিল কামেশ্বর সিং-এর জন্যে। শ্যামবাহাদুরই

সেটা বদলে দিয়েছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না। ব্যোমবাহাদুরকেই জানতে চাইলাম, এখানে কামেশ্বর সিং বলে ঠিকাদার কেউ আছে ?

আছে।—বলে চোখ দুটো কুঞ্চিত ক'রল ব্যোমবাহাদুর। আমি অকপটে বললাম, জীবনলাল আমাকে কামেশ্বর সিং এর জন্যে পাঠিয়েছে। পথে লোকরার দোকানদার তেওয়ারীও কামেশ্বর সিং-এর নাম ক'রেছে। ভালুক পুং-এ এসে শ্যামবাহাদুর আপনাদের কাছে পাঠাল।

ও—ব্যোমবাহাদুর বলল। তারপরই বলল, কামেশ্বর সিং খালাক ট্যাং এ আছে। ওখানে কাজ হচ্ছে। রূপাতেও থাকতে পারে। রূপা হয়ে আসার সময় দেখতে পাও নি ?

মাথা নেড়ে জবাব দিলাম। ব্যোমবাহাদুর আর কথা না বলে নিজের কাজে চলে গেল। আমি বাঁচলাম। বুঝলাম সে আমাকে ছুটি দিয়ে গেল কামেশ্বর সিং এর কাছে যাবার জন্যে। আসলে সে আমাকে অপছন্দ ক'রল। হয়ত ভাবল ভবঘুরে এই লোকটাকে দিয়ে কর্ম যা হবে অপকর্ম তার বেশীও হতে পারে। সেই ভয়েই হযত আমার মুক্তি। যা হোক শাপেই বর হ'ল। আমি ফেরবার ফিকির খুঁজতে লাগলাম। শেলা নয়, রূপা নয়, খালাকট্যাং নয়, কোথাও কাউকে খুঁজব না। সঙ্গী খুঁজব ফিরে যাবার। খুব শিক্ষা হয়েছে। মরুক জীবন ‍লাল আর মরুকগে তার ঠিকাদার কামেশ্বর সিং আড়কাঠি।

দু দিন বেহায়ার মত ওদের কাজ যতদূর ইচ্ছে হ'ল ক'রে দিলাম। রাত্রে ছাউনীতেই দেখলাম সাজ সাজ রব। একদল লোক ভোরে রওনা হবে। বুঝলাম তারা মাল বওয়া কুলি। আমার সঙ্গে যারা এসেছিল এ অন্য দল। কিছুদিন আগেই এরা নিচে থেকে খাবার জিনিষপত্র বযে এনেছিল এবার ফিরছে। আমি ওদের সঙ্গে মিশে গেলাম। অধঃপতন সহজ বলেই নামবার সময় পথটা অনেক সুগম হ'ল।

তবে নামবার পথে আমার সঙ্গী কুলিরা যেখানে যেখানে রান্না ক'রল তাদেরই একজনের মত আমাকেও খাওয়াল। কিন্তু বন্ধু আর বন্ধু রইল না। শ্যাম বাহাদুরের আস্তানায আমার কোনই অভ্যর্থনা জুটল না। সন্ধে থেকে ভোর পর্যন্ত শুয়ে রইলাম সেই সরাইখানায়, শ্যামবাহাদুর বা তার গৃহিণী কেউই এল না খাতির ক'রতে। আমি কোনরকম আশাও করিনি তবু একটা প্রশ্ন কিছুতেই মন থেকে বাইরে এল না তা হচ্ছে শ্যামবাহাদুর আমাকে বন্ধু ঘোষণাই বা ক'রেছিল কেন, আর বন্ধুই যদি মনে ক'রেছিল তবে তিনটে দিন বাদে আমার সঙ্গে সামান্য একটা কথাও বা বলল না কেন! সে প্রশ্নের জবাব কোনদিনই পাইনি, যেমন জীবনে বহু প্রশ্নেরই সমাধান অধরাই রয়ে গেছে।

যাই হোক নিচে এসে আবার বেকার হলাম। বেকার অর্থে কাজের অভাব

নয় কারণ কাজ তো জীবন ধারণের জন্যে যা হোক একটা কিছু ক'রতেই হয় আমার বেকারত্ব অন্য। মানে একেবারেই উদ্দেশ্যহীন এবং দিশাহীন হয়ে যাওয়া। কোনদিকে যাব বা কি ক'রব কিছুই ভেবে পেলাম না। আমার কাছে আট দিকই তো সমান। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত যে কোন দিকেই যাওয়া চলে অথচ যাবার নেই আমার কোনদিকেই। রাঙ্গাপাড়ার রেল-স্টেশনে বসে রইলাম পুরো একটা দিন। রাত্রিটাও ফাঁকা বেঞ্চিতে শুয়ে কাটালাম। তখন শুধু একটা কাজই পেয়েছি, ভাবনা। ভাবছি কোনদিকে যাই।

সকাল বেলা ওপাশটায় প্রাতঃকৃত্য ক'রতে গেছি দেখি একটা লোক মোষের গাড়ী করে কাঠ এনে ঢালছে। বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে লোকটিকে বললাম, আপনিই কি কাঠের মহাজন?

খুব সরল গোছের মানুষটা আমার অনুমান অনুমোদন ক'রল। সেই সঙ্গে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল বিস্মিত জিজ্ঞাসায়। আমি বললাম, একটা কাজের সন্ধান ক'রছি।

আমাকে দেখে বোধকরি কাঠের মহাজনটিরও পছন্দ হ'ল না। হবার কথাও নয়। নিজের প্রতিবিম্ব বহুদিনই চোখে পড়েনা বলে কি আকৃতি যে হয়েছে তা জানি না কিন্তু কয়েকজনের দৃষ্টিতে যেন দেখতে পাচ্ছি সেই প্রতিবিম্ব। চেহারাটি নিশ্চয়ই এমন হয়েছে যা কোন কাজের লোকের নয়। বরং ভবঘুরে যাকে বলে হয়ত তাই। নিজেকে না হয় দেখতে না পেলাম পরণের পোষাক তো দৃশ্যগত। তা দিয়েও তো মানুষ চেনা যায়। নিজেকেই নিজের একটি হতচ্ছাড়ার বেশী বলে মনে হ'ল না। তার ওপরে হাতে গায়ে সুক্ষ্মদেহ পোকার কামড়ে যে ঘা গুলো হয়েছে তা তো আর সুক্ষ্ম নেই। অতএব অন্যের দোষ কি? হয়ত এক পাগল বলে অনুমান করায়ও দোষের অবকাশ নেই। কাজেই আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র নির্মাণের জন্যে বললাম, আমি কাঠের কাজ জানি।

মামুলি কিছু প্রশ্নোত্তরের পরেই একরকম পেটভাতায় বহাল হয়ে গেলাম। বেশী প্রয়োজন যার নেই তার আবার কি থাকে ভাবনার? লোকটির পূর্বে কোন এক বৃদ্ধপ্রপিতামহ পূর্ববাংলার জলাভূমি ছেড়ে কারও সঙ্গে বিবাদ বশতই হয়ত চলে এসেছিল অরণ্য প্রদেশে। কাজেই পাঁচ পুরুষের বাসে ভুলে গেছে পূর্ব পরিচয়। গোস্বামী শব্দটাই স্থানীয় উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে গোঁহাই। পূর্ব নিবাসে বড় ধরণের গোঁসাই বংশোদ্ভব বলেই এখানেও সেই প্রতিষ্ঠার আশায় বড় গোঁহাই। কলহ ক'রে পূর্ব, পুরুষ এসে থাকলেও আমার মনিবটি প্রকৃতই মহাজন। মোটামুটি শান্ত স্বভাব। সোজা কথার মানুষ। চাতুর্যহীন সরল ব্যবহার। দিন কয়েক থেকে বুঝলাম কাঠের ব্যবসা, সে যেন নেহাৎ কিছু কাজ নেই বলেই 'কিছু একটা করা'। ব্যবসাতে যে একাগ্রতা

রামনিবাস বা হরিনন্দন বা জিতেনবাবুর আছে আমার মহাজন দেবেশ বড়গোঁহাই এর তা অনুপস্থিত। নিজের জমির ফসল অতিপর্যাপ্ত। সারা বছর গোটা পরিবারের খাওয়া পরা, সবরকম খরচ খরচার পরও কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যায়। সেই উদ্বৃত্ত টাকার জন্যে সিন্দুক না কিনে বড়গোঁহাই কেনেন শষ্য। মরশুমী শষ্য কিনে অসময়ে বিক্রি ক'রে আবার তাঁর টাকা যায় বেড়ে। এই টাকা বেড়ে যাবার সমস্যাতে প্রথম প্রথম অনেকটা অবহেলা ক'রেই বনবিভাগের দপ্তরে জমা দিয়েছিলেন নগদ কিছু টাকা। তখন তো টাকার সমস্যা মিটল। কিন্তু ক'দিন বাদেই কেটে নেওয়া গাছগুলো যখন কাঠ হয়ে বিক্রি হ'ল তখন সেই জমা দেওয়া টাকা কয়েকগুণ হয়ে ফিরে এসে সমস্যাটা আরও যেন বাড়িয়েই তুলল। তাই বাধ্য হয়ে আবার বেশী টাকা জমা দিলেন, ফলে আবার বেশী গাছ কাটার অনুমতি ঘাড়ে এসে পড়ল অনেকটা এমনি ক'রেই চলছে। নিজে তিনি গম্ভীর মানুষ। কথা কম বলেন। ঘাটতি পূরণ করেন স্ত্রী নিরুপমা দেবী। মানুষকে আপন ক রে নিতে তাঁর সময় লাগে না, এক পলক ভাবেন না যাঁর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন সে তাঁর কথা না বুঝতেও পারে। বছর চল্লিশেক বয়সের মহিলা লোক মাত্রকেই স্নেহের পাত্র-পাত্রী ভাবেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাকেও ভেবে বসতে কোনই সময় নিলেন না, প্রথম দেখাতেই আহবান জানালেন, আহা। বহা। অর্থাৎ আয়, বোস। আমি তাঁর কথাটুকু আন্দাজেই বুঝলাম। তারপরই আপন মনে প্রশ্ন ক'রলেন, ঘর কোত্?

আমাকে জবাব দেবার অবকাশ না দিয়ে দেবেশবাবুই দায়িত্ব নিলেন, গোয়াল পাড়িয়া বঙাল মানুষ না হয়! —অর্থাৎ আমি হলাম গোয়ালপাড়ার বাঙ্গালী।

এমনিভাবে যে লোক প্রথম আলাপ করে মনের কথা বলতে তার ক'দিন লাগতে পারে? আমাকে স্বামীর কাঠের ব্যবসায় নামার ইতিহাসটা অতি সারল্যে তিনিই শুনিয়েছিলেন। এভাবে আপন ক'রে নিতে পারার ক্ষমতা আমি জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখলাম না। শুধু আমাকে বলেই নয় তাঁর অভিমানশূন্য ব্যবহার সকলের প্রতি সমান। অথচ তাঁর স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ ভরাট মুখে কখনো হাসি বলতে কিছু দেখিনি আমি। তার প্রয়োজনও ছিলনা কারণ রাগ বা বিরক্তিও তাঁর ছিল সমান অনুপস্থিত।

ওখানে বহাল হবার দিন কয়েক বাদেই একদিন দেবেশ বললেন, লটুগাঁওতে আটত্রিশটা শালগাছের পারমিট আছে। যাও কাটিয়ে মার্কা করিয়ে নাও গে।

রেঞ্জার বাবুকে তো এখন পাওয়া যাবে না আপনি চলুন গাছ দেখিয়ে দেবেন —আমি জানালাম। একটা চৌকির ওপর বসে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমার কথার সঙ্গে সঙ্গেই সটান শুয়ে পড়লেন। বললেন, ঘাঃ তেরাৎ বেরাৎ নকরিব লাগে। যি গছ আগৎ মিলিব হি টুই কাটি ফালাক। —অর্থাৎ তিনি

যাবেন না, যে গাছ সামনে পাব যেন কেটে ফেলি।

আমি পড়লাম মহা বিপদে। সদ্য কয়েকদিন হ'ল এসেছি, এখানকার হালহদ্দ ভাল জানা নেই এমন অবস্থায় কি করে একা সমস্ত দায়িত্ব নেই? অথচ আমার কোন ওজর আপত্তিও চলছে না। তাই আমি কিছু না বলেও অনিচ্ছা প্রকাশের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেবেশ ওঠবার কোন লক্ষণই দেখালেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়েই ঘরে এসে ঢুকলেন নিরুপমা দেবী, জানতে চাইলেন, আমি অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

কর্তা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বসলেন। আদালতে বিচারক এসে ঢুকলে যেমন ভাবে বাদী বিবাদী, সাক্ষী, উকিল, পেশকার, ঘর শুদ্ধ সবাই উঠে দাঁড়ায় দেবেশ বাবুর উঠে বসবার ভঙ্গীটা পুরোপুরিই সেই রকমের। বসেই স্ত্রীকে বললেন, দেখ তো! আমি ওকে জঙ্গলে যেতে বলছি বলে কি আপনিও চলুন!

নিরুপমা দেবী স্বামীকে নিবিড় ভাবে বোঝেন বলেই তাঁর বুঝতে দেরী লাগল না; আমাকে বললেন, যা বোপাই বুড়া মানুষ কোত্ গছ কাটিবা যাব?

এই কদিনে আমি তাঁদের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম বলেই সাহস ক'রে বললাম, আমি তো মাত্র ক'দিন হ'ল এসেছি। এর আগে কি আমি যেতাম?

আগে তো তুই ছিলি না। মানুষটা বুড়োও হয়নি।

আর কি বলা যায়? বাধ্য হয়েই একা যেতে হ'ল। একা শুধু সেদিন যাওয়াই নয় ধীরে ধীরে সমস্ত কিছুই আমার ওপর এসে পড়ল। এমনকি ভদ্রলোক টাকা পয়সা লেনদেন পর্যন্ত আমার ওপরেই ছেড়ে দিলেন। দিনের শেষে হিসেব বোঝাতে গেলে বলেন, হিসেব ভাল ক'রে খাতায় লিখে রাখ। টাকা গুণে জমা দিয়ে দাও।

অর্থাৎ নিরুপমা দেবীর কাছে টাকা দিতে হবে যেমন দিয়ে থাকি। তিনিও কোনদিন গুণে দেখবেন না কতটাকা দিলাম। শুধু জানতে চাইবেন, কিমান আছে?—যাই বলব শুনে নেবেন শুধু। আর কর্তাটি জীবনে কোনদিন ওই হিসেব লেখা খাতা খুলে দেখবেন বলে আমার অনুমান হয় না।

ব্যতিক্রম দেখলাম কেবল ধানের সময়। ধানকাটার মরশুমে দেবেশ বড়গোঁহাই অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তাঁর বয়স বোধকরি কমেই গেল। চাষীরা যে যত গাড়ী ধান আনল সব নিজে হিসেব ক'রে নিলেন। শুধু তাই নয়, যে চাষীর ধান কম মনে হ'ল তার কাছে কৈফিয়ৎ পর্যন্ত চাইলেন। শুধু ধান বলেই নয় প্রতি ফসলের সময়েই দেখলাম এক ভাব। অথচ অর্থমূল্যে বিচার ক'রলে তখন যে অবস্থা তাতে কাঠের কাজে রোজগার অনেক বেশী কিন্তু সেই অর্থেও তাঁর অনাগ্রহ অপরিসীম। ব্যাপারটা অন্যের অলক্ষ্যে ছিল না। আমাদের প্রতিবেশী দের অনেকেরই যে ব্যাপারটা অপছন্দের ছিল সেটাও আমার কানে এসে পেঁছাত।

এটাও ঠিক যে আমার এই সৌভাগ্যের জন্যে অপরের ঈর্ষার যা পরিমাণ সে তুলনায় আমি খবর পেতাম খুবই সামান্য। খবরে অবশ্য আমার প্রয়োজন ছিল না কারণ প্রতিকার কিছু করা তো আমার সাধ্যের অতীত। আর প্রতিকার চেয়েই বা কি লাভ? যা অন্যের ঈর্ষার সেই সৌভাগ্যে আমার তো কোন লোভ ছিল না। কারণ নিপন শর্মা যেমন ভাবত তার ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ পরিমাণ টাকাও তো আমি কোথাও সঞ্চয় করিনি। আমার সঞ্চয়ে এক বিপদ আছে, আমি রাখব কোথায়? তাছাড়া সঞ্চয়ে প্রথম বাড়ে বোঝা। আমি সেই বোঝা বাড়ানোর পক্ষপাতী নই। জীবনটাই তো একটা ভারী বোঝা শুধু শুধু প্রাণীকে বয়ে বেড়াতে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি জীবন যদি না থাকত কি তাহ'লে ক্ষতি হত পৃথিবীর? যে সব গ্রহে প্রাণ নেই, জীবন নেই, চলছে না সেইসব গ্রহ? অচল হয়ে আছে? আমাদের ওপর এই বোঝা চাপিয়ে কি লাভ হয়েছে প্রকৃতির?—আমি এসব ভাবলে কি হবে নিকটতম প্রতিবেশী নিপণ শর্মা, ফণী বড়ুয়া, গোপীনাথ শইকিয়া, অতুল দাস কেউ তো সেকথা বোঝে না। তারা রাতকে রাতই দেখে, রাতকে তারা দীপাবলী দেখে না। আমাকে সংসারের ব্যতিক্রম বলে যেমন বোঝে না দেবেশ বড় গোঁহাইকেও ঠিক চেনে না তারা। সাধারণ মানসিকতার ক্ষুদ্রতা দিয়ে দেবেশকে মাপতে চাওয়া দর্জি'র ফিতে দিয়ে পর্বত মাপার মত। বলে বেড়ায়, বড়গোঁহাই সরল মানুষ তাই বাইরের অজ্ঞাত কুলশীলকে আশ্রয় দিয়েছে আবার টাকা পয়সা ব্যবসা সব ছেড়ে ঘরের মধ্যে বসে আছে। একদিন আমি নাকি বড়গোঁহাইকে পথে বসাব।

কথাটা যাকে সাবধান করার জন্যে বলে বেড়ানো তাঁর কানে না পেঁছালে তো তার কোন সার্থকতাই থাকে না তাই অযথা খাটো ক'রে বলবে কেন লোকে? বড়গোঁহাই কথাটা শুনে গিন্নিকেই প্রথম জানান, আমার বহু শুভানুধ্যায়ী জুটে গেছে, জান? তারা বলে ছেলেটা নাকি একদিন আমার সব নিয়ে পালাবে, আমি একদম ভিখারী হয়ে যাব? ভাগ্য কি নিয়ে পালানো যায়? এই ছেলেটা কি আমার ভাগ্য নিয়ে পালাতে পারবে মনে কর?

ছেলেটা সে রকম বলে আমার মনে হয় না। স্বামীর চেয়ে এককাঠি সরেস নিরুপমাদেবী তাঁর মত দেন তারপরই বলেন, আমার মনে হয় ছেলেটি যে রকম থাকে ও তা নয়। ও লেখাপড়া জানে। ভাল ঘরের ছেলে।

স্ত্রীর সন্দেহে গুরুত্ব দেন না বড়গোঁহাই। ওসবে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। আগ্রহও নেই। তিনি নিস্পৃহ। খদ্দরের একখানা ধুতি আর গায়ে একটা কামিজ ঠিকমত থাকলেই তিনি খুশী। ছেলে মেয়েরা কে কি পড়ল কে কি ক'রল তাঁর সেসব নিয়ে মাথাব্যথা তিলমাত্র নেই। সংসারে পরম নিরাসক্ত মনে হয় তাঁকে। নিরুপমা দেবীর সন্তান সংখ্যা পাঁচ। তাদের দেখাশোনা যা কিছু ব্যবস্থা সব

মায়ের। বড় ছেলে হেমন্ত বাপের নিস্পৃহতা মায়ের ঔদার্য দুটোই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে নিজের চরিত্রে। একদিন দৈবাৎ তার পড়ার সময় সামনে থাকায় ভুল ধরে দেওয়াতে হঠাৎ সে অনুরাগী হয়ে পড়েছে আমার। মার কাছে গিয়েও বোধহয় এমন কিছু বলেছে যাতে নিরুপমা দেবীও ওদের পড়াশোনার ব্যাপারে পরামর্শদাতা ক'রে নিতে চেয়েছেন। জানি না সেইজন্যেই কিনা একদিন আমাকে একগাদা টাকা দিযে দেবেশ বড়গোঁহাই আকস্মিক ভাবেই বললেন, আজ সব কাজ বাদ দিয়ে গুয়াহাটি যাও নইলে আমার বাড়ী ছাড়তে হবে।

স্বল্প বাক্ মানুষটির এই আকস্মিক কথার তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি বললেন, আমার কথাটা শোন। এবার কোন কাজ না ক'রে গুযাহাটি গিয়ে নিজের কাপড় জামা পছন্দ ক'রে কিনে আন।

আমি বললাম, আমার জামা কাপড় কেনবার জন্যেই যাব গোঁহাটি! যাতায়াতে পুরো একদিনের রাস্তা!

হুকুম হ'লে কি উপায ? আসলে হুকুমটা হয়েছিল আমার ওপরে। আমি বুড়ামানুষ কি গোঁহাটি যাব, তুমিই যাও।

বুঝলাম হুকুমটা আসলে নিরুপমা দেবীর। সেই হুকুমটা উনি কার্যত ঘুরিয়ে আমার ওপর ফেললেন। আমি রাজী না হলে ওঁকেই যেতে হবে, তাই প্রথমেই ইংগিত ক'রেছিলেন ঘর ছাড়া হ'তে হবে বলে। ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে আমি বললাম, আমার যা পোষাক আছে তাতে তো বেশ চলে যাচ্ছে।

বাপু ঝামেলা ক'রো নাতো! আমাকে অশান্তিতে ফেলো না। তুমি হেমন্তর মামা। তোমার ব্যাপারটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে।

ওঁর কথাশুনে খেয়াল হ'ল সত্যিই তো হেমন্তরা মামা বলে ডাকে। এতদিন তো তা খেয়াল করিনি! আসলে ব্যাপারগুলো এত গৌণ যে ওসব নিয়ে ভাবা হযে ওঠে না। কে কি বলে ডাকল বা কি কখন বলল এ নিয়ে ভাবনা চলে না। যা হোক একটা সম্বোধন প্রয়োজন, ডাকার জন্যে, বুঝিয়ে বলার জন্যে। এই যে নাম এ-ও তো একটা সম্বোধন মাত্র। আমি যে এই আমি নাম দিয়ে তা নির্ধারিত করা হয়। যে কোন একজন অন্য দশজনের মধ্যে মিশে থাকে তাকে আলাদা করার জন্যেই দরকার হয় একটা নামের। এটা সংকেত। হেমন্তদের বেলাতেও আমার সংকেত হ'ল মামা। সংকেত ব্যাপারটাই এক এক সময় বড় মারাত্মক হয়ে পড়ে। যেমন যুদ্ধের সময় এমন সংকেতও হয় যাতে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। আমার ক্ষেত্রে সম্বোধনের সংকেত বিপন্ন হবার মত না হলেও আমাকে বিব্রত ক'রল। কারণ পোষাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন কখনোই থাকে না। নিজের শরীর ঢাকবার ব্যবস্থা যতক্ষণ থাকে আর কিছুই আমাকে ভাবতে হয় না।

মধ্যে একবার অভাব হয়েছিল। একদিন সুরাহাও হয়ে গিয়েছিল তেমনি স্বাভাবিকভাবে। একজন লোক এক স্টেশনে বসে অনেকগুলো খাকির প্যাণ্ট বিক্রি ক'রছিল, বোধহয় সেনাবিভাগের পরিত্যাক্ত। তারই দুটো কিনে নিয়েছিলাম, কাজ চলছে। খাকির প্যাণ্ট তাতে সৈনিকদের বলে বিশেষই জবরদস্ত। এখন বেশ কিছুদিন চলবে। কাজেই আদৌ কোন অসুবিধে হচ্ছে না। নিরুপমা দেবীদের বোধহয় হচ্ছে—সে ওই ছেলেদের সম্বোধনের জন্যে। সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্তু আমার সমস্যা অন্য। বোঝা বাড়াতে চাই না। রক্ষণাবেক্ষণ বড় কঠিন ব্যাপার। থাকলেই ফেলতে মায়া লাগে, না থাকলেই তো আরাম। যার কিছু নেই তার হারাবার কোনই ভাবনা থাকে না। অবিমিশ্র সুখে সে যথেচ্ছ চলতে পারে। প্রীতিও এরকমের বোঝা যা বযে বেড়ানো সমান ভারী, হযত কখনো সে ভার অনেক বেশীও হয়ে পড়ে। তখন তা বইতেও পারা যায় না সইতেও পারা যায় না। নিরুপমা দেবীর স্নেহের ভার যে বেশী হয়ে যাচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারছিলাম কিন্তু আমার মনটা যেন অবশ হয়ে গিযেছিল, কিছু ক'রতে পারার ক্ষমতা আমার ছিল না।

আমরা ছাড়াও জঙ্গলের ঠিকাদার আরও ক'জন ছিল। একদিন আমাদের প্রতিবেশী প্রদীপ শর্মার ছয় ছেলের মধ্যে বোধহয় চতুর্থটিই হবে নগেন যার নাম, এসে আমাকে ধরল, খুড়া এ'টা কাম করিব লাগে।

কি কাজ বল? গুরুজনের মতই জানতে চাইলাম সে আমার কি উপকার চায়। জানাল,ময় কিছু গছ কাটিম। বেচি দিয়া লাগে।

আমি জানতে চাইলাম, তয় কলেজর লরা। গছ কাটিবি কিয়?

জবাবে জানাল সে আর পড়বে না। পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন কাজ কার-বার ক'রবে। শুনে চুপ ক'রে রইলাম। করবার কাজ আর আছেই বা কি? আজন্ম সবাই দেখে আসছে ঘরের চারপাশে গাছ, বিশাল সব মহীরুহ। প্রয়োজন হলেই কাটা যায়, সবাই কাটে। কেউ নিষেধ করে না। বন বিভাগ আছে, তাদের চোখে পড়লে সামান্য কিছু টাকা মূল্যেবাবদ সরকারী চৌথ জমা দিতে হয়, ব্যস। আসলে আপত্তি কেউ করে না, গাছেরাও করে না কোন প্রতিবাদ। সবাই চোখ চেয়েই দ্যাখে চারিদিকে খালি গাছ আর গাছ। প্রকৃতি যে কি ঐশ্বর্যে ভরিয়ে রেখেছেন এই অঞ্চল। যুগ যুগ ধরে মানুষ প্রয়োজন মতই কাটছে কিন্তু শেষ আর হচ্ছে না। একটা কাটলে ঠিক আর একটা জন্মে যায়। নির্মূল হয় না। এটাই দেখে অভ্যেস হয়েছে। ফলে চোখ মেললেই লক্ষ্য পড়ে ওই গাছেদেরই ওপরে। আগে ছিল সরাসরি প্রয়োজন, ঘর বানাব তারই জন্যে কাঠের প্রয়োজন আচ্ছা কাট ওই গাছটাকে। এখন তা নয়, এখন প্রয়োজন বাণিজ্যিক। তাই আগে যে লোক একটা কাটত এখন সেই লোক কাটছে হাজারটা। আগে যে গ্রামে সাতটা

পরিবারের বাস ছিল এখন সেখানে হয়ে গেছে গঞ্জ, থাকে সাতশো পরিবার। কাজেই হাতও বেড়েছে কুঠারও বেড়েছে। একদিন গাছ কাটতে যাবার কথাতে দেবেশ বড় গোঁহাই বলছিলেন, এখন তুমি বলছ সাত মাইলে গাছ কাটতে যাবে অথচ আমি প্রথম যে পারমিট নিয়েছিলাম সে পারমিট ওই দেখ বেজবড়ুয়াদের বাড়ীটা হয়েছে যেখানে, সেখানকার জঙ্গল সাফ করতে।
বেজবরুয়ারা বাড়ী করেছে বহু বছর। এখান থেকেই দেখা যায় বাড়ীটা, বড় গোঁহাই এর বাড়ী থেকে হাত পঁচিশেক দূরে। অর্থাৎ একদিন এই জনপদও অরণ্যের অধিকারে ছিল। এবং সেটা বেশী দিনের কথা নয় হয়ত বিশ পঁচিশ বছর হবে। বর্তমান প্রজন্মের অধিবাসীর হাতেই অরণ্য উৎসাদিত হয়ে গেছে। আমরাও নিজেদের অজান্তেই যা ক'রে চলেছি তা সেই উৎসাদনই। এই ক'টা বছর মাত্র এসেছি আমি এখানে এরই মধ্যে কত পেছিয়ে গেল অরণ্য। এই ক'বছরেই বন সাত মাইল সরে গেছে। তবু সবাই প্রয়োজনের নাম ক'রে বন কেটেই চলেছি। অথচ কি যে প্রয়োজন তা কি কখনো ভাবি? দেবেশ গোঁহাই-এর সমস্যা তার টাকার আধিক্য। কেন তবু তিনি গাছ কাটার কাজ বন্ধ করার কথা ভাবেন না? বরং নতুন ক'রে এই ব্যবসা সুরু ক'রছে নতুন যুবকেরাও। ক বছর মাত্র হ'ল দেশে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরানো সাহেবী প্রতিষ্ঠানগুলো উৎসাহহীন এবং বেশীর ভাগই শেষ দশায়। নতুন শাসকমণ্ডলী সরকারী খাতে আয় বৃদ্ধি চায়। বন বিভাগ কাঁচা টাকা এনে দেয়। কাজেই বনবিভাগের প্রতি কর্তাদের প্রীতি আর পিঠ চাপড়ানোর বিনিময়ে বনের ইজারা হয়ে উঠেছে অবারিত। যে খুশী টাকা জমা দিলেই ঢালাও হুকুম কাটো গাছ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাঠের চাহিদা আকস্মিক ভাবে বেড়ে গেছে নানা রকম উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার দৌলতে। চিঠি ছুটে আসছে কাঠ পাঠানোর অনুরোধে, লোক দৌড়ে এসে খুঁজে খুঁজে ধরছে কাঠের মহাজন আর গাছ কাটার ঠিকাদারদের, এই নাও টাকা কাঠ দাও। হাজার হাত খালি দাও দাও ক'রছে এমন স্বর্ণযুগ আর কবে দেখেছে অরণ্যাঞ্চলের অধিবাসীরা। নতুন রেলপথ বসছে উন্নততর। বিভক্ত দেশের পুরানো লাইন ভাগে পড়েছে অন্যদের, এখন পূর্ব পাকিস্থান, বিদেশ। কাজেই উন্নততর আধুনিক রেলপথ যে বসতে সুরু ক'রেছে তার মাল বহনের ক্ষমতাও অনেক বেশী। কাজেই কাটো। নতুন নতুন মানুষ আসতে সুরু ক'রেছে নানা রকম পসরা নিয়ে। বনাঞ্চল মুক্ত হয়ে হয়ে উঠছে লোকালয়। আবাদী জমির চাহিদা বাড়ছে। কোথা থেকে যে এত মানুষ আসছে বোঝা যাচ্ছে না। পাকিস্থান থেকে ছিন্নমূল কিছু মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং নিয়তই নিচ্ছে। তাছাড়াও আসছে অসংখ্য মানুষ। যেন অনেকটা ভোজবাজীর খেলা। আমার চোখের সামনেই কত ঘরবাড়ী গড়ে

উঠল। কতগুলো পশ্চিমা এসেছে বিহার থেকে, তারা নানা রকম কাজের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজেদের ঘাড়ে, বিশেষ ক'রে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ তাদের ওপর ন্যস্ত ক'রতে পেরে স্থানীয় মানুষেরা বাসিন্দারা সুখী। নিশ্চিন্ত। আগন্তুকেরা সকলেই যে মাথায় মোট বইতে লাগল এমন নয়, দু একজন ছোট খাট দোকান খুলেও বসল, সে এমনই সব দোকান যার কথা মানী লোকেরা কখনো কেউ ভাবেও নি বা তাদের পক্ষে প্রযোজ্যও নয়। দেবেশ বাবুর বাড়ীর সামনের ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে আমাদেরই এক কুলি ভাদোরাম একদিন কর্তাকে ধরে বসল, বাবু, ওখানে ছোট্ট একটা চালা যদি ক'রতে দেন তো গরীবের বড় উপকার হয়। বড় ছেলেটা দেশ থেকে এসেছে ওকে একটা পান দোকান ক'রে বসিয়ে দিতে পারি।

ভাদোরামদের দুটো বিশেষত্ব আছে। ওদের কেউ কখনও এদেশের ভাষা বলে না। সব সময়েই আপন ভাষা বলে। এতে কেউ কিছু মনেও করেনা ভাবে ওরা মূর্খ লোক, অন্য ভাষা শিখতে পারেনা। দ্বিতীয় হচ্ছে, ওরা কোন আবেদন নিবেদন এমন নরম ভাবে ক'রতে পারে যার ফলে দাতাকে দরাজ হতেই হয়। আর বড় গোঁহাই তো এমনিতেই নরম মানুষ। ভাদোরাম আবেদন করায় নিমেষ মাত্র ভাবলেন না, অনুমতি দিলেন, জোয়া। যিটু মাটি লাগে বানাই ল।

হুজুরকা বহুৎ কিরপা—বলে ভাদোরাম সেই দিন থেকেই ঘর বেঁধে কাকে দিয়ে একটা পান বিড়ির দোকান খুলিয়ে দিল। ভাদোরাম যেমন কাজ করার তেমনি করে। তার দেশের ঠাকুর সিং বলে একটা লোক কিছুকাল আগে ভাগলপুরের জন কয়েক কাঠের ব্যাপারীর হয়ে কাঠ কিনতে এসেছিল সে-ই এখানে ওদের সকলের মান্যবর লোক। একখানা সাইকেল আছে লোকটির তাতে চেপেই সারাদিন ঘোরে লোকটি। কাউকে দাদন দিয়ে পেছন পেছন দৌড়ায়, কারও কাঠ মাপতে যায় জঙ্গলে, সব ওই সাইকেলটি নিয়েই।

একদিন বিকাল। সূর্য অস্ত যেতে দেরী থাকলেও আমরা পূর্বের আট মাইলে গাছকাটা বন্ধ ক'রে বাড়ীর দিকে ফিরছি হঠাৎ দেখি খানিকটা আগে ঠাকুর সিং চলেছে। পাথর কুচি ফেলা সদ্য তৈরী রাস্তা। হেঁটে যাওয়ার চেয়ে সাইকেল বেশী জোরে চলবে না তাই আমাদের সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধান তার কখনই বাড়ছে না। কিছুটা সময় চলেই হঠাৎ দেখি সর্বনাশ। ঠাকুর সিং যে জায়গাটায় অকস্মাৎ বন ফুঁড়ে হাতির দল উঠে আসছে রাস্তায়! আমরা দাঁড়িয়ে তো পড়লামই ঠাকুর সিং যে আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ায় বিমূঢ় হয়ে গেলাম। আমরা সাতজন সেইখানে একটি আমোঘ মুহূর্তের প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলাম অত্যন্তই অসহায় ভাবে। আমাদের ওই দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'রতেও সাহস হচ্ছিল না আবার চোখ বন্ধ ক'রতেও আমরা পারছিলাম না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই দেখলাম সর্দার হাতি ফাঁকা রাস্তায় শুঁড় তুলে দাঁড়াল।

বিশাল তার মাথাটা অকারণেই ঝাঁকাল। ঠাকুর সিং দেখলাম কিছু না পেয়ে সাইকেল ফেলে বাঁ দিকে রাস্তার ধারে মাটি কাটা খাদে লাফ দিয়ে পড়ল। অবশ্য ওর আর কিছুই করবার ছিল না। নিয়তি যখন সামনে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব? আমরা সবাই ঠাকুর সিং-এর জন্যে দুঃখ ক'রতে লাগলাম। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সেই বিশাল সর্দার হাতি তার পায়ের সামনে পড়া সাইকেলটাতে একটা লাথি মারতেই সেটা দুমড়ে মুচড়ে প্রায় হাত বিশেষ দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। ওরা সদলবলে নেমে গেল বাঁ দিকের বনে। সবাই চলে যেতে আমরা কর্তব্যের খাতিরেই সেখানটায় গেলাম যদি হাতিদের পায়ের তলায় পিষ্ঠ ঠাকুর সিং এর দেহের পিণ্ডটা অন্তত পাওয়া যায়। নিজেদের মনের মধ্যেও আতংক যদি হাতিরা ওখানটাতেই থাকে। তবে সে রকম হওয়ার কথা অবশ্য নয়। কারণ চলমান হাতির দল হঠাৎ এমন দাঁড়িয়ে পড়ে না বিশেষ কোন কারণ না ঘটলে। তাই গুটি গুটি গেলাম। ঠাকুর সিং ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। এক গা ধুলো কাদা মেখে পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে বটে, পা দুটো তার কাঁপছে। তাকে আমরা চেপে ধরলাম। প্রথমটা সে ধন্দ মেরে রইল। তার মুখ থেকে কোন কথা সরছে না, ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে আছে, সে দৃষ্টিতেও কোন নিশানা নেই, আমরাই ডেকে হতচেতন অবস্থা কাটিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রলাম। এ যেন তার প্রেতাত্মা উঠে এসেছে। কারণ ঠাকুর সিং বেঁচে আছে এমনটা আশা করা আমাদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। যাই হোক, সে যে বেঁচে আছে সেই সৌভাগ্যকেই স্মরণ ক'রতে ক'রতে আমরা তাকে সুস্থ ক'রে তুললাম। সে প্রথম কথা বলল, গেছে? হে ভগবান। হে রামজীকে কিরপা! —কথার সঙ্গেই হাতজোড় ক'রে কপালে ঠেকাল।

আমার ভাল লাগল না। কোন রামজী বা কোন ভগবান নয় ওর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত সেই হস্তীযূথ-এর প্রতি যারা প্রকৃতই মহানুভব। এবং কি মহত্বের উত্তরাধিকার থাকলে যে শিশু মাতঙ্গগুলো পর্যন্ত তাকে সাবধানে ডিঙ্গিয়ে চলে যেতে পারে সে কথাটা একবারও ভাবল না ঠাকুর সিং। তার অকৃতজ্ঞতার প্রতি ঘৃণা হ'ল আমার। মনে হল এই বেইমান লোকটার মৃত্যুর সম্ভাবনায় দুঃখ-বোধ করা আমাদের মূর্খামী হয়েছে। একে একে প্রত্যেকটি হাতি তাকে ডিঙ্গিয়ে গেল একটু ছোঁয়া পর্যন্ত লাগল না সে কি হাতিদের চরিত্রের গুণের জন্য নয়? তারা আঘাত ক'রতে চায় নি। কেবল পথের ওপর পায়ের সামনে যে সাইকেলটা পড়েছে সেটা পেছনের অনুগামীদের অসুবিধা ক'রতে পারে ভেবেই যদি দলপতি পদাঘাতে তা সরিয়ে দিয়ে থাকে তবে কি সে তার কর্তব্যটুকুই করেনি?

এসব কথা আমাদের একজনও ভাবল না। আশ্চর্য কেউ ভাবে না। জীবনে বহু ক্ষণে লক্ষ ক'রে দেখেছি প্রকৃত মহত্ব সব মানুষ বোঝে না। বৃহৎকে ব্যাখ্যা না

ক'রলে সাধারণ স্তরের মানুষ তাকে বড় বলে বুঝতে পারে না। প্রাণীমাত্রেই নিজের বুদ্ধির স্তর পর্যন্ত বোঝে। প্রতি প্রাণীর মধ্যে যেমন বুদ্ধির ভেদ আছে তেমনি একই প্রাণীর মধ্যেও বুদ্ধির পার্থক্য অনেক সময়েই দেখা যায়। যে অংক একটি বালক বোঝে না অন্য একটি বালক তা অল্পায়াসেই বুঝে নেয়। এই তারতম্য অন্য প্রাণীর পক্ষেও প্রযোজ্য। ঠাকুর সিং সাইকেলটার অবস্থা দেখে দুঃখ ক'রতে লাগল। অবশেষে সে একবার সাইকেল-এর শোকে গালাগালি দিয়ে বসল হাতিদের উদ্দেশ্যে। আমাদের কাঠকাটা দলের একজন কিঞ্চিত হিন্দি বুঝত, অন্তত গালাগালি গুলো তার পরিচিত ছিল বলেই বলল, হাতিকে গালি দিযো না হে! আজ ছাড়া পেয়ে গেছ গালাগালি দিলে হাতি তাকে কোনদিন ছাড়ে না। যেদিন পাবে শেষ ক'রে দেবে।

কথাটি ঠাকুর সিং কতদূর বিশ্বাস ক'রল কে জানে। তবে শোকার্ত সে যে গালাগালি আর দিল না সেটি বাস্তব। আমরা ঠাকুর সিংকে তার আস্তানায় পেঁছে দিলাম, বয়ে দিলাম তার সাইকেল পিন্ডটাও। মুহূর্তের মধ্যে কথাটা রটনা হয়ে গেল সমস্ত এলাকায়। সকলেই হাতিদের অত্যাচারের গল্পে মুখর হযে উঠল। আমরা যে সেখানে ছিলাম সেটা কেউ মনে না রেখেই যেমন খুশী বলতে সুরু ক'রে দিল। অবস্থাটা এমনই দাঁড়াল যে পরদিন খুব সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে সামনেটায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছি ভাদোরাম বলল, বাবু, আপনারা থাকতে হাতির অত্যাচারে মানুষের প্রাণ যাবে এটা কেমন কথা?

প্রাত্যুষিক বিস্ময়ে জানতে চাইলাম, কি ব্যাপার, কার প্রাণ গেল?

ঠাকুর সিংজীকা!

ঠাকুর সিং মারা গেছে না কি?—মনে মনে ভাবলাম কি জানি ঘরে এসে আবার লোকটি মারা গেল কি না।

বহুৎ এথি সে বাচ গিয়া। হনমানজীকে কিরপা সে।

কাল সন্ধেবেলা তো একবার সে তার রামজীর কৃপায় বেঁচে গিয়েছিল তারপর আবার কি তাহ'লে বিপদে পড়েছিল লোকটা যে হনুমানজীর কৃপায় বাঁচল? ব্যাপারটা বেশ রহস্যের তো! তাই জানতে চাইলাম, আবার কখন কি হ'ল তার?

সে আমার প্রশ্নের উত্তরে জানাল গতকাল বিকালে একদল হাতি ঠাকুর সিং কে তাড়া ক'রেছিল। ঠাকুর সিং জোর সাইকেল চালিয়ে আসতে গিয়ে এক গর্তে পড়ে যায় হাতিরা তাকে না পেযে রাগের চোটে তার সাইকেলটা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। পরিশেষে তার বক্তব্য এই যে হাতিরা আজকাল প্রায়ই বড় অত্যাচার ক'রছে, আমরা যেন এর একটা ব্যবস্থা করি। বড় বাবুর তো বন্দুক আছে অতএব—তাছাড়া আমরা বনের ঠিকাদার সুতরাং দুচারটে বাঘ আর দু চারশো হরিণ মারলে যেমন কেউ কিছুই বলে না বরং চামড়া মাংস ইত্যাদি লাভই হয় হাতি মারাটাও আমাদের

লোকসানের হবে না।

তার পরামর্শের পরাকাষ্ঠায় পরম পুলকিত হয়ে বললাম, হাতি যদি অত্যাচার ক'রেই থাকে তোমার বাড়ী গিয়ে ক'রেছে কি?

কথাটা বোঝবার মত মগজ লোকটির যে ছিলনা অতটা হিসেব আমি করিনি। যে লোক সাতশো মাইলের দূর পথ পেরিয়ে এসে বন খুঁজে গুপ্তধনের সন্ধান ক'রতে পারে সেই লোকই সাধারণ সত্যটা বোঝে না, আসলে বুঝতে চায় না বলে। মানুষ তার প্রয়োজন মত বোঝে প্রয়োজন না হ'লে বোঝে না—আপন বুদ্ধির এই যে কৌশলগত প্রয়োগ এই চাতুর্য অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই যা পার্থক্য। নইলে স্বভাব সর্তে একটা ছোট্ট পোকা এবং মানুষ একই স্তরভুক্ত। অন্য সাধারণ পোকামাকড়েরা মানুষের মত ভণ্ডামী জানেনা যা জানে ভাদোরাম প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর পোকারা। ভাদোরাম আমার প্রশ্নের উত্তরে সুবোধ মুখ-ভঙ্গী সহকারে বলল, কেন? আমাদের ওপর হাতিরা অত্যাচার করে না।

আমরা যদি তাদের ঘরে ঢুকে পড়ি তাহ'লে মানুষ হলে যা ক'রত সেটুকুও তারা করে না। আমার তো মনে হয় বন্য প্রাণীরা যেমন অসহায় তেমনই সহিষ্ণু।

ভাদোরাম আমার কথার মর্ম না বুঝে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ ক'রে বলল, আপনারা বাবু লোক। আমাদের প্রাণের দাম আপনাদের কাছে হাতির চেয়ে কম।

লোকটি আমাকে অকারণে কিছু কথা শুনিয়ে গেল। অথচ এই লোকই দেবেশ বাবুর সামনে সবসময়েই হাতজোড় ক'রে থাকে। আমি লক্ষ্য ক'রেছি সূক্ষ্ম চাতুর্যে জনে জনে আলাদা ব্যবহার ক'রতে জানে এই ভাদোরাম আর সিংরা। যেখানে শক্ত মাটি সেখানে এমন নরম থাকবে যে মনে হবে জল, লেপটে আছে। আর নরম জায়গা দেখলেই গর্ত খুঁড়বে। তাছাড়া, আমি একটা জিনিষ কিছুতেই বুঝলাম না ওর পানের দোকান তো লোকালয়ের মাঝখানে, ওর নিজের কাজও বনে নয় তবে কেন গতকালকের ঘটনায় ওর এত মাথাব্যথা? এ কি তবে পৃথিবীর প্রাণী মাত্রের বিরুদ্ধে দ্বিপদ এই জন্তুটির সেই আদিম হিংসারই উত্তরাধিকার? ভাদোরাম সরে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁতন ঘষতে লাগলাম আর আমার মনে পাক খেতে লাগল প্রসঙ্গত চিন্তার ধূম্রকুণ্ডলী—কত রকম প্রাণীই না ছিল পৃথিবীতে! তার কিছু নিশ্চিহ্ন হয়েছে বিবর্তনের পথে কিন্তু বহু প্রাণীকেই তো নিশ্চিহ্ন ক'রেছে এই প্রাণীটি, যার নাম মানুষ! প্রকৃতির কল্যাণে পৃথিবীর আবহাওয়া যে বিপুল প্রাণের সৃষ্টি ক'রেছিল একদিন, মানুষ আপনার প্রয়োজনে সেই সৃষ্টিকে ধ্বংস ক'রেছে। লক্ষ লক্ষ মাইলের সবুজ অরণ্য সে উৎসাদিত ক'রেছে। কোটি কোটি প্রাণীকে ক'রেছে গৃহহীন, আশ্রয় চ্যুত। জলের প্রাণীকে জল থেকে তুলে তার বেঁচে থাকার পরিবেশ নষ্ট ক'রেছে, বেশী সময়েই ক'রেছে হত্যা। আপন উদরপূর্তির প্রয়োজনে জলের হিংস্র প্রাণীরা জলের প্রাণীকেই

হত্যা করে, স্থলের মাংসাশীরা খায় স্থলের প্রাণী, কিন্তু এই মানুষ নামের বিকট প্রাণীটি স্থল জল এমনকি শূন্যচারী প্রাণকেও হত্যা করে, নিছক উদর পূর্তির জন্যে নয়, রসনার তৃপ্তির জন্যে। প্রকৃতির তৃণ সম্পদে আছে তার অপর্যাপ্ত আহারের আয়োজন কিন্তু তাতে সে তৃপ্ত নয়। তার লালসার ক্ষুধা আকাশের পাখিকে আকর্ষণ করে, ভূচর প্রাণীকুলকে বিনাশ করে, বিপুল জলতল থেকে খুঁজে আনে অদৃশ্য জলচর প্রাণীদেরকেও। এই মাত্রা ছাড়ানো চাহিদার নাম তো ক্ষুধা হতে পারে না, একে বলে লোভ। এর থেকে নিজেরও মুক্তি হয় না, অন্যকেও মুক্তি দেয় না।

অথচ এই মানুষও তো প্রকৃতিরই সৃষ্টি! এক এমনই সৃষ্টি যা অন্য সব সৃষ্টিকে ধ্বংস করে! তবে কি নিজের বিপুল কর্মকাণ্ড ধ্বংসের জন্যেই এই সৃষ্টি ? আপন মৃত্যুর বীজ যেমন প্রত্যেক প্রাণীর শরীরের মধ্যেই থাকে তেমনই কি ঘটেছে এই ক্ষেত্রেও ? আমার অহেতুক ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল পেছন থেকে ভেসে আসা স্বরে। নিরুপমা দেবীর ছোট মেয়ে পার্বতী চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, খুড়াদেউ ইমান দেরী কিয় করিছা ?

পেছনে চেয়ে দেখলাম শাসন করবার সুযোগ পেয়ে ছোট্ট পার্বতী রীতিমত কৈফিয়ৎ চাইছে। দাঁত মাজতে এত সময় লাগে কি ক'রে আবার সে এই জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে জানিয়ে দিল তার মা ডাকছে। দেরী যেন না করি।

ছোটদের এই রকম হুকুমদারীর একটা মাধুর্য থাকে। পার্বতী চলে গেলেও সেই মাধুর্য আমার স্মৃতিতে আটকে রইল। বহু দৃশ্য এমন এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য সঞ্চার করে যা হৃদয়কে ক্ষণিকের জন্যে হলেও প্লাবিত করে। নিরুপমা দেবীর নিযম মাফিক ডাকের জন্যে বিশেষ দ্রুততা ছিল না কারণ এটা জলযোগের সময়, দাঁত ঘষা শেষ ক'রতে হ'ল পার্বতীর শিশুসুলভ শাসনের মর্যাদা দেবার জন্যেই। এতক্ষণের ভাবনাগুলো পার্বতীর কণ্ঠস্বর শুনে কোনদিকে যে ছুটে পালাল তার আর খোঁজ পেলাম না

কিছু দিনের মধ্যেই, বনবিভাগের কার্যপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন হ'ল। নতুন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হ'ল বন বিভাগ। আমরা তার পরিচয় পেলাম। বহু বনাঞ্চল কেটে নির্মূল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কোথাও আবাদ হবে, কোথাও নতুন ক'রে গাছ লাগানো হবে ইত্যাদি। আমরা আগে লটুগাঁও বনে কাজ করেছি, বড়গোঁহাই তাই লটুগাঁও বন উন্মূলনের দায়িত্ব নিলেন। কিনে নিলেন লটুগাঁও ক্লিয়ার ফেলিং কুপ। উনি তো আনন্দে অধীর হয়ে ওঁর কাজ সমাধা ক'রলেন বন বিভাগকে পুরো টাকা আগাম জমা ক'রে দিয়ে এখন আমাদের দায় হ'ল ওই বিশাল এলাকার গাছ কেটে সাফ ক'রতে হবে। শাল গাছ কেটে মাপ মত লম্বা কাঠ ক'রতে হবে, বাকি যে সব অকাঠ কুকাঠ আছে

তার জন্যে জন্বালানীর আড়ৎ। সে সব যতটা সম্ভব ওখানেই ফেলে আসব, কারণ বয়ে আনার খরচ পোষায় না। ওই লট্‌্গাঁও সাফ ক'রতে যে কতদিন কতমাস লাগবে অনন্মান অসম্ভব। বন বিভাগের সদ্য প্রমোশন পাওয়া আঞ্চলিক বড় কর্তা খড়্গেশ্বর কলিতা একদিন বাড়ী এসে হাজির। জীপ গাড়ী থেকে নেমে বসবার ঘরে ঢ্‌ুকেই দেবেশ বাব্‌ুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রল উনি প্‌ুরোটাকা আগাম জমা দেবার জন্যে। জানাল, আপনার এই কাজে আমার খ্‌ুব সুবিধা হ'ল। এখনই প্রমোশন, মোটা টাকা সরকারী খাজাঞ্চিতে জমা করিয়ে দিতে পারায় আমার কিছ্‌ু সুনাম হবে। —অকপটে এবং সরল ভাবে মনের কথা বলে গেল খড়্গেশ্বর। দেবেনবাব্‌ু আধশোয়া হয়ে ছিলেন চৌকির ওপরটায় সেই ভাবেই সামনের একখানা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বহক।

খড়্গেশ্বর বসার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে আস্ত পান সুপারী একটা থালায় ক'রে এনে সামনে রাখল পার্বতী। কাঁচা সুপারী ছাল সমেত মাটির তলায় বহ্‌ুদিন প'্‌ুতে রেখে তৈরী হয় এই তাম্ব্‌ুল। ওপরের ছোবড়া ছাড়িয়ে গোটা পান আস্ত সুপারী একট্‌ু চ্‌ুণ একটি রেকাবীতে ক'রে পরিবেশন করা হয় অতিথি অভ্যর্থনায়। খড়্গেশ্বর একখানা পান তুলে নিয়ে সামান্য একট্‌ু চ্‌ুণ এক কোনায় লাগিয়ে দ্‌ুমড়ে ম্‌ুড়ে ম্‌ুখে প্‌ুরে একটা স্‌ুপারী দাঁতে কেটে কেটে চিবোতে লাগল।

আমি তাকে বললাম, লট্‌্গাঁও জঙ্গলে অনেকগ্‌ুলো বাঘ আছে।

আমার ম্‌ুখের কথা শেষ হবার আগেই সে বলে উঠল, মারি ফালাক। বাঘ, গ'্‌ুড় যি মিলিব হি গ্‌ুলাক মারি ফালাক। ময় বন রক্ষকক কহিদিম—আমাকে ঢালাও হত্যার হ্‌ুকুম জারি ক'রে দেবেশ বাব্‌ুকে বলল, আপনার বন্দ্‌ুকটা ওদের সঙ্গে দিয়ে দিন। যে জন্তুরা পালাবে পালাক যেগ্‌ুলোকে পারবে মেরে ফেলবে। হরিণ মারলে যেন দ্‌ু চারটে মাঝে মাঝে আমাদেরও পাঠায়।

সে আর এমন কি কথা, আমি বললাম। শ্‌ুনে হঠাৎ খড়্গেশ্বর উৎসাহিত হয়ে উঠল, নানা চালাকির কথা নয়। আপনার মনে আছে বড় গোঁহাই আমি যখন রেঞ্জা'র ছিলাম আমাদের রেঞ্জ অফিসেই কি বিরাট একটা হরিণ মেরেছিলাম! আমার জীবনে এতবড় হরিণ আর দেখতেই পেলাম না।

আমাকে সেই স্মরণীয় ঘটনা জানাবার জন্যে খড়্গেশ্বর বলল, তখন চারিদিকে এত ঘরবাড়ী হয়নি। এত চাষের জমিও হয়নি। আমাদের বনবিভাগের অফিসের গা থেকেই জঙ্গলের সুর্‌ু। একদিন সন্ধে বেলাতে একটা বিরাট হরিণ বোধহয় বাঘের তাড়া খেয়েই হবে এসে পড়ল একদম আমাদের অফিস ঘরটার সামনে। বন্দ্‌ুক ছিল আমার চেয়ারের পাশেই রাখা। ব্যস্‌। এক গ্‌ুলিতেই লাফ দিয়ে উঠে ছিটকে পড়ল হরিণটা!

নিজের কৃতিত্বের কথা এমন ভাবেই জাহির ক'রতে চেষ্টা ক'রল লোকটি যে

সমস্ত পূর্ব য়ুরোপ জয়ের পর হিটলারও এভাবে নিজের গরিমা প্রকাশ ক'রতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সামান্য একটা হরিণ—শান্ত নির্বিরোধ প্রাণী প্রাণভয়ে যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে যেখানে রক্ষা করাই ধর্ম, সেখানে হত্যা ক'রে যে বড়াই ক'রতে পারে সেই মূর্খটিকে ঘৃণা করার মতও ক্ষমতা আমার নেই সেই দুঃখেই আমি মূক হয়ে গেলাম।

দেবেশ বাবুর মত নির্বাক শ্রোতা এবং চুপচাপ আমাকে পেয়ে আরও কিছুক্ষণ আবোল তাবোল ব'কে খড়্গেশ্বর বলল, ময় যাঁও।

আমি তার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার ধারণা ছিল খড়্গেশ্বর কোন কাজ নিয়ে এসেছে, তা নয় বুঝে আমি আমার কাজে যাবার মনস্থ ক'রলাম। কিন্তু আমার পেছন পেছন সে এসে তার জীপগাড়ীর কাছটায় আমাকে ধরে ফেলল। আমার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বলল, দিল্লির এক ব্যবসায়ী দশহাজার কিউবিক ফুট শাল কাঠের জন্যে আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়েছে। আপনারা চিঠি লিখে যোগাযোগ করুন। আর শুনুন আমার জন্যে কিছু কাঠ আলাদা ক'রে কাটবেন। পারে দেখা ক'রে সব কথা বলে নেব।

অর্থাৎ আমাদের মার্কা করা এলাকার বাইরে কিছু গাছ কেটে দিতে হবে ওর জন্যে। আমি জানতে চাইলাম, বড়গোঁহাইবাবুকে বলেছেন?

বলব বলে এসেছিলাম। আপনি উঠে এলেন বলে সময় পেলাম না। আপনি বলে দেবেন, আমি পরে এসে সবঠিক ক'রে নেব। —বলেই গাড়ীতে উঠে পড়ল। নতুন জীপগুলো এসেছে বনবিভাগের কাজে, ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে গেল।

এই চুক্তিগুলো লাভজনক আমি জানি। দশটা গাছ কেটে তার অর্ধেক কাঠ অথবা বিক্রি ক'রে টাকা দিতে হবে পেঁৗছে। এরকম তো প্রায় সব বনরক্ষকই ক'রে থাকে। বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের মধ্যে যারা এসব চুক্তিতে একবার ঢুকে পড়ে তাদের এইসব সুযোগ হামেশাই জুটে যায়। আমি কিন্তু এই চুক্তি মন থেকে মেনে নিতে পারিনা। অনেক বাদপ্রতিবাদ ক'রেছি নিজের মনের সঙ্গেই। কিছুতেই পারিনি। আমার কেমন যেন লাগে। অথচ সেই একই তো কাজ, সেই গাছ কাটা, বড় বড় গাছগুলোকে বাঁকের জায়গাটায় করাত দিয়ে কেটে টুকরো করা, হাতিকে দিয়ে টানিয়ে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে যাওয়া তারপর মোষের গাড়ীর তলায় বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে একজায়গায় রেখে দেওয়া দূর কোন দেশে পাঠানোর অপেক্ষায়। এই ভাবে বন কেটে গাছকে কাঠ করা সেখানে আমাদের গাছের সঙ্গে চুরি করা গাছের তফাৎটা কি? আসলে তো গাছগুলো সবই ডাকাতি ক'রে নেওয়া, লুণ্ঠন। এই যে বনের গাছ আমরা কাটি এ তো লুঠ করি বনবাসীদের সম্পদ। তারা অসহায় অক্ষমতায় সরে যায় অন্যদিকে যে দিকটা তখনও কাটা হয়নি বা হচ্ছে না। যারা পালাতে না পারে মরে। নিহত

হয়। তাদের মেরে আমরা যুদ্ধজয়ী সম্রাটের মত খেতাব ধারণ করি শিকারী। আসলে একজন ঘাতক তাকে যে নামেই ডাকা হোক না তাতে তার অপরাধ কাটে না। একজন পররাজ্য লোভী সম্রাট আলমগীর বা শাহ-জাহান যা হোক কিছু উপাধিতে নিজেকে জাহির ক'রতে পারে তাতে তার প্রতি ঘৃণা কারও কমে না। আমরা যে অবলা প্রাণীদের মনোভাব বুঝতে পারি না সেজন্যে তাদের ঘৃণা বা অভিশাপ থেকেও মুক্তি পাইনা আমরা।

বনের নিয়ম চোরাই গাছগুলো মার্কা করা গাছের চেয়ে আগে কাটতে হয়। সেগুলো কেটে নিয়ে মার্কা করা গাছের সঙ্গে কেটে নিয়ে আসতে হয়। কারণ বন রক্ষকই ব্যবস্থাকরুক বা খড়গেশ্বর এর মত ওপর ওয়ালাই ব্যবস্থা করুক হিসেব কেউই রাখতে পারে না। একবার কেটে মিশিয়ে দিতে পারলে বা কিছু সরিয়ে দিতে পারলে কারও কিছু করবার থাকে না। তাই এই চোরের ওপর বাটপারি সব ঠিকাদারই করে থাকে। কিন্তু আমাদের এখনকার বনরক্ষক আবিদ আলী অত্যন্তই দুর্ত। সেয়ানা যাকে বলে। সে একদিন না বলে কয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির আমাদের লটুগাঁও তাঁবুতে। আমরা সেখানে সবে দিন দশেক গিয়েছি। আমাদের সাতশ জোড়া তবলদার সমানে কেটে চলেছে শাল, জাম, খোকন, অর্জুন, পিপুল, কদম, ছাতিম, গোকুল—যে গাছ সামনে পড়ছে। যে বন বৃক্ষশূন্য করতে হবে সেখানে তো গাছ বিচারের কোন ব্যাপারই নেই। তবে যে এলাকাটুকু থেকে বন উচ্ছেদ করতে হবে তার বাইরে যে অংশ থেকে যাচ্ছে আমরা আগেই যে সেখানে গিয়ে গাছ কেটে রাখব সেটা ওই আবিদ আলী ঠিক আন্দাজ করে ফেলেছিল। সে আমার তাঁবুতে ঢুকেই বলল, উত্তরের সীমানার বাইরে শাল গাছ কে কাটল?

আমি দেখলাম এখানে মিথ্যে বলার উপায়ও নেই প্রয়োজনও নেই। তাই সরাসরি স্বীকার করলাম, আমরাই কেটেছি।

আবিদ আলী বেশ গাম্ভীর্য সহকারে বলল, এখন আর আগের দিন নেই। বন বিভাগে এখন আমুল পরিবর্তন হয়ে গেছে আর ওইসব চলবে না। এখন থেকে প্রতিটি গাছের হিসেব দিতে হবে।

আমি ওর ওসব যাত্রার আসরের চোখ রাঙানিতে মজা পাচ্ছিলাম। লক্ষ্য করছিলাম ওর দৌড় কতদূর পেঁছায়। আমার ঠোঁটের কোণে কোথাও হয়ত একটু হাসি ফুটে উঠে থাকতে পারে যার জন্যে হঠাৎ গরম হয়ে উঠল আবিদ আলী, প্রচণ্ড রেগে আপন ক্ষমতার পরিমাপ ভুলে গিয়ে বলে উঠল, আপনার চালাকিটা আমি ভুলিয়ে দেব। কোনদিন আর যাতে এমন কাজ না করেন তার ব্যবস্থা করব।

এবার আমি তাকে থামাতে চাইলাম। অত্যন্তই শান্তভাবে বললাম, আস্তে

মশাই অকারণ চটছেন কেন? যাতে কোন লাভ হবে না তেমন কাজ কোন বুদ্ধিমানে করে?

আবিদ আলী শ্রীহট্ট জেলার লোক। চটলে তাকে ঠান্ডা করা মুস্কিল। আমার কথাগুলোকে সে বিদ্রূপ মনে করে নেওয়াতে তার কথার তাপ চড়তে লাগল। আমি বললাম, অত চটবেন না তো! আমাদের ওপর চটে কি লাভ যা বলবার দেবেশবাবুকে গিয়ে বলুন।

আমার কথাতে যেন একটা পথ পেল আবিদ আলী—। নিমেষমাত্র অপেক্ষা না করেই বলল, সেই কথাই ঠিক। আমি বড় গোঁহাইকেই বলব। এরকম করলে জঙ্গলের কাজ করা চলবে না।

আমি তখনও খুব হালকা ভাবেই কথা বলে চলেছি। সে যেতে উদ্যোগী দেখে বললাম, দেবেশ বাবু তো বাড়ীতেই আছেন। থাকবেনও। আপনি বরং আমাদের সঙ্গে একটু থেকে যান।

রাগ আবিদ আলীর কিছুমাত্র পড়েনি বলেই সে আর একটা কথাও বলল না। যে কথা বললে প্রথম থেকেই ব্যাপারটা থেমে যেত সেটা ইচ্ছে করেই বলিনি। যদি ওর ওপরওয়ালা খড়গেশ্বরের নাম করে বলে দিতাম এ তার কাঠ তাহলে আবিদ আলীর এমন নাটক করবার সুযোগই হত না। কিন্তু খড়গেশ্বর নিজে যেহেতু বলে দেয় নি তাই আমরা বলতে পারি না। সেটা রীতিবিরুদ্ধ। বিশ্বাসভঙ্গ তো করতে পারি না। তাহলে ভবিষ্যতে কেউই নির্ভর করবে না, তাই অন্যের চুরির দায়টাও নিজেদের ঘাড়ে বইতে হল। তাছাড়া ব্যাপারটা আমার ঘাড় থেকে নামিয়ে দেবেশবাবুর ওপর দিয়ে দিলে সুবিধে এই যে তাঁকে আবিদ আলীর মত ছুটকো অফিসার ঘাঁটাতে যাবে না। বরং সেখানে গেলে এরকম লোকেরা নরম হয়েই কথা বলবে সুর সুর করে। আসলে সে প্রথম দিকটায় রাগ করেনি, রাগের অভিনয় করছিল। সেটা যে আমি ধরে ফেলেছি রাগ সেই কারণেই। আমার তাতে কি? তার রাগের অভিনয়ে ঘাবড়িয়ে গিয়ে যদি তার সঙ্গে একটা রফা করতাম ব্যাপারটা তাহলে তার অভিপ্রায় মত ঘটত। তা হবার উপায় আমাদের দিক থেকে ছিল না। আমরা যে কাজ করছি খড়গেশ্বরের হয়ে তা সামলানোর দায় তরাই।

আবিদ আলী তার লোকজন সহ চলে গেলে আমি রাইফেলটা হাতে নিয়ে গাছ কাটা দেখতে বেরোলাম। শীতের শেষের বন। ঝরা পাতার স্তূপে চলা মুস্কিল। মাটির ওপর এত শুকনো পাতা জমে আছে যে মাটিতে পা ঠেকছে না। মনে হচ্ছে স্প্রিং এর গদীর ওপর দিয়ে হাঁটছি। কোথাও কোথাও পায়ের তলায় পাতা পিছলে সরে যাচ্ছে। একসঙ্গে অনেকগুলো কুঠারের শব্দ অপরিচিত ধ্বনি তুলেছে বনের মধ্যে। প্রতিধ্বনিতও হচ্ছে। ওই শব্দ ধরে এগোচ্ছি। এরই মধ্যে

হঠাৎ কানে আসছে দূ একটা পাখির স্বর। আমার কানে আর্তস্বর বলে প্রতিভাত হচ্ছে। হয়ত হতে পারে সে আমার ভুল। পাখি উড়তে উড়তে ডাকছে বলেই অমন শোনাচ্ছে। পাখিটা মিলিয়ে গেলেই আবার অরণ্য ঝিঁঝিঁর শব্দে নিঝুম। তারই মধ্যে এক সঙ্গে একটানা খটাস খটাস শব্দ। কুঠারের। শব্দগুলো আমার চেতনায় আঘাত ক'রতে লাগল। তারই ফলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম জঙ্গলে কখনও অন্যমনস্ক হতে নেই। বিশেষ ক'রে এই রকম গভীর বনে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। সেই সতর্কতার অভাবের জন্যেই আচমকা সড়াৎ ক'রে শব্দ। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি বিরাট এক বিষধর ফণা তুলে সামনে। স্থির লক্ষ্যে আমাকে বিঁধছে। পলকেই থেমে গেলাম। নড়লেই ছোবল দেবে। মৃত্যু নিশ্চিত। আমি না নড়লে যে ছোবল মারবে না সে নিশ্চয়তা কোথায়? তবে শুধু মাত্র চিন্তা চঞ্চল। আমি যথাসম্ভব স্থির। পাথরের মূর্তির মত স্থির হতে চেষ্টা ক'রলাম। একমাত্র বাঁচবার পথ আছে হাতের রাইফেল। তুলে গুলি করতে পারলে যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয় তাহ'লে বেঁচে যাই। কিন্তু হাত নাড়লেই তো ওটা ছোবল মারবে আমায়। কাজেই ডান হাতে রাইফেল ঝুলছে তবু আমি অসহায়। আর যদিই একলাফে পিছিয়ে গিয়ে গুলি করি আর সে গুলি ফসকায় তাহ'লেও আমার পরিত্রাণ পাবার উপায় থাকবে না। দেবেশবাবুর রাইফেল, সামান্য ক'দিন চালিয়ে চালানোটা শুধু শিখেছি, লক্ষ্য স্থির হবার আশা সামান্যই। অতএব—নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে মনে ভেবেই চলেছি কি উপায় করা যায়? কিছুই মাথায় মাথায় আসছে না এমনি সময় একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। সাপটার পেছনে সামান্য দূরত্বে একটা শুকনো ছোট ডাল ভেঙ্গে পড়ল কোন একটা গাছ থেকে। ব্যাপারটা সামান্যই কিন্তু শুকনো পাতার রাশের ওপর পড়বার জন্যে শব্দটা বেশীই হ'ল। তাছাড়া আকস্মিকতার জন্যেও শব্দটা বেশ ভাল রকম আঘাত ক'রল তার স্নায়ুকেন্দ্রে। ভয়ানক চমকে উঠে ঘুরেই অব্যর্থ লক্ষ্যে ছোবল দিল কাঠের টুকরোটার ওপরে। ওইটুকু অবকাশেই আমি আমার লক্ষ্য পরীক্ষা ক'রে নিলাম। একগাদা শুকনো পাতার সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছত্রাকার হয়ে গেল ডালটা। আর একটা দড়ির মতন কিছু লাফিয়ে উঠে পড়ে রইল ওই ঝোপ ঘাস আর ঝরা পাতার ঝাড়ে। মৃদু চঞ্চলতাও মুহূর্তে কয়েক বাদে স্থির হয়ে গেল। আমি পাতার ফাঁকে খুঁচিয়ে দেখে নিলাম সাপটার কবন্ধ দেহ পড়ে আছে মাথার কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

সেই মুহূর্তে আমার প্রথম মনে হ'ল, আচ্ছা যদি আমার লক্ষ্য স্থির না হ'ত কি এমন ক্ষতি ছিল? কি হ'ত তাহ'লে? সাপটা তো আমার দিক থেকে লক্ষ্য বিপরীত দিকেই ক'রে ফেলেছিল, অতএব গুলিটা তাকে না ক'রলেই বা কি ক্ষতি হ'ত আমার? আমি তো ওই অবসরে সরে গেলেই পারতাম। আমি তার জায়গা

দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে ভয়ে সে ফণা তুলেছিল আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায়। তার তো কোন দোষ ছিল না। এক দুঃখবোধ আমাকে পীড়িত ক'রে তুলল। ক্ষমতা মানুষকে বিপথগামী করে। হাতে রাইফেলটা না থাকলে তো আর আমি ওকে এভাবে হত্যা ক'রতাম না। আমাকে যখন ছোবল মারতে উদ্যত তখন গুলি করলে অনুশোচনার কারণ থাকত না কিন্তু যেভাবে যখন ওকে মারলাম সেটা অকারণই হয়েছে। অকারণ হত্যার অপরাধ আমাকে মর্মবেদনায় দগ্ধ ক'রতে থাকল। আমি সেটা সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চললাম। জীবনে এমনি পাথেয় অনেক সংগ্রহ হয়। জীবন তাতে ভারী হয়ে ওঠে। আমরা একটা ভারবাহী প্রাণীর মত ক্লান্তিতে অবসন্ন সেই জীবন বয়ে চলি।

আমরা এমন জায়গায় তাঁবু ফেলেছিলাম যেখান থেকে লটুগাঁও জঙ্গলের চার প্রান্তের দূরত্ব প্রায় সমান। তাছাড়া জায়গাটা অন্য একদিক থেকে অনুকূল ছিল, গৌরীপুরের কুমার প্রকৃতীশ বড়ুয়া বাহাদুর এখানেই ছাউনী ফেলে লটুগাঁও এবং চারপাশের জঙ্গলে হাতি ধরছিলেন মাস তিনেক ধরে। তিনি ছাউনী উঠিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেখানটাতেই তাঁবু ফেললাম। হাতিকে ছাড়া কোন ভয় আমাদের ছিল না। তবে এতদিন খেদানোর ফলে আশা করা গিয়েছিল হাতিরা সদ্য এদিকটায় আসবে না। এই বিরাট এলাকা বনমুক্ত করতে হলে এখানে ছাউনী ফেলে কাজ করাটাই সুবিধেজনক বলে কিছু ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁবু ফেলার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। নিরুপমা দেবীর নজর সব দিকেই থাকে। আমাকে সাবধান ক'রেছিলেন, গছ হিঁয় কাটিব। তয় কি করিবি? —আমি যেন দিনে দিনে লটুগাঁও থেকে ফিরে যাই এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তাই বলেছিলেন, গাছ কাটবে তো কাঠুরিয়ারা আমার সেখানে কি কাজ? দেবেশবাবুও স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে বললেন, মাঝে মাঝে গিয়ে কাজ দেখলেই হবে। রোজ ওখানে থাকবার কোন দরকার নেই। প্রদীপ ডেকা বলে একটি প্রতিবেশী যুবককে কাজে নেওয়া হয়েছিল দেবেশবাবুর ইচ্ছা সে-ই জঙ্গলে থাক। আমি বাদ প্রতিবাদের মধ্যে না গিয়ে চুপ ক'রেই রইলাম। আমার মনোভাব নিরুপমা দেবী বুঝতেই পেরেছিলেন, বললেন, আমার কথা যদি না শুনবি তো আমাকে কোনদিন আর বউদি বলে ডাকবি না।

আমি কারও কোন কথাই শুনিনি। রাত্রিতে আমরা শুকনো ডালপালা তাঁবুর এলাকার চারপাশে জড় করে আগুন ধরিয়ে রাখি। যে কেউ একজন প্রতি রাত্রে জেগে থাকে আগুনগুলো উস্কে দেবার জন্যে। তাঁবু থেকে আটফুট দূরে পর্যন্ত আমরা মাটি কেটে গাছপালা শুকনো পাতা নির্মূল করে রাখি যাতে এই আগুন কোনক্রমে দাহ্যবস্তু বয়ে এগিয়ে না আসে তাঁবু পর্যন্ত। বিকাল হবার আগেই সবাই ফিরে আসে তাঁবুতে যাতে অন্ধকার না হয়। একটু অন্ধকার হলেই রান্নার কাজ সুরু হয়ে যায়। সন্ধে হতে হতেই খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে গল্প

করতে বসি। অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাইনা আন্দাজেই গল্প করি। শব্দ লক্ষ্য ক'রে কথা বলি। আমাদের তো অনেকদিনই থাকতে হবে তাই প্রতি সন্ধ্যাতেই আশা করি অচিরেই শুক্লপক্ষ আসবে। মনে মনে হিসাবও করি কৃষ্ণপক্ষের দিনগুলোকে। আর কটা দিন এই অন্ধকার থাকবে গুণতে থাকি প্রত্যেকটি অন্ধকারে একা থাকার অবসরে। সেটা ত'াবুর মধ্যে শুয়ে। আমরা সচরাচর ক্লান্ত না হলে কেউ শুই না। যে যখন কথা বলতে বলতে ক্লান্তি অনুভব করি উঠে গিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ি আপন বিছানায়। তাঁবুর মধ্যে মাচা ক'রে তার ওপর যা হোক কিছু একটা পেতে বা না পেতে শোবার নামই বিছানায় শোয়া। আমার তাঁবুতে আমি আর প্রদীপ শুই। সামান্য একটু জায়গা তা বাদেও থাকে, কেউ এলে শোবে বলে ব্যবস্থা করা আছে। ব্যবস্থা মানে আছে আর একটা মাচা। সেটা এমন ভাবে করা যে খুলেও রাখা যায় দরকার হলেই পেতে ফেলা যাবে।

এক একরাত্রে শুয়েও কথা বলতে থাকি। প্রদীপই বেশী বলে। একদিন শুয়ে আছি প্রদীপ ডেকে জানতে চাইল ঘুমিয়েছি কিনা। আমার সাড়া পেয়ে বলল, একটা কথা বলুন তো শুনি।

কি কথা? —আমি জানতে চাইলাম।

সবাই বলে লটুগাঁওতে অনেক বাঘ আছে। আমাদের ওদিকে যত বাঘ যায় বা যেগুলো মারা পড়েছে সবই নাকি লটুগাঁও জঙ্গলের। কিন্তু আমরা তো একটা বাঘও দেখলাম না।

দেখতে পেলে কি ভাল লাগত? মানুষের মধ্যে একটা বাঘ দেখতে পাওয়া আর বনের মধ্যে বাঘ দুটোতে অনেক তাফাৎ। দেখতে না পাবার জন্যে দুঃখ ক'রো না।

আমার কথা প্রদীপের কতটা মনঃপুত হ'ল ঠিক বুঝলাম না। সে চুপ ক'রে রইল। কম বয়সের দরুণ তার অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক ভাবেই কম। ভাবনার মধ্যে ভয়ের মাত্রাও অনভিজ্ঞতার দরুণ অনুপস্থিত। তাই যেখানে রোমাঞ্চ সেখানেই তার আগ্রহ। উত্তেজনার পেছনে তার মনের ঘর-পালানো অনুরাগ। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর সে আবার বলল, আমরা এতদিনের মধ্যে তিনটে উদ্‌বেরাল, একটা ভাম, আর সেদিন ঘিরে একটা শেয়াল মেরেছি।

আমি প্রথম কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলাম তারপর আর থাকতে না পেরে জানতে চাইলাম, কি লাভ হ'ল তোমাদের?

অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার শান্ত প্রশ্নটি শুনে তরে কোন ভাবান্তর হ'ল কিনা বুঝতে পারলাম না। তার স্বাভাবিক এবং সহজ স্বর শুনে অনুমান ক'রলাম কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। সে বলল, বাঃ মারব না? পরক্ষণেই যেন নিজের ভুল স্বীকার করে বলল, তা অবশ্য ঠিক বলেছেন এসব

মেরে কোন লাভ নেই। বাঘ বা গণ্ডার মারতে না পারলে মারার কোন আনন্দই আসে না।

আমি চুপ ক'রে রয়েছি দেখে সে আবার বলল, বন্দুক তো নেই। পিটিয়ে তো আর বাঘ মারা যায় না! আপনার রাইফেলটা একদিন দিলে হরিণ মারি। সবাই খুব আফশোষ ক'রছিল হরিণের মাংসের জন্যে। রেঞ্জার সাহেব সেদিন গাছ কাটার ওখানে গিয়ে বলেছিল হরিণ মারবে। সবাই মিলে মাংস রান্না ক'রে রাত্রে খাওয়া দাওয়া ক'রবে আমাদের তাঁবুতেই।

আমি কিছু না জানার ভান করে বললাম, হ'ল না কেন ?

কি জানি। রেঞ্জার তো আর এল না! —প্রদীপের গলার স্বর করুণ শোনাল। আমি কথা না বলে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু প্রদীপের কথার বদলে তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। বেশ কিছুক্ষণ কান পেতে শুনলাম। আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। এরকম অকারণ অনিদ্রা সচরাচর হয় না। আমি ক্রমাগত এপাশ ওপাশ ক'রতে লাগলাম। বাঁশের মাচা। বেশী নড়াচড়া ক'রলে শরীরেও লাগছে। কিন্তু কি উপায় ? ঘুম যখন না আসে তখনকার অসহায়তার ব্যাখ্যা হয় না। তার ওপরে যদি পাশের লোকটির নাসিকা গর্জনের ধ্বনি শুনে যেতে হয় তাহ'লে তো আর সুখের শেষ থাক না। পরম পরার্থপর মানুষও হয়ত ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠে অবস্থার বৈকল্যে। মনের মধ্যে সেই ঈর্ষার জন্ম হবার সম্ভবনায় আমি উঠে পড়লাম। রাইফেলটা আমার মাচাতেই সারারাত শুয়ে থাকে আমার সমান্তরালে। ওঠবার সময় কোন রাত্রেই তাকে ওঠাতে ভুলি না। সেটিকে নিয়েই তাঁবুর পর্দার দরজা সরিয়ে বাইরের দিকে উঁকি দিলাম। আমার তাঁবুর চারপাশে উঁচু উঁচু খুঁটি পোঁতা ছিল। সেই খুঁটিতে নির্ভর ক'রে ঘর হবে। চাঙ ঘরের মত উঁচু ঘর। আমরা যে কদিন থাকব সে কদিনের জন্যে এবং ভবিষ্যতে সেই ঘরকেই সাজিয়ে দিয়ে কাজে লাগাবে আগামী দিনের চাষ বাসের কর্মীরা। ঘর গুলো হয়ে গেলে এই অস্থায়ী তাঁবু গুটিয়ে ফেলা হবে। কাঠুরিয়ারা এখন যেমন অস্থায়ী ডালপালা আর শুকনো পাতা দিয়ে তৈরী ঘর ক'রে নিশিযাপন ক'রছে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তেমনি থাকবে। আমি ছায়াচ্ছন্ন খুঁটিগুলোকে সন্দেহ ক'রতে লাগলাম। রাইফেল এর নলটিকে প্রথম বাইরে বের করে চারপাশ যথসম্ভব লক্ষ্য ক'রে বেরিয়ে এলাম। নাঃ আগুনগুলো বেশ চাঙ্গা আছে। তাহ'লে যার ওপর আগুন জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব সে জেগেই আছে! চারপাশে আবার ভাল ক'রে দেখে নিলাম। বাঘকে বিশ্বাস নেই। অমন নিঃশব্দ বিহারী প্রাণী দ্বিতীয় আর আছে কিনা সন্দেহ। বাতাস যেদিকে বইছে সেদিকে থাকলে তার গায়ের গন্ধটুকুও পাবার উপায় নেই। এতই অন্ধকার যে আমার নিজের হাত ওঠালে আমি ছায়া ছায়া দেখছি। কেমন এক আশ্চর্য অন্ধকার! অদূরে আগুনগুলো যেখানে

যেখানে জ্বলছে সেই জায়গাগুলোই যেন রহস্যময়। কোন একটা পাতার ছাউনীর মধ্যে নিশ্চয়ই বসে আছে পাহারাদার লোকটি। ওর কাছে তো রাইফেল নেই! তবু কোন সাহসে ও এমনি ভাবে সারারাত আগুনগুলোকে উস্কে বেড়াচ্ছে ডালপালা পুড়িয়ে? এদের অনেকে নাকি রাত বাঁধতে পারে। জানোয়ারদের চোখ বাঁধতে জানে। পরম্পরায় শুনেছি। বনের কাজ যারা করে, বনে যারা জীবনের সুসময়ের পুরোটা কাটিয়ে দেয় জাগরণের সময়ের হিসেবে, তারা নাকি ওই সব এমন বিদ্যা জানে যাতে জন্তু জানোয়াররা সামনে আসেনা। কি যে সেই সব মন্ত্র তা কেউ বলতে পারে না, এবিদ্যা যাদের আয়ত্তে তারাই শুধু সন্ধান রাখে। বনে তো কেবল জন্তু জানোয়ারই নেই—বহু রকম অপদেবতারও বাস। তাদেরও বাঁধবার বিদ্যা শেখা আছে এদের। কি করে শেখে? জন্মসূত্রে। উত্তরাধিকার? গুরুগোচর বিদ্যা? জিনিসটা জানতে হবে। কাল সকালেই জিজ্ঞাসা ক'রব। অকস্মাৎ আকাশ জুড়ে বিকট চিঁ চিঁ শব্দ ক'রে আমাকে ভয়ানক চমকে দিয়ে মাথার ওপর দিয়েই উড়ে গেল একটা বিরাট আকারের বাদুড়। বাদুড় তো? কোন বিস্ময়কর অশরীরী নয় তো? সামান্য শিহরণ জাগল শরীরে। পরক্ষণেই মনে হ'ল আমি তোঁ কখনও এত ভয় পাই না! তবে এখন কেন পাচ্ছি? নাঃ অহেতুক এই ভয়ের কোনই অর্থ হয় না। সাহস সঞ্চয় ক'রে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। মাটিতে থাকতে পারে কেবল সাপ। ভয় তাকেই। তবে শীতের ক্রুরতা পরিমণ্ডল থেকে এখনও যেহেতু যায়নি তাই মাঠে ঘাটে তারা গা এলিয়ে রাতের শিশিরে পড়ে থাকবে এমনটা না ভাবলেও চলে। এক কেবল হাতি। তারা তো ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকবার প্রাণী নয়। বাঘ? তাকেই বা ভয় নয় কেন? সে-ও তো ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে যে কোন চালা ঘরের আড়ালে! এবং সেটা যদি সামনে না হয়ে ভাগ্যক্রমে পেছন দিকেই হয়? হ'লে হোক। যা হয় ঘটনার সময় দেখা যাবে কি ক'রে তার প্রতিরোধ করা যায়। আগে থেকে আকাশ পাতাল ভেবে কি হবে কুণ্ডলী পাকিয়ে মরে? সামনের আগুনটা পর্যন্ত গিয়ে দেখলাম অনেক কাঠ পাশটাতেই জমা করা আছে। থাক। আমার কি করবার আছে এখানে? ফিরে চললাম। নাঃ শুয়েই পড়া যাক তাঁবুর মধ্যে গিয়ে। বাইরেব কাজ সেরে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়ব এমনি সময় তাঁবুর ওপাশে কিছুটা দূরে একটা আর্তনাদ ফুটে উঠল। বিজন অন্ধকারের মধ্যে ঠিক কতটা দূরে যে শব্দটা হ'ল আন্দাজ করা গেল না। ঠিক এই ধরণের আর্তনাদ আমি আগে কখনো শুনিনি তাই অনুমান ক'রতে পারলাম না কোন আক্রান্ত প্রাণীর অন্তিম স্বর এটা। এই ঘটনায় আমার কিছু করবার নেই বলে অযথা অনুমানে বিরত হলাম। আমার প্রয়োজনই বা কি? তবে হয়ত এই ঘটনা আমাদের উপকার ক'রে থাকতে পারে। খাদ্যের সন্ধানে যে প্রাণীটি আমাদের কাছাকাছিই এসেছিল সে ওই শিকারটি না

পেলে এখানে আমাদের কাছেও তো এসে পড়তে পারত! আর বনের মধ্যে এ পথ চলা তাদের ক'মিনিটের ব্যাপার?

তাঁবুতে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। অদেখা প্রাণীটির অন্তিম স্বর আমার মনে আছড়ে পড়তে লাগল। অনুমান ক'রে খাদ্যকে চিনলাম না খাদক নিশ্চয়ই বাঘ। অন্ধকারে বাঘেদেরই রাজত্ব। তারাই বনময় বিচরণ করে তৃণভোজী প্রাণীদের হননের ইচ্ছায়, আপন ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনে। তাদেরই বা কি দোষ—? প্রাণধারণের জন্যে অন্য প্রাণের ওপর আছড়ে পড়তে বাধ্য হয় তারা। জীব ধর্মে তারা অসহায়। মনে পড়ল এই অসহায়তার এক করুণ রূপ দেখেছিলাম উত্তর বাংলার জঙ্গলে। ডুয়ার্স। ঘন যে গাছের ছায়া মাটিকে শুকোতে দেয় না, জোঁক, সরীসৃপেরা বুক হেঁটে দিনরাত সমান জ্ঞানে বিচরণ করে। তারই মাঝে মানুষের চলেছে চক্রান্ত। সরীসৃপ ই হোক আর শ্বাপদই হোক তারা সরল। কিন্তু মানুষ জটিল। কুটিল। ক্রূর। তাই প্রথম শ্রেণীর প্রাণীরা যখন আঘাত করে আত্ম-রক্ষার তাগিদে দ্বিতীয় দল তখন চক্রান্ত করে অন্য প্রাণীদের ব্যাপক ধ্বংসের এই বিশ্ব প্রকৃতির আশ্রয় থেকে তাদের উৎসাদনের। তাই নিঃশব্দে বনভূমি থেকে মহীরুহেরা হয় ভূপাতিত, পুনর্নব বৃক্ষদের হতে হয় নির্মূল। ডুয়ার্সের অরণ্যে সেই চক্রান্তের অংশীদার ছিলাম আমিও। এক সময় ছিলাম। কাটা গাছ নিয়ে যাবার জন্যে বলদ মোষেরা আসত জনপদের কাছাকাছি জঙ্গলের ভেতরেও। একবার একজন লোক একজোড়া এমন মোষ নিয়ে এল যাদের শিং ছিল দেখবার মত। ভারী সুন্দর অল্পবয়সী মোষজোড়া দেখতে খুবই ভাল লাগত। যেদিন যখন কাজ থাকত না মোষদুটো আশে পাশে চরে বেড়াত। যেখানেই ঘাস খেয়ে বেড়াক সন্ধের আগেই ফিরে আসত আপন ঘরে। এ ছিল তাদের প্রতিদিনের অভ্যাস। এই অভ্যাসটা এমন ভাবেই তাদের মনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল যে সেটা যেন ওদের স্বভাবের অঙ্গ। তাই বনের মধ্যে কাজ ক'রতে এসেও ওদের মালিক নির্ভয়ে ওদের ছেড়ে রেখে দিত। বনের অনেকটা সাফ ক'রে যেখানে আমরা ছিলাম সেই-খানেই মোষ নিয়ে মালিকও থাকত। একদিন প্রায় দুপুরে মোষ দুটো ঘাস খেতে খেতে জঙ্গলে কখন যে ঢুকে গেছে কেউই খেয়াল করে নি। কববার প্রয়োজনও ছিল না। বিকাল বেলা আমরা সবাই বসে আছি হঠাৎ দেখি একটা মোষ ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে-আসতেই দেখি তার পিঠের পেছনে, ঠিক পেছনের পা দুটোর ওপরে পাছার পাশে বিশাল ক্ষত—। অঝোরে রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। আমরাই আঁতকে উঠলাম ভয়ে মোষের মালিকের যা অবস্থা! দেখে নিঃসংশয় হলাম বাঘে আক্রমণ ক'রেছিল। তাহ'লে নিশ্চয়ই অন্যটিকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু একটু পরেই আমরা দেখে হতবাক্‌ একই পথে অন্য মোষটি মাথার শিং-এ একটা বাঘকে গেঁথে নিয়ে আস্তে আস্তে আসছে। বাঘটি ওর মাথার ওপর প্রায়

চিৎ হয়ে আটকে আছে। নিমেষে আমরা সবাই বিক্ষত মোষটিকে ভুলে গেলাম। সেই বিস্মকর দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ ক'রল। মোষটি ধীরে ধীরে এসে যখন দাঁড়াল তখনও বাঘটি বেঁচে আছে কিন্তু তার কাল উপস্থিত। দুটি শিংই পিঠ দিয়ে ঢুকে এমনভাবে আমূল বিঁধেছে যে কিছুতেই সে ওটিকে ছাড়াতে পারছে না। অবস্থা দেখে সবাই বুঝলাম যে বাঘটি আসলে আহত মোষটির ওপর লাফ দিয়ে কামড়ে ধরেছে দেখেই অপর মোষটি দৌড়ে গিয়ে তাকে এমন ভাবেই গুঁতোর যে তার শিং এ বাঘটি গেঁথে গেছে। সেই অবস্থাতেই ফিরে এসেছে দুটিতে ঘরে। বাঘটি অবশ্য আকারে ছোট তবু সে তো বাঘই! বাঘের এই রকম অপঘাতে মৃত্যু—আমার জীবনে আর কখনো দেখব এমন বিশ্বাস হয় না। আজ বিনিদ্র নিশীথে সেই স্মৃতির সঙ্গে মনে এল, আচ্ছা বাঘটিও কি শিং-এর গুঁতো খাবার মুহূর্তে আর্তনাদ ক'রে উঠেছিল ?

নিশ্চয়ই উঠেছিল। ওঠেই। আহত প্রাণী সে যে প্রাণীই হোক না আর্তনাদ করে। এমনি অন্তিম আর্তনাদ এই পৃথিবীর বাতাসে প্রতিমুহূর্তে কত না স্পন্দিত হচ্ছে আবার দূরে নিখিলের শব্দ তরঙ্গের পথে নিস্তব্ধতায় যাচ্ছে মিলিয়ে; বিলীন হয়ে যাচ্ছে পরের কোন একটা মুহূর্তেই। প্রাণ যেমন ফুটে আবার একটি অমোঘ মুহূর্তে নীরবে পেঁছে যায় তার অন্তিম স্তব্ধতায়, শব্দও তেমনই। নীরবতায় আত্মসমপর্ণ কবে, সেই তার শেষ, তার অন্তিম। বিশ্ব নিখিলের সব কিছুই কেমন এক সুরে বাঁধা। এই ঐকতানের মধ্যে কোথাও কোন বিচ্যুতি নেই। কোন স্খলন নেই। আর সেই নিয়মতন্ত্রের অধীন নিদ্রাও এক সময় আমাকে আচ্ছন্ন ক'রল বিপুল চিন্তারাশির মধ্যে থেকেই।

যেখানে আমরা গাছ কাটা সুরু ক'রেছিলাম দিনের মধ্যেই সেই জায়গা থেকে আমাদের তাঁবু পর্যন্ত একটা দিক সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল। বিশাল এলাকা জুড়ে বলতে গেলে ধুধু মাঠ। মাঠ অবশ্য নয় কারণ শীতের তীব্র প্রকোপ সহ্য যারা ক'রেছিল সেইসব গুল্মরাজি এবং ছোট ছোট কিছু গাছের ঝোপ সারা শূন্য ভূমি জুড়ে। সঙ্গে আছে শিশিরের বিষে জর্জরিত ঘাস। কিন্তু শূন্যস্থল শূন্য। যে মহীরুহেরা ভূমিতল থেকে কিছুটা শূন্য জুড়ে থাকত আপন মহিমায়, যারা আশ্রয় দিত সংখ্যাহীন পাখি, কীট, পতঙ্গকে, তারা নেই। দু একটা ছোট বা মাঝারী আকারের গাছ কেবল রয়ে গেছে কাঠুরিয়াদের অবহেলায়। তাদের মেয়াদ ওই ধারালো যে কোন একটা কুঠারের একটি মাত্র আঘাত। তারও চেয়ে স্বল্প প্রাণও দু একটা আছে। তা বাদে মাটির ওপর হাঁটু অবধি উচ্চতা মাত্র সবুজ। আমাদের আবাসের কাছাকাছি তাও নয়। একেবারে পরিষ্কার।

একদিন ভোরে হালকা হয়ে আসা ঘুমের মধ্যে বন মোরগের ডাক কানে এসে লাগছে, চেতনার দ্বারে আঘাত ক'রছে সেই শব্দ এমন সময় অপেক্ষাকৃত নিকটতর

শব্দে নিদ্রা ছিন্ন হ'ল। দরজায় কার সাবধানী স্বর—বাবু!

উঠে পড়তেই কয়েকটি পাখির ডাক কানে এসে ঢুকল। দরজার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি ঊষা। আঃ কি অপূর্ব ক্ষণ। ডাকছিল মাইসিং। সন্তর্পণে বলল, বন্দুকটা নিয়ে আসুন।

এরকম ক্ষেত্রে প্রশ্ন ক'রতে নেই। নিঃশব্দে রাইফেল তুলে নিলাম শয্যাপাশ থেকে। তাঁবুর বাইরে এসে মাইসিং এর পেছন পেছন উঠে পড়লাম তাদের উঁচু খুঁটির চাঙ্গে। ও আমাকে ইশারা ক'রল—একটা শিশু হরিণ ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দিকভ্রান্তের মত চারি দিকে তাকাচ্ছে। আমার মনে হ'ল রাত্রে ওখানেই ঘাসের ওপরটায় ঘুমিয়ে পড়েছিল জেগে দ্যাখে আলো। চারদিক ফাঁকা। কোথায় যাবে ভেবে পাচ্ছে না। ভেবেই পাচ্ছে না কোথায় থাকে ওর মা, ভাই বা স্বজনেরা। শিশু হলেও জন্মসূত্রে আছে ওর বিপদবোধ—হয়ত ভাবছে কোনদিকে চলে গেলে বিপদে পড়তে হবে কে জানে ? এদিকে মুখ ঘোরানোতেই নজরে এল ওর সরল করুণ চোখদুটির দিকে। এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা গেল তার মায়াময় দৃষ্টি। একেবারে দুগ্ধ পোষ্য না হলেও হয়ত অল্পদিনই মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দুধ খাওয়া ভুলেছে বেচারী। সবুজ ঘাস আর ছোট্ট গাছালির মধ্যে তার পা বুক পেট সব ডুবে আছে। শরীরের ওপর অংশ; পিঠ, গলা, মাথা সব জেগে। ওর ওই অসহায় চাউনি আর বিপদ বোধের কাতরতা আমাকে এমনই মগ্ন ক'রল যে আমি একদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। মাইসিং আমাকে ফিস ফিস করে তাড়া দিল, মারুন।

আমি বললাম, কি হবে ওইটুকু বাচ্চাকে মেরে ?

মাংসটা খুব ভাল হবে বাবু—মাইসিং জানাল, চমৎকার মাংস। ধাড়ীর চেয়ে খেতে ভাল।—আমি তার মুখ দেখছিলাম না কিন্তু কণ্ঠস্বরে যে লালসা লোভ ফুটে বেরোচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারলাম। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত চমকে উঠল একটা ভাবনা। এখানেই তফাৎ। অন্য কোন প্রাণীরই এমন বিশ্বগ্রাসী লোভ নেই। পৃথিবীতে এমন আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই যার লালসার নেই সীমারেখা। এই অপরিসীম লোভের জন্যেই মানুষ অন্য সব পোকা মাকড় বা বড় আকারের প্রাণীর থেকে পৃথক। মানুষের সীমাবদ্ধতা নেই। হয়ত এটা বিশেষত্ব। প্রাণীজগতের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে এ এক অস্বাভাবিক সৃষ্টি। মাইসিং সাধারণ মানুষ। অতি সাধারণ প্রাণীর মতই আবেগ তাড়িত লালসা তার। আমি মনশ্চক্ষে তার লালাসিক্ত জিহবার আস্ফালণ দেখতে পেলাম। অন্য দিকে প্রাণভয়ে ভীত একটি শিশু। পৃথিবীর আলো যার চোখে সদ্যই এনেছে বিস্ময়। এই অপার বিস্ময়ে বিশ্বলোককে প্রত্যক্ষ করার অধিকার হণন করবার আমি কে ? এই বিশ্ব যাকে সৃষ্টি ক'রেছে তাকে ধ্বংস করা তো আমার সমীচীন নয়। এদিকে মাইসিং আর অপেক্ষা করতে না পেরে পেছন থেকে আমাকে একটা খোঁচা দিয়ে বসল হাতের

আঙ্গুল দিয়ে। আমি ভাবলোক থেকে বাস্তবে নেমে এলাম। এই মাইসিং, মেলেং, লালুং—এদের নিয়ে আমাদের কাজ ক'রতে হয়। এদের সঙ্গে রাত্রি দিন এই গভীর অরণ্যে অবস্থান। অগ্রাহ্য করা চলে না। তা ছাড়া অরণ্যবাসী এই পার্বত্য মানুষগুলো অতিরিক্ত অভিমানী। সামান্য বিচ্যুতিতে অসামান্য ক্ষুব্ধ হওয়া এদের আন্তরিক অভ্যাস। তাই নিমেষ মাত্র দেরী না ক'রে রাইফেল উঠিয়েই দেগে দিলাম। রাশিরাশি পাতা উড়িয়ে ছোট ছোট গাছপালা লতাগুল্ম গুঁড়িয়ে একটা শব্দময় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ল প্রত্যুষের প্রশান্তি জুড়ে। মাটি জুড়ে উড়তে লাগল ধূলি কণার রাশি।

মাইসিং হতাশা ব্যঞ্জক একটা শব্দ ক'রল মুখে। গুলিটা অনেক উঁচু দিয়ে গিয়ে হরিণ শিশুকে পেরিয়ে বনভূমিতে বিঁধেছে। নিদারুণ শব্দে ভয় চকিত হরিণ শিশুর সে কি ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়! তখন তার আর দিক বিদিক দেখা নেই। এতক্ষণের চিন্তাভাবনার জটিলতা ছিঁড়ে সে দৌড়াল যেদিকে তার ভাগ্য তাকে নিয়ে যায়। মাইসিং-এর কাছে কৈফিয়ত দিলাম, যাঃ গুলিটা ফস্কে গেল!

আমাকে বিশ্বাস করা না করার দায় মাইসিং-এর। গুলির শব্দে পাতার চাঙ্গ ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে এল সবাই মেলেং, লালুং, আঘচোই, ওয়াবুর, বাংঠাই —সবাই। এবার তাদের কাছেই আপন ভাষায় কি যেন বলল মাইসিং। লালুং আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রল, হরিণটা বড় ছিল, বাবু?

না, বাচ্চা—বললাম।

বাংঠাই বলল, মারতে পারলে খুব ভাল হ'ত। অনেকদিন হরিণের মাংস খাওয়া হয়নি। আগে আমি নিজে তীর দিয়ে কত হরিণ মেরেছি। আজকাল বনে হরিণ খুব কমে গেছে কিনা—

আমি সবাইকে দুঃখ প্রকাশ ক'রতে দেখে বললাম, ঠিক আছে। আজ এখনই একটা লরী বোঝাই ক'রে ছেড়ে দাও। আমি বাবুকে লিখে দিচ্ছি ফেরৎ গাড়ীতে দুটো খাসির মাংস পাঠিয়ে দেবে। রাত্রে যত খুশী খেয়ো।

আমার প্রস্তাব শুনে সকলে এমন ঔৎফুল্ল প্রকাশ ক'রে উঠল যে মাইসিং-এর দুঃখবোধ তাতে চাপা পড়ে গেল। অনুমান ক'রলাম লক্ষ্য বস্তুর ওপর নিশানা করবার অক্ষমতার ব্যাপারটা অনেকেই মেনে নিল একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মাইসিং ছাড়া। আমি একটা বিষয়ে চিন্তামুক্ত ছিলাম যে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাড়ীটা কাঠ ফেলে ফিরে এলে মাইসিং-এর এই হতাশা কেটে যাবে। অপর্যাপ্ত মাংস যখন পাবে এবং নিশ্চয়ই যখন সুরু হয়ে যাবে ওদের পান ভোজনের উৎসব তখন কি আর সকাল বেলাকার সামান্য একটুখানি হরিণছানা না পাবার হতাশা ওর মনে থাকবে আর অবশিষ্ট?

মাইসিংকে গুরুত্ব দেবার কারণ মাইসিং বলে নয়, আমাদের একজন কর্মী

বলে। এই গভীর বনে কাজ করবার সময় সকলে যখন স্বজন বিচ্ছিন্ন, স্থান বিপদসংকুল, তখন কারও মনে আঘাত লাগার মত কিছু ক'রতে নেই। কেননা আমি যখন এখান আছি সকলের দায়িত্ব আমারই। তাই সকলের মন ভাল রাখার দায়ও আমার।

বিকাল বেলায় ফিরতি গাড়ীতে প্রচুর মাংস নিয়ে হেমন্ত এসে হাজির হ'ল। সঙ্গে আরও তিনজন বন্ধু যারা বয়সে হেমন্তর চেয়ে বেশ কিছুটা বড় বলে বেশ বোঝা যাচ্ছে। সকলের সঙ্গেই একটা ক'রে বন্দুক। হেমন্ত খালি হাতে কারণ তার বাবার রাইফেল তো এখানে। সে জানাল তারা শিকার ক'রতে এসেছে। তার বন্ধুরা খুব শিকার ভালবাসে। আমি বললাম, আমরা এখানে অনেক দিন আছি আর জঙ্গল কেটে ফেলছি বলে জন্তু জানোয়াররা এদিক থেকে সরে গেছে। ওদিকের জঙ্গলে পালিয়েছে সব।

তাহ'লে ওদিকেই যাব—একজন জানাল।

কি শিকার ক'রবে ?

যা পাই—

আমি কথা শুনে বুঝলাম আসলে এরা হত্যাকারীর মানসিকতায় আক্রান্ত। যা পাবে তাকেই হত্যা ক'রবে আপন চিত্তবিনোদনের জন্যে। হত্যায় চিত্ত বিনোদন চরম মানসিকতার লক্ষণ। শহরজীবন ছেড়ে এসে বনবাসী হবার পর থেকে বুঝেছি লোকালয়ে আর অরণ্যে কোন তফাৎ নেই। লোকালয়ও যেমন এক শ্রেণীর প্রাণীর আশ্রয় অরণ্য আশ্রয়স্থল বহু শ্রেণীর প্রাণীর। আমরা যে মানসিকতায় বিশ্বের খ্যাতনামা যুদ্ধবাজদের ঘৃণা ক'রতে চাই সেই মানসিকতাতেই ঘৃণা করা উচিত এই বনভূমিতে যারা হত্যার চক্রান্ত করে তাদেরও। বরং এই হত্যাকারীরা অধিকতর অপরাধী। কারণ যুদ্ধ তো নিজেরা করি নিজেদের মধ্যে। কিন্তু এক প্রাণীর আর এক দুর্বল শ্রেণীর প্রাণীকে অসহায়তার সুযোগে হত্যা করা যুদ্ধের চেয়ে জঘন্য। এত যুদ্ধে মানুষের সংখ্যা কিছুমাত্র কমেনি, বরং আদিম অরণ্যাচ্ছাদিত পৃথিবীতে যেখানে অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের সংখ্যা হয়ত ছিল অনেক কম আজ সে জায়গায় হয়েছে বিপরীত। সব প্রাণী কমেছে বেড়েছে মানুষ। অসংখ্য বেড়েছে। অন্য প্রাণীরা প্রতিদিন কমছে, নিয়মিত কমছে, বহু প্রাণী তো নিশ্চিহ্ন। কাজেই হেমন্তদের উৎসাহ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ওদের নিবৃত্ত ক'রতে পারলে ভাল হ'ত। উপায় নেই। হেমন্তকে বললাম, এত কাজ থাকতে হঠাৎ শিকার করবার কথা তোমাদের মনে এল কেন ?

এমনি। আর কি করবার ছিল বল তো খুড়া দেও ? যদি কোন কাজ বাদ পড়ে গিয়ে থাকে তো বল এখনই আমি চলে যাই, ক'রে আসি। —সরল হেমন্ত আমার কথার অর্থ ধরতে না পেরে বলল। আমি জানালাম, তা বলছি না।

বলছি আনন্দ করবার জন্যে শিকার করা ছাড়া আর কি কোন কিছু ছিল না?" —কথাটা বলে ফেলে আমার নিজেরই মনে হ'ল, সত্যিই তো! কি বা আছে? বন কেটে যে বসত সদ্য হয়েছে জনপদ, যে জনপদের গা থেকে এখনও বনের গন্ধ মিলিয়ে যায় নি, সেখানে আনন্দের এক এবং সহজ প্রাগৈতিহাসিক উপকরণ আছে প্রাণী হত্যা। কখনো বল্লম ছুঁড়ে, কখনো তীর ছুঁড়ে, আর এখন তো অব্যর্থ অমোঘ মারণাস্ত্র আছে সীসে আর বারুদের আগ্নেয় সরঞ্জাম। আশ্চর্য এই যে, প্রাণ সৃজনের জন্যে প্রকৃতির অব্যাহত প্রয়াস অহর্নিশ, সেই প্রাণ হরণের জন্যে মানুষের অন্তহীন প্রচেষ্টা যুগ যুগের নিরলস অধ্যাবসায়ে উন্নততর, ত্রুটিহীন! প্রাণ হণনের কাজকে দ্রুততর করবার কী অধ্যাবসায় মানুষের!

আমার কাছে উৎসাহক না পেয়ে প্রদীপের তত্ত্বাবধানে বন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ বনকাটা শ্রমিক বসুমাতারির সঙ্গে শিকারের আয়োজনের ব্যাপারে উদ্যোগ চলতে লাগল হেমন্তদের। স্থির হ'ল মাচা যখন তৈরী হয়নি তখন রাতটায় আর শিকার ক'রতে যাওয়া অনভিজ্ঞ তরুণদের পক্ষে ঠিক হবে না। রাতটা ক্যাম্পে কাটিয়ে ভোরের দিকে নিরীহ প্রাণীর সন্ধানে বেরোলেই হবে। যদি তেমন সুবিধে না হয় তাহ'লে পরের দিন কোথাও মাচা বেঁধে রাত্রে শিকারের জন্যে অপেক্ষা ক'রবে তারা, যা পায় মারবে। অর্থাৎ নির্বিচারে হত্যার এমন একটি পরিকল্পনা চলতে লাগল যা একটি বিশ্বযুদ্ধের কুখ্যাত হত্যানায়কদের চক্রান্তের তুল্য হতে পারে অনায়াসেই। আমি চোখ কান বুঁজে রইলাম।

পরের দিন সকালেই কাঠ বোঝাই ট্রাক যখন রওনা হল আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে তাতে চেপে বসলাম। তখন সবাই কাজে। যে যার নির্ধারিত কাজে আপন ক্ষেত্রে ব্যস্ত। আমার খোঁজ ক'রবে এমন সুযোগ কারও ছিল না। গাড়ীর চালক যোগেন পর্যন্ত কোন প্রশ্ন ক'রল না। বহুদূর এসে গৌহাটি যাবার প্রধান সড়কের চৌপথিতে যখন এলাম তাকে বললাম, যোগেন এখানে একটু থাম।

তখনও ভাবান্তর হয় নি। সে হয়ত ভেবেছিল বিশেষ কোন কাজে তাকে থামতে বলছি। কিন্তু যখন আমি আমার পুঁটলিটা নিয়ে নামছি সে বলে উঠল, এখানে নামছেন যে?

সেই মুহূর্তে আমি নিজেও জানতাম না কেন নামছি। হঠাৎ মুখে এসে গেল তাই বলে ফেললাম, গৌহাটি যাব।

আমার কথায় কিংবা কথা বলার ঢঙে কিসে যে যোগেন অত বিস্মিত হয়েছিল আমি বুঝলাম না। সে জানতে চাইল, হঠাৎ গুয়াহাটি কেন যাচ্ছি। পোটলা নিয়েই বা কেন?

এই কেন-র জবাব আমার নিজেরই জানা নেই। কোনদিনই ছিল না বলে চট করে জোগাল না ঠোঁটের আগায়। কেন যে যাচ্ছি জানিনা। যাচ্ছি এটা সত্যি

এবং বাস্তব। যাবার কারণ প্রকৃতই কিছু নেই। কিন্তু কারণ তো একটা খ‍ুঁজে নিতে হয় বা খাড়া ক'রতেই হয় নইলে নিজের মনের কাছেই কাজটা জোলো জোলো ঠেকে। সেই কারণে ঠিক করেই ছিলাম হেমন্তদের জন্যে চলে যাচ্ছি। ওদের ওই শিকারের উৎপাত আমার ভাল লাগে নি। রাশি রাশি বনবাসী অকারণে মেরে এনে জড় ক'রবে ছোকরাগুলো আমার সেটা বরদাস্ত হবে না। কিছু একটা বলে ফেলব সেটা ওদের মনে লেগে যাবে। বলা যায় না ওাদর আত্মম্ভরিতায় আঘাতও ক'রতে পারে। তাই—

কারণটা দেখতে গেলে কিছুই না। এতদিনের সম্পর্ক ঘুচিয়ে চলে যাবার মত তো নযই। আমার কাছে ওটা একটা কারণ হলেও অন্য লোকে ব্যাপারটার তাৎপর্য আদৌ বুঝবে না। ভাববে এটা আবার একটা কারণ হ'ল? অসামান্য ক্ষমতার দম্ভে যে প্রাণী অসীম আত্মম্ভরী হয়ে উঠেছে তার কাছে কিছু ইতর প্রাণীর প্রাণের মূল্য ক'টা সীসের খোপে বারুদের চেয়ে হতে পারে অনেকই কম। কিন্তু আমি তাদের প্রাণকে আমার তুল্যমূল্যই মনে করি। জীবন—যে রকম আমার সেই রকম একটা কাঠবিড়ালীরও। আমরা কেউই বেঁচে থাকার প্রয়োজন যে কি তা জানি না। কিন্তু এই পৃথিবীর আলো বাতাসের জন্যে আকুতি একটা গুবরে পোকার আর আমার একই রকম। তাই—

লরীচালক যোগেন হাজারিকাকে আমার কথাগুলো বোঝানোর সময়ও ছিল না এবং তাকে এসব বোঝানো সম্ভবও ছিল না। তাই অল্প কথায় বললাম, গৌহাটিতে আমার একটা কাজ আছে।

যোগেন কি কোন সন্দেহ ক'রছে? সে আবার প্রশ্ন ক'রল, কখন ফিরবেন?

আমি যে আর ফিরব না এই কথাটা তাকে বলতে সাহস ক'রলাম না। তাহলেই সে পীড়াপীড়ি ক'রবে নানারকম কথা বলবে, হয়ত গাড়ী থেকে লোক নিয়ে নেমে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রবে—সব মিলিয়ে আমাকে বিব্রত হতে হবে মাত্র। আমি চাই না। আমি জানি যাওয়াটা নীরবেই ভাল হয়। তার চেয়ে ভাল যাওয়া আর নেই। তাই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে বললাম, সেটা এখন বলতে পারছি না।

মালিক জানতে চাইলে?—আবার প্রশ্ন।

বলো যা শুনলে—।

এবার সে আমার জন্যে দুর্ভাবনা ক'রল, কিসে যাবেন এখন?

কিছু একটা পাবই।

আমাকে শেষ বিদায়ের হাত নেড়ে গাড়ী নিয়ে যোগেন চলে গেল। আমি বসবার জন্যে একটা জায়গা খ‍ুঁজতে লাগলাম। একটু বাদেই রোদ এত চড়া হবে যে গায়ে লাগলে মনে হবে পুড়ে যাচ্ছে। কাজেই বড় রাস্তা থেকে নেমে পাশের

অল্প খাদে কোন গাছের তলায় এখন বসব যে কোন রকম বাহনের অপেক্ষায়। এপথ দিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ী যাতায়াত করে গাড়ী চলবার গুরুত্বপূর্ণ পথ এইটাই। কাজেই পাবই। হয়ত দেরী হবে। দুপাশে বন মাঝখান দিয়ে এই পথ। আর আমি যেখান দিয়ে এলাম সেটা তো বন থেকে বেরোবার পথ মাত্র তা বাদে তার আর কোন গুরুত্ব নেই। বনের মধ্যেকার পথ ক্রমাগত গাড়ী যাতায়াত করার জন্যে প্রসারিত। আসলে বড় গোঁহাইদের ওদিকে যাবার জন্যে এটা ঘোরা রাস্তা। হেঁটে বা গোযানে যাতায়াত অন্যদিক দিয়ে করা হয়। লুটগাঁও থেকে যদি পেট্রল ট্রাক নিয়ে যেতে হয় তাহ'লে পথ এইটাই।

আমার পুঁটলিটা ওখানেই ফেলে রেখে এক পাশে সরে গিরে বসলাম। কদাচিৎ দু একটা পাখি ছাড়া প্রাণী মাত্র নেই। অবশ্য অন্য কোন প্রাণীর প্রয়োজনও নেই আমার। একমাত্র হাতি ছাড়া আর কোন প্রাণী এই চড়া রোদের আলোকিত বেলায় বেরিয়েও আসবে না গাছের আড়াল থেকে সেদিকে আমি নিশ্চিন্ত; ভয় শুধু পাগলা হাতিকে। তা এতদিন এই অঞ্চলের বনে কাটালাম সেরকম তো দেখিনি। পাগলা হাতি—অর্থাৎ যূথতাড়িত নিঃসঙ্গ সমাজচ্যুত হাতি নেহাৎই দৈব। সে রকম অবস্থায় বেশীদিন ওরা বাঁচেও না। অনেক সময়েই মরে অপঘাতে। কাজেই ভাবনা আমার ভয়কেন্দ্রিক নয়, ভাবনা যাবার। এখন যাবার একটা উপায় পেলে হ'ত। দেরীর জন্যে ভাবনা। অবশ্য ওখানেই যে আমার জন্যে কোন রাজকার্য অপেক্ষা ক'রছে এমন নয় তবু যেতে যখন হবে তখন আগে যাওয়াই ভাল।

যাব কোথায়? গোহাটিতে? কোথাও একটা উঠতে তো হবে? এই দীর্ঘ সময় এখানে থেকে যাবার জন্যেই কি ভয় হচ্ছে? শিকড় পুঁতে গেছে মাটিতে? তবে কেন ভবিষ্যৎ ভাবিত ক'রছে, যা কোনদিন করে নি। শিকড় মাটিতে বেশী দূর চলে গেলে ওপড়ানোর সময় কষ্ট হয়। চড়চড় করে উপড়ে আসতে চায় ভিত্তি ভূমি। আমার তো কই তা হ'ল না? ভিত্তিভূমিতে টান পড়ল না কোন। পড়ত। ঘন বর্ষার দিনে আকস্মিক ঝড়ে যখন ওপড়ায় গাছ শিকড়ে টান ধরলেও ভিত্তিভূমি সঙ্গে আসে না। আসল ব্যাপারটা হল পরিস্থিতি। যদি বলে কয়ে আসতে চাইতাম, যদি দেবেশ বড় গোঁহাই নিরুপমা দেবী সকলকে জানিয়ে বিদায় নিয়ে আসতে চাইতাম, তাহ'ল না সেই টানটা দেখা যেত। ছাড়ানো সম্ভব হ'ত কিনা কে জানে। আর সব যেমন তেমন নিদেনপক্ষে পার্বতী—সেই শিশু মেয়েটি যে এখন, এই ক'বছরে বালিকা হয়েছে সে কি আটকাতে চেষ্টা ক'রত না তার আশৈশব আপন খুড়াদেওকে?

অবশ্য এগুলো কিছু নয়। আমার কাছে এ সব মূল্যহীন। বেঁচে থাকার পরিবেশ প্রাণীমাত্র খুঁজে নেয়, কিছুটা নিজের মত ক'রেই নেয়। চলার পথে কোন সম্পর্কই নিত্যসত্য নয়। প্রাণী মাত্রেই সঙ্গী সংগ্রহ ক'রে নেয় আপন বাসের

প্রয়োজনে, বেঁচে থাকার সুবিধের জন্যে। এ সঙ্গী জীবনপথের সর্বত্র ছড়ানো ছিটানো আছে। স্বচ্ছন্দেই জুটে যায়। একদিন যে মেয়ে থাকে বাপ মায়ের চোখের মণি, বিয়ে হলে সেই হয় স্বামীর ঘরণী। সে পূর্ব স্নেহবন্ধন তো ভোলে। তখন কি তার মনে হয় বাবা-মা তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের স্থান? আসলে একজন নিজের প্রয়োজন মত, সুবিধে মত, অভ্যাস মত সহযোগী পেয়ে গেলেই তৃপ্ত হয়। স্থান পেয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হয়। জীবন তো তাই। আর জীবনের জন্যেই তো আয়োজন।

বন্ধন। আসক্তি। এগুলো মূল্যহীন। অলকনন্দাকে মনে পড়ল। এই বিজন বন পথে একা নিঃসঙ্গ যাত্রার অবসরে, প্রতীক্ষার ক্ষণে অলকনন্দা এল। তার চেয়ে বড় আসক্তি একসময়—কয়েকটা উপর্যুপরি বছর ধরে আমার তো আর কিছুতে ছিল না। আর একটা বছরের অবশিষ্ট ছাত্রজীবন কেটে গেলে সেই আসক্তি, মায়াতে পরিণত হ'তে পারত। এক রাশ ঘৃণা এসে নিজের জীবনকে সেই মোহ থেকে মুক্ত ক'রে দিল। সত্যি জীবনটা তো কিছু নয়। কিছু কি? ভোজন, নিদ্রা, রমণ—এর বাইরে কিছু কি অস্তিত্ব আছে জীবনের? অলকনন্দার সঙ্গে যে বন্ধন সে তো রমণের চুক্তিমাত্র। বিশেষ উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ আসক্তি। জীবনকে অত ছোট ক'রে দেখা, অলকনন্দাকে অত গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখা—আমার ছিল একান্ত আপত্তির। এতদিনে আরও কোথাও, অন্য কোথাও সেই একান্ত সীমাবদ্ধ আসক্তির ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নিশ্চয়ই অলকানন্দা নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দী ক'রেছে জীবন যাপনের অভ্যাসসিদ্ধ কামনায়। এই বিশাল পৃথিবীর কোন বিন্দুতে তার বর্তমান অবস্থান তা আমার জ্ঞানের সীমার বাইরে। কিন্তু কোথাও সে কোনও এক শান্ত গ্রহকোণে কবোষ্ণ আরামে অধিষ্ঠিতা। থাক। তার তৃপ্তি, তার আরাম, তারই মধ্যে হোক তার নিজস্ব বিস্তার।

সামনে কিছুটা দূরে পথের ওপরে একটা ঘুঘু পাখি এসে বসতেই আর একটা উড়ে গেল এল তার পেছনে। প্রাকৃতিক ধর্মে ওরা অবিচ্ছিন্ন অনুসারী। তবে অলকনন্দাকে ছেড়ে এলাম কেন। সেই প্রকৃতি ধর্মেই তো রমণ। যে ধর্মে ক্ষুধা সেই ধর্মেই ঘুম আর সেই ধর্মেই তো জীবন চলে। পাখি দুটো কি সুন্দর নিটোল। কি সুন্দর তাদের রঙ। একে কি বর্ণনা করা যায়? আমি তাদের সৌন্দর্য একমনে উপভোগ ক'রলে কি হবে তারা দুজনে একটু ঘোরাঘুরি ক'রে কিছু সুবিধে না হওয়াতেই উড়ে গেল। ওই দূরে ঘাসের মধ্যে থেকে অনেকক্ষণ ধরেই উঁকি দিচ্ছিল একটা ছোট্ট হলুদ ফুল। চোখ গিয়ে পড়ল তারই দিকে। শুধু হলুদই নয়, ওটার মাঝখানটায় আবার অন্য রঙও আছে। ওই টুকুর মধ্যে কি অনুপম কারুকাজ! বিস্ময় জমাট হবার আগের মুহূর্তে দূর থেকে যন্ত্রের ক্ষীণ শব্দ শ্রবণে এসে করাঘাত ক'রল। সচকিত হলাম। তাহলে আসছে।

বিপরীত দিক থেকেই আসছে কোন গাড়ী, আমি যাতে যেতে পারব। নিমেষে আশা এল এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের মত। অবিমিশ্র শান্তির মত।

যে সমস্যায় কখনও পড়িনি তাতেই পড়লাম গৌহাটি পেঁছে। অপরিচিত মানুষের শহর বলেই শহরটাও স্বাভাবিক ভাবেই অপরিচিত। রাস্তায় তো আর পোঁটলাটা বগলে ক'রে ঘুরে বেড়ান যায় না! কোথায় যাই? কোথাও এমন একটা স্থান চাই যেখানে এটা নামিয়ে রাখা যায়। আছে, ভরোলিমুখে দেবেশবাবুর বোনের বাড়ী আছে। তাদের নামধাম জানি। একবার ওবাড়ীর ছেলেমেয়েদের দেখেওছি দেবেশবাবুর বাড়ী, কিন্তু সেখানে যাওয়া যায় না। জিনিসটা কোথাও রাখতে পারলে শহরটা ঘুরে দেখে নিতাম তারপর দেখা যেত কি হয়। মনে পড়ল জগদীশ প্রসাদ আগরওয়ালার নাম। প্রায়ই লোক পাঠাত, আমরা বহু কাঠ পাঠিয়েছি তাকে। সরাসরি পরিচয় না থাকলেও তার কয়েকজন লোক আমাকে চেনে। একজনের নামও তো মনে পড়ছে বালকৃষ্ণ। আর একজন ছিল উত্তর প্রদেশের জমাদার গোছের লোক—তার নামটা মনে পড়ছে না দেখলে তো সে-ও আমাকে চিনবে! অতএব—।

শুনেছিলাম লোকটি বড় ব্যাপারী। হয়ত লোককে জিজ্ঞেস ক'রলে জানতে পারব ঠিকানা। মাড়োয়ারী দোকানদার দেখে জিজ্ঞেস ক'রতে তিন জগদীশের সন্ধান পাওয়া গেল। অথচ তার মধ্যে একজনও আগরওয়ালা নয়। আমি কোনদিন জগদীশ সম্বন্ধে চিন্তাই করিনি। এখানে এসে যখন নিরুপায় তখন তারই কথা মনে পড়ল। আমি তো এক জগদীশকেই জানি। এখন আদপে যাকে চিনিই না সে এক হ'লেও হবে তিন হলেও হবে মনে ক'রে কাছাকাছি জগদীশকে দেখতে চাইলাম। তার নাম জগদীশ রুংতা। সে ব্যক্তি এক বিশাল ঘরে ঢালা বিছানার ওপর বসে আরও কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিল। আমি যেতেই খুব খাতির ক'রে আপন আলাপের ভাষা ছেড়ে মহামান্য অতিথির সমাদর ক'রে বলল, আইক। বইক।

আমি তো বসবার জন্যে আসিনি তবু ওর অভ্যর্থনা দেখে প্রীত হয়ে জানতে চাইলাম, উনিই সেই জগদীশ কিনা যাঁর ট্রাক মাঝে মাঝেই ফুলবাড়ী থেকে কাঠ নিয়ে আসে?

হতাশ হতে হ'ল। তবে একটা লাভ হ'ল, জানা গেল আগরওয়াল সমাজে এক জগদীশ আছে ফ্যান্সী বাজার নামক তীর্থ ক্ষেত্রে। তীর্থ ক্ষেত্র অবশ্য আমিই বলছি ফ্যান্সীবাজার নামক লক্ষ্মীর পীঠস্থান পরিদর্শনের পর থেকে। আমাকে গ্রামের মানুষ বুঝে রুংতা জগদীশ পরামর্শ দিল মাড়োয়ারী ছাড়া অন্য কাউকে

জিজ্ঞেস ক'রলে আমি যেন জগদীশ লুণ্ডিয়া বলি তাহ'লেই সকলে বুঝবে। সকলে তো বুঝবে কিন্তু আমিই যে বেবুঝ হয়ে গেলাম! এক মানুষই একাধিক পদবীধারী হয় কি ক'রে? আমরা যাকে চিরদিন আগরওয়ালা হিসেবে জানি বা সেইভাবেই লেখাপড়া চলছে সেই লোক স্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গেই পদবী বদলে অন্য লোক হয়ে গেল কি ক'রে? একেই হয়ত বলে 'একের মধ্যে বহুর প্রকাশ'! হোক। সেই জগদীশই হতে পারে এখন আমার রক্ষাকর্তা। আমার না হ'লেও আমার পেঁাটলার রক্ষা তো হ'তে পারে সেখানে! প্রয়োজন আপাতত ওই টুকুই।

সীমাবদ্ধ প্রয়োজন জানাবার আগেই অসীম অভ্যর্থনা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি দেখলাম আমার পরিচিত লোকেদের কেউ না থাকলেও শুধুমাত্র দেবেশবাবুর নাম শুনেই যে আপ্যায়ণ তার ঠেলা সামলাতেই আমার বেসামাল অবস্থা। আমাকে দেবেশবাবুর লোক বলে যে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে দেবেশবাবু নিজে এলে কি করা হবে সেটাই আমার কাছে গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ভয় হতে লাগল আমার পরিচিত লোকেদের কেউ এসে গেলে খাতিরের বেলুন না ফুটো হয়ে যায়। তার আগে সরে পড়াই ভাল। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। জগদীশ লুণ্ডিয়ার 'পণ্ডিতজী' হাঁকে অচিরে যে ব্যক্তি আবির্ভূত হ'ল সে ওই উত্তরপ্রদেশীয় লোকটি যে আমার এবং আমি যার চেনা। সে তো এসেই একেবারে বিগলিত হয়ে পড়ল। অনর্গল হিন্দিতে সে আমার আসবার জন্যে যেন ভাগ্যে শিশুর চাঁদ পাবার ঔৎফুল্ল দেখাতে লাগল। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম গৌহাটির তাবৎ মাড়োয়ারী মহাজনেরা অসমীয়া ভাষায় বাক্যালাপ ক'রলেও এই ব্যক্তি কিন্তু সে পথ দিয়েও চলাফেরা করে না। এ আপন মতলব মত আপনার ভাষা বলে যায় বুঝে নেবার দায় শ্রোতার। এবং সে কোন অস্বাচ্ছন্দও বোধ করে না।

একজন পরিচারককে ডেকে আমাকে হাত মুখ ধুতে পাঠিয়ে কি কথাবার্তা ওরা বলে নিল জানি না আমি ফিরে আসবার পর অভ্যর্থনার ধারা বদল হ'ল। পণ্ডিত কাছেই ছিল জগদীশ লুণ্ডিয়ার ব্যবহারে গভীরতা এল। আমাকে বেশ খাতির ক'রেই বলল, আপনার বড় ভাই কেমন আছেন?

বুঝলাম ওই পণ্ডিত তাহ'লে এই জ্ঞান লাভ ক'রে এসেছে দেবেশবাবুর বাড়ী থেকে! এখানে মালিককে এখন বোঝাল আমি দেবেশবাবুর ভাই। সংক্ষেপে জবাব দিলাম, ভাল।

কি খাওয়ার অভ্যেস আছে বলুন? ভাত তো খাবেনই এখন চা চলবে তো, না কি দুধ?

মহাসমস্যাতে পড়া গেল দেখছি! আমি ত্রাণ পাবার প্রচেষ্টায় বললাম, চা-ই খাওয়া যাক।

জগদীশ হিন্দিতে চাকরটাকে নির্দেশ দিল, যাও ঘর [illegible] ভাল ক'রে চা ক'রে

দিতে বল। জলদি। আর কিছু জলখাবার।

একরকম বিপদের ভয় পেয়েছিলাম হ'ল অন্যরকম। খাতিরের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো ছিল তাতেই অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছিল। গৌহাটিতে আমার কি কি কাজ, দরকার হলে জগদীশ এর লোকজন সব সময় তৈরী তাদের সাহায্য যেন কাজে লাগাই, কোন অসুবিধে হ'লে জগদীশকে যেন বলি, কোথায় কোথায় যাব ইত্যাদি। আমি এসবের কি জবাব দেব? সত্য বললে এক নিমেষেই ভেঙ্গে যাবে তাসের প্রাসাদ অথচ আমার পোঁটলাটার জন্যে একটু আশ্রয় প্রয়োজন। তার চেয়ে আমার যেটা বেশী প্রয়োজন তার নাম স্বাধীনতা। মুস্কিলও হল সেখানেই। গৌহাটির রাস্তায় দেবেশবাবুর কাজে আরও দু একবার ঘুরেছি মোটর গাড়ী খুবই কম। কে জানত যে জগদীশ লুণ্ডিয়া তখনই এমন শ্রেণীর ধনী যার নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে মোটর গাড়ীও আছে। আমার খাতির বেষ্টিত পরাধীনতা সম্পূর্ণ করবার জন্যে জানিয়েও দিল প্রয়োজন হ'লেই সেটা যেন আমি ব্যবহার করি।

কিছুক্ষণ বাদেই দুপুরের খাবার। সেটা সেই বিশাল এলাকা জোড়া বাড়ীর ভেতরে একটা ঘরে জগদীশজীর সঙ্গেই হচ্ছিল। সেই আসরেই জানতে পারলাম পাঞ্জাব, দিল্লি, কলকাতা থেকে বহু কাঠের চাহিদা তাঁর কাছে পেঁছে জমা হয়ে আছে। অতএব আমাদের যা কাঠ এ বছরে কাটা হবে তা যেন জগদীশ বাবুকেই আমরা দিই। সেটা এক লক্ষ ঘন ফুটের ওপরে হলেই ভাল হয়। দেখলাম লোকটি ওই দূরে বসেও খবর রাখে লটুগাঁও এর গভীর অরণ্য উচ্ছেদ করবার চুক্তি আমাদের, এবং আমরা এক চতুর্থাংশ কাজ শেষ করে ফেলেছি। আমি ভদ্রলোকের খবরের সূত্রের প্রশংসা না করে পারলাম না। সে আমার কাছে চাইল যে আমি যেন তার প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে কথা দিই। কিঞ্চিৎ ভেবে বললাম, আমি তো এবিষয়ে কিছু বলতে পারছি না তবে আপনার সব কথাই আমি আসল মালিককে জানাতে পারি।

কথাটা শুনে যেন খাওয়া বন্ধ করে আমাকে চেপে ধরে, এমনি ক'রে জগদীশ বলল, আরে মশাই ওসব বাদ দিন। যা করবার আপনি ছাড়া হবার নয়। আপনি কথা দিন দেবেশবাবুর জন্যে আমি ভাবি না।

আমি আসল কথাটা বলতে পারছি না অথচ লোকটি নাছোড়বান্দা। একান্ত গোপন ইচ্ছে ছিল আমার আশ্রয়দাতা দেবেশবাবুর উপকারের জন্যে আমি একটা চিঠি লিখে জগদীশ লুণ্ডিয়ার প্রয়োজনের কথা জানিয়ে দেব। কিন্তু জগদীশকে তো আর তা বলা যাচ্ছে না তাছাড়া অত অল্পে সে সন্তুষ্ট নয়, আমার কাছে কথা আদায় ক'রতে চায়। অবশেষে তার হাত থেকে সদ্য নিষ্কৃতি পাবার জন্যে বললাম, আমি দেখছি যাতে আপনার প্রয়োজন মেটে।

কথাটা মন্ত্রের মত কাজ ক'রল। হাঁক ছাড়ল, এ রামু, বড়া বাবুকো লিয়ে

পিস্তা বরফি ওর দাও। আমাকে অসমীয়াতে বলল, টাকা যদি পাঁচ দশ হাজার চান তো বলুন আগাম পাঠিয়ে দিচ্ছি।

না টাকার কোন প্রয়োজন নেই, আমি জানাতেই জগদীশ বলে উঠল, ও তো আমি জানি। টাকার আপনাদের কোনই অভাব নেই। দেবেশবাবু চাইলে সারা জঙ্গল ঠিকা নিতে পারে।

একথাতেও আমি সায় দিলাম না। আমি আসলে কোনক্রমে এ বাড়ীর বাইরে একবার পা রাখতে চাইছিলাম। এখানে এসে বড় ঝকমারি হয়েছে দেখছি, এখন বাইরে যাওয়া বিপদ। মনে মনে স্থির ক'রলাম একবার বেরোতে পারলে আর ফিরব না। আমার কিছু জিনিসপত্র দেবেশবাবুর বাড়ী পড়ে আছে। থাক। ওখানেই সংগ্রহ হয়েছিল আর ওখানেই যদি পড়ে থাকে তো থাক। বাকি যেটুকু এনেছি দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্যে এই যথেষ্ট। এও যদি এখানে ছেড়ে যেতে হয়! কারণ যা দেখছি পোঁটলা নিয়ে বেরোনো অসম্ভব।

খেয়ে উঠে বুদ্ধি ভাঁজতে বসলাম। দেখলাম জগদীশ লুণ্ডিয়া আমাকে ছেড়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হল। এখন এখানে দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস ফেলে গেলে মুস্কিল। অসম্মান দেবেশবাবুরও হতে পারে। তাই ঠিক ক'রলাম দরকার হ'লে একদিন থেকে সুযোগ বুঝে চলে যাব। আপাততঃ গোহাটি ঘুরে দেখা যাক।

প্রথমে ডাকঘরে গিয়ে দেবেশবাবুকে এক পত্রে জানালাম আমি তাঁর একশটি টাকা আসবার সময় নিয়ে এসেছি। আর জগদীশবাবুর প্রস্তাব জানিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দিলাম। এই প্রথম তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে আমি আর তাঁর কাছে ফিরছি না।

জীবনে এই প্রথম পেছন ফেরা। এর আগে ক্ষণেকের জন্যেও ফিরেছি বলে মনে পড়ে না। কখনই আমি মনে করি না পেছনে যারা থাকে তাদের কিছু জানাবার প্রয়োজন হয় কারণ তারা তো স্থিত। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা তারা ক'রেই নেবে। এই ক্রমাগত চলার মধ্যে কেউই কারও জন্যে থেমে থাকে না। সম্ভবও নয়। জীবন এক এমনই চিরন্তন গতির নাম যার মধ্যে যতির স্থান নেই। যতির অর্থ সমাপ্তি। এই গতি কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা পছন্দ অপছন্দের ধার ধারে না। কোন ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে নিমেষের জন্যেও স্তব্ধ হয় না যে গতি তারই তো নাম জীবন। কাজেই স্মৃতি অর্থহীন, শোক অর্থহীন, মায়াও অর্থহীন। এই যাত্রায় এগুলো কোনটাই পাথেয় নয়, উপকরণও নয়; উপদ্রব। অথচ এ এক চিরন্তন অনির্দেশ যাত্রা।

আমাকেও চলতে হবে। এই সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুকেই সেই একই চলার শরিক মনে হয়। এই যে জড় যা নড়ে না তাও কিন্তু চলছে আমাদের সবার অলক্ষ্যে সে-ও তার কালক্রম পূর্ণ করার অদৃশ্য যাত্রায় নিয়ত চলমান। অতএব

কোন ক্ষুদ্র বিন্দুতে কতটুকু ক্ষণের জন্যে কে রয়ে গেল তাতে কি ? কালচক্র পূর্ণ ক'রে তার যাত্রা শেষ হওয়া পর্যন্ত সে চলবেই, পদ্ধতি তার নিজস্ব। আমি চলব আমার মধ্যে আরোপিত বেগে। সেটা আবার আমারও নিজস্ব।

চারপাশে ঘরবাড়ী লোকজন তার মধ্যে থেকেও সারাদিন মনে হ'ল আমি এক অসীম শূন্যতার মধ্যে রয়েছি। কোথাও কিছু নেই বলে নিজের অস্তিত্ব নিয়েই সংকটের জটিলতায় জড়িয়ে যাচ্ছি যেন। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার আগে কিছুটা এবং পরে প্রায় সমস্ত শহরটাই ঘুরলাম। উদ্দেশ্যহীন এই ঘোরাঘুরি কতক্ষণ আর ভাল লাগে ? তারও চেয়ে মুস্কিল হ'ল একসময় মনে হয় আমার এই অকারণ ঘোরা বুঝি চারপাশের লোক বুঝতে পারছে এবং সন্দেহের চোখে দেখছে। পথের ধারের কেউ তাকালেই ব্যাপারটা আরও বেশী ক'রে মনে হ'তে থাকে। অচেনা এলাকায় পথ ভুলে কোথাও দ্বিতীয় বার এসে পড়লে লজ্জা ক'রতে থাকে। সারাদিন এই অস্বস্তিতে ভুগে রাত্রে ওখানেই তোফা আরামে গদিতে শুয়ে কাটালাম। ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল কার যেন কণ্ঠস্বরে, সে বেশ শব্দ ক'রে রাম নাম ইত্যাদি তার ধারণা মত জপ ক'রছে। চেয়ে দেখলাম অন্ধকার। সামান্য দ্বিধা কাটিয়ে উঠে পড়লাম। এটাই সকল মহৎ কাজের ব্রাহ্ম মুহূর্ত। অতএব এখনই পোঁটলা তুলে রওনা হবার ক্ষণ। কাজে লাগালাম।

কাল দিনেরবেলা রেল স্টেশনটা দেখে রেখেছিলাম অন্ধকারে জিনিস নিয়ে নির্বিঘ্নে যাওয়া যেতে পারে সেখানেই। তারপর ট্রেন ধরে চলতে চলতে পরের দিন হঠাৎ চোখে পড়ল মনিপুর রোড। মনিপুর নামটা মনের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রল জানিনা, নেমে পড়লাম। আমার জীবনে দেশ ভ্রমণের আগ্রহ কোনদিন লক্ষ্য করিনি। বিশেষ কোন স্থান লক্ষ ক'রে যাত্রাও করিনি কখনো। তবু মণিপুর নামটাই আমায় আকৃষ্ট ক'রল। আমাকে ছেড়ে ট্রেনটা এবং নেমে পড়া যাত্রীরা সবাই যখন চলে গেল আমি ওই ফাঁকা ছোট্ট স্টেশনে দাঁড়িয়ে দিকভ্রান্তের মত সমস্ত দিক দেখতে লাগলাম। কোন নির্দেশ যার নেই তার কাছে উর্ধ আর অধঃ ছাড়া সব দিকই তো সমান।

হঠাৎ এক অপরিচিত জিজ্ঞাসায় যেন প্রাণ পেলাম—কোথায় যাওয়া হবে ?

স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনেটায় এসে পড়েছি। দরজা খুলে বেরিয়ে যে প্রৌঢ় মানুষটি প্রশ্ন ক'রলেন তাঁকে দেখেই মনে হ'ল স্টেশন মাস্টার। অথচ অন্য কেউ হওয়া আদৌ অসম্ভব ছিল না। ওই মানুষটিকে যে স্টেশন মাস্টার হতেই হবে এমন তো কোন কথা ছিল না। আমি ভদ্রলোকের কাছে অকপটে স্বীকার ক'রলাম, জানিনা। —এর চেয়ে বিস্ময়কর কথা ভদ্রলোক বোধহয় জীবনে শোনেন নি। তাঁর চোখ মুখের ওপরে ছিটকে পড়া কালির মত সেই যে বিস্ময় হঠাৎ ছাড়িয়ে পড়ল আজও তা আমায় স্মৃতিতে স্পষ্ট। ভদ্রলোক আমার মুখের

দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন, অল্প বয়স হলে অনুমান ক'রতে পারতাম। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

এখন গৌহাটি থেকে।

সে তো হতেই হবে। গৌহাটি না হয়ে তো আসাই যায় না। বাড়ী কোথায়?

ভদ্রলোকের প্রশ্নে এমন আন্তরিকতা ছিল যা যে কোন হৃদয়কে স্পর্শ ক'রতে পারে। তাঁর অন্তরকে প্রকাশ করবার পক্ষেও যথেষ্ট। কি এক আশ্বাস যেন সঞ্চারিত ক'রে দিল তাঁর বাক্যালাপ। আমি প্রশ্রয় পেয়ে বললাম, কোথাও নেই।

একথাটা যেন কিছু একটা আভাস দিল তাঁকে। আমাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে ঘরে ঢোকালেন। বললেন, বসুন। তা এই গহন বনে কি করে এলেন মশাই, কোথা থেকেই বা এলেন?

গহন বন বলে ভদ্রলোক বোধহয় যথাযথ শব্দ ব্যবহার করলেন। শহর হিসেবে গৌহাটিকে যা দেখলাম তাতে মনে হ'ল যে প্রকৃতি আর মানুষে লড়াই হচ্ছে। বেশ ঠেলাঠেলি। সংখ্যায় যতগুলো গাছ তত না হ'লেও প্রায় ততই বাড়ী ঘর। ফলে সব বাড়ী ঘরই যেন গাছগাছালির ছায়ায় আশ্রিত। গোটা শহরই ছায়াময়। আর ট্রেনে চাপলে ট্রেন যেই চলতে থাকে ওই গাছাগাছালিরা যেন ক্রমাগত ভিড করে ট্রেন দেখতে দৌড়ে আসে চারপাশে। ঘন হয়ে একের পাশে এক এমন ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে যে তাদের অবিচ্ছিন্ন বলে ভ্রম হয়। ঘন সবুজ ভেদ করে কি ভাবে যে এই বিশাল লৌহযান চলছে এক এক সময় সেটাই বিস্ময় বোধ হ'তে থাকে। আমি দীর্ঘ দিন আসামের নিবিড় বনভূমির মধ্যে বাস করে অভ্যেস ক'রলেও এখানে বনভূমির প্রকৃতি যেন ভিন্ন। দুপাশেই লক্ষ্য করছি বিশাল ঝাঁকড়া গাছ সব। তাদের আয়তন দেখে অনুমান করা অসম্ভব যে কোন অতীতে কার জন্ম। এই সারাদিন রাত দ্রুতগামী রেল গাড়ীতে চড়েও বনের পথ ফুরালো না। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে, বনের বুক চিরেই যেন একটা লৌহ শলাকার মত ছুটে এসেছে এই রেল। পথে যেসব স্টেশনের নাম চোখে পড়েছে সেগুলোও যেন অরণ্যের মধ্যে এক একটা নামের ফলক মাত্র। এই মণিপুর রোডই কেবল বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা ফাঁকা। অনেক খানি জায়গা জুড়ে স্টেশনের বিস্তার। এখানে লোহা লক্কড়ের ধাক্কা খেয়ে অনেকটা দূরে সরে আছে অরণ্য। আছে নির্জনতা। ট্রেনটা আমাদের ফেলে চলে যেতেই সেই নির্জনতা ঘিরে ধরল স্টেশন চত্বর। তারই মধ্যে একটা ঘরে বসে আমরা দুজন কথা বলছি। আমার বাড়ী নেই শুনে অভিজ্ঞ মানুষটি একটু হালকা ভাবে জানতে চাইলেন, বাড়ী ক'দিন নেই?

তাঁর পর পর ক'য়েকটি প্রশ্নের মধ্যে আমি প্রথমটিকেই জবাব দেবার জন্যে বেছে নিলাম। বললাম, এই ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম।

তাঁর চোখে সরু ফ্রেমের চশমা ছিল। নিশ্চয়ই কাঁচে এমন বাড়তি জ্যোতি

ছিল না যার মাধ্যমে আমার শরীরের ভেতরে মন নামক কিছু একটা গোপন ব্যাপার আছে সেটাকেও দেখা যায়। তবু তারই যেন চেষ্টা ক'রে বললেন, আপনার যা বয়েস তাতে সদ্য ঘর পালানো তো মনে হয় না। জীবনের কোন এক সময় ঘর পালালে তার একটা পরিণতি এসেই যায়—

ভদ্রলোকের অসমাপ্ত কথার মধ্যেই আমিও হালকা ভাবে জানতে চাইলাম, কি রকম পরিণতি ?

কেউ সাধু হয়ে যায়। কেউ ঘর সংসারে মগ্ন হয়ে পড়ে কোথাও। নয়ত কেউ একেবারে ভবঘুরে ফেরারী হয়ে যায়।

আমি কি তিন নম্বরেরটি হতে পারি নি ? —কথাটি জিজ্ঞাসা ক'রতে গিয়ে আমি একটু হেসে ফেললাম। ভদ্রলোক তা লক্ষ্য ক'রে বললেন, তা হলে তো মশাই চিনতেই পারতাম। জিজ্ঞেস ক'রতে হ'ত না।

আমার জীবনে রসিকতা করার সুযোগ খুব বেশী আসেনি। অলকনন্দা পরিহাসপ্রিয় ছিল না। তার প্রকৃতি ছিল গম্ভীর। ফলে তার সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত স্থানগুলোতেও রহস্যালাপের সুযোগ ছিল বড় কম। কখনও কোন ঠাট্টা তামাসার ব্যাপার ঘটলেও সে বড় হাসত না। কোন রহস্যালাপের যোগ্য জবাব তো দিতই না বরং হয়ত বলে বসত, 'সব কিছুতেই তোমার ঠাট্টা।' ফলে ঠাট্টা তামাসা ব্যাপারটা যা ঘটা উচিত ছিল তা ঘটেনি। পরবর্তী কালে এমন জটিল আবর্তে পড়ে গেলাম যে রহস্যালাপের সুযোগই রইল না। আমাকে নিয়েই কে যেন রহস্য ক'রতে লাগল অনবরত। আজ এই ভদ্রলোকের অকারণ আহবানে কি পেলাম কে জানে আমার মনের অন্দরমহল থেকে অবগুণ্ঠনবতী রসিকতা বেরিয়ে এসে দুজনের মাঝখানে লাফ দিয়ে পড়ল। আমি তাঁর কথার জবাব দিলাম, ইস্। তাহ'লে কি করি বলুন তো ?

কি ব্যাপারে ?

আমি তো ভেবেছিলাম এতদিনে বুঝি ভবঘুরে বেশ ধারণটা আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। আপনি যখন সত্যিই আমাকে ভবঘুরে বলে ভাবতে পারছেন না তখন তো ব্যাপারটা দুশ্চিন্তারই হ'ল।

আমার চটুলতায় ভদ্রলোক বোধহয় একটু কুপিত হ'লেন, তাঁর কথায় তা প্রকাশ পেল, কথা শুনে তো মনে হচ্ছে পেটে বিদ্যে আছে। তা অমন সব আবোল তাবোল বকছেন কেন ? দেখুন, আমরা ইংরেজ আমলের কর্মচারী। অনেক রকম পুলিশের লোক দেখেছি, অনেক ছল ছুতো ক'রে তারা বিপ্লবী ছোকরাদের পেছনে ঘুরত। এখন তো মশাই দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এখনও কি আপনারা সেই ছেলেদের তেড়ে বেড়াচ্ছেন ?

আমি ও'কে বিরক্ত করা উচিত মনে ক'রলাম না। বললাম, না। আমি কোন

সরকারী চাকুরে নই। এতদিন গোয়ালপাড়ায় এক ব্যবসাদারের কাছে কাজ ক'রতাম। ছেড়ে চলে এসেছি অন্য কাজের সন্ধানে।

'গোয়ালপাড়া' উচ্চারণ ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলেন ভদ্রলোক। তারপর হাতের আঙুলে তুলে শূন্যে একটা দিক নির্দেশ ক'রে বললেন, ওই দিকটায় অনেক দূরে কোথায় যেন। রেল যায় না কিন্তু রেলের মানচিত্রে জায়গাটা দেখা যায়।—পরক্ষণেই বেশ জোর দিয়ে বললেন, সে তো অনেক দূর মশাই!

হ্যাঁ। অনেক দূর, আমি জানালাম। ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। অল্পক্ষণ পরে বললেন, সেই কবে তা প্রায় পঁয়তিরিশ বছর আগে বর্ধমানের দাঁইহাট থেকে এই বনবাসে এসেছি, তারপর থেকে যা কিছু উজোন ভিটেল এই পাশেই। —তাঁর সব কথা গুলো মিলিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল। আমি চুপ ক'রে সেই বেদনা অনুভব ক'রলাম। তিনি কিছুক্ষণ বিরতির পর বললেন, দেশের সঙ্গে সেই থেকে যা কিছু সংযোগ ছিল শুধু ডাকবাক্সের দৌলতে।

আর কোনদিন যান নি? আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম। তিনি জবাব দিলেন, বাপ মরতেও না। যাওয়ার সুযোগ হয়নি।

এই কথার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন তিনি। তাঁর কথায় এমন বিষণ্ণতা ছিল যে আমাকেও তা প্রভাবিত ক'রল। আমি চুপ করে তাঁর ব্যথার বাষ্পকে উবে যাবার সময় দিলাম। তিনি ধীর স্বরে বলতে আরম্ভ ক'রলেন, বাবা হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর খবর যখন এসে পেঁছাল তখন তৃতীয় দিন। তখন গহন বনের মধ্যে নতুন একটা ছোট স্টেশনের কর্তা-ব্যক্তি আমি। সর্বেসর্বা। ফলে দরখাস্ত ক'রে ছুটি পেতে পেতেই শ্রাদ্ধ পার। ছুটি যদি বা পেলাম বদলী লোক কেউ এসে পেঁছাল না। স্টেশন ফাঁকা রেখে যাবার উপায় নেই। যাওয়া হ'ল না। শেষে মনে এমন ধিক্কার এল যে আবার একটা দরখাস্ত ক'রে ছুটি বাতিল করিয়ে নিলাম। গেলেও আর তো বাবাকে দেখতে পাব না, তাই এখান থেকেই বাবার চরণে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। —ভদ্রলোক চুপ ক'রলেন। চোখ বন্ধ ক'রলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই কথা শুনছিলাম। তিনি চোখ বন্ধ ক'রতে মনে হ'ল প্রৌঢ় এই মানুষটির সারা মুখ মণ্ডল জুড়ে ছায়া ফেলেছে প্রগাঢ় ক্লান্তি। এত ক্লান্তি নিয়ে ভদ্রলোক কাজ ক'রছেন কি ক'রে? তিনি চোখ মেললেন, বললেন, জানেন, আমার মনে হয় আমার বাবা মনে মনে আমাকে ত্যাগই ক'রেছিলেন নইলে মৃত্যুকালে পর্যন্ত একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না কেন?

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, আপনি মিথ্যেই ওসব ভাবছেন।

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে বোধহয় আশ্বস্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে হালকা ভাবে বললেন, সেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমার মা বুদ্ধিমতী ছিলেন বলে বিদেশ বিভুঁয়ে চাকরি ক'রতে আসছি বলে পুঁটলিতে মুড়ির নাড়ু, চিড়ে

মুড়ি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুর সঙ্গে বউ-এর পুঁটলিটাও দিয়ে দিয়েছিলেন। তখন আমার বড়ই লজ্জা ক'রছিল কিন্তু পরবর্তীকালে মায়ের দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারি নি কারণ ওই সময় না আনলে জীবনে বোধহয় আর বউ আনারও সুযোগ পেতাম না।

একথার উত্তরে কিছু বলা যেত কিন্তু চুপ ক'রেই রইলাম। তিনি আবার একটু পরেই বললেন, শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে এভাবে পড়ে থাকার কি অর্থ হয় সারা জীবনে সেটাই ভেবে পাইনি। অথচ আছি। বাবার মৃত্যু সংবাদ সময় মত পেয়েও যেতে পারি নি বলেই হয়ত মার মৃত্যু সংবাদ ভায়েরা আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করে নি। অবশ্য দোষ তাদের নয়, আমারই। বলে থামলেন উনি। থেমেই রইলেন। সে কথা তো নয়ই কোন কথাই বললেন না। আমি বুঝলাম ব্যথা গভীর। প্রৌঢ় মানুষটির ব্যথায় খোঁচা দেবার অনিচ্ছায় প্রশ্ন ক'রলাম না। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কি যেন উনি ভাবলেন তারপর বললেন, বসুন আসছি। বাকি কাজটা সেরে নিই।

উনি আমাকে বিরাট বিবর্ণ একটা টেবিল আর মলিন কয়েকটি আলমারীর সঙ্গে যে ঘরে বসিয়ে রেখে গেলেন সেখানে কেবল রাশি রাশি কাগজ। পেছনে রেলের নিজস্ব সংযোগযন্ত্র যাতে মাঝে মাঝেই ঘণ্টিবাজার শব্দ হচ্ছে আমার নাবোঝা কোন সংকেতে। ওখানে বসে থাকতে থাকতে আমি প্রাণের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হ'লাম; ঘরে যদি একটা বোলতাও এসে ঢুকত আমি যেন বাঁচতাম। ভাবছিলাম ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। উঠি উঠি ক'রতে ক'রতে ভদ্রলোক ফিরে এলেন। বললেন, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আসলে দাস বাবুকে আসবার জন্যে খবর পাঠিয়ে এলাম। দাসবাবু এলেই আমরা বাড়ী যাব। আপনার জন্যে কি ক'রতে পারি তাই ভাবছি। সে সব দিন তো আর নেই মশাই! তখন চাকরি ছিল একটা কথার ব্যাপার। আমাদের এ অঞ্চলে মশাই কাজ করবার লোক খুঁজে বেড়াতে হ'ত। কে আসবে বলুন এই বানর তাড়ানোর কাজ ক'রতে?

বানর তাড়ানোর কাজ! —আমার মুখ থেকে আপন বেগে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ মশাই। কি উৎপাতই ছিল স্টেশনগুলোতে! বনের বানরগুলো স্টেশনের যে কি দেখেছিল কে জানে, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসে থাকত, ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ত! আমাদেরই তাড়াতে হ'ত। প্রথম জীবনে যে সব স্টেশনে কাজ ক'রেছি লোক বলতে থাকতাম মাত্র দুজন। আমি আর একজন কর্মচারী আমার ব্যক্তিগত কাজ কর্মও কিছু তাকে ক'রতে হ'ত। ফলে ট্রেন না থাকার সময় স্টেশনে থাকতাম আমি একাই। কারণ সাহেব আমল ওই যে টরে টক্কা যন্তরটা দেখছেন, ওটির জবাব না পেলেই দেখলেন পরের ট্রেনে চেপে লাল চিঠি

চলে এল। কাজে অবহেলার কারণ দেখাও।

এখন কৈফিয়ৎ লাগে না? —জানতে চাইলাম।

দেখুন মশাই, ক'বছর তো হয়ে গেল স্বাধীন হয়েছি। পরের গোলাম তো আমরা নই?

তা নন।

তবে? এখনও জবাব দিতে হয় তবে দশবারে একবার। এখন তো মশাই সেই সাদা চামড়ার হুজুররা নেই। পদোন্নতি হয়ে হয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দিশী সাহেবদের শরীরের দম ফুরিয়ে যায়। উঠে গিয়ে বসে হাঁপাতে যা সময় লাগে ততক্ষণে অবসরের সময় এসে পড়ে। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট না বাড়িয়ে যে বয়েসটা মানুষ শান্তিতে কাটাতে চায় সেই বয়সে ওপরওয়ালা হ'লে উদারকিটা ঢিলেই হয়।— তা বাদ দিন ওসব কথা। যা বলছিলাম। আমার ঠাকুর্দা ক'লকাতায় কুক কোম্পানীর অপিসের বাবু ছিলেন। ঠনঠনের মেসে থাকতেন, মাসান্তে আসতেন দাঁইহাট। তিনি এক কথায় আমার জ্যাঠাকে নিজের অপিসে, বাবাকে জলকর অপিসে আরও কত লোককে যে কত কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তা বলবার নয়। সে বাদ দিন, আমিই মশাই ফি বার সায়েব ওপরঅলারা এলে বলে কয়ে দু চার জনকে রেলকোম্পানীর কাজে ঢুকিয়ে দিতাম। ভাগ্য ভাল ছিল বলে আমার বড় ছেলেটির সেই সময় আঠারো বছর হয়নি তবু হুইলার সায়েবকে আঠারো বলে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলাম। পরে আর হ'ল না।

ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই যে আমার কাজের জন্যে ভাবিত হয়েছেন এতেই তাঁর সংবেদনশীলতার প্রমাণ পেলাম এবং মনে ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে পড়লাম। এমন মানুষ তা'হলে পথে প্রান্তরে আছে, চিনতে পারা যায় না। জানবার সুযোগ পাওয়া যায় কম। তাই আমি নিজেকে ওঁর কাছে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্তে বসে রইলাম। এর মধ্যে দেখলাম স্টেশনে ব্যস্ততা বাড়তে লাগল। বেশ কয়েক জন কর্মী ওঁর কাছে এল গেল। এমনি লোকও এল নানা কাজে। অনেককেই বললেন, পাশের ঘরে দাসবাবু আসছেন। তাঁর সঙ্গেই দেখা ক'রে বলবেন। ইতিমধ্যে একজন কুলিকে ডেকে নিজের বাড়ীতে খবর পাঠালেন, একজন দেশের লোক এসেছে। বাড়ীতে থাকবে।

আমি সংকোচে বললাম, আমার থাকবার জন্যে মোটেই ভাববেন না। স্টেশনেও শুয়ে থাকতে পারব।

তবে আর কিসের ভাবনা। এখন আর ভাবনা নেই। এই ধরুন পনের বিশ বছর আগেও এসব স্টেশন এরকম ছিল না। অন্য ছোট স্টেশনগুলোর কথা বাদই দিন। সেসব তো ঘন বনের মধ্যে একটা ঘর বলে ভাবতে পারেন। এই স্টেশন অবশ্য অনেকদিনই শহরের মধ্যে। অরণ্য শহর ডিমাপুর।

একটু বাদেই দাসবাবু এসে বললেন, আপনি যেতে পারেন।

উনি বললেন, এঁকে নিয়ে বাড়ী যেতে হবে। খাওয়া দাওয়া হয়নি।

না না যান—দাস বাবুও আমাকে উদ্দেশ্য ক'রেই বললেন। তারপরই এক-খানা খাতা টেনে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। দাসবাবু যেতেই উনি বললেন, এই সুখটুকু যদি আগে পেতাম তাহ'লে সারাটা জীবন এমন অপরাধী থাকতে হ'ত না।

অপরাধী কিরকম? আমি জানতে চাইলাম।

বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যাইনি কিন্তু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ভাইরাও মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিত। মার অসুখের খবর যখন পেলাম তখন আমার অবস্থা খুবই খারাপ। সাতটি সন্তান নিয়ে সংসার চালানোই আমার সমস্যা। দেশে জমিজমায় আমারও যে অংশ আছে সেটা কেউ ধরল না! তার আয়ের একটা পয়সা কোনদিন যে আমি নিইনি সেটা হিসেবে এল না। যেহেতু আমি টাকা পাঠাতে পারলাম না বা যেতে পারিনি তাই আমার কর্তব্য চ্যুতির অপরাধে আমাকে মায়ের মৃত্যু সংবাদটাও কেউ দিল না! সেই দুঃখে পরে যখন সুযোগ পেলামও দেশে আর কোনদিনই গেলাম না। আমি মেনে নিলাম যে যখন বাবা-মার কোন কাজে লাগিনি তাঁদের সঞ্চয়েও আমার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

আমি বললাম, আপনার এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের জন্যে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

ভদ্রলোক আমার কথায় আদৌ গুরুত্ব দিলেন না। বললেন, চলুন যাই। আমাদের যে বাড়ী রেলকোম্পানী দিয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্তই ছোট। নইলে আর কোন অশান্তি ছিল না।

আমি একথার জবাব এই ভেবেই দিলাম না যে সাতটা ছেলেমেয়ে থাকলে অনেক বাড়ীই ছোট লাগা সম্ভব। তবে ওঁর বাসায় পেঁছে বিস্ময় চূড়ান্ত হ'ল এই জন্যে, যে শীর্ণা মলিন মহিলাকে তাঁর স্ত্রী বলে জানলাম তারই গর্ভে ভদ্র-লোক সাতটি নয়, এগারটি সন্তান উৎপাদন ক'রেছেন এবং মহিলা তার পরেও নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তবে ওই চামড়া ঢাকা হাড়ের যন্ত্রটিকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম তার ক্ষমতার জন্যে। চিরদিন বিজন বনোময় পরিবেশে বাস ক'রেছেন বলেই কি নতুন এক জনপদ গড়ে তোলবার ইচ্ছায় ওই ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কাজ ক'রে গেছেন? এ প্রশ্ন আর করা হ'ল না। অতি সাধারণ একটি মহিলা আর তার স্টেশন মাস্টার স্বামী—দুজনে মিলে কি সিদ্ধান্ত ক'রেছেন আমার তাতে কি প্রয়োজন? আমাকে যে ভদ্রলোক এতর মধ্যেও খাতির ক'রে ডেকে এনেছেন এতেই ওঁর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি সেটুকুর জন্যেই মুগ্ধ। সামান্য যেটুকু সময় রইলাম নিশ্চয়ই দশ জনকে দেখলাম না, আর

দেখলাম কিনা তা-ও বলতে পারি না। পড়ে মরুকগে সে প্রসঙ্গ। আমি শুধু সৌজন্যের খাতিরে কৌতূহলই প্রকাশ করলাম, উনিও কি জীবনে কখনো বাপের বাড়ী যান নি ?

ভদ্রলোক তখন থালায় ভাত মাখছিলেন। আমার কথা শুনে বেশ প্রীত হয়ে মুখ তুললেন, বললেন, যাবে না কেন, ওর তো আর স্টেশন মাস্টারের চাকরী না যে বদলী লোক না এলে ছুটি নেই—ও প্রথম দুবার ছেলে হবার সময় গেছে আরও বোধহয় একবার গিয়েছিল।

একটি বয়স্কা মেয়ে আমাদের খেতে দিচ্ছিল। তা সত্ত্বেও আমার গোটা পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছিল একগাদা পোকা যেন কিলবিল ক'রছে। ওদের মা নামক মহিলাটির ভেঙ্গেপড়া চেহারা, শিথিল চলাফেরার মধ্যে এমনই একটা ভাব ছিল যার জন্যে তাকে আমার একটি মৃতকল্প পোকা বলে মনে হচ্ছিল। অন্তিম সময়ে পোকা গুলো যেমন ঠ্যাং উলটিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে ছটফট ক'রতে থাকে তেমনি দেখতে লাগছিল তার চলাফেরা। আমার কেমন গা ঘিন ঘিন ক'রছিল। এ কি জীবন ? এ তো শুধু বেঁচে থাকা মাত্র। যেভাবে অস্থানে কুস্থানে পোকা মাকড়রা থাকে সেইভাবে দিনক্ষয়। আবার সেই ভাবনাটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যা ভুলে থাকতে চাইছিলাম। আমি উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন, ও কি মশাই উঠছেন কেন ?

না ঃ আর পারছি না—জানালাম।

এ কি ? হঠাৎ আধখাওয়া ক'রে উঠে পড়লেন ?—যে মেয়েটি নিঃশব্দে খেতে দিচ্ছিল বিপন্ন বোধ ক'রে সে-ই বলে উঠল এতক্ষণের অবাঙময়তার পর।

তাকে সান্তনা দেবার জন্যেই মিথ্যা বললাম, হঠাৎ পেটটা ব্যথা ক'রে উঠল। ও কিছু নয়। আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খাওয়া থামিয়ে জানতে চাইলেন, হঠাৎ কেন ব্যথা হ'ল ?

আমার এমন হয়। মাঝে মাঝেই হয়। এজন্যে ভাববেন না আপনি খান আমি কিছুক্ষণ বসলেই সুস্থ হয়ে যাব।

তাহ'লে বরং একটু শুয়ে পড়ুন—ভদ্রলোক তো অবলীলাক্রমে বললেন কিন্তু আটজন বাসিন্দার এই দু ঘরের বাসস্থানে বাইরের একটা হুট ক'রে আসা মানুষ যে শোবে কোথায় সে কথাটা একবার ভাবালন না। আমি ভাবলাম বলেই বললাম, বহুদিন ফাঁকায় শুয়ে অভ্যেস ক'রেছি। ঘরে শোয়া আর সহ্য হয় না। আমি স্টেশনে যাচ্ছি, আপনি কাজকর্ম সেরে আসুন।

তাহলে আপনি আমার ঘরটাতেই বিশ্রাম করুন গিয়ে, আমি একটু গড়িয়ে নিয়েই আসছি।

যাদের দিবা নিদ্রার অভ্যাস থাকে তারা 'একটু গড়িয়ে' নেয়, এ আমার জানা। স্টেশন মাস্টার মশাই যা খুশী করুন আমার তাতে কি? বরং তাঁর এই আতিথ্যের তার জন্যে ধন্যবাদ। সেই ধন্যবাদ মনে মনে জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

স্টেশনে এসে বাইরে যাত্রীদের জন্যে যে সব বেঞ্চ আছে তাতেই বসলাম। নাম মাত্র ঝামেলার শান্ত স্টেশন। এখানে সময় কাটানোর কোন উপায় নেই বলেই ভাবনা এসে মনের মধ্যে জেঁকে বসল। মণিপুরটা কোনদিকে? কি ভাবে যাওয়া যায় জানতে হবে। —এইসব এলোপাতাড়ি চিন্তা ক'রছি এমন সময় দেখি একজন বিদেশী পাদ্রী আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে তবু যেন একটা ভরন্ত শালগাছের মত হেঁটে যাচ্ছেন। আমার ঠিক সামনেটায় এসে পড়তেই আমি তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে বললাম, আমি একটা কথা বলতে চাই।

আকস্মিক স্বর শুনেই হয়ত তিনি থমকে দাঁড়ালেন। আমার দিকে স্মিত মুখে চেয়ে বললেন, আমাকে কিছু বলছেন?

আমি উঠে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। এই প্রথম পরিচয় দিলাম, আমি বিহার থেকে এসেছি। কোন সেবা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় চাই। অর্থের প্রয়োজন নেই।

আমার ইংরিজি বলা ত্রুটিহীন ছিল বলেই বোধহয় তিনি আমাকে অনুমান ক'রতে চাইলেন। আমি তাঁর সন্দেহ মোচনের জন্যে বললাম, আমি এই পৃথিবীতে একা। কোন দায়হীন। আমার কিছু বিশেষ কর্মক্ষমতা আছে যা দিয়ে আমি আপনাদের কাজে সাহায্য ক'রতে পারি—

এবার পাদ্রী মশায় সামান্য উৎসুক হলেন। প্রশ্ন ক'রলেন, সেটা কি?

অর্থাৎ কি কর্মক্ষমতা আমার আছে তাই জানতে চাইলেন।

সেই পাটনা ছাড়বার পরই আত্মপরিচয় আমি হারিয়েছি। তারপর থেকে এই এতগুলো বছর আমার পরিচয়ের প্রয়োজন হয়নি। যা হোক একটা পরিচয় দাখিল ক'রলেই আমার কাজ চলে গেছে। অনেক জায়গায় সে প্রয়োজনও হয় নি। আজ সামান্য একটু কৃতিত্ব জাহির করা একান্তই জরুরী। সেটুকু না ক'রতে পারলে পাদ্রী সাহেবের জল গলবে না। কাজেই বললাম, কলকাতায় ডাক্তারী শেষ বছর পর্যন্ত পড়েছি।

তাহ'লে তো তুমি প্রায় ডাক্তার, পাদ্রী বললেন। পরক্ষণেই জানতে চাইলেন, তোমার সঙ্গে প্রমাণ দেবার মত কিছু আছে?

প্রমাণ নেবার ব্যবস্থা থাকলে দিতে নিশ্চয়ই পারি। কাগজপত্র কিছুনেই।

হঠাৎ পাদ্রী সাহেব জানতে চাইলেন, তাহ'লে পরীক্ষা না দিয়ে এভাবে কেন ঘুরছি।

এই প্রশ্নের কি জবাব দেব ভেবে না পেয়ে সবচেয়ে ফাঁকি বাজী উত্তরটা বলে দিলাম, আমার ভাগ্য।

এতক্ষণ যে কাজ আটকে ছিল আমার এই এক জবাবে তা হয়ে গেল অত্যন্তই সহজে। সাহেব বললেন, ভারতীয়দের এই একটাই বিরাট দোষ। ভাগ্য। ভাগ্য আবার কি ভাগ্যের ওপর অতি নির্ভরতা ভাল নয়। এটা খুবই খারাপ।

আমি কোন জবাব দিলাম না। প্রতিক্রিয়া কতদূর গড়ায় দেখতে চাইলাম। তিনি আবার প্রশ্ন ক'রলেন, কবে ছাত্র ছিলে ?

আমি তাঁর সংশয় বুঝতে পারলাম। তিনি আমার কথা ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারছেন না। তাই বললাম, প্রায় বছর দশ হ'ল পড়া ছেড়ে দিয়েছি। শালটা জানালাম।

তিনি আমাকে আবার প্রশ্ন করলেন, কেন ?

আমার বাড়ী বিহারে। ক'লকাতায় পড়তাম। বিশেষ একটা অসুবিধের জন্যে ছাড়তে হয়েছে।

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন সাহেব, তারপর বললেন, বেশ। তুমি আমাদের ওখানে এসো। দেখি তোমার জন্যে কি ব্যবস্থা ক'রতে পারি।

আমি তো ফাদার আজ প্রথম এদিকে এলাম। আমি কিছু চিনি না। কতদূরে আপনি থাকেন ?

আবার কি ভাবলেন পাদ্রী সাহেব। ভেবে বললেন, সমস্যা সেটাই। আমি যে গির্জায় থাকি সেটা এখান থেকে অনেকদূর। উখরুল। তুমি কি সেখানে যেতে পারবে ? পরক্ষণেই বললেন, কেন পারবে না ? বলবে যে আমি রেভারেন্ড পিটরের কাছে যাব।

যদি কিছু মনে না কবেন ফাদার তো একটা কথা বলি। আমি এখনই আপনার সঙ্গে যেতে চাই।

পাদ্রী সাহেবের দ্বিধা দেখে বললাম, পথে দেখে হয়ত আমাকে বিশ্বাস ক'রতে পারছেন না যেটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে দেখুন আমি আপনায় সাহায্য ক'রব সেবার কাজে।

আমার কথা যে তিনি মন দিয়ে শুনছেন না তা বেশ বুঝছিলাম। মনে হ'ল একেবারেই শুনছেন না। তবু হঠাৎ শুনলাম জবাব দিলেন, মানুষের জন্যে যে কাজ তারই নাম সেবা। কবি মিলটন বলেছেন। যারা শুধু তাঁর আদেশের জন্যে প্রতীক্ষা করে তারাও ঈশ্বরের সেবা করে। তুমি কি বিশ্বাস কর ?

এই দার্শনিক প্রশ্নের কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। অনেকগুলো দিন এই অরণ্য পর্বতে ঘুরে সভ্য সমাজের সঙ্গে সংযোগ রহিত হয়ে গেছি। বই বলে কোন বস্তু এই পৃথিবীতে আছে বা তা মানুষের ব্যবহারেই লাগে এ কথাটাও ভুল হয়ে গেছে। যে অঞ্চলে বাস ক'রে এসেছি সে সব জায়গায় বই নামক জিনিসটা চোখেই দেখে নি এমন লোকের সংখ্যাই বেশী। দীর্ঘ দিনের আপরিচয়ে শব্দগুলো

এমনই হয়ে গেছে যে এখন আমার কাছে অচেনা ঠেকে। মিলটন নামক একজন কবির সঙ্গে কোন কিশোর কালে পরিচয় হয়েছিল, এতদিন তাঁকে মনে থাকারই কথা নয় তায় তাঁর কথা! আমাদের বাসভূমিতে কথার তাৎপর্য তাৎক্ষণিক। তার প্রতি-ক্রিয়াও তাৎক্ষণিক। কাজেই কোন কথা দীর্ঘকাল ধরে রাখার উপায় নেই, রেওয়াজও নেই। কোন কথা সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ফল যা হবার হয়ে গেল, সেখানেই তার শেষ। শব্দগুলো অস্তিত্বহীন। তাই পাদ্রী সাহেবের কথার জবাব দেওয়া হ'ল না। তিনি জানালেন, যদি ঈশ্বরের সেবা ক'রতে চাও, যদি সত্যিই ইচ্ছুক হও তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ কিছু ভেবেছ?

কি রকম?—আমি জানতে চাইলাম।

আমরা তোমাকে বেতন তো তেমন দিতে পারব না!

একথার জবাবে আমার মুখ থেকে অদ্ভুৎ সব কথা বেরোতে লাগল, এই পৃথিবীতে আমি একা। মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। এই এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনার জন্যে আমি অপেক্ষমান, যদিও জানি না কবে তা ঘটবে। অবশ্য কোন মহান মৃত্যুও আমার আশার তালিকায় নেই। পৃথিবীর অসংখ্য প্রাণীর জন্ম মৃত্যুর মতই স্বাভাবিক মৃত্যু আমার ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ততা।

আমি থামলাম। কথাগুলো বলে ফেলে যেন ফেরৎ নিতে চাইলাম কারণ আমার মনে হতে লাগল আমি যেন বেশী বলে ফেলছি।

কিন্তু কথাগুলো কাজ ক'রল। হয়ত এক নাগাড়ে অমন ইংরিজি বলে যাওয়াই আমার শিক্ষার অভিজ্ঞান হ'ল। সাহেব বললেন, বেশ চল। আমি তোমার জন্যে চেষ্টা ক'রব। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

আমি ধন্যবাদ জানালাম। অপ্রত্যক্ষ কোন কল্পিত ব্যক্তির সহায়তার চেয়ে চক্ষুগোচর এই পাদ্রীটির সহায়তার প্রতি আগ্রহ বেশী বলে তাঁর মনোরঞ্জনে প্রয়াসী রইলাম। পাদ্রী পিটারের শরণ নিলাম।

স্টেশনের বাইরে রাস্তার একপাশে একটা মোটর ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল, বিচিত্র ভাষায় তার চালককে কি বলতে চালক নেমে কতগুলো পেটি দেখাল যা গাড়ীর পেছন দিকে জমা করা ছিল। সাহেব সেগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমাকে গাড়ীর সামনে চালকের পাশে উঠে বসতে ইঙ্গিত ক'রলেন। আমার পর তিনিও উঠে পাশে বসলে আমরা চলতে শুরু ক'রলাম। এ এক নতুন পথে নতুন যাত্রা।

জন্ম থেকেই আমার অবস্থাটা এক রকম। কোনদিনই পথ জেনে পা বাড়াই নি। এটা তো জন্মসূত্রেই জেনেছি পথের সঙ্গী পথেই পাওয়া যায়। পথ থাকলেই যাত্রী থাকে, যাত্রী-রা সহযাত্রী সন্ধান করেই। পথ যেমনই হোক না পথিক থাকে

সুপথেও থাকে কুপথেও থাকে। সুগম পথে বেশী থাকে বলে যে দুর্গম পথে থাকেই না তা কিন্তু নয়। তা ছাড়া যে পথটা দিয়ে চলেছি এ যে কি দুরূহ পথ তার আর বর্ণনার অবকাশ নেই। তবে একটা বিশ্বাস আমার জন্মাল যে এভাবেও যখন পথ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে তখন অগম্য কোন স্থান আর পৃথিবীতে নেই। সেই যে একদিন যাত্রা ক'রেছি তারপর ক্রমাগতই তো চলছি—কতরকম পথ ধরেই তো চললাম দূর দুর্গম সব দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে এই যাত্রাই সবচেয়ে ভয়াবহ। একপাশে উত্তুঙ্গ পাথর পাঁচিল আর পাশেই গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে পথ চলেছি আরও অনেকবার কিন্তু তখন পায়ে চলেছি বলে এমন ভীতিপ্রদ হয় নি। এখন নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই বলেই ভয়টা বেশী লাগাছে। চলার গতিময়তাও ভয়ের মধ্যে বেগ সঞ্চার ক'রছে।

সারাটা পথই পাহাড়। কোন কোন স্থানে পথের ধারে হয়ত বা ছোট একটা কুঁড়ে। সে কুঁড়ে ঘর দুতিনটিকে নিয়েই একটা বসতি—আমরা যাকে বলি গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে লাঙ্গল দিয়ে মাটি কুপিয়ে চাষ করে সেই কুঁড়ের মালিকেরা। ওপরে নিচে কোথাও কোন ঝর্ণার দেখা পেয়েছে বলেই সেখানে বসতি ক'রেছে। তা বাদে সবই অরণ্য। বিজন অরণ্যের মধ্যে কারা বাস করে জানি না তবে চলতে যারা চোখে পড়ল তারা মোরগের মত এক ধরণের পাখি। আরও কিছু ছোট ছোট পাখি দেখা যাচ্ছিল না এমন নয় তবে বনের তুলনায় পাখির সংখ্যা যেন খুবই কম। থাকা না থাকার কারণ জানবার মত প্রকৃতিবিদ আমি নই বা অরণ্য বিশারদও নই আমি। প্রাণের সন্ধান করি প্রাণে আমার প্রয়োজন বলে। এই নিবিড় বনের মধ্যে পাখিগুলোকেও আমার আপন বলে মনে হয়। গাছ গাছালি নড়ে উঠলেই ভয়ে হোক বা পুলকে হোক আমি যেন আশান্বিত হয়ে উঠি।

চলার পথেই মাঝে মাঝে থেমে পড়ে আমাদের গাড়ী—। সাধারণত বসতি পড়লেই থামে। অমনি দেখি কুটিরগুলো থেকে উন্মুখ শিশুর দল হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে আসে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে বড়রাও। কিন্তু বড়দের সংখ্যার তুলনায় শিশু অজস্র। প্রতি ঘর থেকে দশবারটি ক'রে শিশু বেরিয়ে এসে কিল বিল ক'রতে থাকে যাদের বেশীর ভাগই উলঙ্গ এবং স্বাস্থ্যবান। স্বাস্থ্য, বুঝতে পারি, এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ, তার অরণ্যের মতই অকৃপণভাবে প্রদত্ত। শিশুর সংখ্যায় এবং তাদের বয়সের ক্রমানুসারে মনে হচ্ছে সন্তান ধারণ মহিলাদের নিত্যকর্মের পর্যায়ভুক্ত—। এবং এই কাজে নিশ্চয়ই তারা ক্লান্তিহীন। ফাদার-টিরও এক নতুন রূপ দেখলাম এই শিশুর মেলার মধ্যে। তাঁর জামার মধ্যে হাত দিচ্ছেন আর কি যেন বের ক'রে তাদের হাতে দিচ্ছেন। সেই লেন দেন এর ক্ষণ-টুকুতে তাঁর মুখে যে তৃপ্তি আর হাসি ফুটে উঠছে তাকেই কি বলে স্বর্গীয়? কিশোরী মেয়েরা নানা রকম আবদারও ক'রছে। কেউ চাইছে ক্রস, কেউ যীশুর

কোন স্মারক। একটি মেয়েকে অদ্ভুত একটা জিনিষ চাইতে দেখলাম, বলল, আমাকে একটা গির্জার ছবি এঁকে দেবে ? খুব সুন্দর কোন গির্জা !

ছেলেমেয়েরা এবং বয়স্করা কেউ কেউ শুনলাম পরিষ্কার ইংরিজি বলছে। বাকি সকলের সঙ্গে যে ভাষায় ফাদার কথা বলছিলেন তার শব্দমাত্র আমি বুঝতে পারছিলাম না। পরে জেনেছি, নাগামিজ। ইংরিজি বুঝছিলাম তো বটেই বরং এই সব ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের মুখে অনর্গল ইংরিজি শুনে আমার আত্মাভিমান দূর হয়ে গেল। আমাদের শহুরে মানসিকতায় যা এক বিরাট ব্যাপার এই প্রত্যন্ত অরণ্যে তা দেখলাম একান্তভাবে অনায়াসলব্ধ। নিজের মাতৃভাষার মতই ইংরিজি বলছে ওরা ! একটা গ্রামে এসে ফাদার গাড়ীর মধ্যে রাখা পোঁটলা-গুলোর একটা খুলে তা থেকে প্রচুর পোষাক পরিচ্ছদ বের ক'রলেন। তার মধ্যে ছোট বড় বিভিন্ন মাপের পোষাক ছিল। যার যেমন লাগবে উপস্থিত সকলের মধ্যে ফাদার বিলি ক'রলেন সেগুলো। এখানে আর একটা ব্যতিক্রম দেখলাম। অত জিনিষ নিল সকলেই আগ্রহের সঙ্গে কিন্তু সকলে যে খুব খুশী এমন ভাব তাদের চোখে মুখে ফুটতে দেখলাম না। মনে হ'ল এ যেন তাদের নিত্যকর্ম ক'রছে। নেমন্তন্ন খাওয়ার বিশেষ আগ্রহ যেমন দৈনন্দিক খাওয়ায় থাকে না এও তেমনি। কাপড় বিলি শেষ হলে আবার আমরা চলতে সুরু ক'রলাম। পথে কিছু বইও বিলি হ'ল। আমার কেবল দর্শকের ভূমিকা। বসে বসে দেখছি। যেখানে বেশী দেরী হচ্ছে সেখানে গাড়ী থেকে নামছি নইলে গাড়ীতেই বসে থাকছি বোকার মত।

হঠাৎ একবার ফাদার প্রশ্ন ক'রলেন, তোমার কাছে শীতের পোষাক আছে তো ?

গাড়ীটাকে ক্রমাগত ওপরে উঠতে হচ্ছে বলে সাধ্যসীমার অতিরিক্ততায় গর্জন ক'রছিল। সেই শব্দের মধ্যে দিয়েও তাঁর কথা আমার কানে পেঁছাল। কিন্তু উত্তর ভাবতে ভাবতে সময় কিছুটা কেটে গেল বলে ফাদার আবার বললেন, তোমার তো গরম কাপড়ের প্রয়োজন হবে। তোমার সঙ্গে কি আছে কিছু ?

এবার আর দেরী করার উপায় নেই বলে জানালাম, আছে।—ছিল একটা কোট। দীর্ঘদিন ব্যবহারে সেটা যেমন বিবর্ণ তেমনি দুর্দশাগ্রস্থ। তারপর যেভাবে সেটিকে রাখা হয়েছে তাতে বের ক'রলে যে কি মূর্তি তার প্রকাশ হবে সে দুর্ভাবনাও অনেক দিন পরে মাথায় চাপল। তাই প্রশ্ন ক'রলাম, গরম কাপড়ের দরকার হবে কি ? অল্প ঠাণ্ডা হলে আমার অসুবিধে হয় না।

পাদ্রী কি বুঝলেন তিনিই জানেন, আমাকে বললেন, ঈশ্বর আমাদের সহ্য শক্তি নিশ্চয় দিয়েছেন তবে দুঃখের বিষয় এই, যে তার মাত্রা দিয়েছেন।

তাঁর কথা শেষ হবার একটু পরেই হুস করে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে

লাগল। গাড়ীটা পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই সে হাওয়া সমানে এসে আছড়ে পড়তে লাগল আমাদের ওপর। বেশ ঠাণ্ডা মনে হ'ল সেই বাতাস। কিন্তু ঠাণ্ডা হলেই বা আমি তার ক'রছি কি? সে বাতাস যেমন বাড়তে লাগল তেমনি তীব্র হতে লাগল তার শৈত্য। একটা পাহাড়ের প্রায় মাথায় উঠে পড়লাম আমরা। সেখান থেকে চারপাশের অপেক্ষাকৃত নিচু গিরিশ্রেণী চোখে পড়ছিল—কোথাও অরণ্য কোথাও শূন্যতা। আকাশ মনে হ'ল মাথাব কাছাকাছি। যেন এক অসীম শূন্যতার শরিক হতে চলেছি আমরা। এমনই ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে চারিদিকের শূন্যতা মনের মধ্যে মৃত্যুর মত স্বাদের বিস্তার করে। আমার মনে হয় মৃত্যুও চেতনার একটা স্তর। অন্ততঃ এই মুহূর্তে সেই রকমই মনে হ'ল আমার। মৃত্যু বোধহয় এই রকমই কোন একটি হিম শীতল শূন্যলোকে উত্তরণ। উন্নতির জন্য কষ্টের গর্জন থেমে যেতে বুঝলাম এবার আমাদের অবনতি ঘটতে সুরু ক'রবে। আর সত্যি বলতে কি এতটা উন্নতি আমার শীতের কারণে সহ্যও হচ্ছিল না। অথচ বলবই বা কাকে? পাদ্রী মশাইকে বলে হয়ত বিরত করা যায় তাতে লোকসান হতে পারে হিসেব ক'রে কষ্ট স্বীকারের জন্যে তৈরী হয়েছিলাম। জানতাম সব কষ্টেরই এক সময় শেষ হয়।

আমারও হতে লাগল। সেই দারুণ শীতকে কাটিয়ে নিচে যখন নামলাম পাদ্রী আমার পিঠে হাত ছুঁইয়ে বললেন, এখন আমি বিশ্বাস ক'রছি তুমি থাকবে।

আমি এরকম সংলাপে একটু আশ্চর্য হলাম। কারণ—এটা আকস্মিক। যে কারণেই তিনি বিশ্বাস করুন তাঁর বিশ্বাস জম্মানোর জন্যেই আমি আশ্বস্ত হলাম। তিনি নিজের আস্থার কারণ অকারণেই বিশ্লেষণ ক'রলেন, কষ্ট স্বীকার ক'রতে পারলেই এখানে থাকা সম্ভব। বড় কষ্টের জায়গা। তবে বড় সুন্দর। ঈশ্বরের এই পৃথিবীর সব জায়গাই সুন্দর।

পাদ্রীকে সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছাতেই তোয়াজ ক'রে বললাম, আপনার মত অভিজ্ঞতা আমার নেই ফাদার। অত দেশ আমি দেখিনি, তবু এই দেশেরই অনেকটা দেখলাম তাতে সব সময় সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। আসলে যে কোন কিছুকেই উপলব্ধি ক'রতে হলে সেই রকম মন বা মানসিক অবস্থা প্রয়োজন।

পাদ্রী সম্মতির মত ক'রে মাথা নাড়লেন। তাঁকে চিন্তিত দেখাল। কপালে কুঞ্চন জাগল, আমাকে বললেন, আসলে সবই তো উপলব্ধি মাত্র। ঈশ্বরও তো উপলব্ধির সত্য। পৃথিবীর সবকিছুই তাই। যা অনুপলব্ধ তার অস্তিত্ব অনুপস্থিত। নয় কি? তারপরই তাঁর মনের কথাটি বললেন, যারা উপলব্ধি ক'রতে পারে না, বিশ্বাসও করে না।

বুঝলাম উনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলছেন। এবার আমি চিন্তিত হলাম। উপলব্ধি করিনি বলেই কি আমার এই নিরাসক্ততা? আমি অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব

—কোনটা নিয়েই ভাবিনি। সবাই কি ভাবে? পোকা-মাকড় অথবা অন্য প্রাণীরা বেঁচে থাকার চেষ্টার অধিক কোন অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে নিজেকে জড়ায় না আমিও অনঢ় অনাসক্তিতে তেমনই নিস্পৃহ। আছে কি নেই দিয়ে হবেটা কি তাও আমি ভেবে পাই না। থাকলে আছে, না থাকলে নেই। আমার তাতে কি এল গেল। আর ঈশ্বর নামক কিছু যদি সত্যিই হয় তবে আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে তাঁরই বা কি এসে গেল? আমি বিশ্বাস ক'রলেও তাঁর কিছু বৃদ্ধি হয় না আমার নিস্পৃহতায়ও ক্ষুণ্ণ হয় না তাঁর এতটুকু অংশ।

পাদ্রী হঠাৎ বলে উঠলেন, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ। তিনিই সব কিছু ক'রবেন। আমি মনে মনে চমকে উঠে ওঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম পরম নিস্পৃহ ভাবে সামনের দিকে চেয়ে আছেন। আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে যেন সম্পূর্ণ অনবহিত। —অথচ কথাটা উনি বললেন আমি বেশ স্পষ্টই শুনলাম। তবে কি আমার মনের কথা জানতে পেরেই একথা উচ্চারণ? অন্তর্যামী যাকে বলে পাদ্রী কি তাই? মানুষের মনকে জানবার শক্তিতে উনি কি শক্তিমান? না কি সব সময় যেমন উপদেশ সবাইকে দিয়ে থাকেন তেমনি নিয়ম মাফিক বলে চলেছেন? যে সব সাধু সন্তেরা মনের কথা বলে দেন তাঁরা সাধারণত এমন কতগুলো কথা লোকের মুখ দেখেই বলেন যা প্রায় সকলের বেলাতেই কোন না কোন ভাবে খেটে যায়। আমার কাছে লোক এলে ওরকম কথা আমিও যে ভালই বলতে পারি সুযোগ পেলে তা দেখিয়ে দিতাম। কাজেই পাদ্রীর কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁকে আমি অন্তর্যামী মনে ক'রতে পারলাম না। তাতে তাঁরও ক্ষতি হবার ছিল না, তাই আমরা বেশ চলতে লাগলাম। আমাদের গাড়ী যখনই খাড়াই পথে উঠছিল তার গর্জন ছিটকে পড়ছিল চারপাশের বনানীতে কখনো হয়ত বা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল শিলা পাহাড়ের কঠোরতায় ধাক্কা লেগে। আমি এই পাহাড় আর পাহাড় জুড়ে বনের দৃশ্য বহু দিন ধরে বহু জায়গাতেই দেখলাম। এক এক অঞ্চলের পাহাড়ে এক এক রকমের গাছের বাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু দূরের অরণ্যের দিকে দেখলে মনে হয় সেই বমডিলার পাহাড়েও যা দেখে এসেছি এখানেও দৃশ্য সেই একটাই। সেই অসীম নীল আকাশের নিচে সারি সারি পাহাড় যেন সবুজ কাপড় গায়ে জড়িয়ে অনন্তকাল এমন কিছুর প্রতীক্ষায় বসে আছে যা ওদের কোন একদিন উজ্জীবিত ক'রবেই।

প্রথম দিকে এমনি পথ বড় সুন্দর লাগত। এ পথে চলতে রোমাঞ্চ জাগত। এখন জাগে না। একঘেয়ে হয়ে গেছে। কাজেই সৌন্দর্যের আকর্ষণ যা মানুষকে টেনে নিয়ে চলে তা আমি অনুভব করি না বলেই পথ এখন শেষ হলেই বেঁচে যাই। তবে নতুনত্ব না থাকলেও ভাল লাগে। এই অরণ্য, নানা রকম গাছ আর নানা জাতের লতাগুল্ম, দৈবাৎ কোন কোনটায় হঠাৎ নতুন ফুলও দেখা যায়,

ভাল লাগে। তবে তার জন্যে আমার মত মানুষের পথের নেশা ধরে না। আমাদের পথ চলা নেহাৎই পথ ফুরোবার জন্যে।

তাই খুশী হ'লাম। মাঝে মাঝেই যেমন ঘর গৃহস্থালী দেখা যাচ্ছিল তেমনি চোখে পড়েছিল বেশ কয়েকটা বাঁকে বাঁকেই। কিন্তু গুরুত্ব দিই নি। গাড়ীটা থেমে যেতেই ডান দিকে একটা উঁচুমত টিলার ওপরে দেখি একটা গির্জা। বড় ঠাণ্ডা। গাড়ী চলছিল বলে বাতাসের বেগে যে ঠাণ্ডা লাগছিল তা নয়, গাড়ী থামতেও ঠাণ্ডা বড় তীব্র। ঝড়ের মত বাতাস হু হু ক'রে বইছে বিপুল বেগে। রেভারেণ্ড পিটার নেমে আহবান জানালেন, নেমে এস। আমরা পেঁছে গেছি।

এই সামান্য ক'টি শব্দ, জীবনে বহুবার দেখেছি তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পেঁছে যাওয়া ব্যাপারটা বোধহয় সবচেয়ে মূল্যবান। যে যেখানে পেঁছোতে চায় সেখানটাই তার সমস্ত আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। জীবনের ধ্রুবতারা। আপাততঃ আমার যেমন উখরুল। এই কেন্দ্রবিন্দু বারংবার বদলায়, বহুবার। কিন্তু প্রতি নতুনের জন্যে আগ্রহ নতুন করেই সঞ্জীবিত হয় বলে যখন যেটা লক্ষ্যস্থল হয় সম্পূর্ণ আগ্রহ সেখানেই গিয়ে পড়ে।

পরম আগ্রহে গির্জা চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝক ঝক ক'রছে পাথরেরর চাতাল তার ওপরে দু চারটে পাতা পাশের বিরাট মহীরুহগুলো থেকে খসে এসে পড়েছে। মনে হয় এখনই পড়ল। সেই ঝরাপাতার দু একটা আমার চোখের সামনেই উড়ে গেল বাতাসের বেগে। আমরা গির্জার চাতালে দাঁড়াতেই কোথা থেকে চার পাঁচটি বালিকা এসে দাঁড়াল ফোলা ফোলা চোখ, গোল মুখমণ্ডল, শীতপ্রধান অঞ্চলের লোকের পক্ষে স্বাভাবিক লালচে গায়ের রঙ। শরীরে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য দিয়েছে অনবদ্য দীপ্তি। আপন কৃষ্টি সম্পন্ন বর্ণে বিচিত্র একই ধরণের পোষাক। জাতীয় পোষাক। ভারতের উত্তর পূর্ব প্রান্তের পার্বত্য এলাকায় প্রতি গোষ্ঠীরই নিজস্ব পোষাক লক্ষ ক'রে আসছি। এ-ও এক মাধুর্য; মেয়েরা কখনই নিজেদের গোষ্ঠীর পোষাক ছাড়া অন্য কিছু পরে না। সেই সমতা তাদের অন্য এমনই এক সৌন্দর্য দেয় যা আমাদের নাগরিক জীবনের অনুকরণপ্রিয়তায় দেখা যায় না। আমি যখন সেই স্বাস্থ্যবতী বালিকাদের মুগ্ধ চোখে দেখছি তখনই পাদ্রী পিটার তাদের সঙ্গে অজানা অশ্রুতপূর্ব এমন এক ভাষায় কি যে সব কথা বলতে লাগলেন আমি যার বর্ণমাত্র বুঝলাম না। কয়েক মুহূর্ত পরেই আমাকে অবাক ক'রে তারা কচি কণ্ঠের মিষ্টি স্বরে ইংরিজিতে আমাকে বলল, সুপ্রভাত। আমি এমন খুশী হবার মুহূর্ত জীবনে বেশী পাই নি বলে অভিভূত আনন্দে কি যে তাদের বলব ভেবে পেলাম না। ইংরিজি প্রথা অনুসারে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে হ'ত তা না ক'রে আমি তাদের একজনের মাথায় হাত বুলিয়ে আমার স্নেহ প্রকাশ ক'রলাম। অমনই ওরা একই সঙ্গে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

রেভরেণ্ড পিটর তাদের সোহাগী ভৎর্সনার সুরে ইংরিজিতে বললেন, তোমরা সব দুষ্টু মেয়ে।

তাতেও হেসে উঠল তারা। পিটর বললেন, তোমাদের জন্যে এবার কিছু নতুন বই এসেছে। কালকে সবাই পাবে।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি শিশু এসে জুটেছে। তাদের মধ্যে একটি দুষ্টু চেহারার মেয়ে তার নিজের ভাষায় কি যে বলে উঠতেই পিটর শিশুর মতই কৌতুকে মাথা নেড়ে কি সব বললেন। কথা না বুঝেও বুঝলাম ছোটদের সঙ্গে তাদেরই মত হয়ে গেছেন উনি।

এই মানুষটির প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে গম্ভীর মুখ ডিমাপুর রেল স্টেশনে দেখেছিলাম এই নতুন পরিবেশে দেখে সেটা সম্পূর্ণ ভুল হয়ে যায়। কিছুতেই সেই মুখচ্ছবি মনে করা যায় না। এখানে এঁকে দেখে মনে হয় একটি সহজ সরল 'দেহে বেড়ে ওঠা' শিশু। মুখের কাঠামোই যেন বদলে গেছে। আমি আর সব ছেড়ে সেই সরল পবিত্র মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আর মেয়েগুলো তাঁর সঙ্গে আপনভাষাতে কি যে সব বাক্যালাপ ক'রে যেতে লাগল যাতে আমার পূর্ণ অনধিকার। মনে হচ্ছিল সেই অরণ্যের পরিবেশে অসংখ্য পাখি কলতান ক'রছে।

সব ক'টি মেয়েরই গোল মুখ, একই রকম বর্ণ, যেন লাল আর সাদা মিশিয়ে কেউ এদের শরীরের জন্যে রঙ তৈরী ক'রে দিয়েছে। আমার ভয় হচ্ছিল এদের প্রত্যেককে হয়ত আমি আর চিনতে পারব না। ভবিষ্যতে আমার পক্ষে এদের আলাদা ক'রে চেনা বোধহয় সম্ভব হবে না। এখনই সে ভবিষ্যতের কথা ভেবে আগে বিপন্ন বোধ ক'রে কি হবে? ভাষার ব্যবধানের জন্যে দুঃখ পেয়েছি জীবনে অনেকবার। কিন্তু এবার পেলাম যেন সবচেয়ে বেশী। এই শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে না পারার জন্যে মনের মধ্যে ব্যথা হচ্ছিল। এমন সুন্দর শিশুর রাজ্যে প্রবেশের অধিকার অতীতে কখনও পাইনি। দেখতে দেখতে পাদ্রীকে সেই শিশুর দেশের রাজা বলে মনে হচ্ছিল। আমি যেন এক স্বর্গে এসে পেঁছেছি সেখানে দেবরাজ আর দেব কন্যাদের মধ্যে আমি এক অনধিকারী। আমি বুঝি এতদিন ধরে এই স্বর্গে পেঁছাবার জন্যেই পথ চলছিলাম।

আমার অবস্থা লক্ষ ক'রে পাদ্রী পিটার বললেন, তোমার বোধহয় শীতে কষ্ট হচ্ছে। এখানে এটাই সবচেয়ে কম ঠাণ্ডা।

আমি শীত সহ্য ক'রতে কষ্ট পেলেও অস্বীকার ক'রলাম, কষ্ট এমন কিছু নয়। তবে আমরা যে অঞ্চলের মানুষ তার চেয়ে ঠাণ্ডা এখানে অনেক বেশী।

থাকলে অভ্যেস হয়ে যাবে, পিটর বললেন। সে বিষয়ে আমিও একমত। তাই অকারণ বাক্য বিস্তার না ক'রে নির্বাক রইলাম। এখন আমার শোনা প্রয়োজন। কিন্তু পিটর অন্য কথা বললেন, আমার সঙ্গে এস।

আমি অনুসরণ ক'রে গির্জার পেছনে সুন্দর একটা টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ীতে এলাম যার ঢোকবার পথে অতি সুন্দর মরশুমী ফুলের কেয়ারী। টিনগুলোও সুন্দর রঙ করা। অথচ এত সুন্দর বাড়ীটা ওপাশ থেকে দেখাই যাচ্ছিল না। দরজা খোলাই ছিল, ঠেলে ঢুকলাম। ঘরের দরজাও খোলা কিন্তু জনহীন। বড় ঘরটির মাঝখানে নেভা চুল্লি। আগুনের ব্যবস্থা। শীতের দেশে থাকেই। সেই চুল্লি ঘিরে চারপাশে চারটে খাট। একটা খাটে সুন্দর বিছানা পাতা। পাদ্রী বললেন, এই তোমার বিছানা।

এবার ভাল ভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম ঘরটি বেশ বড়। পরিচ্ছন্ন। ভাল লাগার মত, কিন্তু একা! মনের সংশয় কি মুখের ওপর ছায়াপাত ঘটালো? পিটর বললেন, এখানে কোন ভয় নেই। বহু কাল ধরে এটা লোকালয়। তাই এ অঞ্চলে কোন বন্য জন্তু আসে না।

বন্য প্রাণীদের সম্পর্কে ভয় আমার অতীতে কোনকালে ছিল কিনা মনে পড়ে না। বহুকাল ধরে ওদের সঙ্গে বাস ক'রে ওদের চরিত্র তো এখন চিনেই গেছি। জেনেছি অকারণে অন্যের ক্ষতি করার অভ্যেস কোন প্রাণীরই নেই। ফাদারকে আমার জ্ঞানের কথা পরিবেশন না করে বললাম, না ফাদার ভয় পাবার কোন কারণ দেখছি না।

খুব ভাল। তাহলে এখন বিশ্রাম কর। এখানেই তোমার খাবার এসে যাবে।

যাবার সময় পিটর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে গেলেন। আমি বিছানায় বসলাম। এমন একটা সুনির্দিষ্ট শয্যা কতকাল আগে ছেড়ে এসেছি! ধীরে ধীরে সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলেছি। ইচ্ছে ক'রেই আর সেটা ফিরে পেতে চাইনা। এই ভাল। প্রকৃতির দিনরাত্রি আসছে আর যাচ্ছে। বায়ু তরঙ্গ, জল ধারার মত। তাকে সাতটা দিয়ে সপ্তাহ করি বা ত্রিশটা দিয়ে মাস করি অথবা তিনশ পঁয়ষট্টি দিয়ে বছর করি পরিবর্তন কিছুই হয় না, আসলে দিন রাত্রি সেই দিন রাত্রিই। আমার তার হিসেব ক'রে কি প্রয়োজন? নদীতে কত জল গেল, সমুদ্রে কত ঢেউ উঠল পড়ল, শূন্যে বায়ু তরঙ্গের অভিঘাত কত বার সৃষ্টি হচ্ছে এসব হিসেব যেমন রাখতে যাচ্ছি না তেমনি অপ্রয়োজন দিনরাত কতবার এল গেল তার সংখ্যা ধরতে গিয়ে। আমি আর ক'টা দিনকে গুণে রাখতে পারব? কোন অতীতে এর সুরু হয়েছে কোন দূরতম সময় পর্যন্ত এই কালচক্র চলবে সে হিসেব মহাকালই ক'রতে পারে। আমি মানুষ, আমি সেই ভাবনার অঙ্ক কষে মাথা ঘামাতে পারি, জীবনের কিছুটা সময় সেই অংকে কাটিয়ে শ্লাঘা অনুভব ক'রতে পারি, তাতে লাভ হয় না কিছুই।

দিনের প্রচণ্ড সূর্য যে কি শৈত্য থেকে আমাদের রক্ষা ক'রছিল সেটা বুঝলাম বেলা পড়ে আসবার সময়েই। পড়ন্ত বেলায় দুরন্ত শীত যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল সারা জগৎ জুড়ে। জগৎ তো সেইটুকুই যেখানে আমরা থাকি। তীব্র বাতাসের

বেগাড়ুঢ় শৈত্য যেন কোটি সূচীমুখ তীর যা বিশ্ধ ক'রতে লাগল। আমার ঘরের সামনেই দীর্ঘকায় পাইন গাছটি দেখলাম অচঞ্চল। এই তীব্র বাতাসে আমরা যখন কুঁকড়ে যাচ্ছি সে তখনও একই রকম ঋজু, অবিচল। আমি আর বৃক্ষটি ভূমির সমান উচ্চতায় দাঁড়িয়ে নেই। ঢালু পাহাড়ের গায়ে আমার চেয়ে একটু নিচুতে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কত উঁচু। আমি তার উচ্চতার দিকে চেয়ে দেখছি এমনি সময় পিঠে করস্পর্শ পড়ল। একটু চমকেই উঠলাম। চকিতে পেছন ফিরতেই পিটর। সেই মুহূর্তে তাঁর চোখে যেন প্রভু যীশুর দৃষ্টি দেখতে পেলাম। নিমেষ মাত্র স্থায়ী সেই দৃষ্টিভ্রমের পরই ফাদারকে সম্পূর্ণ ক'রে দেখলাম, তখনও মনে হ'ল অনাবিল এক পবিত্রতা তাঁকে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এই যদি অতি সাধারণ এক পাদ্রীর মূর্তি হয় তব সেই মহান মানুষটি কি পরিমাণ জ্যোতিষ্মান ছিলেন! পৃথিবীতে কখনও কখনও ওই পরম পবিত্র মানুষ আত্মশুদ্ধির জন্যে জন্মান। হতে পারেন তাঁরা যীশু, চৈতন্য, বুদ্ধ বা বিবেকানন্দ। তাঁদের নাম হতে পারে সক্রেটিস বা কনফুসিয়াস। পিটর অনেকটা আত্মগত স্বরে বললেন, গাছেদের পবিত্র প্রাণের সামনে দাঁড়িয়ে কি প্রার্থনা ক'রছ?

আমি কিছু ভাববার আগেই আমারই কণ্ঠস্বরে কে যেন আমার ভেতর থেকে বলে ফেলল, আমার তো কোন প্রার্থনা নেই ফাদার!

থাকতেই হবে—শান্ত দৃঢ়তায় পিটর বললেন; খুব শান্ত স্বরে কথা বলছিলেন তিনি, আবার বললেন, প্রার্থনাশূন্য মানুষ নেই।

আমি প্রতিবাদ ক'বলাম না। হয়ত হবে। হতে পারে এটা সত্য যে প্রার্থনা শূন্য মানুষ হয়না। নিজের মনটাকে খুঁজে দেখতে চেষ্টা ক'রলাম। কি প্রার্থনা আমার আছে? কিছুই খুঁজে পেলাম না। তবে কি আমি মানুষ নই? কারণ ফাদার তো ঠিকই বলেছেন অথচ আমি একমাত্র ব্যতিক্রম! তবে কি সত্যিই আমি অন্যকিছু? অন্যই তো। আমি তো একটা পোকা মাত্র। পোকা তো সবাই। কিন্তু আমার তো কিছুমাত্র পার্থক্য নেই অন্যসব পোকামাকড় থেকে।

আমার ভাবনার মধ্যেই স্বপ্নের স্বরের মত গম্ভীর শব্দে বেজে উঠল গির্জার ঘণ্টা। বাজতেই লাগল। পর্বতমালার ওপর দিয়ে আরণ্য পটভূমিকায় অসংখ্য বৃক্ষ শাখার নানা মাপের পাতার জালির সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে সেই শব্দের ধ্বনি বায়ু-মণ্ডলে বাহিত হয়ে চলল অনন্ত শব্দলোকের মহামিলন কেন্দ্রে। ফাদার আমাকে ছেড়ে গির্জার দিকে চলে গেলেন। আমি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে সেই শব্দের বিলীয়মান অনুরণনে কান পেতে রইলাম। আশ্চর্য অনুভূতি আমার বুকের মধ্যে কোথাও যে মন বলে কি একটা আছে সেখানে ছায়া ফেলতে লাগল।

সেই শব্দের পথ ধরেই যেন অন্ধকার নেমে এল। ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার আর শীত যুগ্মভাবে অধিকার ক'রল আমাদের জগৎ। এই সময় আমার কি করা

উচিত ভাবলাম। একবার মনে হ'ল গির্জায় যাই, শুনেছি এই ঘণ্টা ধ্বনি মানুষদের প্রার্থনায় আহবান। ফাদারও তাই গেলেন বোধহয়। গিয়েই দেখা যাক। ভাবলাম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমার মত অধর্মীর যাওয়া হয়ত ঠিক হবে না। ও'রা কিছু মনে ক'রতে পারেন। আবার ভাবলাম ঈশ্বরের উপাসনায় তো সকলেরই অধিকার থাকা উচিত। সেখানে বিভেদ থাকবে কেন? আসলে যে ব্যাপারগুলো নিয়ে জীবনে কোনদিন ভাবি নি সেই প্রশ্নই সামনে এল আজ। যে মানে তারই না ধর্ম! তাহ'লে আমার তো কোন ধর্ম'ই নেই! আমি যদি কোন প্রার্থনায় যাই তো বাধা কি? আসলে গির্জার প্রার্থনার সম্বন্ধে কৌতুহল আমাকে টানছিল।

কাছাকাছি গিয়ে ফাঁকা গবাক্ষ দিয়ে দেখলাম ভেতরে ম্লান আলোয় সারিসারি মানুষের সামনে বেদীর ওপর অনেকগুলো মোমবাতির সামনে বাইবেল থেকে কি একটা অংশ পাঠ ক'রছেন ফাদার পিটার। শ্বেতশুভ্র পোষাকে তাঁকে দেবদূতের মতই দেখাচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথায় এল পোষাক বস্তুটার অসামান্য তাৎপর্য আছে। একই মানুষ যোদ্ধার পোষাক আর পাদ্রীর পোষাকে একেবারেই অন্য হয়ে যায়। তাহ'লে কি পোষাকই ব্যক্তিত্ব? হয়ত কিছুটা। কিছুটা তো নিশ্চয়ই। সিদ্ধান্তগুলো মাথার মধ্যে বয়ে আমি নিজের কামরায় ফিরে এলাম। ওদিকে তখনও কম্পমান ম্লান আলোয় প্রার্থনা চলছে, আমার নির্দিষ্ট ঘরটিতে জ্বলছে একটি আলো। আশ্চর্য তো! কে আলো জ্বেলে গেল? সামান্য সময়ের ব্যবধানে ফিরে এসেছি এরই মধ্যে কেউ জ্বেলে গেছে। কি সুন্দর ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কাজ ক'রে যাচ্ছে প্রত্যেকেই নিঃশব্দে। যাক যেই আলো দিয়ে থাকুক সে তার কাজ ক'রেছে, ঘরে ফিরে বেঁচেছি আমি। বাইরের তীব্র বাতাস থেকে তো রক্ষা পাওয়া গেছে!

কিছু কাজ নেই বলেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। টিনের চালে আলোর প্রতিচ্ছায়া কাঁপছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ভাবনার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমার কি ভূমিকা হবে এখানে? আমার জন্যে তো কেউ অপেক্ষা ক'রে নেই! আমার জন্যে নির্ধারিত নেই কোন কাজও। তাছাড়া এই অতি সুশৃঙ্খল জীবনের যে পরিচয় আজ এই সামান্য সময়েই পেলাম সেখানে আমি বেমানান। জীবনের অন্য প্রান্তে আমার অবস্থান, সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু। সেখান থেকে এপ্রান্তে আসা সম্ভব দৈবাৎই হয়। আমার এই ফিরে আসাটাও একটা দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলতে একে আমার ইচ্ছে ক'রছে না এই জন্যে যে এমন আকস্মিকতা দুর্ঘটনা ছাড়া হতে পারে না। চিৎ হয়ে শুয়ে আছি বলে টিনের চালের নিচেতে চোখ পড়ছে। সেখানে আলোর শিখার প্রতিচ্ছায়া কাঁপছে। কিছু কাজ নেই বলে কিছুক্ষণ শুধু সেই আলোর কাঁপনই দেখলাম। বাইরে শব্দ করে আপন অস্তিত্বকে জাহির ক'রছে তীব্রবেগ বাতাস। কিন্তু আশ্চর্য

আরামে আমি সুখ শয্যায় শুয়ে আছি। এ যে কত কাল পরে কে জানে। কিন্তু এই রাত তো আর নিরবচ্ছিন্ন হবে না? কাল সকালে আমার ভূমিকাটা কি হবে? আমি কি কাজে লাগব? কোন কাজে না লাগতে পারলে এই আশ্রয় আমার তো থাকবে না? এ তো এমন কোন পিলখানা নয় যেখানে অপ্রয়োজনীয় ষাঁড় শুধু আশ্রয় নিয়েই ধন্য ক'রবে আশ্রয়দাতাদের! এখানে নিশ্চয়ই থাকবে কর্মভার। তা বইতেও হবে। কি কাজ আমাকে দেওয়া হবে? কোন কাজের উপযুক্ত বা আমি? জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার পর মনে পড়ল যে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ করা হয়নি, এমন জায়গায় থেমে আছে যে তাকে কাজে লাগাবার অধিকার হয়নি অর্জন করা। যেটুকু শিক্ষা ছিল তাও বহুকাল চর্চার অভাবে বিস্মৃতিতেই বোধকরি চ'লে গেছে।

একসময় নিজেরই সম্বিত ফিরল আমি কি তবে পশ্চাত্তাপে ভুগছি? এ তো দুর্লক্ষণ! এই সুখের ফল? সচেতন হয়ে উঠলাম। জীবনে অনুতাপ অর্থহীন। অনুশোচনার চেয়ে অপরাধ আর নেই। মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে হু হু ক'রছে বাতাস। নিজেকে চাঙ্গা করবার জন্যে এখন তারই মধ্যে গিয়ে পড়া প্রয়োজন। আঘাত মানুষকে চাঙ্গা করে। দরজা খোলা মাত্র এক ঝলক তীব্রবেগ বাতাস এক ঝাঁক তীরের মত বিদ্ধ ক'রল আমাকে। বাইরে মনে হ'ল বাতাসের একটা রঙ দেখা যাচ্ছে, সাদা। তবে কি এখানে সাদা রঙের বাতাস বয়? এ কী? না কি কোন ছায়া? কার বা কিসের এমন শূন্যময় ছায়া হ'তে পারে? ছায়াপথ বলে মহাশূন্যে কি একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার যেন আছে সেটাই কি নেমে এল এই পর্বতলোকের মাথায়, মাটির কাছাকাছি? এ যেন অনেকটা সেই রকমই। কিন্তু ছায়ার কি কোন শব্দ থাকে? কিছু একটা অস্ফুট শব্দ যেন আমার টিনের ঘরের চারপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে! আমি আবাল্য শরীরে বিশ্বাস ক'রে এসেছি, অশরীরী কোন অস্তিত্বে বিশ্বাস করবার সুযোগ আমার ছিল না। বাড়ীতে ঠাকুমা দিদিমার কেউ একজন থাকলে অনেক অশরীরীর আবির্ভাব তাঁদের কথা বেয়ে ঘটে থাকে। আমাদের বাড়ীতে সে সুযোগ তারা পায় নি। বাবা কঠোর প্রকৃতির মানুষ বলে স্বগৃহে কুখ্যাত এবং প্রতিবেশী মহলে বিখ্যাত ছিলেন। সেই মানসিক এবং দৈহিক শক্তির উত্তরাধিকারে আমি ধনী ছিলাম বলেই বোধহয় প্রবল শীতের পরাক্রমকে উপেক্ষা ক'রেই বেরিয়ে এলাম।

বাইরে শুধু গভীর কালো অন্ধকার। চারিধারে নিঝুম মহীরুহে নিস্তব্ধ অরণ্য। তার মধ্যে টানা একটা তীক্ষ্ম শব্দে আকাশ দীর্ণ হচ্ছে। কোন ইঞ্জিন যেন একটানা শব্দ ক'রে যাচ্ছে। বিচিত্র যান্ত্রিক শিসের মত শব্দ ক'রে চলেছে কোন অদৃশ্য পোকা। শব্দটা চেনা তবে এত ঘুরেও এর উৎস আমি পাই নি।

কোনদিন দেখতে পাইনি কোন প্রাণী কিভাবে এই শব্দ করে। এখানে শিয়ালের ডাক শোনা গেল না। এদেশে নিশ্চয় শিয়াল নেই। মনে পড়ল আমাদের কাছাকাছি গ্রাম মাতুয়াঁতে একবার গিয়েছিলাম এক বিয়েতে। সারারাত যখনই জেগেছি শিয়ালের ডাক শুনেছি। ও সে কি ডাক! অসংখ্য শিয়াল যেন রাত ভোর গ্রাম পাহারা দিচ্ছিল।

কনকনে ঠাণ্ডা আমাকে অন্যদিকে মন রাখতে দিচ্ছিল না। কী তীব্র বাতাস! যেন ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। অমানুষিক শক্তি না থাকলে এখানে দাঁড়ানো অসম্ভব। আমি আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে আমার রাতের খাবার এনে মাঝখানকার টেবিলটার ওপর রাখল। আমি অবাক হলাম সে কোন অশরীরী কিনা তাই ভেবে, কারণ চারপাশের অসীম শূন্যতার মধ্যে আমি তো কোন মানুষের চিহ্ন দেখলাম না, অথচ এ এল কোথা থেকে? আমি জানি এদের ভাষা আমার অজ্ঞাত, তাই কোন কথা বলার চেষ্টা ক'রলাম না, সৌজন্যের জন্যেও না। মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখলাম মেয়েটি শীর্ণকায়, খর্বাকৃতি এবং মুখ আদৌ সুশ্রী নয়। এখানে যাদের অহরহ দেখছি তাদের মধ্যে একান্তই ব্যতিক্রম। কপালটাও সামান্য উঁচু, দাঁতের পাটি জোড়াও একটু সামনে এগোনো। এক ঝলক দেখার মধ্যেই সপ্রতিভ মেয়েটি মিলিয়ে গেল।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি টেবিলের ওপর যেখানে আমার ভোজনপাত্র ছিল, অদৃশ্য। সুন্দর এক গোছা সাদা ফুল একটা কাঠের পাত্রে সেখানটিতে বসানো। ঘুম ভেঙ্গেই এমন সুন্দর চমকে ভালই লাগল। উঠে ফুলগুলোকে তুলে নাকের কাছে এনে টের পেলাম রাতে এর গায়ে কিছু সুঘ্রাণ লেগে ছিল যা বাতাসে মিলিয়ে গেলেও স্মৃতির মত রয়ে গেছে তার রেশ। এ তো নিত্যনিয়মের অভ্যাসগত পুষ্প রচনা নয়! তাহ'লে তো এ ক'দিনও দেখতাম। তা ছাড়া আমি এমন কোন মান্য অতিথি নই যে ফাদার এ নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। আমি রবাহূত আশ্রয় প্রার্থী, আমার জন্যে এখানকার নিত্য ব্যবস্থার বাইরে কিছু অসম্ভব! বরং সম্ভব তার মধ্যে থেকেও কিছু খর্ব করা। তাই এই ফুলরচনায় আছে বিশেষত্বের ইঙ্গিত। এ নিশ্চয় কারও ব্যক্তিগত দান, মনোগত অবদান। কে সে? আমার প্রতি অনুকম্পার কি বা কারণ? সকাল বেলাতেই ভাবনাটা মাথায় চড়ে বসল। যাকে জানিনা, চিনিনা চোখে যাকে দেখি নি তার এমন অনুকম্পার কি কারণ? অকস্মাৎ আমার মনে হ'ল নিশ্চয় আজ এমন বিশেষ কেউ আসবে যার জন্যে এই আয়োজন। শয্যা তো ঘরে একটি মাত্র নয়? আমার এখনই বিছানা ছাড়া উচিত। এমনও তো হ'তে পারে এখনই কেউ আসবে!

শীতে আমি অভ্যস্ত। তবু এখানকার ঠাণ্ডা এমনই তীব্র যে আমার প্রতিরোধের যতটুকু আয়োজন ছিল সব ব্যবহার ক'রেও মনে হ'ল যথেষ্ট হয়নি। ঘর

থেকে বেরোতে যাব পাদ্রী পিটার আবির্ভূত হলেন। আমি ও'কে স্বাগত জানালাম উনিও বললেন, সুপ্রভাত। কুয়াশা থাকলেও সকাল সকালই, আচ্ছন্ন সূর্যের স্পর্শে সে প্রাণময়। সেই আলোর লগ্নে ফাদারকে দেখে আমার কেমন বিভ্রম হ'ল। ফাদারের বহুবার দেখা মুখমণ্ডলে অন্য এক উজ্জ্বলতা যেন প্রত্যক্ষ ক'রলাম। প্রশান্ত সেই উজ্জ্বলতা আমাকে একটা সদ্যফোটা ফুলের স্মৃতি এনে দিল। মনে হ'ল মানুষের মুখে এমন পবিত্রতা আমি জীবনেও দেখিনি। আর কি এক ভাবাবেশে বোধহয় অনিমেষ চোখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম যার জন্যে উনি আমাকে সস্নেহ স্বরে ডাকলেন, বৎস, রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো ?

খুবই সুন্দর—জানালাম। উনি বললেন, কাল রাত্রে খুবই ঠাণ্ডা ছিল। মনে হচ্ছে এই আবহাওয়া আজ থাকবে। বাইরে ঝোড়ো বাতাস বয়েছে সমস্ত রাত।

উনি যখন কথা বলছিলেন আমি ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে বয়েস অনুমান করবার চেষ্টা ক'রছিলাম। মুখের ছবি দেখে বোঝাই যাচ্ছে না কত হবেন। ষাট কি পঞ্চাশ কিংবা বেশী আমার অনুমান যে কোন মিটারের কাঁটার মত অনবরত এপাশ ওপাশ ক'রতে লাগল। ফাদার একটা কম্বল এনেছিলেন। বিদেশী কম্বল। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কাছে তো কোন দেবার মত ওভারকোট নেই, তুমি বাইরে বেরোবার সময় এটা গায়ে দিয়ে নিয়ো।

আমি একটা মোটা ওভারকোট অনেকদিন আগেই সংগ্রহ ক'রেছিলাম। বহু অপব্যবহারে সেটি জীর্ণ হয়ে গেছে তবু কাজ চলে যাচ্ছে। তাই জানালাম। উনি সেকথায় কান না দিয়ে বললেন, এটা ব্যবহার কর। আমার অতিরিক্ত।

তাঁর আন্তরিক দান হাত বাড়িয়ে গ্রহণ ক'রলাম। ফাদার যেন খুশি হয়ে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, এখন তো উপাসনার সময় হয়ে গেল, চলি।

একদিন ভোরে হঠাৎ ডেভিড এসে ঢুকল। ডেভিডের মুখে প্রাথমিক হাসিটুকু যেন লেগেই থাকে। সেই হাসি সহ ঢুকেই তার আপন ইংরাজীতে বলল, হেই। এখনও তুমি ঘুমোচ্ছ ? আমি দেখ দুটো পাহাড় পার হয়ে এলাম।

হঠাৎ ? আমিও হেসে তার কথার জবাব দিলাম, হঠাৎ তুমি এই দারুণ শীতের সকালে পাহাড় পার হতে গেলে কেন ?

তুমি বুঝি জান না আমি কাল বিকালে আমার বাড়ীতে চলে গিয়েছিলাম ?

ব্যাপারটা যেন আমার জানা উচিত ছিল এমনি নিশ্চিন্ততায় ও কথাগুলো বলল। ও যেহেতু ভ্যানগাড়ী চালায় আমি তাই স্বাভাবিক ভাবে বললাম, তুমি গাড়ী নিয়ে কত শো পাহাড় পার হচ্ছো দুটো পাহাড় পার হতে আর কি ? তোমার গাড়ী কোথায় ?

আবার আপন আনন্দেই একচোট হাসল ডেভিড, সেভাবেই বলল, তুমি জাননা গাড়ী তো এখন সাইনো চালাচ্ছে !

কে সাইনো আর গাড়ীটায় কার যে কি ভূমিকা আমি কিছুই জানি না। যে দিন আসি ডেভিডই ডিমাপুর থেকে আমাদের গাড়ী চালিয়ে এনেছিল। তাই জানি ওই বুঝি গাড়ীটা চালায়। আমি জানতে চাইলাম, কেন, তুমি ?

আমার প্রশ্ন হয়ত কিছু না বুঝেই সে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। অথবা আমিই তার হাসির কারণ বুঝলাম না। হাসতে হাসতেই সে ইসারায় আমার কাছে সিগারেট চাইল। সিগারেট কিনে পকেটে রাখবার মত আর্থিক সামর্থ আমার নেই বলে ধূমপানের অভ্যাসটাই আমার গড়ে ওঠে নি; ওকে আর অত কথা না বলে শুধু জানালাম, নেই। আমার এই নেই ইসারাতেও সে অমনি অমায়িক ভাবে হাসতে লাগল। ওর কোন কাজের এবং কথারই সামঞ্জস্য নেই, আমাকে হঠাৎ বলল, প্রার্থনার সময় হয়েছে চল।

কিসের প্রার্থনা বা কিসের জন্যে কার কাছে কিভাবে প্রার্থনা আমার তো জানা নেই ? কথাটা নিজের মনেই বললাম, প্রকাশ্যে বললাম, তুমি যাচ্ছ ? এগোও আমি হাতের কাজ গুলো সারছি।—এ যে আমার এড়িয়ে যাবার কথা তা মনেও ক'রল না ডেভিড, যেমন প্রসন্ন মুখে এসেছিল তেমনি ভাবেই চলে গেল। আমি দেখলাম সমস্ত এলাকাটা ফাঁকা। এই সময় এটাই স্বাভাবিক। সবাই এখন উপাসনা গৃহে গিয়ে সমবেত হয়েছে, আমিই একা পড়ে আছি যে ঈশ্বরের বরপুত্রে শরণাগত নই।

এক ঝাঁক হাঁসের মধ্যে আমি একটা বক। আমার সম্পর্কে ফাদার কি ভাবছেন কে জানে, অস্বস্তিতে ভুগছি এখন আমি নিজে। এই অস্বস্তি থেকে বাঁচতে হ'লে আমাকেও উপাসনা কক্ষে গিয়ে বসে থাকতে হবে এক কোণে। তাতে যদি সবাই সন্তুষ্ট হয় তাহ'লে না হয় গেলাম, ক্ষতি কি ? পাদ্রী সাহেবকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে নিতে হবে আমি যেতে পারি কি না ? উনি যদি বলেন তো যাব। যাব আরও ওই মেয়েটির জন্যে, একটু বেঁটে হলেও চোখে পড়বার মতই বটে মেয়েটি। সুস্বাস্থ্যে টইটম্বুর ভরাট চেহারা। গালদুটো গোলাপী আভাযুক্ত। গির্জার আশে পাশেই কোথাও বোধহয় থাকে, কারণ মাঝে মাঝেই গির্জাতে ঘোরাঘুরি ক'রতে দেখি। আরও দু একটা মেয়েকে সঙ্গে করে আসে। গির্জার কোন কাজ কখনও করেনা কিন্তু সব কাজেই থাকে। এখানে কি মেয়ে কি পুরুষ সকলেই স্বাস্থ্যবান যার জন্যে মুখশ্রী যাই হোক না সুন্দর দেখায়। তাদের মধ্যে ঐ মেয়েটির আবার যেন একটু বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের কারণ নিয়ে আমি কখনই মাথা ঘামাইনি, ভাল লাগে বলে কেবল লক্ষ ক'রেছি। আমার ভাল লাগা আর দশটা পোকামাকড়ের মতই তাৎক্ষণিক। যে মুহূর্তে নজরে এল ভাল লাগলেও তারপর আর কোন অনুস্মরণ থাকে না। যে সময়ের ভাল লাগা তখনই শেষ হয়ে যায়। কাজেই মেয়েটিকে সব সময় মনে থাকে না।

ডেভিডের আহবানে মনে এল বলেই উপাসনা ঘরে গেলাম। আমি যখন গেলাম

তখন প্রার্থনা সুরু হয়ে গেছে। ফাদার তাঁর বিশাল জোব্বাটা গায়ে দিয়ে একাগ্র চিত্তে বাইবেল থেকে কোন একটা অধ্যায় যেন পড়ছেন। আমি ঘরে ঢুকতে গিয়েও সাহস ক'রলাম না। ভগবান নাকি পাপীদের তাঁর কাছে ডেকেছেন, কাছে গেলে তিনি পাপ থেকে মুক্তি দেবেন। কিন্তু কোন পোকামাকড় তো সেখানে পেঁছায় না! কেন যাব? আমি তো পাপীও না পুণ্যবানও না, ভগবানের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আমি আমার মত, আরও অসংখ্য কোটি কোটি পোকামাকড় বা প্রাকৃতিক প্রাণীর মত। পাপপুণ্যের বাইরে। আমি উপাসনা ঘরে ঢুকব কেন? পেছনের দরজা থেকে পেছিয়ে এলাম। ভেতরে সারবন্দী হয়ে ডেভিডরা সবাই, এখান থেকে একঝলক দেখায় কাউকেই আর আলাদা ক'রে চেনা যায় না। হঠাৎ মনে হ'ল ওরা কি জন্যে এখানে এসেছে? কি চায়? না এলেই বা কি হ'ত? আমি তো কোনদিন কোন উপাসনালয়ে যাইনি তাতেই বা কি ক্ষতি হয়েছে আমার? কোন জিনিষটা না পাওয়া রয়েছে? কি যেন দেবার কথা রয়েছে? মুক্তি। সেটা কি? কেমন তার আকার, অথবা স্বাদ? বন্ধনই বা কোথায় আর মুক্তিই বা কি?

উপাসনা গৃহের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পাশের দরজাগুলো খোলা। সেই দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সকলেই সামনে এক একখানা বই খুলে নিবিষ্ট হয়ে আছে। গভীর অভিনিবেশ দেখে নিজের কেমন লজ্জা লাগল, সরে এলাম। সকলের একাগ্রতার মধ্যে আমিই একমাত্র ব্যতিক্রম, ভাল লাগল না। যাক ওরা ওদের মত ব্যস্ত থাক, অটুট থাক ওদের একাগ্রতা আমি বরং ততক্ষণ বিশ্বপ্রকৃতির সেবা করি। ফাদার কয়েকটি ফুলের গাছ লাগিয়েছেন অতি আগ্রহে, আমি তার পরিচর্যায় আত্ম নিয়োগ ক'রলাম। বহুকাল আগে অলকনন্দা একটা কবিতা শুনিয়েছিল, তার একটা মাত্র লাইন এখন অকস্মাৎ মনে এল, 'ফুল ফুটবেই জানি মরা গাছে তাই জল ঢালি।' আর মনে নেই, থাকার দরকারও নেই। এই টুকুই অনেক। কিন্তু হঠাৎ আমার কবিতার পংক্তি মনে এল কেন? কি দরকার ছিল? এই অঘটনের জন্যে যেন বিরক্ত হ'লাম। এখানে ওর কি প্রয়োজন ছিল? বহুকাল আগে যাদের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে এসেছি তাদের কেউ আসা এখন প্রকৃতই বিরক্তিকর। সেই রকম অবাঞ্ছিত মনে হ'ল কবিতার পংক্তিটিকে।

ইতিমধ্যে প্রার্থনা উপাসনা শেষ হয়ে যাওয়াতে সকলে গির্জা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল, এল ডেভিড এবং সেই মেয়েটিও। মেয়েটি একজন বান্ধবীর সঙ্গে হাসতে হাসতে আসছে। আমার মাথায় কেমন বুদ্ধি খেলে গেল, আমি একটি ফুল ছিঁড়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে ওর দিকে এগিয়ে ধরতেই ও নিয়ে নিল। ওর এই গ্রহণ করাকে আমি চরিতার্থতা বলে কেন যে মনে ক'রলাম আর কেনই বা ওকে ফুল দিতে গেলাম তাৎক্ষণিক অনুচিন্তায় পেলাম না তার কোনই সদুত্তর।...

নিজের এই কাজকে নেহাৎ মূর্খামী বলে বোধ হ'তেই নিজেকে কেমন হেয় মনে হ'তে লাগল। মেয়েটি ফুলটার সঙ্গে রহস্যময় এক চিলতে হাসির বিনিময় ক'রে আপন পথে চলে যেতেই দেখলাম আমার পেছন দিক থেকে ডেভিড এসে আমার পিঠে হাত রাখল। তার মুখের সেই চিরকালীন হাসিটুকুকে এখন যেন আমার জটিল মনে হ'ল, ওই হাসি দিয়ে ও যেন আমার পুষ্পপ্রদানকে বিদ্রূপ ক'রছে। ওর মনোভাবকে আক্রমণ করবার জন্যেই যেন প্রশ্ন ক'রলাম, ঐ মেয়েদুটিকে চেন ?

যাকে তুমি ফুল দিলে সে আমার আগের স্ত্রীর মেয়ে, নাম থারমিলা অন্য মেয়েটির নাম সিরিন।

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, আগের স্ত্রীর মেয়ে মানে ? তোমার মেয়ে ?

না। আমার আগের স্ত্রীর আগেরপক্ষের মেয়ে। ওর দাবা মারা যাবার পর আমি ওর মাকে বিয়ে করেছিলাম।

তারপর ?

বউটার বযেস অনেক বেশী ছিল, বুড়ি হয়ে গেল তাই ছেড়ে দিলাম।

বাঃ—শব্দটা আমি আপন মাতৃভাষাতে উচ্চারণ করতে ডেভিড তাৎপর্য বুঝল না। তার কোন ভাবান্তরও হ'ল না। মেয়েটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিল, এই অঞ্চলে ঐ বয়সের অবিবাহিত মেয়ে দেখাই যায় না, এর যে বিয়ে কেন হয় নি জানবার কথা ভেবেও ইচ্ছা দমন ক'রলাম। এমনিতে ডেভিড খুবই সরল প্রকৃতির, প্রশ্ন করলেই উত্তর দেবে কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে ওর যা সম্পর্ক শুনলাম তাতে এরকম কোন প্রশ্ন ক'রতে আমার সৌজন্যবোধে বাধল। ইচ্ছে জমা রইল যা জানবার আমি নিজেই জেনে নেব।

ক'দিন বাদে একদিন সে সুযোগ মিলেও গেল। আমাদের বসতির থেকে কিছুটা দূরে একটা ঝর্ণা আছে, যার স্নান করবার ইচ্ছা হয় সেখানে যায়, অনেকেই যায় জল নিতে। এখানে বারমাস ঠান্ডা থাকে বলে স্নান কম লোকেই করে, আমি মাঝে মাঝে করি। তবে এখানে স্নান মানে প্রত্যেকেরই কাক স্নান, উষ্ণ অঞ্চলে যেমন অবগাহন অথবা কলের অবিরত জলের ধারার নিচে দাঁড়িয়ে যেমন অঝোরে ভেজা, সে রেওয়াজ এখানে নেই। তাই আমি যখন ঝর্ণার পাশে বসে শীতের প্রকোপ কাটিয়ে জামাকাপড় ছাড়ছি এমন সময় থারমিলার আবির্ভাব ঘটল। ও কখনই একা চলাচল করে না বলে সঙ্গে সিরিন নয় অন্য একটি মেয়ে। আমি ওকে ডেকে উঠলাম, হেই ! থারমিলা !

নাম ধরে ডাকতেই ও হাসল। কিন্তু তার বেশী আর আগ্রহ দেখাল না। আমার থেকে অল্প দূরে কিছুটা অসুবিধে ক'রেই জল ভরবার জন্যে এগোতে চেষ্টা ক'রল। সকলে সাধারণত যে স্থান ব্যবহার করে আমি সেই সুগম জায়গাটা জুড়ে বসে আছি দেখেই ওদের ওই দুর্গমতা বেছে নেওয়া, আমি কিছুটা ইশারায় কিছুটা

ইংরিজীতে বললাম, এখানে এস না। এখান থেকে জল ভরো।

ওরা আমার কথা অগ্রাহ্য ক'রতে, আমি উঠে ওদের কাছে গিয়ে বললাম, তুমি পড়ে যাবে।—বলেই লোভ সম্বরণ করতে না পেরে ওর পুরুষ্ট হাতের কব্জি খপ ক'রে ধরে ফেললাম। অমন একটা ভরাট হাতের স্পর্শ বেশ লাগল আমার, থারমিলা মুখে কিছু বলল না কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গিনীটি না থাকলে আমার লালসা কতদূর যেত জানিনা তবে মুঠো আলগা ক'রেও মনের কাছ থেকে মুক্তি পেলাম না। ওর শরীর আমাকে তীব্র ভাবে আকর্ষণ ক'রতে লাগল। থারমিলা এবং ওর সঙ্গিনী আঘাটেই জল নিয়ে ফিরে গেল, আমি যেন অবসন্ন হয়ে পড়লাম।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় ঘরের বাইরে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছে বলে সমস্ত অঞ্চল জুড়ে এক প্রবল শৈত্য প্রবাহে অস্বাভাবিক হয়ে উঠল পরিবেশ। তা থেকে বাঁচতে যে যার ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে আত্মরক্ষা ক'রছে, ক'রছি আমিও, এমন সময় দরজায় আস্তে অথচ বেগে করাঘাত হতে লাগল। এই দুঃসময়ে আমার ঘরে আসবার মত প্রযোজন তো কারও হবার কথা নয়! তবে কে হবে? কে হ'তে পারে? চট ক'রে মনে হ'ল থারমিলা নয় তো? প্রবল ঝড়ো বাতাসের মত একটা অনুকূল সম্ভাবনা বয়ে গেল মনের মধ্যে দিয়ে। হতেও তো পারে! ওরও তো আগ্রহ থাকতে পারে আমার প্রতি, অথবা কৌতূহল! উঠে দরজা খুলে দেখলাম আপাদমস্তক কম্বলে মোড়া এক রমনী। না, সুদর্শনা থারমিলা নয় রীতিমত কুৎসিত সেই মেয়েটি যে আমার ঘরের টুকিটাকি কাজ ক'রে দেয় ফাদারের পাকাপাকি নির্দেশে। কৃশকায় খর্বাকৃতি মহিলা। থারমিলাও দীর্ঘা নয় কিন্তু পূর্ণা। স্বাস্থ্যবতী। মুখশ্রীময়ী। তার আগমনে যে সময়টা সুসময় হয়ে উঠতে পারত এই মেয়েটির আসায় তা আরও বিরস করে তুলল—এই অসময়ে এ এসেছে কেন?

আমাকে কোন প্রশ্নের প্রতিবোধের সুযোগ না দিয়ে মেয়েটি যেন ঠেলেই ঢুকে পড়ল। বাইরেব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে আমিও তাড়াতাড়ি ঘন কুয়াশার মত বায়ু প্রবাহকে ঢুকতে না দিতে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু আমার বিরক্তি যা কেবল চোখেমুখেই ফুটে ওঠা স্বাভাবিক ছিল তা ব্যবহারেও ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করবার আগেই মেয়েটি সম্পূর্ণ বিনা ভূমিকাতে বলল, তুমি তো একজন বিদেশী।

বিরক্ত আমি মনে মনে বললাম, এ তো সবাই জানে। কি এমন নতুন কথা হ'ল! আমার সেই নীরব বিরক্ত ভ্রূকুটির সামনেই সে বলল, তুমি একটা নাগা মেয়ের গায়ে হাত দিতে গেলে কেন?

নিমেষে আমার বিরক্তি বিস্ময়ে এসে গেল। আর সেই বিস্ময়ের ওপর ও আবার আঘাত ক'রল, তুমি যে মেয়েটিকে ফুল দিয়েছিলে আজ আবার তার গায়ে হাত দিয়েছ! ফুল যেদিন দিয়েছিলে সেদিনই তোমার ওপর লালখোমাং অসন্তুষ্ট

হয়েছিল। কিন্তু আর কেউ তাকে বেশী সঙ্গ দেয়নি। আজ তুমি গায়ে হাত দেওয়াতে সবাই ক্ষেপে গেছে। মেয়েটির সঙ্গে যে ছিল সেই সকলকে বলে দিতে থারমিলাও স্বীকার ক'রেছে নইলে ওকেও কেটে ফেলত।

কেটে ফেলত! আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

হ্যাঁ। আজ স্থির হয়েছে তোমাকেই কাটবে।

কাটবে!

হ্যাঁ।

আজ রাত্রে কিছু বলবে না, কালই লালখোমাৎ নিজে হাতে তোমাকে খুন ক'রবে। বসতির সবাই ওর পক্ষে রায় দিয়েছে, গাঁওবুড়া নিজেও। এখন তোমাকে ফাদারও বাঁচাতে যাবে না, পেরেও উঠবে না।

কেন?

এখানে এই নিয়ম। লালখোমাৎ থারমিলাকে বিয়ে ক'রবে ঠিক করা আছে। তুমি সেই মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছ কেন?

এতক্ষণে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হ'ল। এ আবার এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল? বিয়ের কথা আছে বিয়ে ক'রবে! বিয়ে মানে তো একক অধিকার। আমি যখন জেনেই গেলাম নিশ্চয় সে অধিকারে ভাগ চাইব না যদি থারমিলাও সেই অনন্যতা স্বীকার করে। তবে আর কিসের অশান্তি? তাছাড়া শরীরে যখন কোনই দাগ লাগে না তখন শরীর ছুঁলে কি এমন ক্ষতি হয় বুঝি না। অবশ্য হ্যাঁ ইচ্ছার বিরুদ্ধে শরীর ছুঁলে নিশ্চয় দোষ, নইলে দোষের কি আছে? থারমিলা নিজে যদি নালিশ ক'রত তাহ'লে আমার অন্যায় মনে ক'রতাম, তা যখন করে নি তখন বলার কিছু থাকতে পারে না! এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে জানতে চাইলাম, থারমিলা কি নালিশ ক'রেছে?

অত জানি না, কেবল এটা নিশ্চিত যে তোমাকে ওরা ছাড়বে না। তুমি পালাও।

পালাব! নিজের মনকেই যেন প্রশ্ন ক'রলাম কেন পালাব? এ মেয়েটি যে সত্যি কথা বলছে তার ঠিক কি?

আমার মুখ দেখে মেয়েটি কি অনুমান ক'রল সে-ই জানে, তার এবারকার কথায় গভীর আবেদন ফুটে উঠল, দেখ বিদেশী আমি এদের দেশের মানুষ নই, কিন্তু এদের নিয়ম কানুন ভাল করেই জানি। তোমাকে যদি ওরা মেরে ফেলে তাহ'লে ফাদারও খুব অসুবিধেয় পড়বেন। তুমি নিশ্চয় ওঁকে অসুবিধেয় ফেলতে চাও না!

আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওর চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। নেহাৎ ওর কথার

পরিপ্রেক্ষিতেই যেন জানতে চাইলাম, তোমার নাম কি ?

এতদিন আছ আমার নাম জান না ? জারোমথাঙ্গি।

তবে তো তুমি মিজো।

সেইজন্যেই তো বলছি—বলেই গভীর আবেগে ও আমাকে বলে বসল, ভগবান মেরী মাতার শপথ তুমি অবশ্যই চলে যাও।

ওর শপথ আমাকে কোন প্রভাবিত ক'রতে না পারলেও আন্তরিকতা ক'রল। আমি সামান্য বিচলিত বোধ ক'রলাম। ওর এত অনুরোধের কি কারণ থাকতে পারে ? আমার যদি কিছু ক্ষতিই হয় তো ওর কি ? ও কেন এমন বিচলিত হচ্ছে ? প্রশ্নটা না ক'রে পারলাম না। শুনে ও বলল, তোমাকে আমার খুব খারাপ বলে কখনও মনে হয় মনে হয় নি ! তোমার ক্ষতি হোক আমি চাই না।

কেন চাও না ?

এবার জারোমথাঙ্গি যেন কিছু গোপন ক'রতে চাইল, বলল, তা জানি না।

তুমি কি করে জানলে যে ওরা এই মতলব ক'রেছে ?

জারোমথাঙ্গি দৃঢ়ভাবে জানাল, আমি নিজে শুনেছি। লালখোমাঙ তো আজই তোমাকে খুন ক'রতে চেয়েছিল সেমা আটকে রেখেছে। রাতটুকু তোমাকে ছেড়ে রাখবে কাল কোন না কোনভাবে মারবেই।

কোথায় শুনলে ?

ঐনী বলে যে মেয়েটা আছে চেন ? ওরাই বলাবলি ক'রছিল।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে ওকে বিশ্বাস করবার অবস্থায় এলাম। যে কোন কারণে মেয়েটি যে আমার প্রতি করুণা প্রবণ একথা আগেও বুঝেছিলাম। এতদিন অলক্ষ্যে থেকে যে মমতা এসে বর্ষাতো এখন সেই মমতার প্রত্যক্ষ স্বরূপ মূর্ত হ'ল আমার সামনে। আমি ওকে অস্বীকার ক'রতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত এইখানে। এবং জারোমথাঙ্গিরই সঙ্গে। এ যেন অনেকটা আত্মসমর্পণ। অনেকটা কেন, যথার্থই তাই। তারই ইচ্ছাতে তার দেখানো পথেই আসা। আসবার সময় সারাটা পথ চিন্তামাত্র হয়নি। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি মনের মধ্যে এ জিজ্ঞাসাও নয়। এমন প্রশ্ন আগেও কখনো আসেনি, নিশ্চিন্তে পথের ওপর নির্ভর ক'রে থাকি। যেদিকে পথ যায় যাব। আত্মসমর্পণ তো একেই বলে ! আগে থেকেই তাহ'লে ক'রে আছি, এখন এই জারোমথাঙ্গির কাছে। কিংবা তার ইচ্ছার কাছে। লোকালয় মানেও বন, বনের ফাঁকে ফাঁকে বসত, আর পথ তো বিজুবন। সেই যে কবে লোকালয় ছেড়েছিলাম তারপর মানুষ দেখা বন্ধ। দু একটা ছোট বসতি যদিবা পথে পড়েছে জারোমথাঙ্গিই তা এড়িয়ে

যাবার চেষ্টা ক'রেছে যত্ন ক'রে। আমি শুধু বিস্মিত বিশ্বাসে করেছি ওর অনুগমন। সবই যেন ওর চেনা পথ, বহুদিনের জানা। অবিচ্ছিন্ন পাহাড়ে কোনটার কোন পাশ দিয়ে যাব, কোনটা পথ আর বিপথ কোন দিকটা, সে বোধহয় একমাত্র জারোমথাঙ্গিই জানে। আর ওর এই জানা দেখে তো আমার সংশয় হচ্ছে মাঝে মাঝে। ও কি মানবী না মায়াবী? শোনা ছিল এদিকে, এই পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে এমন নারীকুলের বসতি আছে যারা মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখে। তাদেরই কেউ নাকি এই মেয়ে? এতকাল বাদে আমার একটা আয়নার অভাব মনে এল। থাকলে দেখতাম সত্যিই আমি ভেড়া বা তেমনি কোন তৃণভোজী প্রাণী হয়ে গেছি কিনা। আমি কি এখনও সেই আমি আছি, হাত পা মুখ সমেত যেমন আমি ছিলাম?

অথচ জারোমথাঙ্গিকে কবে যে প্রথম দেখেছিলাম সে কথাই জানি না। কারণ দেখে নজর পড়বার মত বিশেষত্ব ওর চেহারায় নেই। বরং অন্য মেয়েদের তুলনায় নিষ্প্রভ, দীন চেহারা মেয়েটির। বিশেষত্ব যদি কিছু থেকে থাকে তো সেটা তুলনামূলক কুশ্রীতা। ওর মত কপাল উঁচু ভাঙ্গাচোয়াল কৃশ মেয়ে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। এই পার্থক্যটাও বুঝছি এখন। অতি অবহেলায় ওকে সাধারণ পরিচারিকার মত দেখতাম বলে কখনও ওর দিকে তাকিয়েও দেখিনি, বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া তো দূরের কথা। গির্জার চৌহদ্দির মধ্যে অমন মেয়ে তো অনেক ক'টিই ছিল যারা প্রাত্যহিক কাজ কর্মের সঙ্গে জড়িত। তাদের দু একজনের দিকে একাধিকবার তাকিয়েছি, আমার আগ্রহে তো বটেই কিছুটা তাদেরও ছিল। অথচ আমার প্রতিদিনের কাজের সঙ্গে তারা একজনও জড়িত ছিল না। যে ছিল বোধহয় সে এই জারোমথাঙ্গি। এখন মনে পড়ছে মেয়েটি কখনও কখনও আপন মনেই আমার বাসের ঘরে আমার দিকে পেছন ক'রে কাজ ক'রত। তার অনাকর্ষক শরীরে কোথাও এমন মাংস ছিল না যেখানে আমার দৃষ্টি আটকে যেতে পারে। আমার প্রতি তার কিছু আগ্রহ থেকে থাকতে পারে যা আমি উপেক্ষা ক'রতাম। আমার উপেক্ষা ছিল অত্যন্ত অনায়াস, অনেকটা স্বাভাবিকতার মত। অথচ থারমিলার বেলায় অবস্থাটা ছিল বিপরীত। প্রথম দিন থেকেই তাকে দেখবার জন্যেও আমার চোখকে চোর সাজাতে হত। তার আকর্ষণের সবটুকুই ছিল দেহ সৌষ্ঠব।

সে সব পুরানো কথা মনে পড়ছে শুধু বিস্ময়ের জন্যে। যে মেয়েটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কৌতূহলমাত্র ছিল না আজ তারই পেছনে আমার অনির্দেশ যাত্রা! অবিরত পর্বতের ওপর সেই যে কবে ফাদার পিটরের সঙ্গে উঠেছিলাম তারপর থেকে নিচে আর নামিনি। নেমেছি বড় জোর উঁচু থেকে নিচু একটা পাহাড়ে। সাগর সমান সমতলে কখনই নয়। এখনও তেমনি ভাবেই পথ চলছি একটা পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ের চড়াই উত্তরাই ক্রমাগত পার হয়ে। আমি যেন

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, পথটা শেষ হলে বাঁচি। অথচ ওই মেয়েটি আশ্চর্য সজীবতায় পথ চলছে! ওর মুখে অসীম খুশির উজ্জ্বলতা। ওকে সময় সময় শিশুর মত চপল মনে হচ্ছে, বাতাসের মত চঞ্চল। তাইতেই সন্দেহটা বেশী হচ্ছে মায়াবিনী কি? অবশ্য তাতে কিছুই ক্ষতি নেই। আমার সবই জানা। পথটাই জানি না, পথের শেষটা তো জানি। কাজেই জারোমথাঙ্গি সাধারণ মানবী হোক আর মায়াবীই আমার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি সামান্যই। বিনাশের সতেই বস্তুমাত্র সৃষ্ট হয়, জন্মায় প্রাণও। অতএব অন্য কিছু হবার সম্ভাবনা একেবারে নেই। একসময় বিরক্ত হয়ে বললাম, আমি এখানটায় বসব।

অবাক হয়ে ও বলল, হাঁটতে পারছ না? আসলে তোমরা, সমতলভূমির লোকেরা পাহাড়ে আদৌ চলতে পার না।

তুমি কি ক'রে জানলে?

দেখেছি তো! অনেককেই দেখেছি। কতবার কত লোক কত কাজে এসে পড়ে ফাদাবের কাছে, তাদের মুখেই শুনেছি।

তাও ভাল। আমি ভাবলাম ও বুঝি আরও অনেককে এইভাবে পথে ডেকে এনেছে, এই পথেই। তবু সংশয় কাটল না ব'লেই জানতে চাইলাম, তুমি এই পথে আগেও কখনও এসেছ?

এদিকে কেন আসতে যাব? ওই যে গ্রামটা শেষ রেখে এলাম ওই পর্যন্ত এসেছি, গির্জার কাজে।

তবে যে তুমি এদিকে চলেছ?

তুমি দেখলেনা ওই সামনে আর একটা বসতি আছে!

কি ক'রে দেখব?—অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

বাঃ আমি যে দেখলাম! লালং গ্রামটা থেকেই তো দূরে একটা পাহাড়ের গায়ে জুম চাষ দেখা গেল! সেই দিকেই তো যাচ্ছি।

কিন্তু সে দিকেই যে যাচ্ছি বুঝছ কি করে? পথ বলতে তো নেই!

আমার ঠিক হিসেব আছে তুমি চল। এমন জায়গাতেই তুমি থামতে চাইলে যেখানে জলের চিহ্ন নেই! তাছাড়া এখান পর্যন্ত ওরা স্বচ্ছন্দে আসতে পারবে। ওরা শিকার ক'রতে এদিকে আসে।

এখানটায় ফাঁকা। বন জঙ্গল বলতে কিছু নেই। হঠাৎ একটা জায়গা এত ফাঁকা হবার কি কারণ বুঝলাম না। একটা পাহাড়ের মাথার দিকে অনেকটা জায়গা যেন ভেঙ্গে গেছে। অথচ নিচের দিকে দেখলে মনেই হয় না যে ভেঙ্গে গড়িয়ে কিছু পড়েছে। সেই বিস্তীর্ণ অংশের ওপর হাত রেখে দেখলাম অত্যন্ত কঠিন শিলা। অথচ আপেল কাটার মত কাটা। বিশাল একখণ্ড শিলা কেউ যেন প্রচণ্ড এক তরোয়ালের কোপে কেটে নিয়ে গেছে। আমরা সেই

কাটা অংশের নিচের সামান্য সমতলে একটা ছোট পাথরের ওপর ভাগাভাগি করে, বসলাম। বিকালের ক্লান্ত রোদ ছড়িয়ে আছে মেয়েদের ভিজে চুল ছড়িয়ে রাখার মত আয়েসী অবসন্নতায়। আমি বহুদূর পর্যন্ত রোদের ওপর আমার দৃষ্টি ভাসিযে দিলাম বহু পাহাড় আর বহু গিরিখাদের ওপর দিয়ে। নিচু পাহাড়গুলোর সবুজ মাথার ওপর সাদা আলোর চাদর, সেই একই সুবিস্তীর্ণ চাদর জনহীন উপত্যকা আর গিরিখাদগুলোর ওপরও। শুধু যেদিকটা রোদ পড়ছে না সেই পাশটায় সবুজ পাহাড়গুলো কালো। অন্ধকার কালো করে রেখেছে গিরিখাদগুলোয় গভীর অংশও। আমাদের এখানটা ছাড়া দৃষ্টিগত সমস্ত অঞ্চল সবুজ বনানীতে আচ্ছন্ন। আমাকে বসতে দেখে জারোমথাঙ্গি বলল, তুমি যেভাবে বসলে তাতে মনে হচ্ছে আর হাঁটতে পারছ না। কিন্তু দেরি হয়ে গেলে অজায়গায় রাত কাটাতে বিপদ হবে।

ওর কথা আমার কানে এবং মনেও গেল। তবু আমার উৎসাহ এল না। বিপদ জিনিসটা যে কি জানা হয়নি। এত তো চললাম, অস্থানে কুস্থানেই সবাই বলবে, কিন্তু বিপদের সঙ্গে তো কই পরিচয় হল না। এই তো সদ্য নাকি বিপদে পড়েছিলাম, কই দেখা তো পেলাম না! বিপদ এল সঙ্গে জারোমথাঙ্গিও এল। বিপদ আর আমার মাঝখানে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। এবারও দেখা পেলাম না। কাজেই বিপদের ভয়টা আমার আর কোনদিনই হ'ল না। যাকে চিনি ভয়ই হোক আর ভরসাই হোক, একমাত্র তাকেই করা যায়, যাকে চিনি না তাকে নয়। তাই বসেই রইলাম। জারোমথাঙ্গি আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, ওঠ ওঠ। আর বসতে হবে না। চল।

ওর আন্তরিকতার সৌন্দর্য মনের মাধুর্য হয়ে শারীরিক সৌন্দর্যহীনতাকে অতিক্রম ক'রে গেল। কিন্তু উঠব যে যাবটা কোথায়? কোন স্বর্গপুরীতে যাবার জন্যে ও আমাকে তাড়া দিচ্ছে? আমরা তো এক অনির্দিষ্ট দিশায় চলেছি। জিজ্ঞাসা ক'রলাম, কোথায় যাবে বল তো?

জানি না—বলল চটুল চপলতায়। হঠাৎ নিজে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে হাত ধরে টেনে তুলতে চেষ্টা ক'রল। আমি উঠতে ও বলল, যে ক'রে হোক সামনের পাহাড়টা পেরিয়ে যেতে হবে। ওটা পার হ'তে পারলে ওদের এলাকা পার হবো। আর ভয় থাকবে না।

ভয় আমার আগেই কেটে গিয়েছিল, মনে হ'ল জারোমথাঙ্গি যেন ভয়টা একটু বেশী পেয়েছে। ও আবার আমাকে বেশী ভয় দেখাচ্ছে না তো? আমার সন্দেহ হ'ল। লালখোমাংরা আমাকে পেলে কিছু একটা ক'রবে আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত, কি যে ক'রতে পারে সেই অনুমানটাই আমার অসাধ্য। তাই বলে এত ভয় পাবারও কোন কারণ থাকতে পারে না যে এতদূর পর্যন্ত আমাকে মারতে

ওরা আসবে। আমার যেন জারোমথাঙ্গিকেই সন্দেহ হচ্ছে। ওই যেন আমাকে নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। সে উদ্দেশ্য কি হ'তে পারে? আমার কাছে জীবনটা ছাড়া কি বা আর আছে? তা সেই জীবনই যখন ও বাঁচাল তখন নেবেই বা আর কি? তাই যে উদ্দেশ্য থাকে থাক মনে করেই নির্ভাবনা হতে চাই। ভাবনা কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না বলেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই এসে পড়ে।

আমাদের পা চালানোর কিছু পরেই সেই ফাঁকা জায়গা অদৃশ্য হয়ে আমরা আবার গাছের ছায়ার শীতলতার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। পথ নিচের দিকে নেমে চলেছে। পথ মানে পায়ে চলার প্রায় অনুমিত রেখা মাত্র। আমার পক্ষে অনুমান বজায় রাখা জারোমথাঙ্গি না থাকলে সম্ভব হ'ত না। কাজেই এ এক সানুগত অনুসরণ। কিন্তু এ যেন আর সম্ভব হচ্ছে না। সমতল অরণ্যের অভিজ্ঞতা আমার আছে, পথ সেখানে জটিল কণ্টকাকীর্ণও কখন, তা বলে এমন কণ্টকময় নয়। পাহাড়ী পথে চলার অভ্যেস কোন তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয়। কোন আজন্ম অভ্যেসেই এপথে সহজে চলা সম্ভব। এবার পথ চলতে গিয়ে আমার ক্লান্তি ধরা পড়ল। আসলে ক্লান্তি শারীরিক, মানসিক নয়। শারীরিক ক্লান্তি বলেই তাকে জয় করবার জন্যে জানতে চাইলাম, আর কতদূরে যেতে হবে বলতো?

আমিই কি তা জানি? জারোমথাঙ্গি জবাব দিল। শুনে প্রথমটা বিস্মিত হ'লেও কয়েক মুহূর্ত বাদেই আমি যেন প্রীতিলাভ ক'রলাম। আমারই মত আর একজন তাহ'লে দেখছি জুটেছে! পথ জানে না পথে নামে এমনটি দ্বিতীয় থাকতে পারে ধারণা ছিল না। তায় আবার স্ত্রীলোক! আমার বেদনা যেন সেইখানেই। তবু মন্দ লাগল না। বললাম, ব্যাপারটা কি বল তো? কোথাও থামব না শুধু হাঁটতেই থাকব?

থামবার মত জায়গা পেলে না থামব! নইলে হাঁটা ছাড়া আর কি উপায়? যতক্ষণ তেমন জায়গা না পাচ্ছি চলতেই হবে।

তেমন জায়গা কোথাও আছে কি?

আছে আছে। পাহাড়ে ঝরণা থাকবে না এমন কি হয়?

আমিও আশ্বস্ত হলাম, সত্যি এমন হয় না। পাহাড়ে ঝরণা থাকবেই। বর্ষার সময় তো অনেক ঝরণা পাহাড়ে পাহাড়েই দেখা যায়, অন্য সময়েও চিরবহ ঝরণাগুলো থাকে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আমি ভেবেছি কোথা থেকে আসে এই ঝরণার অবিরাম জল, এই সব জলস্রোত। বহুবার ইচ্ছে হয়েছে জলধারা ধরে উজিয়ে গিয়ে দেখে আসি তার উৎস। হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি সাহস হয় নি। সরু গিরিখাত দিয়ে বিশাল সরীসৃপের মত বয়ে আসা জলের ধারা ঝোপ ঝাড় গাছ গাছালি আর লতাগুল্মের তলা দিয়ে কোন সে সুদূর থেকে যে

বয়ে আসে আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে। সংকীর্ণ গিরিখাত গুলো অনেক সময় ওপর থেকেই দেখি ছায়ায় ঢাকা। সেই ছায়াচ্ছন্ন পথে মধ্যদিনে হয়ত নেমে আসে তৃষ্ণার্ত বনচরেরা—অলস বেলার অনুমানে তাদের কম্পচোখে দেখি, বাস্তবে দেখতে চাই। আজও হয়ে ওঠে নি। আজ হঠাৎ ঝরণার কথায় বহুদিনের বাসনা মনে এল। মনে মনে স্বীকার করে নিলাম পার্বতী জারোমথাঙ্গি আমার চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ। কাজেই ওকে সঙ্গী পেলে কি সম্ভব হবে না একদিন দেখতে যাওয়া? মনে মনে ভাবলাম যে ঝরণার ধারেই আজ রাত কাটাই না কেন কাল সেই জলরেখারই উৎস দেখব।

জারোমথাঙ্গি অকস্মাৎ প্রশ্ন ক'রল, কি এত ভাবছ?

গতরাতেই ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। যদিও বিপন্ন সময়ের পরিচয়, যদিও পরিচয় পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতিতে, এবং যদিও পরিচয়মাত্র আত্মসমর্পণ তবু এটা সত্য যে আমি ওকে জানি না। যতটুকু জানি তাতে আমার ভাবনার কথা-গুলো বলা চলে না। তাই বললাম, কি যে ভাবছি আমি নিজেই কি তা জানি?

আমার জবাবে ও আর কথা বলল না। এমনিতে কথা বেশী বলা হয় না ভাষার ব্যবধানের জন্যে। দুজনেরই ভাষা আলাদা। তবে গির্জার কাজে বহু জায়গা ঘুরে বহুজনের সঙ্গে মিশে আমারই মত অনেক ভাষাতেই ওর কিছু কিছু জ্ঞান আছে। দুজনের মধ্যে যেটা সংযোগের ভাষা আমরা পেয়েছি সেটা হ'ল অসমীযা। আমার এবং ওর-ও এই ভাষায় সামান্য কাজ চালানো জ্ঞান। আমার মাতৃভাষার ভগ্নী প্রতিম ভাষা বলে অসমীয়া আমার পক্ষে সহজবোধ্য। কথা দু চারটে বলতেও পারি। তাই দিয়ে কোন ক্রমে কাজ চলছে কাল থেকে। তাছাড়া ও ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করে ইংরিজি দিয়ে। সেটা ও চলবার মত বলে। কেমন বিনা ব্যাকরণের অভ্যাসগত ইংরিজি অনর্গল বলে যায়, আমাকে হোঁচট খেতে হয় প্রতি মুহূর্তের ব্যাকরণগত ভাবনায়।

কাজেই নিঃশব্দেই বেশ কিছুটা পথ চলে এলাম। হঠাৎ ওর কথা বেরোল অদ্ভুত একটা পাখি দেখে। আপন ভাষায় আমার পক্ষে দুর্বোধ্য কি একটা শব্দ ক'রে উঠল সানন্দ উচ্ছ্বাসে। আমি শুধু অভিব্যক্তি বুঝলাম, ভাষা নয়। আসলে ভাষা তো ভাবের প্রকাশ, তার অনুগামী। তবু কখনও ভাষা বোঝাটা জরুরী হয়ে পড়ে, কখনও আমার বোঝানোটা হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। আমার না বুঝেও চলছিল কিন্তু জারোমথাঙ্গির না বুঝিয়ে চলল না। সে হাত পা নেড়ে বোঝাল এই পাখির মাংস খুবই সুস্বাদু। তার আপসোসও সে বোঝাল পাখিটা এমন কাছ থেকে উড়ে যাবার জন্যে। আমার মন এ ব্যাপারে অভিব্যক্তিহীন। আমার রসনা ওই সামান্য পাখির দেহের জন্যে আদৌ আগ্রহী হ'ল না। আমাকে স্পৃহাহীন দেখেই বোধহয় ও বলল, তুমি নিশ্চয় এপাখির মাংস কখনও খাওনি।

মনে পড়ে না—জানালাম। সত্যিই মনে পড়ে না। এতদিন ধরে এত জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে কোনদিন কি জুটেছে আর কি খেয়েছি মনে থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া খাওয়া কাজটা ক্ষিধে মেটানো এবং প্রাণ ধারণের জন্যে। কাজেই কখন কি পেলাম আর কি খেলাম তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর মানসিকতা নেই। ওটা আমার হয় না। যখন কিছু খাই তখন ক্ষিধের তাড়না এমনই বেশী থাকে যে সবই ভাল লাগে। মন্দ তো কিছু লাগে না, আর খাবার যখন দেখি খাদ্যবস্তুর পরিণত রূপেই দেখি, ভাল কোনটা লাগলেও তার মৌলিক মূর্তিটা তো আর আমার চেনা হয় না ফলে এমন পথ চলতি অনুরাগ প্রকাশ আমার পক্ষে একান্তভাবেই অসম্ভব। এত কথা তো আর জারোমথাঙ্গিকে বোঝানো যায় না কাজেই চুপ ক'রে ওর কথা কেবল শুনতে লাগলাম। ও বলেই চলল, আমাদের দেশে এই পাখি খুব পাওয়া যায়। এদিকে কখন-সখন পাওয়া যায়। আমার বাবা এক একদিনে আটটা দশটা ক'রে মেরে আনত। আমরা সবাই মিলে খেতাম, ভারী সুস্বাদু মাংস। তোমাদের দেশে বুঝি নেই?

আমি শুধু একটা 'না' বলে ওর কথায় অনাগ্রহ প্রকাশ ক'রলাম। আদৌ আমার এই বকর বকর ভাল লাগছিল না। একটানা এই দীর্ঘ পথ চলায় আমি ক্লান্ত। সারাদিনে এমন সব ফল আর মূল খেতে হয়েছে যা ইতিপূর্বে খাইনি, তাতে পেট যা ভরেছে তার চেয়ে বেশী রয়েছে ক্ষিধে। জারোমথাঙ্গি আমাকে খুঁজে খুঁজে দিয়েছে, নিজেও খেয়েছে বিশেষ তৃপ্তিতে। তার মধ্যে ছোট এক রকম গোল ফল পথে একটা গাছ থেকে সংগ্রহ ক'রেছিল স্বাদে কষায়। ও তো অমৃত লাভের তৃপ্তিতে যখন একটার পর একটা টপাটপ মুখে পুরে যাচ্ছিল আমি অবাক হয়ে শুধু ও-র মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। এখন যেন ওর ওপর আমার রাগই হচ্ছে। লালখোমাঙ আমার কি করত? ফাদার কি শেষ পর্যন্ত বাঁচাতেন না আমাকে? তা কি কখনও হয়? আমি কি গির্জার কাজ করিনি? আমি কি ফাদারের কথা মত কত রোগীকে আরোগ্য করিনি! নিশ্চয়ই তার কিছু প্রতিদান থাকে। পাদ্রী পিটার-এর মত নিঃস্বার্থ মানুষ নিশ্চয়ই তার একটা মূল্য দিতেন। তারা যত যাই হোক ফাদারের অবাধ্য হতে পারত না। এখন মনে হচ্ছে এই মেয়েটা চক্রান্ত ক'রে আমাকে ভুল বুঝিয়ে এদিকে টেনে এনেছে নিজের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রতে। কথাটা অনেকক্ষণ ধরেই ভাবছি, এখন তা দৃঢ় হ'ল। লালখো মাঙ এত হিংস্র বা নীচ মনের মানুষ কখনই নয় যে আমাকে মেরে মুন্ডুটা কেটে নিয়ে নিজের ঘরের সামনে ঝুলিয়ে দেবে! তাছাড়া আমার পক্ষে কি একজনকেও পেতাম না যে আমার হয়ে ফাদারকে বলত! এরকম তো কোথাও দেখিনি যে কলহে মানুষ দুপক্ষে ভাগ হয়ে যায় না। পৃথিবীতে চিরন্তন যদি কিছু থাকে তবে তা মতান্তর। কাজেই আমার পক্ষে একদমই লোক

জুটত না তার কি কথা? আসলে আমি গোড়াতেই ভুল ক'রে ফেলেছি ওই ভোরে ওখান থেকে সরে পড়ে। এই মেয়েটির কথায় ভর করে বেরিয়ে না পড়ে যদি দেখতাম কি হয় তাহ'লেই হ'ত ভাল। একবার ভাবলাম ফিরেই যাই। কিন্তু একা পথ চিনে ফেরা অসম্ভব। তাছাড়া সারাদিনের পথ কি ক'রে দিনের এই সামান্য শেষাংশে পেরোব? সে-ও তো অসম্ভব। দেখা যাক শেষটা।

হঠাৎ জারোমথাঙ্গি পেছিয়ে এল। মনে হ'ল যেন ভয় পেয়েছে। ওর হাতে বরাবরই একখানা কাটারি আছে যা দিয়ে আমাদের পথে পড়া অসংখ্য ছোট ছোট গাছ ও কেটেছে এবার যেন সেটা সম্বন্ধে ও বিশেষ সচেতন হ'ল। আমার গা ঘেঁষে এসে আমাকে আড়াল ক'রে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রল। আর অমনি যেন একটা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটল, আমাদের সামনে প্রায় পায়ের কাছেই বিরাট একপাঁজা কালো লোম যেন ছিটকে এসে পড়ল। আমি হকচকিয়ে যাবার আগেই বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় জারোমথাঙ্গি তার হাতের কাটারিখানা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত ক'রল সেই কালোলোমের স্তূপে। বার কয়েক কেঁপে স্তূপ স্থির হয়ে গেল, তার নিচে দিয়ে দেখলাম রক্ত গড়িয়ে আসছে। পাথুরে মাটি কিছুটা শুষে নিলেও স্রোত বয়ে চলল ঢালু দিকে। আমি বাক্যহারা বিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম উত্তেজনায় জারোমথাঙ্গি তখন যেন কাঁপছে। তাকে অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছে। আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম আর সেই মুহূর্তেই সামনে এমন একজন লোক এসে দাঁড়াল যার চেয়ে ওই বন্যজন্তুটি কম ভয়প্রদ ছিল। লোকটির হাতে একটা বন্দুক। সে এসেই আপন ভাষায় জানাল জন্তুটাকে সে-ই মেরেছে। অর্থাৎ কালো লোমশের মালিকানা তার। জারোমথাঙ্গির হাতের কাটারি তখনও বিঁধে আছে সেই লোমের মধ্যে, সেটা দেখিয়ে ও লোকটির দাবী খারিজ ক'রতে চেষ্টা ক'রল।

আমার হঠাৎ নজরে পড়ল একটু আগে স্থির হয়ে যাওয়া লোমশ দেহটা যেন ঈষৎ কাঁপছে। নজর সেদিকেই গেল। খুব মৃদু কাঁপন—থরথর ক'রছে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই আপনি স্থির হয়ে গেল। আমি আবার নড়ে কিনা দেখবার জন্যে চেয়েই রইলাম। না। অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে আছে দেখে আমার মন কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম না কি প্রয়োজন ছিল প্রাণীটিকে এভাবে মারবার! ওর এই স্থির হয়ে থাকায় অসহ্য বেদনা ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্নতার মত আমার মনকে ঢেকে দেবার উদ্যোগ ক'রল। হত্যা এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাদের চিরন্তন চলার পথ। প্রতি দিন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে কিছু দুর্বল প্রাণীকে হত্যা করি আমরা। মনে কোন প্রতিক্রিয়ারই বিস্তার দেখি না। এই অবিরত প্রতিক্রিয়া হীন হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও আজ আমাকে বিশেষ ব্যথিত ক'রল এই অসহায় প্রাণীটির মৃত্যু। তার মধ্যেই আমার নজরে এল হত্যার দাবীদার লোকটি গিয়ে জারোম-থাঙ্গির কাটারিটা ধরে একটা টান মারল আর সঙ্গে সঙ্গেই নিজের বাঁ পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে গোল পশমের বলটাকে গড়িয়ে দিতে চাইল। পশমগুলো যেন ছিটকে

পড়ল আর স্পষ্ট হ'ল একটি মৃত ভল্লুক। অসহায় প্রাণীটি এখন একটি জড়ে পরিণত। আমি যেন নিমেষে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। চাইলাম ওই কাটারিটা নিয়ে হত্যাকারীর মাথায় বসিয়ে দিই, জারোমথাঙ্গিরও। স্বার্থ চেতনা আমার ইচ্ছার হাত ধরে ফেলল। জারোমথাঙ্গি আমার কাছে অনিবার্য। আমার অস্তিত্বের জন্যে ওর প্রয়োজন, আর ওই লোকটিকে মারতে পারছি না একটা মৃত প্রাণীর জন্যে ঝুঁকি নিতে চাই না বলে। ও যে মরবেই এমন কি কথা, আমাকেও তো মেরে ফেলতে পারে! আমার অনভ্যস্ত হাতের অস্ত্র যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় তাহ'লে ওর আছে আগ্নেয়াস্ত্র। থাক কাজ নেই। ওর সঙ্গে আমি যখন পেরেই উঠব না অযথা আত্মঘাতী হয়ে লাভ নেই। যে মরেছে মরুক, বনের অমন একটা ভল্লুকের জন্যে কে আর নিজের প্রাণ দিতে যায়! আমার আবার চোখ পড়ল ভল্লুকটার মৃতদেহের দিকে। অমন শক্ত সবল প্রাণী কেমন নরম কাদার মত নেতিয়ে পড়ে আছে। প্রাণীর মেরুদণ্ডের তাহ'লে কি দাম? কি দাম বা হাড়ের? বুকের পাঁজরে হাড়গুলো কি ওর নেই? তবে এমন নেতিয়ে পড়ল কেন একটা সামান্য লাথিতেই? অথচ ওর প্রাণটা থাকলে তো আর এটা হ'ত না! সামান্য ওই অদৃশ্য বস্তুটুকুর কি অসীম ক্ষমতা! তাকে কোনদিন চোখে দেখা যায় না, তার আকার সম্বন্ধে করা যায় না কোন অনুমান। অথচ সমস্ত হাড় মাংস রক্ত সব কেমন নিমেষে মূল্যহীন হয়ে যায় ওই আশ্চর্য বস্তু টুকু না থাকলেই! প্রাণ তো বস্তুও নয়। তবে? তবে কি আমি জানি না।

ভাবনার মধ্যে আমি চমকে উঠলাম ভল্লুকের দেহটা লোকটা ছেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে। এতক্ষণ জারোমথাঙ্গির সঙ্গে ওর কি কথা হ'ল বা শেষ পর্যন্ত কি সাব্যস্ত হ'ল আমি শুনিনি, শুনলেও হয়ত সব কথা বুঝতাম না। আর কথা যা-ই হোক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। আমার খুবই বিশ্রী লাগছে পাথরের উপর দিয়ে ওকে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া। খুবই অন্যায় অসম্মান। আমার সঙ্গে ভল্লুকটাকে আলাদা ক'রে দেখতে পারছি না যেন। দেখবার কারণও নেই। আমাদের সঙ্গে কি বা তফাৎ ছিল ওর? একই প্রাণের ঐশ্বর্যের অংশীদার আমরা এখানের চারজনই। একই বনের অধিবাসী। পাশাপাশি বা কাছাকাছিই থাকি। থাকতাম, থাকতে পারতাম! সহবাসীকে হত্যা বিশ্বাসঘাতকতার এক চরম নিদর্শন বলে আমার মনে হ'ল। এই বিশ্বাসঘাতকতা ভল্লুকটা কিন্তু করে নি! পরক্ষণেই মনে হ'ল করে নি সুযোগ পায় নি বলে, সুযোগ পেলে কি আর ও হিংসা ক'রত না! আবার মনে হ'ল কি হ'তে পারত এ চিন্তায় লাভ কি? যা ঘটে গেছে সেটাকেই বিচারের বিষয় ধরা উচিত। সে দিক থেকে দেখলেও ওকে মারা একান্ত ভাবেই অনুচিত হয়েছে।

হোক, আমার কিছু করার নেই। শুধু একবার তাকিয়ে দেখলাম ভল্লুকটার

মৃতদেহ তখনও ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলেছে। জারোমথাঙ্গি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, চল যাই। সামনেই ওর বাড়ী। সেখানেই রাতে থাকব। ও মাংস খাবার জন্যে ডেকে গেল। বুঝলাম রাতে বাসস্থান পাবার চুক্তিতেই জারোমথাঙ্গি ভল্লুকটার ওপর দাবী ছেড়ে দিয়েছে। আমি ওর বৈষয়িক বুদ্ধির তারিফ ক'রলাম মনে মনে। মেয়েরা এই রকমই হিসেবী হযে থাকে। মোটামুটি ভাবে একটা ছক তৈরী ক'রেই সাধারণত ওরা কাজ করে। আমি কোন মন্তব্য না ক'রে শুধু জানতে চাইলাম, ওর বাড়ী কোথায় ?

বলছে এই পাহাড়টার ওপারে। সেখানে আরও চারপাঁচ ঘর আছে।

প্রস্তাবটা আমার ভালই লাগল। সন্ধে হ'তে আর খুব দেরী নেই, এখন একটা আশ্রয়ের সন্ধান পাবার চেয়ে বড় পাওয়া আর কি থাকতে পারে ? জারোমথাঙ্গির বিচক্ষণতা প্রসংশনীয়। এখন বুঝছি ওর হাতে আত্মসমর্পণ করা যায়। এই বিজুবনে বসতি আছে, কোথাও আমরা পেতে পারি রাত্রির আশ্রয এর চেয়ে উৎসাহদ সংবাদ আমি ভাবতেই পারি না। কিন্তু কোথায় বা ওর ঘর আর কোনদিকে বা বসতি ? সকাল থেকে সেই যে চলছি তার মধ্যে একবার চোখে পড়েছিল দূরের এক পাহাড়ে কয়েক ঘরের ছোট একটা বসতি। ব্যস। তারপর থেকে পাথর মাটি আর সবুজ গাছপালা। এর মধ্যে হিংস্র বনচর চতুষ্পদ থাকতে পারে সে ভয় সর্বদাই হচ্ছিল, দ্বিপদ প্রাণীর বাসের সম্ভাবনার কথা মনেই আসে নি। তাই জারোমথাঙ্গির কাছে জানতে চাইলাম, তুমি কি এখানেই আসছিলে ?

এবার সে সবচেয়ে চমৎকার কথা বলল, আমিও জানি না। কোথাও একটা জায়গা তো জুটবে! তবে জানতাম এদিকে একটা জায়গা আছে সেটা এটাই কি না জানি না।

এবার আমার মুখ থেকে হঠাৎই আমার মাতৃভাষা বেরিয়ে গেল, বাঃ চমৎকার।

জারোমথাঙ্গির কানে পেঁছাবার জন্যে সেই স্বগতোক্তি শব্দ হিসেবে যথেষ্ট ছিল তা বুঝলাম তার প্রশ্নে, কিছু বলছ ?

আমি বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম তা প্রকাশ না ক'রে বললাম, আমার উপযুক্ত সঙ্গীই জুটে গেছে বট!

কেন ?

আমিও পথ চিনি না, তুমিও চেনো না।

জারোমথাঙ্গি আশ্চর্য অমলিন স্বরে সকালের রোদের মত শব্দ মেলে দিল, একদম চিনি না বলতে পার না, কিছুটা আমি চিনি। এই তো দেখ খাংগাঙ এ এসে গেলাম!

তা হয়ত গেলাম। পৃথিবীর সব দিকেই জনবসতি আছে যে কোন দিকে চললেই একদিন কোন একটা জুটে যায়। যাবেই।

ঠিক আছে—অভিমানের অভিনয় ক'রেই বলল জারোমথাঙ্গি। দীর্ঘ পথ হাঁটার ক্লান্তিকর মানসিকতার মধ্যেও ওর এই সজীবতাটুকু উপভোগ্য মনে হ'ল। একটু অবাক হ'লাম ওর মনের প্রসন্নতা দেখে। আশ্চর্য জীবনীশক্তি মেয়েটির? আমি তো প্রায় অবসন্ন হয়ে পড়েছি, মন মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, কথা পর্যন্ত বলতে ইচ্ছে ক'রছে না অথচ এখনও ওর কথায় সরসতা, কি নরম ব্যবহার! আশ্চর্য এই পর্বতদুহিতা, চেহারায় কোনই মাধুর্য নেই মনে গিয়ে সব জমা হয়েছে!

হঠাৎ ও একটা শব্দ ক'রতেই সামনের লোকটি পেছন ফিরল। জারোমথাঙ্গি প্রায় ছুটে গিয়ে তার কাছে পেঁছে কি সব বলতে সে হাত তুলে ওদিকে কি দেখিয়ে আবার তেমনিভাবেই চলতে লাগল ভল্লুকটাকে টানতে টানতে। আমি কাছে এসে পেঁছানোতে জারোমথাঙ্গি বলল, ওকে বললাম চল ওটা কাঁধে করে পেঁছে দিই ও রাজী হ'ল না, বলল ওই তো সামনেই ঘর। একাই নিতে পারবে।

আমি কোন কথা বললাম না। থামতেই আমার একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। বেলা পড়ে এসেছে, রোদ নিস্তেজ, সরু সরু বাঁশ গুলোর গায়ে সির সির ক'রছে বাতাস। আমার গায়ে তা মৃদু মৃদু হিম বেঁধাচ্ছে। হাঁটলে আবার গরম লাগছে, শরীর গরম থাকছে। তাই বললাম, চল যাই।

লোকটি বাঁক ঘুরেই অদৃশ্য। আমরা একটু এগোতেই সেই ঢালু বাঁক পেয়ে গেলাম। সামনেই চোখে পড়ল ছ সাতটা ঘর। আর একটু নিচে গেলেই ছড়ানো ছিটানো ঘরগুলোর আওতায় পেঁছানো যাবে। লোকটির গতি ঢালুতে পড়ায় খুবই বেড়ে গেছে। সে মুখে একরকম শব্দ ক'রতে ক'রতে চলেছে। হঠাৎ দেখলাম সমস্ত ঘরগুলোর ভেতর থেকেই ছেলেপিলে সমেত লোকজন বেরিয়ে এল। ওপর থেকে দেখে আমার মনে হ'ল পিল পিল ক'রে পিঁপড়ের সার বা উইপোকার দঙ্গল বেরিয়ে আসছে। লোকটি তার শিকার নিয়ে ওখানে পেঁছাতে সবাই মিলে ঘিরে ধরল শিকারীকে। সবাই মিলে পরম আগ্রহে মৃত জন্তুটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। ওকে সামান্য একটু পথ যেতে ভিড় সরিয়ে পথ ক'রে নিতে হল।

আমরা যখন কাছাকাছি পেঁছালাম ততক্ষণে জন্তুটার চামড়া ছাড়ানোর কাজ চলছে। একটা ধারাল ছুরি বুকে বসিয়ে লোমশ চামড়া টেনে ছিঁড়ছে লোকটি একাই। আরও জনা কয়েক তাকে সেই কাজে সাহায্য ক'রতে লেগে গেছে। জারোমথাঙ্গি ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই সমস্বরে কি যেন বলে চেঁচিয়ে উঠল। শিকারী লোকটি কি একটা বলতেই শান্ত হ'ল সবাই। আমি অনুমান ক'রলাম আমাদের প্রতিকূলতা কাটল। এতদিন যাদের সঙ্গে থেকে মিশে এসেছি তাদের ভাষার সঙ্গে ধ্বনিগত কিছু মিল থাকলেও এক বর্ণও আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। বোঝা যে খুব একটা প্রয়োজন এমনও নয় তাই জারোমথাঙ্গির ওপর রাতের আশ্রয়ের দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে রইলাম। এখন যা

বুঝছি ও আমারই মত ভেসে পড়েছে, আর আমার এবারকার ভেসে পড়ায় ও হচ্ছে খড়কুটো।

অনেকে মিলে অল্পদূরে কাঠকুটো জড় করছিল। আমি সেটাই দেখছি। হঠাৎ নজর পড়ল সামনের জটলা ফাঁকা হয়ে গেল আর সেই ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ছাল ছাড়ানো দগদগে লাল দেহটা কয়েকজনে মিলে বেশ পরিপাটি করে ধরে তুলছে। একে আমি কি বলব, বিবর্তন না অন্য কিছু? একটু আগেও যা ছিল প্রাণী এখন তাই পরিণত হয়েছে এক তাল মাংস পিণ্ডে। এখন নিশ্চল জড় পদার্থ, প্রাণী থেকে বস্তু। এ কি রূপান্তর না পরিণতি? এর পর যে কি হবে আমি জানি না। যা কার্যকারণের সম্পর্কে অদৃশ্যগত নিয়ন্ত্রণের নিয়মে ঘটে পরিণতি তো বলি তাকেই। আর এটা তো আমার সামনে ঘটনার অভিঘাতে একটা সচল প্রাণীর অচল হয়ে যাওয়া।

আমার ভাবনাকে আচমকা থামিয়ে আগুন জ্বলে উঠল। জড় করা কাঠের আগুনে সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ বেশ কায়দা ক'রে গাছের লতা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। সমবেত জনতা সেই আগুনকে ঘিরে যেন উত্তেজনার আঁচ পোয়াতে লাগল। সকলেই আপন জায়গায় বসে কথা বলে চলেছে কিন্তু মনে হচ্ছে চোখ আর মন ওই আগুনের দিকে, যেখানে বৃহৎ মাংসপিণ্ডটা ঝলসাচ্ছে, পুড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের আগ্রহ বড়দের মত করে ঢাকতে পারছে না ব'লেই তাদের মুখে চোখে কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। এখান থেকে সেই কাকলির অর্থ বুঝছি না কিন্তু শব্দ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি। আসলে শিশুদের সঙ্গে সরলতার যে একাত্মতা থাকে তা এখানে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ ক'রছে। আমার থেকে সামান্য দূরত্বে যে আগুন অতটুকু বাদ দিয়ে অন্ধকার। একটু শীতও অনুভূত হচ্ছে। আমি জারোমথাঙ্গিকে দেখলাম ওদের সঙ্গে মিশে গেছে। ওদের সঙ্গে ওর চেহারায় কিছুমাত্র সাযুজ্য নেই, ভাষাতেও মিল নেই নিশ্চয়ই তবু ওর যে কিছুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে এমন মনে হচ্ছে না। আমি ভাবলাম ওদের মধ্যেই গিয়ে বসি, আলস্য যেতে দিল না। তাছাড়া ভাষার ব্যবধান এ ধরণের মজলিসের অন্তরায়। আমি ওদের কথা বুঝব না ওরাও বুঝবে না আমি কি বলছি, একসঙ্গে থাকার পক্ষে এ বড় অসহায় অবস্থা। এই ভাষার পার্থক্য না থাকলে কি হয়? সামান্য দূরত্বে ভাষার এমন পার্থক্য হয়ে যায় যে পরস্পরের কেউ কাউকে বোঝে না। এ পার্থক্য না থাকলে কি এমন ক্ষতি হ'ত প্রকৃতির? অথচ মানুষে মানুষে সংযোগ কত সুবিধেজনক হ'ত। সব সুবিধে সব সময় হবার নয়।

পোড়া মাংসের গন্ধ এসে আমার ভাবনা এলোমেলো ক'রে দিল। আমি এতক্ষণ দূরের অন্ধকারের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম সেটা এই মাংসের গন্ধেই বোঝা গেল। এই রকম বনময় পাহাড়ে অন্ধকার একটা স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে

আসে। অন্য সাধারণ অন্ধকারের সঙ্গে এই অন্ধকারের কোন মিল নেই। এখানে অন্ধকার অনেক বেশী গভীর, জমাট কালো। কাছের দূরের সমস্ত পাহাড়গুলোকে মনে হয় অতিকায় সব প্রাণী যারা কোন গোপন উদ্দেশ্যে এক জায়গায় জড় হয়েছে। ওদের কিছু গভীর গোপন কথা আছে। ওরা অপেক্ষা ক'রছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত সেই কথাগুলো বলবে বলে। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়। ভয় হয় পাছে ওরা সেই কথা হঠাৎ বলে ফেলে! তখন প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে থাকে এই বুঝি বলে। ঘন অন্ধকারে গাছপালা পাহাড় সব একাকার হয়ে যায় শুধু আকাশ আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে জেগে থাকে। সারা এলাকা জুড়ে যে প্রাকৃতিক প্রাণের বিস্তার রাত্রির অন্ধকারে তার কোন চিহ্ন থাকে না। পশু পাখি সব স্তব্ধ হয়ে থাকে ঘুমে বা শব্দহীন জাগরণে। অকস্মাৎ কখনও কোন আর্ত প্রাণীর স্বর স্তব্ধতাকে দীর্ণ কারে শূন্যগামী হয়, কখনও বা সঙ্গ লিপ্সায় চিৎকার ক'রে ওঠে কোন নিশাচর পুরুষস্বর। কখন গর্জন, কখনও বৃংহতি, কখন বা নিঃস্ব কোন সংকেত।

মাংস পোড়া গন্ধটা ক্রমে বেড়ে উঠছে, উগ্র উৎকট গন্ধে স্থানীয় অন্ধকার মথিত। এই আরণ্য জীবনে বহু মাংস খেয়েছি, পোড়া মাংসই বেশী জুটেছে ঝলসানোতেও পেটভরাতে হয়েছে অনেক বার কিন্তু ভল্লুকের দেহের স্বাদ এই প্রথম। প্রায় নিশ্চিত অনুমানে বুঝছি আজ রাতের ক্ষুন্নিবৃত্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সমস্ত দিনের অনাহার পেটে প্রায় যন্ত্রণার জন্ম দিয়েছে। এখন যা হোক কিছু জোটা দরকার। ঘুরতে ঘুরতে জেনেছি পৃথিবীতে বিষ ছাড়া অখাদ্য বলে কিছু নেই। যাতে পেট ভরে তাই খাদ্য। পথে একটা অচেনা গাছ থেকে সামান্য কয়েকটি ফল ছিঁড়ে মুখে দিয়েছিলাম খাদ্য ওইটুকুই। তাতে লাভ হয়েছিল মুখের স্বাদ নষ্ট। তারপর থেকে সারা পথ শুধু ঝরণার জল ছাড়া পেটে আর কিছু যায় নি। সেই সব জলই বোধহয় এখন শরীরে শীত এনে দিচ্ছে। বেশ শীত শীত ক'রছে। বেশী দুর্বলতা শরীরকে কাতর করে। শীতের ভাবও কাতর ক'রছে আমাকে। উঠে গিয়ে জটলার কাছে জারোমথাঙ্গির কাছাকাছি বসলাম। আমাকে দেখে শিকারী লোকটি বেশ প্রসন্ন ভাবেই হাসল। তারপর নিজেদের মধ্যে কি যেন বলে বেশ শব্দ করেই হাসল সবার সঙ্গে মিলে। কিন্তু মুখ দেখে বুঝলাম ওদের কথায় কোন ব্যাঙ্গ বা বিদ্রূপ বা আমার প্রতি তাচ্ছিল্য নেই। নেহাৎই কোন রসিকতা হবে, মনে মনে ভাবলাম। তবে জারোমথাঙ্গিরও কোন অভিব্যক্তি না দেখে জানতে চাইলাম, ওরা কি বলছে?

এদের ভাষা আমি বিশেষ বুঝি না—ও জানাল। আর ঠিক সেই সময়েই শিকারী জারোমথাঙ্গির বোধগম্য ভাষায় জিজ্ঞেস ক'রল, আমাদের কথা ও একদমই বোঝে না?

জারোমথাঙ্গি জানাল, না। অমনই তার হাসি, সেই অনাবিল হাসি ঝরণার মত ঝরতে লাগল। জারোমথাঙ্গি ব্যাপারটা আমাকে বলাতে আমি ভেবেই পেলাম না এই সামান্য কথায় হাসির এমন কি থাকতে পারে। কিন্তু আমার ভাবনায় তার কি আসে যায়, সে নিজের মত হেসেই চলল। আমার সন্দেহ হ'ল তবে কি জারোমথাঙ্গি ঠিক কথাটা বলছে না? ওদের মধ্যে কি তবে অন্য কোন কথা হয়েছে যা হাসির ব্যাপার? আমাকে কি তবে ওরা হাসির উপাদান ক'রেছে, অথবা চক্রান্ত! যে চক্রান্তের কথা সকাল থেকে ভেবেছি এতক্ষণে কি তারই বলি হলাম আমি, আর ওরা হাসছে সাফল্যে! তা হলেই বা এখন আর কি উপায়? পরিত্রাণের তো পথ নেই। এদিকে নরমুণ্ড শিকারী জাতি আছে বলে শুনেছিলাম। এরা কি তবে তাই? জারোমথাঙ্গি কি তবে এদেরই চর? জীবনের প্রতি মমতা যে আমারও আছে এখন প্রথম টের পেলাম। কখন এমন মুহূর্তও এসে পড়ে যে সমস্ত ধারণা সেই ক্ষণেই সমূলে উৎপাটিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে বিপরীত সত্য আপন শরীরের কঙ্কালের মত নিজেকেই বিদ্রূপ ক'রতে থাকে। তা হোক, মায়া তবু মায়াই। যতই অর্থহীন প্রাণী হইনা কেন প্রাণের মূল্য প্রাণেরই সমান। এভাবে প্রাণ যাবার দুর্ভাবনা ভেতরে ভেতরে উতলা ক'রে তুলছে আমায় ক্রমাগত। চোরা চোখে দেখে নেবার চেষ্টা ক'রলাম পলায়নের পথ যাতে সুযোগমত ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আমাদের সামনের এই আগুনটুকু সামান্যই আলোর পরিধি রচনা ক'রতে পেরেছে, তার বাইরে তুলনাহীন অন্ধকার। সেই আঁধারে কোনটা পর্বতদেহ আর কোনদিকটা খাদ বোঝবার কিছুমাত্র উপায় নেই। এমন কি প্রাকসন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আলোয় যে বাসগৃহগুলো দেখা যাচ্ছিল তাও নিশ্চিহ্ন। এখন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া গতি দেখি না। এতদিন গির্জায় বাস ক'রে যে অস্তিত্বের সম্বন্ধে বিন্দু মাত্র বিশ্বাস উৎপন্ন হয়নি তেমনি কোন অস্তিত্বের কাছে আত্মরক্ষার প্রার্থনা প্রায় ক'রে ফেলছিলাম।

হঠাৎ জারোমথাঙ্গি তার পিঠের ওপর ঝুলিয়ে বেঁধে রাখা বোঝা থেকে একটা কম্বল বের ক'রে আমাকে দিল। বহুবারের মত আর একবার অবাক হলাম। আমি যেন নতুন করে উপলব্ধি ক'রলাম জারোমথাঙ্গি একজন নারী এবং পূর্ণ সত্তা নিয়ে গড়ে ওঠা এক সম্পূর্ণ নারী। আমি কম্বলটা পেয়েই গায়ে জড়িয়ে নিলাম। আবার আমি ভাবতে পারলাম এতক্ষণ আমার এত বেশী শীত লাগছিল কেন? ভয় কি শীতার্ত করে? তবে কি এতক্ষণ ভয়ের জন্যেই বেশী শীত ক'রছিল? পাহাড়ে অন্ধকার একা নামে না, শীতকে সঙ্গে করেই নামে। রাত যত গভীর হয় ততই ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে পরিবেশ। একমাত্র গুমোট গরমের মরশুমে কিছু ব্যতিক্রম। এখন আর তেমন শীত ক'রছে না। কম্বলটা বিদেশী এবং অত্যন্ত আরামদায়ক সে তো গির্জায় থাকতেই উপভোগ ক'রে এসেছি কিন্তু আমার মনে

কম্বলটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সেটাও কিছু কম সত্য নয়। জারোমথাঙ্গি এই কম্বলটা এগিয়ে দিয়েই আমার সমস্ত শংকাকে যেন নিঃশেষে মুছে নিল।

এতক্ষণে আমার শোবার কথা মনে হ'ল। সামান্যক্ষণ বাদেই তো এখানকার সবাই যে যার ঘরে ঢুকে যাবে, আমাদের গতিটা কি হবে? আমাদের কি তবে গাছ তলাতে কাটাতে হবে আজকের রাতটা? সুখ মানুষকে দুর্বল করে দেয়। গির্জায় আশ্রয় পাবার আগে তো কোনদিন রাত্রিবাসের জন্যে দুর্ভাবনা হয় নি। শয্যার আরাম আয়েসী করে তুলেছে তাহ'লে আমাকে? তা করে থাকলে বা আমার আর করণীয় কি আছে? এখন আমি অসহায়। প্রাণীমাত্রেই তো অভ্যাসের দাস, আমারই বা লজ্জার কি থাকতে পারে দাসত্বে। বরং দেখাই যাক জারোমথাঙ্গি কি করে। ওর উপস্থিত বুদ্ধি তারিফ করবার মত। দেখেছি ও বেশ হিসেব করে কাজ উদ্ধার ক'রতে পারে। হঠাৎ আমার অলকনন্দার কথা মনে হ'ল দীর্ঘকাল বাদে। অলকনন্দা শহরের সুশিক্ষিতা মেয়ে হয়েও জারোমথাঙ্গির সঙ্গে তুলনায় কোথায় যেন দুর্বল। নিশ্চয়ই সে এতদিনে প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি যথেষ্ঠই পেয়ে গেছে তবু ওর প্রতি এমন ভাবে নির্ভর করা সেই পরিবেশেও অসম্ভব। অলকনন্দা চিকিৎসকই হোক আর যাই হোক মানসিকতায় সে লতার মত, অপর নির্ভর। অথচ এই অরণ্য ললনা অনেকের নির্ভরস্থল হতে পারে অতি সহজেই। সে যাক, যে যার নিজের মতই হয় একের সঙ্গে অন্যের তুলনা অনেক সময় অনর্থক। এখনও তাই।

এখন যা বাস্তব সে দিকে নজর দেওয়াই ভাল। মাংসের পিণ্ডটা আগুনের বাইরে এনে বিরাট কাটারি দিয়ে কাটা হচ্ছে, ভাগ হচ্ছে। এক একটা খণ্ড এক একটি পরিবারের কাছে চলে যাচ্ছে। যারা পাচ্ছে বা প্রতীক্ষা ক'রছে তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে আমার বেশ ভাল লাগছে। আর নিজের পেটের অবস্থা থেকে উপলব্ধি ক'রছি ক্ষিধের চেয়ে সত্য অবস্থা পৃথিবীতে আর কিছু নেই। অকস্মাৎ আমার মনে হ'ল এতগুলো আনন্দিত মুখ সামনে আছে তবু এটা ঠিক যে প্রাণীটিকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার সেই আঘাত পাওয়া অবস্থাটা আমার মনের মধ্যে ফুটে আছে যেন। ধ্বংসের জন্যে যদি বুদ্ধিকে প্রয়োগ করা হয় তাহ'লে তো পৃথিবী শেষ হয়ে যেতে পারে। বন ধ্বংস করে কৃষি জমি ক'রছে, অন্য প্রাণীদের ধ্বংস ক'রে করা হচ্ছে রসনার পরিতৃপ্তি। যুগ যুগ ধরে এই অন্যায় চলে আসছে। অসহায় একটা প্রাণীর অন্তিম অবস্থা আমাকে হঠাৎ যেন বিচলিত ক'রে তুলল। এক ধরণের অপরাধবোধ পীড়িত ক'রতে লাগল আমাকে। অথচ এই কার্য কারণের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। আমি যে প্রতিবাদহীন দর্শক ছিলাম এটাই আমার মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এখন সেই হতভাগ্য প্রাণীর শরীর দিয়ে হচ্ছে আমাদের উৎসব! নাঃ

আমার মনের মধ্যে এখনও যেন তার সেই আর্তনাদ বাজছে। মনশ্চক্ষে যেন দেখতে পাচ্ছি আঘাত পাওয়া সে থরথর করে কাঁপছে আপন শরীরের মধ্যে মুখ গুঁজে। জীবনে বহুবার এমন হত্যা দেখেছি চোখে, বহু প্রাণীর মাংসে ভোজ খেয়েছি, আজ হঠাৎ কেন যে এমন হচ্ছে নিজেই তার কারণ খুঁজে পেলাম না। জারোমথাঙ্গিকে বললাম, আজ রাতটা কোথায় কাটাব বলতে পার ?

খুব সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল, ওর বাড়ীতে! তেমনি তো কথা হয়েছে।

তবে আমাকে জায়গাটা একটু দেখিয়ে দাও। আমি শোব।

খাবে না ?

না। আমার শরীর ঠিক লাগছে না।

সে কি ?—আমাকে আর কিছু না বলে শিকারীকে কি যেন বলতেই সে মাংস কাটতে কাটতেই হেসে উঠল, তারপর একজন মহিলাকে কিছু বলতেই সে উঠে গেল। সামান্যক্ষণ বাদেই মহিলা ফিরে এল একটা বাঁশের টুকরো হাতে নিয়ে। জারোমথাঙ্গির হাতে সেটি দিতেই আমার কাছে দিয়ে ও বলল, এটা খেয়ে নাও। হালকা খাবার, শরীর খারাপ হবে না।

ওটার মধ্যে ভাত আছে। কাঁচা বাঁশের ফাঁকের মধ্যে চাল ঢুকিয়ে তার মুখ বন্ধ করে পুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন বাঁশটা চিরে নিয়ে আমাকে ভাত বের করে খেতে হবে। অনেকদিন এভাত থাকে, আমিও বহুবার খেয়েছি। জারোমথাঙ্গি কি বুঝে যে এব্যবস্থা ক'রল জানি না তবে এই দারুণ ক্ষুধার সময় অপরিসীম উপকার যে ক'রল সে আর বলার মতই নয়। বিস্ময়কর মেয়ে এই জারোমথাঙ্গি, এমনি শুকনো রুক্ষ চেহারার মধ্যে একটি পূর্ণ নারীসত্তা! প্রকৃতির কি বিচিত্র প্রকাশ! সুন্দরী সুশ্রী মহিলার কোমল শরীরের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে যে গুণগুলোর অনুপস্থিতি পীড়া দেয় সেই রকম বহুগুণের আধার এই অতি কুদর্শনা শুধুমাত্র নামে নারী! শহরে যাদের দেখতাম পর্বতদুহিতাদের দেখার পর থেকে সেই মহিলাদের সম্পর্কে কেবল একটা তুলনাই মনে এসেছে—পুতুল। ওরা যেন সব আলমারীতে সাজিয়ে রাখবার মত পুতুলের মত করে গড়ে তোলে নিজেদের। তার মধ্যে রকম ফের আছে কোনটা মাটির কোনটা মোমের কোনটা বা আবার কাঁচের পুতুল। বেশী ব্যবহারে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তেই উৎকণ্ঠিত ক'রে রাখে বলে নিয়ে খেলবার চেয়ে তুলে রাখবার প্রবণতাই প্রবল হয়ে ওঠে। এক একটি শিশু পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে মাকে না পাবার কারণে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। তার জীবনে সংশয় এবং সন্দেহের সুরুও হয় সেখান থেকেই।

অন্য সকলে উঠে গেলেও আমাদের ভোজন পর্ব বেশ সময় নিয়ে ওখানেই শেষ হ'ল। সামনের আগুন তখন নিস্তেজ হয়ে এসেছে, আকাশ নক্ষত্রেরা অধিক উজ্জ্বল। আমার, এবং বোধকরি জারোমথাঙ্গিরও ক্লান্তির কারণ ছিল ক্ষুধা।

সেটা নিবৃত্তির পরেই ক্লান্তি কেটে গেল। সামান্য সুধা রসে চাঙ্গা হয়ে উঠল শরীর। জারোমথাঙ্গির ক্লান্তি কিন্তু কখনই বোঝা যায় নি, স্ফূর্তিটা বেশ প্রকাশ পেল। অধীর আনন্দে সে একবার আমাকে জড়িয়েই ধরে বসল। কোনক্রমে তার হাত থেকে আত্মরক্ষা ক'রলেও গৃহকর্তার উচ্ছ্বসিত হাসির আর নিবৃত্তি হ'ল না। তার যেন খুবই আনন্দ হচ্ছিল জারোমথাঙ্গির ব্যবহারে। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসির মাধ্যমে সে ওকে উৎসাহিত ক'রতে চাইছিল। ও সেটা বুঝল কিনা কে জানে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝিমিয়ে গেল। যদি বুঝে থাকে তবে হয়ত ইচ্ছে করেই ঝিমিয়ে পড়ার ভান করে পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে ফেলল। গৃহকর্তা একেবারেই নিভে গেল।

আগুনের সামনে থেকে সরে আসবার পর বেশ ঠাণ্ডা মনে হতে লাগল। জারোমথাঙ্গিকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, তোমার কাছে আর কি কম্বল আছে?

না। এই ছোট পোঁটলায় একটার বেশী ধবে কি? তুমিই ওটা গায়ে দাও।

চারিদিকে একটানা ঝিঁঝিঁর শব্দ। হঠাৎ কখনও সে শব্দ তীব্র হয়ে উঠছে পর মুহূর্তেই কমে সেই এক ঘেয়ে ভাবে বেজেই চলছে বিরামহীন। এখন যেন চোখ জুড়ে আসছে। শোবার যে সামান্য একটু জায়গা পাওয়া গেছে তার ব্যবহারে দেরী ক'রলাম না। মনে হ'ল জারোমথাঙ্গির কথা চিন্তা না করাটা খুবই স্বার্থ-পরতা হচ্ছে কিন্তু আমার সারা জীবনের লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এ স্বার্থপরতা আমি নির্দ্বিধায় প্রকাশ করলাম। যে কোন অবস্থার বিনিময়েই ঘুম আমার প্রয়োজন।

সেই মূল্যবান ঘুম হঠাৎ এক সময় ভেঙ্গে গেল আমার পিঠের দিকে কার একটা দেহের স্পর্শ পেতে। কে যেন আমার শরীরের সঙ্গে লেপটে আসছে। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা মানসিকতায় ঈষৎ ভয় হলেও পরের মুহূর্তে তা রইল না। আমি সম্পূর্ণ বোঝবার জন্যে আড়ষ্ট হয়ে রইলাম। যে আমার পেছনে শুয়েছিল আমার কোমরের ওপর তার পাতলা হাতখানা রাখল। এবার আমার বোঝা প্রয়োজন যে এটা জারোমথাঙ্গি ছাড়া অন্য কেউ নয়। ঘুম ছুটে যাওয়ায় বুঝলাম ঠাণ্ডায় একমাত্র কম্বলের তলায় আশ্রয় ওরও প্রয়োজন। তাই কম্বলটা আলগা করে দিলাম যাতে ও চাপা দিতে পারে। নড়াচড়া না ক'রলে কায়ক্লেশ দুজনে ঘুমোতে পারব। আমাকে জাগতে দেখেই জারোমথাঙ্গি জড়িয়ে ধরল। তার নির্মাস শীর্ণ দেহ আমার শরীরের সঙ্গে মিশে রইল। জীবনের জন্যে উষ্ণতার অবশ্যই প্রয়োজন। জারোমথাঙ্গিরও সে প্রয়োজন আছে। আমি ওকে আশ্রয় দিলাম প্রশ্রয় দিলাম না। ওর শীর্ণ শরীরে যৌবনের প্রকাশ এতই করুণভাবে অনুপস্থিত যে ওর নিদ্রা ছাড়া আমার কিছু অভিপ্রায় হ'ল না।

একটা মোরগ খুব বেশী রকম ডাকাডাকি ক'রে আমার ঘুম ভাঙ্গাল। দেখি আমার পাশে কেউ নেই। কম্বলটা আমার গায়েই চাপা আছে। তবে কি রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলাম? বসে বসেই চারদিকে পর্যবেক্ষণ ক'রলাম জারোমথাঙ্গি কোন

খানেই নেই। পাশেই পথ, কেউ নেই। মহা মুশ্কিলেই পড়লাম! হয়ত প্রাতঃকৃত্যে গিয়ে থাকতে পারে তবে তার জন্যে তো দূরে যাবার কথা নয়। ডান দিক বা দিকে পথ যতটুকু দেখা যাচ্ছে শূন্য। জারোমথাঙ্গি তো দূরের কথা প্রাণী মাত্র নেই। শুধু কিছু ছোট পাখি অলক্ষ্যে থেকে মোরগটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাতে লাগল। তাদের স্বর না থাকলে সমস্ত স্থানটি জুড়ে প্রাণের কোন চিহ্নই থাকত না। আমি চাঙঘর থেকে পথের ওপর নেমে এলাম। হিসেব ক'রে নিলাম কাল আমরা ডানদিক থেকে এসেছি। অতএব বাঁ দিকেই আমাদের যাত্রা। অথবা যাত্রার এখানেও সমাপ্তি হতে পারে, জারোমথাঙ্গির মনে কি যে আছে আমি জানি না। তাকে না পেলে তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কাজেই বোকার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছি এমন সময় দেখি আমার প্রায় সামনেই পথের ওপাশের খাদ থেকে একজন মহিলা উঠে আসছে। আমার দিকে চোখ পড়াতে হেসে কি যেন বলল। তার ভাষা কিছু বুঝছি না দেখে 'এহে' গোছের একটা শব্দ ক'রে তার ডান হাত দিয়ে বাঁ-দিকের পথ দেখিয়ে যেন বোঝাতে চাইল ওই দিকে কেউ চলে গেছে। নিশ্চয়ই জারোমথাঙ্গির কথাই বলছে। আমিও ইশারা করেই প্রশ্ন ক'রলাম আমিও যাব ? হাত নেড়ে সে সম্মতি জানিয়ে আমার আশ্রয় স্থলে উঠে পড়ল, বুঝলাম মহিলা আমার আশ্রয় দাতার গৃহিণী।

অপরিচিতা এই মহিলা যে অযাচিত ভাবে আমাকে পথ নির্দেশ দিল এতেই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হ'ল না। ভাবলাম জারোমথাঙ্গি হয়ত ওদিকে কোথাও কোন কাজে গেছে, ফিরে আসবে। তা বলে আমি অপেক্ষা করি কোথায় ? ঘরে তো কর্তার চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। যে ঘরে রাত কাটিয়েছি সেখানে কোন পুরুষের দেখা পাচ্ছি না, আর দেখা পেলেও তো এদের কথা কিছু বুঝি না, কাজেই এখানে কি ক'রে থাকা যাবে ? পথের মাঝেই বা দাঁড়িয়ে থাকি কি করে ? এক দুই ক'রে পা ফেলতে ফেলতে ওদের ক'ঘর বসতি ছাড়িয়েই একটা ইয়াংগো গাছের নিচে দাঁড়ালাম। গাছটা এমনই একটা বাঁকের মুখে আর উঁচু ঢিবিতে যে বাঁ দিকে অনেকটা দূর পর্যন্ত, সামনের খাদের অনেকটা গভীর আর ডানদিকে ছেড়ে আসা বসতি—সবই দেখা যাচ্ছে। জারোমথাঙ্গি কেবল দৃশ্যের বাইরে। এতদূরে সে কেন যাবে ? বাঁ দিকে তো অনেকটা পথ দেখা যাচ্ছে, প্রায় ক্রোশখানেক উৎরাই। তার মধ্যে কোথাও ও নেই তবে গেল কোথায় ? সামান্য একটু সমতল, কার যেন ধানের ক্ষেত তারপর আবার উঁচু। পাহাড়ের গা কেটে কেটে সিঁড়ির মত ক'রে চাষ করা। সেই ফাঁকা জায়গাতেও দেখা যাচ্ছে না ওকে, ব্যাপারটা বিস্ময়কর ঠেকছে। ওই মহিলা আমাকে অন্য কিছু বোঝায় নি তো ? অন্য কিছু বলে নি তো তার ইঙ্গিতে ? হয়ত গৃহকর্তার কথা বুঝিয়েছে যে ওই দিকে গেছে! এমনও হতে পারে জারোমথাঙ্গি—তা ঘরেই বা

থাকবে কোথায় ? ওইটুকু ঘরের মধ্যে তো একপাল ছেলেপিলে। পা ফেলবার জায়গা নেই। ওর মধ্যে ও ঢুকতে যাবে কোন দুঃখে ? কিন্তু এত ভোরে তার পক্ষে কোথায় যাওয়া বা সম্ভব ? কোথাও যাবার কারণই বা কি হ'তে পারে ? হঠাৎ আমার মনে একটা অন্য কথা উঁকি মারল। গৃহকর্তা নেই, জারোমথাঙ্গিও নেই, দুজনে এক সঙ্গে আবার কোথাও গেল না তো ? কোন বিশেষ কাজে। কাল রাত্রে ওর শুধু শীতার্ততাই ছিল না, কিছু ইচ্ছেও ছিল যা আমি উপেক্ষা ক'রেছি। সেই ইচ্ছে পূরণ ক'রতে সঙ্গী করেনি তো শিকারসঙ্গীকে ? ক'রে থাকলেই বা আমার কি ? ও যদি কারও সঙ্গ করে তো আমার কি ক্ষতি ? কিন্তু আমি এখন কি করি ? কোথায় বা যাই ? কোন উপায় না পেয়ে স্থির ক'রলাম পথ যখন একটা দেখা যাচ্ছে আর এদিকেই এসেছি তখন আরও আগেই যাই। কিছু একটা আছে, নইলে পথ থাকবে কেন ? আর জারোমথাঙ্গি যে এই গ্রামকে লক্ষ্য করেই এসেছিল তা নিশ্চয় নয়। কম্বলটা খুবই প্রয়োজনীয় সেটা কাঁধে ফেলে ঢালু পথে পা বাড়ালাম। ও রাত্রে যদি কোথাও গিয়েও থাকে ফিরে এসে নিশ্চয়ই কম্বলটা পেতে চাইবে, আমাকে তো চিরদিনের জন্যে এটা দান করে নি। এটা ওদের কাছে রেখে আসাই উচিত ছিল। ঢালু পথের সুবিধে পেয়ে অনেকটাই চলে এসেছি, তবু এখনও রেখে আসা চলে। তবে কি রেখেই আসব ? নইলে যদি ওই লোকটিকে সঙ্গে ক'রে কম্বল ফেরত নিতে আসে ? ওর সব সময়েই ছোঁড়বার মত অস্ত্র থাকে আর যা অব্যর্থ-নিরিখ। ভল্লুকটার কথা মনে পড়ল—কি রকম থর থর ক'রে কাঁপছিল অসহায় প্রাণীটি। জীবনের শেষ শীতলতা তাকে তখন গ্রাস ক'রছে, চরম শীতার্ততা। ভাবনাটা দুর্ভাবনার দিকে যাচ্ছে বটে আমার চলা কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না, আমি ঢালু পথে যেন গড়ানে বস্তুর মত গড়িয়ে চলেছি। এখানে ইচ্ছাঅনিচ্ছা কিছু নয় অবস্থা আর অবস্থানই সব।

চলার গতি কমতে ভাবনারও যেন দম ফুরোল। পেছনে তাকিয়ে পথটাও আর দেখা যাচ্ছে না। জারোমথাঙ্গি আর তার সঙ্গী যদি আসে তো কম্বলটা দিয়ে দিলেই হবে। সামনে কতদূর গেলে থাকবার মত জায়গা জুটবে কে জানে ? দিন থাকতে থাকতে যে কোন একটা আশ্রয়ে পেঁছাতেই হবে। কিন্তু এইভাবে নির্জন পথে নিরস্ত্র চলা খুবই নিবুদ্ধিতা। সারাপথই তো বনময়। হিংস্র প্রাণীরা সচরাচর চোখে পড়েনা তা বলে পড়তে বাধা কি ? লোকালয়-এর কাছাকাছি এতক্ষণ যে পথে এলাম তার দুপাশে গাছ কাটা। ছোট ছোট কিছু নতুন গজানো গাছ আছে। সামনে দুধারেই জঙ্গল। পথের ওপরে লাঠির মত আকারের এক সরু বাঁশ পড়ে আছে। সদ্য কাটা, কাঁচা। কেউ এখনই কেটেছে বলে মনে হচ্ছে। অথচ কোন প্রাণী দেখছি না। হয়ত কোন ছেলে ছোকরার কাজ। এদিক দিয়ে গেছে মনের খেয়ালে বাঁশ কেটে লাঠি তৈরী ক'রেছিল, অপ্রয়োজনীয় বলেই ফেলে

গেছে। আমার কাজে কতটা আসবে জানি না, ভয় কাটানো তো যাবে। লাঠিটার একটা মাথা আবার ছুঁচলো, বল্লমের মত। এটা স্বাভাবিক, সরু বাঁশ এককোণে কাটলে এইরকমই হয়ে থাকে। ওটাকে হাতে তুলে নিতে কিছুটা সাহস পেলাম। চলার জোর এসে গেল। পথ অনেকটা সোজা গিয়ে সামনের বাঁকে থেকে চড়াই হয়ে গেছে। এবার কতটা চড়াই ভাঙতে হবে কে জানে? আমাকে সচকিত ক'রে একটা মেটে রঙের খরগোস গাছ গাছালি থেকে বেরিয়েই আবার ঢুকে গেল। যা হয় হোক বড় জাতের কোন প্রাণী না হলেই হ'ল। সামান্য এই বাঁশের লাঠি তেমন প্রাণীর জন্যে যথেষ্ট নয় বরং এর ক্ষমতা যে কিছুই নেই সেটা প্রমাণ করবার পক্ষে এই লাঠি তখন যথাযথ হবে। সে পরীক্ষা না হলেই বাঁচা যায়।

চড়াই পথে কিছুটা উঠে ডান দিকের ঢালুতে চোখে পড়ল বেশ কিছু হলুদ ফুল ফুটে আছে। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম সূর্যমুখী। পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট গাছের বন, সেই বন ভরে অসংখ্য আলোর মত সূর্যমুখী। কে এখানে এমন ভাবে সূর্যমুখীর বীজ ছেটালো? তবে শহরের বাগানে যত্নেজাত ফুলের মত আকারে বড় এগুলো নয়, ছোট। অনেকটা পথ এই সূর্যমুখীরা আমার সঙ্গে চলল। অরণ্যে নানা রকম ফুল দেখেছি সূর্যমুখী এই প্রথম। সব ফুলেরই কোন নাম নিশ্চয় আছে, সবাই জানে না। মনে হয় পৃথিবীর সব ফুল এখনও মানুষের চোখে পড়েনি। সমস্ত ফুলের নামকরণ নিশ্চয় করা হয়নি। এত রকম ফুল এত দুর্গম অরণ্যে ফুটে থাকে যে কে তার খোঁজ রাখবে? কত ছোট অকিঞ্চিৎকর ফুলও ফুটে থাকে সবুজ প্রাণের মেলায়, নামকরণ যারা করে তাদের নজরেই সেগুলো আসে না। এখানকার সমস্ত গাছের ওপর দিয়ে কেউ ধারাল কোন অস্ত্র চালিয়ে নিয়ে গেছে। ছিন্নমস্তা গাছগুলো কবন্ধের মত দাঁড়িয়ে আছে এবং একটু আগেই কাটা মাথাগুলোও পড়ে আছে পাশে পাশে। এভাবে অস্ত্র চালানোর কোন উদ্দেশ্যই বোঝা গেল না। কোন দুরন্ত কিশোরের কাজ বলেই মনে হয়। কিন্তু এভাবে তার অকারণ খেলায় কত মহীরুহের সম্ভাবনা সে নষ্ট ক'রেছে তা সে কোনদিনই জানবে না। এই সব অতি সাধারণ গাছের মধ্যে লুকিয়ে আছে বহু ভেষজ যা পরীক্ষার অভাবে মূল্যহীন। প্রকৃতির জগতে দেখেছি প্রত্যেকটি বস্তুই কোন না কোন বিশেষ গুণসম্পন্ন।

ভাবনার মধ্যে চলেছি একটা বাঁক ঘুরতেই চমকে উঠে দেখি উঁচু একখণ্ড পাথরের ওপরে জারোমথাঙ্গি বসে। তার ছোট পোঁটলাটা সামনে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা, হাতের দা-খানা পাশেই মাটিতে শোয়ানো। গতকাল ভোর থেকে এতটা পথ চলার মধ্যে এতবড় বিস্ময়ের কারণ আর দ্বিতীয় ঘটেনি। এমন আনন্দও আর কখনও হয়নি যা ওকে দেখে হ'ল। জারোমথাঙ্গিকে দেখতে পেলে

এত আনন্দ যে হতে পারে স্বপ্নেও তেমন কথা ভাবিনি। আমি নেহাৎই আবেগহীন মানুষ তাই, নইলে নিশ্চয়ই দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতাম। সেসব না ক'রে ওর সামনে গিয়ে অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, তুমি এতদূরে কি ক'রে এলে?

আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল জারোমথাঙ্গি। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিরে আপন জিনিষপত্র নিয়ে হাঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ আগে যা ভেবেছিলাম তার কিছুমাত্র মেলেনি বলে এবং এমন বিস্ময়কর ভাবে ওকে পাওয়ায় আমার যে কি অনুভূতি হ'ল সে আর বলে বোঝানোর নয়। ও যে আমার কাছে এমন মূল্যবান আগে কখনও সে ধারণা হয় নি। অথচ ও যে কেন এমন ভাবে চলে এল আর কেনই বা কথা বলছে না জানা দরকার। এটা এখন পরিষ্কার হ'ল যে পথে দেখা গাছগুলো ওরই কাটা, বাঁশটাও নিশ্চয় ওরই রেখে আসা। এত সহানুভূতি আবার এত অভিমান! ও নিশ্চয়ই অনেক ভোরে উঠে হাঁটতে সুরু ক'রেছে! নইলে সারা রাস্তা এত কাণ্ড ক'রেছে আবার এখানে এসে বসেও আছে! আমি ওর খালি হাতটা ধরলাম, জিজ্ঞাসা ক'রলাম, তুমি হঠাৎ চলে এলে কেন?

আমার দিকে এবার জারোমথাঙ্গি সাপের চোখে তাকাল। ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, আমাকে তো তোমার একেবারেই পছন্দ নয়!

কথাটায় এক বর্ণ মিথ্যে নেই তা বলে এমন অপ্রিয় সত্যটা স্বীকার করি কি ক'রে। এই পরিস্থিতিতে ওর কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবার দুঃসাহসও নেই আমার। কিছুক্ষণ আগেই ওর মূল্যটা বুঝেছি তাই ওর অসন্তুষ্টি দূর করবার জন্যে বললাম, একথা তোমার মনে হ'ল কেন! এসব ভাবনা একেবারেই ভুল।

কঠিন অভিমানের গুরুভারে চাপা থাকার ক্ষোভ এত সহজে মেটবার নয়। ও কোন জবাব দিল না। আমার ধরা নিজের হাতটাও ছাড়িয়ে নিল না। দুজনেই হাঁটতে লাগলাম কিন্তু পথের অসুবিধের দরুণ হাত ছেড়ে দিতে হ'ল। সে ত্রুটি পূরণের জন্যে বললাম, তুমি এমন অদ্ভুত কথা ভাবলে কি ক'রে?

এবারও জারোমথাঙ্গি জবাব দিল না। মনে হ'ল ও কাঁদছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম চোখে জল নেই তবে মুখমণ্ডল থমথমে। এভাবে ওকে কখনও দেখি নি বলে মমতা হ'ল। আর যাই হোক ও আমার উপকারী, বন্ধু। ওর মনে ব্যথা দেবার মত কিছু করা অনুচিত। অথচ ওকে কি বলে যে সান্ত্বনা দিই ভেবে পাচ্ছি না। পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন এখন থাক, ওর সঙ্গে যখন বেরিয়েছি তখন আর ওসবের মূল্য নেই। তাই ওর মন রাখতে বললাম, তোমাকে অপছন্দ হ'লে তোমার সঙ্গে এমনি ক'রে চলে আসতাম?

এই আচমকা কথাটা দারুণ কাজ ক'রল। মুহূর্তে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল জারোমথাঙ্গি, ম্লান স্বরে বলল, সে তোমার উপায় ছিল না বলে।

কেন? আমি প্রতিবাদ ক'রলাম।

লালখোমাও তোমাকে মেরে ফেলত। গোটা বসতি তোমার ওপর ক্ষেপে গিয়েছিল তুমি তা জান।

ও ভয় আমার নেই।

তবে যে—বলেই জারোমথাঙ্গি থেমে গেল। আরও কিছু প্রশ্ন ক'রতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রশ্নটা আর যে কোন কারণেই হোক ক'রল না। সে শুধু সরল বিশ্বাসে আমার একখানা বাহু নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। সেইভাবেই হাঁটতে লাগল। আমি ওকে হালকা রাখবার জন্যে জানতে চাইলাম, পথের ধারে গাছগুলো কি তুমিই কেটেছিলে?

ও চুপ ক'রে থেকে সম্মতি জানাল।

কেন ওরকম কাটলে?

আমার খুশি—ছেলেমানুষী কণ্ঠে জবাব দিল।

সব কর্মকাণ্ড মিলিয়ে আমার প্রতি ওর প্রীতির গভীরতা পরিমাপ ক'রতে পারলাম। কিন্তু আমি কি ক'রতে পারি ওর জন্যে? ওর প্রতি আমার সহানুভূতিটুকু প্রকাশ করা কিভাবে সম্ভব? ওকে যত মিথ্যে বলেই স্তোক দিই না কৃতজ্ঞতাও কিছু তো আছে! দুর্ধর্ষ মাঙ-এর পক্ষে আমার মত একটা পিঁপড়ে মারা কিছু নয় বরং বহুদিন বাদে ওদের গ্রাম একটা নরমুণ্ড শিকারের সুযোগ পেয়ে আদিম উত্তেজনায় পূর্বপুরুষদের সঙ্গে একাত্ম হ'তে পারার গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। ফাদার পিটার তাঁর এতদিনের দীক্ষা, জ্ঞান প্রচারের মহিমার ধ্বংসাবশেষ হাতে নিয়ে হয়ত শান্তির জল ছিটোতেন মাত্র। আর আমার, কি বা হোত? ভেবে দেখলাম কি বা তফাৎ হ'ত তাতে? এই পৃথিবীতে দু দিন বেশী বাঁচা আর কম বাঁচার তাৎপর্যই বা কি? একই তো! শেষ হওয়া—যে কোন সময় যে কোন ভাবে শেষ হওয়াই তো এক। একটা কীট বা পতঙ্গের আয়ু তার জন্মের সময়েই সীমাবদ্ধতায় থাকে। মূল্যহীন জন্ম-মৃত্যুতে পৃথিবীর সংখ্যাতত্ত্ব ভারী; জন্মেছি যখন তখনই সেই সংখ্যা যোগ হয়েছে মৃত্যুতে তো আর নতুন কিছু ঘটছে না!

তা না হোক, তবু আমার জারোমথাঙ্গির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমি যেন সেই কৃতজ্ঞতাকে অস্বীকার ক'রতে চাইছি। কারণ বেঁচে থাকার কিছুমাত্র তাৎপর্য নেই জানি তবু জীবন জীবনই। তারজন্যে একটা মায়া থাকে। এই মায়া অস্বীকার করা যায় না। আমারও আছে। জীবন যে একটা শূন্যতামাত্র এ তো সবাই জানি, সারাজীবনের সঞ্চয় আর অপ্রাপ্তির অঙ্ক ফল কিছুই নয় তাও সত্য। তবু মোহ কোন ক্ষুদ্র বস্তু নয়। তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে খুশিতে ডগমগ জারোমথাঙ্গি বলে উঠল, তুমি এত কি ভাব বল তো? মাঝে মাঝে চুপ ক'রে থাক কেন?

আমি ভাবনা ছেঁড়া ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে ওর সঙ্গে কৌতুক ক'রতে চাইলাম।

বললাম, তোমার কথাই ভাবি। —এই কথা বললে ও খুশি হবে জানতাম বলেই বললাম। তবে নিছক যে ওকে খুশি করাবার জন্যে তা নয়, ওর সরলতা নিয়ে মজা করবার জন্যে।

ও আমার কথা যে বিশ্বাস ক'রল না তা সরাসরি বলে দিল। আমি বললাম, তবে তুমি বল আমি কি ভাবতে পারি।

তুমি তোমার দেশের কথা ভাব—জারোমথাঙ্গির অনুমান সে প্রকাশ ক'রতে আমি আবার তাকে হালকা ভাবেই জিজ্ঞাসা ক'রলাম, তুমি কি আন্দাজ ক'রতে পার কোথায় আমার দেশ ?

সমতল ভূমিতে।

সে তো হ'ল। কোনদিকে ?

দিক দিগন্তের ধার জাবোমথাঙ্গি ধারে না। প্রয়োজন তাকে যেমন ভাবে নিয়ে বেড়িয়েছে সে ঘুরেছে। সে বলল, আমি তোমাদের দেশের লোক অনেক দেখেছি।

কোথায় ?

চার্চের কাজে ছেলেবেলায় যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে।

সে কোথায় ?

জারোমথাঙ্গি চুপ ক'রে রইল। বুঝলাম স্মৃতি ওকে সাহায্য ক'রছে না। মরুকগে। যেখানে খুশি ও গিয়ে থাক, আমার কিছু নয়। আমি এ নিয়ে আর মাথা না ঘামানোই ঠিক ক'রলাম। এর মত একটি আরণ্যকন্যা আমার দেশ জানবে সেটা সম্ভব নয়। এই বিচিত্র জীবন একটি মাত্র পাহাড়ের বসতিতে বন্ধ থাকে। তার বাইরে যে বিশাল জগত, বিপুল কর্মকাণ্ড, সে সব কোন সন্ধানই এরা রাখে না। আবার আমাদের সমতলের মানুষেরাই কি ভূগোলকে প্রত্যক্ষ ক'রতে এই বনভূমিতে আর শুধু পাহাড়ের দেশে এই বৈচিত্র্যময় মানুষগুলোকে চিনছে ? জারোমথাঙ্গি শিশুকাল থেকেই মিশনারী সংস্থার সঙ্গে মানুষ হয়েছে তাই নিজের জন্মভূমির বাইরেই কেটে যাচ্ছে তার জীবন। দেখেওছে কিছু। অনেক কিছুই হয়ত দেখেছে সব আমি জানি না।

ও যে অনেক কিছু দেখেছে আমাকে উদ্ধার ক'রেই তার প্রমাণ দিল। আমার সঙ্গে এক জায়গায় ওর মিল—আপন জগৎ থেকে ও আমারই মত বিচ্ছিন্ন। কোথায় ওর জন্মস্থান, কোথায় পড়ে আছে আপনজন কিছুরই ঠিকানা নেই। একটা মেয়ে হয়ে সে এই জীবনে এল কি করে ? আমিই বা কি করে এলাম ? ভাবতে গিয়ে নিজেই কেমন থমকে গেলাম। কোথায় কলকাতা শহরের জীবন, কোথায় পাটনার প্রতিবেশের বাড়ী, কোথায় অলকনন্দা আর মা-বাবা ভাইবোনেরাই বা কোথায় ? সেই কবে যে সব ছেড়ে এসেছি, কেনই বা এলাম ? সত্যিই তো কেন এলাম ? সামনে একটা জলস্রোত পড়তেই আত্মপ্রশ্ন অপসৃত হ'ল। জারোমথাঙ্গি

জল দেখামাত্র পাশেই কাঁধের বোঁচকা নামিয়ে বসে পড়ল। জলধারা ডানদিক থেকে বয়ে এসে বাঁদিকে নেমে যাচ্ছে। পথের ওপর থেকে আঁজলা ক'রে তুলে প্রথমে ও মুখচোখ ভাল ক'র ধুলো তারপর পান ক'রতে লাগল সেই জল। ওই স্বচ্ছ জল দেখে আমারও ভাল লাগল। গতরাত্রে জল পান করিনি কাজেই আমারও প্রয়োজন। আমি ডানদিকটায় একটু গড়ানে জায়গায় জল ধরলাম। সঙ্গে একটা বাটি বা মগ থাকলে এখন এই জল তুলে স্নানটাও ক'রে নেওয়া যেত। ক'দিন ও কাজটা হয় নি। তাছাড়া এখানকার আবহাওয়াও বেশ উষ্ণ। এখনও কতদূরে হাঁটতে হবে জানি না। বেলা বেড়ে গেলে হাঁটতে গরম লাগবে কাজেই এখন স্নান ক'রে নিলে আরাম হত।

আমি জল পান করে উঠে দাঁড়াতেই জারোমথাঙ্গি বলল, কি ভাবছ ?

এবার আমি অবাক হলাম। আমি যে কিছু ভাবছি তা ও কি ক'রে বুঝল ? ওর মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলতে ও বলল, এখানে একটু বসা যাক।

আমি বললাম, ভাবছিলাম গা ধুয়ে নিতে পারলে ভাল হত।

হঠাৎ ও বলল, পাহাড়ের যত জল তোমাদের সমতলে গিয়ে জমা হয় তো, তাই তোমরা দেখেছি খুব গা ধোও। তা বেশ এখানে তো অজস্র জল আছে ধুয়ে নাও। —বলে ও নিজেই উদ্যোগী হয়ে আমার গায়ের জামা টেনে খুলতে চেষ্টা ক'রতে লাগল। বলল, আমি তোমাকে সাহায্য ক'রছি।

ওর এই চেষ্টার মধ্যে বেশ ছেলেমানুষী মনের খেলা সুরু হয়ে গেল। যেন পুতুল নিয়ে খেলছে কোন শিশু। আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, আরে থাম। এখানে একটা পায়ের পাতা ডোবেনা স্নান কি ভাবে সম্ভব ?

ততক্ষণে ও বেশ মজা পেয়ে গেছে। আমার কথাকে তোয়াক্কা না ক'রে বলল, তুমি চুপ করে বসো না। আমি সব ক'রে দিচ্ছি।

আমি বুঝলাম না ও কি ব্যবস্থা ক'রবে। কিন্তু আমাকে ভাববার যথেষ্ট অবসর না দিয়েই ও আমার গায়ের কোটটা খুলে নিল। আমি বাধা দিলাম না। পরক্ষণেই ও আমার জামাটা ধরে টানাটানি ক'রতে লাগল। আমি ওকে নিবৃত্ত ক'রতে চাইলাম, বললাম, বেশ এ কষ্টটা আমিই ক'রছি। তুমি থাম।

ও বেশ মজা পেয়েছে। অনেকটা আপন মানেই বলল, আমিও গা ধোব। —চারপাশে দেখে নিল। মানুষ তো দূরের কথা কোন প্রাণীমাত্র চোখে পড়ল না। জারোমথাঙ্গি বেশ আশ্বস্ত হয়ে নিজেকে উম্মুক্ত ক'রতে লাগল। শরীরের শেষ কাপড়টা খোলবার আগে ও হাতের কাটারিটা নিয়ে সরু জলধারার একটা জায়গা সামান্য একটু গভীর ক'রে নিল, তারপর একটা বড় দেখে পাথর এনে তার ঠিক স্রোতবহা নিচেই রাখতে জলধারার গতি ব্যাহত হয়ে সেখানটায় একটা জলকুণ্ড তৈরী হ'ল। ওর কর্মস্থলের দূরত্ব আমার অবস্থান থেকে হাত তিনেক হবে।

আমাকে বলল, এবার এস। তোমার তো দেখছি কাপড়ই খোলা হয় নি।

একটা গামছা পরে নিতে গিয়ে ভাবলাম জল তোলবার মত কোনই পাত্র যখন নেই বরং গামছাটা ভিজিয়ে গা মুছে নিলেই চলবে। কিন্তু ও আমাকে অবসর না দিয়েই এসে আমার বাহু ধরে টানাটানি ক'রতে আমাকে যেতেই হ'ল। আমাকে কুণ্ডের ধারে পেয়ে জারোমথাঙ্গি যেন শিশুর মত হয়ে গেল। দুই হাতের পাঞ্জা জুড়ে জল তুলে আমার পিঠে মাথায় দিতে লাগল। বেশ ক'দিন বাদে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে শরীরে তৃপ্তি এল। ও আমাকে ছোট ছেলের মত ক'রে স্নান করাতে লাগল। আমার পিঠ খুব যত্ন ক'রেই ঘষে দিল যাতে বেশ আরাম বোধ ক'রছিলাম।

আমার স্নান শেষ হবার পরই মনে হ'ল ও আমাকে যেমন যত্ন করে স্নান করাল তাতে আমারও সাহায্য করা উচিত। আর কিছু সম্ভব না হ'লেও করপুট জুড়ে জল তুলে যদি ওর মাথায় গায়ে দিই তাহলেও ওর স্নান সহজ হবে। ওর দুই ছোট হাতে যতটা জল উঠেছে আমার উঠবে তার অনেক বেশী। এটুকু সহযোগিতা যদি করি তো ওর সুবিধে হবে। কথাটা মনে হল ঠিকই, কিন্তু আমি নিজের গামছা ছেড়ে শুকনো কাপড় পরায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দেখলাম ও নিজেই অতি চেষ্টায় ডানহাতের পাঞ্জায় যতটুকু জল ধরে তাই তুলে নিজের দেহে ছিটাচ্ছে। নিজেকে বিস্মিত করা এমন নিস্পৃহতা আমাকে পেয়ে বসল যে আমি যে সব সদিচ্ছার কথা মনে এতক্ষণ পুষছিলাম তার একটাকেও কাজে লাগালাম না।

জারোমথাঙ্গির মুখে কিন্তু বিকার মাত্র নেই। বেশ হৃষ্ট চিত্তেই সে আপন চেষ্টায় রত। বরং একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে তো কেমন আরাম! —তা তো দেখলাম, দেখছি ওর তৃপ্তিও। একটা ব্যাপার বেশ আশ্চর্য হয়েই দেখছি গায়ে কাপড় জড়িয়েই ও গা ধুচ্ছে। একবারও শরীর উন্মুক্ত ক'রছে না। বিস্ময় জাগছে এই যে এই মেয়েই কি গত রাত্রে অমন ভাবে সর্বস্ব সমর্পন ক'রতে চেয়েছিল! নাকি আমার ভুল! ভুল যে নয় সে তো সকালেই বোঝা গেছে। তবে এখন ওর অমন গোপনীয়তা কেন? যে শরীর মুক্ত ক'রে আনন্দ পেতে চেয়েছিল রাতের ওই প্রতিকূল পরিবেশেও, সেই শরীর এমন অনুকূল অবস্থায় আড়াল করার প্রয়াস কেন ওর? তবে কি মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে? গত রাত্রির মন বিসর্জন দিয়েছে জারোমথাঙ্গি, আমার প্রতি কি ভাবের হয়েছে পরিবর্তন? আমি যেন একটু ক্ষুন্ন হলাম।

হলে দোষের কিছুই নেই। আমি তো ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার কিছু মাত্র করিনি! ও যদি এখনই আমার সম্বন্ধে চিন্তা বদলায় তাহ'লেও অন্যায় কিছু হবে না। এত বুঝেও আমি কিন্তু মনঃক্ষুন্ন হচ্ছি, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বদলে আমার দুঃখ হবার কি থাকতে পারে? অথচ হচ্ছে এটাই! আসলে আমারও

বোধহয় তেমন দোষ নেই, প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্যে পুরুষদের এমনি স্বার্থপর ক'রেই গড়া হয়েছে। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই পুরুষেরা ভোক্তামাত্র। তাদের ভূমিকা শুধু গ্রহণের, অধিগ্রহণের। সিংহ নিজে শিকার করে না অথচ শিকারের প্রথম ভাগীদার সে, দলের মধ্যে একা সিংহ যত পারে ভোজন ক'রে যা উদ্বৃত্ত থাকে শিকারী সিংহীদের সমবেত ভোজ্য সেইটুকুই। আমিও তো প্রকৃতিসৃষ্ট প্রাণীমাত্র। জীবধর্মে যে সাযুজ্য তার বাইরে যাই কি ক'রে? আত্মতৎপরতা সৃষ্টি সূত্রে পাওয়া। এই ভাবনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়।

আমার ভাবনার অবসরেই ওর কাপড়চোপড় পরা হয়ে যেতে বলল, এবার চল। এখনও অনেকটা যেতে হবে।

আসলে তুমি কি জান যে আমরা কোথায় যাচ্ছি?—আমি ওকে প্রশ্ন ক'রলাম। ও পরমরমনীয় ভঙ্গীতে হেসে বলল, এটা তুমি ঠিকই ধরেছ।

চমৎকার!—শব্দটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল মাতৃভাষাতেই। জারোমথাঙ্গি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা ক'রল, কি বলছ?

আমি অনেক দুঃখেও হেসে ফেললাম। হাসি আপনি বেরোল। বললাম, তোমার ব্যাপার দেখে আমি যে কি বলব ভেবে পাচ্ছিনা।

ও হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বলে উঠল, ওই দেখ!

ওর সংকেত অনুসারে দেখি পাহাড়ের অনেকটা নিচের দিকে কয়েকটি কিশোরী ও মহিলা জল ভরছে। জল দেখা যাচ্ছে না পাত্র দেখা যাচ্ছে। অনুমান হ'ল এই জলধারাই নেমে যাবার পথে ওখান দিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখাতে জারোমথাঙ্গি বলল, আমরা নিশ্চয়ই কোন বসতির কাছে এসে পড়েছি।

হ'লে খুশি হবো—

এবার অকস্মাৎ চিন্তিত হ'ল জারোমথাঙ্গি, যা অস্বাভাবিক। আমি ওর এই ভাবান্তরে অবাক হলাম। চিন্তা এবং জারোমথাঙ্গি দুটোকে এক সঙ্গে মেশানো যে সম্ভব জানা ছিল না। এ এক নতুন অভিজ্ঞতার অভিঘাত। চলতে চলতে নিত্যনতুন ঘটনা নতুন নতুন চেতনার জন্ম দিচ্ছে, অভিজ্ঞতা হচ্ছে; কিন্তু কি লাভ? জীবনে অভিজ্ঞতাগুলো কোনই কাজে লাগে না, অভিজ্ঞ হতে হতেই জীবন ফুরিয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়। জীবন ফুরোলে অবশিষ্ট কি থাকে? আমি জানিনা। সামান্য সিগারেট ফুরোলে তো তবু থাকে ছাই, সেই ছাই অবশেষে মাটি হয়ে যায়। জীবনের কি হয়? ফুরিয়ে যায় মানে শূন্য হয়ে যায়। অথচ পৃথিবীতে ফুরিয়ে যাওয়া নাকি নেই, সবই নাকি রূপান্তর। তা হ'লে জীবনের রূপান্তর কি? পরিবর্তিত পরবর্তী রূপ? কিছুই না। কি যেন সব ভাল ভাল কথা আছে—আত্মা দেহ পরিবর্তন করে জীর্ণ পোষাক বদলের মত—ইত্যাদি। সে না হয় হ'ল তা বলে জীবনের কি হয়? জীবন তো দেহও নয় আত্মাও নয়,

জীবন জীবনই। আমার জীবন আমার জীবনই। এই দেহ, এই আত্মা, এই পৃথিবী, এই লাভলাভ নিয়ে যা কিছু তাই জীবন। ফুরোলে? ফক্কা। ফক্কা শব্দটা আকস্মিক ভাবেই আমার মুখ থেকে ছিটকে বেরোল। জারোমথাঙ্গি তাতে সচকিত হয়ে স্বভাষায় কি যেন বলে উঠল অস্ফুট স্বরে। পরক্ষণেই চটকা ভেঙে বলল, চল। কোন চিন্তা নেই।

কিসের চিন্তা ক'রছিলে?

ওটা কাদের গ্রাম তাই ভাবছিলাম।

বুঝলাম ও গোষ্ঠিদ্বন্দ্বের কথা ভাবছিল। এমন কোন গোষ্ঠির বসতি কি না যারা অন্য কাউকে সহ্য করে না। গিয়ে পেঁছিাবার আগেই তাহ'লে অস্ত্র বিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে হবে। কিন্তু গ্রামটা কোথায়? এতক্ষণ বন তরল ছিল ঝরণাটা পার হবার পর আমরা যেন ক্রমশই ঘন বনে ঢুকে পড়লাম। দুপাশে বিশাল আকারের খাংরা আর ইয়াংগো গাছ যেন আকাশকে মাথা দিয়ে ধরে রয়েছে। বাঁ দিকের গাছগুলো নিচে থেকে উঠে এসেছে, পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ডানদিকের গাছ আমাদের পাশ থেকে বা কোথাও আমাদের মাথার কাছ থেকে উঠে গেছে কোন মহাশূন্যে যে তাকিয়ে দিশা পাওয়া যায় না। ছোট ছোট অসংখ্য গাছালি ফাঁক ফোকর ভরাট ক'রে রেখেছে। আমার আশংকা হ'ল বিপথে চলে এসেছি। পথের চিহ্ন মাত্র নেই। এদিকটায় আবার বাঁশ নেই। আমার হাতের লাঠিটাই যা নমুনা। এখানে ওটিকে অত্যন্ত উপযোগী মনে হচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে ওটা আমাকে সাহায্য ক'রতে পারে। হঠাৎ জারোমথাঙ্গি আমার গা ঘেঁষে এল। ওর চোখে মুখে আতঙ্ক। আমি ওকে দেখে বুঝলাম ও কিছু বিপদের আশংকা ক'রছে। হাতের অস্ত্রটি প্রস্তুত রাখল। আমিও ওর জন্যে উৎকর্ণ হয়ে গেলাম, মনে হ'ল সামান্য একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোন জন্তুর শব্দ বলে বোঝা গেলেও কোন জন্তুর ধরতে পারছি না। হঠাৎ লতাগুল্ম ছড়িয়ে পড়ে থাকা পাতায় ধ্বনি তুলে যে এসে পড়ল তাকে দেখে আমার রক্ত বোধহয় শরীরেই জমে গেল। জারোমথাঙ্গিও স্থির ক'রতে পারল না কি ক'রবে। আমি বুদ্ধি ভ্রষ্ট হতে গিয়েও কেমন ক'রে যেন দু হাত বাড়িয়ে জারোমথাঙ্গিকে ধরে টেনে নিলাম। নিজেও দুপা পেছিয়ে গেলাম। বিশাল একটি সাপ। ময়াল। একেই বোধহয় অজগর বলে। আমাদের দিকেই আসছিল কিন্তু অকস্মাৎ যাত্রা বদল ক'রে কয়েক পা দূরত্ব দিয়ে ধীরে ধীরে সরে গেল বটে আমার ততক্ষণে উত্তেজনাতেই শেষ হবার অবস্থা। বুকের মধ্যে এমন অস্থির অনুভূতি হয়নি অনেক দিন। মনে হচ্ছে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম, মৃত্যুর দূত এসেও ফিরে গেল। কেন গেল বুঝলাম না। শুনেছিলাম এই সব সাপের প্রচণ্ড সম্মোহন থাকে, গল্পের সাপের নাকি নিশ্বাসেও বিষ। তা যদি থাকত সেই বিষক্রিয়াতেই আমরা দুজন এখন

শয্যাশায়ী হতাম। অনেক বিষের ক্রিয়া তো আবার পরেও হয়। জানি না তেমন হবে কিনা। জারোমথাঙ্গিরও বাকরোধ হয়ে গেছে। তার কাটারি সমেত হাত ঝুলে পড়েছে। খুব রক্ষে যে কাটারিটা ও ব্যবহার করে নি। নইলে আহত সাপ যে কি ভীষণ হতে পারত তা ওর আকারেই পরিষ্কার। জারোমথাঙ্গির চোখে মুখে প্রচণ্ড উত্তেজনার ছায়া। ও যেন হাঁপাচ্ছে।

এমন ভয় পেতে ওকে আর দেখিনি। অবশ্য দেখবার সুযোগও আসে নি। সাপ সম্বন্ধে ওর বোধহয় বিশেষ ভীতি আছে অথবা স্পর্শকাতরতা। যতক্ষণ ধরে বিশাল সাপটা গেল ও সিঁটকে রইল তা দেখেই ওর মনোভাব বুঝে নিলাম। আমিও যে খুব সুস্থ ছিলাম এমন নয় তবে এত বড় না হলেও সাপের সামনা সামনি আমি আগেও হয়েছি আর সাপের সামনে আচমকাই পড়তে হয়। সাপটা চলে যেতে আমরা কিছুক্ষণ আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চলতে সুরু ক'রেই আমি বললাম, আমার কেবল ভয় হচ্ছিল তুমি না ওর গায়ে কাটারিটা বসিয়ে দাও। শব্দ ক'রতে পারছিলাম না বলে নিষেধও করা যাচ্ছিল না।

জারোমথাঙ্গি বলল, ওকে মারতে গেলে আমাদের মরতে হত। ও রাজ সাপ।

মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম ওর সুবুদ্ধিকে। বিপদে সুবুদ্ধি উদয় হলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তার বেশী আর কি করা যায়? বিনাশ বুদ্ধি নাশ করে। তখন আর কিছুই করবার থাকেনা। সাপটাকে ভুলতে পারেনি বলে কিছু পথ এগিয়ে সে বলল, এই রকম সাপ একটা আস্ত হরিণকে গিলে ফেলতে পারে। আমার মনে পড়ল বাবার কাছে ছেলেবেলায় গল্প শুনেছিলাম এই সাপেই না কি আমাদের গ্রামে অনেক গরু বাছুর খেয়ে ফেলেছিল। সেই সাপটাকে যেদিন পাহাড়ের এক গর্তে মরা পাওয়া গেল সবাই মিলে কেটে দেখল তার পেটের মধ্যে একটা আস্ত হরিণের কাঠামো—মাংস প্রায় জীর্ণ হয়ে গেছে।

আমি ওর কথার কোন উত্তর দিলাম না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আমরা বিপথে এসে গেছি। সামনে পথ তো নেইই ক্রমাগত দুর্গম। পা রেখে চলাও দুরূহ হয়ে যাচ্ছে। অথচ বোঝা যাচ্ছে আমাদের নিচের দিকেই নামতে হবে। অকস্মাৎ এক ফাঁকে নজরে এসেছে নিচে ওই ডান দিকে বিস্তীর্ণ সবুজ সমতল। সেই সমতলে গাছ কেটে চাষবাস চলছে। আমরা ওই সবুজ অধিত্যকাটির আশাতেই যেন দু'দিন পথ চলছি। চারিদিকে ঘনসবুজ কালচে অরণ্য তার মধ্যে অধিত্যকার সবুজ অনেকটাই তরল। তুলনায় বলা চলে কচি সবুজ। এক ঝলকের দেখা অনেক সময় দীর্ঘকাল স্মৃতিকে সুখলিপ্ত করে রাখে। অধিত্যকাও আমাকে তাই ক'রল।

কিন্তু আর একটু এগিয়ে দেখা গেল যাবার আর উপায় নেই। আমি একটা বড় পাথরের ওপর উঠেই নিচের দিক থেকে উঠে আসা একটা মহীরুহের একটি

ডালের নাগাল পেয়ে গেলাম। চট ক'রে বুদ্ধি এল, কাঁধের ভার নামিয়ে উঠে পড়লাম তার ওপর। বেয়ে বেয়ে মূল কাণ্ডে পেঁছে দেখতে চেষ্টা করলাম কোন পায়ে চলার উপযোগী পথের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। নিচে বহু দূর গিরিখাত পর্যন্ত শুধুই সবুজ গাছ, গুল্মলতা। কোথাও কোন ফাঁকফোকর চোখে পড়ল না। এমনকি একটু আগে যে সবুজ সমতল দেখেছিলাম সেটা নিছক সুখ স্বপ্ন বলে ভ্রান্তি হতে লাগল। আমরা ঘুরে এসেছি। এখান থেকে সেই প্রাণের নিশানা দেখা যাবে না। ওখান থেকেই জারোমথাঙ্গিকে বললাম, কোন দিক দিয়ে যাওয়া যাবে বোঝা যাচ্ছে না। যাবার উপায় নেই বলেই মনে হচ্ছে। অন্যদিক দিয়ে যেতে হবে।—গাছের ওপর থেকে আমি যতটা পারি দেখে নিলাম। আমরা যে পাহাড়ে আছি তার সমস্ত দেহজুড়ে গাছ আর গাছ। ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের নানা জাতের কত কোটি গাছ যে আছে তার হিসেব বোধকরি প্রকৃতিও রাখতে পারে নি। কোটি নয় কোটির পর অর্বুদ তার পরও যেন কি একটা আছে তত গাছ। তারও চেয়ে বেশী। পাশের পাহাড় তার পাশের পাহাড় তার পাশের—যতদূরে দৃষ্টি যায় আর যতদূর পথ আমরা এসেছি সমস্ত জুড়ে প্রকৃতির কি বিপুল আয়োজন। অকস্মাৎ মনে হ'ল ডুয়ার্সের সেই চাবাগান হয়ে যাওয়া বনের কথা—সেটা এখান থেকে কতদূর হবে? যতদূরই হোক এখান থেকে সেখান পর্যন্ত কোথাও সামান্য ফাঁক ফোকর থাকলেও সমস্ত জুড়ে যেন এক অবিচ্ছিন্ন বনভূমি। শহরের নগরে বন্দরে স্বাধীনতা অধীনতা হয় এসব অরণ্যে ওসব বুঝি হয় না।

জারোমথাঙ্গি নিচে থেকে তাড়া দিল, নেমে এস।

সূর্য খাড়া ওপরে। পেটের মধ্যে অনুভব ক'রছি আগুনের স্পর্শ। সবুজ স্বর্গের স্বপ্ন থেকে নেমেই এলাম। জারোমথাঙ্গির মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তা। আমার মনে হ'ল ওর মুখে চোখে অব্যক্ত প্রশ্ন লেখা হয়ে আছে, কি করি বল তো?

সমস্যাটা ওর যেমন তেমনি তো আমারও। কাজেই বুদ্ধির কাছে হাত পাতলাম পরামর্শের জন্যে। পথ এখানে যে পাকদণ্ডী সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। কারণ কেউ কালেভদ্রে দু একজনের চলার জন্যে এখান দিয়ে রাজপথ বানিয়ে রেখে যায়নি। তা ছাড়া কোন শেরসাহের এখানে কখনও তরুবিজয়ের প্রয়োজনও হয়নি যে নিজের আসার জন্যে পথ করে রাখবে প্রসারিত।

নিচের দিকে নামা যাচ্ছে না দেখে আমরা ওপর দিকে উঠতে চেষ্টা ক'রলাম। যদি আরও কিছুটা উঁচু দিয়ে ঘুরে যাবার উপায় থাকে। এখানটা সত্যিই দুর্গম, দুরতিক্রম্য যাকে বলে। চিন্তিত জারোমথাঙ্গিও। নিজে থেকেই বলল, আমি তো জানতাম এদিক দিয়ে লোকজন যায়। ওপাশে যাবার পথ আছে। তবে কি এখানটায় ঠিক চিনতে পারছি না? পথটা বোধহয় অন্যদিকে।

আমার আশংকা অন্য। এখানে বন যা ঘন হিংস্র প্রাণী নিশ্চয়ই আছে। যদি আচমকা ঘাড়ে এসে পড়ে তো হয়েছে। তাছাড়া পথ খুঁজে পাবার চেয়ে খাবার পাওয়া এখন জরুরী। পথ তো কিছুক্ষণ পরে পেলেও চলবে কারণ বেলা আছে। ক্ষিধে আর সহ্য হচ্ছে না। মুস্কিল হয়েছে এই যে এ অঞ্চলের ফলমূল আমি কিছুই চিনি না। জারোমথাঙ্গির চেনবার কথা কিন্তু সে-ও চেনে খুব কম। তার অভাব অভিজ্ঞতার, কারণ অল্পবয়েস থেকে গির্জার আওতায় মানুষ হবার জন্যে বনের কচু চেনবার প্রয়োজন ওর হয়নি। রক্তের ধারাবাহিকতা ওকে যতটুকু ধারণা দিয়েছে তার চেয়ে আমার জ্ঞানই বরং কিছুটা বেশী। আমি জেনেছি অভিজ্ঞতায়, প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজনে। তবু সব জানা হয়নি, নিশ্চয়ই আমাদের চারপাশের উদ্ভিদগুলোর মধ্যে কিছু আছে যা খাবার হিসেবে ব্যবহার ক'রে সাময়িক প্রাণরক্ষা সম্ভব। কিন্তু চিনিনা বলেই ভয়, ভয় বিষাক্ত উদ্ভিদের জন্যে। বিষাক্ত উদ্ভিদ এমন আছে যে মুখে দেওয়া মাত্র মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়।

হঠাৎ জারোমথাঙ্গি একটা বিশাল গাছের দিকে দেখিয়ে বলল, দেখ ওই গাছটার মাথায় যদি কোনরকমে ওঠা যায় তাহ'লে নিচে নেমে যাওয়া সহজেই সম্ভব হতে পারে। চেয়ে দেখলাম আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার প্রায় পাশেই একটা ইয়াঙ্গো গাছের ওপর দিকটা প্রায় একশ দেড়শ ফুট নিচে থেকে উঠে এসেছে। নিচের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা ক'রলাম কোনক্রমে যদি গাছটার মাথায় চড়া যায় তাহ'লে গাছ বেয়ে নিচে নেমে কি সুবিধে হওয়া সম্ভব। মনে হ'ল জারোমথাঙ্গির অনুমান অনেকটা ঠিক। গাছটা একটা শুকনো নদী থেকে উঠে এসেছে। বর্ষায় পাহাড়ের গা বেয়ে যে সব জলধারা বয় তার মধ্যে বড় আকারের গুলোকে নদী বলে ধরা হয়। সারাটা বর্ষা অজস্র জলে পূর্ণ থাকে দুর্দান্ত এই জলপথ গুলো। এখন শান্ত, শুধু শুকনো কিছু গাছের কাণ্ড আর অসংখ্য ছোট বড় পাথরের নুড়ি বিছানো রয়েছে নদীখাত ধরে। কাজেই ওই শুকনো নদী বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। এখন যেটা প্রথম সমস্যা তা ওই গাছের মাথায় পেঁছান। গাছের কাছের ডালটাও প্রায় হাত চারেক তফাতে। এতটা দূরত্ব লাফানো বাঁদরের পক্ষেই সম্ভব, আমাদের নয়। অথচ এও সত্যি যে এর চেয়ে সহজ পথ নজরে আসছে না।

জারোমথাঙ্গিকে বললাম, বাঁশ একটাও দেখছি না। বাঁশ থাকলে দুখানা গাছের ওপর পেতে দিয়ে চলে যাওয়া যেত।

আমার কথায় ওর কোন ভাবান্তর হ'ল না। ও যেন কিছুর সন্ধান পেয়েছে এমনি গাম্ভীর্য বলল, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ব্যবস্থা ক'রছি।

ও হাতের কাটারিটা নিয়ে চলে গেল, আমি বসে পড়লাম। অপেক্ষা আমি ক'রতে পারি, তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই। ও চোখের আড়াল হয়ে যেতে

অকস্মাৎ মনে এল আমার মধ্যে বেশ একটা পরিবর্তন এসে গেছে। আগে আমার এত প্রাণের মায়া বোধহয় ছিল না। তখন তো কই এমন স্থানকাল বিচার হয়নি। রাত এলে, অথবা রাত কাটানোর জন্যে চিন্তা হয়েছে, সতর্কতা হয়নি এত। এর কারণ কি জানি না, কেন যে এই সব চিন্তা সাবধানতা তাও বুঝি না। জীবনের যে কি মূল্য জানি না, আদৌ কোন মূল্য আছে বলেই তো মনে হয় না। যা দুদিন বাদে থাকবে না তা আজ হারালেই বা কি ক্ষতি? যে জিনিষ চিরদিনের নয়, কি লাভ তার জন্যে দিন গণনা ক'রে? অথচ আমাকে দেখছি সেই অহেতুক ভাবনাগুলোই ভর ক'রছে।

আমার ভাবনাকে বাড়তে না দিয়ে জারোমথাঙ্গি এসে হাজির হ'ল শব্দের অভিঘাত নিয়ে। চেয়ে দেখলাম তার হাতে কতগুলো লম্বা লতা। লতাগুলো যতটা হাতে ধরা সম্ভব তার থেকে অনেক বেশী লুটোচ্ছে মাটিতে। সেই ভাবেই আমাকে বলল, এবার চেষ্টা ক'রে দেখ তো পারা যায় কিনা—।

কি ভাবে চেষ্টা ক'রছ কর, আমি তোমাকে সাহায্য ক'রছি।

কয়েকবারের চেষ্টায় লতার মাঝখানটা একটা ডালে বাঁধানো তো গেল, এবার যে কি করা হবে আমার মগজে ঢুকল না। এই সামান্য লতার ওপর নির্ভর ক'রে পারাপার ক'রতে গেলে পতনের অর্থ নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন না থাকা। নিজের জন্যে তো নয়ই এতটা ঝুঁকি জারোমথাঙ্গির জন্যেও চাইছিলাম না। কিন্তু ওর উদ্যোগে এখনই বাধা দিতে লজ্জা লাগছিল বলেই চুপ ক'রে থেকে ওর কার্যপ্রকরণের জন্যে প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলাম। মনে মনে স্থির ক'রলাম এই রজ্জুপথ দিয়ে পার হবার উদ্যোগ করলেই বাধা দেব। কি কৌশলে বাধা দেওয়া যায় সেটা উদ্ভাবনের জন্যেই মস্তিষ্ক চালনা ক'রতে লাগলাম। এই লতাগুলো খুবই শক্ত হয় জানি কিন্তু আত্মসমর্পণের উপযোগী কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ যথেষ্টই আছে।

কিন্তু আমাকে হতচকিত করে চোখের পলকে দেখি জারোমথাঙ্গি একগোছা লতা ধরে ঝুলে পড়ল। বিচিত্র কৌশলে গাছের একটু নিচের একটা ডালকে জড়িয়ে ধরল নিজের দুই পা দিয়ে। হাত দিয়ে তখনও সেই লতার গুচ্ছই ধরা। হাত ছাড়লেই যে কোথায় ও পড়বে আমার আতংকিত অনুমান তখন সেই দিকেই ছুটছে। উত্তেজনায় রক্তের চাপ যে উর্ধগামী হৃৎপিণ্ডের ধ্বনিতেই তার প্রকাশ যেন আমি শুনতে পাচ্ছি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার রক্তের চাপ নামিয়ে জারোমথাঙ্গি ডালটাকে চেপে ধরল। সামান্য সময় পরে গাছ বেয়ে বেয়ে নিচেও নেমে পড়ল, একদম মাটিতে। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। পরমুহূর্তেই নিজের ভাবনায় পড়লাম—আমি তো ওভাবে যেতে পারব না। অসম্ভব। বিস্ময় মানলাম জারোমথাঙ্গির সাহস এবং ক্ষিপ্রতাকে। জন্মসূত্রে পাওয়া নাগরিক মানসিকতায় মনে

হ'ল অতটা ঝ‍ুঁকি নেওয়া অনুচিত হয়েছে। যদি পড়ে যেত। যদি হাত ফস্কে যেত ? যদি ওভাবে পা না পেত ? যদি ছি‍ঁড়ে যেত লতাগুলো ? এমনি অসংখ্য অব্যয়ে আমাদের যে মন ঘেরা তার বিপরীত বিন্দুতে জারোমথাঙ্গিদের অবস্থান। যদি শব্দটা ওরা জানে না বলেই কি দ্বিধাহীনতায় এত দিনের অভ্যস্ত জীবন অনায়াসে ছেড়ে এল। কোন অনুভাবনা ভোলালো না তাকে, সংশয়ী ক'রল না কোন অবিশ্বাস, নিমেষে তুচ্ছ ক'রল অতীতের প্রতি মোহ নিরাপত্তার নিশ্চিন্ততা। যার পক্ষে এতটা সম্ভব তার পক্ষে জীবন মরণের ভাবনাও অনুপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক।

অল্পক্লেশে ও তো ওপারে পেঁছে গেল এখন আমার পথ কি ? কতগুলো লতা এখনও আমার কাছে ধরা আছে তারও অন্যপ্রান্ত ওই গাছে আটকানো। কিন্তু ওর হালকা শরীর বয়েছে বলেই সমপরিমাণ লতা যে আমার ভারও বইবে এ ভরসা আমার কিছুতেই হচ্ছে না। জারোমথাঙ্গিও নিচের দিক থেকে সমাধান খ‍ুঁজছিল। সে গাছ বেয়ে ওপর দিকে ওঠবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বলল, একটা লতায় বেঁধে তুমি সব জিনিষ আগে পাঠিয়ে দাও।

তা না হয় দিলাম কিন্তু কি সমাধান হবে তাতে ? বরং লতার গোছাটি আরও সরু হয়ে দুর্বল হবে অধিকতর। তখন যদি এভাবেই জীবন বাজি ক'রে যেতে ইচ্ছাও করি হয়ে উঠবে না। জারোমথাঙ্গির বুদ্ধিতে দেখছি বিভ্রাট বাড়ল। এতক্ষণ দুজনে একসঙ্গে ছিলাম যা হচ্ছিল একভাবেই হচ্ছিল, এখন যে একত্র হবার আর পথ দেখছি না। কাজেই ওর পরামর্শ মত আর একটা লতাকে হাতছাড়া ক'রতে চাইলাম না। বললাম, ভাল করে ভেবে নাও তারপর বল।

ও কোন জবাব দিল না। আসলে ও নিজেও ভেবে পাচ্ছিল না কি ক'রে আমার পেঁছানো সম্ভব। ও বুদ্ধির কাজ ক'রেছে যে নিজে পারের লতাটা ছাড়েনি। আমি দেখলাম যে চিন্তাই করি না কেন এই পথেই আমাকে যেতে হবে হবে নইলে জারোমথাঙ্গি আর আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। আর বিচ্ছিন্ন হবার অর্থই এই বিজুবনে এক নিঃসঙ্গ রাত্রিবাস। আর রাত্রিবাসই বা কেন, যদি এখন পার হতে না পারি তো কালই বা পার হবো কি করে ? সমস্যা তো একই থাকবে। একটা রাত্রেই তো আর পথ গড়ে উঠবে না। হঠাৎ নজরে এল কাটারিটা আমার পায়ের কাছেই জারোমথাঙ্গির অন্য জিনিষগুলোর সঙ্গে পড়ে আছে। বললাম, জারোমথাঙ্গি তুমি অপেক্ষা কর আমি আরও কিছু লতা কেটে আনি।

যেখানে লতা কাটতে গেলাম আমার নজরে এল একটা চওড়া ফাটল আছে পাহাড়ে। বহু লতা তারই মধ্যে দিয়ে ঝুলছে। আমার মাথায় এল যদি এই ফাটলের মধ্যে দিয়ে ওই লতা ধরে নেমে যাই তাহলে পেঁছাব কোথায়। একটু বাঁক আছে বলে জারোমথাঙ্গির অবস্থান দেখা যাচ্ছে না তবে মনে হয় বাঁ দিকে

কিছুটা যেতে পারলে পেঁছে যাব। বরং জারোমথাঙ্গিকে বলে আসি যে গাছ থেকে নেমে ডান দিকে কিছুটা যাক। ভয় একটাই যে এই সব বড় বড় ফাটলের মধ্যেই বড় জাতের সাপেরা বাস করে। অন্য জন্তুও থাকে।

ঝুঁকে ফাটলটাকে লক্ষ্য করছিলাম, উঠে পেছন ফিরেই চমকে উঠলাম। মাত্র ক'হাত দূরেই ঝোপের মধ্যে—না, একটা হরিণ। আমার দিকে নজর পড়তেই ডানদিকে এক লাফ। মিলিয়ে গেল। প্রথম মুহূর্তের দেখায় ভয় পেলেও সে আমাকে নিশ্চিন্ত ক'রে গেল। হরিণ যখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ভয় পাবার মত প্রাণী তখন কাছাকাছি নেই। এখানকার হরিণগুলো অন্যরকম, কিঞ্চিৎ রোগা, কখনও হাঁটেনা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। হরিণের এরকম অদ্ভুত চলা আর কোথাও দেখি নি। এ অঞ্চলে এখন পর্যন্ত যে দুটো হরিণ চোখে পড়ল একই রকম। পিটার এগুলোর নাম দিয়েছেন নাচুনে হরিণ। কিছু কিছু গুণের জন্যে পাদ্রী পিটারকে ভোলা যায় না। একটা মৃত হরিণের জন্যে তাঁর যে সহানুভূতি সেদিন দেখেছি তাও কোনদিনই ভুলব না।

নিচে থেকে আসা তীব্র আচমকা শব্দে ভয় পেয়ে একটা বাদুড় উড়ে গেল ফাটল থেকে। আমিও চমকে উঠলাম। বাদুড়টা যে কোথায় গেল দেখবার সময় পেলাম না। দেখলাম নিচেটায় দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল জারোমথাঙ্গি আমাকে ডাকছে। হাত দিয়ে ক্রমাগত ইশারা ক'রছে নামবার জন্যে। অনেকগুলো ছোট গাছের পাতা আর অসংখ্য গুল্মের ফাঁক দিয়ে আংশিক ওকে দেখা যাচ্ছে। ওর উৎসাহ দেখে বুঝলাম এদিক দিয়ে নামা সম্ভব। আমি ওপর থেকে এবং ও নিচে থেকে দেখতে পাচ্ছে বলেই আমার আশা জাগল। এবার আমি লতাগুলোকে টেনে পরীক্ষা ক'রতে লাগলাম উপড়ে আসে কিনা।

অবশেষে নেমে এসে যখন জারোমথাঙ্গির সামনে দাঁড়ালাম ও তখন উত্তেজনায় অস্থির, আত্মভোলা হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বুঝলাম ও আমার চেয়ে অনেক বেশী ভয় পেয়েছিল দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াতে। নিজেকে সামলে নিতে পারবার পর ও বলল, এই দেখ এদিক দিয়ে যাওয়া কত সহজ।

একটু বাঁ দিকে ঘুরতেই সেই বিরাট ইয়াঙ্গো গাছটি যার ওপর ভর ক'রে ও নিচে নেমেছিল। গোড়ায় পড়ে আছে ওর পোঁটলা আর আমার মামুলী জামা কাপড়। সত্যিই এদিক দিয়ে নেমে যাওয়া অনেক সহজ। নিচে দেখা যাচ্ছে অনেকটা সবুজ জমির মত প্রান্তর। দূরে, কিন্তু স্পষ্ট। অতএব এটা ঠিক যে এটাই নির্ভুল দিক। শুধু তাই নয় সামনের নিচু পাহাড়টাতেই দু তিনটে ঘর দেখা যাচ্ছে। আভাস পাওয়া যাচ্ছে আসেপাশে আরও অনেকগুলো আছে। দুই পাহাড়ের গ্রন্থিস্থলে কয়েকটা গরুও চরছে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে

সামনের পাহাড় পেরিয়ে আরও কয়েকটা ছোট বড় পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ওই সবুজ সমভূমি। আমি সেই সমতল অরণ্যেই যেন চলছি। আমার ধারণা জারোমথাঙ্গিও তাই। নইলে আর কোন স্বর্গ আছে যেখানে যাচ্ছি আমরা? এখন আমার ভাবনা এল ওই সমভূমিতেই বা কি পাব আমরা? এখানেই বা কি পার্থক্য? কিছুই বুঝছি না, এখনও জানিনা কোন লক্ষ্যে পেঁছে আমরা থামব। এ যেন অনেকটা যুদ্ধ-যাত্রা। সৈন্যেরা জানেনা কোন সীমান্তে পেঁছাবে তারা অনর্থক মৃত্যু অথবা অকারণ হত্যার জন্যে। সংশয় অবসানের জন্যে জানতে চাইলাম, কোথায় থামব আমরা?

আমার চোখের দিকে সরল দৃষ্টি মেলে জারোমথাঙ্গি জবাব দিল, জানিনা।

সামান্য শব্দটুকু শুনে আমি যেন মাটিতে বসে পড়লাম। এই দীর্ঘ পথ, শ্রম, উত্তেজনা, এতসব পেরিয়ে কিনা ফলশ্রুতি এই লক্ষ্যহীন যাত্রা! এ যে সমুদ্রের অকূল জলে ফেনার মত ভেসে বেড়ানো। কি যে ওকে বলব ভেবে পেলাম না। তা ছাড়া আমি কিছু না বলে থাকবার চেষ্টা ক'রলাম এই জন্যে যে ক্ষুৎপিপাসায় এখন এতই কাতর যে আত্মসম্বরণ ক'রে কথা বলা হয়ত সম্ভব হবে না। পেট জ্বলছে, শরীর টলছে, তার ওপর যদি মনের মধ্যে দুলতে থাকে অনিশ্চয়তা তাহ'লে কি ভাবে মাথা ঠিক রাখা যায়? আমি চুপ ক'রে আছি দেখে ও ধীরস্বরে বলল, আর তো একটুখানি গেলেই পেঁছে যাব। ওই যে [illegible]টা দেখা যাচ্ছে ওর নিচেই আমাদের একজন লোক আছে।

কথাটা আশ্বাসের মত শোনালো বলে বিশ্বাস ক'রতে আরাম লাগল। অন্য সময় হ'লে ওর কথার সত্যাসত্য সম্পর্কে ভাবতে লাগতাম, এখন সে ইচ্ছে এলই না। ওর পরিচিত কেউ একজন সামনেই কোথাও আছে এবং আমাদের আশ্রয় দিতে পারে এমনি একটা সম্ভাবনার ভাবনা আমাকে উজ্জীবিত ক'রছে বলেই মেনে নিলাম। আমার এখন আশা প্রয়োজন এমন আশা যা বাকি পথটুকু চালাবে। চোখ দিয়ে অনুমান ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম পথের দূরত্ব খুব একটা বেশী নয়। কষ্টও কম হবে, এখন উতরাই। এটুকু পথ আর দেরী ক'রতে ইচ্ছে ক'রছে না। বিশ্রাম তো যে কোন জায়গায় নেওয়া যেতে পারে, প্রয়োজন এখন খাদ্যের।

চার পাঁচ ঘরের বসতির এলাকায় আমরা যখন এসে পড়লাম তখন রোদ ঝিম ঝিম ক'রছে। মাথাব ওপর গাছ অত্যন্ত প্রয়োজনের বন্ধু মনে হচ্ছে। একে ক্লান্তি তার ওপর ক্ষিধে—আমি যেন অবশ হয়ে পড়ছি। এখন প্রয়োজন শীতলতা। শরীর আর চলছে না। এই ক'টা ঘরের মধ্যে জারোমথাঙ্গির পরিচিত একটিও আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। ওর চোখে মুখে সেই পরিচয়ের উজ্জ্বলতা তো দেখছি না! দেখাই যাক ও কি করে। আর কিছু না হোক একটা গাছের ছায়ায় বসতে পারলেও হয়, ও ততক্ষণ আশ্রয় খুঁজুক। সামনের ঘরটায় একজন মহিলা

একপাল ছেলে মেয়েকে খেতে দিচ্ছিল। জারোমথাঙ্গি তার সামনে গিয়ে কি সব বলে কোমরে কষির মধ্যে থেকে কি একটা মুদ্রা বের ক'রে দিল। বহুকাল বাদে যেন আমি একটা পুরানো দৃশ্য দেখলাম। বস্তুত ওর কাছে অর্থ থাকতে পারে বা কখনও তা কাজে লাগতে পারে এমন কথা ভাবিও নি। আমি কি তাহ'লে আমারই মত ওকে যাযাবরী ভেবেছিলাম? কিন্তু যাযাবরীও যে জীবনের গণ্ডির বাইরে নয় এই সহজ সত্য আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমাকে সংগ্রহ করবার পেছনে ওর যে মানসিকতা তার নাম আর যাই হোক ভেসে বেড়ানো যে নয় সেই কথাটাও ভেবে দেখিনি প্রয়োজনের বাইরে থাকায়। কিন্তু সামান্য মুদ্রায় ও কি বিনিময় ক'রতে চায়? আমি জানি না কতটুকু পাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব। যদি অর্থে বিনিময় ক'রে নিতে হয় বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা তবে মৃত্যু যে অবধারিত এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম এই মুহূর্তেই। আমার তো কথাই ওঠে না ওর কাছেও নিশ্চয় এমন সামর্থ নেই যাতে প্রাণ ধারণের পাকা ব্যবস্থা অর্থের বিনিময়ে করতে পারে। না পারুক। তখনই বিপরীত চিন্তা মনে এল। কি হবে অকারণ ভেবে? আগামীকাল কি হবে তার ভাবনাই অভ্যেস করিনি এখন ভাবতে বসছি ভবিষ্যৎ? দূর! প্রাণটা বাঁচিয়ে যখন গির্জার এলাকা থেকে এতটা দূরে এসে পড়েছি তখন নিশ্চয় যাবার মত দিক আবার একটা জুটে যাবে। কি ক'রেই বা যাবে? আমি এখন লোকালয়ের থেকে অনেক দূরে, জনবসতির বাইরে। এ তো এমনই এক অরণ্য অঞ্চল যার প্রকৃতির সঙ্গে আমার আদৌ নেই পরিচয়। শুধুই পাহাড়, উঁচু নীচু পাহাড়ের সারির মধ্যে অসংখ্য গিরিখাদ। ভয় ওই খাদগুলোকেই বেশী, বন্যপ্রাণীদের আশ্রয় ওই গভীর, গহন, অরণ্যসঙ্কুল দুর্গম খাদগুলোই। আপন ভূমিতে যারা নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতায় বিচরণ করে দৈবাৎ অপরিচিতের আগমনে হয়ে যায় ভীত। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক প্রেরণাতেই তারা জানে আক্রমনই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। ভয় সেই জন্যেই। অন্য কোন শ্বাপদের চেয়ে বেশী ভয় সরীসৃপকে। ওদের অবস্থিতি বোঝা মুস্কিল। ওদের লক্ষ্যও অভ্রান্ত। কোথায় যে কি ধরনের সাপ আপন আরামে শুয়ে আছে—নিশ্চিন্ততা ব্যাহত হলেই আত্মরক্ষার উদ্যোগ নেবে, সে সামান্য ছায়া নড়তে দেখলেও। কাজেই এই বনময় পাহাড়ে প্রকৃতি না জেনে পথ চলা বড়ই বিপদসঙ্কুল। জারোমথাঙ্গি এ বিষয়ে বেশ ওয়াকিবহাল। তা ছাড়া ওর আছে নারীসুলভ স্বভাবলব্ধ সাবধানতা, যা আমার একেবারেই অনুপস্থিত। সেই যে ডোঙ্গন আমাকে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ একনলা বন্দুকটা দিতে চেয়েছিল তা-ও গ্রহণ করিনি অপ্রয়োজন মনে করে।

সাত পাঁচ ভাবছি এমন সময় দেখি গৃহকর্ত্রী জারোমথাঙ্গির হাতে বিশাল এক কাঁচা সেগুন পাতায় মোড়া কি যেন দিচ্ছে। দুজনেই খুব হাসছে। কি যে ওরা আপনটানে বলল তা বুঝলাম না। জারোমথাঙ্গি হাতের ইসারায় আমাকে কাছে

ডেকে বলল, ও আমাদের এখানেই থাকতে বলছে। বলছে ওর সঙ্গে থাকলে ও খুব খুশি হবে।

ওর স্বামী? আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম। তার মতও তো প্রয়োজন। জারোমথাঙ্গি জানাল, লোকটা দিন কয়েক আগে আর একটি মেয়েকে নিয়ে পাহাড়ের ওপারে থাকতে আরম্ভ ক'রেছে। ডিঙ্গি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বুঝলাম মহিলার নাম ডিঙ্গি। খুবই হৃষ্টপুষ্ট মাংসল চেহারা মহিলার। তার মুখ দেখে বয়স বোঝবার উপায় নেই। তবে ত্রিশ যে ছুঁয়েছে শরীরের ছাঁচ দেখে সে অনুমান ক'রলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তার শরীরে এবং মুখশ্রীতেও দুর্লভ কমনীয়তা। এ হেন একটি চিত্তাকর্ষক নারীকে ছেড়ে যে গেছে না জানি তার নতুন পাওয়া রমনী কি অপরূপা। নেহাৎ কৌতূহল বশেই মনের মধ্যে ইচ্ছে হয়ে রইল লোকটিকে আর তার নতুন নারীকে দেখবার। তাই বললাম, থাক তাহ'লে এখানেই।

না। জারোমথাঙ্গি বেশ দৃঢ়ভাবেই বলল।

অকস্মাৎ কি ভেবে কে জানে ডিঙ্গি আমার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, এখানে থাক।

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই জারোমথাঙ্গি আমাকে বলল, ওর একটাই মাত্র ঘর। এর মধ্যে কি ক'বে থাকা যায়?

আজ রাতটা কাটাবার মত অন্য জাযগা আর কোথায়?—জারোমথাঙ্গিকে কথাটা বলে ডিঙ্গিকে বললাম, দেখছি। থাকবার একটা জায়গা তো দরকার।

ডিঙ্গি কি বুঝল সেই জানে চুপ ক'রে রইল। জারোমথাঙ্গি কয়েক পলক কি ভাবল, তারপর আমাকে লক্ষ্য ক'রেই বলল, আমার একটা রাত্রিও থাকবার ইচ্ছে নেই। দিনটা কাটানো যায়, রাতটা নয়।

আমি তার কথার কারণ বুঝলাম না। দিন যেখানে কাটানো যাবে রাত কাটাতে কি অসুবিধে? এমন তো নয় যে শোবার জন্যে রাজশয্যা লাগবে! সাপখোপ না থাকলে গাছের ডালে বা শ্বাপদশূন্য হলে যে কোন পাথরের ওপর শুয়েও রাত কেটে যেতে পারে স্বচ্ছন্দেই! এই যেখানে অবস্থা সেখানে এত বাছবিচারের কি আছে বুঝলাম না। যার ঘর অসুবিধে হবার কথা তারই, সেই যখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তখন আমাদের মত নিরাশ্রয়ের আপত্তির কারণ থাকা তো বিস্ময়ের। ওর মনে যে কি আছে ওই জানে।

একটা বিশাল ইয়াঙ্গো গাছের ছায়ায় বলে কুটিরটা শীতল। দারুণ দাহে আমার প্রীতিপ্রদ মনে হচ্ছে। গাছের গোড়াটা কিছু নিচে, মাথা অনেক ওপরে, ছায়া ঠিক এখানটায়। আমি মাটিতেই বসে পড়লাম। আমাকে বসতে দেখে ডিঙ্গি কি যেন বলে উঠল। জারোমথাঙ্গি জবাব কি একটা দিল যার মধ্যে ডিঙ্গিকে হাসানোর উপকরণ ছিল বলেই মনে হ'ল। যে সব কথা আমি বুঝছি না সেই

কথাবার্তার মধ্যে মাথা না দিয়ে আমি এই নিশ্চিন্ততাতেই রাত্রিবাসের বন্দিধ আঁটতে ব্যস্ত হ'লাম। আর যেন হাঁটতে ভাল লাগছে না। এই যে বসেছি তাতে মনে হচ্ছে দুই পায়ের পেশী বেদনা বিকিরণ ক'রছে। যে কোন আগুন থেকে যেমন ভাবে আলো বেরোয় তেমনি ভাবে পায়ের পাতার ওপর থেকে জানু পর্যন্ত যত লোমকূপ আছে সব কটি ছিদ্র মুখ দিয়ে ব্যথার তাপ যেন বিচ্ছুরিত রশ্মির মত অনবরত ছিটকে বেরোচ্ছে। আজ অসীম মমতায় আপন পা দুখানার দিকে দৃষ্টি দিলাম। ইস্ কি ফুলে উঠেছে শিরাগুলো! পা দুটোও যেন ফুলেছে! এমন যে হয় ধারণা তো ছিল না! এবারই দুঃখ অনুভব ক'রলাম। নিজের পায়ের ওপর যে আমার এত মায়া তা-ও উপলব্ধি হ'ল। ফোলা অংশ টিপে সমান করবার চেষ্টাও আরম্ভ হ'ল মনের কোন প্রত্যক্ষ আবেদন ছাড়াই। তাতে তাৎক্ষণিক কিছু সুখ হলেও অধিক লাভ হ'ল না। হঠাৎ নজরে এল জারোম-এর পায়ের একটা জায়গা ফেটে রক্ত পড়ছে। ওর কিন্তু সেদিকে নজর নেই। আমিই বললাম, শুনে কথাটা গ্রাহ্য না ক'রে বলল, ও তো ক'দিন ধরেই পড়ছে।

ক'দিন! আমি অবাক হ'লাম শুনে। অথচ মেয়েটি নির্লিপ্ত! সব জেনেও! নিজের উদাসীনতা এবং সহনশীলতা সম্বন্ধে যে একটু গর্ব ছিল এখন হঠাৎ ভেঙ্গে যেতে তা বুঝলাম। সত্যি এক বিস্ময়কর মেয়ে। প্রতিদিন এক একটা নতুন ধাক্কায় যেন পর্যায়ে পর্যায়ে ওকে জানছি।

হাতের মোড়া পাতা নিয়ে জারোমথাঙ্গি আমার সামনে এসে বসল। মেলে ধরতেই দেখলাম ভাত। আঃ। এই অরণ্য—গভীর নির্জনতায় মহীরুহদের অকৃপণ স্নেহ এগুলো সবই মিথ্যা এবং তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে, সত্য শুধু এই ভাত। চাপ ধরা ডেলা ডেলা ভাত যা অনায়াসে কয়েকদিন ধরে খাওয়া যায় এবং হয়, সেই সরু আকারের লালচে ভাতগুলো নিমেষে আমাকে স্বার্থপর ক'রে দিল কিন্তু সংযত হলাম। ভাগ ক'রেই ভোগ। দুঃখ কষ্টও যেমন একসঙ্গে ভোগ ক'রছি সুখও সেভাবেই করা উচিত। যদিও দুজনের ক্ষুধার পক্ষে অপ্রতুল তবু আমরা দুজনেই সেই ভাত নুন দিয়ে খেতে লাগলাম। এত ক্ষিধে জারোমথাঙ্গির তবু অসংযম নেই দেখে আমি বেশ অবাক হলাম। তার শান্তভাবে ধীরে ধীরে খাওয়ার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল ও আমাকে সুযোগ দিচ্ছে। ক্ষুধা সকলকে সমানভাবে পীড়ন করে, তা অস্বীকার ক'রে সে সামান্য পরিমাণ ভাত খাচ্ছে। ব্যাপারটাতে নিশ্চিত হওয়া মাত্র আমি সংযত হলাম। আমাকে ভাগ ক'রে দিলেই ভাল ছিল। সে রেওয়াজ অবশ্য এদিকে নেই, সকলে এক সঙ্গে খাবে প্রচলন এটাই। যার যতটা প্রয়োজন খাও। কিন্তু খাদ্য যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় কম? আমি জারোমথাঙ্গির মত অল্প ক'রে না খেয়ে কিছুটা ভাত খেয়ে নিয়ে উঠে পড়লাম। ও থাক। কিন্তু প্রতিরোধ ক'রতে চাইল জারোম, একি! খাও? আমি এত খাব না কি?

তোমার তো পেটই ভরল না।

আমার ভরেছে, তুমি খাও—বলে আমি বেশ দৃঢ়ভাবেই উঠে দাঁড়ালাম, কাছাকাছি ঝরণা কোথায় জান ?

ডিঙ্গিকে জিজ্ঞাসা কর—বলেই নিজে চপলস্বরে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল ডিঙ্গিকে। সে ঘর থেকে মুখ বাড়াতেই বলল, তুমি ওকে ঝরণায় নিয়ে যাও।

ঝরণা বহুদূরে। এখানে জলের খুব অভাব।

আমার একটু জল দরকার।

ওর সন্তানগুলোর মধ্যে যেটা বড় তাকেই ডেকে আপন ভাষায় কি যেন বলল। আমাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি ওর সঙ্গে চলে যাও।

জারোমথাঙ্গি বলে উঠল, তাহলে আমিও যাই। তোমার কাছে পাত্র থাকে তো দাও জল নিয়ে আসব।

ডিঙ্গি আপত্তি করল অতিথিদের সে জল আনতে দিতে পারে না। তার প্রবল আপত্তি সে মাথা নেড়ে প্রকাশ করতে লাগল। আমিও দেখলাম ঝরণা যদি থাকেও তো সে দূরে, চোখে তার অস্তিত্ব দেখা তো দূরের কথা কানেও সামান্য শব্দ আসছে না যে কোথাও জল ঝরছে। যে ছেলেটিকে ডিঙ্গি আমাকে সঙ্গদেবার জন্যে পথ প্রদর্শক করেছিল সে হঠাৎ ঘর থেকেই একপাত্র জল এনে সামনে ধরল। তার নিঃশব্দ মুখের আবেদন ছিল, খাও।

ছোট ছোট চোখের তারা অপলক চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমার বেশ ভাল লাগল। কিন্তু যেই না আদর ক'রে ওর গালে হাত দিয়েছি ছিটকে গেল। আমি জলের পাত্র নিয়ে জারোমথাঙ্গিকে উদ্দেশ্য করেই বললাম, বরং পরে গিয়ে আমরা জল এনে দেব।

জারোমথাঙ্গি চুপ ক'রে রইল বলে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি তাতে ক্লান্তি অবসাদ আর কিছুমাত্র নেই। অল্প হোক তবু ভাতে তার চেহারা বদলে দিয়েছে। আমারও বোধহয় ওই রকমই হবে। শরীর যেন জুড়িয়ে গেছে। অল্পক্ষণ বাদেই জারোমথাঙ্গি বলল, এ জায়গাটা থাকবার পক্ষে বেশ ভাল।

আমারও তাই মত। কত আর ঘুরব ? এবার যেন মন অবসন্ন হয়ে পড়ছে। দীর্ঘকাল ধরে যে চলা সুরু করেছি তার যেন শেষ চাইছে মন এবার। এখন বেশ মনে হচ্ছে আর পারছি না। চলতে চলতে এখন এক ক্লান্তি আসছে যা এবারের পথেই বুঝলাম। আমার মনে হয় গীর্জায় কিছুদিন কেটে যাবার এই ফললাভ। শরীর আরাম পেয়ে শিথিল হয়ে গেছে। মনের কথাটা ওকে খুলেই জানালাম। শুনে বেশ চিন্তাশীল ব্যক্তির মত গম্ভীরভাবে বলল, কিন্তু এখানে থাকব না। এ পাহাড়ে নয়, আর কিছুটা গিয়ে অন্য একটা জায়গা আছে সেখানে থাকব। আমি অবশ্য ওদিকটায় যাই নি তবে শুনেছি। সেখানে

বার্মারোড আছে। আগে না কি গাড়ী যেত সেই রাস্তা দিয়ে।

আমি অনেকটা দমে গেলাম। আবার চলা! আবার সেই খাড়াই আর উতরাই। নাঃ আর নয়। ও যায় যাক, আমি আর নড়ছি না। এখানেই—কিন্তু কোথায় থাকব? থারমিলার অভিজ্ঞতা এখনও মনে ছায়ার মত। এখানে থাকতে গেলে আবার কোন ঝামেলায় পড়ব তার কি ঠিক? কোন অলক্ষ্য থেকে তীর বিঁধবে অথবা বুলেট! আর যা-ই হোক সে মৃত্যু অভিপ্রেত নয় বলেই না থারমিলার অমন নধর আকর্ষণ ছেড়ে পালিয়েছে। ডিঙ্গির শরীরেও থারমিলার পুষ্টি আছে তবে এ আরও পরিণত। ডিঙ্গি বয়সেও পরিণত, কুমারী নয়। একাধিক সন্তান ধারণ করে তার শরীর যেন ঢল ঢল ক'রছে অনেকটা বর্ষার নদীর মত। থারমিলার মুখমণ্ডলে ছিল তারুণ্যের সরলতা, ডিঙ্গির মুখে সৌন্দর্য। থারমিলার স্নিগ্ধতা মুগ্ধ ক'রতে পারে, ডিঙ্গির সুষমা করে আকর্ষণ। আমি সে আকর্ষণ বেশ অনুভব ক'রছি—জারোমথাঙ্গি যদি আমাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে যায় আর ডিঙ্গির পুরুষটি যদি ফিরে না আসে তো আমি ওর আশ্রয়েই বেশ আরামে থেকে যেতে পারি। আমি ওর জন্যে অনেক কিছু ক'রে দিতে পারি, দরকার হ'লে ওর শুয়োর পাহারা দেওয়া, ওর জন্যে জল নিয়ে আসা—এমন একজন সঙ্গীও তো ওর নিশ্চয়ই দরকার! কিন্তু তা কি হবে? আমাকে ডিঙ্গির কাছে পেঁছে দেবার জন্যে কি এত কষ্ট সহ্য ক'রে এত বিপদ বয়ে এতদূরে এনেছে জারোমথাঙ্গি? তবু আমার এই মুহূর্তে এমন একটি সুখচিন্তা ভাল লাগছে; সংশয় আসছে না। তারই মধ্যে জারোমথাঙ্গি বলে উঠল, আর দেরী না করে চল।

আমি এবার অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে ফেললাম, যেখানে যেতে চাইছ থাকবার জায়গা আছে কিনা জান? কত দূরে কেমন জায়গা কিছুই তো জান না।

জারোমথাঙ্গি কোন জবাব দিল না। কিন্তু ওর মুখ দেখে বুঝলাম আমার কথা ওর মনঃপুত নয়। ও যে কি ভাবছে বুঝতে না পারলেও আমার ইচ্ছার বিপরীতে ও কিছু ভাবছে সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই। আচ্ছা ওর কি আলস্যও আসে না? ক্লান্তি, তাও নেই? বেঁটে খাটো শীর্ণ শরীরটায় কিসের শক্তি ওর? আমার তো এখন বেশ ঘুম ঘুম আসছে, শিথিল হয়ে আসছে শরীর। মনে হচ্ছে এই গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ি। আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই, শিউলি গাছের পোকা যেমন, মাটির নিচের কেঁচো—তেমনি নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ততা আমার একান্তভাবেই প্রয়োজন। আমি এখন তেমনই ভাবে গুটিয়ে ঘুমাবো ঠিক সেই রকমের রমনীয় বিশ্রামে।

আরামে চোখ বুঁজে ছিলাম, জারোমথাঙ্গি নিঃশব্দতার কারণ জানতে চাইতে তাকিয়ে দেখি সে আমার দিকে অপলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমি প্রথমটা তাতে গুরুত্ব না দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে ঘুমের ইচ্ছা ক'রলাম কিন্তু

সামান্যক্ষণ বাদে আপনি খুলে গেল আমার চোখের পাতা এবং সবিস্ময়ে দেখি একই ভাবে অনড় জারোমথাঙ্গি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ আর বন্ধ হ'ল না, কিছুক্ষণ তার চোখে চোখ রেখে ক্লান্ত হয়ে বললাম, এখানে বসে দেখ কি আরাম। বাতাস কি সুন্দর। আমার ঘুমোতে ইচ্ছে ক'রছে।

এবারও জারোমথাঙ্গি কোন উত্তর দিল না। আমি যেন বিপাকে পড়লাম। অথচ আমার কথার উত্তর যদি ও নাই দেয় তো আমার কিছু ক্ষতি যে হয় এমন নয়, তবু কেন যেন বিচলিত হতেই হ'ল। ওর স্থির ভাবে চেয়ে থাকা আমাকে বেশ অস্থির করতে লাগল। মহা মুস্কিলে পড়েছি দেখছি—ওকে যে উপেক্ষা ক'রব এমন শক্তিও পাচ্ছি না। ভৎর্সনা ক'রব সে জোর আমার কোনদিনই নেই। অত রুক্ষ কখনই হতে পারিনি, প্রয়োজনেও নয়। তা ছাড়া কি বা প্রয়োজন? সামান্য একটা কীটের জীবন আমাদের এতে কিসের কি মূল্য থাকতে পারে? কাজেই আমি কখনও রাগ করবার প্রয়োজন অনুভব করি না।

আবার ওর দিকে তাকালাম। মনে হ'ল কেমন করুণ চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। তেমনি অপলক। আসলে ওর চোখের ভাষা বদলে যাচ্ছে। যেটা কৃত্রিম ছিল সেই কঠোরতা নিভে আসল যা সেই কোমলতা ভেতর থেকে ফুটে উঠছে। বড় ছেলেমানুষ! যতই বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রতে চেষ্টা করুক সরল সত্যে যা ওর কাছে সহজ সেটাই ওর পক্ষে সম্ভব। কোন কৃত্রিমতাকে কতক্ষণ ধরে রাখবার সাধ্য ওর!—আমি মনে মনে হাসলাম এক গভীর গোপন চরিতার্থতায়—ওকে আমি সম্পূর্ণভাবেই আবিষ্কার করেছি। আর সেই আনন্দেই ওকে কাছে আসবার ইসারা ক'রলাম, ও যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে এল। আর আসা মাত্রই একটা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলাম আমার পাশেই।

জারোমথাঙ্গি প্রতিবাদ ক'রল না কিন্তু প্রশ্রয়ে প্রকাশ ক'রল ক্রোধ—কৃত্রিম বলেই তার মধ্যে অনিবার্যতার প্রকাশ ঘটল না। আমি তার ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে উড়িয়ে দিতেই প্রগলভ্ হলাম, এই দারুণ রোদে না-ই বা পথ চললাম এখন। একটু অন্তত আরাম করতে দাও। তারপর চাও তো সারারাত হাঁটব।

আমার প্রস্তাবে তাব যুবতী মনের কোথাও আবেগের খোঁচা লাগা স্বাভাবিক কারণ এ যাবৎকালের ব্যবহারে কোনদিনই আমি এতটুকু কোমলতাও প্রয়োগ ক'রে উঠতে পারিনি। ফলে ও যেন একেবারেই ঝরে পড়ল। ভোরের আলো লাগতে লাগতেই যেমনভাবে ঝরে গাছের সমস্ত শিউলি, তেমনিভাবে ও একেবারে শিথিল হয়ে গেল, তবে থাক। কালই আমরা যাব এখান থেকে। রাতটা তাহ'লে এখানেই থাকি। ডিাঙ্গকে বলে আসি।

ঝামেলা মেটানোর জন্যে ওটুকুই যথেষ্ট ছিল এবং আমার পক্ষে বেশী। এবার যা খুশি ও করুক আমি আমার মত এই বিপুল ইয়াঙ্গোর নিচে আরাম

করি তার সামান্য সাধ্য ছায়ায়। যত যাই হোক ছায়াতরু যদি কেউ থাকে তো সে বট। তার তুল্য আর বুঝি বিশ্বেই নেই। বট-অশ্বত্থের ছায়ায় কি নরম মায়া! কি বিশাল জায়গা জুড়ে তাদের ছায়াচ্ছন্ন বিস্তার! আঃ। সেই স্মৃতিও যেন আমাকে শান্তি দিচ্ছে এখন। সেই ছোটবেলার ভূগোলে কি যেন সব শব্দ পড়তাম—স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম অনেক কালের পর—বনস্পতি, মহীরুহ না কি সব শব্দ যেন—আজ তার মর্মোপলব্ধি হচ্ছে এই বিশাল মহাকাণ্ড খাঙ্গরা—ইয়াঙ্গো, সেই সব সুবিশাল বট অশ্বত্থ—বটেই এরা বনস্পতি। এদের পক্ষে তেমনি শব্দই সুন্দর, গাছ শব্দটা বোধহয় অবমাননাকর!

প্রচণ্ড তাপের মধ্যে সামান্য ছায়ার প্রশ্রয়, হঠাৎ কোথা থেকে মৃদু বাতাসও এসে যোগ দিল যেন সঙ্গে। আমি নিজেকে ভুলে দীর্ঘ জীবনের ভুলে যাওয়া ভাবনায় অকস্মাৎ কেন যেন ডুবে যেতে লাগলাম। মনে হতে লাগল অতি দূর বিস্মৃতির তল থেকে যেন শব্দ উঠে আসছে, ধ্বনি আসছে, অতিক্ষীণ তার স্বর। কেন যে এমন হচ্ছে সে ভাবনার অবকাশ পেলাম না, ভাবনাটা যে উঁকি দিল এমনও অবশ্য নয় তার আগেই আমি নিজেকে হারালাম। নিঃশব্দে নীরবে যার নিঃশঙ্ক সঞ্চরণ সেই নিদ্রা আমাকে অনিশ্চিতা থেকে নিশ্চয়তায় অশান্তি থেকে প্রশান্তিতে নিয়ে গিয়ে পেঁছে দিল হয়ত অনতিবিলম্বেই, আমি ঠিক জানতেও পারলাম না।

চেতনা ফিরল এক আর্তস্বরে, সামনে এক উৎকণ্ঠিত মুখ দেখে—সে মুখ ডিঙ্গির। আমাকে দুহাত দিয়ে ধাক্কাচ্ছে সে পরম পরিচিতের স্বাভাবিকতায়।

ওই ও দিকটায় রোজা গাঙতেই-এর বাড়ী। সামনের পাহাড়টার দিকে আঙুল দেখাল ডিঙ্গি, আমি সামনের ঢালুতে তারপর ফের খাড়াইতে কোথাও কোন ঘর দেখতে পেলাম না ওর অঙ্গুল নির্দেশ সত্ত্বেও। তবু ডিঙ্গি বলল, গাঙতেই বুড়োকে একটু ডেকে দেবে? বলবে ডিঙ্গির ছেলের অসুখ।

ঘুম ভাঙ্গা চোখে প্রথম চারদিকে চেয়ে সময় ও স্থান নির্ণয় ক'রে নিতে চেষ্টা ক'রলাম তারপর অবাক হয়ে ডিঙ্গির বিহ্বল মুখের দিকে তাকাতেই আমার জগৎ সংসারের মূল্য বদলে গেল। ব্যাকুল কথার উত্তরে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে তোমার ছেলের? চল দেখি।

কিছুক্ষণ আগে দেখা ডিঙ্গির সেই অমল মুখে বিশেষ উদ্বেগ। আমাকে নিয়ে তার ঘরের মধ্যে ঢুকতেই দেখলাম একটা ছোট ছেলে বেশ ছটফট ক'রছে। কুঁকড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। কয়েক মুহূর্ত লক্ষ্য ক'রে মনে হ'ল ওর পেটে ব্যথা হচ্ছে, কৃমি থাকা সম্ভব। কিন্তু শুধু হাতে আমি আর ক'রছি কি, ওষুধ থাকলেও না হয় অনুমানে দেওয়া যায় তাতে কিছুটা আরাম হতেও পারে। সে তো এই সময় চিন্তা ক'রে লাভ নেই, জারোমকে ঘরের সামনে দেখে বললাম, একটু জল গরম ক'রে ফেল তো। ডিঙ্গিকে বললাম, ছেলেটিকে একটু গরম জল এখনই খাইয়ে দাও।

জারোমথাঙ্গ তৎপরতার সঙ্গে জল ফোটাতে লেগে গেল আমি ডিঙ্গিকে সাহস জোগানোর জন্যে বললাম, চিন্তা করো না একটু গরম জল পেটে গেলে ওর ব্যথা এখনকার মত কমবেই। তারপর তুমি গাঙতেই না কোন রোজাকে ডাকতে চাইছ ডাক। আমি তোমার রোজার বাড়ী চিনি না।

ডিঙ্গি একা অসহায় বোধ করছিল বলেই অত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। আমরা যা হোক কিছু করবার চেষ্টা করাতে কিছুটা ধৈর্য ধরে রইল। সে ছেলেটির সামনে বসে তাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রতে লাগল। তার অত ব্যথা কি আর কথায় ভোলে!

যা হোক অল্পক্ষণের মধ্যেই জল গরম হয়ে গেলে কিছুটা ছেলেটিকে খাইযে দেবার কিছুক্ষণ পর সত্যিই যেন একটু শান্ত হ'ল ছেলেটি। ধীরে ধীরে আরও শান্ত হযে এল সে। কিন্তু ওর তো চিকিৎসা প্রয়োজন, কাছাকাছি কোথায় যে সে ব্যবস্থা আছে আমি তো জানি না! ডিঙ্গিকে কথাটা বলতেও জানা'ল, দৈবাৎ কখনও চিকিৎসার দরকার হ'লে সে ওই রোজা গাঙতেই-ই করে থাকে। ওকে খবর দেওয়া তো কম মুস্কিল নয়। তবে প্রায়ই ও পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় বিশেষ ক'রে এই সাত পাহাড়ে। এই সব পাহাড়ের কোথায় কোন দেব দেবীর আস্তানা আছে তা ওর জানা, তাদের কাছে নানা কাজে যাতাযাতের পথে হয়ত সে দিকের বসতিতেও দেখা দিযে যায়। তা তেমন যদি হঠাৎ এসে পড়ে তাহ'লে তো দেখিয়েই নেবে—।

অর্থাৎ দু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে গেলেও সেই মহাপুরুষের দেখা হবার সম্ভাবনা সামান্যই। আসলে বিপন্ন সময়ে ক্ষীণতম সম্ভাবনাও উজ্জল হয় তাই আমাকে অমন আকুতি জানাচ্ছিল ডিঙ্গি যাবার জন্যে। ছেলে একটু সুস্থ হতেই ও আমার দিকে গভীর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি মেলে এমন ভাবেই তাকাল যে আমার মনে হ'ল এমন পুরস্কার আমি আগে কখন পাইনি। আরোগ্য ক'রতে পারার চেয়ে বড় ক্ষমতা পৃথিবীতে আর কিছু বুঝি নেই। ডিঙ্গির কৃতজ্ঞতাব জন্যে আমি আবার ভাবতে চেষ্টা করলাম কি হযে থাকতে পারে ওব ছেলের। সামান্য শিক্ষার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, ভুলেই গেছি। গির্জায় থাকতে কিছু চর্চাব সুযোগ ছিল, কাজে লাগাই নি। ফাদারকে সাহায্য ক'রেছি কেবল অনুসরণ ক'রে, তাঁর মত করে। সেখানে আমার জ্ঞানকে ঝালাই-এর চেষ্টা আদো করিনি। ওসবের মধ্যে আমি নেই। আমি আমার সামান্য অস্তিত্ব নিয়ে গুটি পোকার মত গুটিয়ে থাকতে চাই।

কিন্তু মুস্কিল করল ডিঙ্গির শিশুটি। কেন যে এরা এত শিশুর সৃষ্টি করে! আর একবার তাকালাম, জেগেছে। কেমন করুণ চোখে চেয়ে আছে! স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে কষ্ট সয়ে নেবার চেষ্টা ক'রছে। কি বা হয়ে থাকতে পারে? দেখব না কি পেটে হাত দিয়ে একবার? লাভ কি হবে? ওষুধ তো দিচ্ছে

পারব না। শুধু কষ্ট দেওয়া হবে ছেলেটিকে। আরোগ্য করবার ব্যবস্থা যখন আমার হাতে নেই কি হবে ওর সামান্য আরাম নষ্ট করে? ফাদার পিটারের কাছে যে সব ওষুধ আছে তাতে উপশম হতে পারে। পারত। সে তো এখান থেকে দুর্গম দূরত্বে। অতদূর ফিরে যাওয়াই অসম্ভব তো ওষুধ আনা! কাছাকাছি তো কিছুই নেই। আছে কেবল অসংখ্য লতাগুল্ম আর মহীরুহ। এই সব লতাগুল্মের মধ্যে কিন্তু আছে ভেষজ। চিনি না। অথচ বন্যপ্রাণীরা চেনে। হাতিরা দেখেছি অসুস্থ হ'লে তাদের নির্দিষ্ট লতাপাতা খায়। এমন কি শ্বাপদেরাও বনজ উদ্ভিদ ব্যবহার করে তাদের অসুস্থতায়, আমি যদি জানতাম! শিশুটিকে আরোগ্য ক'রতে পারতাম এখন, মুক্তি দিতে পারতাম ওকে দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে!

রোজা গাঙতেই নিশ্চয় জানে। সে তো এই লতাগুল্ম নির্ভর চিকিৎসাই করে, নইলে তাকে ডাকবার জন্যে ডিঙ্গির অম। ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু আমি যে গাঙতেই এর বস্তি চিনি না! ডিঙ্গি তো আঙুল তুলে দেখিয়েই খালাস আমি তো কোনও দিকে কোন ঘরের চিহ্ন দেখছি না, গাঙতেই নিশ্চয়ই ওই অসংখ্য বৃক্ষের অনন্ত অরণ্যের মধ্যে কোন গাছের ওপরেই বাস করে না! তবে? তবু একবার চেষ্টা করা দরকার শিশুটির আরোগ্যের জন্যে, ওর যন্ত্রণার উপশমের জন্যে। জারোমথাঙ্গিকে ডেকে বললাম, আমি তো পথ চিনি না চল দুজনে ওই পাহাড়ের ওপারে দেখে আসি রোজাকে পাই কিনা। ছেলেটি বড় কষ্ট পাচ্ছে।

জারোমথাঙ্গি উৎসাহিত হয়ে উঠল! যেন নিমেষে প্রস্তুত এমনই ভাবে বলল, চল আমরা রোজা গাঙতেই কে ডেকে দিয়ে যাই।

আমি ওর কথার মধ্যেকার শেষ শব্দটার তাৎপর্য বুঝতে চাইলাম। ও কি কোথাও যেতে চায়? বোধহয় চলে যাবার সেই ব্যস্ততাই প্রকাশ হ'ল আবার। কিন্তু এই ভাবে ওই অসুস্থ শিশু আর অসহায় আশ্রয়দাত্রীকে ফেলে! ভাতের জন্যে ডিঙ্গির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আছে। সামান্য দুটি ভাত অনেক অসামান্য খাদ্যের চেয়ে অনেক প্রীতিপ্রদ। সেই ভাত ডিঙ্গি আমাদের দিয়েছে নিজের ভোগ খর্ব ক'রেই হয়ত। কাজেই সেই অসীম দান আমি ভুলি কি ক'রে? জারোমথাঙ্গি যে কি ক'রে এমন সহজে সব অস্বীকার করে বুঝিনা। ওর সব কিছুই সহজ। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা। প্রকৃতই পোকার মানসিকতা। সবই যেখানে মূল্যহীন সেখানে জারোমথাঙ্গিই বোধহয় যথার্থ, আমি ভুল। মমতা, আবেগ এগুলো আমাদের মত পোকামাকড়ের জীবনে অপগুণ তো নিশ্চয়।

জারোমথাঙ্গি প্রকৃত কীট। নিবৃত্তির পর তার আর কোন আক্ষেপ থাকে না। তার চরিত্রে কোন অনুচিন্তাও নেই। যতটুকু দেখছি সম্পূর্ণ ভাবেই বেঁচে থাকা ছাড়া তার আর কোন সর্তও নেই জীবনের। কার জীবনেই বা কি থাকে এক

বেশী ? অন্য সকলে নানা আড়ম্বরে মূলে ব্যাপারটাকেই সাজিয়ে বিরাট ক'রে তোলে, জারোমথাঙ্গির বরং সে সব ভণ্ডামী নেই। নগ্ন সত্যটুকুর বাইরে নেই কোন আবরণ। তাই অত্যন্ত সহজেই ও বলে দিতে পারল, চল চলে যাই।

ওর মূলে চিন্তায় প্রশ্রয় না দিয়ে আমি জানতে চাইলাম, রোজা গাঙতেই এর বসতি কি তুমি চিনতে পারবে ?

চলাচল যখন আছে চিহ্নও নিশ্চয়ই থাকবে—জারোমথাঙ্গি জানাল। তবে এই অনুমান নির্ভর যাত্রার আগে ডিঙ্গির কাছে একবার ভাল ক'রে জেনে নেওয়া উচিত মনে ক'রে প্রশ্ন ক'বলাম, রোজার বাড়ীর পথটা তুমি কি জান ?

না, ডিঙ্গি জানাল।

ওদিকে যে থাকে তা জান, সেখানে আর কত বসতি আছে তা জান ? বসতির কি নাম ?

জানি না তো ?

তবে কি এখানের কেউ চেনে ?

নিচের ঠিঙালমা চিনতে পারে—।

অর্থাৎ ওদিকে কিছুটা নিচে এক ঘরের বসতি আছে তারা চিনলেও চিনতে পারে এমনি ডিঙ্গির অনুমান। আমি ওর অনুমানে সন্দিগ্ধ হয়ে জানতে চাইলাম, তবে যে তুমি বললে ওই দিকে ওর বাড়ী ?

আর কোথায় হবে ? ওদিক থেকেই তো সে আসে।—ডিঙ্গির জবাব শুনে হতাশ না হয়ে আর উপায় রইল না। ওর কথা শুনে তো হয়রানির শেষ থাকবে না। রোজা গাঙতেই যেমন এই পাহাড়েব এই বসতিতে ডিঙ্গির কাছে সত্য সমান সত্য আরও উত্তরে অন্য বস্তিতেও বিপন্ন অন্য কোন মা বা স্ত্রীর কাছে। আসলে ছেলের কষ্ট দেখে বিপন্ন ডিঙ্গি আশা করবার একটা মধ্যেম চেয়ে নিজের অসহায়তা কমাতে চেয়েছিল। হয়ত এমনও হতে পারে গাঙতেই একটা নাম যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াও মুস্কিল। বিপাকে পড়ে জারোমথাঙ্গির কাছে পরামর্শ চাইলাম, কি করা যায় বল তো ? গাঙতেই কে কোথায় খুঁজি ?

জারোমথাঙ্গির সহজ উত্তর, ডিঙ্গি তো বলল ওই দিকে পাহাড়ের মধ্যেই বসতি।

ওদিকে গিয়ে না পেলে ?

না পেলে আর কি হবে আমরা চলে যাব।—ওর সেই চলে যাওয়া। কিছুতেই এখানে থাকতে চায় না, অস্থায়ী ভাবেও নয়। যাবার কথা উঠলেই হ'ল, ও যেন একপায়ে খাড়া। অথচ ডিঙ্গির আশু বিপদের দিকটা না দেখলেও আমি আপন স্বার্থেই আজ রাতটা অন্তত এখানে কাটানোর পক্ষপাতী। সন্ধ্যার পর পথ চলা এই অরণ্যসংকুল পর্বতে অসম্ভব। এমন পথ আছে যে দিনের বেলাই

দুরতিক্রম্য রাতে কোন কথা। কাজেই কেবল জেদ ক'রলে তো হবে না। ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বলতে যেতেই ও বলল, যেখানেই সন্ধে হবে থেমে যাব। আর যদি অন্ধকারের আগে সেখানে পেঁছিই যাই তবে তো কথাই নেই।

ও যে কোন স্বর্গে পেঁছোতে চাইছে নিজেও জানে না। কোন আশ্রয়স্থলও কোথাও ওকে অভ্যর্থনা করবে বলে অপেক্ষা ক'রে নেই, সে তুলনায় বরং ভাল ডিঙ্গির ঘর। তবু তো মাথার ওপর চাল একটা আছে! ঘরেও চাল আছে ডিঙ্গির যতটুকু থাক। একটা সন্ধ্যা অন্তত সে আমাদের না দিয়ে খাবেনা এটুকু সহজ বোধ্য। তবে যে কেন ও যাবার জন্যে এত ব্যস্ত বুঝতে পারছি না। ডিঙ্গির ভালমন্দ না দেখুক নিজের সুবিধে তো দেখবে! ও যদি আমার গির্জা থেকে পালাবার সঙ্গী না হ'ত তাহ'লে ওকে ছেড়ে থেকে যেতাম এখানেই। তা সম্ভব নয়। তবু আমার ইচ্ছে ডিঙ্গির ছেলেটির জন্যে সাধ্যমত কিছু করি। যদি ওর যন্ত্রণার উপশম হয় তো হোক।

জারোমথাঙ্গির জন্যেই শেষ পর্যন্ত বেরোতে হ'ল। তবু নেহাৎ ডিঙ্গিকে প্রবোধ দেবার জন্যেই আমি বললাম, দেখি যদি গাঙতেই-কে পাই তো আসতে বলব।

ডিঙ্গি কি ভাবল সেই জানে শুধু নীরব করুণ চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিলাম না আবার ছিটকে আসি সে শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সম্মোহন শব্দটাকে প্রত্যক্ষ দেখিনি কোনদিন, মনে হয় এটাই হবে, এই অবস্থাই। জারোমথাঙ্গি অনেকটা টেনেই সরিয়ে নিল আমাকে, কাছাকাছি এসে বলল, চল চল। আর দাঁড়ালে চলবে না।

এতো বন্ধন নয়। মায়া? এই সামান্য সময়ে মায়া কি করে সম্ভব? তবে কি আকর্ষণ? সামান্য কিছুক্ষণ একসঙ্গে কাটানোর জন্যে কি এই আকর্ষণ? বেশ কষ্টই হ'ল ছাড়িয়ে আসতে। একসময় আমার মনে হ'ল এটা ব্যতিক্রম ঘটল। পেছনের টান কোনদিনই অনুভব করিনি এখনই বা ক'রলাম কেন? আমার চলা তো অনেকটাই নৌকার মত। যতক্ষণ নোঙর ততটুকুই থেমে থাকা, নোঙর উঠল তো আর কোন থামাথামি নেই, ভেসে চলা। স্রোত থাকলে স্রোত না থাকলে বাতাসের ধাক্কায় যে দিকে নিয়ে যায় চল সেদিকে। নৌকা কোন চিহ্ন রেখেও চলে না। তার চলার পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমারও তো তাই। কোথাও কোন স্মৃতি রেখে আসা হয়নি। পেছনের কিছু আর মনেও পড়ে না। সব যেন ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে। এমন কি যে থারমিলার জন্যে প্রাণটা যেতে বসেছিল চোখ বুঁজলে ভাসে না আর সে-ও। দিনান্তে একবারও মনে আসে না তার কথা। ডিঙ্গিও আর কিছুক্ষণ পরে থাকবে না, এ নেহাৎই তাৎক্ষণিক। জীবমাত্রেরই জৈবিক আকর্ষণ। প্রাণী মাত্রেরই প্রাণ, জীব মাত্রেরই জীবন, আর জীবনের কতগুলো ধর্মও তো প্রাকৃতিক। খাদ্য চাই, নিদ্রা চাই,

রমণও। এগুলো তো জীব ধর্ম। যে কোন কীট পতঙ্গ বা ভূচর, জলচর প্রাণীরই চাই এগুলো। আর এক প্রাকৃতিক অবস্থা হ'ল হিংসা। রমণ আর হিংসার কি যেন কোন সম্বন্ধ আছে? নইলে আমার তো থারমিলাকে প্রয়োজন ছিল শুধু একটু রমণের জন্যেই, তাতে সকলে আমাকে হত্যার চেষ্টা ক'রল কেন? আগেও দেখেছি পথের কুকুর আর একটি কুকুরকে ক্ষত বিক্ষত করে শুধু মাত্র কুকুরী রমণের অধিকার আদায়ের জন্যে। অন্য একটিকে বঞ্চিত করে নিজে ভোগ করবার জন্যে। বিশ্বময় সব প্রাণীর মধ্যেই দেখছি এক অবস্থা, শুধু ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের মধ্যে এটা কম। আমার মধ্যেও। তাই তো ওই পোকামাকড়দের সঙ্গে আমি একাত্মতা খুঁজে পাই। জল ঢেলে দাও জলের ধাক্কায় ছোট পোকা চলে যাবে, ঝাঁট দাও ঝাঁটার ধাক্কায় দূরে ছিটকে চলবে, আমিও তো চলছি জারোমথাঙ্গির ইচ্ছায়। তবে আগে ওর ইচ্ছার চেহারাটা স্পষ্ট ছিল না এখন যেন ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে ও আমাকে ব্যবহার করতে চায়। তবে আমার মত অতি নিম্ন স্তরের পোকাকে কিভাবে ব্যবহার করে সেটাই এখন দেখবার। আমাকে দিয়ে যে কোন কাজ হবে না সেটা যখন বুঝবে তখন নিশ্চয় আমার মুক্তি। তখন তো ছেড়ে দেবেই। আবার নোঙর তোলা নৌকার মত ভাসব।

বহুদিন আগে একদিন বাসের মধ্যে একটা উড়ন্ত পোকা ঢুকে পড়েছিল। ড্রাইভারের জানালার কাঁচের মধ্যে আটকে ছিল সেটা, কাঁচকেই ফাঁকা মনে করে উড়ে পালাবার জন্যে বারবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল সেদিন। তারপর একসময় পালাতে পেরেছিল—অতদূরে অন্য জায়গায় গিয়ে পোকাটা কতদিন যে বেঁচে ছিল আজ অকস্মাৎ সেই চিন্তা আমার মাথায় ঢুকে পড়ল। নিশ্চয় তার অনুকূল পরিবেশ খুঁজে নিয়ে বেঁচে গিয়েছিল পোকাটা। এই রকমই তো হয়। এই ভাবেই বেঁচে আছে ডিঙ্গি, জারোমথাঙ্গি বেঁচে আছে। আরও কত লক্ষ প্রাণী আপন উৎস ছেড়ে গিয়ে কোথাও না কোথাও ঠিক টিকে আছে। আসলে প্রকৃতির বিধানে সৃষ্টি হয়ে এক্ই ব্যবস্থায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া এর মাঝের ফাঁকটুকু কোন না কোন ভাবে কেটে যায়, কাটিয়ে দিতে হয়। এতে কৃতিত্ব আর অকৃতিত্ব সবই সমান—; মূল্যহীন। এই যে এখানে ডিঙ্গি বেঁচে আছে আর কোথাও এক জায়গায় অলকনন্দা, কি তফাৎ আছে দুজনে? দুঃখ দুজনেরই আছে, সুখ ডিঙ্গির কি নেই? নিশ্চয়ই ওরও সুখের উৎস কিছু আছে। কাজেই আবার ডিঙ্গির ঘরের নিচে যে শুয়োরটা থাকে সে-ও আছে। তারই বা জীবনযাত্রায় অলকনন্দা বা ডিঙ্গির থেকে পার্থক্যটা কোথায়? আমার সঙ্গে? কিছুমাত্র নয়। ওকে খাবার বিনিময়ে বাচ্চা উৎপাদন ক'রে যেতে হয়, আমাকেও গির্জায় অনেক কাজ ক'রে দিতে হতো, জলপাইগুড়িতে বন কেটে টাকা কামাবার কাজে তদারকি ক'রতে হ'তো, জারোমথাঙ্গি কি করাবার

জন্যে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে ও-ই জানে।

আমি জানতাম না। না জেনেই এসেছি। এখান থেকে দূরের সমতল ভূমি বড় সুন্দর দেখা যায়। ভূমিটা যে সমতল তা বোঝবার উপায় এই যে বহুদূর জোড়া ঘন অরণ্যের বিটপীকুলের মাথা দেখতে পাই এখান থেকে, সমান মনে হয়। সেগুনের বন। এমন ঘন সেগুন বন আমি আর কোথাও দেখিনি। পাহাড়ের ওপর থেকে প্রথম দিন তো বেশ অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলাম। আমাদের ঢাল বেয়ে যে নেমেছে কোথাও কোন ফাঁক ফোকর পর্যন্ত নেই। শুধু গাছ আর গাছ। সেগুন ছাড়াও অচেনা কিছু গাছ দেখা যাচ্ছে। তবে সংখ্যায়ও কম।

রাতটা তো একটা বড় গাছের তলায় কাটানো হ'ল, সকালে উঠে জারোমথাঙ্গি বলল, একটা গাছ কাটতে পারবে ?

গাছ ? কেন ?—

বাঃ ঘর ক'রতে হবে না ?

আমি তো অত ভাবি নি। ওর কথা শুনে আমার চেতনা এল তাহ'লে আর যাব না আমরা। আমি ভেবেছিলাম অন্য কোনখানে বুঝি আবার যাত্রা হবে আমাদের। জানতে চাইলাম, তুমি এখানেই থাকতে চাও ?

কেন তোমার পছন্দ হচ্ছে না ?

আমি জায়গাটাকে পর্যবেক্ষণ ক'রতে চাইলাম। ডান দিকে ওই সমতল অরণ্য, সামনে বাঁদিকে কিছুটা এগিয়ে মনে হচ্ছে কিছু জনবসতি আছে। আমরা যে ছোট পাহাড়ের মাথায় আছি এখানটায় জনপ্রাণী নেই। শুধু কিছু গাছ, বড় বিস্ময়কর ভাবে একটা বকুল গাছ। এ অঞ্চলে বকুল গাছ আমি প্রথম দেখলাম। হ'লই বা কি ক'রে ? আমরা যে বিশাল গাছটির কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেটি উনিংথো, এরা বলে গাছের রাজা। সত্যিই রাজার মত চেহারা, যেমন কাণ্ডের ব্যাস তেমনি এর ডালপালার বিস্তার। এ জাতের গাছও খুবই কম। জায়গাটা মনোরম বটে। কিন্তু এখন যে আবার ঘর করবার ঝামেলা জোটাচ্ছে জারোমথাঙ্গি তার কি করা ? এসব ঝামেলা আমার একদমই সয় না। নিচের দিকে নেমে গেলে বেশ কয়েক ঘর মানুষ আছে, একটা রাস্তাও বেশ চওড়া হয়ে চলে গেছে ওই বন ভেদ ক'রে সমতল ভূমির মধ্যে দিয়ে। তার সামান্য আভাস পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকেই। এখানটা বেশ নিরিবিলি নির্জন। জারোমথাঙ্গিকে বললাম, সবই তো হ'ল তুমি যে এখন আবার ঘর করবার বুদ্ধি ক'রছ—।

ঘর নইলে থাকব কোথায় ?

চুপ ক'রে রইলাম। এর চেয়ে সত্য আর কি হতে পারে ? ব্যাপারটা বাস্তব হলেও আমার ওসব পোষায় না। বরং অনেক ভাল সামনের বড় সড় বকুল গাছের মধ্যে একটা বিশাল কোটর আছে ওটাকে খুঁজে দেখা কোন সাপটাপের বাস আছে

কিনা, না থাকলে ওরই মধ্যে সচ্ছন্দে জারোমথাঙ্গির যা কিছু সম্পত্তি ঢুকিয়ে রাখতে পারবে। কথাটা ওকে বলতেই হাতের দা খানা নিয়ে ও বকুল গাছের সামনে গিয়ে হাজির হ'ল। একটা ছোট চারা গাছ এক কোপে কেটে সরু লাঠির মত ক'রে নিয়ে তার ছুঁচলো মাথা ঢুকিয়ে দিল বকুল গাছের কোটরে। আমি উনিৎথোর নিচে বসে ওর কাণ্ড দেখতে লাগলাম। আমি চোখের দেখায় যা অনুমান করেছিলাম জারোমথাঙ্গির কাজে দেখলাম গর্তটি আমার অনুমানের চেয়ে বড়। অনেকক্ষণ ধরে খোঁচাখুঁচি ক'রল জারোমথাঙ্গি, তারপর ফাঁকের মুখটায় নাক দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ শুঁকলো। আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, বেশ সুন্দর জায়গাটা খুঁজে পেয়েছ। ওটায় কিছু থাকে না। আসলে এই পাহাড়-টাতেই সাপ নেই।

কেমন ক'রে বুঝলে? আমি জানতে চাইলাম।

আমরা বুঝি। সাপ থাকলে তার কিছু লক্ষণ থাকে, গন্ধও থাকে। আসে পাশে বানর আছে।

বানর? কই দেখছি না তো?

আমি দেখেছি। রাত্রে ধরব।

সে কি? আমি অবাক হ'লাম, হঠাৎ বানর ধরতে যাবে বা কেন?

ও তুমি বুঝি কোন দিন বানরের মাংস খাও নি? আজ দেখবে কেমন খেতে। খুব ভাল। অবশ্য—

আমি আর ওকে শেষ ক'রতে দিলাম না। না বলা কথা ওর কাছেই থাক, আমি বানরের মাংস নিয়ে চিন্তিত নই। আমার দুশ্চিন্তা গাছ কেটে ঘর তৈরীর ঝঞ্ঝাট। এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল ডিঙ্গির তৈরী ঘরে সাজানো সংসারে অতিথি থাকা। আমাকে এমন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে জানলে কে আসে ওর সঙ্গে? এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল গির্জার এলাকা এড়িয়ে অন্য কোনদিকে একা সরে পড়া। আমার অনীহা বুঝতে পেরে কি না জানি না জারোমথাঙ্গি প্রসঙ্গ বদলে বলল, আমার সঙ্গে একটু চল।

চল—মনে মনেই বললাম, প্রশ্ন ক'রলাম না কোথায় যাবার জন্যে ও ডাকছে। কি হবে জানতে চেয়ে, চলুক যেখানে ওর প্রাণ চায়।

বাঁ দিকে কয়েক পা গিয়েই হাত পনের লম্বা একটি সরল চারাগাছে কোপ বসাল জারোমথাঙ্গি। এটা একটু অন্য জাতের গাছ। সোজা লম্বা, মাঝারি আকারের পাতাগুলো। অদ্ভুত দক্ষতায় কয়েকটা কোপ দিতেই মড় মড় শব্দ ক'রে পড়ে গেল গাছটা। কাটা অংশ দেখা গেল টকটকে লাল। বেছে বেছে একই রকম আরও তিনটে গাছ কাটার পর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল জারোমথাঙ্গি বনের গভীরে। আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হ'ল না

অচিরে দেখলাম হাতে কিছু লতা নিয়ে উঠে আসছে। দেখে বুঝলাম কচি বেত। উঠে এসে আমাকে বলল, গাছগুলোকে টুকরো কর তো ? নিচের দিকের কাণ্ডটি লম্বা রেখে কোপ মেরে নিজেই দাগ করে দিল কি ভাবে টুকরো ক'রতে হবে।

দুজনে মিলে গাছের টুকরো-গুলোকে বয়ে আনলাম। উনিংথো গাছটিও নিচে। সমস্যা দেখা গেল গর্ত খুঁড়তে গিয়ে। দা দিয়ে তো আর গর্ত খোঁড়া যায় না। আমি দমে গেলাম। কিন্তু, বিচিত্র ধাতুতে গড়া এই খর্বাকৃতি কৃশকায় মেয়েটি, আদৌ দমল না। বরং ওই গাছেরই একটা ছোট্ট চারা কেটে এনে তার গোড়ার দিকটা ছুঁচলো করে তাই দিয়ে শাবলের কাজ চালাতে লাগল। অল্পক্ষণ বাদে সেটি খারাপ হয়ে গেলে আরও একটু উঁচুতে সেটি কেটে নিল। তবে সত্যিই গাছটা অসম্ভব শক্ত জাতের। লোহার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করবার পক্ষে খুব অনুপযোগী নয় বলেই মনে হ'ল। অন্তত মাটি খোঁড়ার কাজটা ভালই হ'ল ওই গাছের শাবল দিয়ে। চারটে খুঁটি পুঁতে কাণ্ডগুলোর সরু অংশের পাতা ছাড়িয়ে খুঁটির মাথায় মাথায় যখন লতা দিয়ে বাঁধা হ'ল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ ক'রছে। এই অবস্থায় আমাকে বসতে বলে হাতের দা ফেলে রেখে জারোমথাঙ্গি কোথায় যেন চলে গেল। অনেকটা ঘরের মত আকার হয়েছে বটে তবে মাথার ওপর চালা বলতে উনিংথোর ডালপালা, তাও অনেক উঁচুতে। এখনও কিছুই হয় নি, কি দিয়ে যে ছাউনি হবে আর কি দিয়েই বা চারপাশের দেয়াল তার কিছুই আমার মাথায় আসছে না। আনতে অবশ্য চাইছিও না, আমার যেন কোনই প্রয়োজন নেই এমনি নির্লিপ্ততা মনে। সত্যিই আমি কোন আগ্রহ অনুভব ক'রছি না জারোমথাঙ্গি যেটুকু বলছে অনেকটা হুকুম তামিল করবার মত ক'রেই কিছুটা ক'রছি, অনেকটা যেন অনুরোধ রক্ষার জন্যেই।

উনিংথোর গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম ক্লান্তি দূর করবার জন্যে। বহুদিন এমন পরিশ্রম করিনি, অনভ্যাসের জন্যেই কষ্টটা বেশী মনে হচ্ছে। যাক একটু বাতাস বইছে বলে যা রক্ষে, নইলে এসময় গুমোট হলেই হয়েছিল। খাবার ব্যবস্থা কি যে হবে কে জানে ? বড়ই ক্ষিধে পেয়েছে তাতেই যেন ক্লান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। জারোমথাঙ্গিই বা হঠাৎ কিছু না বলে গেল কোথায় ? বকুলের কোটরে যা হোক নিজের পুঁটলিটা ঢুকিয়ে রেখেছে। তা হ'লে যেখানেই যাক আসবে। আমি গাছের গুঁড়িতে গা এলিয়ে দিলাম যতক্ষণ সে না আসে আমি একটু বিশ্রাম ক'রে নিই। আঃ বেশ আরাম লাগল দমকা বাতাসটা এসে। চোখ জড়িয়ে আসছে বোধহয় রোদের তাতের জন্যে। বন্ধ করেই থাকি ; কি আরাম! কেবল চোখ বন্ধ ক'রলেই এত ভাল লাগে জানলে আগে থেকেই না হয় বুঁজে থাকতাম।

আচমকাই জেগে উঠলাম। জারোমথাঙ্গি ধাক্কা দিচ্ছে। চোখ মেলতেই বলল,

বাবাঃ এই ভরা দুপুরে এমন ঘুমও তোমার আসে।

ঘুমের জন্যে আবার সময় নির্দেশ করা থাকতে পারে না কি আমার মত নিষ্কর্মার ? বড় অবাক করা কথা বলল জারোমথাঙ্গি। তার যখন ইচ্ছা সে আসবে এর মধ্যে অবাক হবারই বা কি থাকতে পারে ? কিন্তু জারোমথাঙ্গির হাতের দিকে চোখ পড়া মাত্রই আমার চিন্তাভাবনা উবাও হয়ে গেল। বিরাট সেগুন পাতার মোড়কে কি যেন এনেছে। নিশ্চয়ই খাবার। মোড়কের চেহারাই বলে দিচ্ছে। আমি নেতিয়ে পড়েছিলাম উঠে খাড়া হয়ে বসলাম। ও আমার সামনে বসে পাতার মোড়ক খুলে ধরল। বাঃ ভাত, আর মাছের কি যেন একটা সহখাদ্য। মাছগুলো কালোঝুল। তা হোক, খাবার তো বটে। এখ। ও-ই অমৃত। এক সঙ্গেই মেলে ধরলাম দুজন। আজ আর কম নেই, কাউকেই কৃচ্ছসাধন ক'রতে হবে না।

খাওয়া শেষ হতেই জারোমথাঙ্গি জানাল, এখানে নিচেই নদী আছে। নদীটা বেশ কাছে। ছোট একটা বাজারও আছে নদীর ওপরটাতেই।

এখন সব কথাই মধুর শোনাচ্ছে। মন দেবার প্রয়োজন না থাকলেও কান ক'রেই শুনলাম। নদী আমার প্রয়োজনে লাগতে পারে বাজার দিয়ে কি ক'রব ? ওই বা বাজার দিয়ে কি ক'রবে কে জানে ? বাজার ক'রতে তো টাকা লাগে, আমি বহুকাল সে বস্তুটা চোখে দেখি নি, আমার ধারণা জারোমথাঙ্গিও আমারই মত নিষ্কপর্দক। জানি না বাজার দিয়ে কোন কর্ম ওর হবে। তা ছাড়া এই বিজুবনে বাজার কথাটা আমার কাছে একটু বিস্ময়কর শোনালেও আমি ব্যাপারটায় গা ক'রলাম না।

জগৎ সংসারের নিয়মই এমন যে সকলেই অন্যকে নিজের মত ক'রে দেখে থাকে। তাতে যে অনেক সময়ই ভুল হয় তার প্রমাণ পেলাম জারোমথাঙ্গির ঘর বাঁধবার পর। ওকেই আমি আমার মত কপর্দকহীন বাউন্ডুলে ভেবে যে কি ভুল ক'রেছি তা বুঝতে সময় লাগল না। যখন আমার এই জ্ঞান হ'ল তখন অবাক হ'লাম ও কি ক'রে অর্থ সঞ্চয় ক'রেছিল ? বা কোথায় পেল সঙ্গের টাকাগুলো ? সামান্য হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা কম হল না। ওর যা প্রয়োজন সবই ও অর্থমূল্যেই সংগ্রহ ক'রে ফেলল। শুধু তাই নয় কি জিনিষ যে প্রয়োজন হতে পারে সবই সুন্দর ভাবে ওর মনের মধ্যে যেন সাজানো ছিল। আমাকে বিস্মিত ক'রে একে এক সবই সংগ্রহ করে যখন ঘর তৈরী সম্পূর্ণ ক'রল আমাকে বলল, তুমি অনেক ক'রেছ। সত্যি বলতে কি তুমি যে এতটা ক'রতে পারবে আমি ভাবি নি। ঘরটি বেশ ভালই হয়েছে, আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট।

আমার কোন নারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা ছিল না, ধারণা হবার সুযোগও ছিল না। কারণ যাদের সামনে অতীতে এসেছি সকলকেই অংশতঃ দেখেছি, এক একজনের এক এক খণ্ডরূপ। যদি সম্পূর্ণ দেখে থাকি তো এই জারোমথাঙ্গিকেই

প্রথম সম্পূর্ণ দেখলাম। পরম বিস্মিত আমার সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচন ঘটল ওর। অথচ সত্যি কথা বলতে কি গির্জায় থাকাকালে আকার প্রকার দেখে জারোমথাঙ্গির প্রসঙ্গে আমি এক শ্রেণীর বানরের কথাই ভাবতাম, আমার মনে এসে পড়ত। আমি তাই কখনই ওর দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখি নি। আজ আমি ওর সংগঠন শক্তির সামনে অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। শুধু তাই নয় আমি ওর ইচ্ছার একটা রূপ মাত্র হয়ে পড়েছি ধীরে ধীরে।

ক' দিন ধরে সমানে পরিশ্রম করার পর ঘর যখন শেষ হ'ল তখন সামনের বকুল গাছের মাথার ওপর সূর্যের শেষ রশ্মি আটকে আছে। আর একটু বাদেই অরণ্যের অন্ধকার জেগে উঠে সূর্যের রোশনিটুকু নিঃশেষে মুছে নেবে। গতরাত্রেও উন্মুক্ত আকাশের নিচে কোনক্রমে দিনের প্রতীক্ষা সাঙ্গ হয়েছে। আজ মাথার ওপর ছাউনি পড়েছে, যা হোক কোন ভাবে তৈরী হয়েছে পর্ণছায়া কুটির। গভীর রাতের আকস্মিক শৈত্য প্রবাহ থেকে তো বাঁচা যাবে। অথবা রাতের শিশির যা ভোরের শিরশিরানি জাগায় শিরার মধ্যে তার থেকেও পাওয়া যাবে মুক্তি।

সূর্য সরে গেলেই আমাদের সন্ধ্যা, আর সন্ধ্যা মানেই রাত, সে রাত অচিরেই গভীর হয়। পৃথিবীর অন্য অনেক প্রান্তে যখন দিন থাকে তখনই আমাদের সন্ধ্যা নেমে আসে গাছের ছায়ায় অন্ধকার নেমে। আর সূর্যের আলো নিভে আসবার আগেই যা কিছু কাজ কর্ম শেষ হয়ে যায়, আমাদের রাতের খাওয়াও। আলোর কোন ব্যবস্থাই আমাদের নেই। প্রকৃতি জ্বাললে আলো, নইলে অন্ধকার। আর অন্ধকার মানেই তো সমস্ত কাজের অবসান। এই ভাবেই আমাদের জগৎ সংসার চলছে। ঘর তৈরী যেদিন শেষ হ'ল সেদিন আমাদের উৎসব। আমাদের মানে জারোমথাঙ্গির। একসময় গিয়ে চাল আর লবণ কিনে এনেছিল নিচের বাজার থেকে আমি যখন শেষ ছাউনি সাজিয়ে ওপর থেকে নেমে এলাম জারোমথাঙ্গিও ঘরের সামনে আগুন জ্বালিয়ে নিল একটা গর্ত ক'রে। আগেই একখানা বাঁশ কেটে এনেছিল জঙ্গল থেকে তাকেই ছোট ছোট টুকরো ক'রে নিল একদিকের গাঁট রেখে কৌটোর মত ক'রে। সেই কাঁচা বাঁশের টুকরোগুলোয় চাল ভরে ওপরের মুখটা বেশ করে লতা পাতা দিয়ে মুড়ে বেঁধে সেগুলোকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর বনের মধ্যে থেকে অনেকগুলো ফুল তুলে এনে ঘরের মধ্যে ফেলল। আমি আগুনের সামনে বসে ভাত রান্না দেখছি ও তখন আপন খেয়ালে ব্যস্ত। ও কতগুলো সূর্যমুখী ফুলও জোগাড় করে এনেছে দেখলাম, অপেক্ষা ক'রতে লাগলাম ফুলগুলো দিয়ে ও কি রান্না করে। কিন্তু রান্নার তো আরও উপকরণ চাই, তেল, লবণ, মশলা। কিছু না হলেও তেল, লবণ তো চাই। একমাত্র লবণ ছাড়া যার কিছুমাত্র তৈজস নেই সে কি রান্না করবে ফুল দিয়ে? তাও তো কোন উদ্যোগ নেই। ফুলগুলোকে বেশ যত্ন ক'রে ঘরের এক কোণে রেখে দিল

লক্ষ্য ক'রলাম। তবে আমার ওতে আগ্রহ আদৌ নেই, ভাতটুকু কেবল হোক।

আমার পাশটিতে এসে জারোমথাঙ্গি বসল, যেন ওর এবার ছুটি হয়ে গেছে। মুখে চোখেও খুশির প্রলেপ। আমি কিছু বলবার আগেই বলল, ঘরটা হ'ল না। ক'দিন বাদে একজন লোক বলেছে গাছ চেরাই ক'রে দেবে, তখন ঠিক ক'রে নেব। যাক এখন রাত কাটানোর মত তো হয়েছে।

এবার আমি জানতে চাইলাম, তুমি তাহ'লে এখানেই থাকছ?

মানে? ও আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জানতে চাইল। পরক্ষণেই প্রশ্ন ক'রল, আমি থাকছি মানে? তুমি?

আমি একটু থেমে মনের কথাটা প্রকাশ ক'রলাম, আমার কি ঠিক বল? ভাল লাগলে আছি, নইলে—

জারোমথাঙ্গির মুখে শেষ সূর্যের আলো আর সামনে জ্বলা আগুনের প্রতিবিম্ব একই সঙ্গে খেলা করছিল, অকস্মাৎ ওকে ম্লান দেখলাম। একটু আগেই ওর যে নিজস্ব উজ্জ্বলতা ছিল তা যেন মিলিয়ে গেল। প্রথমটা ও কোন কথা বলল না। হঠাৎ একসময় বলে উঠল, একথা আমাকে আগে বললেই পারতে! ওর কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ, অভিমান। আমি ওর এই আকস্মিক পরিবর্তনে একটু বিচলিত হলাম। ওর ক্ষুব্ধ হবার মত কি যে ক'রলাম ভেবে পেলাম না। কি যে বলা যায় তাও চিন্তায় এল না। আমি এক সামান্য প্রাণী, অন্য পোকামাকড়দের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের শব্দ তেমন আছে কিনা জানা নেই। না থাকলেই ভাল, ভাষাই যত বিপত্তি ঘটায়। কথা অনেক অশান্তির উৎপত্তি করে। আমি যদি আমার কথাটা না বলতাম তাহলে তো নিশ্চয়ই ওর এই বিরাগের কারণ ঘটত না? এখন এই নিঃশব্দতা বড় অস্বস্তিকর। দুজনেই আপন নীরবতা নিয়ে বসে আছি। আমি মাঝে মাঝে ওর মুখের দিকে চোরা চোখে চেয়ে দেখছি সেখানে আলোছায়ার খেলা। কিছু আগে যে প্রসন্নতা ছিল তার বদলে ধীরে ধীরে ধূমায়িত হচ্ছে বিষণ্ণতা, যেমন সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে জমাট বাঁধছে অন্ধকার।

আমাদের ঘিরে ধীরে ধীরে নেমে এল অন্ধকার, সামনের আগুনটুকু জ্বলতে জ্বলতে ম্লান হয়ে গেল সময় বুঝে। তার আর আলোকিত করবার ক্ষমতা রইল না। দাহ্য যা কিছু ছিল সবই অঙ্গারে পরিণত হয়ে গেল। মধ্যে একবার উঠে গিয়েছিল জারোমথাঙ্গি তার সাধের কুটিরে। ফিরে এসে বসে অঙ্গারের মধ্যে থেকে বাঁশের চোঙা গুলো বের করে নিল এক একটা করে প্রায়ান্ধকারের মধ্যেই। দুপুরে একবার গিয়ে মাটির কলসী কিনে জল এনেছিল সংগ্রহ ক'রে, আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে খুব স্বাভাবিক স্বরেই বলল, একটু জল আনো তো কলসীটা থেকে।

আমি বেশ খুশি হয়েই আনলাম। অনেকক্ষণ পর ওর কথা শুনে ভাল লাগল। অনুভব ক'রলাম ওর দুঃখে আমিও কাতর হয়ে পড়েছিলাম। ওর স্বরের

সুস্হতা আমাকে তৃপ্তি দিচ্ছে তো শুধু সহানুভূতির জন্যেই। হোক। ওকে অযথা ব্যথা দিয়ে নিজেই যেন ব্যথিত হয়েছি বেশী। নিজের মানসিকতায় অবাক হযে গেলাম পরমুহূর্তেই। এ কি! কিসের এ দুর্বলতা? কেনই বা এ সমবেদনা কি বা সম্পর্ক ওর সঙ্গে? আমার আমি নিজেকে নিয়েই তো মগ্ন থেকেছি চিরদিন অহেতুক ভাববাদ কেনই বা আচ্ছন্ন ক'রল আমাকে? একটা পোকার জীবনে কি বা তাৎপর্য এর?

এই আমাদের অমৃত, এই ভাত আর লবণ। আমাদের সেই অমৃত ভোগ শেষ হ'ল ঝিঁ ঝিঁর সঙ্গীতের সুর শুনতে শুনতে। আমি এই মুহূর্তে বলতে পারি বিশ্বের বড় বড় শহরের দামী ভোজনালয়ের জমকালো সন্ধ্যাকালীন ভোজ সঙ্গীতের চেয়ে আমাদের এই সঙ্গীত অনেক বেশী চিত্তহারী। মধুর। নিবিড় প্রাকৃতিক অরণ্যের গভীরে এই ঝিল্লির সুর যে কি মায়াময় পরিবেশ সন্ধ্যার অন্ধকারে গড়ে তোলে সে কেবল বোঝে যার অভিজ্ঞতা আছে। সন্ধে হতে না হতেই রাত গভীর হয়ে যায়, এই সময় রাত যেন লাফিয়ে চলে। সূর্যাস্তের পরই এখানে রজনীর মধ্যযাম, আর কোন পর্যায় নেই। আমরা পোকামাকড় আর সরীসৃপেরা সাধারণত আপন কোটরে ঢুকে পড়ি, শ্বাপদেরা ক্ষুধার্ত থাকলে বিচরণ ক'রতে থাকে আহার্যের সন্ধানে। অহিংস কোন প্রাণীই রাতের অন্ধকারে আর ভোজ্য খোঁজে না, রাত তাদের বিশ্রামের, নিদ্রার নির্ধারিত অবসর।

এখানকার জীবনে খাদ্য হওয়া ছাড়া ফুলের কোন ভূমিকা থাকতে পারে তা দেখলাম জারোমথাঙ্গির কর্মে। খাওয়া শেষ ক'রে ঘরে ঢুকে সে ফুলগুলোকে ঘরের বেড়ার গায়ে গুঁজে গুঁজে রাখতে লাগল। বুঝলাম ভালবাসার ঘরখানাকে সে সাজাতে চায। এটা তার গির্জার আওতায় থাকার শিক্ষা, ফুলসজ্জা তার পরিবর্তিত মানসিকতার ফসল। ওর যা ভাল লাগে করুক। ওর ঘর নিয়ে যা ক'রে সুখ পায় করবার অধিকার ওর আছে। আমার এখন প্রয়োজন ঘুম। সেটুকুর ব্যবস্হা যে হয়েছে এতেই আমি খুশি। বাস্তবিক জারোমথাঙ্গির চেহারা আকৃতির সঙ্গে তার প্রকৃতির যা রূপ দেখছি সেখানে কোন মিলই নেই। ওকে দেখে আমার কখনও একটি নারী সত্তার কথা মনে আসে না, এখনও নয়। অথচ অতি বিস্ময়েই আমাকে লক্ষ্য ক'রতে হচ্ছে যে বাসনায় ও বিলাসে আর পাঁচজন নারীর সঙ্গে ওর পার্থক্য বোধহয় কিছুমাত্র নয়। ওর ইচ্ছাগুলো যে নারীসুলভ বিলাসে নিয়ন্ত্রিত এও যেন আমার কাছে এক বিপুল বিস্ময়। আকারে বা আকৃতিতে যাকে অন্য কোন শ্রেণীর প্রাণী বলে আমার ধারণা হয় ওদেরও বোধহয় এমনি আচার আচরণ হবে! হোক। ও ওর মনের মত থাকুক আমি আমার মত থাকি। কাল সকালে উঠে বরং একবার বেরিয়ে যাব ডিঙ্গির খোঁজে। ওর ছেলেটি কেমন আছে জানতে হবে। জারোমথাঙ্গি যখন দেখেছে কাছাকাছি একটা বাজার আছে তখন

খোঁজ নিতে হবে সেখানে ওষুধ পাওয়া যায় কি না। গেলে—আমার কাছে তো পয়সা নেই। কি ক'রে নিয়ে যাব? ইস্। এতদূরের পথ সকালে বেরোলে পাহাড় ভেঙ্গে পেঁছাতে তো রাত হয়ে যাবে। গিয়ে ডিঙ্গিকে বললেই হবে কিনে নিয়ে যেতে। কিন্তু ডিঙ্গি কি পারবে এতদূর শুধু ওষুধ কিনতে আসতে? কি ক'রে সম্ভব? আমার পক্ষেও যে অসম্ভব ওষুধ কিনে নিয়ে যাওয়া। কি করি—? জমাট অন্ধকারের মধ্যে চোখ বুঁজে ঢুকে পড়েছি একই রকম জমাট বাঁধা চিন্তার মধ্যে। এমনি সময় অন্ধকারের মধ্যে চিঁ চিঁ করে ডেকে উঠল কোন ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া বৃক্ষবাসী। অমনি আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা শীর্ণ দেহ। শুধু দেহটাই আছে। হাত দিতেই বুঝলাম কোন আবরণ নেই। আমার হাত লাগা মাত্রই আমাকে সজোরে জাপটে ধরল সে। জারোমথাঙ্গি। প্রকৃতির কৃপণতায় দীন কিন্তু সম্পূর্ণ নারী। শুধু তার দুখানা হাত নয় পা দুখানাতেও আমাকে প্রবল ভাবে বেষ্টন ক'রেছে। অক্টোপাস? তার তো শুনেছি হাতে পায়ে মিলিয়ে আট, এর তো চারটে বেশী আর নেই, মনে পড়ে গেল শাখামৃগ যেমন ভাবে বৃক্ষবাহু জড়িয়ে ধরে থাকে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তেমনি ভাবে জড়ানো আমি। অন্ধকারের গভীরে জারোমথাঙ্গির দীনতাকে অতিক্রম ক'রে উঠল নারীত্ব, আমার ঘুম ছিঁড়ে অভ্যুদয় হ'ল প্রবৃত্তির। প্রাণীসুলভ প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হলাম। শীর্ণা জলধারাকে বিপুল বেগবতী হতে দেখছিলাম, অন্ধকারে উপলব্ধি ক'রলাম সেই দুর্বার আবেগের অমিত শক্তির প্রকাশ। স্পর্শ তার শরীরের সীমাকে অতিক্রম ক'রল।

কোন প্রাণীই ক্ষুধা পিপাসা আর রিরংসাকে অতিক্রম ক'রতে পারে না। বহুদিন আগে মহানগরীর জলাশয়ের ধারে সেই যে একটি উভচর ছোট পোকাকে দেখেছিলাম, আমি এই অন্ধকারে সেই পোকাটিতে রূপান্তরিত হ'লাম। সেই ক্ষুদ্রতম পোকাটিও আপন শরীরে যতবড়, আমি তার চেয়ে বড় নই। বিস্ময়কর কেবল জারোমথাঙ্গি। ওর ওইটুকু ক্ষীণ শরীরের মধ্যে থেকে যেন মত্ত হস্তীর প্রকাশ। প্রকৃতির অনিচ্ছুক দানে জারোমথাঙ্গিকে অনেকটাই অসম্পূর্ণ মনে হয়। তাই বলে ওর আকাংখার যে কোন ঘাটতি আছে এমন নয়। সেই অদম্য বাসনার নিষ্পেষণে আমার সাধ্যের সুখটুকু নিংড়ে নিয়ে যখন ওর নিস্তার তখন একটা অজানা পাখি নিজের মনে চেঁচিয়েই চলেছে বনে কোন গাছে। আমাদের কুটিরের এত কাছেই তার চিৎকার যে কান না দেবার পথ নেই। জারোমথাঙ্গি হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়ল। আমার বুকের ওপর ওর একটি অবশ হাত মাটিতে আশ্রিত কোন কাটা লতার মত লেপটে আছে। অবসন্নতা তো আমারও, তাই সেই হাতটিকে সরিয়ে দেবার প্রয়াসী না হয়ে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেলাম।

আমরা সূর্যের স্পর্শ পাবার আগেই পাখিরা চেতনা পায়। তাদের জাগরণের

শব্দে মুখর হয় স্তব্ধ বনস্থলী। ধীরে ধীরে সেই শব্দের অভিঘাত আকাশ পথে ছিটিয়ে যায। ছড়াতে ছড়াতে আঘাত করে আমাকেও। চোখ খুলে দেখি একা। আমিই শুধু শুয়ে আছি, কাল রাতে আমার পাশটিতে যে প্রবল একটি অস্তিত্ব আপনাকে বিপুল ভাবে বিকশিত করেছিল সেটি নিশ্চিহ্ন। প্রথম ঝোঁকে সন্দেহ হ'ল সে কি মায়া? কোন বিভ্রান্তি! স্বপ্নের রেশ কি আমার জাগরণ পর্যন্ত লেগে আছে?

উঠে বসলাম। ঘরের মধ্যে কালকের সূর্যমুখীদের ম্লান মৃতদেহ চারিদিকে ছড়ানো। গতরাত্রির স্মৃতিমোচন হতে দেরী লাগল না আর নিমেষমাত্র। না, স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, ভ্রমও নয়। সত্য। নিবিড় অন্ধকারকে দীর্ণ করে যে আলোর প্রকাশ ঘটেছে এ তারই মত। এখনও আলো অসম্পূর্ণ, প্রাতঃসন্ধ্যা। কোথাও যে আলোর স্পর্শ লেগেছে আকাশে তারই আভাস। জারোমথাঙ্গি গেল কোথায়? শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে অন্ধকার বড় ভয়ঙ্কর। ও কি অন্ধকারেই গেছে কোথাও। আবছা আলোয় ভেতরটাকে যতটুকু দেখা যায় তাতে ওর দা খানা নেই। এ একটা শুভ সংবাদ, কোথাও গেছে। সম্ভবতঃ প্রাতঃকালীন কাজে। কিন্তু আমার দেখা পথে নদী তো বেশ দূর। অতটা দূরেই কি তবে এরও চেয়ে অন্ধকারে উঠে চলে গেছে? তবে ভরসা এই যে বন্যপ্রাণীদের যতটা ভয় আমরা করি জারোমথাঙ্গি হেন প্রাণীদেরও প্রায় ততই ভয় করে তারা। কাজেই আমার অমূলক চিন্তায় কাজ নেই।

ঘরের বাইরে পা দিতেই অন্য রকম। আলোয় আলো। আলোময় এই বিশ্ব। যে বৃদ্ধ বকুল গাছটাকে কেমন ঝুপড়ি অন্ধকার বুড়ির মত দেখায় তাকেই কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সূর্যের আভাসে চারিপাশের বৃক্ষলতা, পায়ের তলার ঘাস, সামান্য পাথরের স্তূপগুলোকে পর্যন্ত অনারকম দেখাচ্ছে। পূবের যে বিস্তীর্ণ সমভূমি জঙ্গলাকীর্ণ কি সুন্দর সবুজ দেখাচ্ছে তাকে। যে বিশাল উনিংথো গাছটিকে আশ্রয় ক'রে আমাদের কুটির তার দিকে এই প্রথম সম্পূর্ণভাবে তাকালাম। এত নিচে থেকে বিশালত্বের পুরো উপলব্ধি অসম্ভব। সামান্য একটু অংশ মাত্রই দেখা গেল। খুবই ছোট আকারের কোন পাখি চিড়িক্ করে, ডাকছে। দেখা গেল না, আগ্রহও ছিল না দেখবার। ঘরের ভেতর আর ঢুকতে ইচ্ছে ক'রল না। ঘর আলো এমন অমলিন নয়। আসলে আমরা নিজেদের চারপাশে বেষ্টনী গ'ড়ে প্রকৃতির অকৃপণ দানকে খণ্ডিত করি। আলোর ঔদার্যকে ঢেকে অন্ধকারকে করি আমন্ত্রণ। প্রাণীমাত্রেরই ধর্ম আপনার চারপাশে কোন না কোনভাবে গড়ে তুলতে চায় মন মত নির্মোক। এই যে পাতার কুটির এও তো আমাদের খোলসমাত্র। ইঁট পাথরের ঘর সে আরও শক্ত ধরনের নির্মোক।

আমি খোলস ছেড়ে বেরিয়েছি বলেই হাঁটতে লাগলাম। নিচের দিকে না কি

লোকালয়, দোকান, বাজার। ফাদারের দেওয়া প্যাণ্ট সার্ট আমার পরণে সাকুল্যে অনেকগুলোই পকেট কিন্তু সবই তো শূন্য। বস্তু বলতে কিছু নেই পয়সা তো কোন দূর। এ হেন অবস্থায় বাজারে আমার কি কাজ? তা ছাড়া কি বাজার কেমন বাজার কিছুই তো জানি না—তবু ধীরে ধীরে উতরাই বয়ে বোধ হয় সেদিকেই নেমে চললাম। জারোমথাঙ্গি বাজারের দিকেও গিয়ে থাকতে পারে, ওর ওই বাজারের প্রতি কিছুটা আকর্ষণ আছে। থাকার কারণও আছে, ওর অর্থ আছে, যত কমই হোক সামর্থ আছে জিনিষ কেনবার। যাই তবু ওই দিকেই। কিছুটা নেমে একটা বাঁক নিতেই মনে হ'ল নিচের দিকে একটা টিনের ঘর। আর একটু নামতে একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে আরও কয়েকটা অমনি টিনের বাড়ী উঁকি দিল। দেখা গেল একটা পাকা সড়ক, পশ্চিমে একটা টিলার আড়াল পড়েছে পূবে অনেকটা লম্বা—বনের মধ্যে ঢুকে গেছে বন চিরে। তারই দুপাশে টিনের ঘর বাড়ী ক'টি। ওটাই তবে বাজার হবে জারোমথাঙ্গির কিন্তু আমি কি ক'রব ওদিকে গিয়ে? কি বা কাজ?

মুহূর্তের চিন্তায় আমি পথ বদল ক'রলাম। ডান দিকে বেঁকে গেলে কালকের ফেলে আসা পথ। যদি না গুলিয়ে ফেলি তো ওই দিকেই চলতে চলতে একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে ডিঙ্গির আস্তানা। সেদিন ওই ভাবে চলে আসা ঠিক হয় নি। ওর ছেলেটি বা কেমন আছে? ডিঙ্গিকে একদিন দেখেই মনে হয়েছে ও বেশ পরিশীলিত মেয়ে। ওর পোষাক পর্যন্ত আলাদা। ও একটা আলাদা পিঠকাটা জামা ব্যবহার করে ওর বক্ষশ্রীর গর্ব করে। ও ঠিক পিঙ্গলা নয়, বরং এমন শুভ্রতা যে কোথায় পেল মুখ দেখে সে অনুমান অসম্ভব। বর্ষার নদীর মত শরীরে অকৃপণ যৌবন। ঠিক স্থূল নয় আবার শীর্ণকায়া তো নয়ই। প্রকৃতির পরিমিতি বোধের এক আশ্চর্য উদাহরণ এই ডিঙ্গির শরীর। আমার আপন ভাষার শব্দে ওর নাম হলে ডিঙ্গি তো কোন মতেই নয় বরং ময়ূরপঙখী বলা যেত। তা না বললেও ও যেন এক মহাজনী নৌকা, যে আপন ব্যাপ্তির মহত্বে গরবিনী, গমনে আগমনেও তার মর্যাদার অভিব্যক্তি।

অথচ কতটুকুই বা দেখেছি ওকে? এত ক্ষণকালের দেখা দিয়ে কি বিচার চলে? চলতে চলতে নিজেই এ কথা ভাবলাম। তারপর মনে হ'ল এ তো সবই বহিরঙ্গের রূপ, মনে কেমন কে বা জানে? নইলে ওর পুরুষটি ওকে ছেড়েই বা গেল কেন? অন্তরেও যদি সুশ্রী হ'ত তাহ'লে কি আর ওর লোকটি ওকে ফেলে যায়? অনেকটা পথ চলে এসে বাঁকা ইয়াংগো গাছটিকে দেখে বুঝলাম ঠিকই পথে আছি, এটাই কালকের পথ। এমন বাঁকা ইয়াঙ্গো গাছ কদাচিৎই দেখা যায়। সরল, ঋজু, দীঘল ইয়াঙ্গোরা শত শত ফুট ওপরে উঠে আকাশ ছোঁয়। এমন ভাবে মাঝ পথে বেঁকে যাওয়া এদের স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই এটিকে আমার

পথের নিশানা ক'রে রাখা সহজ মনে হয়েছে। গাছটিকে বাঁ দিকে রেখে পায়ে চলবার ক্ষীণ রেখা ধরে চলতে লাগলাম।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে নিচের একটা গাছ থেকে লাফ দিয়ে উঠল এক উৎকট বানর। একবারে আমার সামনে। বিচিত্র দর্শন এই জাতীয় বানর আমার চোখে এই প্রথম। সেটি মাথায় প্রায় একটি বছর দশেকের ছেলের সমান লম্বা, মাথার সামনের দিকটা প্রায মাঝ পর্যন্ত নির্লোম। দুটি বিশাল দাঁত তার মুখের মধ্যে থেকে বাইরে চলে এসেছে। লক্ষ্য পড়ল ওর কোলে আঁকড়ে আছে একটি বাচ্চা। এমন আচমকা ওকে লাফিয়ে পড়তে দেখে আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় ক'রতে লাগল কিন্তু আমিও যেন আত্মরক্ষার বুদ্ধিতেই আর কিছু না পেরে বিরাট এক লাফ দিয়ে উঠলাম জোড়া পায়ে হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে। আমার ওভাবে লাফিয়ে ওঠা এবং ধপাস ক'রে লাফিয়ে পড়ার শব্দে বানরটিও যেন হকচকিয়ে গেল। ও-ও হয়ত আমাকে আগে লক্ষ্য করে নি, এবার কোলের শিশুর স্বার্থেই লাফ দিয়ে একটা ছোট গাছে উঠে আর এক লাফে অন্যগাছে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল। এমন একটি বিকট আকারের বানরকে এভাবে দেখে নিজের নির্বুদ্ধির পরিচয় পেলম। এভাবে নিরস্ত্র বেরিয়ে আসা ঠিক হয়নি। যদিও এই রকম ক'রেই দীর্ঘকাল চলেছি অতীতে যে কোন বন্য প্রাণীর সম্মুখীন হতে হয় নি এমনও নয় তবু আজ যেন সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম, এবং এরকম ভয় পাওয়া এই প্রথম। ও আমাকে কোন দিক থেকে আক্রমণ ক'রে বসবে কি না ভাববার জন্যে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার ওর সঙ্গে যদি কোন পুরুষ সঙ্গী থাকে। থাকলে আমাকে আক্রমণ না ক'রে ছাড়বেনা। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত বাদেই বুঝলাম তা নেই, কাছাকাছিও নেই, তাহ'লে ও চেঁচিয়ে জড় করে ফেলত। এখন ভয় ও আমাকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসবে কি না। চারদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বুঝলাম ও ওর মত সরে পড়েছে। আসলে কেউ আমরা কারও জন্যে তৈরী ছিলাম না। দুজনেই আপন পথে চলতে গিয়ে আচমকা দেখায় ভয় পেয়ে গেছি পারস্পরিক অবিশ্বাসের জন্যে। এই অবিশ্বাস জন্মগত এবং লক্ষ যুগের উত্তরাধিকার। রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে ভয় এবং বিদ্বেষ—অবিশ্বাস। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে দুর্বল প্রাণীরা বাধ্য হয়ে ক'রে বসে আক্রমণ। সদ্য জন্মানো বানর শিশু স্বভাবজ প্রেরণাতেই দাঁত খিঁচায় আত্মরক্ষার তাগিদে। ভয় পায় বলে ভয় দেখিয়ে বল পেতে চায়।

আমিও অন্য উপায় না পেয়ে দুটো পাথর কুড়িয়ে নিলাম দু হাতে—যদি তেমন আক্রান্তই হই তো প্রথম আঘাতটা যেন প্রাণী অনুসারে তার দুর্বল স্থানে আমিই ক'রতে পারি। এ নেহাৎ মনঃতুষ্টি, নইলে এই গহন অরণ্যে হিংস্র প্রাণীদের স্বভূমির অভ্যন্তরে দুটো সামান্য পাথর কোন অস্ত্রই নয়। আত্মরক্ষা তো

দুরন্থান বিপদ ডেকে আনবার পক্ষেও ওটি যথেষ্ট হতে পারে। অন্য কোন উপায়ও যে আর নেই। একটা গাছের ডাল কেটে নেব তার জন্যেও তো অস্ত্রের দরকার। এই জন্যে জারোমথাঙ্গি নিজের দাখানাকে কখনও কাছ ছাড়া করে না। আসলে ও হিসেবী। মেযেদের মধ্যে এই সতর্কতা থাকেই, এ ওদের স্বভাব। অলকনন্দাকেও দেখেছি প্রতি কাজেই তার সাবধানতা ছিল, প্রত্যেকটি কাজই বোধহয় হিসেব করে করত। এখন পর্যন্ত তো জারোমথাঙ্গিকেও সেই রকমই মনে হচ্ছে। আমার ভয় আরও সেই খানেই। আমি এত হিসেবের নির্দেশ মেনে চলতে পারি না। জীবনটুকু ছাড়া আমাদের মূলধন তো আর কিছু মাত্র থাকে না, তা সেই জীবনটাও যদি কৃপণের মত সন্তর্পণে ভোগ করতে হয তাহ'লে আর তার সার্থকতা কি থাকে ? যে অর্থ ব্যয় ক'রতে প্রতি মুহূর্তে সংকোচ হয় সেই অর্থের যেমন কোন মাধুর্য থাকে না তেমনই তো সবই। আসলে উদার ব্যবহারের মধ্যেই থাকে ভোগের আনন্দ।

আত্মপক্ষ সমর্থনের পক্ষে যুক্তিগুলো সাজিয়ে নিতে পেরে আরামে পথ চলতে লাগলাম। মনে আর কোন বিকার রইল না। জারোমথাঙ্গির দা এবং সতর্কতা ওর নিজস্ব থাক, আমি এমনি বেহিসেবীই থাকি, এই আমার আনন্দ। আর আনন্দের সন্ধানেই তো আবার বন্ধন ছিঁড়লাম। জারোমথাঙ্গি বাঁধতে চাইলে চলবে কেন ?

আলো কমে এলে হঠাৎই ঝিমিয়ে পড়ে পরিবেশ। চট ক'রে শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। চারিপাশ যেন অজানা আশংকায় ঝিম ধরে থাকে। ঠিক এমন সময়েই আমি এসে পেঁছালাম ডিঙ্গির ঘরের সামনে। বাইরে যেমন প্রকৃতির সংসারে ডিঙ্গির ঘরের মধ্যেটাতেও তেমনি—ভয়ংকর নীরবতা। অতগুলো শিশুর বাস অথচ কোন কোলাহল নেই। তবে কি কেউ নেই ? এটা ডিঙ্গির ঘর নয় ? আমি কি তবে ভুল এলাম ? ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম চারপাশে এই তো সেই ছায়াতরু, এই তো সেই পাথর। সবই ঠিক আছে অতএব ঠিকই এই ঘর, কিন্তু এমন নিঃশব্দ কেন ? ওরা কি তবে নেই ? ঘরের কাছটিতে গিয়ে উঁকি মারতেই একটি শিশু স্বভাষায় কি বলে উঠল। ডানদিকে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম আগুনের সামনে বসে ডিঙ্গি কি যেন রাঁধছে। শিশুর কথায় পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাকে ঠাহর ক'রতে পারল না আলো আঁধারির জন্যে। সেও স্বগতস্বরে কি যেন বলে উঠল। আমি তা না বোঝায় জবাব দিতে পারলাম না। আমার নিঃশব্দতার জন্যেই হোক বা অন্য কোন সন্দেহে ডিঙ্গি উঠে এসে দরজার ভেতর দিকে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। আমাকে দেখেই তার মুখ থেকে ম্লান স্বর বেরিয়ে এল, হাই! খুব ছোট্ট সেই শব্দ আমার কাছে পেঁছাল কেবল অবস্থানগত ঘনিষ্ঠতার জন্যেই। আমি সেই শব্দটুকু থেকে তার অনুভূতি

বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ওর কাছেই আমি এসেছি, ওকে বোঝানো আমার বিশেষ প্রয়োজন। এতটা দূর থেকে সারাদিন পথ শ্রমে ক্লান্ত হয়ে যে এসেছি সে তো ওরই ওপর নির্ভর ক'রে। গতকাল এই রকম সময়ে সেই যে দুটো ভাত গেছে পেটে তারপর থেকে আর কিছু নয়। সেইটুকু ভাত তো কাল রাতে ঘুমের মধ্যেই হজম হয়ে গেছে, আজ সারাদিনের উপবাস এখন কেবল সৃষ্টি ক'রছে যন্ত্রণা। এ অবস্থায় ডিঙ্গি ছাড়া গতি নেই। ও যদি আমার প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ ক'রে তাহ'লেই গেছি। কিন্তু কি জন্যে বা আমার এই আসা? এখন যেন নিজেই তা বুঝতে পারছি না। সবচেয়ে বিপদ হবে যদি এখানে আশ্রয় না পাই। এখন একটু ভয়ও পেলাম, সেদিন এখান থেকে যখন চলে যাই মিথ্যে বলেছিলাম অচেনা কোন এক গাঙতেইকে ডেকে দেব। আজ যদি সে প্রসঙ্গ ওঠে। যদি ডিঙ্গির মনে থাকে যে আমি তাকে ডেকে দিই নি। ওর ছেলেটি বা কেমন আছে? একই সঙ্গে বহু শংকা এবং বহু প্রশ্ন উঁকি দিল মনের সামনে। হঠাৎ প্রশ্ন ক'রল, ও কই? অর্থাৎ জারোমথাঙ্গি।

ও নেই আমি চলে এসেছি—জানালাম।

এস।—বলেই ডিঙ্গি গিয়ে আগুনের ধারে বসল। ওর পেছন পেছন ঢুকেই ঘরের মধ্যে মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ। ডিঙ্গি আগুনের সামনে বসেই আবার কি যেন পোড়াতে লাগল। আমি ওর পাশটিতে বসলাম। ও একটু বাদেই আমার হাতে একটা ঝলসানো মাংস তুলে দিল। আমি নিতে গিয়েও হাত গুটিয়ে নিলাম মমতায়। আহা বাচ্চাগুলো কত আশা করে আছে তাদের ভাগে আমি দাঁত বসাই কেন। আমি বললাম, ছেলেদের দাও। আমাকে বরং ভাত থাকলে একটু দিতে পার। মাংস আমার চাই না।

খাও না, ডিঙ্গি বলল, আমার এক প্রতিবেশী শুয়োর কেটেছে। আমাকেও দিয়েছে।

দিক। তোমরা খাও।

অগত্যা ডিঙ্গি কিছুটা ভাত দিয়েই খুঁত খুঁত করতে লাগল মাংস না খাবার জন্যে। আবার সেই ভাত আর লবণ—যার নাম অমৃত। কিন্তু সেই ছেলেটিকে দেখছি না কেন? সেই অসুস্থ ছেলেটি? ভাতটুকু খেতে সামান্যই সময় লাগল। আমিই শেষ ক'রে উঠে গরম জলের পাত্র থেকে সামান্য একটু ঢেলে হাত ধুয়ে নিলাম। ছেলেমেয়েরা খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র যে যার শুয়ে পড়ল ঘরেরই একপাশে। কিছু আবর্জনা ছিল মেঝেতে ফেলতেই একটা ফাঁক দিয়ে নিচে চলে গেল। অমনি নিচে একরকম ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ মনে পড়ল ডিঙ্গিরও একটা শুয়োর আছে ঘরের নিচে খাঁচায়। এ নিশ্চয় তারই খাবার পাবার আনন্দ। ও বেচারীর একটাই শুধু চাহিদা—। খাবার ছাড়া আর কিছু নয়, শয্যা পর্যন্ত নয়। তাও

খাবার বলতেও ওকে দেওয়া হয় যত আবর্জনা ; পরিত্যাজ্য, উপভুক্ত, এমন কি শরীরের যত গ্লানি যা সকলে মোচন করে। ঘেরাটোপের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে ও আপন খাদ্য সংগ্রহও করে নিতে পারে নিজে, কিন্তু আর ফিরে আসবে না বুঝেই তো সে মুক্তি দেওয়া হয় না, কারণ ওকে প্রয়োজন। ওর চাহিদা সামান্যমাত্র হতে পারে ওর কাছে চাহিদা যে কম হবার কোন কারণ নেই। ও যে ভাবেই দেহ ধারণ করুক কেন ওর দেহকে নিংড়ে নেবার জন্যে আটকে রাখা ওকে হবেই। ভয়ানক শোষণের হাত থেকে কে ওকে মুক্ত ক'রবে পৃথিবীকে শোষণ করবার জন্যে যে প্রাণীর জন্ম সেই প্রাণী কি তার শক্তিতে দুর্বল এই শূকরকে ছেড়ে দেবে!

শোষণে আর ধ্বংসে অনেক পার্থক্য। শূকরকে আজ সম্পূর্ণ ভাবেই শোষণ কবি। শুধু শূকর কেন যে কোন শক্তি সম্পন্ন প্রাণীকেই তো শোষণ করে মানুষ। গরু, মোষ, ঘোড়া, গাধা, কা'কে শোষণ করা হয় না? হাতি যে বিশাল বণ্য প্রাণী, মানুষের সঙ্গে যার সংযোগ মাত্র নেই তাকেও কি অসহায় ভাবে নিপীড়ণ আর শোষণ করা হয়।

ডিঙ্গি হাতেব কাজ শেষ ক'রেই আগুনটা নিভিয়ে দিল। তারপর জানতে চাইল, এখন কি ক'রবে, শোবে না এমনি কবেই বসে থাকবে?

আসলে আমি যা ভাবছিলাম সে কথাটা ডিঙ্গির জানবার বা বোঝবার কথা নয়। অন্যান্য প্রাণীকুলের মতই ভাবনা বস্তুটা ডিঙ্গিদের বন্য জীবনে অনুপস্থিত। অনুভাবনা বলে কোন অবস্থা তো এদের জানাই নেই। তাৎক্ষণিক আবেগে এদের যা কিছু ক্রিয়া কর্ম। আগুন নিভে যেতেই অন্ধকার সম্পূর্ণ হ'ল। অথচ এখন সদ্য সন্ধ্যা। আমি এই আকস্মিক অন্ধকারে কি ক'রব স্থির ক'রতে পারলাম না। মনে হ'ল এই দীর্ঘপথ আর অনিশ্চয়তা বয়ে কেনই বা এখানে এলাম, কি দরকার ছিল? ডিঙ্গি খেতে দিল ঠিকই কিন্তু সে যেন অনেকটা দায়ে পড়েই দিল। আমার প্রতি যে আন্তরিকতা [illegible]রোমথাঙ্গির তার সামান্য এক ভগ্নাংশও ডিঙ্গির ব্যবহারে নেই। নিস্পৃহ নিরাসক্ত স্বরে ও কথা বলছে। এইজন্যে এখানে আসবার কি যে প্রযোজন ছিল সে প্রশ্ন নিজেকেই যেন ক'রতে চাইছি এখন। তাছাড়া ওর যে ছেলেটিকে অসুস্থ দেখেছিলাম এসেই তার খোঁজ না নেওয়াতে এখন তাকে না দেখেও আর বলতে পারছি না কিছু, অথচ অস্বস্তিও পীড়ন ক'রছে মনকে। কি যে করি স্থির ক'রতে পারছি না, তাছাড়া সামান্য এই ঘরটুকুতে যা জায়গা আছে ডিঙ্গি শোবার পর তার পাশেই শোয়া ছাড়া গতি থাকবে না। আমার অবশ্যই কোন স্পর্শকাতরতা নেই, তাছাড়া মনের মধ্যে খুঁজলে তো স্পষ্ট হবে ডিঙ্গিকে উদ্দেশ্য করেই আমার আসা। পরে কি ঘটবে জানি না এখন তো আমি আশাপূরণের মুখোমুখি।

কেন যে আমি এই রকম চিন্তার মধ্যে পড়লাম কে জানে? ডিঙ্গির ব্যবহারের

প্রেক্ষিতে ওর মানসিকতা বিশ্লেষণেরই বা আমার কি প্রয়োজন ? এ তো আগে কখনও হয় নি। আমিও তো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে চলাফেরা করে আসছি বরাবর, তবে কেন হঠাৎ এ ব্যতিক্রম। বিস্ময়কর এই অঘটনে নিজেই অবাক হলাম। এটা বিশেষ সুলক্ষণও নয়। দায়হীন চলার মধ্যে যে তৃপ্তি চিন্তাশীল চলায় তার বদলে প্রতিমুহূর্তের অশান্তি পীড়ন ক'রতে থাকে। সুখের ভাগে টান পড়ে যায়। হঠাৎ এমন হ'লই বা কেন ? ডিঙ্গির সঙ্গে আমার কোন মানসিক সম্পর্কের লেশমাত্র নেই, কিছুক্ষণ পরে কি ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠবে তা জানি না তবে কি ওর দেহের জন্যে আমার কোন দুর্বলতা জন্মে যাচ্ছে ? ওর দেহ আমার প্রয়োজন ঠিকই—তবে সেই জন্যেই মনও আমার প্রয়োজন। কিন্তু যতদূর আমি এসেছি এর পর আর আমার যাওয়া চলে না। এখানের অন্ধকারে আছে নিরাপদ আশ্রয় বাইরের অন্ধকার শ্বাপদসঙ্কুল। কাজেই এ রাতের কোন ঘটনাতে যদি আমাকে বাইরে চলে যেতে হয় তো অসুবিধেই হবে। তাই বা কেন ? নিজের মনকেই প্রশ্ন ক'রলাম। বহুরাত্রি তো আমি অরণ্যেই বাস করে এসেছি কোন গাছের ডালকে বা সামান্য পাথরকে আশ্রয় করে। আজ কেন ভয় পাচ্ছি ? বিচার করে দেখলাম এটা ভয় ঠিক নয়, আমি ডিঙ্গির সঙ্গ ছাড়তে অরাজী। ওর প্রতি আমার আকর্ষণ অচ্ছেদ্য। আসলে আমার যেটা ভয় সেটা ডিঙ্গিকে হারানোর। তাই সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে সেখানেই শুয়ে পড়লাম ডিঙ্গির দূরত্ব বাঁচিয়ে। বললাম, ডিঙ্গি, আমি শুলাম।

সে উত্তর দিল না। বুঝলাম আমার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছে। ওর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে ভালই করেছি। ও যে ভদ্রতা ক'রে আশ্রয়টুকু দিয়েছে ভুল করলে সেটা চলে যেত। আর কিছু না হোক ডিঙ্গির সঙ্গে থাকতে পারাটাও আমার সুখ। সুখ ব্যাপারটা পুরোপুরি মনের। কাজেই ঘুরে ফিরে সেই মনের প্রসঙ্গই এসে পড়ছে। কেন যে আসছে আমি কিছুতেই বুঝছি না। জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় তো মন হীন কেটে গেল, এখন হঠাৎ কেন যে মন ব্যাপারটা এসে ঢুকে পড়ছে কে জানে ? জীবন যাপনের জন্যে মন জিনিষটা নেহাৎই অপ্রয়োজনীয়, ভাল কিছু সে করেই না বরং কিছু উটকো বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে, মনহীন জীবন অনেক সহজ এবং সাবলীল। তা বলে ওকে এখন জীবন থেকে ছাড়াই বা কি ক'রে ? কেমন করে ওর ঢুকে পড়াকে আটকে রাখি জীবনটার বাইরে ? নাঃ। কালই তাহ'লে পালাতে হয় এখান থেকে, কিসের কি ? দূর আর ভাবতে ভাল লাগছে না। বাঁ দিকে পাশ ফিরতেই ডান হাতখানা নরম মাংসের ওপর পড়ল। আরে! এমন নরম দেহ কার ? ডিঙ্গি! এত কাছে! ঘুমের মধ্যেই ঘটে গেছে ভাব করে হাতটিকে অসাড় করে রাখলাম ওর প্রতিক্রিয়ার জন্যে। বোঝা প্রয়োজন। এর চেয়ে বেশী দূরত্ব রাখা ওর পক্ষে সচ্ছন্দেই সম্ভব ছিল, তবে কি ডিঙ্গিও

আমার দিকে মানসিক ভাবে এগিয়েছে? আমি কি আশপূরণের আরও কাছে? নাঃ আমার হাতখানাকে কই ছিটকে তো ফেলে দিল না কেউ? কিন্তু আমার হাত যে ওর শরীরের কোন অংশে তাও তো বুঝছি না। এত শীঘ্র কি ঘুমিয়ে পড়েছে ডিঙ্গি? সে বরং আমারই কথা, সারাদিন পথ চলার ক্লান্তি আমার শরীরে, পুরো একটা দিন রাতের অনাহারের পর ভরপেট আহার—ঘুম আসবার কথা আমারই। অভ্যাস যেহেতু প্রাণীজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে হতেও পারে ডিঙ্গি ঘুমন্ত। আমি মানসিক চঞ্চলতা দমন ক'রে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রলাম। আমার হাত সরে আসতেই ওর একটি হাত এসে আমাতে আশ্রয় নিল। আমার যেটি আকস্মিকতা ছিল ওর তা পরিকল্পিত বোধ হওয়াতে আমি ওর হাতখানি ধরলাম। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এর বেশী আর দরকার ছিল না। আমি জেগে আছি বুঝেই ও আমার হাত ধরে আকর্ষণ ক'রল। আমি সরে গিয়ে বুঝলাম ওরা যেখানে শুয়ে আছে সে দিকের পাটাতন অনেকটা মসৃণ। এতক্ষণ আমি উঁচুনিচু জায়গায় শুয়েছিলাম। কিছুটা আরাম বোধ হ'ল। অচিরে অনুভব ক'রলাম ডিঙ্গির শরীরের কোমল স্পর্শ আমার শরীরে। আমি ওর নাম ধরে ডাকতেই ওর একটা হাত আমার মুখ চাপা দিল। আমার মনের যে আকুতি ছিল তার প্রকাশ শব্দে বলে সবই রুদ্ধ হয়ে রইল। শব্দের শক্তিকে অতিক্রম ক'রে স্পর্শ বাঙময় হ'ল। অনুভব ক'রলাম ওর শরীরে অনেক আগ্রহ সঞ্চিত হয়ে আছে। শব্দের অপ্রয়োজনীয় প্রকাশের চেয়ে তা অনেক বেশী ব্যাকুল। তবে সেই ব্যাকুলতার মধ্যে উচ্ছ্বাস সামান্য, জারোমথাঙ্গির মত্ত যৌবনের প্রথম আত্মপ্রকাশে অস্থির উন্দামতা যা স্বাভাবিক, তার একান্ত অনুপস্থিতি ডিঙ্গির বহুঅভিজ্ঞতার পরিপক্কতায়। এর শান্ত ব্যাকুলতা গভীর সমুদ্রের বানের মতো। ধীর সুস্থির তবে বেগবান।

উত্তীর্ণ সন্ধ্যার সেই মধুর অন্ধকার আমার সমুদ্রের গভীরে কেটে গেল। সাগর তলের অন্ধকারে আশ্চর্যজনক এক নীল আলো জ্বলে। সে আলোয় অন্ধকার কাটে না অথচ তার বিস্ময়কর দ্যুতি। সাগর জলের তলের দোলা সে বড় আরামে দোলায়, শরীরে ঝাঁকানি লাগে না ঘুম ঘুম অনুভূতি আচ্ছন্ন ক'রে রাখে আধো জাগরিত চেতনাকে। চেতনা অচেতনতার মধ্যে দুলতে দুলতে যখন ভেসে উঠলাম আমার দুহাত ভরা মুক্তো।

বোধহয় সে কোন বন মোরগই হবে যার ক্রমাগত ডাকাডাকিতেই কোথাও সূর্য উঠল। আমিও জেগে উঠলাম। চোখ মেলতেই আলো। অজস্র আলো জীবনের স্পন্দন নিয়ে আকাশময় ছড়িয়ে আছে, ছিটিয়ে আছে গাছে, পাহাড়ে, মাটিতে। রাতের সেই জ্যোতির্ময় অন্ধকার যে কোন পথে কখনইবা উধাও হ'ল ভাবনায় তার দিশা পেলাম না। বিছানা নয় কাঠের শক্ত পাটাতন এর ওপর শয্যাহীন শয়ন কিন্তু

সেখান থেকেই উঠতে ইচ্ছে করছিল না। পাশে না কাল অন্ধকারে কার একটি তৃপ্তিময় অস্তিত্ব ছিল। না কি সে নিছক স্বপ্ন? কেউ তো পাশে নেই। কারও অবস্থানের চিহ্নমাত্র নয়। সামান্য দূরত্বে শুয়ে আছে কয়েকটি শিশু। ঘুমন্ত মানবক-এর সারি। ওদের আর আমার মধ্যে কিছুটা ফাঁক। রাতে তাহ'লে এটুকুই ভরাট ছিল একটি পীবরা দেহবল্লরীর মায়াময় অবস্থিতিতে। চেতনার পুরোপুরি ফিরে আসার সঙ্গে স্মৃতিতে এল সুধাময় সম্ভোগের স্বাদ। দেহ তো দেহ মাত্রই। তার মোহনরূপ কখনও কখনও সম্ভব, বাহ্যিক সেই রূপের সঙ্গে দেহধারীর আন্তরিক প্রকৃতির মিল থাকে না অনেক সময়েই, খুব কম সময়ে থাকে। থাকলেও সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা থাকবে এমন আশা কষ্টকল্পনার বিষয় মাত্র। বিশেষ ক'রে এমন এক বন্য রমনীর এমন কলারসিকতা সচরাচর দুর্লভ তো বটেই সুদুর্লভ। আমার মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন হঠাৎ লাফ দিয়ে পড়ল সত্যিই কোন বদরসিক কোন দিন ওর সঙ্গী হয়ে বাস ক'রেছিল কিনা অথবা ওরই ইচ্ছার ফসল এই সন্তানগুলো? এমন বরাঙ্গনার উপযুক্ত সঙ্গী মেলা ভার। হয়ত এমনটিও হতে পারে যে ওর আসঙ্গ আসক্তি কখনই বন্দী ক'রতে চায়নি নিজেকে। কেউ তাই আজীবন সহবাসের বিশ্বাসে আবন্ধ হয় নি ওর সঙ্গে। প্রকৃতির যা নিয়ম বনের যা রীতি ওর লিপ্সাতেও সেই সহজ গতিময়তার সচ্ছন্দ অনিয়ম—হতে পারে তো এমনটিও? এর মধ্যে হয়ত কোন রসেবশে সমর্থ পুরুষ ক'রে থাকবে ওর মনোরঞ্জন ভোগ ক'রেছে সেই ওকে চরমে, ওরও ভোগে লেগেছে তার সমস্ত ক্ষমতা; কিন্তু তার কথাই ভাবছি সে এমন কোন রসিকাকে পেল যায় আকর্ষণ অধিকতর হ'তে পারে। আমার এই প্রায়মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘকাল কেটে গেল অসংখ্য জনপদে অরণ্যে, দেখাটা আমারও তো তার চেয়ে বিশেষ কম নেই। কম মায়াময় কায়া তো দেখি নি আমি, অথচ আমি তো অনায়াসে এর দাসত্বে আত্মদান ক'রতে পারি। মায়ালোক যাকে বলে, যেখানে জানতাম পুরুষেরা প্রমীলাদের মেষ হয় এও তো সেই মহারাজত্বের অংশ। তবে কোন মহামন্ত্রে ছিঁড়ে যায় মায়ামন্ত্রের যাদু? আমিও তো দীর্ঘকাল এই মায়ালোকেই ঘুরছি, এখনও তো আছি সেই দ্বিপদই। ভাবগত অর্থে ভেড়া? তাও তো কই হই নি।

তবে দুঃখটা কিসের ডিঙ্গির ভেড়া হলে—? কি বা তফাৎ? আসলে অহং বোধে আটকায়। প্রশ্ন তো অহংকারের। জীবনে তার কতটুকু মূল্য? আমার যে সমাজে উদ্ভব সেখানে সব মানুষই অহমিকার মুখোশ পরে থাকে। ঘুমের সময়টুকু কেবল সেই মুখোশটা খুলে রাখে, ঘুম ভাঙ্গামাত্রই পরে নেয়। চোখে যাদের দারুণ কমদেখা তারা যেমন চোখ মেললেই চশমা না লাগালে বৃথা হয়ে থাকে চোখ আমাদের সমাজের জীবগুলোও তেমনি, মুখোশ আঁটা না থাকলে ভয় পেয়ে যায় এই বুঝি তার প্রাকৃতিক রূপ প্রকাশ পেয়ে যায়, দেখে ফেলে অন্যে। তাতে ক্ষতি

কি ? এতদিনে সহপাঠীরা সবাই, অলকনন্দাও নিশ্চয়ই চিকিৎসক হয়েছে। কেউ নামী কেউ বা দামী, কেউ খুব ভাল কেউ সাধারণ কিন্তু আমার ওসব না হওয়াতেই ব্যক্তিগত লোকসানটা বা কি হয়েছে ? আমিও তো ঠিক বেঁচেই আছি। আপন মনের আনন্দে আছি। বরং অকৃত্রিম আনন্দের ছন্দের মধ্যে আছি বলতে পারি। অহংকার ক'রলে আমারও করবার আছে—আমার ডিঙ্গি আছে। সভ্যতার মধ্যে মুখোশ আঁটা সমাজে এমন আরণ্য সজীবতা আর স্বচ্ছন্দ বিলাস কেউ কি পাবে ? সেখানে জমানো অথবা মাস মাইনের টাকার মত জীবনটাকে প্রতি মুহূর্তে হিসেব করে খরচ করা—। কৃপণের মত নয়, অক্ষমের অক্ষমতায় দীনের দৈন্যে। প্রেম—তাও পরিমিত প্রকাশে দীন। যেন ওষুধ খাবার গ্লাসের মাপে তার ব্যবহার। প্রীতি—উপহারের অর্থমূল্যে তার যাচাই। সোনা কেনার সাবধানতায় পরিচয় পেতে হয় তার। আবেগশূন্য হিসাব নির্ভর সম্পর্কের জন্যে সম্পর্কটাও বাঁধা থাকে অনেকটাই অভিনয়ের ওপরে। তাই সব সময় ভয় থাকে অভিনয়ে কোথাও তাল কেটে গেলেই কেটে যাবে গড়ে তোলা সম্পর্কের বনিয়াদ। এখানে সে ভয়ের ভাবনা একেবারেই অনুপস্থিত তার স্বাভাবিকতার জন্যে। প্রেম আসে তার সহজ সত্যের প্রয়োজনের পথ ধরে। আমাদের সভ্যতায় আসল কথাটা অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফন্দীফিকির ক'রে বলতে হয়, বেআব্রুযানা ভাল করে দেখবার জন্যে পোষাক পরবার কায়দার মত করে। এখানে তার পূর্ণ বিপরীত। তোমাকে আমার চাই—মানে চাই আমার সমস্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। বিলাসের জন্যে নয়, ভোগ সম্ভোগ এবং তৃপ্তির জন্যে। বিনিময়ে কোন দেনমোহর বা স্ত্রীধনের ব্যবস্থা নেই, বিনিময়ে তোমারও লাভ একই, তৃপ্তি ; নিবৃত্তি।

পাহাড়ের জীবন সত্যের মূলেই এই সরলতা। এর প্রকাশ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল কাজের বেলাতেই। এ শুধু ডিঙ্গি নয় এই বিশাল পার্বত্য এলাকায় হাজার হাজার মাইল জুড়ে কখনও অবিচ্ছিন্ন বা কখন বিচ্ছিন্ন যে বিপুল জনপদ—ব্যবহারিক বিচারে সকলেই এক অবিভাজ্য চরিত্রের অধিকারী। নেপালী, ভুটিয়া, গাড়োয়ালী, লেপচা, আলং, মিরি, মিকির, ডফলা, আবর, আর কাদের কথা বা বলা যায় সব যেন একই সরলতার সুতোয় গাঁথা। জীবন চর্চায় প্রচণ্ড পার্থক্য, সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ত পরস্পরের আচার আচরণ কিন্তু সকলেই সরল—মোটামুটি সত্যনিষ্ঠ জীবনযাত্রার পথিক।

কেউ একজন এই সূর্য-জাগরণের ভোরেই বন্দুক ছুঁড়ল, ঘরে শুয়ে শুনতে পেলাম শব্দ। এই দু চার ঘরেই কারও বন্দুক আছে তাহলে, বোধহয় বনমোরগের আলোরমন্দ্র লক্ষ্য ক'রেই ছুটিয়ে থাকবে বারুদ। নিশ্চয়ই তাকে ডেকে জাগানোর অপরাধে শাস্তি দেবার জন্যে নয়, ঘুমভাঙ্গা বিরক্তিতেও নয়, লোভে। রসনার লোভে, মাংসের বাসনায়। আমার চোখের সামনে বনমোরগ বেশ কয়েকবারই

এসেছে বহু জায়গায়, বহু মোরগ। তাদের কারও শরীর এমন বিশাল নয় যা প্রচুর মাংসে তৃপ্ত হতে পারে উদর। একজন মানুষের একটি বার ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষেও অপ্রতুল মাংসের জন্যে অকারণ এমন একটি সুদর্শন প্রাণীকে হত্যা ক'রে বনের সৌন্দর্য ব্যাহত ক'রে যে কি চরিতার্থতা হয় কে জানে। জানে না সে নিজেও। আসলে এ এক বিলাস; কিছুটা হত্যার, কিছুটা মুখের। জিঘাংসা মানুষ নামক প্রাণীর মনের এক প্রকার আবেব, হত্যায় সে তৃপ্তি পায়, আনন্দ পায় ধর্ষণে। মানুষের মত অহেতুক জিঘাংসা আর কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। হিংস্র প্রাণীদের জিঘাংসা ক্ষুধার বৃত্তকে কেন্দ্র ক'রে অথবা আত্মরক্ষার আগ্রহে, মানুষের হত্যা শুধু হত্যার জন্যেই, অপরের বিনাশে আত্মসুখ বলে।

অনেক সময় শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে। মিলিয়ে যাবার আগে আত্ম প্রচারের শেষ চেষ্টা একবার করে মাত্র। এবার তা জাগল না! বোধহয় শিশির ভেজা পাতায় ঘাসে লেপটে গেল গুলির শব্দটা, আটকে গেল। মোরগের স্বপ্ন ভাঙ্গানো স্বরও স্তব্ধ। শব্দের অভিঘাতেও হতে পারে, আবার হতে পারে বারুদের আঘাতে। দ্বিতীয়টার দুর্ভাবনাতেই দুঃখ আমার; যদি তা না হয়ে থাকে, যদি শব্দের তীব্রতায় ভয় পেয়ে সে উড়ে গিয়ে থাকে কোথাও তাহ'লেই ভাল। নিঃশব্দ হয়ে যেতে আমি উঠে পড়লাম। বাইরে আসতেই দেখি ডিঙ্গি সামনের খাদ থেকে উঠে আসছে কি সব গাছপালা বয়ে নিয়ে। অনেকটা নিচে বলে মাথা নিচু ক'রে উঠছে। আমি ওকে দেখেছি বলেই অপেক্ষা করলাম যতক্ষণ না উঠে আসে। সামনে এসে দাঁড়িয়েই ও বলল, দেখ তোমার জন্যে কি আনলাম।

কতগুলো ছোট গাছের ডালসমেত পাতা। আমি দেখলাম, তবে কি যে ও আমার জন্যে এনেছে বুঝলাম না। আমি পাতা থেকে চোখ তুলে ওর চোখের ওপর রাখতেই বলল, হুইসিং। খেতে খুব ভাল। আজ খেয়ে দেখো। অনেক দিন খাইনি।

ভাল যদি তো খাও নি কেন? জানতে চাইলাম।

ওই নিচে থেকে আনতে হয় বলে আর আনি না। বলে ও নিচের দিকে খাদের গভীর বন দেখালো। পরক্ষণে একটু হেসে বলল, এতদিন দরকারও তো ছিলনা।

লক্ষ্য ক'রলাম শেষ কথাটি বলার সময় ওর চোখ কেমন লজ্জাচঞ্চল হয়ে উঠল। আমি ওর একথায় বা লজ্জা পাবার কারণ বুঝলাম না। জানতে চাইলে বলল, একা একা খেয়ে লাভ নেই। সঙ্গী থাকলে খেতে হয়।

আরও জটিল হয়ে উঠল ওর কথার রহস্য। বুঝলাম না কিন্তু নতুন পরিচয় পেলাম ডিঙ্গির, রমনী রসিকা। কথা না বাড়িয়ে ও ঘরের দিকে চলে গেল। আমি মুগ্ধ হয়ে কয়েক নিমেষ দাঁড়িয়ে রইলাম। পার্বত্য দেশগুলোর মধ্যে আমি

এমন হংসগামিনী আর দ্বিতীয়টি দেখি নি। বিস্ময় আমাকে ভাবিত ক'রল, যে প্রকৃতি অন্য সকলের স্রষ্টা সেই প্রকৃতি তো এরও! তবে এ এমন বিশেষত্বে সমুজ্জ্বল কেন? ডিঙ্গিকে গড়ে তোলবার জন্যে স্রষ্টার যত্নের আর শেষ ছিল না অথবা সবই হয়ত আকস্মিক—প্রাকৃতিক কারণে সব কিছু সৃষ্টি হয় ঠিকই, এর জন্যে কারও কোন হাত নেই। কারও সুন্দর হওয়া বা কারও সৌন্দর্যহীনতা সবই সমান আকস্মিক ঘটনা। এর মধ্যে কোন তাৎপর্যও নেই, কোন হস্তক্ষেপও নেহাৎই কষ্ট কল্পনা। কিছু কিছু কল্পনা সাময়িক সুখ সঞ্চার করে সেগুলোকে আমরা যথাসাধ্য লালিত ক'রে বিশ্বাসে পরিণত ক'রে ফেলি। সৃষ্টি সম্পর্কিত যে কোন বিশ্বাসও অমনি মনোরম কল্পনা মাত্র যা অনেককাল ধরে আমাদের উত্তরাধিকার বয়ে রক্তের মধ্যে মিশে থাকছে।

ডিঙ্গি ঘরে ঢুকতেই ওর ছানাপোনাগুলো কলকল ক'রতে ক'রতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সকাল বেলার আলোয় কিংবা বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে শিশু-গুলোকে দেখে আমার মনে হ'ল যেন একরাশ ফুল কোন বন থেকে উঠে এল। বহুদিন বাদে হারিয়ে যাওয়া একটি গানের কলি এল মনে, এরাই বোধহয় সেই আলোকের শিশু যারা আলোকতীর্থে যাবার আহ্বান নিয়ে ছুটে এসেছিল কবির কল্পলোকের সামনে। দূরতম কোন জগতে উঠেছে সূর্য, তার আলোকচ্ছটা পাহাড় বন পেরিয়ে এসে ওদের মুখে লেগে যেন থমকে গেছে! প্রক্ষিপ্ত আলোর প্রলিপ্ত উদ্ভাসে ওদের মোহন রূপ হয়ে উঠেছে উজ্জ্বলতর। পাহাড়ের অজস্র ফাঁকে গাছে গাছে লতাগুল্মে ফুল যেমন, সবুজ সবুজ পাতা যেমন, এই শিশুরাও তেমনই। সবই যেন এক উৎস মুখ থেকে অনর্গল উৎসারিত। সব চেয়ে যেটি ছোট ঘরের বাইরে পা দিয়েই সে ধুলোর মধ্যে বসে পড়ল গতকালের অসমাপ্ত খেলা শেষ করবার প্রচেষ্টায়। নিমেষে তার হাত ভরে উঠল ধুলোতে, পা দুখানাও ধূসর হয়ে গেল। দেখা দেখি তার ওপরেরটিও ছোটভাই এর সঙ্গে যোগ দিয়ে বসল। এই দুজনের ওপরে যে সেটিই সেদিন ছিল অসুস্থ, ডিঙ্গির মনের অবস্থা দেখে তো কোন দুর্ঘটনাও অনুমিত হচ্ছে না! অথচ শিশুটির দেখা নেই ব্যাপারটা যে এক রহস্য হয়ে থাকছে। কাল রাত্রির পর ছেলেটির কথা জানতে চাওয়াও আর সম্ভব নয়। যাক কোনদিন নিশ্চয়ই জানা যাবে। এখন ওই অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলে রাখাই ভাল।

আমি ঝরনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অনেকটা খাড়াই নেমে বাঁ দিক ঘুরে কিছুটা চড়াই ভাঙতে হবে বলে শুনেছি। ডিঙ্গির বড় মেয়েটি দেখলাম একটা জলের পাত্র মাথায় করে চলেছে। ওইটুকু মেয়ে যখন যাচ্ছে তখন কতই আর দূর হবে? কিছুটা নেমেই ধরে ফেললাম মেয়েটিকে। বছর দশেকের শিশু ভরা পাত্র বয়ে আনা কি ওর পক্ষে কষ্টকর নয়? তবু আনতে হয়, উপায় কি? অনেক সময়

জলাভাবেই বসতি সরে যায়। ঝর্ণাধারা পথ বদলালে বা শুকিয়ে গেলে পাহাড়ে অরণ্যে গড়ে তোলা কুটির ভেঙ্গে অন্যত্র কোন জলের উৎসের কাছে গিয়ে নতুন ক'রে গড়ে নিতে হয় বসত। আমাকে সঙ্গী পেয়ে মেয়েটি যে বিশেষ খুশি হ'ল এমন বোঝা গেল না বরং লজ্জায় কিছুটা গুটিয়ে গেল। সে কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ক'রছে মনে হ'ল। তা হোক। লাজুক প্রকৃতির মেয়ে আর শিশুও তো বটে তাই লজ্জার সঙ্গে ভয়ও তো মিশে আছে কিছুটা। ওর অহেতুক ভয় কাটিয়ে আপন করবার ইচ্ছায় ওর মাথায় হাত রাখতে ও যেন ছিটকে গেল। আমি কারণ বোঝবার চেষ্টা করে ইসারা ক'বে ওর জলাধারটি চাইলাম এই জন্যে যে জলটা আমিই ওর হয়ে বয়ে দিলে কষ্ট থেকে বেচারী রেহাই পাবে। আমার প্রস্তাব মেয়েটি গ্রাহ্যই ক'রল না। আমাকে এড়িয়ে আগে নেমে যাবার চেষ্টা করল। পাহাড়ী ঢালে স্বচ্ছন্দ গতিতে ওর নেমে চলার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার পক্ষে যে সম্ভব হবে না ওর শিশুবুদ্ধিও সেটা বুঝতে পেরেছিল। আমি আলাপ জমাবার ইচ্ছায় ইস্তফা দিলাম। ওব মাব সঙ্গে সহবাসের সূত্রে আমার সঙ্গে ওর যে বিপিতার সম্পর্ক এটা না বুঝলেই ভাল তবে সহবাসী হিসেবে আমাকে একদিন চিনবেই। আমার স্নেহ ততদিন না হয জমাই থাক। আমি ওকে পথেই ত্যাগ ক'রলাম।

ডানদিকেই পাহাড় কেটে সামান্য একফালি জমি ক'রে কে যেন ভুট্টা লাগিয়েছে; ফসলে দানা এসেছে। ছোট্ট ফালিটুকুতে কত ভুট্টাই বা হবে? আমার মনে হ'ল আমিও অমনই একফালি জমি তৈরী ক'রে ক্ষেত ক'রব। ধান ভুট্টা সবই লাগাব। ডিঙ্গির জন্যে কি না করা সম্ভব? আহা বেচারী যদি সুখী হয়—। বড় দুঃখ ওর। অথচ আপন কথা ডিঙ্গি কখনই বলে নি, সেদিনও বা গতরাত্রির নিবিড় সুখের সময়েও নয়। তবে আমি ওকে দুঃখী ভাবছি কেন? ওর তো দুঃখ না-ও থাকতে পারে? ওর পুরুষ ওকে পরিত্যাগ ক'রেছে বলে? কে জানে যদি ডিঙ্গিই ত্যাগ ক'রে থাকে ওর পুরুষটিকে? জারোমথাঙ্গি তো নিশ্চয় ওর কাছে শুনেই বলেছে? যদি মিথ্যে বলে থাকে ডিঙ্গি জারোমথাঙ্গিকে? আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে অসত্য তো বলতেও পারে? বিপরীতমুখী ভাবনার মধ্যে পড়ে নাকানিচোবানি খাওয়া আমার চিরদিনের মানসিক দুর্দশা, আবার তাতেই পড়লাম। অনর্থক এই ভাবনার ঝামেলায় পড়বার কোনই অর্থ হয় না কারণ ডিঙ্গির সুখ বা দুঃখ কোনটাই আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়, আমার দরকার ডিঙ্গিকে কাজেই নির্হেতু দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে নিজেকে তাতে জড়িয়ে ফেলে ডুবোজল খেয়ে কি লাভ?

মনের বলগা টেনে ধরে ভাবনার অশ্বের গতিরোধের চেষ্টা করলাম নিজেকেই যেন ধমকে দিয়ে। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু কোন দিকে এসেছি আমি? ভাবনার ঘোরে কোথায় চলেছি? কিছুটা নিচে আর একটি জুম

চাষের জমি তার কাজেই একটি কুটির। কে বা থাকে ওখানে কে জানে। এখান থেকে ডিঙ্গির বাসস্থান বিশেষ দূরে নয়, ডিঙ্গির কাছাকাছি আরও ক'টি ছোট ছোট ঘর তো আছে কিন্তু সামনের বিশাল গিরিখাদ পেরিয়ে ঘন বনের ওপারে সবুজ পাহাড়টার গায়ে ছোট্ট একটা টিপের মতো একটি মাত্র ঘর দেখে অবাক হলাম ওই নিঝুম নির্জন নিঃসঙ্গতায় কোন মানুষ বাস করে কি করে? তাকে তো লবণের জন্যে হলেও বাইরে আসতে হয়, কত চড়াই ভাঙ্গতে হয় তাহ'লে ওকে তখন? ওদিকে কোন পথ দিয়েই বা বাইরে আসে? কোন বসতিতে যায় লবণ সংগ্রহ ক'রতে? হঠাৎ মনে হ'ল যাই ওখানটায়। কিন্তু একমাত্র ডানা থাকলেই সম্ভব। সামনে নিচের গভীরে যে অরণ্য তা ভেদ ক'রে হে'টে যাওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাছাড়া যেভাবে বাস করে ওরা তাতে বাইরের কেউ পে'ছালে অভ্যর্থনা অতিথির বিশেষ অনুকূল হবে এমন অনুমান নিবুদ্ধিতা। আর আমারই বা কি কাজ ওখানে? অযথা যাব কেন?

কোথাও না গিয়ে যখন ফিরে এলাম সূর্য তখন শিরে, প্রায় শীর্ষ বিন্দুতে। আমাকে দেখে নিরুদ্বিগ্ন স্বরে ডিঙ্গি প্রশ্ন ক'রল, কোথায় ছিলে? সেই সকালে উঠেই যে গেলে; কোথায় গেলে?

কোথাও যে যাই নি সেটা ডিঙ্গিকে বোঝানো অসম্ভব বুঝে বললাম, ওপাশের পাহাড়ে ঘুরে এলাম।

ওদিকটা তো গভীর জঙ্গল। শুধু হাতে গেলে কেন? বন্দুক থাকলে হরিণ টরিণ মেরে আনতে পারতে।

বন্দুক কোথায়?

আগে যদি যাবে বলতে তো ডিংলাঙু-এর কাছে বন্দুকটা চেয়ে আনতাম। মাংসের ভাগ দিয়ে দিলেই চলত।

কে তোমার ডিংলাঙু—আমি প্রশ্ন ক'রলাম, সে বন্দুক দেবে কেন?

বাঃ তুমি ডিংলাঙুকে জাননা বলেই বলছ। ওই ওপরের ঘরটা ডিংলাঙ এর। বলে যে ওর ঘরের ওপর দিকে দেখাল, আমি কোন ঘর দেখতে পেলাম না। হয়ত আছে ওপরে কোন ডিংলাঙ কিন্তু সে যে আমাকে বন্দুক ধার দেবে এমন নিশ্চিন্ততার কথা ডিঙ্গি ভাবতে পারে, আমার বিশ্বাস অসম্ভব। ডিঙ্গির বিশ্বাসের উৎস থাকা উচিত, সেটা জানবার কৌতূহলে প্রশ্ন করলাম, ডিংলাঙ যে আমার মত অচেনা বিদেশীকে নিজের বন্দুক ধার দেবে এ বিশ্বাস তোমার কেমন ক'রে হ'ল?

ডিঙ্গি এই প্রথম হাসল, সমস্ত মুখ জুড়ে ওর হাসিতে দেখলাম দুই গালে টোল পড়ে বড় মোহনীয় ক'রে তুলেছে ওর হাসি মুখ। বিভোর হয়ে দেখতে গিয়ে প্রায় বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিলাম, চটকা ভাঙল ওর স্বরে, ডিংলাঙ বন্দুক দেবে তুমি আমার

লোক বলে।

আমি ঠাট্টা ক'রে জানতে চাইলাম, ডিংলাঙ এর সঙ্গে তোমার খুব ভাব ?

ডিঙ্গি এবার আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তার বোনায় মনোনিবেশ ক'রল। দেয়ালের সঙ্গে টানা দিয়ে আপন কোমরে বাঁধা ওর বোনাটা যতটা হয়েছে তাতে চমৎকার নকসা। আমি ওর কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে জানতে চাইলাম, আমার কথার জবাব দিলে না যে ?

আমার দিকে ফিরে ডিঙ্গি বলল, আমার যখন খুব অল্প বয়েস তখন থেকেই ডিংলাঙ আমার ওপর খুব সদয়। কখনও দৈবাৎ আমার সঙ্গে দেখা হয় তার, তবু বেচারী আমাকে ভোলে নি।

আমি আগ্রহী হয়ে বললাম, মনে হচ্ছে তুমি তার প্রতি বিশেষ সুবিচার করো নি।

এবার সামান্য হাসল ডিঙ্গি। ম্লান হলেও সে হাসিতে সামান্য গর্ত হ'ল তার স্বাভাবিক রক্তিম গালে, বলল, আমি নিজের ওপরই সুবিচার ক'রতে চেয়েছিলাম।

কথাটা হেঁয়ালীর মত অস্বচ্ছ বলেই জানতে চাইতে হ'ল, কি রকম ?

এতক্ষণ হাতের কাজ ক'রতে ক'রতে কথা বলছিল ডিঙ্গি, এবার সম্পূর্ণ থামিয়ে আমার দিকে সরাসরি এমন ভাবে তাকাল যে মনে হল অতিরিক্ত কৌতূহলের জন্যে ও আমাকে অনুকম্পা ক'রছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলল, আমি যাকে বিয়ে করেছিলাম আশা ছিল সে অন্য রকম হবে।

কি রকম ? আমার কৌতূহল বাড়ল।

তোমাদের মত।

আমাদের মত মানে ?

শুনেছি সমতলের লোকেরা আজীবন তার একজন স্ত্রীর সঙ্গেই সংসার করে। ভাল মন্দ সব কিছুতেই সে সঙ্গী থাকে।

ডিংলাঙকে বিয়ে ক'রলে কি তা হ'ত না ?

ডিঙ্গি এবার হাসল বিদ্রূপের মত, সেটুকু মিশিয়ে বলল, আমাকে ভাল লাগবার সময় তার দুজন স্ত্রী ছিল। আর এখন ?

আমি চুপ ক'রে থেকে ওকে বলতে দিলাম, বলল, কয়েকজনকে ছেড়ে দিয়ে না থাকলে ওর যত স্ত্রী হাতে বোধহয় তত আঙুল নেই।

বাঃ!

আমার স্বরের শব্দে ডিঙ্গি গুরুত্ব দিল না তাই রক্ষে নইলে যা বলা সম্ভব ছিল তার বদলে বলল, ওর কাছে একটা হরিণ মারার চেয়ে একটা বিয়ে করা সহজ।

আমি ডিংলাঙ প্রসঙ্গ হালকা ভাবেই ধরলাম। সেই রকম ক'রেই জানতে চাইলাম, হরিণ মারার চেয়ে সহজ কেন ?

সহজ নয় ? একটা হরিণ মারতে হ'লে পিঠে বন্দুক বেঁধে বনের মধ্যে কত ঘুরতে হয়। অনেক সময় সারাদিন খুঁজেও বৃথা হয়ে যায়, পাওয়া হয়ত গেলই না কোন শিকার। বিয়েটা কিন্তু অত কঠিন নয়। কাউকে চোখে ধরলেই হ'ল।

শুধু তোমার বেলায় বেচারীর এমন দুর্গতি হ'ল কেন ? যা তুমি বলছ তাতে তো ব্যক্তিটির গুলি ফসকায় না!

ডিঙ্গি হালকা ভাবেই সামান্য হাসল, নিজের কাজে মন দেবার জন্যে আবার ঘুরে বসল বোনবার সরঞ্জাম হাতে নিয়ে! কাজ ক'রতে ক'রতেই বলল, ফসকায় কি না জানি না। আমি তো আর সব সময় ওর সঙ্গে থেকে দেখি নি! তবে এমন কোন শিকারীই নেই যার হাতে গুলি কখনও ফসকায় না। আমার মত আরও কতজন যে ফসকেছে তা তো আর দেখি নি, যে ক'টি মরেছে তাই শুধু দেখতে পেয়েছি।

ডিঙ্গির কথাগুলো ভারী ভাল লাগছিল। অনেক উচ্চশিক্ষিত পরিশীলিত বুদ্ধির মহিলার তুলনায় বেশী বুদ্ধি দীপ্ত কথাবার্তা। রসিকতাও এমন মার্জিত যে প্রশংসা আপনি আসে। মুখে স্তুতি না করে, কথা বলার আগ্রহে বললাম, আচ্ছা সে কখনও তোমাকে বন্দুক তাক করে নি ?

মানে ?

মানে সত্যিকারের বন্দুক। হতাশায় তো ক'রতেও পারত!

মেয়েদের ওপরে বন্দুক তাক ? তুমি কি জান না আমাদের দেশে তা অসম্ভব! অনেক কিছু সম্ভব, মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

আপন মনে কাপড় বুনতে লাগল ডিঙ্গি। ওর কথা শোনবার জন্যে আমিও কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। আমার সেই নীরবতার জন্যে ডিঙ্গি হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা বড় মূল্যবান কথা বলল, অত আগ্রহ ডিংলাঙ এর নেই। ওর শুধু চোখের লালসা। নজরে এলে লোভ, চোখের বাইরে থাকলে আর আগ্রহ হয় না।

তবে যে বললে তোমার জন্যেই আমাকে বন্দুক ধার দিতে পারে ? তুমি তো সব সময়ই ওর চোখের আড়ালে ?

আমি ডাকলেই ও আসবে। আর বন্দুক ছাড়া ও এক পাও হাঁটে না। জানি না রাতে বন্দুক পিঠে বেঁধেই ও ঘুমোয় কি না।—কথাটা বলে নিজেই একটু হাসল ডিঙ্গি। ক'ঘর বুনে হঠাৎ বলল, আমার বড় মেয়ে কি বলছে শোন।—তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই ওর বড় মেয়েটি মাকে লক্ষ্য করে কি যেন সব বলছে আপন ভাষায়। আমি কিছু বুঝলাম না। শুধু এই লোকটা প্রভৃতি শব্দগুলো আন্দাজে ধরতে পারলাম আমার সম্পর্কেই কথা হচ্ছে। জানতে চাইলাম, কি বলছে ?

তুমি নাকি ঝরণার দিকে যেতে যেতে খাণ্ডবুঙ এর দিকে চলে গেলে ?

এবার আমি হাসলাম, তোমার এই পঁচুকে মেয়ের জন্যেই যেতে হ'ল।

কেন ?

এমন লাজুকে মেয়ে যে আমি যাচ্ছি বলে ও সিঁটকে যাচ্ছিল লজ্জায়। ফলে ওর অসুবিধে না করে ওই দিকেই চলে গেলাম। কিন্তু খাণ্ডবুণ্ডটা আবার কোথায় ?

তুমি যেদিকে গিয়েছিলে সেই দিকে।

সে দিকে তো বন ছাড়া একটুকরো মাত্র ভুট্টার ক্ষেত দেখলাম। কোন বসতি তো নেই ?

এক সময় ছিল এখন পরিত্যক্ত, ওখানে আর ফসল হয় না। ওই খাণ্ডবুণ্ড এই অনেক ক'ঘর থাকত। এখন সব কোথায় কোথায় চলে গেছে। দুতিন ঘর এখানেই আছে। ডিংলাণ্ড-ও আগে খাণ্ডবুণ্ড এই থাকত। এখানকার প্রায় সব ক'টি ঘর ওই খাণ্ডবুণ্ড ভেঙ্গেই হয়েছে।

ভুট্টা ক্ষেতটা তাহ'লে কার ?

ড্যানিয়েল আবার এ বছর ক্ষেত ক'রেছে। অনেক বর্ষা তো ওখানে চাষ করা হচ্ছে না, তাই ড্যানিয়েল আবার নতুন ক'রে চেষ্টা ক'রছে।

ভুট্টা তো হয়েছে দেখলাম কিন্তু কিছু কিছু ভুট্টা কে যেন ভেঙ্গে নিয়ে গেছে ?

তাহ'লে নিশ্চয় বানর এসেছিল। ড্যানিয়েল বোধহয় দেখে নি, বাঙলামাও যায় নি ?—ডিঙ্গি বড় ছেলেটিকে ডেকে কি যেন বলতেই সে একলা বেরিয়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে ডিঙ্গি বলল, বানর যখন একবার দেখেছে ক্ষেত শেষ ক'রে দেবে। বাঙলামাকে খবর পাঠালাম, ওরা পাহারার ব্যবস্থা করুক। ড্যানিয়েলের তো বন্দুকও আছে বানর দু একটা মারতেও পারবে দঙ্গল, এলে।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই ডিঙ্গির ছেলেটি ছুটতে ছুটতে ফিরে এল, ওর হাতে একটা লতায় বেঁধে ঝোলানো এক তাল ঝলসানো মাংস। ছেলেটির কাছেই জানা গেল আজ সকালে ভুট্টা ক্ষেতে বানর পড়েছিল একপাল, ড্যানিয়েল পাহারায় যাচ্ছিল গুলি ক'রে সে একটাকে মারতে পেরেছে। সেই মাংসই কিছুটা দিয়েছে ড্যানিয়েল-এর স্ত্রী বাঙলামা। মাংসটা দেখা মাত্র ডিঙ্গির ছেলে মেয়েদের মধ্যে কি উৎসাহ! তারা সব তখনই বসে যায় মাংসর টুকরোটাকে ঘিরে। ডিঙ্গি ক্যাচর ম্যাচর ক'রে ওদের সামনে ভাত বের ক'রে দিল একটা বড় থালায়। মাংস থেকে খানিকটা কেটে আমাকে ভাতের সঙ্গে দিয়ে নিজে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেতে বসে গেল। দেখলাম সকালে আনা পাতাগুলো দিয়ে তলতলে একটা তরকারী রেঁধে রেখেছে, পরিমাণে অনেকটাই দিয়েছে আমাকে নিজেও নিয়েছে কিছুটা।

খেতে বসে আমার কেমন মমতা হ'ল অদেখা মৃত বানরটির জন্যে। বেচারীরা বনের ফসল মনে ক'রেই ভুট্টা খেতে এসেছিল স্বভাবগত অনুপ্রেরণায়, জানত কি যে এ তাদের জন্যে নিষিদ্ধ ফল ? সারারাত্রির অবরুদ্ধ ক্ষুধা নিয়ে বেচারী

সকলে মিলে তো শুধু খাবার জন্যেই এসেছিল। এখন ও নিজেই খাদ্যে পরিণত হয়ে গেছে। নিরপরাধ বানরটির দেহ এখন কালো একটি পিণ্ড মাত্র। তার রক্ত কালো, মাংস কালো, হৃৎপিণ্ড কালো সমস্ত অস্তিত্ব যেন এমনি কালো একটা অঙ্গার। নাঃ। আজ আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আমি এভাবে সেই অভুক্ত বানরকে ভক্ষণ করতে পারি না। মাংস খণ্ডটি তুলে দিলাম শিশুদের পাতে। যারা একটু বড় অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল, ছোটটি নিমেষে সেটি দখল করল এক থাবায়, মুখে তুলে নিয়ে কামড় বসাল। ওর এই আগ্রহ আর খাওয়ার ভঙ্গী হঠাৎই আমার ভাল লেগে গেল। নিজের খাওয়া ভুলে আমি শিশুটির কসরৎ দেখতে লাগলাম। নিজের মুখের তুলনায় অনেকটা বড় আধপোড়া মাংস খণ্ডটি নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছিল বেচারী। নিজের ছোট ছোট দাঁতে কিছুতেই জব্দ ক'রতে পারছিল না সেটিকে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা ক'রে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ওই পর্যন্ত দেখেই আমি আমার ভাতে মন দিলাম। দীর্ঘদিন ধরে বহু অখাদ্য কু-খাদ্য খেযে আসছি, খাদ্যের প্রকরণে আসক্তি কবেই যে উঠে গেছে তার হিসেব নিজের কাছেই নেই। কোনদিন পোড়া বা কোনদিন সিদ্ধ সামগ্রীতে কিঞ্চিৎ লবণ থাকলেই এখন তা অমৃত, তাও অনেক দিন জোটে নি বলে কাঁচা ফলমূল খেয়েও কাটিয়েছি তো কাল। গির্জার দিনগুলোকে বাদ দিলে আলু পোড়াই ছিল সর্বোত্তম আহার। তাই বা জুটেছে ক'দিন। আর কতদিন যে অখাদ্যে কেটেছে আজ তা ভাবতে বসলেও পাব না।

আমাদের সময়ের হিসেব চলে দিন রাত্রের মাপকাঠিতে তাই জীবনের অসংখ্য দিনের হিসেব রাখার ব্যবস্থা নেই, প্রয়োজনও নেই। এই সহজিয়া জীবনে সংখ্যাতত্ত্ব বাহুল্য, দশের মধ্যে সীমাবদ্ধ সামান্য কয়েকটি সংখ্যা কদাচিৎ কাজে লাগে। সামান্য সামগ্রীর বিনিময়ে এর বেশী সংখ্যাও অপ্রয়োজনীয়, তেমনি অপ্রয়োজন আমাদের আয়ুর দিনগত সংখ্যার হিসাব। এখানে মানুষ প্রকৃতির নিয়মে প্রাকৃতিক ভাবে জন্মায় প্রকৃতির নির্দেশেই যার যেমন মৃত্যু হয় মরে। কে কত দিন রইল তার অকারণ হিসেবে কার কি হবে? বেঁচে থাকবার জন্যে যতটুকু যা লাগে তার বেশী আয়োজন এখানকার জীবনে অনুপস্থিত। প্রয়োজনের পাত্রে মেপে সংক্ষিপ্ত চাহিদার পূরণেই জীবন সম্পূর্ণ হয়। যাই হোক বহুদিন পরে আজ আমার যেন তৃতীয় জন্ম হল। চেতনার উন্মোচনই তো জন্ম, আমার মনে হ'ল প্রকৃতির কোলে তার সন্তানকে হত্যা ক'রে লালসার নিবৃত্তি অন্যায়। বনের পশুকে বনের মধ্যে হত্যা করবার কোন অধিকার কারও থাকতে পারে না, কেউ ক'রলে সে অন্যায় করে। আমি সে অন্যায়ে অংশ নিতে পারি না। বেঁচে থাকবার জন্যে বিশ্বময় অসংখ্য আয়োজন আছে, বহু উদ্ভিদ আছে, শস্য আছে। হাতিরা যদি গাছপালা খেয়ে প্রাণ ধারণ ক'রতে পারে তো আমি কেন পারব না। এত তৃণভোজী প্রাণী বেঁচে

আছে আমার প্রয়োজন তো তাদের তুলনায় নগণ্য।

সদ্য খেয়ে উঠেছি এমন সময় নিচের দিক থেকে একটা অতি করুণ আর্তনীর স্বর উঠে এল। এ আমি আগেও শুনেছি বলে চিনি, কোন শূকর-শাবককে হত্যা করা হচ্ছে। এমন অন্তিম চিৎকার আমি আগেও শুনেছি, খারাপ লাগেনি এমন নয় তবু এখনকার চিৎকার আমার হৃদয়কে যেন বিদীর্ণ করে দিল। দুঃসহ শব্দের অভিঘাত আমার মনের মধ্যে যেন অনবরতই বেজে চলল। আমি বুঝতে পারলাম না সত্যিই শব্দটা ক্রমাগত উঠছে না আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে গেছে। শব্দ উঠতেই থাকুক বা আমার মনে জমে যাবার জন্যেই বাজতে থাকুক আমার মধ্যে শূকর শাবকটির হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠল, ইচ্ছে হ'ল যেখান থেকে শব্দটা উঠছে তার ওপর একটা বিশাল পাথর গড়িয়ে দিয়ে ঘাতককে বিনাশ করে দিই।

কিন্তু কাকে আমি মারব, ক'জনকে? পৃথিবীময় এই মানুষ নামের প্রাণী অন্য প্রাণীদের কি নির্মম ভাবেই না হত্যা ক'রছে। নিয়ত এই হত্যাকাণ্ড চলেছে। এখানে এখন এই পাহাড় বনস্থলীতে আমি একটি হত্যা দেখছি এই মুহূর্তেই এই পৃথিবীর আরও কত জায়গায় আরও কত হত্যা চলছে যা আমার চক্ষুগোচর নয়। কাজেই এর শেষ কোথায়? মানুষ ছাড়া অন্য সব প্রাণী কি শেষ হয়ে যাবে এই পৃথিবী থেকে? তবেই হয়ত এই নির্মমতার শেষ হবে। সেই কোন আদিম কাল থেকে বন্য মানুষ অন্য প্রাণীকে নিধন ক'রে চলেছে, হয়েছে কি সব শেষ? নিজের মনেই বিপরীত চিন্তা এল। পরক্ষণেই মনে হ'ল বহু প্রাণী তো নিঃশেষ হয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে, তাদের তো আর অস্তিত্বই নেই। তাছাড়া মানুষ আগে তো এমন নিপুণ মারনাস্ত্রের অধিকার পায় নি। এখন অসম শক্তির দ্বন্দ বাঁচা আর বাঁচতে না দেবার। হত্যা অনেক সহজ এবং অব্যর্থ। অন্য দিকে মানুষ বেড়েছে বিপুল; বন থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ গড়েছে আপন বাস, বনের হয়েছে বিনাশ। অন্য প্রাণীরা প্রাকৃতিক বাসস্থান ছেড়ে আসবার বুদ্ধি প্রকৃতির কাছে পায় নি বলে বনের সঙ্গে তাদের বৃদ্ধি এমনিতেই হয়ে যাচ্ছে সংকুচিত।

আমাকে গাছের তলায় দেখে ডিঙ্গি এসে বলল, তোমাকে তখন থেকে চুপচাপ দেখছি, কেন বল তো?

এ প্রশ্নের উত্তর হয়না বলে বললাম, বলবার কথা না পেয়েই তো চুপ করে আছি। তা ছাড়া তুমি তোমার কাজে ব্যস্ত আমি কি গাছের সঙ্গে কথা বলব?

ডিঙ্গি আকস্মিকভাবে প্রসঙ্গান্তরে পেঁছে গেল, আচ্ছা তুমি কি কোনদিন বানরের মাংস খেয়ে দেখ নি? খেয়ে থাকলে আজ ছাড়তে না।

বিত্তবানের কাছে খাওয়াটা বিলাস। তার স্বাদ চাই, গন্ধ চাই। তার খাওয়ার মধ্যে থাকে ভালমন্দের বিচার রসনার তৃপ্তি অতৃপ্তির প্রশ্ন। প্রাচুর্য যাদের আছে তাদের জিব খায় আর অন্য সর্বসাধারণের খায় পেট। খিদে মেটানোর জন্যে

উদর পূর্তি ছাড়া কোন ভাবনা সেখানে থাকে না। ডিঙ্গিও সেই সর্বসাধারণ সেই অসংখ্যের একজন মাত্র। তবে ও কেন এইরকম রুচির ইঙ্গিত করল। অরণ্যে অভাব নিত্য, নিরন্তর। লবণের অভাব, খাদ্যের অভাব, জলের অভাব, রোগে চিকিৎসার অভাব—অভাব দিগন্তজুড়ে। খাদ্য তাই হলেই হ'ল। যা হোক কিছু পেলেই চলে। উদরপূর্তিই এক্ষেত্রে প্রধান এবং শেষ কথা। যার শরীরে কিঞ্চিত মাংসও আছে বধযোগ্য হলে সেই খাদ্য। শূকর হোক, কুকুর হোক, বাঘ হোক কিংবা ভল্লুক; মারতে পারলেই হ'ল তা বানর বা এমন কি দোষ ক'রল? আসলে আমি খেলাম না অন্য কারণে সে আমার প্রতিবাদ; ডিঙ্গি বা নির্দিষ্ট কারও প্রতি নয়, মানুষ নামক যে জন্তু সমস্ত বিশ্বকে আত্মসাৎ ক'রতে চায় সেই উদর সর্বস্ব রাক্ষসসত্তার প্রতি। মানুষের চেয়ে ভণ্ড প্রাণী আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই বলে আমার বিশ্বাস—রাক্ষস স্বভাব-এর প্রতি তার তীব্র ঘৃণা অথচ তার নিজের মধ্যেই রাক্ষসের অবিভাজ্য বসবাস। ফুল যেমন আপন বৃন্তকে ভাগ দিতে পারে না আপন সৌন্দর্যের, মানুষও তেমনি নিজের স্বভাবকে দেখতে পায় না। আপন স্বভাব থাকে অনালোকিত, অনুজ্জল। তাই নিজের অপছন্দের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সে করে বসবাস। অনেক সময়ে সত্য তার সামনে ধরা দেয়, কিন্তু নিঃসংকোচে সব মেনে নিয়ে সে করে সহাবস্থান। তখন তার ভণ্ডামীর ভাণ্ডার পূর্ণ হয়।

যাই হোক ডিঙ্গি যা ভেবেই বলে থাকুক আমার মনের ভাব ওকে বলে বোঝাবার নয় বলে আমি উত্তর দিলাম না। অন্য কথা বলে প্রসঙ্গান্তরে পালাতে চাইলাম। বললাম, আচ্ছা খাণ্ডবুণ্ড-এ তো অনেকটা জমি পড়ে আছে, তুমি ইচ্ছে করলে ওখানে ফসল বুনতে পার?

কেন পারব না? আমাকে তাহ'লে খাণ্ডবুণ্ডে গিয়ে বাস ক'রতে হবে। ওখানে ঘর ক'রে নিতে হবে।

ড্যানিয়েল তো ওখানে থাকে না?

ওখানে ড্যানিয়েলএর ঘর আছে দেখনি? বেশীর ভাগ সময় ওখানেই থাকে। ওর বউটা ওখানে বেশী থাকতে চায় না। বাঙলামা এখানে থাকবে বলেই ড্যানিয়েলকে দুজায়গাতে পালা ক'রে থাকতে হয়।

আমার মাথায় হঠাৎ কি চপলতা খেলে গেল বললাম, ওখানে ড্যানিয়েল আর একজন বউ জোগাড় ক'রে থাকতে পারে তো!

ডিঙ্গিও হঠাৎ চপল হয়ে আমার দিকে চোখ টিপে হেসে বলল, পরামর্শটা সরাসরি ড্যানিয়েলকে দিলে ও তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। খুব খুশি হবে ড্যানিয়েল। কথা শেষ ক'রেও ডিঙ্গি হাসতে লাগল। আমি ওর মুখে অন্য ভাব লক্ষ্য ক'রলাম। ভারী সুন্দর লাগল ওর এখনকার চপলতা। মোটামুটি একটা গাম্ভীর্য সবসময়

ওকে জড়িয়ে থাকে এখন যেন সেই গাম্ভীর্যের খোলস ছিঁড়ে গেছে। ঘন মেঘের ফাটল দিয়ে চাঁদের দেখা যেমন, ডিঙ্গির এ মুখ দেখার দৃশ্যও অনেকটা তেমনি যেন। সেই ভাবেই সে আমাকে লঘুস্বরে বলল, তুমি লোকটা তো বিশেষ সুবিধের নও মনে হচ্ছে!

কেন বল তো এমন মনে হচ্ছে?

অনেক দিন আগে মোরে গির্জায় একজন সায়েব ফাদার এসেছিলেন, বলেছিলেন, যে অন্যকে কুপরামর্শ দেয় সে শয়তানের চেয়ে বদমাস। কথাকটি হাসি মিশিয়ে বেশ হালকাভাবেই পরিবেশন ক'রল ডিঙ্গি। আমিও বললাম, তুমি এটাকে কুপরামর্শ মনে ক'রছ কেন? আমি তো একটা সমস্যার সমাধান ক'রে দিতে চাইলাম। সেটা তো কই ভাবছ না?

আমি খুব ভেবেছি। এই ভাবনাটা বাঙলামা ভাবলে তোমার বিপদ। এক কোপে দুখানা ক'রে খোনদাঙ-এর জঙ্গলে পুঁতে দেবে।

ডিঙ্গির কথায় এমন সহজ রসিকতা ছিল যে খুব পরিণত মন ছাড়া তা অসম্ভব। আমিও ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে ওর ভার হালকা ক'রছিলাম। কিন্তু ওর এই চপলতা ধরে রাখা গেল না। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেল। তবে কয়েক পলকের ঝলকে যা দেখা গেল তা যদি ওর স্বাভাবিকতা হয় তবে নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটে গেছে যা আমার অজ্ঞতা। কিন্তু যা-ই ঘটে থাকুক ডিঙ্গি স্বাভাবিকই আছে। হয়ত হয়ে থাকতে পারে কিছুটা গম্ভীর, নয়ত স্বভাবগত চপলতা হয়ে থাকতে পারে বন্ধ, তাই বলে অস্বাভাবিক আচরণ ওর কোথাও নেই। যদি ওর সেই ছেলেটি মারা গিয়ে থাকে তাহ'লে কাল রাতে আমার সঙ্গে ওর সচ্ছন্দ বিহার কিছুটা বিস্ময়কর বটেই। তবে স্বামী পরিত্যক্ত রমনী ও, ভরা যুবতী, ওর আকাংখাও তো সত্য। তাছাড়া স্বাভাবিক সত্যে জীবন তো জীবনেরই জন্যে, তার যত ডালপালা বা বিস্তার সেগুলোই বড় নয় সেগুলো সবই জীবনের সহায়ক মাত্র, পথ চলতে পড়ে পাওয়া বস্তু। স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু পরিজন সবই চলার পথে জুটে যাওয়া সার্থকতা। আরও বহু জাগতিক জড়বস্তু প্রাপ্তির মতই, পাওয়া যায় ব্যবহারে ফুরিয়ে যায় হারিয়ে যায় আবার একটা জোটে—জীবন চলতেই থাকে; আবার চলতে চলতে একসময় জীবনও ফুরিয়ে যায়। কে আর হারানো বস্তুর হিসেব নিয়ে বসে থাকে? বরং হারানো প্রাপ্তিকে সহজ ভাবে তাচ্ছিল্য ক'রতে পারার নামই জীবন রসিকতা। এতদিন অরণ্যে, পর্বতে, ঘাসে, মাটিতে, জলে যে অসংখ্য প্রাণের সন্ধান পেলাম সব এই এক ভাবে চলছে। যা ঘটছে ঘটুক জীবন জীবনের মত চলে যায়। জীবন তো মহাকালের অংশ। এর চলাও তারই মত চলা। কাজেই ডিঙ্গির প্রতিষ্ঠা তো স্বাভাবিক সত্যের ওপর, বিয়োগ যদি ঘটেই থাকে তো অমূলক শোকে ডুবে থেকে অকারণ আত্মবঞ্চনার কি ফলশ্রুতি

থাকতে পারে ?

ওকে সাহায্য করবার অভিপ্রায়েই বললাম, আচ্ছা বাঙলামা আমাকো মাটিতে প'্তে দিলে তুমি খুশি হবে ?

আবার ওর গাম্ভীর্য বিদীর্ণ হ'ল হঠাৎ হাসির ঝিলিকে, বলল, তোমাকে প'্তে ফেলল বা কি ক'রল আমার তাতে লাভ ক্ষতির কি থাকতে পারে ?

আমি একটু আঘাত পেলাম। হয়ত ও বলেছে সেটি নির্মম সত্য কিন্তু যদি মিথ্যেও বলত যে আমার বিপদে ও দুঃখ পাবে তাহ'লে আমি একটু সুখ পেতাম। তা আমাকে সুখ দেবার জন্যে ওর আগ্রহের কি কারণ থাকতে পারে ? বরং স্বাভাবিক অনাগ্রহ আমাকে দুঃখ দিতে পারে কিন্তু ওকে প্রকাশ করে যথার্থ ভাবেই। তাই দুঃখ সম্বরণ ক'রে বললাম, তাহ'লে তুমি আমার প্রস্তাবটা মনে রেখে প্রয়োজন মত বাঙলামাকে বলে দিয়ো।

আমার তো আর কাজ নেই!—বলে ডিঙ্গি তার অসমাপ্ত কাপড় বোনায় মনোনিবেশ ক'রল। ওর এই ব্যস্ততা মেয়েদের ঐশ্বর্য। সমস্ত পাহাড়ী মেয়েই সব সময় কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকে। যখন সংসারেব কাজ ফুরিয়ে যায় তখনই কাপড় বুনতে বসে পড়ে। আমি আর কতক্ষণ বাজে বকে সময় কাটাই তাই উঠে পড়লাম। যাই যেদিকে হোক ঘুরে দেখি। আজ আমার প্রথম মনে হ'ল কাজ না থাকাটা বড়ই অস্বস্তিকর। কিছু একটা ক'রতে পারলে ভাল হত। এখন যদি কেউ ক্ষেত কোপানোর কাজে বেগার দিতে বলত তাহ'লেও ভাল হ'ত। নাঃ ক্ষেত একটা জোগাড় ক'রতে হবে, তাই বরং ঘুরে দেখি কোথায় করা যায়।

থাঙবুঙ এর দিকেই যাই ওদিকে পথ মোটামুটি জেনেছি। তা ছাড়া ওখানে তৈরী জমি আছে সে সবের একটা পেলে কাজ কিছুটা সহজ হবে। নইলে নতুন জায়গা কেটে পাহাড়ের ঢালে জমি তৈরী করা বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার, আমার মত মানুষ, যে কোনদিন চাষের কাজ করে নি তার পক্ষে কণ্টকর তো বটেই। এখানে গাছপালা অনেকটা কম। বেশ ফাঁকা। ঘুরে ঘুরে অচেনা সব গাছ খাঙরা বা ইয়াঙো বিস্ময়কর ভাবে অনুপস্থিত। যে সব গাছ আছে বেশীর ভাগই অচেনা। শুধু ছোট ছোট গাছ আর গুল্ম। বেশ কিছুটা নিচের দিকে নেমেছি হঠাৎ দেখি একটা ডালপালা কম গাছে বড় আকারের একটি ধনেশ পাখি চুপচাপ বসে আছে। আমার দিকে পেছন বলে ওর লক্ষ্য পড়েনি। নইলে যেমন ছোট আকারের গাছে বসে আছে এতক্ষণ ভয় পেয়ে উড়ে যেত। এদেরকে পেলেই মানুষ খুন করে অথচ এমন নিরীহ নির্বিরোধ প্রাণী কি সুন্দর বা দেখতে। যারা মারে একটুও কি মমতা হয় না তাদের। একবারও ভাবে না ? দেখা মাত্র খুন করে করে প্রায় শেষ করেই এনেছে এদের অস্তিত্ব। ঘাতকের চোখ এড়িয়ে এমন কোন বিজনে এ বেচারী বড় হয়েছে কে জানে ? আমার হাতে অস্ত্র নেই তাই নইলে হয়ত আমিও একে

হত্যা ক'রতাম।

ওকে বিরক্ত না করবার জন্যেই পথ বদল ক'রতে চাইলাম বেচারী বসে আছে থাক। আমি একটু ঘুরে গেলে ও যদি শান্তিতে বসে থাকতে পারে তো থাক। বাঁ দিকে বাঁকতেই দেখি এত খাড়াই যে নামা অসম্ভব। কাজেই আবার ফিরতে হ'ল। নাঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই অনুচ্চ গাছটির কাছে এসে পড়লাম অমনি ডানা ঝাপটানোর শব্দ! আমি ওপর দিকে তাকালাম শূন্য আকাশে ধনেশ উড়ে চলেছে। আচ্ছা কোন দিকে যাচ্ছে? ওরা কি ক'রে বা পথ চেনে? কেমন ক'রে শূন্যের নিশ্চিহ্নতায় পথের নিশানা ঠিক রাখে? না কি যেখানে সেখানে রাত্রিবাস করে? হয়ত এমনও হতে পারে যেখানে দিনান্ত হয় সেখানেই যে কোন এক মহীরুহে নেয় আশ্রয়। কিন্তু ওরও সঙ্গী আছে! জীবন তো নিঃসঙ্গ হয় না! কীট পতঙ্গ পাখি বা কোন জন্তুই সঙ্গীহীন ভাবে বাস ক'রতে পারে না। ওরা এই নিঃসীম শূন্যময় পথ চিনে কেমন ক'রে পরস্পরকে খুঁজে পায়?

এক একসময় একটা জানবার ইচ্ছা প্রবল হয়। আবার তা চাপা পড়ে যায়, না জানতে পেরে অজানাই থেকে যায় জিজ্ঞাসা। পাখিরা যে কোন ক্ষমতায় শূন্যে পথ চেনে সে রহস্যও অজানাই রয়ে গেল। ধনেশ তার পথে কোথায় মিলিয়ে গেল, আমি আমার পথে চললাম। একটু পরেই আমার মন থেকেও ও মিলিয়ে যাবে, প্রশ্নও আর হয়ত কোনদিন মনে আসবে না যে কেমন করে পথ চেনে পাখিরা। তবে এখন তো এই প্রশ্নই জীবন্ত অসংখ্য গাছ পাতার ফাঁক দিয়ে উড়তে উড়তে চলে গেল, এমনি করে দূর থেকে দূরে কত নদনদী প্রান্তর পেরিয়ে শূন্যের বুক চিরে চলে যায় যারা তাদের পক্ষে নিচের একাকার হয়ে যাওয়া স্থান চিহ্নিত করে ফিরে আসা যে কি করে সম্ভব হয় সে রহস্য জানে বোধকরি প্রকৃতিই কেবলমাত্র। আপন দুই চঞ্চল ডানায় শূন্য নির্ভর এই যে যাত্রা আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে এ চলার রহস্যের কথা ভেবেছি। এভাবে বিশালতম শূন্যতার মধ্যে দিয়ে চলতে যে ওদের কেমন লাগে একথাও মনে হয়েছে অনেক নির্বাক সময়ে। ওদের মন দিয়ে এ চলার স্বাদ পেতে চেয়েছি নিস্ফল অর্বাচীনতায়। ওপরে সীমাহীন শূন্যতা আর নীচে সবুজ গাছ গাছ আর গাছ—সামনে কিছু নেই, কোন লক্ষ্য বস্তু নয় তারই মধ্যে দিয়ে জন্ম থেকে কোথায় একটা নিঃশব্দ মৃত্যুর চিহ্নহীন ক্ষণ পর্যন্ত বিরামহীন উড়ে চলা এ যে কেমন লাগে তা শুধু ওরাই জানে যারা ওড়ে। অথবা তাও জানে কিনা জানি না কারণ আমাদের এই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কালের উদ্দেশ্যহীন যাত্রার অর্থ আমরাই কি কেউ খুঁজি কখনও! মাঝে মাঝে আমার মনে হয় জীবনটা একটা অভ্যাস। কেবল অভ্যাসবশে জীবনটাকে কাঁধে করে বয়ে বেড়ানো, তারপর চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় টুপ ক'রে নামিয়ে দেওয়া, ফেলে দেওয়া। অর্থহীন যাত্রা আরম্ভ ক'রে নিরর্থক

ভাবে থেমে যাওয়া ছাড়া জীবনের আর কিছু তাৎপর্য নেই।

এই সময়ের কিছু পর্যায়কে সুখ বলি তো সুখ আবার কিছু পর্যায়কে দুঃখ বলি বলে তার নাম দুঃখ। এই সুখ হোক বা দুঃখ হোক আনন্দ বা বেদনা হোক জীবনের মূলকে এর কোন কিছুই স্পর্শ করে না। এই অনর্থক যাত্রার মধ্যে এই সুখ দুঃখের অবদানও কিছু নয় তবু তা নিয়ে বিড়ম্বিত হওয়া প্রাণধর্মের অঙ্গ। এই পাখি পতঙ্গ কীট বা বন্য প্রাণী এরাও কি একই প্রাণ ধর্মে পীড়িত? এরাও কি এই নিত্যবৃত্তের অধীন? দুঃখবোধ বা সুখানুভূতি কি এদেরও মধ্যে সঞ্চার করে রাখে হৃদয়বৃত্তি?

আমি কিন্তু এই আনুভূতিক দাসত্বের থেকে মুক্ত ছিলাম। সামান্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলাম, ডিঙ্গির সঙ্গে দেখা হলে থেকেও যেতাম হয়ত, এখন আর থাকছি না। ডিঙ্গির মধ্যে কি আছে যে সে স্বভাবে পরিবর্তন আনতে পারে? একজন পৃথুলা নারী যার শরীরের জ্যোতি অপরাহ্নের ক্লান্ত আলোর মত যার মনে ভারবহনের অবসন্নতা, যার জীবনে বঞ্চনা আর পরাজয় মাত্র—কি তার সম্পদ থাকতে পারে অবশিষ্ট? আসলে আমার এ এক ভ্রান্তি। কিন্তু কি কারণ থাকতে পাবে এই বিভ্রান্তির? বরং জারোমথাঙ্গির সম্পদ ছিল, তার ছিল যৌবনের অব্যবহৃত অটুট উষ্ণতা, ছিল অপ্রাপ্তির উদ্দাম ক্ষুধা ছিল সজীবতা। ডিঙ্গি সে ক্ষেত্রে সারারাত জ্বলা দীপের শেষ রাত্রির নিষ্প্রভতা, স্তিমিত আবেগের মগ্নতায় মুগ্ধ এক গভীর জলের দীঘি। তবু সেই অতল জলের আহ্বান যে কেন আমায় মাতালো কে জানে।

বেচারী জারোমথাঙ্গি আমাকে মুক্ত ক'রতে চেয়েছিল আর আমি নিজেই জড়িয়ে পড়লাম বন্ধনে। জারোমথাঙ্গি হয়ত আমাকে ছাড়ত না, বেঁধে রাখত কিন্তু বন্ধনে জড়াতে পারত না। এতটা সে চাইতও না, দৈহিক নৈকট্যের ওপরে আরও যে নৈকট্য হতে পারে যা দুস্তর দূরত্বকে স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে যায় তার পরিচয় নিশ্চয় জারোমথাঙ্গির অজানা। তাছাড়া সে তো অপ্রকাশ। সেই সংযোগ তো দৃশ্য নয়, অগোচর। কাজেই তার কোন সংঘাতও নেই কোন স্বার্থের সঙ্গে।

বড় আকারের একটা খরগোস হঠাৎ লাফ দিতে দিতে আমার সামনে দিয়ে পথ করে নিতেই আমার চটকা ভাঙ্গল। ভাবনার ঘোর কেটে গিয়ে আমিও পথ চলতে লাগলাম। এত বড় খরগোস যে হয় কখনও তা আমার চোখে পড়ে নি, গায়ের রঙ বোধহয় ওকে বড় হতে সাহায্য ক'রেছে। মাটি আর শ্যাওলা দুটোকে মেশালে যেমন রঙ হয় তেমনি ওর দেহ। বনের মধ্যে মিশে থাকতে পেরেছে বলেই খাদকের চোখ এড়িয়ে যেতে পেরেছে বেচারী নইলে প্রায় বনময় ঘাতকেরা ঘুরছে কেউ তীর কেউ গুলতি বা কেউ বন্দুক নিয়ে। আপন ভূমিতে অবাধ বিচরণের সময় কোন গুপ্ত ঘাতক যে কোন্ অলক্ষ্যে নিঃশব্দে নজর ক'রে আছে কেমন ক'রে

তা জানবে বেচারীরা ? তাদের চোখে পড়ামাত্রই আচমকা মৃত্যু এসে লাফিয়ে পড়ে। নিমেষে এই সুন্দর চঞ্চল অস্তিত্বটি একটুকরো মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়। পৃথিবীর আলো বাতাস শব্দ গন্ধ সব তার মুছে যায় নিমেষে। এ বেচারী সেই অসংখ্য চোখ এড়িয়ে যে এত বড়টা হতে পেরেছে তার জন্যে যাদের অবদান আছে আমি সেই বৃক্ষলতা পাতা গুল্মদের ধন্যবাদ জানালাম। অজস্র লতাগুল্ম তাদের বুকের মধ্যে ওকে দিয়েছে আশ্রয়, অনেক বৃক্ষ ওর দেহের ওপর পাতা বিছিয়ে ওকে আড়াল ক'রে রেখেছে। যে ঝরণায় ও জলপান ক'রেছে তার পাশের পাথরেরাও নিশ্চয় কোন না কোন বিপদে ওকে দিয়েছে আত্মগোপনের সুযোগ। সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতায় ও বনভূমিকে ভরিয়ে রেখেছে নৃত্যের উৎসবে।

হঠাৎ কি হ'ল খাণ্ডবুণ্ড-এর পথে না গিয়ে আমি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এলাম লাইজিং পাহাড়ের ঢালুতে। এখানে অবণ্য বড়ই গভীর। সামনে সমস্ত পাহাড়টাকে ছেয়ে আছে অজস্র সবুজ পাতা, অসংখ্য সব সবুজ গাছ। ওর মধ্যে প্রচুর মহীরুহ। কেন যে এদিকে এলাম জানি না। এই সবুজ অরণ্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রলে আর আলোর দেখা পাওয়া যাবে না। এমনিতেই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব সমস্ত জায়গাটা জুড়ে। আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে তার নিচেই একটা শুকনো ঝরনা। এখন আর জল নেই কিন্তু জলের চলাচলের সুস্পষ্ট রেখা। পাহাড়ে বাদল হলেই এ পথে ধারাস্রোত নেমে বইতে থাকবে খুজাইলকের দিকে। সমস্ত পাহাডেব জলধারা নিয়ে বার মাস খুজাইলক বয়ে চলেছে পূর্বদিকের সমতল লক্ষ্য করে। বর্ষার অজস্র ধারা অসংখ্য পাহাড়ের গা বেয়ে গিয়ে খুজাইলককে পূর্ণ করে, আর এখন শীর্ণ ধারা কোনক্রমে বয়ে চলে আপন অস্তিত্ব রক্ষা ক'রছে মাত্র। যতটা না জল তার বহু বেশী পাথর আর নুড়ি তার বুকে। ' সামান্য স্বচ্ছ জলটুকুব গতি উপলব্যথিত শব্দে আবহ ভরে রাখে—আমি একদিন শুনেছি। মাটির দিকে চোখ পড়তেই স্পষ্ট হ'ল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র পদচিহ্ন। কিছুক্ষণ আগেই কোন হরিণ হেঁটে গেছে। নিরীক্ষণ ক'রতে ভাল লাগল বলেই নিচু হ'লাম, বাঁ দিকে ছোট খাদ বেয়ে ওপর দিকের ঘন অরণ্যে উঠে গেছে সে। মনে বড আনন্দ হ'ল। আর একটু নিচের দিকে শুকনো ঝর্ণার বালির বক্ষভূমিতে একটি পদচিহ্ন বেশ গভীর। তাহ'লে হরিণটি আকারে বড়। এই চিহ্ন ধরেই ব্যাধেরা চলে থাকে শিকারের সন্ধানে, আপন পদচিহ্নের ভারেই অবোধ হরিণ হয় নিহত।

দূর থেকে এই লাইজিংকে অনেকবারই তো দেখেছি আরও অগুণতি পাহাড়ের মত নিবিড় সবুজ ব্যতিক্রমহীন বনভূমি। আজ একবারে তার পাদদেশে দাঁড়িয়ে তাকে পৃথক করবার মত কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। আমার সে প্রয়োজনও অবশ্য ছিল না। তবু আমি হঠাৎই যেন সতর্ক হ'লাম। এই লাইজিং এর

দক্ষিণেই তো জারোমথাঙ্গির সেই সাধের বাসা, পাহাড়টা পেরিয়ে গেলেই পরের টিলায় যে ঘরটি বেচারী বে'ধেছিল আছে কি আর তা এখনও? একা একা নিশিযাপন ক'রছে সে সেই অরণ্যে? গভীর অন্ধকারে শ্বাপদও যখন শিহরিত হয় শংকায় তখনও কি একা সে যাপন ক'রতে পারছে তার নিদ্রাহীন নিশীথ?

এই প্রথম আমার মনে হ'ল আমি অপরাধ করেছি। জীবন তো শুধু জীবন কাটানোর জন্যে, আয়ু কেবল ব্যয়ের জন্যে সঞ্চয়। তবে আর অকারণ কি প্রয়োজন সঙ্গী বদলে? সঙ্গী চাই অন্ধকারে, দুর্গত সময়ে। সে সঙ্গী যে কেউ তো হ'তে পারে, বরং দুঃসময়ের সঙ্গী হিসেবে জারোমথাঙ্গি অনুপমা। আমি যদি নিজের লাভের কথাটা অন্তত ভাবতাম তাহ'লে জারোমথাঙ্গিকে ছাড়তাম না। ও বেচারী নিশ্চিত সুখ আর নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ ছেড়ে আমার নিরাপত্তার জন্যেই কেবল বেরিয়ে এসেছে দীর্ঘদিনের আশ্রয় ছেড়ে আমাকে এই বিপদসঙ্কুল পথ পার করে এনেছে নিবিড় মমতায় অথচ আমি তার সঙ্গে ক'রলাম চাতুরী। এটা বোধহয় ঠিক হয় নি সে বেচারী আমাকে কোথায় খ'ুজে বেড়াচ্ছে কে জানে? একা এক যুবতী তার পরও আমাকে খ'ুজতে গেছে ডিঙ্গির বাড়ী। আচ্ছা ও কি ক'রে অনুমান ক'রল যে আমি ওখানে যেতে পারি?

সত্যিই জারোমথাঙ্গি অদ্ভুত মেয়ে। ওর চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে কেবল শাখামৃগের। বেশ কিছুক্ষণ ওকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ ক'রলে একটা বড় বিশেষ শ্রেণীর বানর বলে মনে হবে ওকে। জারোমথাঙ্গির চেহারাই প্রমাণ করে মানুষও বানর এক শ্রেণীভুক্ত জীব। প্রাকৃতিক পার্থক্যের কারণে পৃথক নামকরণ বটে মূলত অভিন্ন। কিন্তু সে যাক। চেহারা প্রাণী মাত্রেরই ভিন্ন তাই বলে কি সব এক নয়? প্রাণের মূল্যে সবাই তো সমান সব কিছুই এক—একাকার এই বিশ্বনিখিলের প্রাণ সম্পদ। একটি দ্বিপদ, একটি চতুষ্পদ অথবা কোন নিষ্পদ—প্রাণী যদি হয় তো প্রাণের মূল্য সকলেরই তো অভিন্ন, জন্ম ও মৃত্যু সকলেরই তো একরকম।

তবে তারতম্য কি নেই? যেটুকু তারতম্য দেখা যায় তা যে কেন হয় আমি তার কারণ বুঝি না। জারোমথাঙ্গির ওপরটুকু দেখা যায় ভেতরটা নয়, কিন্তু বিস্ময়কর বৈপরীত্য ওর ওপর আর ভেতরে। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবেরই ওপরটা দেখা যায় ভেতরটা নয়। জড়বস্তু ভাঙ্গলে তার ভেতর আর ভেতরে থাকে না বলে তাও দেখা সম্ভব হয়, হয় না কেবল কোন প্রাণীর ভেতরটা দেখা। প্রাণের বিশেষত্বই এই যে তার স্বরূপ অদৃশ্যই থেকে যায়।

কিন্তু আমি তো জারোমথাঙ্গির ভেতরটা দেখেছিলাম। অনেকটাই দেখেছিলাম। কারণ ওর মনটা স্বচ্ছ এক খোলসের মধ্যে সামান্য একটা পর্দা দিয়ে এমন আলগা ভাবে ঢাকা যে সে ঢাকা খুলে দেখতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হয় নি বরং বলতে গেলে দমকা এক বাতাসে সে পর্দা এমন ভাবে খুলেছিল যে প্রায় পরিপূর্ণই দেখেছি

আমি তাকে ঃ আর তাই এই অনুশোচনা। আমার হঠাৎ মনে হ'ল এই অনুতাপের জন্য ওই লাইজিংই একমাত্র দায়ী। কারণ আমি যে জারোমথাজিকে প্রতারণা ক'রেছিলাম তার সাক্ষী এই লাইজিং। জারোমথাজির সাধের নীড়ের চেয়ে লাইজিং অনেক উঁচু। আর দুজনের মধ্যে কিছু নির্মল শূন্যতা ছাড়া কোন ব্যবধান ছিল না বলে আমিও সেই ঘরের মধ্যে থেকে লাইজিং-এর ধ্যানস্থ মূর্তিটা অন্ধকারের স্তূপ এর মত দেখছিলাম। সে রাত্রে আমরা ছিলাম মুখোমুখি। তাই লাইজিংকে যেন আমার ভয় লাগছে আজ।

আমি তো কোনদিন ভয় পাইনা। আজ হঠাৎ কেন এমন হচ্ছে? কত রাত একা দুর্গম অরণ্যে পর্বতে অনেকই তো কাটিয়েছি। কত বার বন্য প্রাণী এসে পড়েছে সামনে, নির্ভয়েই তো পেরিয়েছি সে সব ত্রস্ত সময়। এখন এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল সময়ে বসতির কাছাকাছি উৎসাদিত অরণ্যের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ভয় পাবার কি কারণ থাকতে পারে? দূর। এ নেহাৎই দুর্বলতা। একে জয় করবার জন্যেই পদসঞ্চারে গতি সংযোগ ক'রলাম। নাঃ এখনই নেমে লাইজিং-এর পাদভূমি দিয়ে খুজাইলক পর্যন্ত পেঁাছে যাব। খুজাইলক থেকে জারোমথাজির কুটির দেখা যায় না, তাছাড়া একা সে তো আর থাকছে না ওখানে। নিশ্চয় অন্য কোথাও চলে গেছে। আমাকে খুঁজতে সে যখন এত দূর চলে এসেছিল আরও দূরে নিশ্চয় গেছে—ফিরে গেছে কি তবে সেই গির্জায়? তা অসম্ভব। বিজন বনের দুর্গম পার্বত্য পথে একা চলার সাহস সে ক'রবে না কিছুতেই। তবে? কোথায় থাকবে সে তাহ'লে একা? ওই জীর্ণপাতার কুটির ছাড়া আস্তানা আর কোথায় বা আছে তার? মেয়েটির মনের জোর অসামান্য হলেও আসলে তো বেচারী অসহায়। অমন একটা মেয়ের পক্ষে একা থাকা অসম্ভব। আর কুশ্রী সম্বলহীনা এক নারী যতই সে যুবতী হোক তার স্থায়ী সঙ্গী মেলা ভার। আর অস্থায়ী সঙ্গী? সে তো সর্বত্র এবং সবসময়ই বিপজ্জনক। অস্থায়ী সঙ্গীর দায় কেন দায়িত্ব বোধও থাকে না। তাছাড়া বিবেকহীন দায়িত্ব চেতনাহীন চপল চরিত্রের পশুরাই তো অস্থায়ী সঙ্গী হতে আসে।

আমার চেতনাকে চমকে দিয়ে হুড়মুড় ক'রে পাশের বন ভেদ ক'রে এক হাতি এসে কাছকাছিই হাজির। অন্যমনস্কতার জন্যে বার্তা পাইনি আগে। হাতির কাছ থেকে পালাবার দৌড় আমার সাধ্যাতীত জানি বলেই যেন থমকে গেলাম আর সেই মুহূর্তে শুনলাম তার মাথার ওপর থেকে মানুষের নির্দেশ। যাক পোষা হাতি। তাই তো হাতি আসবে কোথা থেকে? এই অঞ্চলের অরণ্যে তো হাতির আস্তানা নেই। আমার কিছুটা নিচের দিক দিয়ে যেতে যেতে মাহুতের নির্দেশে হাতি দাঁড়াল, সামনেই একটা সবুজ ছোট গাছ ছিল শুঁড় বাড়িয়ে তার কিছু

ডালপাতা চালান ক'রে দিল নিজের মুখের মধ্যে। মাহুত আমাকে মণিপুরী ভাষায় জিজ্ঞেস ক'রল, বিড়ি আছে কিনা।—আমি ভাষাটা বলতে পারি না বলে ইসারা ক'রে জানালাম নেই। আমারও মানুষটাকে দেখে সন্দেহ হচ্ছিল অন্য প্রদেশের মানুষ বলে। ওর কথাগুলোও আড়ষ্ট। মৈতেই হলে যেমন ক'রে আপন ভাষা বলে বা নাগারা যেমন ক'রে বলে তেমন সহজ নয়। লোকটি হাতি নিয়ে আসছে কোত্থেকে, যাবেই বা কোথায়, কৌতূহল হ'ল। ভাষা এমনই একটি সমস্যা যার সমাধান সহজ নয়, তাই ভাবতে লাগলাম কি ক'রে কথা বলি মানুষটার সঙ্গে?

হঠাৎ শুনি মাহুত তার হাতিকে নির্দেশ দিতে বাংলা শব্দ একটা ব্যবহার ক'রল। আমি একটা সুযোগ নেবার অভিপ্রায়ে বললাম, মশায় কোনদিকে যাবেন?

হাতি ঘাড়ের ওপর মানুষটা যেন চমকে উঠল, তার মুখের থেকে শব্দ এল, আরে! পরমুহূর্তে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে যেতে হাতি তার সামনের পা দুটো মুড়ে একটু নিচু হতে মাহুত তার ঘাড় থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, বাড়ী কই? মিলে কামে আসলেন না কি?

আমি তার অনুমান অসার ক'রে বিস্ময় প্রকাশ ক'রলাম, কোন মিল? কিসের মিল?

আমার কথা তাকে বোধকরি এতই বেশী বিস্মিত ক'রল যে সে আর বাক্যব্যয় করবার বদলে আমাকে আপাদমস্তক ভাল ক'রে দেখতে লাগল। সম্ভবত আমার মত প্রাণী সে অতীতে কোনদিন দেখে নি! অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে আমার যা বর্তমান আকৃতি তার তুলনা সচরাচর মেলে না।

আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করবার পর সে তার প্রথম প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ক'রল, বাড়ী কই!

আমি ভেবে পেলাম না কি ঠিকানা ওকে দেব। তবু ওকে ভাল লাগল বলেই বললাম, ঘর বাড়ী তো কোন নেই—ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি।

আবার একটা অনুমান ক'রল মাহুত, বার্মা থিকা? পাকিস্থান তো মনে হয় না!

বর্মা থেকে! আমি অবাক হলাম। পরক্ষণেই জানতে চাইলাম, আপনার বাড়ী কোথায়?

মাহুত তার হাতিকে দেখিয়ে বলল, ওই দ্যাখেন আমার বাড়ী। যখন যেইখানে হাতি সেইখানে থাকি সেই বাইশ বছর বয়সের থন হাতি খেদাই।

মানুষটিকে অন্তরঙ্গ দেখে জানতে চাইলাম, এটা কি আপনার হাতি?

আমার প্রশ্ন শুনে গভীর অনুকম্পার সশব্দে কিছুক্ষণ হেসে বলল, আমার হাতি। আমি হাতি পামু কই? হাতি মিলের। মিলের মালিক হাতি কিন্যা আনছে লগে আমারেও। আমারে আনল দেইখা এই হাতি কাম করে, অন্যে

পারতো না। এই হরেন্দ্র মালাকার সব হাতিরে বশ মানাইতে পারে।

ধীরে ধীরে অনেক কিছু স্পষ্ট হ'ল ধারণা ক'রলাম কোথাও একটা মিল আছে, সেটা কি মিল জানতে চাইতে হরেন্দ্র জানাল, মোরে যান নাই? ওই তো সামান্য পথ। ওইখানে কাঠ মিল বসাইছে আমাগো দেশের এক বাবু। তিনির হাতি, আমি চালাই।

হরেন্দ্রর বয়েস কত হবে অনুমান অসম্ভব তবে আমার চেয়ে কিছু কম হওয়া স্বাভাবিক। তবু অতি সরলতার জন্যে তার অনেক কথা শোনা গেল, আমাকে একসময় প্রস্তাবও ক'রল আমি চাইলে সে তার মালিকদের বলে মিলে আমাকে যে কোন একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। আমি ওকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, যদি এদিকে থাকি তো আপনাকে জানাব।

আমার অনাগ্রহকে গ্রাহ্য না করে হরেন্দ্র মালাকার বলল, আমি বড়বাবুরে কইয়া রাখমু। আপনে তো আমারে পাইবেন না কখন কামে কই থাকি। বড়বাবু আপনেরে দেখলেই কাম দিতেন। দ্যাশের লুক দেখলেই—

কথা অসমাপ্ত রেখেই হরেন্দ্র হাতির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর যেমন অনায়াসে হাতির ঘাড়ের ওপর থেকে নেমেছিল তেমনি ভাবে হাতিকে নির্দেশ দিয়ে তাকে নিচু করিয়ে তার কাঁধের ওপর উঠে ধীরে ধীরে গিরিখাদের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এমনি অসংখ্য পাহাড় আর অজস্র গিরিখাত—কত যে তার সীমা সংখ্যা নেই। আমিই কি কম ঘুরেছি? কিন্তু এ যে কত দেশ জুড়ে কতটা পৃথিবী জুড়ে কতটা কে জানে? আমার এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে বা কি লাভ? আমি যত ঘুরেছি, আমাকে যত ঘুরতে হয়েছে এটা সোজা হাঁটলে পৃথিবীর কতটা যাওয়া যেত? একজন সারাজীবনে যত হাঁটে তার কতগুণ হাঁটলে পৃথিবীকে একবার বেড় দেওয়া যায়? কি হবে তা দিয়ে আমি তো জীবনে কখনও ভাবি নি যে বিশ্ব প্রদক্ষিণ ক'রতে বেরোব? তবে আর এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ? গিরিখাতগুলোকে আমার রহস্যের মত মনে হয়। কি যে ওর মধ্যে আছে—কখনও বা মনে হয় বনের প্রাণীরা সব ওর মধ্যেই বাস করে, হয়ত দেখব অসংখ্য হরিণ কিংবা ভল্লুকের পাল অমনি কোন গিরিখাদের অরণ্যে নিভৃত নীরবতার মধ্যে আছে পরম শান্তিতে। আমার গিয়ে পেঁছোতে ইচ্ছে করে, দেখতে ইচ্ছে করে তাদের ভয়হীন বাসের অভিব্যক্তি। কোন একদিন যাব। পাহাড়ের গা বেয়ে তো অনেক চলেছি কিন্তু বর্ষার জলে যেমন ঢল নামে তেমনি ভাবে চলতে চাই আমি মাইলের পর মাইল অজস্র বনভূমি পেরিয়ে নিবিড় সবুজের সিক্ত শীতলতার মধ্যে দিয়ে। উপলখণ্ডব্যথিত সে যাত্রার বন্ধুরতা আছে ঠিকই

আনন্দও নিশ্চয় অপার।

আমার মানস ভ্রমণে বহুকাল কেটে গেল এক লেহাউ গাছের ছায়ায় বসে, চেতনা এল অচেনা এক পাখির বিকট ডাকে। না, অনেক দেরী হয়ে গেছে অযথা এতটা সময় কাটানো ঠিক হয় নি। তাছাড়া ডিঙ্গির জন্যে কিছু করা দরকার। শুধু শুধু তার ঘাড়ের ওপর বসে খাই কি ক'রে? কিছু কাজে লাগতে পারলে অস্তিত্ব মজবুত করা যায়।

ফিরতেই ডিঙ্গি বলল, খোমা যে বলল তুমি হরিণ মারতে গেছ, হরিণ পেলেনা?

ডিঙ্গির বড় মেয়ে কথাটা নিজের চিন্তা থেকেই বলেছে আমি আর তার ধারণা নষ্ট ক'রলাম না, বললাম, দিনের বেলায় হরিণ পাওয়া যায় না।

সেটা বুঝতে তোমার এতক্ষণ লাগল?

একটা হাতি পেয়েছিলাম, মারতে পারলাম না—আমি কিঞ্চিৎ রসিকতা করবার চেষ্টা ক'রলাম।

ডিঙ্গি এমনিতে একটু বেশী গম্ভীর। প্রগল্‌ভতা তার চরিত্রে নেই। সে রসিকতায় অংশ নেয় না কখনই, এবারও কোন কথা বলল না। আমিও বুঝলাম না ও আমার কথা কিভাবে নিল। এটা অবশ্য কখনই বোঝা যায় না। ও সব সময় গাম্ভীর্যে ঘিরে রাখে নিজেকে, আমার বাক্যালাপ তাই কখনই বিশেষ এগোয় না। তাছাড়া ওকে বুঝি না বলেই একটা ভয় কখনই কাটে না এই বুঝি রাগ ক'রল। এই যে ক'দিন আছি বিদ্যালয়ের পড়োর মন নিয়েই যেন আছি। অথচ রাত হলে নিদ্রায় যখন সব নিশ্চুতি হয়ে যায় ওর জীবিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মৃতটির কোন তফাৎ থাকে না তখন অন্য এক ডিঙ্গির দেখা পাওয়া যায় অনুভবের চেতনায়। চোখ তখন কোন কাজ করে না, সেই ডিঙ্গিকে দেখে হৃদয়, মনে হয় দিনের বেলা চারপাশের যে পাহাড়গুলোকে নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে সবুজ পোষাকে মোড়া শীতের বৃদ্ধের মত দেখা যায় তারই বুঝি অকস্মাৎ হয়েছে জাগরণ, অকস্মাৎ তার শিরশোভা শ্যামবন দীর্ণ ক'রে জেগে উঠেছে আগুন—লাভাস্রোত সেই উন্মুক্ত গহ্বর পথে উর্ধ্বমুখী। সে কি ভীষণ, কি ভয়াবহ, দুর্দান্ত, দুর্নিবার।

আবার সকালে উঠে দেখি সেই একই রকম শান্ত অরণ্যের আচ্ছাদনে আবৃত শান্ত পাহাড় ধ্যানস্থ। সেই সুগভীর প্রশান্ত শ্যাম বনভূমি থেকে সুরভির মত প্রবাহিত হচ্ছে স্নিগ্ধতা। নিশীথ একটা স্বপ্নের মত আসে আর প্রত্যূষে রাত্রির বিস্তারের চিহ্নমাত্র থাকে না। কিন্তু দিনের বেলায় ওর কৃপণ কথাবার্তা আমাকে কুণ্ঠিত ক'রে রাখে। কখন বা মনে হয় ও আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ বুঝি না। সারাদিন ওর ব্যবহার দেখে মনে হয় ও আমাকে সামান্যই চেনে, নেহাৎই পরিচয় থাকা প্রতিবেশী আমরা।

আমি আমার মত ঘুরি যখন খিদে লাগে খাই বেশীর ভাগ খাই না। আমি কিছু কিছু ফল আর মাটির তলার এক রকম মূল চিনেছি প্রায়ই সেই সব খেয়েই পেট ভরাই। খাবার খুঁজতে গিয়ে দেখি সত্যিই প্রাণ বিশ্বভরা, অরণ্যময় প্রাণধারণের আয়োজন। আমারই মত কত প্রাণী এর মধ্যে বেঁচে আছে, সকলেরই আছে খাদ্যের ব্যবস্থা, যার যা প্রয়োজন পাচ্ছে, খাচ্ছে, চোখে দেখা যায় না এমন কীট থেকে সুরু ক'রে বিশালদেহ হাতি পর্যন্ত বেঁচে আছে এই বনভূমির ওপর নির্ভর করেই। হরেন্দ্র মালাকারও তাদের পোষাহাতিকে অরণ্যেই ছেড়ে দেয় খেয়ে আসবার জন্যে। এ একটা দারুণ অন্যায়। হাতিটিকে যে কোন বন থেকেই তো ধরে এনেছে মানুষ। তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে অথচ তার খাবার বন্দোবস্তটুকু পর্যন্ত ক'রছে না। তাকে সেই প্রকৃতির কাছ থেকেই নিজেকে সংগ্রহ ক'রে নিতে হচ্ছে আপন খাবার! তাহ'লে তাকে ধরে এনে কাজ করিয়ে নেওয়ার মত অন্যায় আর কি থাকতে পারে? এমন শোষণ এক মানুষই ক'রতে পারে—অন্য প্রাণী নয়। আসামে দেখেছি কি দুরূহ পরিশ্রমই না বেচারীদের ক'রতে হয়। বিশাল গাছগুলোকে শুঁড় দিয়ে না পারলে শেষ পর্যন্ত মাথা দিয়ে ঠেলতে হয় ওদের। সাধ্যের বাইরে হলেও ছাড়তে পারে না, কাঁধের ওপরে যে জন্তুটি বসে থাকে তার হাতে থাকে অংকুশ নামের লোহার শলাকা—সেটি কোন অক্ষমতার কথা শোনে না, ক্ষত বিক্ষত করে মাথাকে, তাই যন্ত্রণায় কাতরেও তাকে ঠেলতেই হয়।

হরেন্দ্র মালাকারের হাতিটির কথা মনে পড়ে বড় খারাপ লাগল—সে বেচারীকেও তো অমনি কাঠের গুঁড়ি ঠেলতে হয়! এদিকেও যে আসামের মত কাঠের বাণিজ্য আছে আমার ধারণা ছিল না। পৃথিবীতে যত রকম ব্যবসা আছে তার মধ্যে নিকৃষ্টতম বোধকরি এই গাছ কেটে কাঠের ব্যবসা। আমি অনেক দেখেছি বলেই আমার বড় তীব্র ঘৃণা। হরেন্দ্র মালাকারের মালিকের কাছে কাজ ক'রতে যাবার প্রস্তাবে সরাসরি আপত্তি করিনি কেবল হরেন্দ্রর সরলতার জন্যে, আমি তা কখনই যাব না। আমি বরং এবার একটা নতুন ক্ষেত তৈরী ক'রব বর্ষা নামলেই। দু একদিনের মধ্যে, জায়গা ঠিক ক'রে এখনই সেটা পরিষ্কার করে রাখব। মোটামুটি ভাবে খাণ্ডবুও এই একটুকরো মাটি নির্বাচন ক'রে রেখেছি, মনে হচ্ছে ওখানটাই হবে কম শ্রমসাধ্য ক্ষেত।

খুজাইলকের উত্তর দিকে বন যে এত গভীর আমার ধারণা ছিলনা। হঠাৎ এসে পড়ে দেখি দুর্ভেদ্য যাকে বলে। দীর্ঘ বিপুলকায় খাংড়া ইয়াঙ্গোর ভীড়ে মিশে আছে অজস্র ছোট আকারের গাছ। লতাগুল্মের তো কথাই নেই লোহাউ, তেলহাউ বা ওই জাতীয় দীর্ঘাঙ্গ বৃক্ষও আছে কিছু কিছু। ওর মধ্যে ঢুকে আমার কোন লাভ নেই বলে ঢুকিনি। মাঝে মধ্যে সম্বর বানর বা হরিণ শিকার ক'রতে অনেকে

যায়। আমি আর বেশী ঢুকলাম না, প্রচুর কন্দ হয়ে আছে যেখানে সেখানে সেই কন্দ তুলতে লেগে গেলাম। যখন অনেকই জমে গেছে আমার মনে হ'ল কি হবে এত দিয়ে? যত তুলেছি এর দশভাগের এক ভাগও তো আমি একেবারে খেতে পারব না, দু চারটে খাবে হয়ত ডিঙ্গির বড় মেয়ে, বাকি সব নষ্ট হবে। তবে আমি কেন তুলছি? বরং গাছগুলো গাছই থাক, প্রকৃতির আপন আনন্দে যার সৃষ্টি তার সেই আনন্দই পূর্ণ করুক আমি প্রয়োজনের বেশী তুলে ধ্বংস করি কেন? কেন অযথা ব্যাহত করি সেই আনন্দের ধারা? উঠে দাঁড়ালাম। মুস্কিল হ'ল এতগুলো কন্দ নিই কি ক'রে? ওপরের উদ্ভিদ লতাগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে গেলে অযথা ভার বইতে হয় তবে সে ছাড়া তো আর উপায়ও নেই।

ওগুলোকে গুছিয়ে বাঁধছি এমনি সময় যেন বনফুঁড়ে এক বলিষ্ঠ মানুষের আবির্ভাব ঘটল। খাকির প্যাণ্ট পরণে গায়ে একটা মোটা কাপড়ের জামা, তাতে দুটো বুকপকেট। মাথায় ছোট ক'রে কাটা চুল। মুখের ওপর ফুটে আছে সুস্বাস্থ্য আর শক্তি। মানুষটা যে এ দেশীয় নয় তা বুঝতে দ্বিতীয় মুহূর্ত লাগে না। তার পেছনে দেশীয় মানুষটিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে উচ্চতায়। পেছনের লোকটির হাতে একটি বড় মাপের কাটারি। দীর্ঘকায় মানুষটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে অবাক ক'বে দিয়ে বললেন, আপনার কথাই কি আমাকে হরেন্দ্র বলেছিল? আমার মাহুত?

আমি আপন মাতৃভাষা শুনে অন্য সময় হলে নিশ্চয় থমকে যেতাম, এখন গেলাম না হরেন্দ্র মালাকারের নাম শুনে। জবাব দিলাম, তা হবে।

ভদ্রলোক গভীর বনে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। থেমে গেলেন, জানতে চাইলেন, বাড়ী ছিল কোথায়?

আমি এ প্রশ্নের জবাবে থেমে রইলাম। মনে মনে বললাম, এখানে! তাই তো জানি। প্রাণী হিসেবে জন্মেছি এই পৃথিবীতে অতএব বাসস্থান তো এখনও এই পৃথিবীই! জন্মের আগের প্রশ্ন ক'রলে তো জবাব দিতে পারব না। তাই থমকে রইলাম। আর ভদ্রলোক যেহেতু আমার চেয়ে বেশী বয়স্ক তাই বাচালতা হবার ভয়ে মনের কথাটি জানাতে পারলাম না।

ভদ্রলোক আপন প্রশ্ন থেকে সরে গিয়ে জানতে চাইলেন, এখানে কি ক'রে এলেন?

ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি। জানালাম। এবার আমার দিকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে ওঁর বোধহয় কোন মমতা হ'ল, বললেন, এ অবস্থা কেন?

আমি নিজের দিকে প্রথম তাকালাম। কিছু না বুঝে বললাম, কি অবস্থা?

দাড়ি গোঁফ তো কাটেনই নি—

ওটা আর হয়ে ওঠে না। দৈবাৎ কখনও কোন লোকালয়ে তেমন সুযোগ পেলে কয়েকবার কেটে ছিলাম। ফাদারের আশ্রয় ছাড়ার পর থেকে ওই যে ওরা প্রশ্রয় পেয়েছে এখন সমানে বেড়েই চলেছে। আমার ও নিয়ে কোন মাথা ব্যথাও নেই। আমার পানীয় জল ছাড়া আর কিছুতেই ভাগ বসায় না বলে আমি ওদের ওপর অসন্তুষ্টও নই।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন ক'রলেন, কোথায় থাকেন ?

ওই পাহাড়ে। জানালাম।

ও, ভদ্রলোক আপন মনেই যেন উচ্চারণ করলেন, তারপর বললেন, যদি অসুবিধে হয় আমার মিলে চলে আসবেন। কাঠ মিল এখানে একটাই আছে।

ভদ্রলোকের ব্যবহার আমার ভাল লেগেছিল তাই নিঃশব্দে মাথা নেড়ে অঙ্গীকার ক'রলাম। উনি আমাকে আরও বললেন, আমি আজ সাঙসাক চলে যাচ্ছি, পরশু ফিরে এলে দেখা হবে। হরেন্দ্র হয়ত আছে, না থাকলে অন্য যারা আছে তাদের বলবেন আমি থাকতে বলেছি।

ভদ্রলোকের অবারিত দাক্ষিণ্যে অভিভূত হ'লাম। আসলে হরেন্দ্র মানুষটিও ভাল, সে-ই তার মালিককে আমার কথা ভাল ভাবে বলেছে বলেই উনি আমাকে বনের মধ্যে দেখেই চিনলেন আর ব্যবহারও এমন সুন্দর ক'রলেন। কিন্তু ফাদার পিটার না হয় ধর্মযাজক ছিলেন, পরহিতব্রতীও। তিনি নিঃস্বার্থ ভাবেই আশ্রয় দিয়েছিলেন, গির্জার স্বার্থে হলেও হতে পারে এ ভদ্রলোক ব্যবসায়ী হয়েও কি সেই রকম নিঃস্বার্থে আশ্রয় দিতে চাইবেন ? অন্যথায় আমাকে কি উদ্দেশ্যে থাকতে দিতে চাইবেন ? আমাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না বুঝলে হয়ত নিমেষমাত্র অনুগ্রহ থাকবে না, এখনকার অনুকম্পা অবিলম্বেই খসে যাবে।

চোখের পলকে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। আমি আমার মত কন্দ গোটাতে লাগলাম। আমি তো আর ওনার কাছে যাচ্ছি না অযথা এসব চিন্তায় কি কাজ ? এই সময়টা অরণ্য নিঃশব্দ। এখানে পাখি কম বলে আমাদের দিকে ডুয়ার্সের অরণ্যে যে সারাদিন পাখির ডাক শোনা যায় এখানে সেই অবিরত কূজন অনুপস্থিত। এখানে মানুষ মাত্রেই ব্যাধ, তাই পাখিরা সদা শংকিত। তবু মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বর্ণময় মোরগ অথবা ঘুঘু। মোরগ কোন মানুষের চক্ষুগোচর হলে প্রাণ নিয়ে খুব কমই ফেরে আপন কুলায়। এক আমার মত নিরস্ত্র কেউ যদি দেখে তো স্বতন্ত্র নইলে তার বিনাশের জন্যে যদি একটা ঘণ্টা পাহাড়ে বনে ঘুরতে হয় তো সে শ্রম অক্লেশে সহ্য করে যে কোন ঘাতক। কাজেই এমন নিষ্ঠাবান ঘাতকদের বিচরণের মধ্যে চারণের সাহস সামান্যই পায় বনের প্রাণীরা। নির্জনতা তাই নিঃশব্দে গভীর।

সামান্য একটু শব্দে তাই সচকিত হয়ে উঠলাম, লক্ষ্য ক'রে দেখি অল্প নিচে ফাঁকা একটু জায়গায় একটা মেটে রঙের খরগোশ কিছু পাবার চেষ্টা ক'রছে। নিশ্চয় খাবার খুঁজছে ওটা, আমি এতগুলো কন্দ জোগাড় ক'রেছি এর মধ্যে চারটে দিলে বেচারী খেয়ে তৃপ্তি পেত। কিন্তু দিই কি ক'রে? এখন যদি ছুঁড়ে দিই তাহ'লে খাওয়া তো দূরের কথা প্রাণের ভয়েই পালাবে বেচারী। যাক তার চেয়ে আমি কিছু কন্দ এখানেই রেখে যাই ও যদি ঘুরতে ঘুরতে আসেবা অন্য কোন প্রাণী তো খেয়ে তৃপ্তি পাবে।

দিন বেশ আরামেই কাটছে। খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, বিনিময়ে কিছু কিছু জমি তৈরী ক'রে দিয়েছি ডিঙ্গিকে সেখানে খুব ভাল ভুট্টা ফলেছে প্রথম চাষ বলে। শীঘ্র একদিন ফসল পেকে ঘরে উঠবে। ডিঙ্গির ইচ্ছে ছিল ধান লাগাবে আমার অনুমান ছিল ধানের চেয়ে ভুট্টা ফলবে ভাল, সারা বছরের খাবার ভাবনা আর থাকবে না। এখন ডিঙ্গি খুশি। ওর খুশির ফলে আমার দিন আরও একটু ভাল কাটছে। রাতে ক্ষেতের মধ্যেকার ছোট চালা ঘরেই একটা থাঙচাও সঙ্গে ক'রে শুয়ে থাকি হরিণ বা অন্য কোন প্রাণী এসে না ক্ষেত সাবাড় ক'রে সেই জন্যে। সকালে উঠে ঘরে আসি মুখ ধোয়া আর খাবার জন্যে। মাঝে মাঝে ডিঙ্গিও আমার সঙ্গে পাহারা ঘরেই রাত কাটায়, ও চলে আসে খুবই ভোরে।

এরই মধ্যে একদিন সকালে ফিরেই দেখি ডিঙ্গি একজন লোকের সঙ্গে খুব খুশি মনে গল্প ক'রছে। বিরাট এক বরাহের শরীরের পরিত্যাক্ত দেহাংশ পড়ে আছে চারিদিকে ছিটানো। রাতে কি তবে বিশেষ ভুরিভোজ হয়েছে? কে বা লোকটি? ডিঙ্গির সমস্ত মুখমণ্ডলে এমন এক উজ্জ্বলতা আজ ফুটে উঠেছে যে এমন জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ডিঙ্গির আজই প্রথম দেখলাম আমি। ব্যাপার কিছুই বুঝছি না বরং ডিঙ্গি আমাকে যে চেনে এমন ব্যবহার না করায় আমি বেশ অবাক হলাম। সে যেন লোকটিকে নিয়ে মেতে আছে। আমি হতভম্ব ভাব কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে যাব হঠাৎ লোকটি আমাকে প্রশ্ন ক'রল, কে তুমি?

তুমি কে? আমি প্রতিপ্রশ্ন ক'রতেই লোকটা অসম্ভব রেগে উঠে দাঁড়াল যেন আমাকে ধ্বংস করে ফেলবে। আমি সাবধান হলাম। সে আমাকে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস ক'রল, মানে? আমাকে জানতে চাস আমি কে? আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে!

ব্যাপারটা কেমন বেয়াড়া মনে হ'ল। ডিঙ্গিও দেখলাম এর মধ্যে মাথা না দিয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকে গেল, আমাকে যে চেনে এমন ভাব দেখাল না। তবে কি এখন আমাকে একাই পরিস্থিতি সামলাতে হবে? ডিঙ্গির কাছ থেকে কণা মাত্র সাহায্য পাওয়া যে যাবে না তা ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছি। অনুমান ক'রে নিলাম লোকটি ডিঙ্গির সেই স্বামী হতে পারে যে দীর্ঘদিন আগে ওকে ত্যাগ ক'রে গেছে অন্য একটি নারীর সঙ্গ করবার জন্যে। আর তারই প্রতি ডিঙ্গির এমন মরমী আচরণ?

আমি যে ওর এই গভীর নিঃসঙ্গতায় সঙ্গ দিলাম তার কি কোন দাম নেই ? কোনই অবদান নেই আমার এতদিনের এই নিবিড় অনুসঙ্গের ?

এখন আর আমার বিস্মিত হবারও অবকাশ নেই, খুবই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং ভুল সিদ্ধান্ত যে ফল দেবে তার রূপ আমার অদেখা হলেও অজানা নয়। লোকটার প্রকৃতি আমার সম্পূর্ণ অজানা, সামর্থেরও জানিনা পরিমাপ, প্রথম প্রত্যক্ষ ক'রে যা দেখছি তাতে আতংকিত হবার কারণ দেখি না। কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘকাল বাদে যে ওর প্রত্যাবর্তন অনুমানও অসাধ্য আমার। এখন আমাকে একমাত্র স্বীকৃতি যে দিতে পারত সে তো প্রথমেই আমাকে ত্যাগ ক'রেছে বলে মনে হচ্ছে। অতএব আমাকে একাই প্রতিরোধ ক'রতে হবে। তবে সে প্রতিরোধ আমাকে প্রতিষ্ঠা যে দেবেনা ডিঙ্গির কার্যক্রমে সে ব্যাপারে আমি নিঃসংশয়। লোকটি দৌড়ে ঘরে ঢুকল বোধহয় কোন অস্ত্রের খোঁজেই, কি যে ওর আছে আমি জানি না বলেই শংকিত হলাম কিন্তু এখন সরাসরি পিঠটান দেবারও কোন যুক্তি নেই। একটা খাণ্ডাও নাগাভূমির ঘর মাত্রেই থাকে যদি ওর লক্ষ্য থাকে সেই বস্তুটি তবে ওকে নৈরাশ্য নিয়ে ফিরতে হবে কারণ সেটি আজ আমারই হেফাজতে। যদি ওর নিজস্ব অস্ত্র কিছু থাকে যা রাতে ও ঘরে রেখেছে, মুস্কিল হবে তবেই।

ইতিমধ্যে আমাদের প্রতিবেশী শেনাচোবা এসে হাজির হ'তে আমি একটু জোর পেলাম। এই একটি লোক বসতিতে আছে যার যুক্তি বুদ্ধি বলে নিজস্ব কিছু আছে। অন্য সকলের মত আবেগ তাড়িত এবং কুসংস্কার চালিত নয় ছোকরাটি। তাছাড়া এই বসতির ওই একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে শহর বাজারের সংযোগ আছে। ও মাঝে মধ্যে ইস্কুল পর্যন্ত নাকি যায়। ফলে ওর দৃষ্টিভঙ্গীতে সামান্য কিছু ঔদার্যও আছে অন্যদের তুলনায়। আগন্তুক লোকটির তিরিক্ষি মেজাজ দেখে তাকেই প্রথম প্রশ্ন ক'রল, ব্যাপারটা কি ? রাগছ কেন এত ?

· লোকটির মেজাজ কিছু কমল না, সে বলল, রাগব না মানে ? আমার বাড়ীতে এই উটকো বিদেশী লোকটা এসে বলে আমি কে !

কাজটা অন্যায় হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে ওর বিশেষ দোষ নেই। ও তোমাকে চেনে না।

ও কে ?

পরিচয় জানি না আমিও তবে অনেকদিন ধরে দেখছি তোমার ছেলে মেয়েদের দেখা শোনা করে।

লোকটি এবার যেন দপ ক'রে জ্বলে উঠল বারুদে আগুন লাগার মত ক'রে। বলে উঠল, তার মানে ? আমার দিকে চেয়ে তেমনি স্বরে বলল, আমার বাড়ীতে তুই কার হুকুমে এসেছিস ?

ওর চিৎকার চেঁচামেচিতে ততক্ষণে বসতির অনেক বাসিন্দা এসে জুটে গেছে। এদের প্রকৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় প্রত্যক্ষ। তবে ওদের যে কি ভূমিকা হতে পারে সে ব্যাপারে অনুমান ক'রতে পারলাম না এই জন্যে যে ওদের সঙ্গে ডিঙ্গির প্রাক্তন মানুষের সম্পর্ক আমার অজানা। কিন্তু এদের গোষ্ঠীবদ্ধতার যে ইতিহাস প্রচলিত এবং আমিও তার স্বরূপ যতটুকু দেখেছি তাতে ওদের কাউকে যে আমার পক্ষে পাব না এটা খুবই স্বাভাবিক। শেনাচোবা এর মধ্যে ব্যতিক্রম। তবে সে যে কতদূর সাহায্য ক'রবে সে অনুমান না করাই ভাল। আর যে ড্যানিয়েল সম্বন্ধে আমার একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল সেই প্রথম কথা বলল, তোমার না থাকার সময় এ লোকটা এসেছে। ওকে এখনই তাড়াও।

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো স্বর একসঙ্গে শোনা গেল, এখনই তাড়াও।

আমি ওদের বিচারবুদ্ধি দেখে অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে ওরা একটিবারও ডিঙ্গিকে ছেড়ে চলে যাবার জন্যে লোকটাকে কিছুমাত্র বলছে না! তাছাড়া ডিঙ্গি যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে এ জন্যেও কিছু বলছে না তাকে। তা না বলুক, ওই লোকটিকে বলা উচিত। উল্টে আমার বিরুদ্ধেই উত্তেজিত ক'রে তুলছে ওকে। আমার বোধহয় আর থাকা উচিত নয়। এবার অবস্থা খুবই প্রতিকূল হয়ে উঠবে। কিন্তু অকস্মাৎ আমি যাই বা কি করে? মধ্যে থেকে একজন হঠাৎ বলে উঠল, ওকে বাঁধ। বেঁধে রেখে নিংথোর কাছে খবর দাও। বিচারে যা ব্যবস্থা হয় করা যাবে। এমনি ছাড়া হবে না।

এদের গোষ্ঠীপতি যাকে নিংথো বলা হয়, থাকে অন্য এক বসতিতে। এই পাহাড় পার হয়ে যেতে হয়। ব্যাপারটা একদমই অন্যদিকে চলে যাচ্ছে দেখে আমি বিশেষ সজাগ হলাম। শেনাচোবাকে লক্ষ্য ক'রে বললাম, বাঁধবার কোন দরকার নেই চল আমি নিজেই নিংথোর কাছে যাচ্ছি। আমি হলাম ওই রবি মহাজনের লোক, নিংথোকে বললেই চিনবে।

মহাজন!—শুনেই একটু থমকে গেল দু একজন।

হ্যাঁ। ওই যে কাঠমিল হাতি আছে যার।—আমার বিপদকালীন বুদ্ধি আমাকে সেই মানুষটির কথা বলবার নির্দেশ দিতে আমি তা কাজে লাগালাম। দেখলাম কিছুটা কাজ হ'ল, সকলের মধ্যে যে উগ্রভাব ফুটে উঠছিল তা কিছু প্রশমিত হ'ল। তারই মধ্যে একজন মহিলা ছোট মাপের একটা থাঙচাও নিয়ে আমাকে হঠাৎ কাটতে উঠল। আমি পলকে সরে গেলাম আত্মরক্ষা ক'রতে। শেনাচোবা তাকে থামাল। আমার ওপর মহিলার এত রাগের কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। এই মহিলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ আমার কোনদিনই নেই, থাকবার কথাও নয় কারণ আমার বাসস্থান থেকে কিছুটা দূরে এবং পাহাড়ের আড়ালটায় ওদের ঘর। দেখাও কদাচিৎ হয়। কাজেই আমার প্রতি ওর ক্রোধ অহেতুক ছাড়া

কি আর ভাবি।

মহিলার আক্রমণের প্রেরণায় অন্য যারা আমাকে বাঁধবার প্রস্তাব দিয়েছিল অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক—একজন মহিলার বীরত্বের কাছে কেউ কি পরাভব মানতে পারে? মহিলার থেকে পিছিয়ে থাকা তো পরাভবই! তাই ওদের একজন অন্য একজনকে নির্দেশ দিল, যা শীঘ্র লতা নিয়ে আয়। বাঁধ।

মধ্যপন্থীদের একজন বলল, তার কাজ নেই। ও নিজেই তো নিৎথোর কাছে যেতে চাইছে।

এইরকম কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে যখন উত্তেজনা কিছু প্রশমিত হয়ে আসছে এমনই সময় ডিঙ্গির পুরুষমানুষের পৌরুষ হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। লাফ দিয়ে উঠে সে মহিলাটির হাত থেকে থাঙচাওটা খুলে নিয়ে তুলে ধরল আমার মাথা লক্ষ্য ক'রে। আমি চট ক'রে সরে গেলাম। ও নিজেও একটা লাফ দিল মর্কটের মত। লাফ দেবার সেই ভঙ্গীটা এমনই অদ্ভুত ছিল যে আমার ওই গভীর প্রাণসংশয়ের মধ্যেও যেন হাসি পেল। হাসতে পারলে যেন কিছুটা মুক্ত হতাম। তা তো সেই সমূহ বিপদের মধ্যে সম্ভব ছিল না, তাই আমি আত্মরক্ষার চিন্তাতেই ব্যস্ত রইলাম। এখান থেকে বেঁচে এখন বেরিয়ে যাওয়া দরকার। ডিঙ্গির মত বেইমান মেয়েগুলোর যত আকর্ষণই থাক ওর কাছে আর মুহূর্তমাত্র নয়। কিন্তু পালাই কি ক'রে? দৌড়ে পালানোর চিন্তা নেহাৎই আত্মঘাত। এই পাহাড় অরণ্যে আমার চেয়ে দ্রুত দৌড়াবে ওরা অনেকে। তাছাড়া নানা রকম পাকদণ্ডী পথে চলাচলের অভিজ্ঞতা ওদের সাহায্য ক'রবে আমার আগে গিয়ে পথরোধ করবার।

এখন কৌশলই ভরসা। তা বলে এত লোকের সঙ্গে একার কৌশলই বা কি হতে পারে? আমার শেষ কৌশল তো প্রয়োগ ক'রেছি, সে ওই মহাজনের নাম। সেটাই একবার ভাল ক'রে প্রয়োগ করবার প্রয়াস পেলাম, কাঠের মহাজন কাল আমাকে বলেছেন এখানেই থাকতে। উনি এসে আমাকে সাঙসাক নিয়ে যাবেন।

না—ডিঙ্গির মানুষটা বলে উঠল, এখানে নয়। এখানে আমি কিছুতেই থাকতে দেব না।

তাহ'লে কোথায় থাকব? তিনি আমাকে নিয়ে নিৎথোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। এখানে পঞ্চাশটা খাংড়া গাছ কাটা হবে। তার টাকা নিৎথো বলেছে বসতির সকলকে ভাগ ক'রে দিতে। আমি না থাকলে টাকা ভাগ ক'রবে কে? টাকা তো আসবেই না।

এবার সকলেই যেন দমে গেল। শেনাচোবা বলল, খুব অসুবিধে হয় তো আমার বাড়ীতে থাকবে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হ'ল ডিঙির পুরুষের কথা, তার কি দরকার ? এক দুদিন আমাদের কাছেই থেকে যাক।

বন্ধু একজন জানতে চাইল, কতটাকা দাম হবে ?

মোট দাম হাজার দশ টাকা।

সব আমাদের ভাগ করে দেওয়া হবে ?

তাই তো কথা। আমাকে মহাজন যা বলেছে।

বেশ বেশ।

তবে থাক। পরেই যা হোক হবে।

একে একে সবাই সরে যেতেই লোকটি আমাকে এক পাত্র পানীয এনে অভ্যর্থনা ক'রল।

দুজনে যখন জমিয়ে বসেছি পাত্র প্রায় খালি হয়ে গেছে এমন সময় লোকটি জানতে চাইল, সত্যি অত টাকা দেবে মহাজন ? তুমি ঠিক বলছ, অত টাকা ?

তাই তো কথা। কোন গন্ডগোল না হ'লে ওই রকমই হবে বলে আমার জানা আছে।

তোমাকে মহাজন বলেছে ? মহাজন বলে থাকলে ঠিক হবে। অনেক গাছ কেটে রেখেছে মহাজন নুয়েঙ থাঙ, সাঙসাক, আরও অনেক জায়গায়।

তুমি কেমন করে জানলে ?

গৌরহরি বলে মহাজনের একজন মণিপুরী ট্রাক ড্রাইভার আছে। আমার সঙ্গে তার খুব খাতির। সে আমাকে বলেছে হাজার হাজার সেগুন গাছ মহাজন জঙ্গলের মধ্যে কেটে রেখেছে।

আমি সুযোগ পেয়ে বললাম, তবে তো তোমার জানাই আছে।

আছে—এক মুখ মদ এক সঙ্গে গিলে ফেলে মুখটা একটু কুঁচকে সে বলল, তবে সে সবই সেগুন গাছ। আমাদের এদিকে তো সেগুন গাছ নেই। সব খাংড়া ইয়াঙ্গো।

তার সংশয় দেখে বুঝলাম লোকটা চতুর। একেই বলে জাতে মাতাল তালে ঠিক। অতএব এর সঙ্গে বিশেষ সাবধান হয়েই কথা বলতে হবে। তাই সতর্ক হবার জন্যে পানে মনোনিবেশ করবার ভাণ করে নিঃশব্দ হলাম। ও কিন্তু আমাকে ছাড়ল না, বলল, যাই হোক তুমি নিশ্চয় আমার কথা মনে রাখবে। এতদিন আমার বাড়ীতে আছ, আমার জন্যে তুমি নিশ্চয় বলবে—

কথাটা পড়ামাত্র ডিঙি আমাকে চমকে দিয়ে বাইরে এসে আমাদের মধ্যে যেন লাফ দিয়ে পড়ল, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ইস্। আমার গ্রাম এটা। এখানে টাকা আমি পাব।

আমি যেন নতুন ডিঙিকে দেখলাম। আসলে মহিলা বহুরূপী। এরকম

মহিলারা দেখছি বিপদজনক। মনে মনে খুশিই হলাম, লাগে তো লাগুক, ওরা ঝগড়া ক'রলেই ভাল। ঝগড়া মারামারি যত পারে করুক ওরা, যদি মারামারি করে মরে একটা তো আরও ভাল। তবে ডিঙ্গি মরলে অবশ্যই নয়, প্রকৃতি যাকে এমন রূপ দিয়েছে তার এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়া মানে পৃথিবীরই লোকসান। তবে এই বদমাস লোকটা মরলেই ভাল। বরং এই হতভাগাটা মরলে কারও কোন ক্ষতিই হবে না, মধ্যে থেকে আমি খুশি হবো। এখানে থেকে যাব ডিঙ্গির কাছে।

পরক্ষণেই মনে হ'ল এই ডিঙ্গির কাছে—যে এমন বেইমান? আমি মৃত্যুর সীমানায় পেঁছে গেলাম অথচ যে আমাকে মুখের কথাটুকু পর্যন্ত বলে সাহায্য ক'রল না। তারই কাছে থাকতে চাইছি আমি। হ্যাঁ চাইছি। আমি যেহেতু একটা সামান্য কীটের উর্দ্ধে কিছু নই তাই ডিঙ্গির শরীরের প্রতি আমার অদম্য আকর্ষণ। ওর শরীরের সবটুকু সুখের প্রতি আমার দুর্নিবার আসক্তি। অস্বীকার ক'রে নিজের কাছে মিথ্যাচার করে কি লাভ? খাওয়া ঘুমানোর পর একটা জীবন্ত প্রাণীর জীবনে যা তৃতীয় প্রয়োজন তা হচ্ছে রমণ। সেজন্যে রমণীর প্রয়োজন আর রমণীর মধ্যে ডিঙ্গি একজন উত্তমা।

আমার ভাবনার সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে যে ঝগড়াটা বাড়বে তা হ'ল না বরং আমাকে সম্পূর্ণ হতাশ করে ডিঙ্গি আপন কোটরে গিয়ে ঢুকল। মানুষের মন এমনই এক দুরূহ রহস্যের দুর্গ যে তার হদিস কোনদিনই বেরোবে না। যে ডিঙ্গি আমার প্রতি এত অবৃতজ্ঞ সেই ডিঙ্গিই কিনা তার প্রতি অবিচার করা লোকটির প্রতি এত অনুরক্ত। যে লোক তার সঙ্গে চরম বেইমানী করেছে, তার অনুপম সৌন্দর্য আর দেহের অতুল বৈভবকে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষ ভাবেই তাকে ক'রেছে অপমান তারই প্রতি কি না এমন অনুরাগ ডিঙ্গির? এর চেযে বিস্ময়কর আর কি থাকতে পারে পৃথিবীতে! ডিঙ্গির মনের রহস্য উদঘাটনই বা কে ক'রবে?

কোন ক্রমে মিথ্যার মাধ্যমে সামলে নিয়েছি অবস্থাটা আপাততঃ আত্মরক্ষা ক'রেছি। আর আমার কাজ নেই ডিঙ্গির ঐশ্বর্যে, যা তার তা তার কাছেই থাক গচ্ছিত, আমার তাতে আর লোভ ক'রে কাজ নেই। এখনকার মত সেই মোরের কাঠ চেরাই কলেই গিয়ে আশ্রয় নিই, তাতে প্রাণটা অন্তত বাঁচবে। আমার মিথ্যা আর এদের সরলতার মধ্যে থেকে একটা জিনিষ আমি জানতে পেরেছি এরা ওই কাঠ কলের মালিককে যে কারণেই হোক সমীহ করে। কাজেই তাঁর আশ্রয়ে যদি এখন থাকি তো উনি চেষ্টা ক'রলে আমার কোন বিপদ এদের হাত থেকে হবে না। এখন একটা সরে পড়ার মত সুযোগ পাওয়া প্রয়োজন। আমাকে বেঁধে রাখবার কথা এদের তা না ক'রে ছেড়ে যে রেখেছে তার অর্থ আমি এদের নজরদারিতে ঘেরা। বেশ কিছুটা সময় না পেলে নিরাপদ দূরত্বে পেঁছে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই সময়ের জন্যে সজাগ থাকা এখন বিশেষ প্রয়োজন। ডিঙ্গির পুরুষ একটু অন্যমনস্ক

হতেই আমার পাত্র থেকে কিছুটা পানীয় ওর পাত্রে ঢেলে দিলাম। ও ততক্ষণে জমিয়ে গল্প বলছে আর আপন আনন্দেই হা হা ক'রে হাসছে মাঝে মাঝে। ডিঙ্গি সাংসারিক কাজে ব্যস্ত, এক একবার ঘরে ঢুকছে বেবোচ্ছে। এর মধ্যে কেবল একবারই সে আমার দিকে দেখে নিল কোন ভাবলেশহীন চোখে। ওর সঙ্গে আমি এই প্রথম মিথ্যাচার ক'রলাম নিজেকে নেশায় আচ্ছন্ন ভাব দেখিয়ে, ওকে প্রতারিত ক'রতে চাইলাম যাতে ও আমাকে পাহারা দেবার ব্যাপারে সজাগ না থাকে।

আমার সবচেয়ে ভুল হয়েছে থাওচাওটা থাওবুঙ-এ ফেলে আসা। এরা কখনও একাজটা করে না। সব সময় থাওচাও হাতে নিয়েই চলাফেরা করে। আমাকে এখন এতটা পথ বনের মধ্যে দিয়েই তো চলতে হবে, থাওচাও না থাকলে হাঁটবই বা কি করে? এ অঞ্চলের বনে সবচেয়ে বিপদজনক হ'ল কুকুবগুলো। বুনো কুকুর গুলো ওদের নজরের মধ্যে কাউকে পেলে নিঃশব্দে অনুসরণ করে। কোন মুহূর্তে যে লাফ দিয়ে পড়বে কয়েকটা একসঙ্গে তা যার ওপর পডবে সে অনুমানই ক'রতে পারবে না আগের মুহূর্তে। আর এক ভয় ভল্লুক। তবে এই অঞ্চলটুকুতে কম। দিনের বেলা তো যেমন করে হোক ফাঁকা পথ দিয়ে যেতে হবে। তাতে যদি একটু বেশী হাঁটতে হয় তো উপায় নেই।

নেশার চোটে একসময় ওর কথা থেমে গেল। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে ঝিমিয়ে পড়ল। আমি সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলাম যখন দেখলাম ডিঙ্গি বা ওর ছেলে পিলে সবাই এক সঙ্গে ঘরে ঢুকল আমি আর নিমেষ মাত্র দেরী না করে পাশের ইয়াঙ্গো গাছটার একটা ডাল ধরে মূল কাণ্ডে পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে গাছ বেয়ে প্রায় দুশো ফুট নিচে। এবার আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত। এপথ যে ধরব এ অনুমান ওরা ক'রতেই পারবে না। কিন্তু একটা শক্ত লাঠি জোগাড় করা প্রথম দরকার। লাঠি এই পাহাডেব পথে আমাকে পতন থেকে রক্ষা ক'রতে পারবে, লাঠিই এখন আমাকে সাহায্য ক'রবে প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষায়। বুনো কুকুর বা ভল্লুকের সামনে তো বটেই এ অঞ্চলের কালো কালো ছোট আকারের বাঘও যদি আসে তবে এই একটা লাঠি অকিঞ্চিতকর, তবু কিছু না থাকার চেয়ে যা হোক একটা থাকা ভাল বলেই লাঠির কথা ভাবা। কিন্তু তেমন একটা লাঠি পেতে হলেও তো কাটবার জন্যে ধারাল কিছু প্রয়োজন! সবচেয়ে উপযোগী হ'ল থাওচাও। আর সেটা থাকলে তো আর অন্য কিছু না থাকলেও চলত।

অনেক খুঁজে একটা শক্ত ডাল জোগাড় করে সেটিকে বাগিয়ে নিয়ে চললাম। আমার সঙ্গে কারও বিবাদ নেই সত্য কিন্তু অরণ্য প্রাণীমাত্রকেই বন্য প্রাণীমাত্রের ভয় খুব স্বাভাবিক—এই ভয়ের ব্যাপারটা দেখেছি পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদেরও সমভূমির মানুষদের প্রতি আছে—অবিশ্বাসের রূপে। আর সেই ভয় থেকেই তারা আক্রমণ করে বসে আত্মরক্ষার তাগিদে। যদিই দৈবাৎ তেমন বিপদ আসে লাঠিটাকে ততক্ষণ তো ব্যবহার করা যাবেই যতক্ষণ না এটার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ

ধারণা ক'রে নিতে পারে।

আমি যেহেতু দুর্বল তাই যতদূর সম্ভব সশব্দে চলাই বিধেয় মনে করলাম। লাঠিটা দিয়ে যেখানে সেখানে আঘাত করে শব্দ উৎপাদন ক'রে চললাম। হঠাৎ একটা ঝোপের ওপর আঘাত ক'রতেই একটা ধনেশ পাখি তার মধ্যে থেকে উড়ে পালাল এমন আকস্মিক ভাবে যে আমি তার পাখার আওয়াজে নিজেই চমকে উঠলাম। আমার আওয়াজ পেয়ে একটা ধূসর হরিণ শিশু একবার দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে দৌড়োল। ওকে দেখে আমার বিশেষ মায়া জাগল। ইচ্ছে হ'ল শিশুটিকে ধরবার চেষ্টা করি। ওর মা নিশ্চয় আশেপাশেই অন্যমনস্ক আছে নইলে বন্য শিশুরা কখনই একা বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না। অথবা হয়ত কোন ব্যাধের হাতে ওর মা সদ্য নিহত হয়েছে যার প্রতিক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ ভাবে পড়েনি বাচ্চাটির ওপর। কিন্তু ওকে নিয়েই বা কি ক'রব আমি? আমার নিজের থাকবার স্থানই নির্দিষ্ট নয় এখন পর্যন্ত, কি হবে ওকে নিয়ে নতুনতর কষ্টের মধ্যে ঢুকে। প্রকৃতির শিশু ও হয়ত প্রতিপালিত হয়ে যাবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই।

আর একটু এগোতেই দেখি বিরাট একটি কর্তিত বৃক্ষের প্রোথিত অংশ রক্তের মত লাল। দু' একদিন আগেই কেউ কেটে নিয়ে গেছে গাছটিকে, মনে হচ্ছে কাটা অংশে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আশেপাশেই হয়ত ঘর তৈরী ক'রছে কেউ। এখানকার পদ্ধতিই এই। একটা ঘর ক'রতে হ'লে একটা দুটো বা যে ক'টা ইচ্ছে গাছ কেটে ফেলে লোকে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশীই কেটে ফেলে, যা কাজে লাগে তার চেয়ে নষ্ট হয় বেশী।

আর কিছুদূর এগিয়ে বন পাতলা হয়ে গেল। বিশাল মহীরুহগুলো দূরে দূরে দাঁড়িয়ে—যেন আমাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে সতর্কতার সঙ্গে। আমি এখানটা এমন নিবৃক্ষ হবার কারণ বুঝলাম না। আগেও তো এপথে চলেছি কিন্তু এমন ফাঁকা জায়গা তো দেখিনি! তবে কি আমি পথ হারিয়েছি? ঠিক তাই, পথই হারিয়েছি আমি। এখন উপায়? পেছনে তাকিয়ে সন্ধান পেতে চাইলাম কোন দিক থেকে এসে পড়লাম। সেখান দিয়েই ফিরতে হবে। আসলে আমি যে প্রথমেই খানিকটা নেমে পড়েছিলাম সেটা ভুলে গিয়েই এই দুর্ঘটনা। এখন যে কোন জায়গায় সেই উচ্চতা অথবা কিছুটা বেশী উচ্চতা ফিরে পেতে হবে আমাকে তবেই আসল পথের হদিস পাব।

ছোট্ট একটা টিলার ওপরটা জুড়ে কাঠ চেরাই-এর কল বসেছে সদ্য। সামান্য আয়োজনে কোনরকমে কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেই কলের নিচে দিয়েই সমস্ত পূর্ব-মণিপুরের একমাত্র পাকা সড়ক—ইন্দোবর্মা রোড। সেই ইম্ফল থেকেই চড়াই উতরাই ভাঙতে ভাঙতে এতদূর এসে পড়েছে, যাচ্ছে আরও দূরে, বর্মার অভ্যন্তরে

কতদূরে কে জানে। চারিদিকের ঘন অরণ্যের মধ্যে ছায়াচ্ছন্ন পথটিকে পায়ের নিচেই চেনা যায় কেবল, সামান্য একটু দূরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি সেই রাস্তা থেকেই কাঠ কলে গিয়ে উঠলাম। আমাকে দেখে একজন ভদ্রলোক এমন অবাক চোখে দেখতে লাগলেন যেন কোন বিচিত্র প্রাণীর সন্ধান তিনি এইমাত্র পেলেন। লোকটির দেখবার ভঙ্গী এমন অদ্ভুত যে আমার ওঁকে ভেংচে উঠতে ইচ্ছে ক'রল। তেমনই মুখভঙ্গী সহকারে ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কি চাই ?

আমি যে হিন্দি ভাষা না জানতে পারি এমন কথা ভাবতে পারা উচিত ছিল লোকটির। আমি ওঁর ভাষার দৌড় দেখে বুঝলাম ব্যক্তিটি কি হওয়া সম্ভব। সেই অনুমান এবং আমার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে জবাব দিলাম, এই মিলের মালিকের কাছে এসেছি। তিনি আমাকে চেনেন।

এবার লোকটি ভ্রূকুঁচকে গেল। মনে হ'ল আমাকে বা আমার কথা কোন একটা ওঁর মনঃপূত হয়নি। সেই অবস্থাতেই বিস্ময় প্রকাশ ক'রলেন, মালিক! কে মালিক ? কিসের মালিক ?

এবার আমি হতচকিত হয়ে গেলাম, তবে কি আমার জানায় কোন ভুল আছে ? আত্ম সম্বরণ ক'রে সপ্রতিভ হবার চেষ্টার সঙ্গে বললাম, লম্বা মত একজন স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক—জঙ্গলে যাচ্ছিলেন, আমাকে বলেছিলেন এখানে এসে দেখা ক রতে।

কি ব্যাপার আমাকে বললেও চলতে পারে, উনি জানালেন।

কি বলব ভেবে পেলাম না। সত্যিই তো, কি যে ব্যাপার আমি নিজেই কি তা জানি ? তিনি আমাকে আসতে বলেছিলেন বললে যদি জানতে চায় কেন আসতে বলেছিলেন তা'হলে কি বলব ? কেন যে আসতে বলছিলেন তাও তো জানা হয়নি। আপাততঃ আমি নিজের গরজে এসেছি আশ্রয়ের জন্যে, যা মেজাজ দেখছি আমি ওকথা বললেই আমার রাস্তা দেখিয়ে দেবে লোকটি। তাই বললাম, তিনি আমাকে আসতে বলেছেন। ওঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রতে বলেছেন এখানেই।

অপ্রসন্ন স্বরে উনি বললেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

লাইজিং থেকে।—আমি জানাতে ভদ্রলোক কি ভেবে অভ্যর্থনা ক'রলেন, ওপরে গেলাম।

একটা অকিঞ্চিৎকর চালার নিচে মেসিন চলছে, পাশেই খক্ খক্ শব্দ ক'রে লিস্টন ইঞ্জিন চলছে মেসিন ঘুরিয়ে। তার পূব দিকে লম্বা লম্বা খাংড়া-ইয়াঙ্গো গাছ ফালি ফালি ক'রে রাখা আর পশ্চিম দিকে বড় মাপের প্রান্তরে একটা তেঁতুল গাছের তলায় অগুনতি ইয়াঙ্গো গাছ—কেটে এনে কাঠ হিসেবে ফেলা আছে। তার মল চারপাশে, হাতির দুর্গন্ধ আসছে এই পর্যন্ত। একটু আগে খাংড়াইয়াঙ্গো চেরাই-এর গন্ধ পাচ্ছিলাম যা মোটামুটি সুগন্ধই বলা চলে। তারপরই এই কটু গন্ধ সাময়িক অস্বস্তিতে ফেললেও সয়ে নিলাম। ভদ্রলোক একটি চেয়ার ধরনের আসবাবে

বুঝলাম ওটি ওখানে ছিল, আমি তার সামনেই একটি গোল গাছে বসলাম। বসাতে উনি এই অঞ্চলের ভূগোল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সেটি প্রমাণ ক'রে প্রশ্ন ক'রলেন, তোমাদের এলাকায় কত গাছ ফেলিং হয়েছে ?

একটাও নয়—জানালাম আন্দাজেই।

আমার কথা শুনেই যেন চমকালেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন, কি কাজ হচ্ছে তাহলে ওদিকে ?

এবার আমি কিছুটা অনুমান করে নিলম লোকটির বক্তব্য। সুযোগ নেবার জন্যে বললাম, আমাদের ওদিকে তো কোন কাজ সুরুই হয়নি। আমাকে বোধহয় উনি সেই জন্যই ডেকেছেন।

তা হবে—বলে একটু ভেবে স্বগতোক্তির মত বললেন, এইভাবে যে কি হবে! তারপরই আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের বসতিতে কত গাছ আছে ?

আন্দাজ নেই।

সব তো নাগা বসতি। তা তোমাকে তো নাগা বলে মনে হয় না!

কি মনে হয় ?

অসমিয়া বা বিহারী।

ভাবলাম একবার জানতে চাই যে কোনটি হলে ও'র বিশেষ কোন সুবিধে হয়, সংযত হলাম। এখন আমার নিরাপদ আশ্রয়ের একান্তই প্রয়োজন, এসময় কাউকেই বিরক্ত করা হবে নিবুদ্ধিতা। অতটা বোকা হ'তে চাইলাম না বলে বললাম, কোনটাই নয়। তবে বিহারী বলতে পারেন।

ঠিক আছে—উনি যেন স্বস্তি পেলেন। আর আমি ভদ্রলোকের মুখভঙ্গী দেখে বুঝলাম আমার প্রাথমিক বিপদ যা হোক কাটল।

এবং আমি রয়ে গেলাম। রবিবাবু পরের দিন বিকালে জঙ্গল থেকে ফিরলে কাজে বহাল হলাম। আমার কাজ হ'ল কাঠ চেরাই কলে মিস্ত্রিদের সঙ্গে কাঠ ঠেলে দেওয়া অথবা চেরাই কাঠ বয়ে নিয়ে গিয়ে সামান্য দূরে থাক দেওয়া। এর বেশী আর কি বা আমার যোগ্যতার পক্ষে সম্ভব ? একটা মানুষ শুধু হাতে পায়ে প্রমাণ সাইজের হলেই তো হয় না, আধুনিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যেক কাজের জন্যেই চাই দক্ষতা, তার জন্যে যথাযথ শিক্ষা যাকে ইংরেজরা বলে ট্রেনিং। যে আমি কখনও কোন কাজ করিনি তার জন্যে এর চেয়ে সহজ আর কোন কাজ সৃষ্টি হতে পারে। তবু রবিবাবু যে আমার মত অজ্ঞাতকুলশীলকে বহাল করলেন সে-ই তাঁর যথেষ্ট ঔদার্য। আমি ও'র ব্যক্তিগত ব্যবহারে মুগ্ধ হ'লাম। ও'র মধ্যে মায়াময় কঠোরতা লক্ষ্য ক'রলাম। কাজের সময় দারুণ কঠোর, কিন্তু কখনও রুক্ষ নয়। ভোর হলেই আমাদের উঠে পড়তে হবে সে ব্যাপারে কোন আপোষ নেই তবে লক্ষ্য রাখতেন বেশী পরিশ্রম কখনও হয়ে যাচ্ছে কিনা বা বেশী চাপ পড়ে যাচ্ছে কিনা।

যা সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সে রকম দেখলেই উনি বলে উঠবেন, থাক থাক। তুমি এখন ছাড়। ও কাজটা আবার পরে হবে।

একসময় ও'র দেশ ছিল পূর্ববাংলার শ্রীহট্টে, পিতৃপুরুষের ভিটে। মাঝে মাঝে বাচনিক শব্দে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ত আমাকে স্বদেশজ মনে ক'রে ; বলে উঠতেন, খাইছাল নি ?

কাছাকাছি সময়ে খেয়ে থাকলে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতাম, নইলে না। বয়সে উনি কিছুটা বড় ঠিকই কিন্তু প্রকৃত বড় সামাজিক অবস্থানে, সেই সুবাদেই নিম্নগামী স্নেহ এসে পড়ত আমাদের সমস্ত সহকর্মীদের ওপর। চারজন তেলেগু মিস্ত্রিকে কলকাতা থেকে জোগাড় করে নিয়ে গিয়ে সদ্য খুলেছেন ওই চেরাই কল আর যে ভদ্রলোক প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রছিলেন পরে জেনেছি তিনি ও'র অর্থ যোগানদার। তাঁকেও উনি কলকাতা থেকে এনেছেন ব্যবসায়ে অর্থ যোগানের জন্য অংশীদার করে।

দীর্ঘ অনভ্যাসের জন্যে এমনিতে কোন কাজ ক'রতেই আমার কষ্ট তাছাড়া আরও কষ্টকর এই অতিপরিশ্রমের কাজ। সদ্য কাটা গাছের কাঠ ভিজে এবং অসম্ভব ভারী, এমনিতেই ভারী খাংড় ইয়াঙ্গো তাই সরাতে সরাতে আমার সারা গায়ে ব্যথা হয়ে যায়। সন্ধেবেলায় খোলা আকাশের নিচেই কিছুক্ষণ শুয়ে পড়ি মিল বন্ধ হলে। চারদিক চিরমুক্ত এই টিলার ওপরে ইঞ্জিনের ঘুক্ ঘুক্ আর চেরাইকলের সাঁই সাঁই শব্দ খুব একটা বেশী না হলেও তা যে শরীরে ছাপ ফেলে তা বেশ বুঝতে পারি মিল থেমে গেলে। তখন নিঃশব্দতা বেশ আরাম দেয়, তৃপ্তি হয়। মিস্ত্রিদের সঙ্গে খেতে গিয়ে দীর্ঘকাল বাদে মুখ বদল হয়। পুরানো জীবনে ফিরে আসি যেন। ওদের তো সামান্য ডাল আর ভাত, তবু সেই ডাল অমৃতের স্বাদ। তাতে পরিচিত মশলার স্বাদ। ভাতের মধ্যে আলু সেদ্ধ ক'রে নিয়ে তেল লবণ আর সামান্য কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মেখে নিলে যে কি স্বাদু খাদ্য হ'তে পারে তাও যেন ভুলেই ছিলাম এতদিন।

তবুও যেন আমি ভেতরে ভেতরে খুবই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিলাম। এই নিয়মতান্ত্রিক বাঁধাধরা জীবনের একঘেয়েমী অসহ্য হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। অবশ্য জীবনটা তো সবসময়ই একঘেয়েমী, এর বৈচিত্র্য কোথায় ? তাই ছুটির দিনে বৈচিত্রের সন্ধানে নেমে পড়ি আমার আপাত বাসস্থান কাঠকলের টিলা থেকে। নামলেই রাজপথ, সেই পূর্বগামী পথ অদূরে সীমান্তের দিকে চলে গেছে তার অনেক আগেই একটা কাঠের সাঁকো যা আমাদের এই পাহাড় চূড়ার পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী খুজাইলকের ওপর দিয়ে পথের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা ক'রছে। অর্থাৎ আমাদের মিল থেকে নেমে পথে পা দেবার পরই চার পা চলে সেতু, সেতুর ওপর দিয়ে কয়েক পা হাঁটলেই মোরেহ বাজার। এ বাজারের বিচিত্রতা এই যে

সকালের দিকে কখনই সম্পূর্ণ হয় না। সন্ধ্যায় বাজার বসে জমাট হয়ে। চারপাশ থেকে নানা জাতের পসারিণীরা নানারকম পণ্য আনে গুছিয়ে, সাজিয়ে বসে সামান্য বড় জাতের পেটচেরা শুকনো মাছ, ছোট ছোট শুকনো মাছ গোটা, গোটা মানকচু, তেঁতুল, নানা রকম শাকপাতা, লবণ, লংকা, খাদ্যতেল, মায় কেরোসিন তেলও সাজানো থাকে বিকিকিনির মেলায় স্বদেশিনী পসরার মধ্যে। আমার কিছু কেনবার থাকে না কিন্তু ওই স্বল্পায়তন বাজারে ঘুরতে ভাল লাগে। বিকালের বাজারে সব মানুষই বেরিয়ে আসে বলে মনে হয়। তথাকথিত ভদ্রলোক বলে পরিচিত যে কটি অর্থবান লোকের দামী পোষাকপরা স্ত্রীলোক এই সামান্য জনপদে থাকে সবাই এই সময়টা বাইরে আসে বাজার করার সূত্র ধরে বেড়াতে। তাদের দেখে বুঝি যে সভ্যতার নাম ধরে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বিলাসের অনুপ্রবেশ ঘটছে এই আরণ্য গ্রামেও।

বাজার পেরিয়ে আমি রাজপথ ধরেই হাঁটতে থাকি দুপাশের ঘন অরণ্যের মায়াময় পরিসর ধরে। একটু গেলেই ছোট্ট নতুন পুলিশ চৌকি বসেছে—থানা। ওটা পেরোলেই নতুন বসতি সব নাগাদের। নদীর ধার ঘেঁষে যেমন ভারতবর্ষের পুরাতন সব শহর, পথের দুধারে তেমনি ভাবেই নাগা বাসিন্দারা ঘর গড়ে তুলেছে। চারিধার থেকে মানুষ ধীরে ধীরে এখানে এসে জমছে। এর মধ্যে একজন শীর্ণ কৃষ্ণকায় মানুষকে দেখে একদিন চমকেই উঠলাম। ওকে এখানে মেলে না। বহিরাগতরা সকলেই অর্থসফল, সার্থকতার দ্যুতি উজ্জ্বল হয়ে আছে মুখে চোখের ওপরে, সেক্ষেত্রে এই মানুষটি ম্লান। দেখি একা ক্লান্ত ভাবে চলাচল করেন এই এলাকাটুকুতে। নাগা বসতির মধ্যে বোধহয় কোথাও বাস। চেকলুঙ্গি আর সাধারণ সার্ট সবসময় পরণে থাকলেও অন্য সাধারণের মধ্যে মিশে থাকার পথ নেই মানুষটির। দক্ষিণ ভারতীয় বলে ভ্রম কখনও হ'তে পারে চেহারার সাজুয্যে, তবে তা যে উনি নন সত্য উদ্ঘাটন হয়ে গেল একদিন আকস্মিক ভাবেই। ভদ্রলোক রবিবাবুর কাছে এসে যখন কথা বলছিলেন তখন শুনতে পেলাম দুজনে একই গ্রামীণ ভাষায় কথা বলছেন সম্পূর্ণ শ্রীহট্টের উচ্চারণে। তারপর থেকেই আমার আগ্রহ হ'ল ও'কে জানবার, কোথায় থাকেন কি করেন অনেক জিজ্ঞাসাই মনের মধ্যে অকারণে তোলপাড় ক'রতে লাগল ক'দিন।

এরই মধ্যে একদিন রবিবাবু আমাকে বললেন, শুনলাম তুমি নাকি ওষুধপত্তর জান?

কে বলল?

আপুপানা। তাদের অসুখ ক'রলে তুমিই নাকি ওষুধ দাও!—ভদ্রলোকের কথায় প্রশ্ন কিন্তু বিস্ময়ও তাতে সামান্য পরিমাণে মেশানো। আমি বাধ্য হয়েই বললাম, অল্প কিছু জানি।

কি ক'রে শিখলে ?

এক পাদ্রীর কাছে কিছুদিন কাজ ক'রেছিলাম এক গির্জায়। সেখানে ওষুধপত্র দেওয়া হ'ত—

ভালই হ'ল। এখানে এই একটা বিরাট সমস্যা। সামান্য ওষুধ পর্যন্ত তম্মু থেকে আনতে হয়। তাও সেখানে ওষুধের দোকানে গিয়ে রোগীর কি হয়েছে বলে ওষুধ কিনে আনতে হয় এমনি অবস্থা। জঙ্গলে হাতির মাহুতের অসুখ হয়েছে মাখনবাবুকে বলে দিচ্ছি তুমি ওনার সঙ্গে তম্মু গিয়ে মাহুতের জন্যে ওষুধ নিয়ে এস। একবার চিনে এলে একাই যেতে পারবে।—পূবদিকে আঙ্গুল নির্দেশ ক'রে বনজঙ্গলের ফাঁকে কি যে দেখালেন উনিই জানেন, বললেন, ওই যে টিনের বাড়ীটা দেখছ, ওটাই তম্মু।

আমি কিছুই দেখলাম না, ভালমন্দ কিছু বললামও না। আজ তাহলে কাঠ টানতে হবে না বলেই খুশি এল মনে। আর যে কাজের দায়িত্ব পড়ল সেটিও মনের মত। বেশ কিছুটা নতুন এলাকা ঘুরে দেখা যাবে। উনি এরপর বললেন, মাখনবাবুর কাছে টাকা থাকবে তুমি যদি পর সাধারণত যে সব অসুখ হয় তার জন্যে কিছু ওষুধও কিনে আনবে।

পথে নেমেই মাখনবাবু অর্থাৎ সেই শীর্ণকায় মানুষটি বললেন, আপনাকে দেখে তো আমি মাদ্রাজী মনে করেছিলাম।

ভদ্রলোক যে আমাকে আপনি সম্ভাষণ ক'রলেন সেটাই ভাল লাগল। প্রীত হয়ে মন খুলে দিলাম, আমিও আপনাকে নিয়ে গবেষণা কম করিনি। কেন কে জানে অনেক মানুষের মধ্যে আপনাকেই আলাদা ক'রে ভাবতে ইচ্ছা হয়। জানতে চাইলাম।

আমাদের মালিকের সঙ্গে আপনার অনেকদিনের চেনা ?

পরিচয় এখানেই তবে রবিবাবু আমাদের আত্মীয়।

অনেকে যেমন বড় মানুষের আত্মীয়তা শ্লাঘার বিষয় গণ্য করে মাখনবাবুর কথাও আমার তেমনই মনে হ'ল। ঘোর কালো ভদ্রলোকের গায়ের রঙ, রোগা পাকানো চেহারা, মুখের ওপর একটা হতশ্রী ভাব—সব মিলিয়ে এঁকে আমার কোনভাবেই রবিবাবুর আত্মীয় বলে ভাবতে ইচ্ছে হ'ল না।

আমরা দুজনে পথ ছেড়ে গভীর বনের মধ্যে নেমে পড়লাম। ক্রমান্বয়ে অসংখ্য বৃক্ষ আমাদের ঘিরে ধরতে লাগল। সেগুনের অজস্র চারা জড়িয়ে যেতে লাগল পায়ে পায়ে। পাশেপাশে দীর্ঘ সেগুন, দীঘল ইউ-কেনিয়ান, পিণ্ডকাড়ুও বেশ দুচারটে মধ্যে মধ্যে আপন আনন্দে মেতে আছে যেন। আরও অজস্র গাছ—সব চিনিও না নজর দেবারও সময় নেই। এখন আমাদের সামনে শুধু যাত্রা, পথ খুঁজে খুঁজে চলা। এই রকম অযত্নবর্দ্ধিত আদিম অরণ্যে দিক ঠিক রাখা এক

দারুণ সমস্যা। আমি তো ঠিক জানিও না কোন দিকে এখন যেতে হবে কারণ অরণ্যের মধ্যে সামান্য কিছুটা এগিয়েই আমি নিশানা ভুলেছি। এর চেয়ে অনেক দুর্গম অরণ্যেও চলেছি কিন্তু কখনই আমার দিক ঠিক রাখার দায় বিশেষ ছিল না। এবারও সে দায় মাখনবাবুর ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝেই গাছেরা ঘন হয়ে ঘিরছে আমাদের, আমরা তাদের বেষ্টন থেকে মুক্ত হচ্ছি বেশ কষ্টে।

আমি কি একটা বলতে যেতেই মাখনবাবু আমাকে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা ক'রে চুপ করালেন। অজানা বিজনে এই বিজুবনে ও'কে অনুসরণ করাই সঙ্গত বিবেচনায় চুপ করে চলতে লাগলাম। অল্পক্ষণ বাদেই আমাদের সামনে একটু দূরে দিয়ে কালো কি একটা ছোট জানোয়ার সাঁৎ করে দৌড়ে গেল চোখের পলকে। আমি তাকে ভাল করে চেনবার পর্যন্ত অবকাশ পেলাম না। মাখনবাবু আমার হাতটা ধরে একটা গাছের গায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রায় লেপ্টে। আমি ও'র গা ঘেঁষে রইলাম। অল্পক্ষণ বাদে উনি খুব সাবধানেই চলতে সুরু ক'রলেন। আমি অনুসরণ ক'রলাম। কিছুটা পথ চলেই ডানদিকে ঘুরে হঠাৎ দেখি একটা লম্বা সদ্য টাঙ্গানো সাইনবোর্ড তাতে লেখা 'টেরিটোরি অফ বর্মা'—অর্থাৎ ব্রহ্মদেশের এলাকায় পা দিতে যাচ্ছি—সতর্কীকরণ। এ আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। বনে সেই জগতের বাসিন্দারা থাকে কেউ হিংস্র হয় কেউ অহিংস কিন্তু তারা কেউ কখনও এমনভাবে শাসায় না। মনে ভয় নিয়ে সেই শাসানি উপেক্ষা ক'রে আর কিছুদূরে যেতেই পড়ল নদী। তার ওপারে বন বেশ হালকা। আর সেই হালকা বনের মধ্যেই একটা ঘাটে ক'জন মহিলা স্নানে বা কাপড় ধোয়ায় ব্যস্ত। মাখনবাবু বললেন, যাক পৌঁছে গেলাম। কে যে বাঘটাকে তাড়া ক'রেছিল বুঝলাম না। অন্য কোন বড় জানোয়ারে তাড়া ক'রলে বাঘ ওভাবে ছুটত না, নিশ্চয় মানুষ।

বাঘ! কোথায় বাঘ? আমি বেশ অবাক হলাম।

কেন? দৌড়ে পালাল দেখলেন না?

ওটা তো ভল্লুকের মত কালো কি একটা জানোয়ার!

এখানের বনে কালো বাঘ কখনও চোখে পড়ে নি? ওটা বাঘ।

মানুষ কোত্থেকে আসবে?

কিছুই জানেন না দেখছি। এই জঙ্গলে দুনিয়ার ডাকাত থাকে। মারাত্মক সব চোর ডাকাত লুকিয়ে থাকে এখানে। তাদের কেউ নিশ্চয় ওটাকে তেড়েছিল। আমাদের ভাগ্য ভাল যে তাদের সামনে পড়িনি। ওদের চোখে পড়লেই সব কেড়ে নিত। ওদের ইমিগ্রেসান অফিসারও আজ নেই।

আমাদের দুজনকে দেখে কিনা কে জানে স্নানরতা মেয়েদের সে কি কলধ্বনির মত হাসি। নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলিও ক'রল ওরা। মাখনবাবু অস্ফুট

উচ্চারণে কি যেন বললেন আমিও স্পষ্ট শুনতে পেলাম না। ঘাট থেকে পাথুরে পথ বেয়ে ওপরে উঠে জানতে চাইলাম, কি বলছিলেন ?

আপনাকে দেখে ঠাট্টা ক'রল। ইচ্ছে ছিল কিছু বলি, সামলে নিলাম।

ওরা তো বর্মী ?

ছিনু। ছিন বর্মার একরকম জাতি।--প্রসঙ্গ বদলে উনি বললেন, এখানকার ডাকঘরে বাঙ্গালী এক ভদ্রলোক পোস্ট মাস্টার ছিলেন। এখনও আছেন কিনা কে জানে ?

আমি এদিকের ঘরবাড়ী দেখছিলাম। একটু অন্য রকম, মাটি থেকে উঁচু পাটাতনের ওপর কাঠের মেঝে ; একটার ভেতরে উঁকি মেরে দেখলাম বেশ সাজানো। মাঝে মাঝে দুচারটে চার চালা ঘরের বাড়ীর পাশ দিয়ে কাঁচা পথ কোথাও কিছুটা উঁচু কোথাও বা সমতল। চলতে চলতে অমনি একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন মাখনবাবু আমাকে ঢোকবার ইসারা ক'রে। পেছনে গিয়ে দেখি সদর পেরিয়েই একটা কাঁচা উঠোনে চাঁপা গাছের তলায় বসে একজন মহিলা আর একজন পুরুষ কাঠের আগুনে কেটলিতে কি যেন গরম ক'রে কলাই এর কাপে ঢেলে খাচ্ছে। দেখে আমার বার্লির মত মনে হ'ল। মাখনবাবুকে দেখেই মহিলা হেসে উচ্ছ্বসিত হ'ল। সঙ্গের পুরুষটিকে কি বলতেই মাখনবাবুও ওদের ভাষাতেই কিছু বললেন। পুরুষটি নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ঘর থেকে দুটো হরিণের চামড়া মোড়া বাঁশের গোলাকৃতি মোড়া এনে দিল। মাখনবাবু আমাকে বললেন, একটু বসুন।

চোখের পলকে গৃহস্থ পুরুষটি আমার আর মাখনবাবুর সামনে একটা ছোট্ট কলাই-এর হাতলছাড়া কাপে তাদের ওই প্রায় স্বচ্ছ তরল পানীয় কেটলি থেকে ঢেলে দিল। মাখনবাবু তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিতে আমিও পান করতে আরম্ভ ক'রলাম। তিনজনে মিলে গল্পে মেতে রইলেন আমি রইলাম একা নিঃশব্দে বসে। অবশ্য অল্পক্ষণ বাদেই মাখনবাবু উঠলেন।

হরেক রকম জিনিষের মধ্যে দেখলাম সবই বিদেশী। বেশ ক'টা ভাল বিদেশী ওষুধও পাওয়া গেল আর আমি মোটামুটি ভাবে কম্পোজিশান দেখে জ্বর পেটের গোলমাল প্রভৃতি ব্যাপারের জন্যে কিছু ওষুধ কিনে নিলাম, মাহুতের রোগের বিবরণ যা শুনেছিলাম তার জন্যে আমার জ্ঞান ও ওষুধ বিক্রেতাদের ধারণা মিশিয়ে দোভাষী মাখনবাবুর সাহায্যে কিনে ফেরবার পথ ধরলাম।

যেই সেই নদীর কাছে এসেছি অমনি একজন লোক আমাদের উদ্দেশ্যে কি যেন বলল। মাখনবাবু তার কথা ধরে জবাব দিয়ে আরও কিছু জেনে নিলেন বলে মনে হ'ল। তারপরই উনি যেন ভেবে কিছু একটা স্থির ক'রতে পেরেছেন এমনি ভাবে বললেন, চলুন নেমে পড়ি। একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলবেন।

হঠাৎ ?

হ্যাঁ হঠাৎই শুনলাম এদের পুলিশ নেমে পড়েছে। খুব সাবধানে যেতে হবে কারণ একবার ধরলে জীবন শেষ।

আমাদের দুজনের হাতের ওষুধের পোঁটলা দুটো লুকোবার তো কোনই উপায় নেই, তাছাড়া লুকোতে তো হবে দুটো গোটা মানুষকেই, সেখানে ওষুধের পোঁটলা তো সামান্যই ব্যাপার। মাখনবাবু বললেন, আজ কপালে দুর্ভোগ আছে বোঝা যাচ্ছে। এতটা পথ কিভাবে যে পার হবো! এক কাজ করুণ একটু আলাদা থাকবার চেষ্টা ক'রবেন আর কোন শব্দ শুনলেই বসে পড়বেন। যদি তেমন সন্দেহ হয় তো হামাগুড়ি দিয়ে চলবেন।

এতটা পথ!

উপায় নেই। নয়ত আজ এখানেই থাকতে হবে। তবে ক'দিন যে ওরা থাকবে তার তো ঠিক নেই। কাজেই চলে যাবার চেষ্টা করাই ভাল।

আমার কোনই প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না এই ঘটনায়। সঙ্গে ওষুধগুলো না থাকলে ভাল হত, ধরা পড়লে বেশ কিছুদিন ব্রহ্মদেশ ঘুরে আসা যেত ওদের বন্দী হয়ে। মুস্কিল ছিল ওরা কোন কথা বুঝতও না আমিও পারতাম না ওদের কথা বুঝতে, তাতে না হয় জেল আরও দিন কয়েক বেশী হবে। কিন্তু ধরা পড়লে ওষুধগুলো যে মাখনবাবুকে দিয়ে দেব সে উপায়ও তো নেই। হরেন্দ্র মালাকারকে মনে পড়ল উপকারী মানুষটি অসুস্থ হয়ে আছে ওর চিকিৎসা অত্যন্তই জরুরী। যে ক'রেই হোক আমাকে ওষুধ নিয়ে ফিরতে হবে, মালিকের কাছে অনুমতি নিয়ে হরেন্দ্রকে ওষুধ পেঁছাতে যাব আমি।

ততক্ষণে বনের মধ্যে ঢুকেই পড়েছি, মাথানিচু ক'রে কাছাকাছিই হাঁটছি দুজনে। অকস্মাৎ কানে গেল একটা হুংকার, ভাষা দুর্বোধ্য হলেও ওটা যে কোন হুকুমদারের গর্জন এ বেশ সুন্দর বোঝা গেল। আমরা দুজনেই গুড়ি মেরে বসে পড়লাম। মাথার ওপরেও ঝোপঝাড়, হঠাৎ শুনলাম সাঁই ক'রে একটা বুলেট ওপর দিয়ে ছুটে গেল। আন্দাজেই গুলি চালিয়েছে কোন প্রতিহারী। তবে কি আমাদের উপস্থিতিই টের পেয়েছে না আরও লোক আছে? এমনও হয়ত হতে পারে ওরা কোন পলাতক আসামীর খোঁজে তল্লাসী ক'রছে এই সীমান্তের অরণ্যে! সেক্ষেত্রে আমাদের ধরা পড়ার অর্থ জীবন শেষ। বেচারী হরেন্দ্রেরও হয়ত। আমাদের যা হবার তা তো পরে হবে, হরেন্দ্র মারা যাবে বিনা চিকিৎসায়।

আমাদের কিছুটা দূর দিয়ে ভারী কয়েকটি পা ঝরাপাতা মাড়িয়ে ঝোপঝাড় ভেদ করে চলে গেল শব্দ পেলাম। তবু স্থির হয়ে বসে রইলাম আমরা। ওরা ডানদিকে গেল যেদিকে গুলিটা ছুটে গেছে। শব্দ থেমে যেতে ওষুধের পোঁট অতিকষ্টে দাঁতে কামড়ে আমরা এমন ভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম যেন কোন ছোট গাছ আমাদের গায়ের ধাক্কায় না নড়ে। পাথরের ওপর দিয়ে এভাবে চলতে সামান্যতেই

হাঁটুতে ব্যথা হয়ে গেল। কয়েক মিটার বোধ হয় চলেছি আর পারা গেল না। বসে পড়তে হল। মাখনবাবুর অবস্থা সেই রকম।

আমরা ফিরে আসতেই একজন মহিলা আমাকে কাঠমিলের সদরেই ধরল, আমাকে একটা ওষুধ দাও।

অবাক হয়ে গেলাম মহিলার প্রস্তাবে। আমার কাছে ওষুধ আছে কেমন করে ও জানল? জানতে চাইলাম, আমি কি ওষুধ দেব? মিলমালিকের কাছে যাও তিনি দিলে দিতে পাবেন।

মিলে গিয়েছিলাম। মালিক ছিল, মিস্ত্রি বলল তুমি নাকি ওষুধ জান। একটা মেয়ের খুব অসুখ, ওষুধ দাও।

কি অসুখ?

তা তো জানি না!

বাঃ। কি ওষুধ দেব আমি?—বলেই পাহাড় ভেঙ্গে উঠতে লাগলাম কাঠ কলের এলাকার মধ্যে দিয়ে। রবিবাবুর সামনে পেঁাছে দেখি মেয়েটিও পেছনে। এ তো ভারী মুস্কিল! রবিবাবুকে বললাম, মাখনবাবু বাড়ী হয়ে আসছেন।

ওষুধ পেয়েছ? উনি জানতে চাইলেন।

পেয়েছি, আমি কিছু ওষুধ এনেছি যা সব সময় লাগে।

ভাল করেছ।

হঠাৎ পেছন থেকে মেয়েটি বলে উঠল, তুমি একটু বলে দাও বাবা। এক সঙ্গে দুজন মারা যাবে ওষুধ না দিলে।

ও, শোন তো মেয়েটি কি বলছে। এব কে রোগী আছে। একটু দেখে ওষুধ দিয়ে আসতে পারলে ভাল হত। মেয়েটা বহুবার আসছে।

মণিপুরী ভাষায় কথা বলছিল নাগা মেয়েটি। আমি জানতে চাইলাম, তোমার কার অসুখ?

একটা মেয়ের।

রবিবাবু অনেকটা ঝামেলা সরানোর জন্যেই বললেন, যাও যাও দেখে এস।

কি ওষুধ নিয়ে যাব বুঝতে পারছি না।

তুমি দেখে এস, ও এসে ওষুধ নিয়ে যাবে।

নিধিরাম সর্দারের মত শূন্য হাতেই অনুসরণ করলাম মহিলাকে। কি হয়েছে চোখে দেখে কি তা বোঝা সম্ভব? সে বৈদ্য কি আর আমি? শুনেছি মহান জ্ঞানী সে সব বৈদ্য একসময় ছিলেন যাঁরা শুধু অনুভবে রোগ নির্ণয় ক'রতে পারতেন। আমি তো অনধীত বিদ্যায় আধপন্ডিত, কাজেই আমার দায়িত্বহীন নির্দেশ ক্ষতিকারক না হয় দেখার খালি ওইটুকুই। আমি এ অঞ্চলে আসবার

আগে অসংখ্য লোক যদি আরোগ্য হয়ে থাকে তবে সেই আয়ুবলেই যদি ওর রোগিণীর নিরাময় হবার থাকে তো হবে, নিদানকাল আসন্ন হয়ে থাকলে বৃথা বদনাম না কুড়িয়ে বলব, ওষুধ নেই।

এইসব সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে নিয়ে কিছুটা চড়াই ঠেঙিয়ে ওর ছোট্ট কুটিরে পেঁছে চমকে উঠলাম। প্রশ্ন করলাম, এ তোমার কে হয় ?

কেউ নয়—নাগা মহিলা জানাল, এই পাহাড়টার ওপারে ও একাই থাকত, আমি চিনি। অসুখ হয়েছে বলে আমি আর হুইমিলা মিলে ওকে নিয়ে এসেছি। একা ওখানে তো বেঘোরে মারা যেত। তাছাড়া ওর পেটে বাচ্চা আছে।

শেষ কথাটায় আরও চমকে উঠলাম আমি। নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইলাম, ওর স্বামী নেই ? সঙ্গে কোন পুরুষ ?

মেয়েটা কোনদিন বলেনি, তবে শুনেছি একজন বিদেশীকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল, সেই লোকটা পালিয়েছে। ও একাই থাকত। নিচে বাজারে রোজই আসত, আমাদের সঙ্গে বাজারে কেনা বেচা ক'রত কখনও বলত না কিছু।

কথাগুলো শুনলাম জানলামও সব কিন্তু বিস্ময়ের এই যে প্রথম দেখার সামান্য চমক ছাড়া আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়া হ'ল না। প্রাণ কোন আধার পেলে প্রাণ হয়, প্রাণী মাত্রেই কোন না কোন আশ্রয় খুঁজে বেঁচে থাকে। প্রাণ আছে অথচ বিনা আশ্রয়ে বাঁচে সে একমাত্র বৃক্ষ। সে চিরনিরাশ্রয়, বরং আশ্রয়স্থল। তা জারোমথাঙ্গিও যে বেঁচে থাকবে এ তো স্বাভাবিক। আর এই অঞ্চলেই সে গড়ে নিয়েছিল তার আশ্রয়, তবে সঙ্গী নির্বাচন যে তার ভাল হয়নি সে কথা আমার চেয়ে বেশী কি আর জানতে পারে এই অসময়ের আশ্রয়দাত্রী ?

ওর পাশ ফিরে শুয়ে থাকা শীর্ণ শরীর দেখে বুঝলাম নতুন এক প্রাণকে ও ধারণ ক'রছে আপন শরীরের অভ্যন্তরে। এই মহিলাদের কাছে শুনে যা বুঝছি সেই প্রাণের বীজ বপন আমিই করেছি অথচ আমার নিঃশব্দ পলায়ন সত্ত্বেও ও সেই বীজকে বৃক্ষে পরিণত করবার বাসনায় ধরিত্রী হয়েছে। প্রথম থেকেই ওর কাজ-কর্মের ধারা দেখে বুঝেছিলাম ও একটু অদ্ভুত প্রকৃতির, আজ বুঝলাম অসাধারণ। ওই ক্ষীণ শরীরের মধ্যে যে মনোবল ও বহন করে সেটাও বিস্মিত হবার পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপন প্রাণধারণই যেখানে ওর সমূহ সমস্যার সেখানে আর এক জীবন সৃষ্টির সাহস বোধহয় রাখতে পারে মাত্র রমণীরাই। প্রকৃতির এই এক বিচিত্র প্রয়াস যে শারীরিক দিক থেকে দুর্বলতর ক'রে যে নারীদের সৃষ্টি ক'রেছে তাদেরই কাছে দিয়েছে দুর্জয় সাহস অথবা সহ্য করবার অদম্য চেতনা। গর্ভমোচনের মন্ত্রগুপ্তি এখানে কারও জানা নেই এমন কথা ভাববার কোন সঙ্গত কারণ নেই এই জন্যে যে, বিভিন্ন লতাপাতা জড়িবুটির প্রয়োগে এ অঞ্চলের বাসিন্দারা অতীব পারঙ্গম। অরণ্যের অজস্র বৃক্ষলতা অথবা গুল্মের গুণাগুণ

এদের জ্ঞানের আয়ত্তে, কাজেই অপগুণও অনায়ত্ত হবার কথা নয়। তার প্রয়োগ স্বচ্ছন্দেই ক'রতে পারত জারোমথাঙ্গি আপনাকে ভারমুক্ত করবার জন্যে!

হঠাৎ খুজ্রাইলকের জলের শব্দে চমকে উঠে দেখলাম আরও কয়েকটি রমণীর নিঃশব্দ আবির্ভাব ঘটে গেছে আমাকে ঘিরে, তারই মধ্যে এক চপলার স্বরে পাহাড়ী ঝরণার শব্দ। সেই যুবা কিশোরী বলছে, ওষুধ কিছু দেবে, না সব ভুল হয়ে যাচ্ছে?

আমার মনে ওর কথা শুনে সংশয় এল, হঠাৎ এই কথা কেন? ও কি আমাকে ওর পরিচয়ের মধ্যে পেয়েছে; অথবা জারোমথাঙ্গি কখনও এই সদ্যযুবতীর কাছে আপন মনের আগল খুলে দিয়েছিল তার দয়িতের বর্ণনা? সেই স্মৃতির পথে চিনছে আমাকে!

যে মহিলা আমাকে এনেছিল অনেক সাধনায় সে-ই কলধ্বনির জবাব দিল, ওকে দেখে ভুলবে কেন, বরং তোকে দেখে যদি ভুলে যায় তো যেতে পারে। তুই থাম।

আরও কিছু ছোট ছোট বাক্যের শব্দ আমার পেছনটায় ঘটতে লাগল, আমি জারোমথাঙ্গির কপালে হাত রাখলাম। দারুণ উষ্ণ ওর কপাল। জ্বর যে প্রবল এ তো সহজবোধ্য, আর কিছু আছে কিনা তা তো বুঝছি না! জ্বরই বা কোন জীবাণুজাত বিচার্য বিষয় এখন ওটাই। কিন্তু সে সব বোঝার কোন পথই এখানে নেই, কবে যে জ্বরটা হয়েছে তাও এরা জানে না। ব্যাধির গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধানও এদের পক্ষে অসম্ভব, অতএব আমার মত চিকিৎসকের আনুমানিক চিকিৎসাই এক্ষেত্রে সম্ভব, আমিও সদ্য আনা জ্বরের ওষুধ প্রয়োগ করা ছাড়া পথ পেলাম না তাতে যদি আয়ু থাকে তো বাঁচবে নইলে প্রতিনিয়ত অসংখ্য পোকামাকড় জীবজন্তু যে ভাবে প্রাণ রাখছে সেই ভাবেই পরলোক যাত্রা ক'রবে জারোমথাঙ্গি নামের মানুষ নামক এই প্রাণীটিও। তবে আমার ভরসা এই যে অসাধারণ কোন জ্বর না হলে এই ওষুধে কমবে। এই সঙ্গে আমার খেয়াল হল তমু তে আমি এই রকম অন্তর্বর্তী রমনীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী একটা ওষুধ দেখেছিলাম, অপ্রয়োজন বোধে আনিনি। ওর আশ্রয়দাত্রীকে বললাম, এর জন্য সদ্য যা দরকার সে ওষুধ আমি দিচ্ছি কিন্তু একটা ওষুধ তা থেকে আনতে পারলে কাজে লাগতে পারে যদি বেঁচে থাকে।

কি ওষুধ, আমরা তো চিনব না—মেয়েটি জানাল।

নামটা মনে ছিল, লিখে দেবার জন্যে কাগজ চাইতে ওরা অবাক হয়ে গেল। কাগজের বা লেখবার কোন যন্ত্রের নাম মাত্র ব্যবস্থা ওদের ঘরে অনুপস্থিত। বললাম, আনাতে পারবে? তাহ'লে চল ওষুধ নিতে মিলে তো মালিকের কাছে যাচ্ছ ওখানেই লিখে দেব।

আমাকে পরম বিস্ময়ের অতল খাদে ফেলে দিয়ে ওরা দুতিন জনে এক সঙ্গে

জানাল, আনাতে পারবে।

একদিন আমার যাত্রার সঙ্গী ছিল জারোমথাঙ্গি সে ছিল মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা, আর আজ ওর জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে যাত্রা যদি হয় তো সে যাত্রায় আমিই না হয় সাহায্য করলাম—ওষুধ দিতে দিতে এই কথাটাই মনে হ'ল আমার। তাই ওষুধ নিতে আসা মহিলা দুটিকে বললাম, আজ এখন একবার আর রাতে একবার ওষুধটা খাওয়াবার পর যদি দেখ সকালে সুস্থ আছে তবে তো এ ওষুধ নিশ্চয় খাওয়াবে আর যেটি লিখে দিলাম সেটা আনবে।

ওষুধ নিয়ে খুব খুশি হয়ে ওরা চলে গেল, দিয়ে আমি বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। ওর অবস্থা দেখে মমতা হল আমার। জীবন সম্পর্কে বড়ই আগ্রহী মেয়েটি। খেলার বলের মত ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে ঘুরতে ঘুরতেও স্থিতির কথা ভাবে, স্বপ্ন দেখে। আমি তো জন্ম মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়ানো এক উদ্দেশ্যহীন প্রাণমাত্র—আমার জয়পরাজয় বলে কিছু নেই, উন্নতি অবনতি বলে কিছু নেই, তাই উদ্দেশ্য নেই, বিশেষ আনন্দ বা বিশেষ বেদনা কিছুই নেই, সবই প্রাকৃতিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত। মধ্যবর্তী কালটুকুতে আশ্রয় হিসেবে রোদবৃষ্টি প্রভৃতি প্রতিকূলতা থেকে বাঁচাতে পারলে বৃক্ষতলও যা প্রাসাদও তাই। জারোমথাঙ্গির গর্ভসঞ্চার যদি আমার দ্বারাই হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে প্রাকৃতিক কারণেই, তাতে আমার আহ্লাদিত হবার কোন কারণই নেই বা হবার মূর্খতাও আমার নেই। আবার দুঃখবোধও নেই এই জন্যে যে এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, সৃষ্টির পদ্ধতি, সেক্ষেত্রে আমার দুঃখ পাবার কি কারণ থাকতে পারে? তাছাড়া এর মধ্যে জড়িয়ে আছে জারোমথাঙ্গির বিলাস, ওর আনন্দ। কাজেই আমি সেই আনন্দের উপকরণ মাত্র। আমার নিজস্ব ভূমিকা কতটুকু? তা বাদে জারোমথাঙ্গিতে আমার আগ্রহ যে কতটুকু ছিল সে তো নিজেও তা বোঝে। বরং যদি ডিঙ্গির ক্ষেত্রে হয়, তো আগ্রহের দায়ভাগ বেশীটাই আমি মেনে নেব স্বচ্ছন্দেই।

মেয়েগুলো চলে যেতেই রবিবাবু বললেন, কাল ভোরবেলা উঠেই তুমি চিংগ্রেই চলে যাবে। ওখানেই হরেন্দ্রকে পাবে বলে মনে হয়। ওষুধপত্র যা যা দরকার মনে করে নিয়ে যেয়ো।—বলেই সামান্য ভেবে বললেন, তুমি তো কোনদিন যাও নি, একা পারবে না। বুদ্ধিবলের গাড়ী যাবে কাঠ আনতে, সেই গাড়ীতে কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারবে। বাকিটা হেঁটে যেতে হবে।

ঠিক আছে—

বলছ তো, যেতে পারবে তো? ওখানেই দেখবে প্রচুর লগ পড়ে আছে। ওই পর্যন্ত টেনে আনে হাতিতে।

চিনে নিতে পারব। শুধু বলে দিন ট্রাক থেকে নেমে কোনদিকে যেতে হবে।

পাহাড় ধরে পূব দিকে নেমে ডানদিকে চলে গেলেই চিংগ্রেই গ্রাম পেয়ে যাবে।

আর খোঁজ নিচ্ছি যদি ওখানকার নিংথো এসে থাকে তো তোমার সঙ্গী হবে সে-ই। আজ ওখানকার নিংথোর আসবাব কথা।

বলে রবিবাবু যখন বেবোলেন তখনই খুজাইলকেব জলে ভাসছে অন্ধকার। ওঁর চলাচলের হদিস একমাত্র উনি নিজেই জানতেন কাজেই অহরহ যাত্রার মত এখনও অনুমান আমার অসাধ্য রইল। শুধু আমাকে উদ্‌গ্রীব থাকতে হল কখন ফেরেন, আমাকে যাত্রার জন্যে শেষ নির্দেশটা দেন। ভয় এই যে ওঁর কাছে দিনরাতের কোন ব্যবধান আছে এ বোধহয না। কখনও শুনি এই গহন আরণ্য প্রদেশে গভীর নিশীথে উঠে কোথায় চলে গেছেন, আবার কখনও বা ডাকাডাকিতে জেগে উঠে দেখি উনি ফিরে এলেন কোন অজানা আস্তানা থেকে কোন গভীর রাত্রে। সামান্য সময় আমাদের দেখা হ'ত তাঁর অথচ আশ্চর্য এই যে উনি সবার সব খবর জানতেন। খবরও যে এত রাখেন কি করে মাঝে মাঝে তা থেকেই জাগে অনেকের বিস্ময়।

আমরা শোবার আগেই একজন মনিপুরি এসে খবর দিল, মালিক বলে পাঠালেন চিংগ্রেই গ্রামের নিংথো এসে ভোরবেলা আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবে।—আমি যেন সজাগ থাকি।

ভোরবেলাতে কোন নিংথো নয় ডাকলেন রবিবাবু। ঘরের দরজার বাইরে দেখি ক্লান্ত চাঁদের ম্লান আলোতে উনি দাঁড়িয়ে। বললেন, চল যাই। আমিও যাব।

যে ট্রাকটাব সামনে এসে চিংগ্রেই যাত্রার জন্য দাঁড়ালাম সেটি চলে বলে মনে করবার উপায় ছিল না। ওর চেয়ে অনেক শক্তদর্শন এবং সুদর্শন ট্রাককে একসময় পথের ধারের গাদায় পুরানো লোহা হিসেবে বিক্রি হবার অপেক্ষায় পড়ে থাকতে দেখেছি অতীতে। কাজেই বেশ হতাশ হতে হ'ল বাতিলের গাদা থেকে টেনে আনা এই নিশ্চল গাড়ীটা আমাদের কোথায় নিযে যেতে পারে এই ভেবে। বুদ্ধিবল কি এই গাড়ী চালিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে? কখনই তা হতে পারে না। অন্য গাড়ী নিশ্চয় আছে বুদ্ধিবলের, এটা বোধহয বাতিল ক'রে রাখা। কিন্তু আমাকে প্রভূত বিস্ময় আর জিজ্ঞাসায় নিয়ে গেলেন মালিক নিজে, বললেন, ওঠ।

আমি যেন গাড়ীতে নয় এক প্রবল বিস্ময়ের মধ্যেই উঠে বসলাম। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভেতরটায় বসবার ব্যবস্থা বলতে একখানা তক্তা; লোহার জীর্ণ-কাঠামোব ওপর তক্তাখানা এমন লম্বা ক'রে পাতা যে চালক ছাড়া জনা তিনেক ঠাসাঠাসি ক'রে বসতে পারে। আমার পরে একজন নাগা যুবক তার পরে মালিক রবিবাবু উঠে বসলেন। অতঃপর চালকের আসনে এসে বসল বুদ্ধিবল নিজে। আর সন্দেহ রইল না যে এই কংকালটাই আমাদের বাহন। বুদ্ধিবলের সহকারী একটি অল্পবয়স্ক কিশোর গাড়ীর সামনে গিয়ে সাধ্যাতীত শক্তি সংযোগ ক'রে

হাতলটা বার কয়েক ঘোরাতেই হড়হড় ক'রে এমন শব্দে ইঞ্জিনটা ডেকে উঠল যা কেবল অতিবৃদ্ধ মানুষদের কাশির সঙ্গে জমা শ্লেষ্মা উঠলে শোনা যায়। সেই শব্দ মাঝে মাঝে গমকের মত বেড়ে বেড়ে উঠতে লাগল দেখে বুঝলাম এ গাড়ী না গিয়ে আর ছাড়বে না। আমার ভরসা রবিবাবু। উনি যখন উঠেছেন তখন এ গাড়ীর বিশেষ ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে। তবে এ দেশের মধ্যে নিশ্চয় এমন কোন অদেখা দিক আছে পথ যেখানে শূন্যের মত মসৃণ, নইলে এ গাড়ী যায় কি করে?

গাড়ী পূর্ব মুখ করে ছাড়বার অল্পক্ষণ বাদেই দেখলাম সামনের সমতলে মাটির ওপর কেউ যেন সমস্ত রাত ধরে নিঃশব্দে অতি সঙ্গোপণে টন টন তুলো বিছিয়েছে। একরাত্রে এত তুলো বিছালো কে? আমাদের দেশের বাড়ীতে নতুন বালিশ তোষক তৈরীর আগে ঠাকুমা উঠোন জুড়ে তুলো মেলে দিতেন এমনি করেই, শুকোবার জন্যে। এত তুলো কার? এ যে কয়েক কোটি তোষক বালিশ তৈরী হবার মত! বর্মার প্রান্তরেরও পূবে যে সারিবদ্ধ পাহাড় কালো রেখার মত দেখাচ্ছে তার ওপিঠে কোথাও সূর্যের প্রকাশ ঘটেছে বলে আলোর ঝলক আসছে পাহাড় পেরিয়ে। সেই আলোর অভিঘাতে তুলোর রাশি বদলে গেল মেঘে। আকাশ থেকে অজস্র মেঘ যেন উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে মাঠের ওপর বসে। সকাল হলেই আবার কোনও সুদূরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে বলে উঠি উঠি করছে।

আমাদের বাহন হঠাৎই ডানদিকে হুড়মুড় ক'রে নামতে লাগল। তারপর আবার বাঁ দিকে পাক খেয়ে উঁচুতে এমনই অপথে উঠতে লাগল যে আমার মনে হ'তে লাগল যে কোন মুহূর্তে আমরা পেছন দিকে গড়িয়ে যাব। আমরা সকলেই চিৎ হয়ে প্রায় আকাশের দিকে মুখ ক'রে গাড়ীতে বসে রইলাম। একমাত্র অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রেখে বুদ্ধিবল ওর মধ্যে নির্বিকার চিত্তে আপন গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরে রয়েছে দেখলাম। এই পথে একমাত্র হেঁটে ওঠা সম্ভব হতে পারে অন্য কিছুতেই নয়। যদি এই অসাধারণ যানের যাত্রী না হতাম তা'হলে এই অপথে যাবার উপযোগী কোন গাড়ী আধুনিক বস্তু বিজ্ঞান নির্মাণ ক'রতে পেরেছে এ কথা অজানা থাকত। বেশ কিছুক্ষণ ওই ভাবে ওঠবার পর হঠাৎই পথ শেষ হয়ে গেল। সামনে কেবলই নানা জাতের বৃক্ষের কাণ্ড আর শাখা। অর্থাৎ আমরা এমন জায়গায় এসেছি যে সামনেই ঢালু বন। এতক্ষণও ঘন বনের মধ্যে দিয়েই এলাম তবে সে পথে গাড়ী ফিরবে কি করে জানি না, কারণ গাড়ীটা যে কখনও পেছন দিকে গড়িয়ে পড়েনি সে নেহাতই দৈব। প্রতিমুহূর্তেই ওই খাড়াই বাইতে গিয়ে গড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। ফেরবার সময় যে তা কিছুমাত্র কমবে এমন ভাববার সঙ্গত কোন কারণ হাতে নেই। যাক এবার যে পথ শেষ এই ভাবনা যখন আমাকে বেশ স্বস্তি দিচ্ছে সেই মুহূর্তেই আমাদের অলৌকিক যান হুড়মুড় করে সামনের উৎরাইতে নামতে লাগল ছোট ছোট গুল্মলতা মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে।

পাহাড়ের গা বেয়ে সেই ভয়ঙ্কর নিম্নগতিতে আমি শংকিত হলাম যে কোন মুহূর্তে আমাদের এই গাড়ী উল্কা পিণ্ডের মত ছিটকে পড়বে। তবে পড়বে কোথায়? চারিদিকে তো সুবিশাল বৃক্ষ সব, সামনেটাই কেবল চেঁছে ছুঁলে পরিষ্কার করা হয়েছে চলাচলের জন্যে। এক যদি ব্রেক নষ্ট হয়ে সামনের দিকে গড়াতে থাকে তো বড় সড় বাঁক না আসা পর্যন্ত গড়িয়েই চলবে, বাঁক এলে আছড়ে পড়বে কোন মহীরুহের ঘাড়ে।

ঘটনা যা-ই ঘটুক কোনটাই সুখপ্রদ বা কাঙ্খিত যে নয় সেই কথা ভাবতে ভাবতেই অতিদুর্গম অরণ্যের এক গভীর অভ্যন্তরে এসে গাড়ী আমাদের থামল। সেখানে অসংখ্য বৃক্ষের মৃতদেহ ছড়ানো, ছিটানো, জড় করা। সেগুন গাছগুলোকে কেটে কেটে কাঠে পরিণত করা হয়েছে, যেন দৌড়ে যাওয়া ছাগলকে ধরে নিমেষে করা মাংস। সামনে যে কত কাঠ সে গুণে নিষ্পত্তি করা একান্তই অসম্ভব বলে বোধ হল আমার। গাড়ীর শব্দ শুনে কয়েকজন লোক এসে হাজির হ'ল, কোথা থেকে যে এল তার হদিস পাবার জন্যে চারপাশে চেয়ে অজস্র গাছ ছাড়া কিছু আর চোখে পড়ল না। রবিবাবু নামতেই তারা সামনে জড় হয়ে গেল। নিংথোও নেমে পড়ল দেখে দুজন তার সঙ্গেই কথা বলতে লাগল। তাদের কাছ থেকে শুনে নিংথো মালিককে বলল, মাহুত আমার বাড়ীর কাছে আছে। এরা নিয়ে এসেছে।

অল্প দূরেই একটা বাড়ী, স্বাতন্ত্র এই যে ঘরের সামনে বিরাট দুটো করোটি টাঙ্গানো আছে সদরের শোভাবর্দ্ধনের জন্যে। কি জন্তুর করোটি এখন আর তা ভালভাবে বোঝা যায় না তবে জন্তু যে বিশাল সে প্রমাণ মেলে। তার পাশে শিংসমেত বাইশনের করোটি একাধিক সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো। দরজার ভেতরে চোখ যেই যাবে প্রথমেই দেয়ালে সুন্দর ভাবে আড়াআড়ি রাখা সুসজ্জিত দুটি বর্শা। তার মধ্যে একটা ঢাল। সদর পার হলে দেখলাম বিরাট আকারের একটি খাণ্ড দেয়ালে ঝুলছে। ঘরের সামনে বারান্দার মত জায়গায় হরেন্দ্র শুয়ে। তার গায়ে কম্বল মোড়া। শরীরে যে কম্বল মোড়া আছে তা দেখলেই জ্বর সম্পর্কে প্রাথমিক অনুমান স্বচ্ছন্দে ক'রে নেওয়া যায়।

রবিবাবুকে অনুসরণ ক'রছিলাম, এবার এগিয়ে গেলাম। গায়ে হাত রাখতেই চমকে উঠলাম তাপের পরিমাপে। নিঙথো আমাদের সঙ্গেই ছিল, বলল, তোমরা যদি বল তো আমরা চিকিৎসা ক'রতে পারি।

আমরা ওষুধ এনেছি। তুমি যত করেছ এর জন্যেই ধন্যবাদ।—রবিবাবু আন্তরিক ভাবেই জানালেন। ততক্ষণে রোগীর ওপর ঝুঁকে পড়েছি। আমার অসম্পূর্ণ বিদ্যা তার ওপর তা দীর্ঘ অচর্চায় মলিন, স্বাভাবিক ভাবেই তার ক্ষমতা সম্পর্কে আমি খুবই সন্দিহান। তবু উপায় যেখানে নেই সেখানে আমার অনলব্ধ বিদ্যার শরণ নেওয়া ছাড়া গতি কি? ফাদার পিটার কে মনে পড়ল

তিনি স্বীকৃত চিকিৎসক ছিলেন বলে মনে হয়না কিন্তু তাঁর আন্তরিক চিকিৎসায় উপকৃত হ'ত মানুষ। তাঁর সাহচর্য যতদিন করেছি সেই অভিজ্ঞতা আমার বিদ্যা লাভের ঘাটতি পূরণ ক'রতে পারে নি ঠিকই, কিন্তু আমাকে দিয়েছে উদ্যম। তার বলেই লেগে পড়লাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল আসলে লোকটার শরীরে কিছু নেই। নিজের সমস্ত রক্তমাংস শরীর নিজেই খেয়েছে প্রায় নিঃশেষ করে। শুধু হাড়ের ওপর তামাটে কালো চামড়া আছে জড় যো আর তারই নাম হরেন্দ্রনাথ মালাকর। ওর এই দীন অবস্থার কথা যদি কোন ক্রমে জেনে যেত ওর বাহন, তাহ'লে বোধহয় ওর দাসত্ব স্বীকার এমন নীরবে সে বেচারী কিছুতেই ক'রত না। আর আমি শারীর বিদ্যা যেটুকু আয়ত্ব ক'রেছি তাতে এমন দেহের প্রাণধারণ সম্ভব একথা ছিল না। অর্থাৎ একটি অসম্পূর্ণ শরীর নিয়ে শ্রী হরেন্দ্র মালাকর নামক ব্যক্তিটি পরম আশ্চর্যের এক নিদর্শন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ওর চলমানতার জন্যে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। আমার মনে হ'ল লোকটির দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তিলমাত্র নেই। ওষুধে এর কতটা উপকার হবে সে অনুমানে অনিশ্চিত হয়েও বুদ্ধিমতে ওষুধ প্রয়োগ করলাম। একটি অপ্রিয় কথা রবিবাবুকে বললাম, এর শরীরের যা অবস্থা তা'তে সুপথ্য আর বিশ্রাম দরকার।

হরেন্দ্র সে যাত্রা সুস্থ হয়ে উঠলে তাকেও বললাম, আপনার শরীরের যা হাল আপনার রোজ দুটি ডিম আর কিছু ভাল খাবার খাওয়া দরকার।

কথা শুনে লোকটি আমার মুখের দিকে এমনই দৃষ্টিতে তাকাল যে আমার কথা হয় সে শুনতেই পাচ্ছে না, অথবা আমার ভাষা বুঝছে না। কিঞ্চিৎ রসিকতা ক'রেই বললাম, আমার কথা বুঝছেন না ?

দুপাশে মাথা নেড়ে হরেন্দ্র ম্লানস্বরে বলল, আপনে বুঝতাছেন না ?

কি ?

যেই সব খাইতে কইলেন কইর থনু খামু ? আমি একটা ডিম খাইলে আমার পরিবার উপাসে থাকবো। আমরা লবণ পাইলেই ভাত খাইয়া লই।

এই জবাবে নিজের কথার জন্যেই আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সত্যিই তো, আমি নিজেই দেখছি আপন সম্পদ গড়ে তোলবার লোভে একদিকে রবিবাবু যেমন অমানুষিক পরিশ্রম করেন তেমনি বঞ্চিত করেন আপন সহকর্মীদের। জগতের সমস্ত রবিবাবুই এইরকম, একইরকম। সম্পদের নিয়মই এই, যে শোষণ বিনা তা গড়ে ওঠে না। কিছুদিন ধরেই তো রবিবাবুর কাঠ চেরাই কলে আছি দিনরাত দেখছি ও'কে যতদূর বুঝেছি প্রবল অর্থলোভে উনি ভুগছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে বর্মার সীমান্ত ঘুরে দেখেছেন এই এলাকা জুড়েই সেগুনের অরণ্য। অসীম সেই আরণ্য ও'কে মুগ্ধ করেনি

প্রলুব্ধ করেছে। যুদ্ধ শেষ হবার পর কর্মবিরতির অবসরে আরণ্য অধিবাসীদের বুঝিয়েছেন গাছ মানেই তাদের জ্বালানীর যোগান নয়, গাছ অর্থ। আর এই অরণ্য উৎসাদিত ক'রে দিলে তারা পাবে কৃষিভূমি। প্রথমে তারা আকৃষ্ট হয়েছে ও'র বলশালী পৌরুষদীপ্ত চেহারায়, তারপরে কথায়। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে তাদের আতিথ্যে থেকে, নিংথোদের বুঝিয়ে, এলাকা জুড়ে সেগুন কেটে মৃতবৃক্ষের দেহের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। দিল্লী দৌড়ে সরকারী কর্তাদের অজ্ঞতার সুযোগে এনেছেন এই সব এলাকার সেগুনে ও'র একচ্ছত্র অধিকার। কিন্তু এই বিপুল সম্পদের আহরণের খরচ আর সরকারী খাজনা যোগানো ও'র সাধ্যাতীত। তাই দৌড়েছেন সমস্ত বাঙালীর স্বাভাবিক মনোকেন্দ্র কলকাতা। অর্থ যোগাতে পারে এমন লোক যোগাড় ক'রে এনেছেন পরিচিতির সূত্রে। আমি বুঝতে পারি অংশ ভাগে উনি কিন্তু অসুখী। সমগ্রের জন্যে আয়োজন যার সে কখনও ভগ্নাংশে তুষ্ট হতে পারে? স্বাভাবিক অসন্তুষ্টিতে ভোগেন রবিবাবু, অথচ উপায় নেই।

অংশীদারের অর্থেই চেরাইকলের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু আমার সন্দেহ এ বন্ধন টিকবে না। কেবল অর্থলগ্নী করবার জন্য লাভের অর্ধেক নিয়ে যাবে অংশীদার এ ব্যবস্থায় উনি ক্ষুব্ধ, অথচ অন্য পথও নেই। অর্থের প্রয়োজন তো অর্থেই যেটা সম্ভব। যে তা যোগাবে সে এই অক্ষমতার জন্যে বিকল্প সর্তে রাজী না হলে অন্য কি উপায়? রবিবাবুর যুক্তি তাঁর দীর্ঘদিনের শ্রমে যে গুপ্তধনের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তা সংগ্রহও তিনি ক'রছেন, আর শুধু আহরণের ব্যয় বহন ক'রেই একজন অর্ধেক পাবে কেন? যে রবিবাবু এই যুক্তিতে বিশ্বাসী তিনিই আবার হরেন্দ্র মালাকরের মত জীবনপণ ক'রে কাঠ টেনে আনা শ্রমিকদের জন্যে বরাদ্দ করেন ন্যায্য মজুরীর নিম্নতম ভগ্নাংশ। এই দুর্গম পার্বত্য বনাঞ্চলে বিপুল বৃক্ষভার নিয়ে চলাচলে যাদের জীবন বিপন্ন থাকে প্রতিমুহূর্তে তারা কেবল লবণজল মেশানো ভাত খেয়ে শরীরের খণ্ডাংশ নিয়ে যেন বেঁচে থাকে শুধুমাত্র মহাজনদের সম্পদ গড়ে দেবার জন্যেই। আসলে বেঁচে থাকার বিকল্প নেই বলে তাদের বেঁচে থাকতে হয়, জীবনকে ভালোবেসে হয়ত নয়। আর বাঁচবার দ্বিতীয় পথ অজানা বলে এই চেনা কাজে নামমাত্র মজুরীর বিনিময়ে জীবন বাজীরাখতে হয় কেবল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতিহিসেবে।

হরেন্দ্র সেই চরম দুঃখের সময়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও রবিবাবুকে বিড়ম্বিত ক'রতে চাইল না। রবিবাবু কেবল নিজের কাজের ক্ষতি হবার ভয়েই আমাকে বললেন, তুমি হরেন্দ্রকে ভাল ক'রে দেখ। ও সেরে না উঠলে হাতিটা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অন্য মাহুত দিয়ে কাজ হয় না। ওষুধ পত্তর যদি লাগে জোগাড় ক'রে এনো।

ওর এখন বিশ্রাম দরকার, আমি বলাতে রবিবাবু চিন্তিত হলেন কাজ না হবায়

জন্যে। তারপর নিজের কথায় সংযোজনে ক'রে বললেন, এখন তো কিছুটা ভালই আছে। পুরো সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম তো হচ্ছেই।

ওর কিছু ভাল খাওয়া প্রয়োজন—

তা মেস-এ সে ব্যবস্থা ক'রে নাও।

সকলের মাস মাইনের টাকা দিয়ে আপন খোরাকী যে মেস সেখানে বিশেষ রকম ভাল খাবারের ব্যবস্থাটা যে হবে কি ক'রে সে পরামর্শ রবিবাবু দিলেন না। হরেন্দ্রর কাজটুকু তাঁর দরকার, তার স্বাস্থ্যরক্ষার দায় তো তাঁর হতে পারে না। কাজেই এভাবেই চলবে, হরেন্দ্র যে ক'দিন বাঁচে। আপন জীবিকার তাগিদেই সমস্ত জীবনীশক্তিটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে হাতিকে তাড়া ক'রে কাঠের গুঁড়ি সংগ্রহ ক'রে দিয়ে যাবে এমনি সব বাবুদের সম্পদ গড়ে তোলবার জন্যে। তার সঙ্গে তার দ্বারা তাড়িত হাতিটার কোন তফাৎ নেই। দুজনেই যন্ত্রমাত্র।

হরেন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠতেই আমি স্থির ক'রলাম আর নয়। এই যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেতে হবে। সবচেয়ে অস্বস্তিকর দৃশ্য এই রাশি রাশি কাটা গাছের স্তূপ। রবিবাবুকে যা আনন্দ দেয় আমাকে দেয় যন্ত্রণা। ভয়ঙ্কর অপরাধবোধ আমাকে এমন যন্ত্রণা দিতে থাকে যে আমি অকারণেই নিজেকে দোষী ক'রে ফেলি। মনে হয় এই যে হাজার হাজার মহীরুহের মৃতদেহ জায়গায় জায়গায় জড় করা আছে সবই আমার দ্বারা সংঘটিত অপরাধ। আমিই যেন এই অসংখ্য বৃক্ষছেদনের জন্যে দায়ী। মনে হয় আমি এক ঘৃণ্য সারঙ্গিক—কারণ আমি এ অন্যায় সহ্য ক'রে এরই মধ্যে জড়িয়ে আছি।

আর ক'রব না মনে করেই নিজের সম্বল সন্নিবিষ্ট ক'রে মিল থেকে যখন বেরোলাম তখন ভরা দুপুর। পাহাড়ে প্রান্তরে মাথার ওপরে ঝিমঝিম রোদ। কাঠকলের বিশাল প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে কটি গাছ রোদ তাদের আপাঙ্গে। তারই কোলের মধ্যে কোথাও বসে আপন মনে ডেকে চলেছে অদেখা কোন পাখি। আমার সহকর্মীরা বিশ্রামে, রবিবাবু যে কোথায় জানেন কেবল তিনিই, তাঁর অংশীদার পর্যন্ত বিশ্রাম ক'রেছেন মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে। পরশুদিন জারোমথাঙ্গির আশ্রয়দাত্রীর কাছে খবর পেয়েছি সে ওর কাছেই সুস্থ আছে। প্রসবের দিন এগিয়ে এসেছে বলে ওরা ওদের কাছেই রেখেছে ওকে নিঃসঙ্গতায় ফিরতে না দিয়ে। সেদিন যেমন ভেবেছিলাম আজও তেমনই ইচ্ছে হ'ল জারোমকে দেখে আসি একবার। কিন্তু আমাকে দেখলেই সে তো চিনে ফেলবে, তখন যে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে সেই কথা ভেবেই আর যেতে সাহস ক'রলাম না।

কাঠ চেরাই কলে কাজ ক'রতে এসে আমার যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে তার নাম সঞ্চয়। অকস্মাৎ কিছু টাকা জমে গেছে আমার হাতে। টাকা সামান্যই কিন্তু আমার জীবনে এই প্রথম। আর এটাই আমার প্রকৃত পদস্খলন। এর

আগে কোনোদিনই আগামী দিনটির কথা ভাবিনি অধিক দূরের কথা তো অনেকেই দূর। তাই অর্থ উপার্জন বা সঞ্চয় দুটোই আমার ভাবনার জগতে ছিল না। এবারও ভেবে করিনি, হয়ে গেছে। কাজ ক'রলেই অর্থ প্রাপ্তি ঘটে, আর অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা না থাকলে চুরি না গেলে তা জমবেই। তাই জমেছে। সে আমার সঙ্গেই আছে।

একবার ভেবেছিলাম জাবোমথাঙ্গির জন্যে আমার এ সামান্য সঞ্চয় ব্যয় করে দিই। ওই নাগা মহিলাকে দিয়ে দিই টাকাগুলো যাতে তাদের আশ্রিতা রোগিনীর কাজে লাগে। পরে আর তা হ'য়ে ওঠে নি। ভাবনা, সেই মহিলা আর আমার সামান্য ক'টি টাকা—তিনটির সংযোগ আর ঘটে নি। জাবোম-এর জন্যে আমার কিছুই করা হয়নি অথচ এখন আমার গন্তব্য ওর সেই পর্ণকুটির। সেটা যখন পরিত্যাক্ত পড়ে আছে আমার গিয়ে বাস ক'রতে বাধা কোথায়? ও যদি আবার ফিরে যায় আমাকে তাড়িয়ে দেয় তো দেখা যাবে, তার আগে তো গিয়ে থাকি। বরং এখন সঞ্চিত অর্থটুকু দিয়ে কিছু চাল আর লবণ কিনে নিয়ে যাই। কতদিন রসদ না ফুরোবে নিচে নামবার আর দরকার হবে না। কিন্তু সে আর কতদিন? একদিন তো এ চাল ফুরোবে! তখন? আবার কি ফিরে আসতে হবে এই রবিবাবুর কাঠ চেরাই কলেই?

নিজের কথা ভাবতে গিয়েই জাবোমথাঙ্গিকে মনে এল কোন সাহসে যে মেয়েটি একটি বাচ্চাকে পেটের মধ্যে পরিপোষণ ক'রল কে জানে। আমার মিলনেই কি ওর এই অঙ্কুরোদ্গম? তা যদি হয় তবে ওর মত মেয়ে এতদিন কি একাই ছিল ওখানে? কিসের আশায় ওই নিরবচ্ছিন্ন একাকীত্বের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল এই ক'দিনে কি আরও দুর্গম হয়ে গেছে পথ? কাঠ চেরাই কলের বাতিল করাতের টুকরোতে শান দিয়ে একটা খাঙ-এর মত বড় ছুরি ক'রে নিয়েছিলাম নিজের ব্যবহারের জন্যে, সেটি আমার সঙ্গী আছে। দেখছি বেশ চমৎকার কাজের হয়েছে এটি। যদি পথ ভুল না ক'রে থাকি তবে লোকালয় বর্জিত এই পাহাড়ে অসংখ্য নতুন বৃক্ষের জন্মে বেড়েছে এর বন্যতা। আমাকে পথ কেটে নিতে হচ্ছে। কিছুদিন আগে এপথে মানুষ যে গেছে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিছু কবন্ধ কিশলয়ের অবস্থিতিতে। তাহ'লে পথভ্রান্ত হইনি। আমি নতুন কিছু কেটে কেটে যাচ্ছি যদি পরে কেউ আসে প্রয়োজনে তার নিশানার কাজ ক'রবে। তবে ব্যাপক বিস্তারের দেরী আছে এখনও। বসন্তের বিদায় বেলা সমুপস্থিত। এরপর গ্রীষ্ম তারপর বর্ষা আর নবমালঞ্চের সঞ্চার তো সেই ঘন বর্ষণের শেষে। তখন সবুজে সমাদিত পর্বতগাত্রে সৃষ্টির সমারোহ। আমি আমার খাঙ-এর আঘাতে কিছু কিছু তরুণ বৃক্ষকে কাটছি বটে তবে আমার পথ করবার জন্যেই। পথের বাধা না হ'লেও অনেকে যে অকারণে কাটে তা আমার অনভিপ্রেত। বেশ কিছুটা উঠতেই হঠাৎ সামনে এসে হাজির হ'ল জাবোমথাঙ্গির কুটির। চারপাশে গুল্ম জন্মে গেছে

অনেক, ঝিঁকরাও কিছু কম নয়। অযত্নে আর অবহেলায় কুটিরটির অবস্থা বড়ই দীন। আমি কাছে পোঁছাতেই একটা বাচ্চা কালো বাঘ এক লাফে বেরিয়ে এল ঘরের ভেতর থেকে। যাক তা'হলে বাস একজন করছিল। আসলে ঘরে অরণ্যে একাকার হয়ে গেছে বলেই শিশুটি পার্থক্য ক'রতে পারেনি। ওকে উচ্ছেদ ক'রলাম বলে দুঃখ বোধ হ'ল। এইবিশ্বে বৃদ্ধের পরিবর্ত হিসেবে বাসস্থান ক'রে নিতে হ'লে খারাপ লাগে না, শিশুর পরিবর্ত হতে হ'লে দুঃখ হয়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বোটকা গন্ধ পেলাম। পলাতক প্রাণী তার দেহের ঘাম রেখে গেছে বদ্ধ বাতাসে। দরজাটা অল্প ফাঁক ছিল সম্পূর্ণ খুলে দিলাম। আমার আশঙ্কা হ'ল বাচ্চাটা যখন বিশ্রাম ক'রছিল তার পিতামাতার আবির্ভাবটাও তখন অসম্ভব নয়। এখন হয়ত তারা আহার্য সন্ধানে গেছে. অন্ধকারে দেহ মিলিয়ে তো এসে ঢুকতে পারে! দরজার অবস্থা যা তাতে আলোবাতাস বা বনবাসী কাউকে প্রতিরোধ করবার মতই নয়। আপন সামগ্রী বলতে কেবল একটা গামছা আর একটা কম্বল। সে দুটি রেখে ঘরে অনুসন্ধান ক'রতে লাগলাম কোন পাত্র আছে কিনা যাতে চালে এনে রাখা যায়। উৎকট গন্ধটা না গেলে ঘরে টেকা দায়, তবু নজরে এল এক কোণে জারোমথাঙ্গির ব্যবহারিক সামগ্রী সবই জড় করা। তার মধ্যে পাত্রও অনেকগুলো আছে। এখানে কষ্ট জলের। সেই খুজাইলক্ নামতে হবে, আধঘণ্টা উতরাই আর প্রায় একঘণ্টার চড়াই ভেঙ্গে জল নিয়ে ফেরৎ আসা যাবে। সে চলাচলও সবটাই অপথে। একা জারোম এত অসুবিধের মধ্যে যে কেমন ক'রে এতগুলো দিন কাটালো কে জানে?

আমার রসদ যখন ফুরিয়ে এসেছে ঠিক সেই সময় একদিন জারোমথাঙ্গি এল। আমি ঘরে ছিলাম না, ঢালুতে সামান্য একটুকরো ক্ষেত তৈরী করে আলুর ডাল লাগিয়ে ফসল ফলাবার চেষ্টা ক'রছিলাম। এই সব ফসলের দোষ এই যে মাটির নিচে মানুষের চোখের অলক্ষ্যে এদের বৃদ্ধি বলে ফলল কি ফলল না বোঝাবার উপায় থাকে না। অনেক সময় ওপর দিকে ফণা নিয়ে ওঠা গাছ দেখে মনের আনন্দে মাটি খুঁড়ে দেখা যায় ফক্কা। কিছু নেই, কেবল কতগুলো শিকড় এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাটির মধ্যে জাল বিস্তার ক'রেছে। ফলন হলেও বিপদ আছে, আমাদের চোখের আড়ালে জন্মালেও বনের অন্য অনেক প্রাণীর গোচরে তা এসে যায় আমাদের আগেই, আর তারাই ফল ভোগ করে। নজর রাখতে হয় সে জন্যেও। অন্যের ভোগে লেগে যাবার ভাবনা আছে বলে যে যত্ন ক'রব না সে উপায় তো নেই। সেই খুজাইলক থেকে জল বয়ে এনে জমি ভেজাতে হয় রোজ। অসম্ভব বলে মাঝে মাঝে হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে কিন্তু এতদিনের শ্রম পণ্ড হবার ভয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়ে ওঠে না।

আমি না থাকার সময় ও এসেছিল বলে আমার বসবাসের সামান্য আয়োজন দেখে কি ও ভেবেছে জানাতে পারলাম না তবে আমি ঘরে ফেরা মাত্র প্রচণ্ড খুশিতে ও যে এমন লাফিয়ে উঠবে তা ও নিজেও ভেবেছিল কি না জানিনা। পরমুহূর্তেই আছড়ে পড়ল আমার ঘামে ভেজা বুকের ওপর। আমি জানতাম যে আপন আশ্রয়ে ও যে কোনদিন ফিরবেই তাই আমার কোন বিস্ময় ছিল না কিন্তু ওর ছিল। ওর শিশুটি ট্যাঁ ক'রে উঠতেই আমাকে ছেড়ে দৌড়ে গেল তাকে দেখতে। পলকে কোলে তুলে আবার সামনে এসে বলল, এই দেখ তোমার মেয়ে।

সেই শিশুটিকে দেখবার বিশেষ কোন আগ্রহই আমার ছিল না, আমি দেখলাম জারোমথাঙ্গির আনন্দ যেন উপচে পডছে। আনন্দ শুধু মুখে নয় সমস্ত শরীর জুড়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে। সে দুহাতে তার শিশুটিকে আমার দিকে তুলে ধরে বলল, এই দেখ তোমার মত।

ও খুব আগ্রহ ক'রে বললেও ওর কথা আমাকে মোটে কোন আনন্দ দিল না তো বটেই বরং আমার কেমন অস্বস্তি হ'ল। আমার মেয়ে! আমার আবার কিসের মেয়ে! এক বাঁদরীর গর্ভে জন্মানো এক নতুন বাঁদরী। মনের কথা প্রকাশ না করে বললাম, মেয়ে তোমার। তুমিই মেয়ে নিয়ে থাক।

ও আমার কথায় খুবই খুশি হ'ল, বলল, আমার তো বটেই আমার সোনা মেয়ে —বলে সদ্যজন্মানো ক'দিন মাত্র বয়সের শিশুটিকে চুম্বন ক'রতে লাগল। ওর সোহাগের আগ্রহ আমার কাছে আতিশয্য বলে মনে হ'ল। একজন যুবতী মা তার প্রথম সন্তানকে আদর ক'রছে সেদৃশ্য আমার কাছে বিরক্তিকর লাগল। এসব আহ্লাদেপনা আমার সহ্য হয় না। আমি সরে যেতে চাইলাম কিন্তু নেহাৎই খারাপ হয় বলে গেলাম না। তার বদলে বললাম, ওকে শুইয়ে দাও।

এত ছোট ছেলে আমি হাসপাতালে ছাত্র অবস্থায় দেখেছি বটে তবে কখনও তাকিয়ে দেখিনি। আমার কেমন ঘেন্না লাগে। ইঁদুরের বাচ্চার মত দেখতে সদ্যজন্মানো শিশুগুলো যতদিন না হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে ততদিন আমি কোন শিশুর দিকেই তাকাই নি। এটির প্রতিও তাকালাম না। আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারা জারোমথাঙ্গির পক্ষে সম্ভব নয় বলে ওর আহ্লাদ কিছুমাত্র কমল না।

আমিও ওদিক থেকে মনকে সরাবার জন্যে অন্য কাজে মনঃসংযোগ করা প্রয়োজন মনে করলাম। আমার সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হয়েছিল করাতের টুকরো দিয়ে বড় আকারের ছুরি বানিয়ে আনা। অনেকটা খাণ্ড-এর মতনই কাজ করে সেটি। সেটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জারোমথাঙ্গি অনেকদিন বাদে আমাকে দেখছে বলে কিছু আতংকে জানতে চাইল, কোথায় যাচ্ছ ?

এই প্রশ্নটির জবাব দেওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই শুধু হাত নেড়ে জানালাম আসছি। আর কোন কথা বলবার সুযোগ দিলাম না বলেই বেচারী

কিছু বলতে পারল না কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টিতে আমি তার সংশয় বেশ স্পষ্টভাবে আঁকা দেখলাম। ও কি তবে ভয় পেল? পাক।

সরু সরু চারা গাছ কেটে ঘরের এক কোণে সেই লাঠির মত গাছ পুঁতে কিছু লতা দিয়ে বেঁধে একটা ঘেরা ছোট্ট খাটের মত করে দিলাম ওর মেয়ের জন্যে। সেখানে শোয়ানো থাকলে শিশুটি পড়েও যাবে না আবার মাটি থেকে উঁচুতেও থাকবে—দেখে জারোমথাঙ্গি খুবই খুশি। আমার বুকের ওপর নিজের ডান হাতের পাতা রেখে বলল, তুমি অনেক কাজের হয়ে গেছ দেখছি।

ওর শীর্ণ শরীরের হাতও শীর্ণ, তাতে কোন সৌন্দর্য নেই। তবু ভাল লাগল কারণ সেই হাতের মধ্যে দিয়ে ওর আন্তরিকতা স্পর্শ করছিল আমায়। ওর এই অভিনন্দনও হৃদয়গ্রাহী। ওর মনে এমন মাধুর্য ছিল যে সেটা স্বীকার করে নেবার মানসিকতায় আমি ওরই কথার মত করে প্রশ্ন করলাম, আগে কি আমি কাজের ছিলাম না?

প্রীতিময় হাসিতে মুখ ভাসিয়ে ও বলল, এখন আর অস্বীকার ক'রব কি ক'রে? কাজের নমুনা কোলে ক'রে বলব কি করে যে তুমি কাজের নও?—বলেই গভীর প্রীতিতে ওর কোলের মেয়েকে বার কয়েক নাচাল। ও যে মেয়েটিকে নিয়ে কি করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না। আপন আনন্দ বোঝাবার জন্যে হঠাৎ একবার আমার শরীরে নিজের শরীরের একটা পাশ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, দেখ দেখ কেমন তাকাচ্ছে! ওই দেখ তোমাকে দেখছে।

ওইটুকু শিশু যে কিছুই দেখতে পারে না সে বোধ আমার ওর মত মুছে যায় নি আনন্দের আবেগে। আমি ওর কথায় না ভুলে বললাম, ওকে ওই জায়গায় শুইয়ে দাও। বুদ্ধি ক'রে জায়গাটা বানালাম দেখ ঠিক হ'ল কিনা!

আসলে আমি ওই শিশুটিকে ওর ঘাড় থেকে নামাতে চাইছি, ওর এই আদেখ-লেমি আমার ভাল লাগছে না। কি পাগলামী যে ওটাকে নিয়ে আরম্ভ ক'রেছে সে আর বলবার মত নয়। তাতে আমার যে কিছু অসুবিধে হচ্ছে এমন নয়, অকারণেই অসহ্য হচ্ছে আমার। একবার আত্মজিজ্ঞাসা করলাম, ও যা ভাল লাগছে ক'রছে। করুক না, আমার তাতে কি? কিন্তু সেই মনোভাব আমার স্থায়ী হ'ল না। আসলে আমার মানসিকতার ধারাটাই আলাদা, কারও সঙ্গেই মেলে না। বিশেষ ক'রে জারোমথাঙ্গির সঙ্গে তুলনা করতে গেলে ও আর আমি দুই বিপরীত মানস-বিন্দুর বাসিন্দা। কাজেই দুজনের কোন কাজই যে মিলবে না এ তো স্বাভাবিক, তবে ওর মধ্যে সামঞ্জস্য ক'রে চলবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যা আমার একেবারেই নেই। ও সমস্ত প্রতিকূলতা সহ্য ক'রেও চলতে পারে; আমি কোনও কিছুর সঙ্গেই আপোষ করতে পারি না। তাই ও সব সময়েই স্বচ্ছন্দ, আর আমি সর্বদাই অস্বাচ্ছন্দ বোধ করি। ওর এই বিশেষ গুণের জন্যে ও

যেখানে জেতে সেইসব ক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ পরাজিত হই।

হেরে তো এখানেও গেলাম। জারোমথাঙ্গিই তো আপন ইচ্ছামত বেঁধে ফেলল আমাকে। শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই এসে আত্মসমর্পণ ক'রতে হ'ল। আসলে প্রকৃতির রাজ্যে স্ত্রী একটা প্রতিষ্ঠান। নিজে সে দুর্বল আক্ষরিক অর্থে, কিন্তু কোথাও তার এক অসীম শক্তির বীজ আছে লুকিয়ে। সেই শক্তি তার আপন দুর্বলতা উন্মোচিত করে আবার অন্যকেও কিন্তু আকর্ষণ করে, আশ্রয়ও দেয়। পুরুষ তার আপন পৌরুষকে জেনেছেও সেই শক্তিবীজের সান্নিধ্যেই। ইতিহাস বললে ইতিহাস বা কাহিনী বললে কাহিনী, যাই বলা যাক না কেন পুরুষের আত্মপ্রকাশ প্রায় সর্বদাই নারীকেন্দ্রিক। হেলেনের জন্যে যুদ্ধে পৌরুষের যে আত্মপ্রকাশ সেই আত্মপ্রকাশ সীতার জন্যে যুদ্ধে এবং কিছুটা দ্রৌপদীর জন্যে ভীমের প্রতিজ্ঞাতেও। অথচ এমন বীর্যসম্পন্ন যে সৃষ্টি সেই পুরুষও একা অসম্পূর্ণই নয় তার আত্মপ্রতিষ্ঠাও অসম্ভব একজন নারীর স্পর্শ ছাড়া। একজন নারীর মাধ্যমেই তার আশ্রয় ওঠে গড়ে। নইলে পুরুষ একা উদ্‌ভ্রান্ত, বিচরণশীল ; অরণ্যের অশ্বমাত্র। আপন মুক্তিকে শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে সে অসাফল্য রচনা করে তার স্বভাবগত ফেরারীপণায়। নারী তাকে বাঁধে, তখন তৈরী হয় আশ্রয়। প্রকৃতির ঐ এক বিচিত্র খেয়ালে মহীরুহ বা শক্ত কাণ্ডের চেয়ে লতা অনেক অনেক দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এক গাদা কাণ্ডকে বাঁধবার শক্তি সামান্য এক লতাতেই রাখে, তাকেই ব্যবহার করা হয়। এই বন্ধনকেই বলে জীবন। আর জীবন গড়ে তোলে নারী তার প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতায়।

বন্ধন মেনে নেওয়ার মধ্যে শক্ত ঋজু কাণ্ডগুলোর যেমন হয় না কোন অগৌরব তেমনি পুরুষ হিসেবেও কোন অমর্যাদার চিন্তা আসে না মনে। ফলে ব্রততীবন্ধন মেনে নেওয়া স্বাভাবিকতার একটা অনুভাব হয়ে দাঁড়ায়। আমিও তাই নিঃশব্দে মেনে নিলাম আমার আত্মসমর্পণ। অবশ্য আমার কোন বিশেষ মানসিকতা কোনদিনই ছিল না যাতে মুক্তি বা স্বাধীনতা অথবা অন্য কিছুর কথা চিন্তা করি। আসলে কিছু ভাবনার কথা নয়। কীটপতঙ্গের জীবনে জড়ের জীবন থেকে পার্থক্য প্রাণগত—সপ্রাণ আর নিষ্প্রাণ। এ ভিন্ন আর কি আছে? বরং দীর্ঘদিন ক্রমাগত পরিক্রমায় ক্লান্ত আমি। সে পরিক্রমাও তো আর সহজ পথের ছিল না! স্বাভাবিকতাও ছিল না তাতে। প্রচণ্ড রূঢ়, কঠোর বিশৃঙ্খল লক্ষ্যহীন যাত্রা। অবশ্যই এ যাত্রায় যে বেগ তার নাম উদ্দেশ্যহীনতা। আর এই যে থেমে যাওয়া আত্মসমর্পণের স্থিতি এরই বা কি নাম? এও তো কোন উদ্দেশ্যের সন্ধানে নয়! তবে? তফাৎ কোথায়? কিসের তফাৎ? আসলে শেষ হয়ে যাবার জন্যে সুরু থেকে অপেক্ষা করা—সমাপ্তির প্রস্তুতি।

তাই আমার কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই, রাগ অনুরাগ নেই, জয় পরাজয় কিছুই

নেই। আমি এক কীট, প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির নির্দেশে চলি। ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা আনন্দ বেদনা যদি কিছু থাকে তো জারোমথাঙ্গির থাক। লাভ লোকসানের হিসেব নিকেশ যদি কিছু করবার থাকে তো করুক তা জারোমথাঙ্গি, আমি ওর ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র মাত্র—অংশীদার নই। ও মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয় না এমন নয় কিন্তু আপন মানসিকতার গুণেই সামলে নেয় আপনাকে। মাঝে মাঝে হয়ত সামান্য অনুযোগ করে, আচ্ছা তুমি এমন কেন বল তো?

কেমন? প্রতিপ্রশ্ন করি, ও তার জবাব দিতে পারে না জবাব হয় না। আমি যে কেমন তা আমার চেয়ে বেশী তো আর কেউ জানে না, ব্যাখ্যা ও করবে কেমন ক'রে? সাধারণতঃ ব্যাখ্যা ও করে না, করতে চায় না। নিজেই সারাদিন ঘুরে নানা উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে, আমাকে বিব্রত করে না। আমি বন বেড়িয়ে ফল ফুল কন্দ যা পাই বা পেলে নিয়ে আসি। যে বার ইচ্ছে হয় কিছুটা জমিতে ফসল তৈরী করি ইচ্ছে না হ'লে করি না, সে নিয়ে তো কোন অনুযোগও করে না। কার কাছে যেন জেনে ও বড় মেয়েটির নাম রেখেছে যশোদা। বড় আগ্রহে পিতৃকুলের নামকরণের ধারা রক্ষা ক'রে মেয়ের পিতাকে করে তুলতে চেয়েছে আনন্দিত কিন্তু আমার তাতে বিন্দুমাত্র হর্ষ বা আগ্রহ না দেখে পরের মেয়ের নাম আপন বুদ্ধিতেই দিয়েছে মুঙ্গি। ওর কানন্দের তৃতীয় ফলশ্রুতির নাম অঙ্গে। এটি পুত্র। মাঝে মাঝে মনে হয় সন্তান ধারণ ওর এক বিলাস। ওর গর্ভে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলে আমি শংকিত হই, ও হয় পুলকিত। আমাকে বলে, তুমি অমন কর কেন বল তো? এবার যে মেয়েটি হবে সে হবে নদীর মত। তার নাম রাখব খুজাইলক। এই ওর বর্তমান বাসনা। এই বাসনার নিবৃত্তিতেই যে ওর পরিসমাপ্তি হবে এমনটা ভাবা ভুল। আবার একটা শিশুর জন্যে ব্যাকুলতা দেখা দেবে ওর মনে। অথচ সবগুলোকে নিয়ে মাঝে মাঝেই বিব্রত বোধ করবে, খাবারে টান পড়লে বিরক্ত হবে, তবু এক অদ্ভুত ইচ্ছা ওকে যেন তাড়না করে। মুরগীর পায়ে পায়ে তার বাচ্চারা যেমন করে ঘুরতে থাকে তেমনি অবস্থা প্রায় ওর এখন। আজকাল তম্মু থেকে প্যান্টের কাপড়, সুগন্ধি আরও নানা রকম সহজবহ বস্তু এনে ও বিক্রি করে। সেই থেকে যা রোজগার গ্রাসাচ্ছাদন তাতেই। তবে সামান্য কয়েক ঘণ্টা ও ব্যয় করে ওর উপার্জনের জন্যে বাকি সময় বাচ্চাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। যেন পুতুল খেলা!

ভবিষ্যৎ বলে কিছু আছে এখানে কেউ তা জানে না। এখন আমার মাথার মধ্যে সেই ভাবনা মাঝে-মাঝেই কিলবিল করে। এই যে আগন্তুকেরা কি এদের ভবিষ্যৎ? অজস্র পাহাড়ে অসংখ্য শিশু যে প্রতিদিন জন্মাচ্ছে কি ক'রে বাঁচবে এরা? কখনও এ প্রশ্ন তুললে জারোমথাঙ্গি উড়িয়ে দিতে চায়, কেন? ভবিষ্যৎ আবার কি? এই যেমন সবাই বেঁচে আছে তেমনি বাঁচবে।—ব্যাপারটা ও বোঝে

না বলেই যত সহজে বলে সমস্যা তত সরল নয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই বিশাল পার্বত্য ভূমির যতটা আমি ঘুরেছি তাতে আমার সামনে সমস্যা বড় বিশাল। মাঝে মাঝে ভয় হয় পিলপিল ক'রে জন্মানো মানবকেরা কিলবিল করছে উইপোকার রাশির মত। যদি একটু সুনির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে কোন উপযুক্ত মাধ্যমের সাহায্যে পৃথিবীটাকে দেখা যায় তবে মনে হবে কোন আরশোলার মৃতদেহের উপর জমে থাকা লাল পিঁপড়ের থোকার মত অসংখ্য মানুষও ঝাঁক বেঁধে জমে আছে গাদা হয়ে। নড়ছে চড়ছে। থিক থিক ক'রছে। আপন সংখ্যার অস্তিত্বে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তাদেরই ভবিষ্যৎ।

জারোমথাঙ্গিদের বোধের অতীত বলেই যে ওরা ভাবনাটা উপেক্ষা করে তাই নয়, ভাবনা ওদের চেতনার বাইরে বলে ওরা প্রচণ্ড অবহেলায় ক্ষণিকের সুখের চরমপ্রাপ্তি ত্যাগ করবার কথা চিন্তাই করে না। আমি ওর দাসত্বে বন্দী। আমি তো এক সাধারণ পোকা মাত্র, আমারই বা কোন দায়? দিন কেটে যায় তাই নির্দায় অচেতনতায়। ও আমার অন্নসংস্থান করে আমি ওর শরীর মনের তৃপ্তি বিধান করি। বেঁচে আছি বিনিময়ের অকথিত অলিখিত চুক্তিতে। বেশ আছি। মাঝে মাঝে হরিণের মাংসও জুটে যায় ওরই প্রীতিভাজন ব্যক্তিদের কল্যাণে, আমাদের আশে পাশে শিকার ক'রলেই ভাগ দিয়ে যায় স্বতোপ্রণোদিত শুভেচ্ছায়। অনেক সময় মোনে থেকেও ও পেয়ে যায় পরিচিতজনদের কাছে।

একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে চারিদিকে মনে হচ্ছে আগুন জ্বলছে, গাছ পালা থেকে এমন কি মাটি থেকেও আগুনের হল্কা উঠছে। আমি আমাদের ঘরের সামনের গাছটায় হেলান দিয়ে বসে আছি তার ছায়ায় জারোমথাঙ্গি আর তার বড় মেয়ে বাদে তিনটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে ঘরের মধ্যে সূর্যের তেজ থেকে আত্মগোপন ক'রে আছে হঠাৎ একটা গুলির শব্দ পেলাম কাছেই। আর আমাকে অবাক ক'রে আমার সামনের গাছটা থেকেই ঝুপ ক'রে একটা বানর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে জোড় হাতে মাটিতে আছড়ে পড়ল। স্থানটা উঁচু বলে আমি স্পষ্ট দেখলাম যে ঝোপের ওপরে বানরটা পড়ল সেখানে খানিকটা জায়গার ঘাসপাতা রক্তে লাল হয়ে গেল, পাতা গড়িয়ে রক্ত মাটিতে পড়তে লাগল চুঁয়ে চুঁয়ে। কোথায় গুলি লেগেছে জানি না বানর একটিবারও নড়ল না। কিন্তু আমি ওর হাত জোড় ক'রে পড়বার রহস্য ঠিক বুঝলাম না। এত কাছে শব্দ শুনে জারোমথাঙ্গিও বেরিয়ে এল ঘর থেকে, আমি ওকে বললাম, বানরটাকে কে মারল বল তো?

কই বানর?

ওই তো হাত জোড় ক'রে পড়ে আছে।

বলতে বলতে বন্দুক হাতে একজন লোক এসে হাজির হল। আমাদের দেখে এক মুখ হেসে বলল, ও তোমাদের বাড়ী এখানে! তা তোমরা ইচ্ছে ক'রলে এটা

নিয়ে নিতে পার।

জারোমথাঙ্গি ভদ্রতা ক'রল, তুমি তো আর শিকার পাওনি দেখছি। এটা তুমি নিয়ে যাও। যদি হরিণ মার তো কিছুটা মাংস আমাদের দিয়ে যেয়ো।

লোকটি খুব খুশি। আবার একমুখ হেসে বলল, পাখি মারব বলে ঘুরছিলাম হঠাৎ এটাকে চোখে পড়ে গেল। ঠিক বুকেই লেগেছে গুলিটা, নইলে মরত না এত সহজে। আজ রাতেই হরিণ মারব সকালে তোমাকে দিয়ে যাব।

এই ভরা দুপুরের দুঃসহ গরমে লোকটা বন্দুক কাঁধে ক'রে পাহাড়ে বনে ঘুরছে! বেচারী বানরটা যে এখানেই গাছটার ওপরে ছিল তাও নজরে পড়েছে ওর! লোকটি গিয়ে বানরটার লেজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল আমার সামনে। নিশ্চল দেহ বানরটি সাধারণ প্রজাতির নয়, অন্য ধরনের দেখতে। এ জাতীয় বানর আমি অন্য কোথাও দেখিনি। মৃতদেহটি দেখে আমার বড়ই মায়া হ'ল, এত খারাপ লাগছে যে কি বলব? দুঃখ এবং রাগ দুটোই হ'ল,। এই বানরটাকে না মারলে কি চলছিল না লোকটার! খাবার কি ফুরিয়েই গিয়েছে একবারে? আমি হত্যা অনেক দেখেছি সারা অরণ্য জুড়ে অহরহ যে হত্যাকান্ড চলেছে—সেই ডুয়ার্সের অরণ্য থেকে সুরু ক'রে বহুবারই প্রত্যক্ষ ক'রেছি আমি, ভাল কোন মৃত্যুই লাগে নি তবে এমন ব্যথা কখনই পাইনি। ও কি তবে গুলি ক'রতে দেখেই হাত জোড় ক'রে আত্মরক্ষা ক'রতে চেয়েছিল অনুকম্পা ভিক্ষা ক'রে? এ হত্যা শুধু অকারণ নয় চরম অন্যায়। মানুষের বুদ্ধির বলে মানুষ এই যে অসম যুদ্ধ ক'রে চলেছে—যুদ্ধ কোথায় নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড, এতে কি প্রকৃতির সর্ত ভঙ্গকরা হচ্ছে না? একবার ইচ্ছা হ'ল হত্যার প্রতিবাদ করি, ওর বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে এখনই ভেঙ্গে ফেলি পাথরে আছড়ে। বিরত হ'লাম। তাতে এই হত্যার তো কোন শেষ হবে না। বরং আমার সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত সংঘাতের সূচনা হবে। ওকে যে বোঝাব তাতেও কোন লাভ নেই, আমার কথা ও শুনবে না। হত্যার মধ্যে ওর প্রবৃত্তির প্রকাশ আছে লুকিয়ে। এই বন্দুক ভেঙ্গে দিলে আর একটা জোগাড় ক'রবে, নইলে অন্য অস্ত্র নিয়ে বেরোবে। আসলে ওর মনে যদি না নিবৃত্তি আসে তো এ হত্যা বন্ধ হবে না। তা ছাড়া এই একজনকে এখনকার মত বন্ধ করলেও আরও হাজার হাজার ঘাতক ঘুরছে—এভাবে আমি কাকে বন্ধ করব? নিয়ত তারা অস্ত্র শানাচ্ছে অসহায় এই প্রাণীকুলের দিকে।

লোকটি বানরটির লেজ ধরে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে চলে গেলে আমি যেন কিছুটা স্বস্তি পেলাম। এতক্ষণ আমার মনের মধ্যে কি যে হচ্ছিল লোকটি চলে যেতে বুঝলাম তা। জারোমথাঙ্গির সঙ্গে আমার যেটা সম্পর্ক সেটা মুখ্যত শারীরিক; মানসিক কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে, কারণ ওর সঙ্গে কোন বিষয়েই কোন আলাপ আলোচনা করবার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু আমাদের ক্ষেত্রে বলেই নয়

এই পাহাড়ী জীবনে মানসিকতার চর্চা অত্যন্তই সীমাবদ্ধ। একটা বনমোরগ যেমন সময় বিশেষে আর একটির গা চুলকে দেয় অথবা কোন হরিণ অন্য এক হরিণের গা দেয় চেটে, পাহাড়ী জীবনে মানসিক সম্পর্ক কেবল ততটুকুই। পাহাড়টুকুর মধ্যে অথবা ঢালুতে যে জঙ্গল তারই বেষ্টনীতে যে জীবন সীমাবদ্ধ সেখানে ভোজন নিদ্রা রমণের বাইরে আর জ্ঞানের সীমানা নেই কাজেই আলোচনা কিসের বা হবে? আর দশটা বন্যপ্রাণীর মতই প্রাণধারণ আর প্রকৃতির অনুসরণই জীবন এখানে। পোকামাকড় বা অন্যান্য বন্যপ্রাণীর ক্ষেত্রে জীবন শরীরকেন্দ্রিক—মন বলে কোন অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্বই সেখানে অনুপস্থিত।

পরের প্রত্যুষে সত্যিই লোকটি একটি মৃগশাবকের মৃতদেহ এনে হাজির ক'রতে সদ্য ঘুমভাঙ্গা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হৈ চৈ করে উঠল জারোমথাঙ্গিও আনন্দে। আমি ঘর থেকে বাইরে এসে দেখলাম মৃতশিশুটি পড়ে আছে ওর চোখের জলের দাগ লম্বা হয়ে আছে অনেক নিচ পর্যন্ত। জান্তব আনন্দে জারোমথাঙ্গি উদ্বেল অথচ ওর ছেলেমেয়েদের থেকে মৃত শিশুটির কোন পার্থক্য যে নেই সেই কথাটা একবারও মনে আসছে না ওর। মৃত শিশুটি বুলেট বিদ্ধ হবার যন্ত্রণায় কেঁদেছে, ওর অশ্রু মোচিত হয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণাতেও। কাল যেমন বানরটার জন্যে হয়েছিল আজ ততোধিক বেদনা হ'ল মৃগশিশুটির জন্যেও। আমি শিকারীটিকে বললাম, তুমি ওটি নিয়ে যাও।

ঘাতকটি তার সমস্ত দাঁতগুলো বের ক'রে হেসে বলল, কাল তোমাদের বানর মেরেছিলাম বলে আজ এটা দিয়ে গেলাম। এটা এখানে মারিনি, কথাবস্তির রাস্তায় মেরেছি। আজ আমার বানরের মাংস আছে।

থাক। তুমি নিয়ে যাও।

ছেলেমেয়েগুলো আর তাদের মা-ও একসঙ্গে আমার কথার প্রতিবাদ ক'রে উঠল সমস্বরে। তারা এ মাংস কিছুতেই দেবে না। এমন উপাদেয় খাদ্য পাওয়া যাবে এ তারা ভাবতেই পারে নি, এ কি কখনও ছাড়া যায়? ছেলেমেয়েদের কথা শুনে লোকটিও বড় খুশি, সবসময় হাসি হাসি ভাবে বেরিয়ে থাকা দাঁতের মানুষটা বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে তোমরা সব খাও। বলে পরম তৃপ্তিতে একটা বর্মী কাঁচাপাতার বিড়ি যা নাকি চুট্টার মত, ধরাল পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে, মনের সুখে তার ধোঁয়া টানতে লাগল। আমি সকলের মতের বিরুদ্ধে একা হয়ে গিয়ে ওখান থেকে সরে এলাম।

আমার খুবই খারাপ লাগছে। অসহায় প্রাণীগুলোর আত্মরক্ষার আর্তি আর চোখের জল আমাকেও যেন বেদনায় বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছে। ছোট্ট একটি হরিণ-শিশুর অকাল মৃত্যু, তার মৃত্যু যন্ত্রণা, অর প্রতি নিষ্ঠুরতা অথবা আমার চোখের

সামনে ক্লান্ত বানরটার আপন আশ্রয়ে গুলিবিদ্ধ হওয়া, তার বাঁচবার আকুতিতে হাতজোড় ক'রে প্রাণভিক্ষা করা, সবই আমার বেদনার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সেই সঙ্গে আমার অক্ষম অসহায়তা, আমার ক্লীবত্ব সব আমাকেই যেন বিদ্ধ ক'রছে বিদ্রূপে। ওখান থেকে উঠে এসেও আমার নিষ্কৃতি নেই। সেই যন্ত্রণা আমাকে ছায়ার মত, না ঠিক ছায়ার মত নয় আমার শরীরের অংশ হয়ে বুকের মধ্যেই শক্ত হয়ে বসে আছে। ওদের যন্ত্রণা তো ওদের প্রাণের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে আমিই তাকে বুকের মধ্যে ক'রে বয়ে বেড়াচ্ছি। এ দহন অকারণ কিন্তু বহন আমাকে ক'রতেই হচ্ছে পরিত্রাণহীন অসহায়তায়। কিছু একটা প্রতিকার ক'রতে পারলে এই বেদনা থেকে অব্যাহতি পেতে পারতাম। কি করি ?

সারা সকাল কিছু খুঁজে পেলাম না। কোন কাজও ক'রতে পারলাম না। একবার ভাবলাম নেমে যাই লোকালয়ের দিকে, কাঠ চেরাই কলের তীব্র শব্দের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াই হয়ত এই বেদনা থেকে অব্যাহতি পাবার সুযোগ পাব। বহুদিন যাইনি বলে যেতে কেমন বাধো বাধো ঠেকছে। সেই যে মিল ছেড়ে উঠে এসেছি তারপর একটা দিনই মাত্র নেমে মোরেহ বাজারের দিকে গেছি, দ্বিতীয়বার নয়।

তবু এলাম। কাঠ চেরাই কারখানাতেই হাজির হ'লাম সোজা। আমাকে দেখেই রবিবাবু যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, আরে! কোথায় হঠাৎ চলে গেলে কাউকে না বলে! কোথায় ছিলে এতদিন?—আমার কোন জবাবের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই বললেন, যাক আজ এসে পড়েছ ভালই হয়েছে! গৌরহরি মিস্ত্রি আজ আসে নি তুমি কাজে লেগে পড়। তোমার আগের তিন দিনের টাকা বাকি আছে সেটাও নিয়ে নিয়ো আজ। আমি তো কাজ ক'রব বলে আসি নি তবু লেগে পড়লাম। একজন লোক কম থাকায় অন্য কর্মীদের যে অসুবিধে হচ্ছিল আমাকে পেয়ে তারাও খুশি। আপপাইয়া ঠাট্টা ক'রে বলল, তোমাকে কি গৌরহরি পাঠিয়ে দিল ?

আমি বললাম, মনে ক'রতে পার।

সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যেতে পেরে আমি অন্যমনস্ক হবার সুযোগ পেলাম। কাজের চাপ আমার মনের ভার নিমেষে কোথায় সরিয়ে দিল। ভালই হ'ল। দুপুরে খাবার সময় সহকর্মীরা সবাই ডাকল আমায়। কিন্তু আমার জন্যে তো রান্না হয় নি, খাই কি ক'রে? রবিবাবু সমাধান ক'রলেন তাঁর বাড়ীতে খেতে দিয়ে। ধনবান লোকের বাড়ী বাড়তি রান্না হয়েই থাকে। বহুদিন বাদ রান্না করা খাবার খেলাম, বড় ভাল লাগল। গোটা একটা মাছের ঝালও পাতে পড়েছিল, এতদিন বাদে অমন মশলা দিয়ে রান্না খাদ্য অল্প বয়সের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। রসনা প্রলুব্ধ হ'ল কিন্তু মাছের ঝাল আমি খেলাম না। কোন প্রাণীকে হত্যা করে আমার রসনার পরিতৃপ্তি আমি আজ থেকেই ত্যাগ ক'রলাম। স্থির ক'রলাম সক্রিয়

ভাবে হত্যা বন্ধ ক'রতে না পারলেও নিজে আর জীবনে প্রাণীজ খাদ্য খাব না। প্রতিকারে অক্ষম আমি নীরবে প্রতিবাদ তো ক'রতে পারি, এই আমার নিঃশব্দ নিরুচ্চার প্রতিবাদ। প্রতিবিধান ক'রতে পারিনি বলে সারাজীবন এই প্রতিরোধ বয়ে বেড়াব আপন সম্প্রদায়ের হয়ে প্রায়শ্চিত্তের মত ক'রে।

সন্ধের আগেই মিল বন্ধ হ'তে আমি বললাম, আমার টাকাটা দিন।

একথার জন্যে রবিবাবু তৈরী ছিলেন না। উনি ভেবেছিলেন ফিরে এসেছি থেকে যাব যেমন ছিলাম। আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক সেটাই ভেবেছেন উনি। বললেন, তুমি থাকবে না?

আজ তো কাজ ক'রে দিলাম—

কোথায় যাবে? থাকবে কোথায়?

কিছু একটা বলতে হয় বলেই বললাম, নাগা বস্তিতে।

উনি আর কথা না বলে আগের তিনদিনের টাকা মিটিয়ে বললেন, কাল সকালে কাজে এসো। গৌরহরি এলেও তোমার কাজ হবে।

কালকে যে আমি আসব না সেকথা এখনই বলতে পারি, বললাম না। উনি সন্দেহ ক'রলেন। জানতে চাইলেন, কি আসবে তো? আর তো কোন কাজ নেই, চলে এসো।

প্রধান মিস্ত্রি সামনে ছিল সে-ও বলল যেন চলে আসি আগামী কাল। আমার রান্না হবে মেসে। এদিকে অন্ধকার নেমে আসছে, অনেকটা পথ পার হ'তে হবে আমাকে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। সাপ বা বিছেরা তো আমাকে ছেড়ে দেবেনা ওদের কাছে পা পড়লে! অন্য কোন বড় জাতের প্রাণীর ভাবনা না হয় প্রথম সন্ধ্যায় নাই ক'রলাম। তাই আমার ফিরে যাবার ব্যাগ্রতা। আবার ভাবলাম না ফিরলেই বা কি? থাক, আজ এখানেই থেকে যাই! কিন্তু এখানে থাকলে সকালে উঠে তো আর যাওয়া যাবে না, কাজ কাল ক'রতেই হবে। নাঃ আজ আমার প্রয়োজন হল বলে কাজ ক'রেছি তাই বলে কালও ক'রব? দূর। আমি দরজার দিকে পা বাড়িয়ে মিস্ত্রিকে বললাম, কাল আসব না। চেরাই কাঠের ফেলে দেওয়া গাদা থেকে একটা লাঠির মত কাঠ তুলে নিয়ে রওনা হলাম। নাঃ এবার ফিরব। পোকা মাকড় পশুপাখি প্রত্যেকেরই একটা আস্তানা থাকে, সেই আস্তানায় ফিরে যাব পিঁপড়ের মত।

মৃগশিশুর ঝলসানো দেহের অনেকটা অংশ রাত্রে খাবার জন্যে রাখা ছিল, আমাকে ফিরতে দেখে উৎসাহিত জারোমথাঙ্গি উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, এইতো এসেছ! তোমার জন্যে মাংস রেখে চারিদিকে খুঁজলাম, কোথায় ছিলে সারাদিন? সেই যে সকাল বেলা চলে গেলে—

কি খেয়াল হ'ল মিলে পাওয়া টাকাগুলো ওর হাতে দিয়ে বললাম, নাও। কাঠ

মিলে পেতাম নিয়ে এলাম।

ও আমার কথায় খুবই খুশি হয়ে বলল, কাঠ মিলের মহাজন ভাল মানুষ। ওর কাছে কাজ ক'রলেই তো পার।

একথার জবাব দিলাম না। ঘরের মধ্যে ছেলে মেয়েরা ট্যাঁ ভ্যাঁ ক'রছিল, আমি ঢুকতেই জারোমথাঙ্গি মাংসের তাল বের ক'রে বলল, তুমি খাও ওদেরও দাও।

বুঝলাম, আজ এই মাংস পেয়ে আর কিছু রাঁধে নি জারোম, অথচ এই মাংস আমি খাব না। কিন্তু কেন যে খাব না সেকথা ওকে বলে লাভ নেই, ও বুঝবে না। তাই বললাম, তুমি খাও। আমি আজ খাব না।

সে কি! এমন নরম মাংস খাবে না। এত সুন্দর মাংস তুমি অনেকদিন খাওনি একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

হোক। আমার আজ খাবার ইচ্ছে নেই। দুপুরে খুব খেয়েছি মহাজনের বাড়ী। এখন শুয়ে পড়ব।

ছেলেমেয়েগুলো তাল তাল মাংস দুহাতে মুখে তুলে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে আর আনন্দ উৎসাহে কেমন একটা শব্দ ক'রছে মুখে। দৃশ্যটা না দেখবার জন্যে আমি ওদের দিকে পেছন ফিরে শুয়ে পড়লাম। বাইরে অন্ধকার তবু রাতটা শুক্লপক্ষের বলে তার ঘনত্ব কম। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালানোর আলো আলো ভাব।

ওদের খাওয়া যে কখন শেষ হ'ল কখন যে ঘরের আগুন নিভল আমি কিছুই টের পাইনি। সারাদিন কাঠ ঠেলাঠেলির পর শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভাঙ্গল জারোমথাঙ্গির জাপটে ধরায়। আমাকে সমস্ত শরীর দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। এখন রাতের কোন প্রহর কে জানে, কিংবা সদ্য শুয়েছে কিনা। ও ঘুমের ঘোরে ধরল না জেগে আছে বোঝবার জন্যে আমি নড়াচড়া না ক'রে পড়ে রইলাম যেন আমার ঘুম ভাঙ্গেনি। আস্তে আস্তে ও আমাকে জোরে জাপটে ধরল, বুঝলাম সম্পূর্ণ জ্ঞানে আমাকে জাগাবার চেষ্টা ক'রছে। একটু নড়াচড়া ক'রতেই ও আমাকে ওর দিকে ফেরাবার জন্যে আকর্ষণ ক'রল।

তবে কি ও আদৌ ঘুমায় নি? ওর দিকে ঘুরে জানতে চাইলাম। ও জানাল ওর ঘুম আসছে না। প্রায়ই রাত্রে যে ওর কি হয় ঘুম আসে না। আর এই ঘুম না আসা রাত্রে ওর সামান্য শরীরে দৈত্যের শক্তি আসে। আমি ইদানীং ওর এই রাতগুলোকে ভয় ক'রতে আরম্ভ ক'রেছি। এখন যেন মনে হয় আমার শরীর জুড়ে অপরাহ্ণ বেলার ম্লান শিথিলতা। অবিচ্ছিন্ন নিদ্রায় আমার বেশী সুখ। ক্লান্তি নেমে আসে সহজেই আমার অঙ্গে, প্রায়ই লেগে থাকে আমার সঙ্গে। অথচ আশ্চর্য ওর অবসাদ নেই অবসন্নতাও নয়, সমস্ত দিন তম্মু ঘুরে এসে সংসারের ঝক্কি সামলিয়েও ওর মনে শরীরে ক্লান্তির কথা আসে না। আমি ওকে বললাম,

ঘুমাও।

তার জন্যে গোটা রাত পড়ে আছে, ও বলল। তারপরই বলল, জান, ঘরটা এবার একটু বাড়াতে আর ভাল ক'রতে হবে। কাল আমি গিয়ে কাঠ মিল থেকে ছাল আর বাগা নিয়ে আসব। তুমি কেবল মহাজনকে বলে কিছু পাতলা কাঠ এনো তাহলেই হয়ে যাবে। ঘরটা ভাল ক'রব।

এত রাতে তোমার সে কথা খেয়াল হ'ল ?

দিনের বেলা তুমি কোথায় থাক আর আমি কোথায় কিছু তার ঠিক থাকে না। কতগুলো গাছ কেটে খুঁটি ক'রে আর একটু উঁচু ক'রব ঘরটা একটা শুয়োর পুষব।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে যত রাজ্যের স্বপ্নের আবির্ভাব হয় জানি, তা ব'লে রাত জেগে ওর যত স্বপ্ন সাধের কথা বলার স্বভাব এতবড় পৃথিবীতে দ্বিতীয় কারও আছে কিনা জানা আমার সম্ভব হয় নি। সময় তো দ্রুত চলে, বাচ্চাগুলোর জন্ম দিয়ে আমি এখন বছরের হিসাব ক'রতে পারি এই যে এতগুলো বছর ওর ঘনিষ্ঠ সঙ্গে আছি এর প্রথম থেকেই ওর নানারকম স্বপ্ন দেখার অভ্যেস দেখে আসছি। এত ইচ্ছাও একজনের মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে পারে! একটা মরে না গেলে ওর সন্তানের সংখ্যা হ'ত ছটি। শেষ ছেলেটি টলে টলে চলে, ও তার নাম রেখেছে জাঙ্গিরাঙ্গা—কি খুশি এই ছেলেকে নিয়ে। ওর যে বিচিত্র বাসনা আমাকে সব চেয়ে অবাক করে তা হচ্ছে নিচে মোরেতে কে এক নাগা মেয়ে আছে ফুংগ্রেই বলে সতেবটা সন্তানের জন্যে নাকি বড় গর্ব তার, ও সেই গর্ব নাশ ক'রবে। এমন বিচিত্র ইচ্ছার কথা প্রথম যেদিন শুনলাম আমার মনে হ'ল ওর নিশ্চয় মাথাব গণ্ডগোল আছে। অথবা হয়ে গেছে কোন কারণে। কিন্তু এই এক বিচিত্র বাসনা ছাড়া মাথার গণ্ডগোলের আর কোন লক্ষণ না দেখে পরে অবশ্য আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু ওর নিজের অবস্থা যা-ই হোক আমাকে পাগল করবার পক্ষে ওর এই একটা ইচ্ছাই যথেষ্ট।

তবে আমি কিছুতেই বিশেষ মাথা ঘামাই না। ওর কোন ইচ্ছার সঙ্গে আমার মানসিক সংযোগ নেই। তাই দৈনন্দিন কাজে আপন খুশিতে চলে ও, তবু দেখি প্রায় কথাই আমাকে বলে, সব কাজেই আমাকে অকারণে জিজ্ঞাসা করে। যে কাজই ক'রতে চায় আমি তাতে আপত্তি করি না। কেবল শুয়োর পোষবার কথাতে প্রশ্ন ক'রলাম, শুয়োর দিয়ে ক'রবে কি ? বাচ্চা হ'লে কে সেই বাচ্চা মারবে ? আমাকে দিয়ে ও কাজ কিন্তু হবে না।

তুমি আজ মাংসটা তো খেলে না—চমৎকার মাংস ছিল। ছেলেমেয়েরা সব খেয়ে নিয়েছে নইলে সকালে তোমাকে খাওয়াতে পারতাম।

এই সুযোগে আমি ওকে বললাম, আমি মাংস আর কোনদিনই খাব না।

আমাকে আর কখনই দিয়ো না।

সে কি ? ও বেশ বিস্মিত হয়ে আমাকে আঁট ক'রে ধরল, জানতে চাইল, কেন, খাবে না কেন ?

আমাদের দেশে অনেকে মাংস খায় না, অনেকে একটু বয়েস হলে খাওয়া ছেড়ে দেয়।

আমি জানি ও কেবল আমাদের নিজস্ব প্রথার নাম দিয়ে কিছু বললে তা মন দিয়ে শোনে, মানে। আমার কথা শুনে বলল, তোমার কি অনেক বয়েস হয়েছে ? এখনও কত শক্ত তুমি। আচ্ছা তাহ'লে আমাকেও মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে আরও কিছুদিন বাদে ?

কেন ?

আমি যে তোমার সঙ্গে বিয়ে ক'রলাম ! তোমাদের মত হয়ে গেলাম !

না না। তা কেন ছাড়বে ? তোমাকে কিছুই ক'রতে হবে না, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনই ক'রবে।

আমার বড় ইচ্ছে হয় তোমাদের দেশটা কেমন দেখতে।

সেখানে পাহাড় নেই। মানুষে সমস্ত বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার ক'রে ফেলেছে অনেক দিন আগেই। এখন মানুষ আর মানুষ। যত গাছ তোমাদের এই পাহাড়ে তত মানুষ ওখানে।

এত ! গির্জা আছে ?

কোথাও কোথাও আছে। তবে কম !

ফাদার পিটার কয়েকবার কোথায় যেন চলে গেছেন বলতেন সমভূমির দেশে, সেখানকার গির্জায় কি সব কাজে যেতেন।

ডানা ছাড়ানো পাখির মত শরীরের স্পর্শ ওর। আমি ওর এই কথার ঝড় থামাবার জন্যে ওকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা ক'রলাম। হঠাৎ আমাদের ঘরের পাশেই একটা চিতা ডেকে উঠল। আমাদের শরীরের ঘ্রাণ পেয়ে হয়ত প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে ওর রসনা। ভয়ের অছিলাতেই ও আমার শরীরের যেন একদম ভেতরে ঢুকে যেতে চেষ্টা ক'রল। বিশেষ ভয় পাবার কিছু নেই কারণ ছোট-জাতের চিতা ঘরে ঢোকবার চেষ্টা ক'রলেও সফল হবে না। নিচে দিয়ে ঘুরে ফিরে সে দেখতে পারে, হতাশ হয়ে তাকে অন্যপথ দেখতে হবে। ভয় ছিল ভল্লুক হলে, সুবিধের মধ্যে এই যে এ অঞ্চলে ওই জন্তুটা নেই, তাদের অস্তিত্ব আছে উখরুলের দিকে। এদিকে সবচেয়ে ভয়ের জানোয়ার কুকুর। বুনো কুকুরগুলোকে দেখলে হরিণ নীলগাই তো কোন ছার কালোবাঘ কিংবা চিতা পর্যন্ত প্রাণের ভয়ে দৌড়ায়। ওদের হাত থেকে পার পাওয়া কঠিন।

সকালে আমার ঘুম ভাঙ্গতেই দেখলাম জারোমথাঙ্গি চেঁচাচ্ছে তার একটা মোরগ

নেই। ঘরের মধ্যেই থাকবার কথা মুরগীগুলোর মোরগটারও, কাল কি তবে ঘরে ঢোকানো হয়নি ওটাকে? যশোদাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। মুরগী তাড়িয়ে ঘরে ঢোকাবার কাজটা ছেলে মেয়েরাই করে, যশোদারই খেয়াল রাখবার কথা। ও এতই ছেলেমানুষ যে অত দায়িত্ব তার পক্ষে বহন করা সম্ভব কিনা সেকথা চিন্তা না ক'রেই ওদের মা ওর ওপর মানসিক উৎপীড়ন চালাতে লাগল। সে মোরগ রাতে ঘরে যদি না ঢুকে থাকে তো গেছে। তার জঠর প্রবেশ হয়ে গেছে কাল রাত্রেই। অন্ধকারে অচল প্রাণীকে উদরস্থ করা তো অনেক শ্বাপদের পক্ষেই সম্ভব। হয়ত যে নেকড়ে রাতে ঘুরছিল তারই ভোগে লেগে গেছে মোরগটা। যার পেটেই পৌঁছে থাক, চোরের দায়ে ধরা পড়েছে বেচারী যশোদা। আমি নির্দোষ বেচারীকে দায়মুক্ত করবার জন্যে বললাম, অকারণ ওকে ব'কো না। ছেলেমানুষ ভুল যদি ক'রেই থাকে তো কি করা যাবে?

কি করা যাবে মানে?—মেয়েকে ছেড়ে আমার ওপর আছড়ে পড়ল জারোমথাঙ্গি, একটা ধাড়ী মোরগ মায়া ক'রে নিজেরা খেলাম না দল নষ্ট হবে বলে আর চিতার পেটে চলে গেল সেটা!

পরিবেশ লঘু করবার চেষ্টায় বললাম, তোমার তাহ'লে মোরগটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে না, ওটা খেতে না পারবার জন্যেই যত দুঃখ!

আমার দুঃখ খাবার জন্যে?—যেন লাফ দিয়ে পড়ল ও আমার ঘাড়ে, এখন অমন একটা মোরগ কোথায় পাব সেটা বলতে পার? কি ক'রে জোগাড় ক'রব?

এই সামান্য ব্যাপার তুমি পারবে না এমন কথা আমি ভাবতেই পারছি না। তুমি হয়ত রাগ করবার জন্যেই রাগ ক'রছ।—কথা বলতে বলতেই আমি লক্ষ্য ক'রেছিলাম যশোদা ফাঁক পেয়েই চোখের আড়াল হয়ে গেছে। বাঁচবার সুযোগে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আঙ্গা থুঙ্গিও। আমার চাটুকারিতায় মোরগের শোক ভুলতে ওর বেশী সময় লাগল না। আজকাল খোঁজ খবর ক'রলে মোরের নাগা বস্তিতে মোরগ বা মুরগী কিনতে পাওযা যায়, ও স্থির ক'রল সেখান থেকেই কিনে আনবে। তারপরই বলল, আজ রাতেই ও চিতাটাকে মারবে।

আমি মজা ক'রে বললাম, সে কি! আবার চিতার ওপর রাগ হ'ল কেন?

আজ ওটা আবার আসবে মোরগা খাবার লোভে—

চিতাটাই যে তোমার মোরগ খেয়েছে একথা কি ক'রে বুঝলে?

তবে আর কে খাবে? আজ আমি জেগে থাকব, ওকে খাও দিয়ে কেটে দুখানা ক'রব।

আমি রহস্য ক'রে বললাম, জেগে তো কালও ছিলে!

লজ্জিত হেসে ও বলল, কাল রাতে বড় ঠান্ডা ছিল। উঠতে ইচ্ছে ক'রছিল না, তাছাড়া ও যে আমার মোরগা মারবে তা তো বুঝি নি!

ঠাণ্ডা তো আজ রাতেও পড়বে। মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা এবার একটু বেশীই পড়বে। তুমি বরং এখন থেকেই ঠাণ্ডার থেকে বাঁচবার জন্যে তৈরী হও। ছেলেপিলেদের সব গা ঢাকবার বন্দোবস্ত ক'রতে হবে তো!

সেই জন্যেই তো ঘরটা একটু বড় করতে চাইছি ভেতরে আগুনের বন্দোবস্ত ক'রতে হবে নইলে রাতে বড়ই কষ্ট হয়। আজই আমি কাঠ মিলে যাব। তুমি কাজে যাবে তো কাঠ মিলে?

না!

গেলেই তো পারতে, মহাজন তো টাকা দিয়ে দেয়।

তুমি যাও। কিন্তু অত দূর থেকে বাগা বয়ে আনতে পারবে? অসম্ভব।

দু চারটে ক'রে নিয়ে আসব। যশোদার কথা বল্লাম বটে, ও পারবে না। ও বরং জাঙ্গিয়াঙ্গাকে রাখবে।

শীত এবার সত্যিই খুব জাঁকিয়ে পড়েছে। এমন ঠাণ্ডা সচরাচর দেখা যায় না। সকাল থেকে সন্ধে মনে হয় যেন শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে সমস্ত পাহাড় অরণ্যের ওপর দিয়ে। সেই বাতাসের মধ্যে কোটি কোটি সূচ থাকে যা শরীরের মধ্যে প্রতি লোম কূপ দিয়ে ঢুকতে থাকে প্রচণ্ড তীব্রতায়। সন্ধের পর ঝড় থাকে কিনা জানা যায় না কারণ তখন সবাই ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে আগুন জ্বালিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু প্রচণ্ড ধোঁয়ার জন্যে এক এক সময় দমবন্ধ হয়ে আসে, তখন দরজা খুলে দিলেও বাইরে কুয়াশার চাপে ধোঁয়া বেরোয় না। এমন হ'লে তো কোনদিন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবো সবাই। জারোমথাঙ্গিকে আশংকার কথা বললেও গুরুত্ব দিতে চায় না। ঘরটা তৈরী করবার সময় ওপর দিকে ফাঁক রাখা উচিত ছিল যাতে ধোঁয়া বেরোবার সুযোগ থাকে। আসলে অনভিজ্ঞতার জন্যে অনেক কিছুই করা হয়নি। এখন যা ঠাণ্ডা পড়েছে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে ঘুমানো অসম্ভব। রাতে কোন সময় আগুন নিভে গেলেই ঘুম ভেঙ্গে যায় কনকনে ঠাণ্ডায়। ছেলেমেয়েগুলোকে যত যা পারে চাপা দিয়ে রাখলেও সব কুকুর কুণ্ডলী হয়ে থাকে, মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে ছোটদের কেউ কেউ।

আমার আজকাল শীতটাও যেন বেশী লাগছে! আগে অনেক এলাকাতে এরকম ঠাণ্ডার মধ্যে তো অনেকবারই পড়তে হয়েছে, এত অসহ্য হয়নি। জারোমথাঙ্গি শরীর ঢাকবার যত উপকরণ জোগাড় ক'রেছে এর অর্ধেকও ছিল না আমার সংগ্রহে, তবু অনেকটা অনায়াসেই কাটিয়ে দিয়েছি দিন রাত্রি। অনেক রাত তো আমার গাছের ওপরেও কেটে গেছে অথচ এখন ঘরের মধ্যে আগুনের তাপেও অসহ্য লাগছে মাঝে মাঝে। শরীরের যে পাশটা আগুনের দিকে থাকে সে পাশ তাপে থাকে অন্য পাশটা ঠাণ্ডায় কনকন করে, আপনি ঘুম ভেঙ্গে যায়। এ পাশ ও পাশ ক'রতে

হয় সারারাত ধরে। মাঝে মাঝে শরীরে ব্যথা হয়ে যায়, সকালে উঠেও সে ব্যথা মাংসের মধ্যে জমে থাকে।

আশ্চর্য এই যে এই দুর্বহ ঠাণ্ডার মধ্যেও রাতে কেউ কেউ শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় অথবা জেগে বসে থাকে বন্দুক নিয়ে। তীব্র শীত যেমন আমাদের হাড় হিম ক'রে দিচ্ছে তেমনি কষ্টে আছে তো অন্য বন্য প্রাণীরাও। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের চলাচলের গতি শ্লথ হয়ে যায় বলে মারতে বোধহয় সুবিধে হয় ওদের। আমার কেবল মনে হয় এই তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডায় এত ঘন শিশির আর ঝোড়ো বাতাসের চোটে হরিণগুলোর কি কষ্ট! দিনের বেলাই দু একটা চোখে পড়ে যায়। একদিন সকালে একটা কালো বাঘের বাচ্চা তো চলে এসেছিল আমাদের ঘরের প্রায় কাছেই। ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুটা দূরে গেছি ঘন কুয়াশার জন্যে বিশেষ এগোতে ইচ্ছে ক'রছে না ভাবছি এখানেই কোথাও সকালের কাজ সারি। এখানে কিছু ঝোঁকরা আছে তার মধ্যে বসলে পাশে মানুষ এলেও দেখা যাবে না, তাছাড়া মানুষ তো আর আসছে না এখানে! হঠাৎ দেখি একটা কালো বিড়াল। এই বিজন বনে যেখানে আমরা ছাড়া আর বসতি নেই সেখানে বিড়াল কি ক'রে আসবে? আর বিড়ালটা আকারেও তো বেশ একটু বড়। পরক্ষণেই বুঝলাম বাঘের বাচ্চা। এই রকম ছোট ঝোপ ঝাড়ই তো বাসস্থান হিসেবে পছন্দ করে বাঘেরা—তাহলে ওর বাপমা-ও কাছাকাছি আছে মনে করেই আমি সরে এলাম। ফিরে আর আমি বলি নি কাউকে কারণ, শুনেই তো আক্ষেপ ক'রতে থাকবে জাবোমথাঙ্গি বাচ্চাটাকে না মারার জন্যে। বাঘ দেখলেই তার তেল দরকার হয় এদের, ভল্লুক দেখলেই তাকে মেরে তার যকৃৎ নেবার দরকার হয়, বানর চোখে পড়লেই তাকে শেষ ক'রে তার মাংস খাবার কথা মনে পড়ে। হাতে খাণ্ড একটা সকলের প্রায় সময়েই থাকে; গাছ দেখলেই কেটে ফেলতে ইচ্ছে করে তা কিশলয় মহীরুহ যাই হোক না কেন।

এই কিছুদিনের মধ্যে তো দেখছি মোরেতে অনেক লোক সব কোথা কোথা থেকে এসে বসে গেছে। এখানে ওখানে সব ঘর। তারা সব গাছপালা কেটে ঘর বানাবার জায়গা ক'রে নিচ্ছে ফলে মোরে প্রায় ফাঁকা হতে বসেছে। বড় ধরনের খাংড়া ইয়াঙ্গো গাছ যা ছিল সব তো কেটে কলে চিরে কাঠ ক'রে ফেলল মিলে। আমি ভাবলে অবাক হয়ে যাই যে দ্রুত গতিতে এই মিলে কাঠ চেরাই হয় তাতে এই সমস্ত বন শেষ হতে কদিনই বা লাগবে! দিনে তিন চারটে গাছ অনায়াসে চেরাই হয়ে যাচ্ছে। যারা ঘর বাড়ী করতে আসছে তাদেরও হয়েছে সুবিধে, মিলে এসে কেবল বলছে আমার ওই গাছটা চিরে এই এই মাপের কাঠ তৈরী করে দিন—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই বিশাল বনস্পতি সরু সরু চেরাই করা কাঠে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ যেন এক ধ্বংসের যজ্ঞস্থল। চেরাই মেশিনের পাশেই বিশাল প্রাঙ্গন, গাছপালা কেটে পরিষ্কার ক'রে সেখানেই সব গাছ কেটে এনে ফেলে রাখা হয়, বিশাল সব

বৃক্ষের মৃতদেহ যখন সারি সারি পড়ে থাকে আমার কেমন যেন মনে হয়। এই সব মহীপতি একসময় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আকাশের ছায়া দেখত, মেঘের স্পর্শ, দিনের রোদ, রাতের শিশির মেখে নিত মাথায়, আর নিষ্ঠুর কুঠারের আঘাতে তারা কি অসহায় ভাবেই না ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে খণ্ড খণ্ড হয়ে। এদের শাখায় পাতায় আশ্রিত ছিল যে সব খেচর তারা তাদের আশ্রয়দাতার অপমৃত্যু দেখে আতংকিত হয়ে ব্যর্থ প্রতিবাদে আকাশ মুখরিত ক'রে অন্য বৃক্ষে খুঁজেছে নতুন আশ্রয়।

সবচেয়ে হতভাগ্য হচ্ছে হাতিরা। কাঠ মিলে পায়ে লোহার শিকল বাঁধা যে হাতিদুটো অবসন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমার দুঃখ সর্বাধিক। আপন আশ্রয় যে অরণ্য তাকে উৎসাদনের কাজ ওদের বাধ্য হয়েই ক'রতে হয়। অমন মহৎ প্রাণীকে এই নিষ্ঠুর বন বিনাশের কাজে যে কি নির্মম ভাবে নিয়োগ করা হয় দেখতেই আমার খারাপ লাগে। বিশাল বিশাল বৃক্ষগুলোকে কেটে মাটিতে ফেলার পর অসহায় এই প্রাণীগুলোকে লাগানো হয় সেই সব বিশাল বৃক্ষকাণ্ড টেনে টেনে স্থানান্তর করার কাজে! অনেক সময় শক্তিতে কুলোয় না তখন মাহুত তার ছুরির ফলার মত লোহার শলাকা দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে মাথায়। সেই পীড়নের ভয়ে সাধ্যের বাইরে হলেও গাছের গুঁড়িকে ঠেলতে হয় এদের শুঁড়, দাঁত বা কখনও মাথা দিয়ে। যখন না পারে আপনা থেকেই শব্দ বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে, সেই আওয়াজে থাকে যন্ত্রণার প্রকাশ কিন্তু কান দেয় না কেউ। আপন বাসভূমি বিনাশের কাজে তাদের যেভাবে লাগাতে হয় আমার কাছে মনে হয় এরচেয়ে করুণ এবং দুঃখজনক ঘটনা পৃথিবীতে আর ঘটে না।

অনেকটা এই সব কারণেই কাঠ চেরাই কলে কাজ ক'রতে যেতে ভাল লাগে না আমার। কিন্তু মনের এই বেদনার কথা কাকে বা বলি, কে শুনছে। বরং গত কিছুদিন ধরে দেখছি মনিহার আর মনমোহন বলে দুই মহাজন ইম্ফল থেকে এসে নেমে পড়েছে গাছ কাটার কাজে। ওরা সবাই এখান থেকে খাংড়া ইয়াঙ্গো গাছ কেটে ট্রাকে ক'রে নিয়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। আগে তো এখানে গাড়ী দৈবাৎই আসত এখন দেখছি অনেক গাড়ী কাঠ বইছে। নিচে গেলে দেখতে পাই অনেক মণিপুরী মানুষ এসে জুটেছে মোরের পাকা রাস্তার দুধারে। বড় দোকান ও দু একটা খুলেছে দু একজন লোক এসে, তারা ট্রাকে ভরে নানা রকম ব্যবহারের জিনিস নিয়ে আসে শহর থেকে। আমি একদিন দাঁড়িয়ে দেখে এসেছি দোকানগুলো। হিন্দীভাষী দোকানী জানতে চেয়েছিল কি চাই আমার, নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানিয়ে এসেছি কিছু প্রয়োজন নেই। আসলে ওই সব জিনিষের অনেকগুলোর সঙ্গে দূর অতীতে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, এতদিন বাদে সেই সব নিত্য ব্যবহার্য জিনিষগুলোকে নতুন ক'রে দেখতে কেমন যেন নতুন নতুন লাগছিল। আমি

মোরে বাজারে আসি না বলে জারোমথাঙ্গি এখান থেকে ফিরে গিয়ে নানা রকম গল্প করে আমার সঙ্গে। এখানে যা ঘটে তার গল্প, নতুন কোন দোকান বা বলার মত কোন বাড়ী হ'লে সে খবর, সবই সে সবিস্তারে বলতে চায়, আমি কমই মন দিতে পারি ওর সেই আগ্রহে। আমার কোন নতুন জনপদে আগ্রহ হবার কারণ নেই, বহুজনপদ পেরিয়ে এড়িয়ে এসেছি অবহেলায়। জনপদ হচ্ছে প্রয়োজনের পৃথিবী, সেখানে সকাল থেকেই সময় সুরু হয় প্রাপ্তি বিচারের পরিমাপ-পাত্রে হিসেব ক'রে। দিনরাত্রির আলাপচারিতার মধ্যে শুধুই থাকে বিকিকিনি আর বিনিময়ের মতলব বাজী। শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার জন্যে এত কিছু কাজে লাগে না। প্রয়োজন-বোধ সেখানে একটা বিশাল বেলুনের মত, লোভের বাতাসে তাকে ক্রমাগতই ফোলানো হয়ে থাকে। ফুলতে ফুলতে ক্রমে ক্রমে সেটা পৃথিবীর আকার ধারণ করেছে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করবার ব্যাপ্তি নিয়ে লোলুপ হয়ে রয়েছে প্রচেষ্টার নিরন্তরতায়।

সেই প্রচণ্ড লোভ ছায়া ফেলতে সুরু ক'রছে এখানেও ক্রমান্বয়ে। ইন্দোবর্মা রোডের দুপাশের গভীর অরণ্যে অবিরাম চলছে কুঠারাঘাত। দীর্ঘায়ু মহীরুহেরা প্রতিদিন একে একে পড়ছে লুটিয়ে। তারপর তাদের ভূপতিত দেহ হেঁচড়ে হেঁচড়ে যখন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখতে বড়ই খারাপ লাগে সেই করুণ দৃশ্য। নৃশংস আক্রমণকারী যেমন ভাবে অন্যরাজ্য জয় করে মহান ভূপতিকে করে লাঞ্ছিত, যেভাবে মহান দারাশিকোকে তার আপন কুটিল অনুজ ক'রেছিল অসম্মান তেমনি এ হত্যার রূপ। একদা অরণ্য ইতিমধ্যেই উৎসাদিত, যেখানে ভূমি ছিল ঘন অন্ধকারে আবৃত, বনস্পতিদের ছায়ার আবরণে ভূমি ছিল অসূর্যম্পশ্যা সেইখানে আজ গড়ে উঠেছে মোরেহ জনপদ। আর তাকে কেন্দ্র ক'রেই চারপাশে চলছে হত্যার অভিযান অরণ্য উচ্ছেদ। দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে নতুন সারঙ্গিকের সংখ্যা। প্রতিদিন যেমন অনবরত কুঠারের আঘাতে অজস্র বৃক্ষ পড়ছে লুটিয়ে তেমনি অসংখ্য হরিণও নির্মম বুলেটের আঘাতে প্রত্যেকদিন হয়ে যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন। এ এক ভয়ঙ্কর মারণযজ্ঞ হঠাৎ সুরু হয়েছে, অকস্মাৎ এসে পড়েছে অজস্র অপঘাঞ্জিক। বনবিনাশ এমন ব্যাপকভাবে সুরু হয়েছে যে মনে হচ্ছে শীঘ্র ওরা নিচের দিকটা শেষ ক'রে এই পাহাড়গুলোর ওপর উঠে আসবে। বিনাশের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না ছোট গাছগুলোও—জ্বালানীর জন্যে যে কেউ কেটে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে। আজকাল তো অনেকে জ্বালানী কেটে নিযে বিক্রিও ক'রছে অর্থবানদের ঘরেঘরে। পাকশালার টানেই আরও চারাগাছগুলো বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেন তাড়াতাড়ি। আমরাই কি প্রতিদিন কম কাষ্ঠ জ্বালাই? এই পাহাড়টার ওপরে যত গাছ আছে একমাত্র আমাদের জ্বালানীর চাহিদা মেটাতেই একদিন ফুরিয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা ভাবতে গেলে বিশ্রী লাগে, কিন্তু করি কি? দিনে রান্নার জন্যে আর

রাত্রে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে যে আগুনের দরকার তার উৎস তো কেবল কাঠ—পাহাড় জুড়ে জন্মানো গাছের নিহত দেহ।

আমার এসব ভাবনা আমি মনের মধ্যেই রাখি। কোথায় কা'কে বলব? এমনিতে তো নিঃসঙ্গ জীবন আমার—বাক্যালাপের জন্যেই হোক বা যে কোন প্রয়োজনেই হোক সঙ্গে আছে একমাত্র জারোমথাঙ্গি। ও এসব ভাবনার কথা শুনলে এমন বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন বুঝতে চায় আমি প্রকৃতিস্থ আছি কি না। এতে আমি ওর দোষ দিতে পারি না, ও যে পরিবেশের সন্তান, ওর রক্তে বইছে যে উত্তরাধিকার তা'তে বিশেষ শিক্ষার সাহচর্য ছাড়া ওর পক্ষে আমার মনোভাব বোঝা স্বাভাবিক ভাবেই অসম্ভব। দৈবাৎ আমার মনের কথা কোন দুর্বল মুহূর্তে হয়ত মুখ ফসকে বা তাৎক্ষণিক কোন আবেগে গেছে বেরিয়ে তাতে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি জারোমথাঙ্গির। মনের কথা প্রকাশ ক'রতে না পারার জন্যে তা জমে জমে ব্যথা হয়ে থাকে। কথা বলবই বা কি, কখন বা বলব? আমি পাহাড়ের থেকে নিচেই নামি না আজকাল, এখানে যে থাকি রবিবাবুর লোকজন সবাই জেনে গেছে, রবিবাবু নিজেও যে জেনেছেন তা বুঝলাম একদিন ও'র উপেক্ষা দেখে। আমার জীবনযাপন প্রণালীর জন্যে আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া কোনদিনই কোন স্থিতিশীল লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, রবিবাবুর পক্ষেও ছিল না তবে ঘৃণা উনি যে ক'রতেন না তা বুঝতাম! এখন দেখলাম উনি ঘৃণা ক'রছেন। আমাকে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু না বললেও ও'ঁর ব্যবহার দেখে এ কথা বুঝতে আমার কোনই অসুবিধে হ'ল না।

আর সেই থেকে আমি কাঠ মিলে যাতায়াত বন্ধ ক'রলাম। কাঠ মিলে যাই না বলে নিচে নামারও কোন প্রয়োজন অনুভব করি না। সবচেয়ে যে ব্যাপারটা বিস্ময়কর তাহ'ল জারোমথাঙ্গির সঙ্গে কোন কথাই যদিও এ বিষয়ে বলিনি তবু ও আমাকে একবারও মোরেহ যাবার জন্যে বা কোন কাজ ক'রে অর্থাজনের্র জন্যে একদিনও কিছু বলল না। ও নিজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে সারাদিন মোরেহ বর্মা বা কোথায় থাকে এক এক দিন প্রচুর জিনিষ থাকে সঙ্গে, বিদেশী জিনিষ বাড়ী এনে জমা করে, পরদিনই সেগুলো নিয়ে নেমে যায়। আজকাল ও নাকি ইম্ফলও মাঝে-মধ্যে যায় তখন আর ঘরে ফেরেই না সেই রাতে। প্রথম যেদিন ইম্ফল যায় আমাকে বহুবার বলে অনুমতি নিতে চেয়েছিল। ও কাজের কারণে বর্মার ভেতরে তম্মু শহরে যে যাচ্ছে তাতে আমার আপত্তি নেই যদি ইম্ফলেই ওকে যেতে হয় তো অমত ক'রব কি কারণে। তা ছাড়া মত দেওয়া বা নেবার কি প্রয়োজন? ইংরেজ রাজত্বের কালে মোরেহেতে যখন মাত্র তিন চার ঘর লোকের বসতি ছিল তখন তম্মুই ছিল এ অঞ্চলের ডাকঘর। মোরের চিঠি তম্মু হয়েই আসত, এখন ওটা বিদেশ। আমি এখানে এসে চৌধুরী বাবুর কাছেই শুনেছি এসব

ইতিহাস। উনি খুব আগ্রহে আমাকে শুনিয়েছেন, সানন্দে। সকলেরই এমন একটা বয়েস আছে যখন সে নিজের মনের কথা অতীতের কথা অন্যের কাছে বলতে চায়। সাধারণত দীর্ঘ জীবনের স্মৃতিচারণ দীর্ঘ হয় বলে শ্রোতা জোটে না, বলার অবরুদ্ধ আগ্রহ যায় বেড়ে, কাউকে একটা ধরতে পারলেই পুরাতন দিন উঠে আসে, বাঙ্ময় হয়ে ওঠে ইতিহাস। মাখন চৌধুরীও আমাকে সেই শ্রোতা পেয়ে অনেক পুরানো কথা উজাড় ক'রে দিয়েছেন যা এখন স্মৃতিমাত্র। যে তম্মু একসময় স্থানীয় ডাকঘর ছিল সেই জায়গাটাই এখন এক অনতিক্রম্য বিদেশ ভাবতে কেমন লাগছে আমার। মাখনবাবুর যে কেমন লাগে কি ক'রে বলব! স্বাভাবিক ভাবেই ওঁর আরও খারাপ লাগবার কথা। বিভেদ বিভাজন এক এমনই ঘটনা যে নিমেষে আপন পর হয়, নিজের জিনিষ নিজের ঘর অন্যের হয়ে যায়।

এ ব্যবধান সকলেই জানে অনেকে মানে না। মানলে চলে না। প্রতিদিন অসংখ্য দরিদ্র বর্মী এদিকে আসে তাদের ক্ষেতে জন্মানো জিনিষ বেচতে, মনিহার এবং অনেকে ওদিক থেকে নিয়ে আসে গাড়ী গাড়ী পিতল, ভরি ভরি সোনা। রবিবাবু কেটে আনেন ভাল ভাল সেগুন গাছ। বিনিময়ে এখানের ক'জন দোকানীর কাছ থেকে ওরাও ওদের নিত্য প্রয়োজনের সামগ্রী নিয়ে যায় ফিরতি পথে। জারোমথাঙ্গির মত সামান্য মানুষেরা আনে দু দশগজ কাপড়ে অথবা নিত্যব্যবহারের প্রসাধন দ্রব্য যা জাপান বা থাইল্যান্ড থেকে পূর্বপ্রান্তের পথ দিয়ে এসেছিল ব্রহ্মদেশে! আশ্চর্য এই যে এইসব অকিঞ্চিতকর জড় বস্তু কেমন গতিশীলতা পায়। পূর্ব প্রান্ত দিয়ে ঢুকে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে আসছে বেরিয়ে। আর এ চলাচল নিরন্তর চলছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন আমাকে জারোমথাঙ্গি বলল, আজ তুমি একবার ইম্ফল যেতে পারবে?

ইম্ফল! আমি আকাশ থেকে পাড়লাম। সে জায়গাতে আমি কোনদিন গেছি বলে মনে পড়ল না। আমি তার কিছু চিনি না, তাছাড়া এখন আমার আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। সেদিন কি একটা ছোট্ট কৌটো এনেছিল জারোম, আমাকে অনেক আগ্রহ ক'রে দেখাল ছোট্ট কৌটোর মধ্যে আবার ছোট্ট একটা আয়না ছিল। সেটা দেখতে গিয়ে বহুদিন বাদে নিজের বাহ্যিক প্রতিবিম্ব দেখে ফেলেছি। স্বচোক্ষে যা দেখলাম তাতে এটুকু বলতে পারি পুরানো কোন পরিচিত স্থান তো দূরের কথা সাধারণ লোকালয়ে গেলেও আমাকে কেউ সুস্থভাবে নেবে না। অখুশি আমি অবশ্যই হইনি কারণ লোকালয়ে যাবার আমার প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি মোরে পর্যন্ত নয়। মাঝে মাঝে আমি যখন কোন গাছ বা ফলের সন্ধানে পাশের পাহাড়টায় যাই চূড়ায় উঠলে বহুদূরে নিচে মোরেহ জনপদে জন চলাচল দেখি। চারপাশের গাছপালা কেটে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে মোরেহ—দিনে দিনে যেন বেড়েই যাচ্ছে তার জনবসতি। হঠাৎ কখনও মনে হয় আচ্ছা সর্বত্রই কি এইরকম

হয়েই বেড়েছে মানুষ? এইরকম পিলপিল করেই বাড়ছে জনসংখ্যা? হবেই বা না কেন, এক জারেমথাঙ্গি আর আমার থেকেই উৎপত্তি হ'ল ছজনের। জারেমথাঙ্গি অখুশি। ওর চেনা জানা অন্য মেয়েদের কারও সন্তানই এত কম নয় বলে ওর এই সংখ্যাস্বল্পতা ও অসম্মানের মনে করে। আমার প্রতি ওর সামান্য অসন্তোষও যেন লক্ষ্য করি ইদানীং। এ নিয়ে আমি কিছু মনে করি না, কারণ আমার প্রতি অসন্তোষ কিছুমাত্র অমূলক নয়,বরং আমার প্রতি ওর এতদিনের যে অনুরাগ এবং প্রীতি সেটাই বিস্ময়কর। আমার ওপর রুষ্ট হবার অনেক কারণই তো আছে, প্রীত হবার মত দেখি না। যে লোকের কোন দায়িত্ববোধ নেই, কর্তব্য ভাবনা নেই, তার প্রতি অবিচ্ছিন্ন অনুরাগের কি কারণ থাকতে পারে? ওর যে আছে সে নেহাতই ওর স্বভাবের মাধুর্যে। বরং ওর সম্বন্ধে সত্য এই যে ওর আকৃতিগত রূপ আর প্রকৃতিগত রূপ মেলে না। দৃশ্যতঃ ওর কোন আকর্ষণ নেই অথচ ওর স্বভাবে এমনই মাধুর্য যে ওর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই। একদিন ও নিজেই বলে ফেলল, বড় অদ্ভুত মানুষ তুমি!

আমি একটু হেসে বললাম, তুমি এই কথাটা আজ জানলে!

ও প্রত্যুত্তর ক'রল না। যে জন্যে ও কথাটা বলল এবং আমার জবাবের প্রত্যুত্তর ক'রতে পারল না সেটা আমার অনুমেয়। ওর অত্যন্ত গভীর প্রীতির স্পর্শ পেয়ে আসছি যে আমি সেই লোক ওর অসন্তুষ্টিতেও কেন যে বিচলিত বোধ ক'রছি না ওর কথার কারণ তাই। সেটা আর মুখ ফুটে বলে কি ক'রে? আমিও ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রেখেই মজা পেলাম। যশোদা এখন বেশ একটু বড় হয়ে গেছে, ভাত তৈরী সে নিজেই করে। বেশীর ভাগ দিনই তো অন্য কিছু ক'রতে হয় না বলে কোন ঝামেলাই নেই। পরের গুলোও তলায় তলায় ঠিকই বেড়ে উঠছে ওগুলোর স্বভাব হয়েছে অনেকটাই আমার মত—আঙ্গা ছেলে বলে তো বটেই এমন কি থুঙ্গি যে মেয়ে সে পর্যন্ত এই আট ন বছর বয়সেই ঘুরে বেড়ায় বনে জঙ্গলে। ঘোরে দুটোতেই এক সঙ্গে, কখনও বা তার পরেরটিও পেছন পেছন থাকে। হঠাৎ একদিন ওরা একটা খরগোশ মেরে এনে হাজির ক'রল। ছোট আকারের মেটে রঙের খরগোশ আঙ্গা আর থুঙ্গি দুজনে মিলে ঝুলিয়ে এনে সে কি আনন্দ। দেখে আনন্দ ছোটগুলোরও। মৃত প্রাণীটিকে ঘিরে ওদের স্ফূর্তি ক'রতে দেখে আমি সরে এলাম। আমাদের ঘরের সামনেটায় একটা পুরানো গাছ আছে তাতে একটা বিরাট কোটর আগে সেখানে পাখিরা ডিম পাড়ত, পিঁপড়ে জমবার পর থেকে তা বন্ধ হয়েছে, আমি সেটি দখল নিয়েছি এখানে এসে জমবার কিছুদিন পরই। ওর মধ্যে বহু জিনিষ থাকে। গৃহস্থালীর অর্ধেক সামগ্রী ওটির মধ্যে রেখে ঘরে জায়গা পাওয়া যায়। তা ছাড়া দারুণ গ্রীষ্মে গাছটির ছায়া দুপুরের কিছু পরই আমাদের ঘরের ওপর পড়ে দাহ কমায়। আমি বেরিয়ে এসে ভাবলাম অনেকদিন

আগে ওই গাছটার কোটরে একটা কৌটোয় কিছু বীজ রেখেছিলাম, দেখি তো কি অবস্থা তার। ওদের শিকার করা খরগোশ নিয়ে যা করে ওরা করুক। ওদের মা না আসা পর্যন্ত এমনি ক'রেই কাটাবে ওরা। সে এসে শেষ গতির ব্যবস্থা ক'রবে খরগোশের মৃতদেহের।

গত ক'বছর ধান বুনিনি আমি, এবার কিছুটা জমিতে ধান লাগাবে ঠিক করলাম। গাছের কোটরে রাখা বীজগুলোর সন্ধান ক'রতে না গিয়ে ঢালু ধরে নেমে পড়লাম সাম্ভাব্য জায়গার সন্ধানে, কোনখানে আবার একটু ক্ষেত করা সম্ভব। যেখানে কিছুদিন ধরে চাষ ক'রতাম সেখানটায় মাটি ক্রমাগত ফসল তোলায় নিষ্ফলা হয়ে গেছে দেখে সেই যে ত্যাগ ক'রেছি ফসল ফলানোও সেই সঙ্গে। এবার আবার আরম্ভ ক'রব। শরৎ পেরিয়ে গেছে, হেমন্তের অরণ্য ঘন সবুজে আচ্ছন্ন। শীত এলে এই সব সবুজ পাতাই যে কেমন ক'রে বর্ণ হারায় আমি ভেবে পাইনা। রাতের শিশিরে ভিজে চকচক ক'রছে পাতাগুলো। ঝিঁকড়া আর গুল্মে আচ্ছন্ন ভূমিতে এক পা এগোতেই অনেক কসরৎ ক'রতে হচ্ছে। বহু কষ্টে কিছুটা তো নামলাম, আর একটু নামতে পারলে সামান্য একটু জমি চাষযোগ্য পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে। এখান থেকে তো সঠিক কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কারণ সমস্ত জায়গাটাই নানা জাতের গাছ গাছালিতে ঢাকা। কিছুটা কম ঢালু চাতাল মত যে জায়গাটুকু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যদি ওখানটা পাথুরে না হয় তো ভাল ধান হতে পারে। কারণ ওখানে মাটি জল ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু ওখানটা পেঁছাতে হ'লে থামচাওটা সঙ্গে থাকা দরকার। বোঝা তো যাচ্ছে না ওর মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে কি না নেকড়ে বা চিতা অথবা কোন কালো বাঘ! তা না হলেও এই দুর্ভেদ্য বন না কেটে তো দেখছি এগোবার উপায় নেই। ফিরে যাব কিনা ভাবছি এমন সময় একটা লোক বাঁ দিক থেকে উঠে এল। লোকটিকে দেখেই চিনলাম মনবাহাদুর। রবিবাবুর খুব বিশ্বস্ত লোক, নেপালী। এই দুর্ভেদ্য বন থেকে হাতে শুধু একটা খিউ গাছের লাঠি নিয়ে অবলীলাক্রমে উঠে এল এক মুখ হেসে। সামনে এসে বলল, কি কেমন আছ দোস্ত ?

যতদূর মনে পড়ছে কাঠ মিলে ওকে এর আগে কয়েকবারই মাত্র দেখেছি। আলাপ তেমন যে একটা হয়েছিল তাও নয়, আর তাতেই বলে দোস্ত! যাক, খারাপ তো কিছু বলে নি তাই বললাম, কতদূর থেকে আসছ ?

অনেক, জানাল মনবাহাদুর।

মানে ?

ওই বর্মা বর্ডার দিয়ে ঘুরে আসছি। বলে ও হাতের লাঠি দিয়ে দূরের অরণ্যের শেষ প্রান্তে ব্রহ্মদেশের সমভূমির দিকে দেখাল। আমি অবাক হয়ে অবিশ্বাস

ক'রতে চাইলাম, ও তো অনেক দূর।

হ্যাঁ। কাল দুপুর থেকে সুরু ক'রেছি। রাতে একটা গাছের ওপর ঘুমিয়ে ছিলাম জঙ্গলের মধ্যেই।

ওদিকে হঠাৎ ?

এমনি চলে গিয়েছিলাম, একমুখ হেসে মনবাহাদুর বলল। মানুষটার এই এক সুন্দর অভ্যেস, সব কথার সঙ্গেই হাসে। পরক্ষণেই বলল, গিয়ে কিন্তু লাভই হয়েছে। ওদিকে এক জায়গায় অনেক সেগুন গাছ আছে। সুপুরী বাগানের মত সারি সারি সেগুনের গাছ, যেন কেউ লাগিয়ে রেখেছে।

আমি বুঝলাম না সেগুনের বন থাকায় ওর কি লাভ হয়ে থাকতে পারে। আমার বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ ক'রলাম প্রশ্নের মত করে. তাতে ও বলল, লাভ আমার নয়, রবিবাবু আমাদের মালিক, তাঁর হবে।

এবার আমার দ্বিতীয় বিস্ময়, সেটাও প্রকাশ ক'রলাম, তুমি তো ও'র কাছে কাজ ক'রতে বলে শুনি নি, কবে থেকে ঢুকেছ কাজে ?

আমার কাজ ভাই জীবনে কোথাও জোটে নি কেবল ফৌজে ছাড়া। ফৌজী মানুষ কখনও অন্য কোথাও কাজ করতে পারে ? ব্রিটিশ ফৌজের অফিসারদের কাছে কাজ ক'রেছি আমি, সেই কাজ যখন ইচ্ছে ক'রে ছেড়ে এসেছি তখন কি আর অন্য কোথাও কাজ করা যায় ?

তবে ? এইটুকু প্রশ্ন ক'রেই থেমে গেলাম আবার, আমার বলবার ছিল রবিবাবু তবে মালিক কি ভাবে হ'ল ? আমি ওকে কাঠ মিলে যখন দেখেছি তখন মিলের যে কোন কাজ দরকার হ'ত নিজের মিলের মত যত্নে সে কাজ ক'রে দিত এমন কি মেশিনে বা ইঞ্জিনে কোন ছোটখাট গোলমাল হ'লেও তা মেরামত ক'রে দিত মনবাহাদুর কিন্তু কখনই ও স্থায়ী কোন কাজ করে নি। কারণ মাঝে মাঝে কোন দরকার পড়লেই রবিবাবু আমাদের বলতেন, বাজারে মনবাহাদুরকে পেলে ডেকে আনবে তো! কিন্তু প্রায় সময়েই পাওয়া যেত না। বহুদিন বাদ আবার একদিন নিজেই উদয় হ'ত। রবিবাবু নিজেও হয়ত ভালভাবেই জানতেন যে নিজে থেকে এসে হাজির না হ'লে সারাদেশ খুঁজেও মনবাহাদুরকে বের করা যাবে না। আর খুঁজবেই বা কোথায় ? ওর ঘর নেই, সংসার নেই। না আছে কোন আত্মীয়-স্বজন যাদের কাছে গেলে অন্তত একটা প্রশ্ন করা যাবে। ও যে কোথায় থাকে বা এখানে না থাকলে কোথায় যায়, কি করে, কি খায়, কেউ তার খবর রাখে না। মোরের প্রায় প্রত্যেকেই চেনে ওকে কিন্তু ওর বাসস্থান কিংবা উৎপত্তি স্থল কোথায় ছিল তার সন্ধান জানে না কেউ। অনুমান করবার প্রয়োজনও অবশ্য হয় না, কে কার জন্যে অযথা ভাবে আজকাল ? অথচ ও সকলের জন্যেই করে, যার যখন যা প্রয়োজন জানালেই মনবাহাদুর তৈরী আছে ক'রে দিতে। আজও যেমন জঙ্গলে

গাছ দেখে রবিবাবুর জন্যে চিন্তা ক'রছে।

হঠাৎ ওর প্রতি কেমন অনুরক্ত হয়ে পড়লাম, বললাম, রাতটা কাটালে না হয় গাছের ওপর, খেলে কি ?

খাওয়া জোটেনি। অম্লান বদনে বলল মনবাহাদুর। যেন খাওয়া কোন একটা ব্যাপারই নয়। অবশ্য এমন অভুক্ত রাত তো আমারই কম কাটে নি! আমিই বা কি ক'রছি, কতটুকু বিচলিত বোধ ক'রেছি তাতে ? করে লাভ নেই, তাতে খাবার তো আর আকাশ থেকে পড়বে না। ফাদার পিটারের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে যা অনাহারের রাত দূর হয়েছে আমার। জারোমথাঙ্গিও যে করেই হোক যাদিয়েই হোক দুবেলা পেট ভরিয়ে রাখে, এখন রাখে এতগুলো প্রাণীরও। অনাহার ভুলেই আছি বল্লে ইচ্ছে হ'ল মনবাহাদুরকে নিয়ে গিয়ে হাজির করি জারোমথাঙ্গির কাছে কিন্তু ভাণ্ডার বলে তো কিছু নেই ওর ঘরে। এক্গাদা ক্ষুধার্ত পেট ভরা হয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থায়, খাবার মজুত বলে কিছু থাকে না। কি দিয়ে এই অভুক্ত মনবাহাদুরের পেট ভরাব তবে ? তবে যে খরগোশটার মৃত্যুর জন্যে কিছুক্ষণ আগে দুঃখিত হয়ে ঘর ছেড়ে এসেছিলাম এখন সেই মেটে খরগোশের মৃতদেহটিকে ভরসা ক'রেই মনবাহাদুরকে ডেকে আনলাম জারোমথাঙ্গির কাছে।

মনবাহাদুরকে দেখে জারোম এমনভাবে অভ্যর্থনা ক'রল যেন কতদিনের চেনা। আমি একটু অবাক হয়েই জানতে চাইলাম, তোমাদের আলাপ আছে না কি ?

তার উত্তরে ও জানাল, আলাপ তো এবার হ'ল। তবে আমি ওকে চিনি! মেরের সিনেমা হলের কাছে প্রায়ই দেখি, ও দিকেই বোধ হয় থাকে। আমাকে কথা ক'টি বলে মন বাহাদুরকেই প্রশ্ন ক'রল, তাই না ?

জারোমথাঙ্গির এমন সম্প্রতিভতায় থমকে গিয়েছিল মন বাহাদুর ; এবার একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, হ্যাঁ, মানে ওদিকে প্রচুর চেনা শোনা আছে তো—তাই কথাবার্তা বল্লি।

থানার ওপারে যে ক'টা ঘর হয়েছে তার মধ্যে সদাশিব এর সঙ্গে তো আপনার খুব আলাপ, তাই না ?

এবার মনবাহাদুর কিছুটা স্বাভাবিক হ'ল। জানাল, আগে আমরা বর্মাতে এক জায়গায় থাকতাম।

ওর কথা শুনে মন বাহাদুরের কি হ'ল জানি না আমি বেশ অবাক হ'লাম। এত খবর রাখে জারোমথাঙ্গি! সত্যিই ও একটা বিচিত্র মেয়ে। কোথায় কার সঙ্গে কার আলাপ এত খবরও রাখে! আমি প্রশ্ন ক'রলাম, কোথায় ঘর হয়েছে ?

তুমি তো অনেকদিন যাও নি, বর্মা রোডের ধারে যে নাগা বসতি আছে তারই নিচের দিকে যে জঙ্গল আছে সেই জঙ্গলের মধ্যে অনেক লোক বসে গেছে বর্মা থেকে

এসে। অনেক কটি ঘর হয়ে গেছে। ওখানে হরিণ মারছে লোকে। সেদিন যে হরিণের মাংস এনেছিলাম ওখানেই থ্রংগিন বলে একটি মেয়ে দিয়েছিল।—ওরা তো প্রায় রোজই মাংস আনে খায় কোনদিন যে কে দেয় বা কোথা থেকে পায় অত হিসেব রাখতেও যাই না পেতেও চাই না। আমার মনে তাই সে কথার কোন প্রতিক্রিয়া হ'ল না আমি কেবল অবাক হলাম বন কেটে বসত করার সংবাদে। অতীতে দেখেছি বনের মধ্যে একবার বসতি হলেই সে বসত ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। ক্রমাগত বসতি হবার ফলে বন হয়ে যায় সংকুচিত। এমনি ক'রেই তো প্রাকৃতিক অরণ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অবিচ্ছিন্ন অরণ্যভূমিতে চলাচলে অভ্যস্ত প্রাণীরা অকস্মাৎ এসে পড়ছে কৃষিক্ষেতে—কারণ তাদের বিচরণ ভূমি যে হঠাৎ মানুষের দখলে চলে গেছে এ তারা বুঝতে পারে না। বহু প্রসারিত ধান ক্ষেতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে অমনি লুব্ধ সারঙ্গিকের শিকারে পরিণত হয়, প্রাণবন্ত একটা শরীর নিমেষে হয়ে পড়ে একটা মাংসপিন্ড। পৃথিবীর এ এক প্রাত্যহিক ঘটনা। প্রতিদিন এই পৃথিবীতে কত নিরপরাধ প্রাণী নিহত হচ্ছে তার কোন হিসেব কেউ রাখে না। কত বনস্পতি প্রতিদিন ভূপতিত হচ্ছে তাই বা কার চোখে পড়ছে ?

হঠাৎ মন বাহাদুর আমাকে প্রশ্ন ক'রল, কি ভাবছ দোস্ত ?

ভাবছি ওই সুন্দর বন কেটে ফেলছে লোকে ?—আমি আমার দুঃখ জানালাম। তাতে ওর কোনও ভাবান্তর হ'ল না, বলল, কি ক'রবে বর্মা সরকার আমাদের সব তাড়িয়ে দিল যে। বহু লোক চলে আসছে। ওখানে নতুন বসতি গড়ে উঠছে। আর জঙ্গল কাটছে তাতে ক্ষতি কি ? জঙ্গল যত সাফ হয় ততই ভাল তো।

ভাল! আমি মানতে পারলাম না, তবে অহেতুক বাদ প্রতিবাদে না যাবার জন্যেই বললাম না কিছু। কি হবে বলে ? মনবাহাদুররা বুঝবে না, আর কেন যে বন বিনাশ আমার খারাপ লাগে তা আমি কাউকে বোঝাতেও পারব না। আসলে গড়ে তোলবার নাম ক'রে প্রতি মুহূর্তে আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস ক'রে চলেছি। অরণ্যের অপার সৌন্দর্যের দিকে না চেয়ে আমরা উচ্ছেদ ক'রছি তাকে অনবরত প্রচেষ্টায়। সোনার ডিম প্রসবকারী হাঁসকে যেমন মূর্খ মালিক কেটে তার পেটের ডিম একসঙ্গে পেতে চায় সেই একই মূর্খতায় আমরা অরণ্যের মহীরুহ আর বনস্পতিদের বিনাশ ক'রছি কাঠ সংগ্রহের নামে, ওদের দৈনন্দিন দানকে অস্বীকার ক'রে। এই পৃথিবীতে আমার যতটুকু অধিকার ঠিকই ততটুকুই একটি হরিণ বা একটি শাখামৃগেরও। মানুষ যদি সত্যিই কোন উৎকৃষ্ট প্রাণী হত তবে একটি নরহত্যার সমান শাস্তির বিধান ক'রত একটি হস্তি হত্যার বেলাতেও। প্রাণের মূল্যে একটা হাতি বা একটি পাখির সঙ্গে কি পার্থক্য একজন মানুষের ? কোন মনুষ্যবাসে প্রবেশ যদি অধিকারবোধ দিয়ে প্রতিরুদ্ধ করা যায় তবে অরণ্যে অনুপ্রবেশই বা কেন প্রতিরোধ্য হবে না ? সেও তো অসংখ্য প্রাণীর একান্ত এবং

নিভৃত আবাস।

এসব কথা আমি এককভাবে কাকে বা ক'জনকে বোঝাব? আর অরণ্যভূমিকে যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠন যারা ক'রে চলেছে তারা আমার কথা শুনবেই বা কেন? মন বাহাদুরদের এসব কথা বলা নিছকই আমার অরণ্যে রোদন বলেই বিরত হ'লাম। ওই বরং বলল, কাল রাতে আমার খুব কাছেই এক জোড়া হরিণ ঘোরাঘুরি করছিল। একবার ইচ্ছে হ'ল হাতের কুকরীটা ছুঁড়ে দিই একটাকে ঘায়েল ক'রে কিন্তু দেখলাম তা ক'রলে বিঁধে যাওয়া কুকরী নিয়ে হরিণটা তখনকার মত ছুটে পালালে আমার হাতের অস্ত্রটাই যাবে হারিয়ে। এই অরণ্যে নিরস্ত্র হবার চেয়ে বোকামী আর কিছুই হয় না।

ওর কথা শুনে জারোমথাঙ্গি আক্ষেপ ক'রল, তুমি হরিণটাকে মারলে সবাই মিলে বেশ খাওয়া যেত!

আমি ওর হ্যাংলামীতে বিরক্ত হয়েই বললাম, তুমি কি না খেয়ে আছ যে হরিণটার জন্যে এত দুঃখ হচ্ছে?

আমার কথা ও গায়ে মাখল না। বলল, তুমি নিজে খাও না বলে তোমার আগ্রহ নেই।

মনবাহাদুর আমাদের কথায় কান না দিয়ে আগের কথার জের ধরে বলল, ঠিক আছে আমি একটা হরিণ এনে দেব।

এক শ্রেণীর পুরুষ আছে মেয়েদের মুখের কথায় মোহিত হয়ে যায় চট ক'রেই। তারা যে কোন মেয়ের কোনও রকম কথা রাখতে পারলে যেন ধন্য হয়ে যায়। তাদের তৎপরতা বেড়ে যায় মেয়েরা কিছু ক'রতে বললে, মনবাহাদুর যে অমনি পর্যায়ের তা দেখে অবাক হ'লাম না। আসলে প্রকৃতিকে নানা পর্যায়ে উপেক্ষা ক'রলেও সকল প্রাণীই বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী, প্রকৃতির অধিকার থেকে তাই বাইরে যাবার নেই কারও। জিঘাংসা, বিরংসা, ক্ষুধা, নিদ্রা সবই এক একটি প্রাকৃতিক অবদান। কোন প্রাণই এগুলোকে অস্বীকার ক'রতে পারে না, কেউ কেউ সাময়িক ভাবে কোন কোনটাকে দমন ক'রতে পারে মাত্র। খিদমতগারীও আসলে অবদমিত বিরংসার প্রকাশ মাত্র।

তবে একটা কথা মনে মনে স্বীকার ক'রতে বাধ্য হলাম নিজের প্রবৃত্তিকে দমনের ক্ষমতা মনবাহাদুর রাখে। যেমন সে ক্ষুধা দমন ক'রে আছে অম্লানবদনে। আমিই অবস্থা বিবেচনা ক'বে বললাম, ও তো হরিণ মেরে এনে তোমাদের খাওয়াবে এখন যদি তোমার কিছু থাকে তো ওকে খাওয়াও। রাত্রে ওর কিছু খাবার জোটেনি।

জারোমথাঙ্গিকে যতদূর জানি ও মানসিকতায় উদার। লোভ লালসা প্রাণ মাত্রই ধর্ম কিন্তু যে জিনিষে ওর প্রবল প্রয়োজন তাও ও অকৃপণ ভাবেই অন্যের প্রয়োজনে লাগিয়ে দিতে পারে। এই দুর্লভ গুণ ওর নিজস্ব সম্পদ। আমার

কথা শোনা মাত্র ও এক টুকরো পোড়া বাঁশ এনে দিল। ওর মধ্যে ভাত আছে। কাঁচা বাঁশের চোঙ্গের মধ্যে চাল ভরে আগুনের মধ্যে ফেলে রাখি আমরা প্রায়ই। ছেলেপিলের ঘর ক্ষিধে এখানে নিত্য অবস্থা যে যখন চায় একটা ক'রে দিয়ে দেয় জারোমথাঙ্গি। মনবাহাদুর এখন অমৃত পেয়ে চোখের পলকে বাঁশ ফাটিয়ে ভাত বের ক'রে খেতে লাগল। দু চার গ্রাস খেয়ে সামান্য হেসে ও বলল, সত্যি খুব ক্ষিধে লেগেছিল দেখছি।

মনবাহাদুর বেশ সুশ্রী চেহারার মানুষ, হাসতে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় আমার। ওর প্রতি দেখে প্রশ্ন ক'রলাম, এতক্ষণ ক্ষিধে বোঝনি ?

আবার হাসল, বলল, সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছি। ভাতটা পাবার আগে ক্ষিধেটা যে এত তীব্র তা বুঝি নি।

এত ক্ষিধে ওর লেগেছিল অথচ খেল কিন্তু ধীরে, বেশ সৌজন্য সহকারে। এবং আশ্চর্য এই যে ভাতগুলো খাবার জন্যে একটু লবণ পর্যন্ত সে চাইল না। খাওয়া শেষ হবার পর বলল, তোমরা যে আমাকে ডেকে এনে খাওয়ালে একথাটা আমার মনে থাকবে।

যশোদা আর থুঙ্গি মিলে এক পাঁজা শুকনো ডালপালা এনে জড়ো ক'রল। জাঙ্গিয়াঙ্গা শীত গ্রীষ্ম ন্যাংটো হয়েই কাটায়। ওর বড় গুলোর সে অবস্থা নেই বলে তাদের জন্যে প্যান্ট জোটাতেই হয়। ওর চলে যায় বড়দের ছোট হয়ে যাওয়া জামা গায়ে দিয়েই। ওদের শব্দ পেয়ে আঙ্গা দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে নিহত শশকের দেহটি লেজ ধরে টানতে টানতে এনে হাজির ক'রল ওই কাঠের পাঁজার কাছে। যশোদা কাঠ জড় ক'রে ক'রে একটা চুলি সাজিয়ে শুকনো পাতা দিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। জাঙ্গিয়াঙ্গার মত শিশুর পক্ষে নাচানাচি করা ছাড়া কিছু সম্ভব ছিল না বলে বাকি চারজন মিলে সেই আগুনের ওপর শশকের মৃতদেহ ফেলে সেটি ঝলসানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই দৃশ্য আমার আজকাল অসহ্য লাগে, তাই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। একটা অসহায় প্রাণীকে অন্যায় ভাবে হত্যা ক'রে তার দেহটা নিয়ে এই লোলুপতা আমার খুব জঘন্য লাগে। একই অবস্থা অবশ্য মাছ বা অন্য কারও বেলাতেও। এ নিয়ে জারোমথাঙ্গির সঙ্গে আমার প্রবল মতান্তর, আমার এই মত প্রকাশের প্রথম দিকে এই মতভেদ এমন ভাবেই প্রকাশ ক'রত জারোমথাঙ্গি, যে আমি আলোচনা বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হয়েছি। আমার চেয়ে ওর পক্ষে যুক্তি অনেক বেশী সেই যুক্তি স্থূল বলে তা সাধারণ ও সহজগ্রাহ্য, কিন্তু আমার পক্ষের যুক্তি সূক্ষ্ম, তা সাধারণবোধ্য নয় বলে যুক্তি তর্কে খুব স্বাভাবিক ভাবে আমাকে পরাজিত মনে হ'ত। আর এই জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি এভাবে সম্ভব নয় বলে আমি সেই অপ্রিয় আলোচনায় ইস্তফা দিয়ে নিজেকে বিরত ক'রেছি নিজের অপ্রিয় কাজ করা থেকে।

আমার মনে হয় যুক্তিবাদিতা জীবনের সুলক্ষণ। কিন্তু সে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন তার ভঙ্গি অবশ্যই সুষ্ঠু হওয়া প্রয়োজন। এখানে ত্রুটি থাকলে তার সৌন্দর্য অথবা মূল্য দুটোই ব্যাহত হয়। তখন আর তার অপরিহার্যতার কথা মনে হয় না বরং তার পরিহার আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অবশ্য যুক্তি দুর্বল হলে তার প্রকাশ প্রবলতার আকার ধারণ করে, বিচলিত হয় সে-ই যার আত্মশক্তিতে থাকে সন্দেহ। জারোমথাঙ্গির যুক্তির পরিমাণ অনেক হলেও, তা আপাতগ্রাহ্য হলেও তার প্রতিযুক্তিগুলো সূক্ষ্ম বলে সেগুলো গভীরে প্রবিষ্ট। যে যত গভীর সে ততই অচঞ্চল বলে তাকে নাড়া দিতে হ'লে নিজেকে বেশী নড়তে হয়। আর নড়া মানেই আপন কেন্দ্র থেকে বিচ্যুতি। জারোমথাঙ্গির সেটাই হয়ে পড়ত বলে আত্মসম্বরণ ক'রতে পারে না কোন তর্কের বেলায়। এই একটাই বড় দোষ। আমি তাই কোন ব্যাপারেই ওর সঙ্গে তর্ক করি না। ও উত্তেজিত হয় এমন কোন প্রসঙ্গেরই অবতারণা করি না আমি। আসলে আত্মসমালোচনা করবার শক্তিই ওর নেই। সম্পূর্ণ রকমে এক আবেগ ও প্রবৃত্তি তাড়িত প্রাণী ও। স্বাভাবিক ভাবের অপরিশীলিত এবং প্রাকৃতিক বুদ্ধি ওর স্থূল, কাজেই নিজে কিছু বোঝে না বলে বোঝালেও ধরতে পারেনা।

চান্দ্র সংযোগে পৃথিবীর নদীতে সমুদ্রে যেমন জোয়ারভাটা হয় তেমনি কোন কারণে বুদ্ধির জগতেও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে কিনা জানিনা তবে ইদানীং ওর ক্রোধ কিছু বেড়েছে, সামান্য ব্যাপারেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে, তর্ক করে অকারণেই। সেই তর্কের মধ্যে যুক্তিকে যেন সযত্নে পরিহার ক'রে রাখে। মাঝে মাঝে পরিস্থিতি এমনই হয় যে ভাবি কোথাও চলে যাই, কিন্তু কোথায় যাব? জীবনের দীর্ঘ অংশ যে আমি কেবল ক্রমাগত চলে বেড়িয়েছি গ্রহ নক্ষত্রের অস্থিরতায় সেই আমিই এখন ভাবতে পারি না এই ছোট্ট পাহাড়টার বাইরে যাবার কথা। এই পাখির বাসার মত ঘর, পাঁচটি সন্তান মিলে সংসার, সবই জারোমথাঙ্গির; আমি এখানে এক অতিথির মত। এমনই অতিথি যার কোনদিন যাবার দরকার নেই অথচ কোন ভূমিকাও নেই সংসারে। একদিন এই সংসার গড়ে তোলবার জন্যে আমাকে প্রয়োজন ছিল কিন্তু কোন রাজমিস্ত্রির তৈরী বাড়ী সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর যেমন তার আর কোন অধিকার থাকেনা সেই বাড়ীতে, আমারও ভূমিকা প্রায় সেই রকম। আমি ওদের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক। কারণ আমার কোন বিষয়েই মেলে না। ওদের কোন প্রয়োজনই আর সিদ্ধ ক'রতে পারিনা আমি। খুব সামান্য কাজ যে জ্বালানী সংগ্রহ করা তাও আমার দ্বারা হয় না। এই ক'বছর ধরে ক্রমাগত আগুন জ্বালিয়ে এই আমরা একটা পরিবারই এই ছোট্ট পাহাড়ের ওপরটায় যত গাছ ছিল শেষ ক'রে দিয়েছি। বর্ষায় যে সব নতুন চারা জন্মায় বর্ষার পর সেগুলোকে কেটে জ্বালাই মাসখানেক ধরে, তার পরই আবার দূর থেকে সংগ্রহ

ক'রে আনতে হয় জ্বালানী। আনে ছেলেমেয়েগুলো। বিশেষ ক'রে মেয়েরা। যশোদা, থুঙ্গি আর জাঙ্গিয়াঙ্গি। ছোট জাঙ্গিয়াঙ্গাটা মাঝে মাঝে দিদিদের সঙ্গে গেলেও বড় ছেলে এখন বড় হয়ে গেছে, সে কোন কাজেই লাগে না। সমস্ত দিন সে গুলতি হাতে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। মাঝে মাঝেই কোন নিরীহ পাখি বা খরগোশ অথবা অন্য কোন অহিংস প্রাণী মেরে নিয়ে আসে খাদ্য তালিকায় যোগ ক'রতে। আমার আপত্তি গ্রাহ্য করে না। অবশ্য অগ্রাহ্য করবার জন্যে প্রেরণা ওর মা-ও দেয় কারণ আমার মতের সঙ্গে ওদের গুরুতর অমিল তা ওদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে। আমি এই প্রাণী হত্যা সমর্থন ক'রতে পারি না, ওরা বলে খাদ্য। পৃথিবীর মাটিতে যে এত ধান হয় এত শাকপাতা ফল-মূল হয় এগুলোতে পেট ভরে না এমনই বৃকোদর প্রাণী আমরা! আসলে আমরা এমনই এক প্রাণী যার প্রবৃত্তির মধ্যে আসুরিক বৃত্তিগুলোর অবস্থান অনেক বেশী। বিরংসা সীমাহীন বলে জন্ম হার সব প্রাণীর চেয়ে বেশী, সংখ্যাও বেশী। জিঘাংসা বেশী বলে আমরা পৃথিবীর সকল প্রাণীকেই হত্যা করি অন্য প্রাণী নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া করে না, অসংখ্য প্রাণী আছে হিংসা যারা করেই না। একটা হাতি বা গন্ডার জীবনে যত বৃক্ষ বা উদ্ভিদ আপন প্রাণ ধারনের জন্যে উদরস্থ করে আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে বিনাশ করি বৃক্ষ-লতা। খাদ্যের প্রয়োজনে যেটুকু করি সে তো সামান্য, অপ্রয়োজনেই করি বেশী।

এগুলো আমি বুঝি জারোমথাঙ্গিরা বোঝে না। শুধু ওর কথা বলি কেন, কে-ই বা বোঝে? ভাবে না কেউই। তাই আমার চোখের সামনেই ঘন অরণ্যে আচ্ছাদিত পাহাড়গুলো ধূসর হ'ল, আমরা যেমন আমাদের চারপাশের গাছগুলোকে কেটে জ্বালানীর কাজে লাগিয়ে দিই তেমনি দেয় আর সবলেও। আমাদের তো মাত্র পাঁচটি সন্তান জারোমথাঙ্গি সংখ্যাতত্ত্বে তার পটুতা প্রমাণ ক'রে আমাকে আগে বহুবার জানিয়েছে এই অঞ্চলে তার জানার মধ্যে কার কার দশটার অধিক সন্তান আছে। এ ব্যাপারে তার উৎসাহ অদম্য। সেই উৎসাহে আমার অংশ থাকলে ও গৌরব বোধ করবার মত সংখ্যা পেতে পারত। কিন্তু পরবর্তী ভাবনা, যেমন এখন ভাবতে হচ্ছে, আগে ভাবতে হ'লে কি ক'রত এখন তা সে অনুমান করতে পারছে কিছুটা তাই এখন আর আগ্রহ প্রকাশ করে না।

সবকিছু সত্ত্বেও এখন যেন এক ভয়াবহ শূন্যতার মধ্যে বাস করছি আমি। কোথাকার সব লোক এসে খাংড়া ইয়াঙ্গো মহীরূহগুলো কেটে নিয়ে যাচ্ছে চারিধার থেকে প্রতিদিন, আমরা ছোট গাছগুলোকে ক'রছি শেষ। ওদিকে নাকি থুদেংথাবীর কাছে কারা খাদান ক'রেছে পাথরের, সেখান থেকে প্রতিদিন শত শত ট্রাক এসে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ভাঙ্গা পাথর। গভীর রাত্রে পাহাড় কাটানোর আওয়াজ আসে আমাদের কাছেও, অরণ্যের প্রাণীরা লুকিয়ে কাঁপে। কত হরিণ

শিশু হয়ত আকস্মিক শব্দে আতঙ্কিত হয়ে মায়ের পেটের নিচে আশ্রয় চায় আবার তার মা-ই ভয় পেয়ে চায় পালাতে। আমাদের চেয়ে কাছাকাছি জায়গায় এ আওয়াজ অনেক গম্ভীর বলে বনের গভীরে থাকা শার্দুলও যায় চমকে। আর পাহাড় ফাটানোর প্রতিটি শব্দ আমার মনে সৃষ্টি করে এক একটি যন্ত্রণার। প্রতি মুহূর্তে আমরা বিনাশ করছি পৃথিবীর যথাযথতাকে। সভ্যতার নামে যা গড়ে তুলি তার অন্যদিকে থাকে ধ্বংস। পাহাড় কেটে পাথর নিয়ে বানাই পথ, ধাতুর সূত্র পেলেও বিনাশ করি অসংখ্য পর্বতের। অঙ্গার উঠিয়ে নিই ভূপৃষ্ঠে বিশাল সব গহ্বর সৃষ্টি ক'রে। অসীম অরণ্য উৎসাদিত করে আমাদের অবস্থানের সীমারেখা প্রতিদিন যাচ্ছে ছড়িয়ে। আগে আমার শীতের বিষণ্ণ অরণ্য দেখে কেমন মমতা হত। শুকনো ঝরা পাতার মাদুরের ওপর দিয়ে যখন চলতে হ'ত মর্মর ধ্বনিতে চমকে উঠত আশেপাশের হরিণ, ভাম, শিয়াল, গোসাপেরা। তখনও আমার তাদের কথা মনে হ'ত মাঝে মাঝে, জানি না সে সব অরণ্যের এখন কি অবস্থা। এখানে যেমন ভাবে বন বিনাশ হচ্ছে তেমনি ভাবে হয়েছে নিশ্চয় সেখানেও। ওদিকে তো তখনই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, অসংখ্য কুঠারের আঘাতে বনভূমিতে আর্তনাদ উঠত প্রতিদিন, অগণিত বৃক্ষ, মহাবৃক্ষ ভূতলশায়ী হ'ত মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। কত অসহায় প্রাণী না আমার চোখের সামনে হয়েছে নিহত। সেই ধারা অকস্মাৎ থেমে যাবে এমন তো কোনই কারণ দেখি না, বরং যা দেখছি লোভ হয়েছে প্রসারিত আয়তন বেড়েছে প্রয়োজনের, ফলে দ্রুততর হয়ে থাকতে পারে অরণ্য উৎসাদন। তবে তো বোধ হয় ডুয়ার্সের সেই কুমারী অরণ্য অথবা ডুয়ার্সের বনভূমির সঙ্গে সন্নিবিষ্ট আসামের আদিগন্ত সবুজ বনানী গেছে বিনষ্ট হয়ে। আমার বেশ মনে আছে গ্রীষ্মের বাউন্ডুলে বাতাসে চারটি পাপড়িওয়ালা শালের ফুল বহু দূর পর্যন্ত উড়ে চলত মুক্ত ডানায় বিহঙ্গের মত। যেখানে ঝরত অপেক্ষা ক'রত বৃষ্টির। বর্ষার ধারাপাতে ফুলের সংশ্লিষ্ট বীজ মাটির আশ্রয়ে উপ্ত হ'ত, ধীরে ধীরে মাথা তুলত এক বিস্ময়মুগ্ধ সবুজ কিশলয়। এমনি ক'রেই অরণ্য আপন বিস্তার রাখতে পেরেছিল অব্যাহত। মানুষের অনুপ্রবেশ তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ করেছে রুদ্ধ, সংকুচিত করেছে তার অস্তিত্ব।

আজকাল কখন সখন আমার পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় ছোট ছোট সংস্কৃত গল্প পড়েছিলাম, তার একটিতে এক লোকের কথা ছিল যে সৌভাগ্যক্রমে একটি এমন হাঁস পেয়েছিল যে হাঁস প্রতিদিন একটা মাত্র সোনার ডিম প্রসব ক'রত। একদিন সেই মূর্খ লোকটি লোভের বশবর্তী হয়ে হঠাৎ বড়লোক হবার বাসনায় হাঁসটার পেট কেটে ফেলল এক সঙ্গে অনেক ডিম পাবার জন্যে। ফলে তার হাঁসটি মারা গেল আর তার প্রতিদিন সোনার ডিম পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল।

আমার সেই গল্পটা মনে পড়ে আর মনে হয় অনেক মানুষের মধ্যেই সেই মূর্খ ব্রাহ্মণের সত্তা আছে লুকিয়ে। তাই আমরা অরণ্যের সম্পদ ভোগ করবার পরিবর্তে লুণ্ঠন ক'রেছি তাকে, ধ্বংস ক'রছি সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের মত। আমি নিজেও যে কত গাছ কেটেছি তারই কি সংখ্যা আছে? কত কিশলয় ধ্বংস ক'রে ফেলে কত না বৃক্ষের সম্ভাবনাকে ক'রেছি বিনষ্ট! যে তরুণ বট গাছটির নিচে আমাদের এই কুটির ছিল সেই বট আমাদের বহু দুর্যোগের থেকে রক্ষা ক'রছে। কত বসন্তে আমি দেখেছি সেই সজীব বটে সবুজ ফল ধরেছে, ধীরে ধীরে সেই সবুজ ফল হলুদ হয়েছে আবার হলুদ থেকে এমনই এক আশ্চর্য লাল যে সবুজ পাতার শ্যামল শোভার মধ্যে অজস্র সেই ফল মনে হ'ত যেন আলোর বিন্দু। অথচ একদিন এই কুটির সম্প্রসারণের জন্যে সেই আশ্রয়দাতার ওপরই আমি চালিয়েছি আমার ধারালো কুঠার চাও। এখানকার বট গাছ দেখলে জাম বলে ভ্রম হয় কারণ বট ঠিক বটের মত নয়। তার আকার এবং আকৃতি কিছুটা ভিন্ন। কেবল ফল ধরলে স্পষ্ট হয় সে বট।

প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন তার সুনির্ধারিত। কখনও দারুণ শীত কখনও প্রচণ্ড দাহে প্রাণ রাখাই দায়। এই যদি কঠোর শুষ্কতা তবে তার পরই আকাশ ভেঙ্গে আসে বর্ষণ। অজস্র বর্ষণে ভূমির কঠোরতা যায় দূর হয়ে, বৃক্ষ লতাপাতা সেই প্রাণ-প্রবাহী বারিধারায় যেন নবজন্ম লাভ করে। যে সব নদী-নালা জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে ম্লান ভাবে আপন অস্তিত্ব কেবল বজায় রেখেছিল সংকটজনক সময়ে, তারা সব হয়ে ওঠে পূর্ণ। নতুন জলধারার উদ্দাম বেগ নিয়ে সবাই হয়ে ওঠে গতিময়। নিত্য নির্দিষ্ট ধারায় চলছে এই পরিবর্তনের আবর্তন। এই রকম পরিবর্তনশীল বুঝি মানুষের মনও। সেখানেও প্রকৃতির নীতি অনুসারেই বোধহয় চলতে থাকে নিয়মিত রদবদল। যে ব্যাপারটা জারোমথাঙ্গির সান্বিধ্যে স্পষ্ট হচ্ছে আমার কাছে। ওর ছেলেমেয়েরা সবকটাই অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে অন্তত আত্মনির্ভর হওয়ার মত। অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হবার ক'দিন পরই যেমন হয় আর কি, চলে ফিরে বেড়ানো, খুঁটে খাওয়া, মার দেখাদেখি খাদ্যাখাদ্য বিচার—এই রকম। আশে পাশের বন থেকে ওরা খরগোস, হরিণ প্রভৃতি প্রায়ই মেরে নিয়ে আসে। কোন কোনদিন কোন পাখিও। ফলে আগের মত তীব্র খাদ্যাভাব ওদের আর নেই। ওদের পেট বড় যেমন হয়েছে তেমনি আহারের সংস্থানও ওরা ক'রে নিয়েছে আপাততঃ। কারণ প্রতিনিয়ত যেভাবে বন্যপ্রাণীদের হত্যা করা হচ্ছে তাতে ক'দিন যে আর বনে প্রাণী থাকবে আমি সংশয়ী। যে ক'দিন থাকে সবাই থাক, আমি আর কি ক'রব। চারিধার থেকে যেন হত্যার প্রতিযোগিতা চলছে। তাছাড়া বন তো প্রায় সবই বিনষ্ট। আমরা এখানে যখন বসতি ক'রলাম

তখন মোরে তো ঘন অরণ্য আর এই ক'দিনের মধ্যেই মোরের অরণ্য তো দূরের স্মৃতি আমাদের এই ছোট পাহাড়টা পর্যন্ত আমাদেরই কুটিরে আর জ্বালানীর প্রয়োজনে নির্বৃক্ষ হয়ে গেছে। আমরা এখন পাশের পাহাড়ে বন কাটছি। এখন দূর থেকে এই নেড়া পাহাড়ের মাথায় আমাদের কুটির স্পষ্ট দেখা যায়, রুক্ষতার মধ্যেই বাস ক'রছি বলে কিনা জানি না দেখছি ব্যবহারেও আমরা অনেক রুক্ষ হয়ে গেছি। বিশেষ ক'রে জারোমথাঙ্গির মত মেয়ের ব্যবহারে এমনই পরিবর্তন এসেছে যে তাকে প্রাকৃতিক বলে ভাবতে চাইছি অনেকটা জোর ক'রেই। অথচ দীর্ঘ যে দিনগুলো আমরা অনাহারের সঙ্গে নিত্যবাস ক'রেছি তখনও ওর আচরণ ছিল কি মনোরম! আজকাল তার যেন সবকিছুর প্রতিই উপেক্ষা অপরিসীম। আমার প্রতি তো বিশেষ ক'রে। কাজের উপযোগী আগেও আমি ছিলাম না তবে এখনকার মত অক্ষমতা আমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস ক'রে নি। ইদানীং আমার পাহাড় ভাঙ্গলে শ্বাস কষ্ট হয় বলে বিশেষ চলাচল করি না। কুটিরের সামনেই বসে থাকতে চাই, নিজের খাবার জোগাড়ের জন্য বনের মধ্যে ঢুকতেই হয়। নইলে ওরা যেদিন শিকার না পায় সেদিন পোষা শুয়ারের যে কোন একটা বাচ্চাকে ধরে খাদ্য বানায়; আমার কোনটাই চলে না। এজন্যেও আমার ওপর রাগ জারোমের। আমার এই মাংসবর্জন ও কিছুতেই পছন্দ ক'রতে পারে না। ওর ধারণা আমার এই মাংস না খাওয়ার জন্যেই দুর্বলতা। আর যেহেতু আমি সে ব্যাপারে আদৌ সচেতন নই অতএব আমার দুর্বলতা ও দুর্দশার দায়িত্ব আর কারও হতে পারে না। জারোমথাঙ্গির শেষ কথাটার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মতভেদ নেই। আমার ভালমন্দের দায় আমি কাকেই বা বইতে বলব, আর তাতে লাভই বা কি? কেউ একজন গাড়ী চাপা পড়লে যে মরে তার মৃত্যুদায় হয়ত চালকের ওপর বর্তায় তা বলে কি চাপা পড়া লোক বেঁচে যায়? যে মরে সে তো মরেই। অন্যের দায়িত্ব কি তার মৃত্যু রোধ করে? তা যখন করে না তখন মিথ্যে অন্যের দায় চাপাতে যাব কেন? অন্তত ততটা নির্বোধ যে আমি নই এই সহজ সত্যটুকু ওকে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, ওর পক্ষেও সমান অসম্ভব আমার সম্বন্ধে কিছু বোঝা। এখানে আমি আমিই—অন্য দশজনের একজন। আরও অনেক মণ্ড, লালখোমাও, ইবোহল, যাদব, মাধব, হরি সিং বা রামবাহাদুরদের মত একজন। অথবা আরও বিস্তৃত নিখুঁত ভাবে বলতে সাপ, ব্যাঙ, বিড়াল, কুকুর, অজস্র অনামী কীট পতঙ্গের পংক্তিতে একজন। বিশেষত্ব যা কিছু থাকে তা বিকাশে। যে কুঁড়ি না ফুটে শুকোয় সেটা যেমন ফুল নয় তেমনি যে গুণের বিকাশ না ঘটে সে কোন বিশেষত্বই নয়। কাজেই আমার যদি কিছু বিশেষ ক্ষমতা এদের তুলনায় থেকেও থাকে তা অপরিচয়ে অবসিত। জারোমথাঙ্গির তা জানার কথা নয় বলেই আমি ওদের সমপর্যায়ের প্রাণী। তাই ওর ক্রোধের প্রকাশ আমাকে লক্ষ্য ক'রেই ঘটে থাকে।

ইদানীং তা অহরহ।

ছোট ছোট বিস্তর ঘটনা নিয়ে ও এমন মাতামাতি করে যা আগে ক'রত না। সামান্য সব ব্যাপারে যে অসামান্য প্রতিক্রিয়া ওর আজকাল লক্ষ্য করি তাতে সময় সময় অবাক হয়ে যাই। যশোদা কেবল আমার পক্ষে থাকে, আমাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে। ওর মায়ের প্রবল ক্রোধের দুর্যোগেও যশোদা অবিচল থাকে আমার পক্ষে কথা বলতে। তার ফলে ও নিজে নিস্তার পায় না, আমার ভার কমে। আমি জারোমথাঙ্গির এই স্বভাব পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাই না। অবশ্য আমার সুখের জন্যে চিন্তারও ওর অন্ত নেই। ইদানীং শরীর ঠিক যাচ্ছে না বলে তম্মু থেকে নানা রকম ওষুধ এনে ভরে রেখেছে ঘর। নতুন একজন পাঞ্জাবী ডাক্তার এসে মোরে বাজারে না কি বসেছে, আমার একটু কিছু হলেই বলবে, যাও ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনো। আমি যাই না বলে আমার সঙ্গে বিস্তর চেঁচামেচি ক'রে নিজেই জানতে চায়, কি কষ্ট হচ্ছে বল আমিই গিয়ে ওষুধ আনছি—। আমি সমান নিরুৎসাহ বোধ করি, বলি, কি যে হচ্ছে তা যদি বোঝাতে পারতাম তা হলে তো কথাই ছিল না। নিজেই বুঝি না শরীরের ভেতরে কোথায় কখন কি হয়! আমার এখন মনে হয় জীবনের মাঝের অংশটায় অত্যধিক চলে দেহের সমস্ত যন্ত্রাংশ ঢিলা হয়ে গেছে এখন যত যাই করি না কেন জোড়া আর লাগবে না। তার প্রয়োজনই বা কি? সব বস্তুই তো ক্ষয়ে ক্ষয়ে একসময় ফুরোয়, শেষ হয়ে যায়। জীবনও আমার জারোমথাঙ্গির এমন কি পৃথিবীরও হবে। কাজেই আমার যদি শেষের সময় সমাগত হয়ে থাকে কি প্রয়োজন তার জন্যে উতলা হবার! বরং ধীরে ধীরে নিভে যাবার জন্যে অপেক্ষা করা ভাল শান্ত চিত্তে। নিঃশব্দে নীরবে যেমন রাত্রি আসে তেমন মৃত্যু আসে। সারাজীবনে তো অসংখ্যবার মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ ক'রেছি নানা রূপে এবার তাকে আত্মসাৎ করবার পালা যদি পড়েই থাকে তো তার জন্যে বিচলিত হবার কি আছে? আর সে এমনই ধ্রুব, এমনই অনিবার্য পদক্ষেপে তার পথচলা যে তাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব। তবে আর ভয় পেয়ে নিজেকে ছোট ক'রে লাভ কি? মৃত্যুকে সঙ্গে ক'রেই দীর্ঘদিন ধরে অরণ্যে পথ চলেছি নিঃসঙ্গ নির্জনতায় ভয় তখনই পাইনি এখন পেয়ে কি লাভ? তাছাড়া জীবনটাকে নিঃশেষ ক'রেই যখন ভোগ ক'রেছি তখন আশা আর কিসের ক'রব? তাছাড়া এখন প্রাণধারণ তো একটা বিশেষ দায়! আমি মাংসাশী নই বলে ওদের খাদ্য আমার চলে না, কোনদিন শুধু ভাত সামান্য লবণ মিয়িয়ে, কোনদিন জুটে যায় স্বাদিষ্ট একটি পেঁয়াজও তার সঙ্গে। ছোট্ট একটা উমোরক, যাকে বলে ধানীলংকা, একটা ক'রে জোটে বটে প্রত্যেকদিনই, কিন্তু তা জিবে ঠেকায় কার সাধ্য! ওই দুঃসহ ঝালকে আমি দেখেই দণ্ডবৎ করি মনে মনে। ওরা থাক আমার কেবল লবণই যথেষ্ট। তবে কোন কোনদিন মাছ মাংস কিছুই না জুটলে

ইয়ামচাকের তরকারী হয়, আমারও জুটে যায়। সে যে এমন মহাসুখাদ্য কিছু হয় তেমন নয়, বনের কোন বিশাল গাছ থেকে ছেলেরাই গিয়ে পেড়ে আনে তাতে পরিমাণ মত লবণ আর লঙ্কা দিয়ে জলে সেদ্ধ ক'রে নেবার নাম তরকারী। তা যা হোক ভাত খাবার কাজে সাহায্য হয়। জীবন যখন এইরকম স্বাদহীন তখন আর কার বিশেষ আকর্ষণ থাকতে পারে জীবনের প্রতি ?

জীবন যেন এক কালচক্র, পরিবর্তহীন পরিবর্তনে নিয়মবন্ধ। এক সময় এইরকম নিয়মতান্ত্রিকতায় আমি বড় ক্লান্তি অনুভব ক'রতাম, এখন আর করি না। এখন আমি জীবনের একঘেয়েমীতে অভ্যস্ত, অথবা জীবনের প্রতি নতজানু এক পরাজিত পদাতিক। পৃথিবীর ওপর দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনে যেমন ঋতু আসে তেমনি এল বর্ষা। এবার কি জানি একটু বেগেই এল। একটু বললে ঠিক হবে না এল বিশেষই বেগে। তার আসবার প্রস্তুতি যে বিশেষ ছিল এমন নয়, অতি দীনহীন বেশে এসে ধীরে ধীরে যেন জমে বসল। অবিশ্রান্ত বর্ষণ যেন আর থামতেই চায় না। আমাদের এই সামান্য আচ্ছাদনের নামে-মাত্র ঘর তিনটে দিনের অবিশ্রান্ত বর্ষণের পরই প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পন ক'রল। কম সম বর্ষা হলে সে সামলে যেত বর্ষণের এই তীব্র বেগ আর সইতে পারল না। ঘরের চালা আর আচ্ছাদন রইল না চালুনি হয়ে দাঁড়াল, ফলে বৃষ্টি যত বাইরে ততই বর্ষণ আমাদের ঘরের মধ্যে। আমি আর জারোথথাঙ্গি মিলে জোড়াতালি দেবার বৃথা চেষ্টা অনেকই ক'রলাম, যশোদা, আঙ্গা, থুঙ্গি তাদের সামান্য সামর্থে সাহায্য সমানেই করে চলল কিন্তু সবই নিষ্ফল ক'রে দিল বৃষ্টির তীব্রতা। মাঝখান থেকে সকলে ভিজে এমন অবস্থা হ'ল যে সদ্য কোন আশ্রয় না পেলেই নয়। এখনও কিছু শুকনো পোষাক অবশিষ্ট আছে কোনক্রমে চাপাটাপা দিয়ে রাখা আছে, সেগুলো ব্যবহার ক'রতে হলেও তো একটা আচ্ছাদনের তলায় যাওয়া প্রয়োজন। অবস্থা যেমন দেখা যাচ্ছে এই বৃষ্টি সহজে থামবে না, এখনই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যাবার অবস্থা কাজেই আশ্রয় দরকার। অথচ এই পাহাড়ের ওপর আমরা একা, জনবসতি অনেকটাই নিচে, আর সেই বসতিও এমন নয় যে আমরা গেলেই আমাদের আশ্রয় জুটে যাবে। দিনের আকাশ ঘোর কালো, ফলে দুনিয়াজুড়ে অন্ধকার আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে, অনেক নিচে থেকেও খুজাইলকের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ টানা ধারা বর্ষণের ঝিমঝিম আওয়াজ ছাপিয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে জলের বেগ এমনই তীব্র হয় যে শিশুরা ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে, সবাই এক সঙ্গে জড়িয়ে ধরতে চায় মাকে। আতঙ্কিত স্বরে চিৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে জাঙ্গিয়াঙ্গি জাঙ্গিয়াঙ্গা দুজনেই।

কি জানি আমারও কেমন ভয় করে। এটা আগে কখনও অনুভব করিনি ; এখন এই নতুন অনুভূতিতে নিজেই কেমন অবাক হয়ে যাই সকালে আলো ফুটলে। অবাক হ'লেও জারোমথাঙ্গির প্রস্তাবে সম্মতি আমাকে দিতেই হ'ল যে বৃষ্টির

ভেতরেই আমরা নিচের দিকে নেমে যাব। কিন্তু যাব কোথায়? ওর মনে একটা হিসেব কষা ছিল জানাল, মেরীদের ঘরে গিয়ে উঠব।

মেরী থাকতে দেবে? তাদের জায়গা আছে?

আছে। মেরী আর ডায়না দুই বোনই থাকে একটা ঘরে। ঘরখানা নতুন টিনে তৈরী, আমার খুব বন্ধু ওরা, জায়গা দেবে, জারোমথাঙ্গি দৃঢ় ভাবে তার বিশ্বাসের কথা জানাল।

সমস্যা হ'ল নিচে নামার কাজে, অন্যসব জিনিস তো বয়ে নিয়ে না হয় নামলাম মুরগীগুলোকে নিয়ে কি করি? কেমন ক'রে নিয়ে যাব ওগুলোকে? অন্যকিছু বরং অপ্রয়োজনীয় বোধে এখানে রেখে যাওয়া যায় কালোবাঘ বা কুকুর যেই আসুক নেবে না, মুরগী পেলে ছেড়ে যাবে এমন ক্ষুধামান্দে তো তারা ভুগছে না! স্থির হ'ল আগে ওগুলোকে সব একসঙ্গে পায়ে পায়ে বেঁধে একটা গাছের ডালকে বাঁকের মত করে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে যাব আমি, পরে বরং একবার এসে শেষের জিনিষগুলো নিয়ে যাব। না হ'লেও এখন চলবে সেগুলোই কেবল পড়ে থাক। তাছাড়া আমরা তো আবার বর্ষা কমলেই ফিরে আসছি, অত চিন্তার কি?

জারোমথাঙ্গির বিশ্বাস সম্পর্কে আমার ধারণা হ'ল মেরীর অভ্যর্থনায়। ওই প্রবল বর্ষণের মধ্যে একপাল ছেলেপিলে আর মুরগী নিয়ে আমাদের এসে দাঁড়াতে দেখে সে কলকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল নিজের দরজা খুলে দিয়েই। তার বক্তব্য হ'ল, আরে তোমরা দেখছি ভিজে একদম কাদা হয়ে গেছ। শীঘ্র ভেতরে এস।

দরজার বাইরে থেকে আমি দেখলাম ওর ছোট্ট সাজানো ঘরখানা আমরা ঢুকলেই ভিজে জবজবে হয়ে যাবে। যা বুঝেছি ঘরটুকু ছাড়া ওদের আর আচ্ছাদিত জায়গাও নেই সেখানে আমরা বৃষ্টির ধারা থেকে মাথা বাঁচাতে পারি। আর সামনে ঘর দেখে এই বৃষ্টির ছাট আমার তীব্রতর মনে হচ্ছে। মেরী ব্যস্ত হয়ে বলল, ভেতরে এস। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আমার দ্বিধার জন্যেই জারোমথাঙ্গি যা দ্বিধান্বিত ছিল মেরীর ডাকে তা কেটে যেতেই সে ভেতরে ঢুকে পড়ল সঙ্গে তার ছেলেমেয়েরাও। আমি মুরগীগুলোকে নিয়েই পড়লাম সমস্যায় এগুলোকে বা কোথায় রাখি আর ওইটুকু ঘরের মধ্যে আমিই বা কোথায় দাঁড়াই। শেষে সব শুদ্ধই ঢুকে পড়লাম। আর আমাদের পদক্ষেপে ঘরটির যে কি অবস্থা সে আর বর্ণনার নয়। জারোমথাঙ্গি বুঝি কিছু কুণ্ঠিত হয়েই বলল, চারদিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ঘরটায় আর থাকতে পারলাম না।

ঘরটা আছে তো? মেরী প্রশ্ন ক'রল। ঘরের কোণ থেকে একটা সুরেলা শব্দ এল, যা বৃষ্টি পাহাড় যে ধসে পড়েনি এই তো যথেষ্ট। তোমরা এলে কি ক'রে?

শব্দের উৎসে দেখলাম আর একটি কমবয়সী মেয়ে একটা চেয়ারে বসে কি বুনছে। সামান্য কথা কটি বলেই সে হাতের কাজে মনোনিবেশ ক'রল। মেরী

সে কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বলল, ধস নামা যেমন তেমন এত বৃষ্টির মধ্যে ওই পাহাড় থেকে নামাও তো কম দুঃসাধ্য নয়। তার ওপর সঙ্গে এইসব শিশু।

জারোমথাঙ্গি বলল, তা ঠিক। রাস্তায় কতবার যে আমার পা পিছলে গেছে তার আর ঠিক নেই! এই অন্ধকার দুর্যোগে চেনা রাস্তাই যেন অচেনা লাগছিল।

তোমাদের সঙ্গে শুকনো জামা কাপড় আছে তো? মেরী আমাদের অবস্থা দেখে জানতে চাইল। আমি মনে মনে বললাম, থাকবার কথা তো নয় এখন দেখা যাক বোঁচকা খুলে।

আমাদের অবস্থা দেখে মেরীই উদ্যোগী হযে শুকনো কাঠকুটো এনে আগুন জ্বালল যাতে আমরা নিজেদের সেঁকে নিতে পারি। তখন যেন প্রাণ বাঁচানোর আগ্রহে আমরা ছুটে গিযে সেই আগুনকে ঘিরে বসলাম সকলে। সমস্ত শরীর শীতে কনকন ক'রছে ভেতরে ভেতরে এমন কাঁপুনি ধরে গেছে যে মনে হচ্ছে শরীরের ভেতরে হাড় পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে বরফের মত। এখন একমাত্র এই আগুনই আমাদের বাঁচাতে পারে, এই উত্তাপই দিতে পারে পুনর্জীবন। নিজের শরীরটাকে সামান্য সেঁকে নিযে জাবোমথাঙ্গি কাপড়ের পোঁটলাটা খুলতে লাগল, ভিজে একদম জবজবে হয়ে গেছে। তার ধারণা ছিল ভেতরের দিকে দু একটা শুকনো থাকলেও থাকতে পারে, খুলে হতাশ হ'ল। ছেলেপিলেগুলোকেই বা কি পরাবে আর আমরাই বা পবব কি? এখন তো সকলেই খালি গায়ে বসে আছি তা তো আর বেশীক্ষণ সম্ভব হবে না। ডাযনা নিজের চেয়ারে বসেই জাবোমকে বলল, তুমি ববং আমার ফানেক একটা পব, আমার জামাও তোমার অল্প একটু বড হবে।

তা তো হবে কিন্তু অন্যদের করি কি? অবশেষে সকলে মিলে একটা চাদবে সাবাশবীর জড়িয়ে ছেলেমেয়েরা প্রাণ বাঁচাল। ভাগ্যিস বাড়তি চাদর এদের দুবোনের ছিল। শরীরটা একটু গরম হ'লে উদরের কথা মনে এল। চালের মজুদ যা ছিল আমরা সঙ্গে এনেছি। প্রচণ্ড জলের ছাটে আর দীর্ঘসময় ঝুলে থাকার জন্যে একটা মুবগীর অবস্থা খুব সঙ্গীন দেখে সেটি কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিতেই হ'ল। কিন্তু এতগুলো প্রাণীর জন্যে একটা মুরগী যথেষ্ট নয় বলে আর একটিকেও জবাই ক'রতে হ'ল সেই সঙ্গে। দৈনিক ডিম যাদের কাছে পাওয়া যেত তাদের দিযেই আপাততঃ প্রাণরক্ষা করা যাক। কারণ আশ্রয় যারা সাগ্রহে দিয়েছিল ভাণ্ডারের অবস্থা তাদেরও আশ্রয় দেবার মত যে নয় এটা সেদিনই টের পাওয়া গেল সন্ধেবেলায়। একটা টিনে দুজনের মত চাল থাকে তাদের, আমরা যোগ দিয়েছি সাতজন। দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক বলেই মেরী আমাদের আড়ালেই ডায়নাকে বলল, সকালেই গিয়ে মহাজনের দোকান থেকে চাল আনিস আর কিছুটা শুকনো মাছ।

আমাদের সঙ্গের চাল দিয়ে আর মেরীদের শুকনো মাছের শেষ সম্বল দিয়ে

রাতের রান্নাটা কোনক্রমে হ'ল স্থির হ'ল, সকালে বৃষ্টি ধরলে জারোমথাঙ্গি বাজার থেকে চাল আর আলু কিনে আনবে। তারপর আমরা ফিরে যাব আমাদের ঘরে।

কিন্তু বৃষ্টি থামলে তো যাব! রাত্রে বৃষ্টি যেন আকাশ ভেঙ্গে নামল। দিন যতই প্রায়ান্ধকার হোক না কেন সন্ধেটা তবু ঠিক বোঝা যায়। সন্ধের একটু পরই রাতের খাবার পালা শেষ হয়ে যায় আমাদের। সে পর্ব শেষ ক'রে আগুনের প্রহরা রেখে কোনক্রমে শুয়েছি মাত্র বৃষ্টির বেগ যেন কয়েক কোটি মত্ত হাতির উল্লাস নিয়ে লাফিয়ে পড়ল। সে কি ভীষণ শব্দ চারিদিকে! মাথার ওপর টিনের চালা ফুটো করে এখনই বুঝি ঘরে ঢুকবে বলে তার দুর্নিবার আয়োজন। চারদিকের গাছে পাতায় ঘরের চালে মাটিতে অঝোর বর্ষণের সে কি ভয়াবহ বেগ! পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে বৃষ্টির জল খুজাইলকে নেমে যাবার কি বিকট শব্দ! আর সব শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে অনতি নিচে প্রবলবেগ এক জলপ্লাবন, পূর্ণ খুজাইলকের পাহাড়ী ধারার শব্দ। সব মিলে মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ —যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে পাহাড় পাথর গাছপালা মাটি সমেত এই বৃদ্ধ পৃথিবী। গুম গুম ক'রে গর্জন উঠছে ভরা খুজাইলকের বুকের মধ্যে থেকে। অন্ধকারের মধ্যে কোথাও দৃশ্যমান কিছু নেই, সম্পূর্ণ অগোচরে কি মহাপ্রলয়ের আয়োজন যে ঘটে চলছে কিছুই তার বুঝতে পারছি না। আবারও যদি দিন হয়, যদি তা আমি দেখি, হয়ত দেখব মোরেহর জনপদ নিশ্চিহ্ন। পর্বতমালা আর তার সানুদেশের বনভূমি উৎসাদিত করে মানুষের যে বিস্তার, সব ঘরবাড়ী দোকানবাজাব হয়ত দেখব তার কিছুরই কোন অস্তিত্ব নেই, বিশাল ধ্বংসস্তূপ বিশ্বের আবর্জনার আকারে জমা হয়ে আছে সমস্ত অধিত্যকা জুড়ে। অসংখ্য বন্যপ্রাণীকে হত্যা ক'রে যারা দখল ক'রেছিল অসূর্যম্পশ্যা বনভূমি তারা সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শবে পরিণত। সেই শব সৎকারের জন্যে শিবাকুল এসে পেঁছাবে না অনাহূত নিমন্ত্রণে, তারা নেই, মানুষের সীমাহীন সংহারে অবলুপ্ত। কিন্তু আকাশ থেকে কালান্তক প্রতিম ডানা মেলে অনিবার্য নিয়তির মত নেমে আসবে অসংখ্য শকুন, প্রকৃতির হয়ে তারাই নেবে অন্তিম প্রতিশোধ। মানুষের অস্তিত্ব না থাকলেই আবার বিশ্বপ্রকৃতি আপনাকে বিস্তার ক'রে নেবে স্বগর্ভা ভূমির সবুজ সন্তানদের মায়াময়তায়। ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় পাখির দল করে নেবে বংশবিস্তার, দৈবাৎ বেঁচে থাকা হরিণ তার হরিণীকে নিয়ে বিচরণ ক'রতে পারবে দ্বিধাহীন প্রমত্ততায়। ভয়হীন অরণ্যে ভরে উঠবে সচকিত শশক সজারু আর নকুলের দল। পুষ্পার্কে আকৃষ্ট সরীসৃপ আর ভৃঙ্গকুল আসবে মধুমক্ষিকার বিপুলবাহিনী সহযোগে, সমস্ত রাত ধরে বনভূমি সজাগ রাখবে সংখ্যাহীন ভৃঙ্গারিকা। আমি যেন অনিদ্রিত স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলাম। এই দুরন্ত দুর্যোগে বিনাশ যখন অবশ্যম্ভাবী মনে হচ্ছে, আত্মনাশ যখন অনিবার্য তখনও কিন্তু

আমার মনে কোন ভয়ের উদয় হ'ল না। বরং আমি যেন সেই সমাপ্তির সম্ভাবনাকে বিশ্বাস ক'রে ফেললাম নোয়ার জাহাজের গল্পের মত। বিশ্ব যখন প্রবলতম প্লাবনে বিপর্যস্ত সামান্য সংখ্যক প্রাণী তখন প্রচণ্ড পুণ্যে আশ্রিত এক ভাসমান নৌকায়। আমি যে সেই অলৌকিক জাহাজের যাত্রী হবো না তা জানি, কারণ আমি একদিন নিজহাতে আমাদের আশ্রয়দাতা বৃক্ষটিকে ছেদন ক'রেছি প্রয়োজনের বাহানায়। কত অজানা প্রাণীকে হত্যা ক'রেছি প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ ইচ্ছায়। কাজেই আমি অপাপবিদ্ধ নই। সেই মহাপ্রলয় যদি সত্যিই সংঘটিত হয তবে আমারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এবং হয়ত সেটা ঘটতে চলেছে আজই রাত্রে। যেরকম ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যাচ্ছে তাতে যে কোন মুহূর্তে তা ঘটে যেতে পারে। এখনই, হয়ত এই মুহূর্তেই। অথচ আমার আজ একটুও ভয় হচ্ছে না। বরং কি এক অকারণ পুলকে ভরে উঠছে মন, হোক ধ্বংস হোক, বিনষ্ট হোক প্রয়াসের নামে মানুষের যত অপপ্রয়াস। একদিন সেই ডুয়ার্সের চিরসবুজ বনভূমি থেকে যে অরণ্য উৎসাদন দেখে এসেছি মধ্যে আসামের সবুজ শ্যামলিমাকে উৎখাত ক'রতে ক'রতে এই ব্রহ্মসীমান্তের অসূর্যম্পশ্যা অরণ্য পর্যন্ত শেষ হয়েছে আমাদেরই কুঠারাঘাতে; করেছে মানুষ। আর সেই মানুষ নামের কোটিদন্ত কীট তো আমিও, সেই সর্বগ্রাসের অপরাধ থেকে আমিই বা মুক্ত হই কি করে? কাজেই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে মৃত্যুতে আমার কোন আপত্তি নেই। বরং এই সমবেত মৃত্যুকে আমি সানন্দে বরণ ক'রব বিশ্বপ্রকৃতির বিকাশের জন্যে। আবার যদি কোনদিন হস্তীযূথ আরাকানের অরণ্য থেকে যাত্রাসুরু ক'রে খাদ্য সন্ধানের পথ ধরে দ্বিতীয় বসন্তে পৌঁছে যায় তরাই বা ডুয়ার্সের কচিকলাপাতার অরণ্যে, আর যে যাত্রা যদি হয় অবিচ্ছিন্ন বনভূমির ছায়ায় ছায়ায় মায়াময় পদচারণা তবে আমার হৃদয়ও হবে জয়যূথের সমান হর্ষে-হ্লাদিত। আমি তো থাকব না, তাতে কি? এই বিশ্বময় যে অসংখ্য প্রাণ সেই অবিনাশী প্রাণসত্তার মধ্যে আমি তুমি সে-সব একাকার। প্রাণ প্রাণীর, প্রাণ উদ্ভিদেরও। বর্ষার ধারাস্নাত কিশলয় যখন করতে শিশিরে সিক্ত হয়ে হেমন্তের প্রথম সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে দুলতে থাকে পবন স্পর্শে, তখন যে প্রকাশ সে কি প্রাণের নয়? সেই খুশিতে মিশে থাকে না আমার প্রাণের পুলক? আমার থাকা না থাকায় কিছু যায় আসে না, আনন্দ তো অনির্বাণ! সে তো থাকেই। বিনাশ যেমন অবিনাশ আনন্দও তেমনই। সৃষ্টির সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে, দুজনেই ওতপ্রোত জড়িত। আনন্দ আকাশে, তার আলোয়, তার সফেদ মেঘপুঞ্জের মুক্ত বিচরণে, আনন্দ বর্ষণে তার অঝোর ধারাস্রোতে।

সেই ভয়ানক শব্দের মধ্যেই আমি যে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানিনা। জাগলাম অন্য শব্দে, সে শব্দ স্বাভাবিক। প্রতিদিন যে শব্দে সকাল হয় সেই প্রাত্যহিক

প্রত্যুষের শব্দ নিয়ে আজও আমার জেগে ওঠা প্রমাণ ক'রল কালকের নিদ্রা মহানিদ্রা ছিল না। বিগত চারটি দিনের প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর আয়োজনেও পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয়নি। খুজাইলক নদীর জল কেবল, বেড়েছে উদ্দাম হয়েছে তার গতিবেগ দুর্দাম জলস্রোত। পাহাড়ী নদীর চলনই অমন, সাধারণ সময়ে পায়ের পাতা ডোবে না এমন সরু জলধারার স্বচ্ছ ক্ষীণ শরীর নিয়ে শান্ত স্রোতে বয়ে চলা। প্রত্যুষে যেমন আলো আলো ভাব আসে তেমনই আলোর আভাস, বৃষ্টি নেই। এ কদিনের অবিশ্রান্ত বর্ষণ দেখে মনেই হচ্ছিল না যে এ বর্ষণ থামবে। তবু যে থামল এতেই যেন আবার জীবন ফিরে পেলাম। জীবন মানে আলো, আলো মানেই জীবন। চোখ মেলতে আবছা আলোর প্রকাশ লাগল চোখে তবে কি প্রাতঃসন্ধ্যা? আমাদের জাগরণের ক্ষণ? এখানে এসে দুদিন বড় কষ্ট পেয়েছি, প্রাতঃকৃত্যের কালে ঘন বর্ষণের মধ্যে যাই কোথায়? এখন যা হোক বর্ষা ছেড়েছে সেই অসুবিধেটা নেই। আমি উঠে দেখলাম জারোমথাঙ্গি বা মেরী ডায়না কেউ নেই। ঘর থেকে বেরোতেই ওদের সরু গলিটা দিয়ে উঠে আসতে দেখলাম, নদীর দিকে গিয়েছিল। আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখি নিশ্ছিদ্র মেঘে তা এখনও ঘোর। পুঞ্জিত মেঘের কোথাও একটু ফুটো ফাটা কিছু নেই যে ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মির প্রকাশ এসে অন্তত একটা টর্চের আলোর মতও পৌঁছোতে পারে পৃথিবীর ওপর, কোনও পাহাড়ের মাথায় বা শস্য ক্ষেতে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আবার এখনই নামবে। এ নেহাৎই একটা বিরতি, সমাপ্তি নয়। এই একটানা বর্ষণে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আর মেঘের ক্ষান্তি নেই! মেরীদের ঘর থেকে বেরোলেই ডানদিকে খাড়াই আর বাঁ দিকে উতরাই, ডানদিক সামান্য একটু উঠলেই ইন্দোবর্মা আন্তর্জাতিক সড়ক পিচঢালা এবং পাকা আর বাঁ দিকে পাথরের ওপর পা দিয়ে দিয়ে নামতে নামতে কিছুটা বেঁকে অনেকটা নিচে নদী। ওদিকটা কেবল পাথুরে, অপরিষ্কার। যত ঘর লোক এখানে বসতি ক'রেছে সকলের মল মূত্রগার ওই পথটা। যতদূর চোখ যায় বড় ছোট পাথরের ফাঁকে ফাঁকে মানুষের মল। খুব সাবধানে চলতে হয়। আর সেই ফাঁকা পাথুরে প্রান্তর পেরোলে বন। খাংড়া ইয়াঙ্গো শিশুরা সেখানে অজস্রই জন্মায় প্রতিনিয়তই মানুষের হাতে অপঘাতে মরে, জ্বালানী হয়ে খুঁটি হয়ে উঠে আসে মানুষের ঘরে।

সেগুন, উনিংথো, তেলহাও, লেহাউ প্রভৃতি অন্য যে সব বৃক্ষ শিশুরা দৈবাৎ জন্মে যায় তাদেরও ওই একই অবস্থা দাঁড়ায়। আর এই মাত্র কিছুদিন আগে, যখন আমি এখানে আসি, ওই পাকাসড়কের সংলগ্ন ছিল বন। প্রকাণ্ড সব মহীরুহ বিটপী বনস্পতি আকাশের দিকে মাথা ক'রে সূর্য সম্ভাষণ ক'রত প্রতিটি প্রত্যুষে। তাদের বিনাশ ক'রেই মেরী ডায়নাদের মত আরও অসংখ্যজন বানিয়েছে, নিজেদের বাসস্থান। একসময় যে স্থান অরণ্যকুসুমের সুবাসে আমোদিত হয়ে থাকত এখন

সেখানে মনুষ্যমলের দুর্গন্ধ, পুরীষে দুর্গম।

এখন আমার নির্জন অবকাশগুলোয় প্রায়ই মনে হয় এই তো প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের ভূমিকা। মানুষ হনন করে, খনন করে, বিকাশের নামে বিনাশ করে। আমার তো অবসর অন্তহীন তাই অন্তহীন ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। আজকাল কেবল নিজের পরিমণ্ডলটুকুই নয় চিন্তার মধ্যে এসে যায় সমস্ত জগৎ। তার একটা কারণ আছে, সেই অতি বর্ষণের পর আমরা আর আমাদের কুটিরে ফিরে যাইনি, পরের বর্ষণবন্ধ দিনটিতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় জারোমথাঙ্গি যশোদাকে নিয়ে যেতে গিয়ে কিছুটা দূর গিয়ে ফিরে এসেছিল পাহাড়ের সেই অংশ ধসে আমাদের চলাচলের পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল বলে। পাওখুলুন বলে একটি দুর্ধর্ষ ছেলেকে কিছু টাকার চুক্তিতে রাজী করিয়ে পাঠিয়ে শুয়োর ক'টিকে আনিয়ে নিয়েছিল আর মেরী ডায়নার সুপারিশে লোকালয়ের সংলগ্ন নদীর ধারে একটা ঘর ক'রে নিল মোরে জনপদের আদামসুমারীর মধ্যেই। শুয়োর ক'টিকে আনবার জন্যে ডানপিটে ছেলে পাওখুলুনের সঙ্গী আমাদের সন্তান আঙ্গাও হয়েছিল। এবং কেবল শুয়োর ক'টিকেই তারা আনেনি, সঙ্গে একটি হরিণ শিশুর মৃতদেহও এনেছিল বয়ে।

আমার একান্ত অনিচ্ছা ছিল এখানে বসবাসের। শরীরে আগের তেজ থাকলে নিশ্চয় এখন আবার বেরিয়ে পড়তাম অন্য কোন নির্জনতার সন্ধানে। কিন্তু ইদানীং কি হয়েছে শরীরে কোনই বল পাইনা, সব সময় কেমন ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। বুঝি এর অনেকটাই অপুষ্টিজনিত দুর্বলতা, অপূর্ণ আহারের আভ্যন্তরীণ ক্ষয়ের প্রকাশ। তা বলে করবার তো নেই কিছু! জারোমথাঙ্গির ইচ্ছা ওষুধপত্র খাই, আমি জানি তার কোন ফল নেই। ও আমার শরীরে হাত দিয়ে দেখে প্রায়ই বোধ করি অবাক হয়ে যায় এই কথা ভেবে যে সেই বলিষ্ঠতা কোন জাদুর মন্ত্রে উধাও হয়ে গেল শরীর থেকে! আমার বাহুতে বুকে পিঠে ওর বিস্মিত হাত মাঝে মাঝেই সেই উধাও হয়ে যাওয়া মাংসপেশীর খোঁজ ক'রে বেড়ায় আমি বুঝি। ওর চিরদিনের কৃশতনু আমার বলিষ্ঠতা হারানো মজবুত কাঠামোর চেয়েও যে অনেক সংকীর্ণ সে কথাটা না ভেবে কেবল আমার জন্যেই দুর্ভাবনা করে। আমার এ নিয়ে কোনই ভাবনা নেই। শরীর বা সংসার কেন জানিনা চিরদিনই আমার চিন্তার থেকে অনেক দূরেই রয়ে গেল। এ নিয়ে যে ভাবতে হয় সেই কথাটা আমার জানাই হ'ল না। তবে এতদিন যা হচ্ছিল না এখন তা হচ্ছে, এখন অতীতের কিছু কিছু কথা অবসর মতই মনে আসে, যে পৃথিবী ছিল সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত সেই ফেলে আসা পৃথিবীর কথা এখন মনে পড়ে যেখানে মানুষের সমাজ বুদ্ধিকে প্রয়োগ ক'রছে পৃথিবীকে শোষণ ক'রে নিজের সুখের ব্যবস্থা বাড়িয়ে যেতে। সেখানে জ্ঞানের চর্চা বিজ্ঞানকে প্রসারিত করে চলেছে প্রতিদিন সেখানে ভোগের আধিক্য আছে

সভ্যতার ছদ্মবেশ ধরে, সেখানে প্রয়োজনের মুখোশ পরে চলে বেড়াচ্ছে লোভলালসার চাতুর্য, সেখানে অলকানন্দারা আছে শরীরের জন্যে আছে হাজার রকম গন্ধদ্রব্য, বিশ্বের বুকচিরে আনা সুবর্ণ, সমুদ্রের অতল থেকে নির্বিরোধ প্রাণীকে হত্যা করে আনা মুক্তো, আছে লর্ড আর লেডিরা যাদের সাজসজ্জার বিলাসের জন্যে অকারণে নির্বিরোধ পশুকে হত্যা করে সংগ্রহ করা হচ্ছে তাদের দেহের চর্ম পর্যন্ত। সেখানে অহরহ আয়োজন চলছে পৃথিবীর বুকের মধ্যে থেকে তেল লোহা কয়লা যা পাওয়া তাই তুলে আনবার। মৌমাছি আপন প্রাণ ধারনের জন্যে সারাদিনের প্রচেষ্টায় যে খাদ্য সংগ্রহ করে, স্বস্তির জন্যে সঞ্চয় করে, শঠতা দ্বারা তাকে বঞ্চিত করে সেটুকু লুণ্ঠনের নাম শ্রেষ্ঠতা! যে সামান্য কীট আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে নিজের চারপাশে আপন বুকের রক্তে গড়ে তোলে আবরণ সেই কীটকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার সামান্য আবরণ অপহরণ না করে পোষাক প্রস্তুত হয় না যাদের তাদেরই নাম নাকি মানুষ, যারা প্রতি মুহূর্তে ব্যয় করছে এই সব ধ্বংসের চিন্তায় সেই অসংখ্য মানুষের যে সমাজ একদিন পেছনে ফেলে এসেছি একান্তই অবহেলায়, এতদিন ভুলেই ছিলাম এখন মাঝে মাঝে সেই মনুষ্যকুলের অস্তিত্বের কথা মনে পড়ে অতীব ঘৃণায়।

মনে পড়বার কারণ অলস ভাবনা ছাড়া এখন আমার আর কোনই কাজ নেই। নদীর পাড়ে ঘরটির থেকে কিছুটা নেমে গিয়ে বড় একটা পাথরের উপর বসে আমার বেলা হয়ে যায়, কিছুটা দূরে নদীর ওপর কাঠের সাঁকো পর্যন্ত আজকাল মাল-গাড়ীগুলো সওদা বয়ে আসে আবার এখান থেকে জিনিস নিয়ে ফিরে যায় আমি দেখি। কি আনে আর কি যে নিয়ে যায় তার কোন সন্ধান রাখি না অকারণ বলে। ক্রমাগত জনসমাগম বাড়ছে, দ্রুত বাড়ছে জনবসতি তা দেখছি। প্রতিদিন রাশি রাশি খাংড়া ইয়াঙ্গো আর সেগুন গাছ কেটে এনে জড় ক'রছে লোকে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! বিশাল গুঁড়িগুলোকে দেখে আমার বড় মায়া লাগে। মনের মধ্যে কেমন ব্যথাও অনুভব করি। কিন্তু ক'রব কি? সামান্য একটা কীট আমি অতি ক্ষুদ্র পোকা মাত্র, আমার কি সামর্থ এই হত্যাযজ্ঞে বাধা দিই! আমি ভেবেই পাইনা কি ঘৃণ্য আনন্দের নাম শিকার! তবে তো যে ডাকাত নিশীথে মানুষের বাড়ীতে ঢুকে হত্যা করে লুঠ করে সে-ও তো প্রশংসার পাত্র। যে খুনি নিরীহ পথিককে খুন করে মাত্র সামান্য অর্থের লোভে সে-ও তো তবে শ্লাঘা ক'রতে পারে! মানুষ ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীর সমাজে ঘাতকের কোন বিশেষ সম্মান নেই, নেহাৎ প্রাণ ধারনের জন্যেই তারা অন্য প্রাণীকে হত্যা ক'রে আপন উদর পূর্তি করে, নেহাৎ আপন মানসিক বিলাসের জন্যেই করে না। আমাদের বাড়ীর কাছেই এক জমিদার বাড়ীতে একটি বিরাট তৈল চিত্রের কথা আমার মনে পড়ছে, রাজকীয় চেহারার একজন সুবেশ বিশাল গোঁফওয়ালা লোক একটি বন্দুক হাতে মৃত এক

শাদর্লের গায়ের ওপর বাঁ পাখানা রেখে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। তৈলচিত্র-খানার বিরাটত্বের জন্যে প্রতিবারই নজরে আসত আর ছবির লোকটির অহঙ্কারী ভঙ্গী দেখে আমার কেমন যেন লাগত। এখন সেই লোকটির প্রতি ঘৃণাই হচ্ছে আমার। ঘোরতর অন্যায়ের জন্যে কৃতিত্বের দাবীদার লোকটির নাম ছিল ভৈরোঁ সিং, যাদের শোধণ ক'রে তার সম্পদ সেইসব অতি দরিদ্র হীনজন বলত রাজা সাহেব! তা সেই তথাকথিত রাজাসাহাব সম্পর্কে এখন আমার অবশিষ্ট কেবল সুতীব্র বিতৃষ্ণা। বিশ্বধ্বংসী লালসা আর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে মানুষ পৃথিবীর যেখানে যা কিছু আছে খুঁজে খুঁজে ব্যবহার করে নিঃশেষ ক'রে যাচ্ছে, খাল বিল বুঁজিয়ে, গাছপালা কেটে তচনচ ক'রে ফেলছে। ভোগের নামে কেবল বিনাসের আয়োজন দিকদিগন্ত জুড়ে। প্রকৃতির এমনই বিধান যে আত্মনাশের আয়ুধ থাকে নিজেরই মধ্যে, প্রকৃতিরও সৃষ্টির মধ্যেই আছে প্রকৃতিকে বিনাশের আয়োজন, সেই আয়োজনের নামই মানুষ সৃষ্টি।

আমার এখানে আসা যে কত বছর হয়ে গেল হিসেব রাখতে পারিনি তার ব্যবস্থা নেই বলে। জারোমথাঙ্গির বড় মেয়ে যার নাম সে নিজেই পতির দেশের নাম সম্পর্কে আপন জ্ঞান অনুসারে রেখেছে যশোদা, এখন কৈশোরে। আকারে সে মাতৃভাবাপন্ন হলেও তার মার যেমন ক্ষুদ্রাকৃতির জন্যে বয়স আটকা থাকে নি, যশোদারও তেমনই বোঝা যায় সে পূর্ণ কিশোরী। অতএব ওর বয়সের নিরিখে যদি অনুমান করি তো বহু আগেই দেড় যুগ পার হয়ে গেছে। এতদিন এখানে রয়ে গেলাম। এই দীর্ঘ সময় কি ক'রে এখানে আটকে গেলাম? এমনটা তো কথা ছিল না এত দ্রুত কেটে গেল এতগুলো দিন। একটা গাছ জন্মাতে আর বড় হতে কত সময় লাগে? কতগুলো বর্ষা, কত হেমন্তের শিশির আর কটো বসন্তের বাতাস? সেই গাছ রবিমহাজনের যে কল চলছে তাতে চেরাই হয়ে ধুলো হয়ে যেতে লাগছে কয়েকটা ঘণ্টা মাত্র। এই সামান্য সময়ে চোখের পলক ফেলতে ফেলতেই একটা বিশাল বনস্পতির অস্তিত্ব যাচ্ছে লুপ্ত হয়ে। সৃষ্টি আর ধ্বংসের পার্থক্য এটাই, একটার লাগে অজস্র সময় অন্যটির কালক্ষয় হয় না। কোটি কোটি বছরের অগোচর ক্রমবিবর্তনে যে অঙ্গার পিণ্ডটি প্রস্তুত হয়েছে তাকে মাটির তলা থেকে তুলে এনে জ্বালিয়ে ফেলতে সময় আর কতটুকুই বা লাগে? লক্ষ কোটি বছরের নিভৃত তপস্যায় যে বসুধা বুকের মধ্যে জমা ক'রেছে নানা রকম ধাতুপিণ্ড তার রূপান্তর বললে রূপান্তর অথবা যথার্থ অর্থে ধ্বংসে বা সময় ব্যয় হচ্ছে কতটা? এমনি ক'রে খনিজ তেল, ধাতু, বৃক্ষ, প্রাণী সবই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে চলেছে, হয়ে চলেছে। কত প্রজাতির বৃক্ষলতা ও প্রাণী যে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেল কে তার হিসেব রাখে? আজ যে খনিজ তেলের দৌলতে মানুষের এত দৌড়োদৌড়ি অচিরে এ যাবে নিঃশেষ হয়ে।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমার এসব ভাবনায় কি লাভ ? আমার তো কীটপতঙ্গের জীবন, সে জীবন ভোজন রমণ আর শয়নেই শেষ হয়ে এল। যা হচ্ছে তা প্রকৃতির কারণেই ইচ্ছে, বিনাশ যদি পূর্ণ হয় তো প্রাকৃতিক নিয়মেই তা হবে, এতে আমার মাথাব্যথা কিসের ? কিসের যে মাথাব্যথা সেই কথাটা বুঝতে পারি না, কারণ চিন্তাটা আমাকে সচেতন ক'রে আসে না, আসে যখন তখন, আমার মনের অচেতন অবস্থায়। আসলে অরণ্যের শরাহত গুলিবিদ্ধ প্রাণীদের সঙ্গে আমি একধরনের একাত্মতা অনুভব করি, সেই অনুভূতি আমাকে পীড়িত করে। তাদের বিনাশ, অকারণ ধ্বংস, তাদের প্রতি মানুষের অহেতুক জিঘাংসা আমাকেও বিপিষ্ট করে মানুষ নামের এই দ্বিপদ প্রাণী সমাজের প্রতি। মানুষ আপন ব্যাপ্তিকে ক'রেছে সীমাহীন, অন্যের অধিকার ক'রেছে অস্বীকার। তার অবাধ লোভ, অপ্রতিহত জিঘাংসা, অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার আর সঙ্গে আছে প্রকৃতিপ্রদত্ত সর্বভুক্ স্বভাব। সমস্ত কিছু মিলিয়ে মানুষই তার কল্পিত রাক্ষস এক। তার দিতি আরোহণ যদি বা কখনও ঘটে সে নেহাৎ দৈব আসলে স্বভাবে সে দানব। জল, ভেষজ, উদ্ভিদ, চলমান প্রাণীর রক্ত, মাংস কিছুই তার লালসার থেকে রেহাই পায় না, তার ক্ষুধা সর্বগ্রাসী। সে যেমন উদ্ভিদ থেকে আহরণ করে তার প্রাণ ধারণের রসদ তেমনি সে প্রাণীর রক্তপানে তৃপ্ত করে তার মনোবাসনা, জীবহত্যা ক'রে তার মাংসে করে রসনার তৃপ্তি। পৃথিবীতে এমন সবভুক, প্রাণীর অস্তিত্ব আর দ্বিতীয় মেলে না।

আমার এদের সঙ্গে মেলে না বলেই আমি জনসমাগমের মধ্যে থাকতে চাইনা। এই সীমাহীন স্বার্থপরতা আমার সহ্য হয় না। আপন অভীষ্ট পূরণের উদ্দেশ্যে দেবতার কাছে নিরীহ একটি ছাগ শিশুকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার মধ্যে নির্বোধ বিশ্বাস থাকতে পারে সত্য থাকে না। এখানকার সম্পন্ন গ্রামবুড়োরা কোন বিয়ে বা অন্য বড় উৎসবে অরণ্য থেকে প্রাণবন্ত মিথুন ধরে এনে তার শরীর ছেদন ক'রে সেই রক্তস্রোতে আনন্দ সম্পূর্ণ করে। আমার এর কোনটাই সহ্য হয় না। যে প্রাণীটির নাকে লোহা বিঁধিয়ে দড়ি পরিয়ে পিঠে চড়ে দুঃসহ মরুপথ পার হওয়া হয় সেই পরম সহিষ্ণু পরার্থপর মহান প্রাণীকে হত্যা করে ধর্মীয় উৎসবে ধর্ম থাকতে পারে এ বিশ্বাস আমি কিছুতেই ক'রতে পারি না। আসলে ঈশ্বরের নাম ক'রে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ধ্বংস ক'রে মানুষ নিজের কল্পিত ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে মাত্র।—আমার তাই মন্দির মসজিদ গির্জা কিছু নেই ; আমার মতের অনুকূলে একজনকেও পাই না বলে আমি একা, নিঃসঙ্গ পথিক। মানুষ বলে নিজেকে মনে করি না বলে আমি একটি পোকা।

তাই আমি চেয়েছিলাম সেই এখনও জনহীন ক্ষীয়মান অরণ্যের নির্জনতায় ফিরে যেতে। জারোমথাঙ্গিকে বললাম, এখন তো আর বর্ষা নেই বৃষ্টির সম্ভাবনাও শেষ হয়েছে এবার চল ঘরটি ঠিক ক'রে নিই গিয়ে।

জারোমথাঙ্গি অন্য মত প্রকাশ ক'রল, দেখ, ওখানে তো আর কিছু নেই, সবই নতুন ক'রে :ক'রতে হবে, সে খুব হাঙ্গামা। তার চেয়ে চল ওই নীচেটায় ঘর ক'রে ফেলি। এখানে ঘর তৈরীর মালপত্তর সব পাওয়া সহজ হবে।

সহজ তো হবে টাকা লাগবে না? সবেই তো পয়সা লাগবে।

লাগবে তো বটেই।

কোথায় পাবে?

আমার প্রশ্ন শুনে কেন যে জারোমথাঙ্গি হেসে ফেলল বুঝলাম না, তবে ওর হাসিটা যে সুন্দর তা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রলাম। ওর ওই মুখশ্রীতে এমন সুন্দর হাসি যে কি ক'রে হয় কে জানে? সেই নিঃশব্দ হাসি দেখে আমিই আবার প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম, হাসছ যে?

হাসছি এই জন্যে যে জীবনে এই প্রথম তোমাকে টাকার কথা চিন্তা ক'রতে দেখলাম। হঠাৎ কি যে হ'ল কে জানে?

হবে আর কি, এখানে ঘর ক'রতে গেলে আমাকে যদি বল মহাজনের কাছে কাঠ চেয়ে আনতে হবে আমি তা পারব না।

তোমাকে কিছুই বলব না ভয় পেয়ো না। যা করবার আমিই ক'রব।

কিন্তু থাকতে তো বলবে আমাকে? এই হট্টগোলের মধ্যে আমার থাকতেই ভাল লাগে না।

সে কি? চারদিক থেকে লোকে এখানে চলে আসছে থাকবে বলে, আর তুমি বলছ—কথা শেষ না ক'রেই জারোমথাঙ্গি অন্য কথায় চলে গেল হঠাৎ মনে পড়ায়, কাল হঠাৎ ডিঙ্গির সঙ্গে দেখা। ওই পোলের ওপারে ও ঘর ক'রছে, সঙ্গে চায়ের দোকান।

ডিঙ্গির নাম ক'রতেই আমি যেন এক লহমায় বেশ কিছু বছর পেরিয়ে গেলাম, মনে পড়ল এক সুতনু রমনী যার শরীরের বর্ণ সোনার মত, মুখে পার্বত্য এলাকার ছাপ যত তার চেয়ে বেশী সমতলের মানুষের তীক্ষ্নতা। এই দুর্লভ সংযোজন যে কি ক'রে হ'ল আমার কাছে সে এক রহস্য। মনে পড়ল রমনীর শরীর ছিল অঢেল সুখের উৎস, আরামের অতল সমুদ্রের মত স্বাদ সে শরীরে। বহু খরা বর্ষা যে সেই শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তা আর আমার মনে হ'ল না স্মৃতির প্রকোষ্ঠে যে নারী সে সেই অটুট স্বাস্থ্যের অতুল যুবতী।

জারোমথাঙ্গি সংবাদ সরবরাহ করবার ইচ্ছাতেই বলল, ওর ছেলে মেয়েগুলো বেশ বড় হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে দেখলাম একজন অন্যলোক থাকে।

কি ক'রে বুঝলে?

দেখে বুঝলাম। এ আর এমন কি?

থাকুক। কোন প্রাণীই নিঃসঙ্গ বাঁচতে পারে না। যারা কথা বলতে পারে

তাদের তো সঙ্গী অবশ্যই প্রয়োজন। আর সঙ্গী বদল ক'রতে পারা সৌভাগ্যের লক্ষণ। এই ভাগ্য থেকে তুমি বঞ্চিত।

এবার আবার সেই মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে গেল জারোমথাঙ্গির মুখময়। সবচেয়ে যেটা বিশিষ্টতা তা হ'ল ওর মুখের হাসি চোখেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন বোঝা যায় সমস্ত অন্তর দিয়ে ও হাসছে। তেমনি ভাবেই বলল, অমন ভাগ্যের আমার দরকার নেই বরং তোমাকেই তাহ'লে ভাগ্যবান বলি কেন না ডিঙ্গির সঙ্গ তোমারও কিছুদিন হয়েছিল।

আমি চুপ ক'রে থেকে ওর কথা স্বীকার ক'রে নিলাম আর জারোমথাঙ্গিও সহজভাবে বলল, ওর ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে তোমার কোনটা বলতে পার?

আদৌ আমার কোন আছে কিনা জানি না। থাকলেও আমার তাতে কোন লাভালাভ নেই।

ও সেই একই হাসি মুখে নিয়ে বলল, তা নেই সে জানি তবু একটা কৃতিত্বের দাবী তো অন্তত ক'রতে পার! ডিঙ্গির মত সুন্দরীর সন্তান উৎপাদন করা তো পুরুষদের কম গর্বের নয়। ও যদি কম বয়সে এখানে আসত তাহলে মোরের অনেকেই চেষ্টা ক'রে দেখতে ছাড়ত না।

আমি ওর এত খোলামেলা কথায় বেশ অস্বস্তি অনুভব ক'রছি বলে কথার ধারা বদলাতে বললাম, তুমি তবে ডিঙ্গিকে সুন্দরী বলে স্বীকার কর?

না স্বীকার করবার কারণ আছে? ও যে সুন্দর একথা গোটা মোরেহ মানবে। হ্যাঁ কেবল দু একজন মেয়ে যারা ওর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না তারাই কেবল হিংসে ক'রে বলে ও আর এমন কি?

আজকাল এসব অপ্রয়োজনীয় আলোচনা আমার মনে ধরে না তবু অনেক দিন পর বলে আজ কেমন যেন মজা লাগছিল তাই বেশ আগ্রহ ক'রে শুনছি। কৌতুক ক'রেই বললাম, ডিঙ্গি কি তবে মোরে সুন্দরী?

সে আবার কি? হ্যাঁ তবে মোরে কেন আমি আমাদের পাহাড়ী রাজ্যে ওর মত সুন্দরী দেখি নি।

ওর কথা শুনে আমি মনে মনে মানলাম যে ওর তারিফ করবার মত চোখ আছে। আর একটা কারণে ওর প্রশংসা ক'রতে হয় সে ওর অকপট সরলতা। ওর বিশ্বাসে আর বাক্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। কারও প্রশংসা করবার সময় ওর কোন কার্পণ্য আসে না, খারাপ লাগলে নিন্দা করবার সময়ও সৌজন্যের কথা চিন্তা করে না, তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার ক'রতে হয় যে এখন পর্যন্ত ওর কাছে নিন্দা বিশেষ শুনি নি। তার একটা কারণ এ হ'তে পারে যে ওর সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিশেষ অভাব আছে। না শোনবার আরও একটা কারণ হতে পারে যে আমি কাউকে চিনি না, কোথাও যাই না এবং কারও সঙ্গে মিশি না বলে কোন লোক সম্বন্ধে বিশদ কিছু

জানি না তা আলোচনা চলবে কি ভাবে ? এর মধ্যে ওর হঠাৎ যখন যাকে ভাল লাগে আমার কাছে বলে তৃপ্তি পায়, আমি প্রায় সময় নিঃশব্দেই শুনি। আমি নিজেও অপরের প্রসঙ্গ আলোচনা ক'রতে ভালবাসি না, নেহাৎ ওর তুষ্টির জন্যে কখন কখন শুনি মাত্র।

এখানে এসে আমার একটা বিশেষ অসুবিধে হয়েছে এই যে ঘরের বাইরে পা দিলেই মানুষের মুখ দেখতে হয়। দিনে দিনে কি হয়ে গেল পিল পিল করে মানুষ আসছে আর বসে যাচ্ছে মোরেহতে চারিদিকে ঘর বাড়ী গড়ে উঠছে যেন হঠাৎ সন্ধ্যার আকাশে তারা ফুটে ওঠার মত করে। এ বিষয়ে বুড়ো চৌবা বলে ভাল। সেই ইংরেজ রাজত্বের শেষ প্রহরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে ডাকাত চৌবা এসে আত্মগোপন ক'রেছিল মোরেহর অসূর্যস্পশ্যা অরণ্যে। ওর সঙ্গে কেউ ছিল না বলে দক্ষিণের পাহাড়ে একমাত্র নাগা পরিবারেই তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সেই নাগার সঙ্গে শিকার করে হরিণ আর খরগোসের মাংস খেয়েই দিন কাটাতে হ'ত তাকে। মাঝে মাঝে জুম চাষের ফসল উঠলে ভাত জুটত কিছু-দিন। এখন কথা উঠলে বন্ধ হয়ে আসা কুতকুতে চোখ খুলে সে সব দিনের গল্প করে। তখন চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশাল সব মহীরুহ আর তাদের শরীর জুড়ে নানা রকম লতা পাতার জড়াজড়ি। সেই ঘন বনে দশ পা পথ এগোতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগত, মোরেহর ঢাল বেয়ে তম্মুর দিকে নেমে গেলে সমতলের অরণ্য জুড়ে থাকত বর্মার ডাকাতেরা। দলে দলে ভাগ হয়ে থাকত তারা নিজের নিজের মত। চৌবার সঙ্গে তাদের দেখা হত দূরে থেকে, খাদ্যাখাদ্য বিচারে ওদের সঙ্গে আদৌ মিল ছিল না বলেই চৌবা ওদের সম্পর্কে আগ্রহ দেখাত না। চৌবার দুটো বউএর মধ্যে ইবমপিসা একদিন একা মোরেহ এসে হাজির হয়ে গেল। প্যালেল থেকে কথা-বস্তিতে একদল লোক আসছিল হেঁটে সমস্ত মণিপুর রাজ্যে কেবল এই কথাবস্তিতেই যা মৈতেইরা থাকে নইলে আর কোথাও পাহাড়ে অরণ্যে মণিপুরী মানুষ নেই সেই কথার মৈতেইদের সঙ্গী হয়ে এসে পড়ল ইবমপিসা। যুবক চৌবা সেদিন যেমন খুশি তেমনই অবাক হয়েছিল স্ত্রীর কাজে। অভিভূত সে বন কেটে নিজেদের মত কুঁড়ে নিল বানিয়ে। চৌবার ধারণা মোরেহ বসতির সেই সুরু। তারপর তো উদ্বাস্তুর স্রোত এল বর্মা থেকে তার মধ্যে একজন বিহারী নাপিত এলেন নেতাজী সুভাষ বসুর একখানা ফটো আর একটা আই. এন. এর পদক সঙ্গে করে। পরাজিত আজাদহিন্দ বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন তিনি, একসময় নিয়মিত নেতাজীর ক্ষৌরকর্ম করেছেন এই তাঁর অহংকার। সেই সম্বলটুকু বুকে নিয়েই তিনি ছোট্ট একটি-টিনের ঘরে চুল-কাটবার দোকান খুলেছেন সুভাষচন্দ্রের ছবিটা ঘরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে। এই উদ্বাস্তুর স্রোত এখনও যেন ফল্গু ধারা, বোঝা যায় না রোজই আসে কিছু মানুষ, একে একে আসে নিঃশব্দে বসে। মোরে-র এলাকা জুড়ে শূন্যভূমি আর নেই বলে

পূর্বাদিকে দুই রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী অরাষ্ট্রীয় অরণ্যভূমি কেটেও বেড়ে যাচ্ছে জনপদ, ধীরে ধীরে মোরেহ যেন এখন এক অন্য অরণ্য, জনারণ্য। আমি মাঝে মাঝে দেখি আর ভাবি মানুষের এই বিকট বিস্তার কোথায় গিয়ে থামবে? বনজঙ্গল তো বোধহয় সব শেষ, মোরের চারপাশের পাহাড় যখন সব ফাঁকা হয়ে গেছে তখন কি আর প্রকৃত অরণ্য অবশিষ্ট কিছু আছে? আজকাল তো দেখি রবিবাবুর কাঠ চেরাই কল দিনরাত চলে। সাঁই সাঁই শব্দ কোন কোন দিন রাত পর্যন্ত শুনি! তাহ'লে কি পরিমাণ কাঠই না রোজ চেরাই হচ্ছে, কত বৃক্ষ ধরাশায়ী হচ্ছে প্রতিদিন! এখন আর চারপাশে কোন পরিণত বৃক্ষ নেই তাই ট্রাক বোঝাই কাঠ আসে মণ্ডকাণ্ড মিনো আর কথাবস্তির দুর্গম সব অরণ্য থেকে। মহাজনের চেরাই কল ছাড়াও গোল গাছ সব গাড়ী বোঝাই হয়ে হয়ে চলে যায় ইম্ফলের সরকারী সড়ক ধরে। উত্তরসান্ধ্য নীরবতায় চলমান গাড়ীর গর্জন আমাদের কুটির থেকেও শোনা যায় আজকাল, সে গর্জন খুজাইলকের ক্ষীণ জলধারার শব্দ ছাপিয়ে ওঠে।

শান্ত অরণ্যে এই দুরন্ত গতিবেগ সর্বত্র। সারাদিন আসা যাওয়া বেচাকেনার অন্ত নেই; হরেক রকম জিনিষ নিয়ে অনবরত অসংখ্য লরী এসে মাল খালাস ক'রেই বর্মা থেকে আসা ভুট্টার দানা, পোস্ত, রকম রকম ডাল বা অন্য জিনিষ নিয়ে চড়াই ভাঙ্গার গর্জন ক'রতে ক'রতে চলে যায় ইম্ফলের দিকে, কাঠ চলাচলের গাড়ী কেবল কাঠই বয়। মানুষগুলোরও ব্যস্ততা তুলনায় কিছু কম নয়। অগুণতি বিহারী কর্মী মৌমাছির মত এসে জুটে গেছে যারা চোখের পলকের বেগে ভর্তি ট্রাক শূন্য করে নিয়ে অন্য সামগ্রী দিয়ে পূর্ণ করে তোলে। এই সব লেন-দেনকে কেন্দ্র করে চলাচল আর দ্রুততা সমগ্র এলাকা জুড়ে। এই গতিময়তা আমার ভাল লাগে না, সহ্য হয় না এই দৌড়াদৌড়ি। আমি একান্ত ভাবেই চাই এ থেকে দূরে যেতে, দূরে কোন পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে এখনও হয়ত আছে অরণ্যের কিছু ধ্বংসাবশেষ। কোন ঘর নয়, মাথার ওপর কঠিন কোন আবরণও নয় আমার কেবল একটি বড় উনিংথো গাছের ছায়া হলেই চলবে, চারপাশে কিছু খাংড়া ইয়াঙ্গো আর লেহাও তেলহাও বা বাঁকা শরীর ওয়াঙ গাছের ভিড় থাকলে তো কথাই নেই, তাদের ছায়াময় মায়ায় আমি স্বর্গবাসের তৃপ্তি পাব। হরিণশূন্য বনে ভুল করে উড়ে আসা পাখিরা যদি এসে বসে, নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপে মাতোয়ারা হয়, তো আমার সুখ পূর্ণ হবে অনেকটাই। একসময় কত বানরই না ছিল সবাই বলে পালিয়েছে; আমি জানি তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কোথায় পালাবে? আমরা এদিকের অরণ্য নিধন করেছি ওদিকের লোকেরা ওদিকের, ফলে নির্মূল হয়ে গেছে বনভূমি, নিঃশেষ বনবাসীরাও। হয়ত দেখা যাবে ওই বিজনে প্রাণী বলতে আমি একা, তা হোক; সেই একাকীত্বও আমার সহ্য হবে অসহ্য এই হট্টগোল আর দৌড়ে বেড়ানো।

কিন্তু করি কি, সেই দুরন্ত বর্ষার পর থেকে কি এক জ্বর যে আমাকে পেয়ে

বসেছে কিছুতেই ছাড়ছে না। দুচারটে দিন যদি বা আমায় ছেড়ে থাকে, আবার ঝাপটে ধরে, ছাড়তেই চায় না। আমার আবার স্বভাবটা এমনই যে, কেউ জড়িয়ে রাখলে ছাড়াতে পারি না। জ্বরের বেলাতেও যেন সেই স্বভাবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জারোমথাঙ্গি তার সাধ্যমত ওষুধপত্র এনে এনে জোগাচ্ছে কিন্তু সুফল দিচ্ছে না কিছুই। তার একান্ত বিশ্বাসের শিখ চিকিৎসক যখন ব্যর্থ হ'ল তখনই তার মনে এল ব্যাপারটা নেহাৎ ব্যামো নয়, এ অন্য কিছু। কি হতে পারে? নিশ্চয় কোন অপদেবতা, ধীরে ধীরে জীবন্ত মানুষের রক্ত শুষে নেওয়া যাদের না কি চিরাচরিত কর্ম! বহু আয়াসে সে সন্ধান পেয়েছে লোকচাও বলে কয়েকমাইল দূরে যে বসতি আছে সেখানে কে একজন নাগা গুণীন আছে যে এসব অপদেবতার ছলাকলা সম্বন্ধে অবহিত, তার কাছে সব বিধিব্যবস্থাও আছে এদের বিদায় করবার। জারোমথাঙ্গির একান্ত আগ্রহ আমাকে নিয়ে সে লোকচাও যায় সেই গুণীনকে দিয়ে আমার ভূত ছাড়াতে। আমার যা শরীরের অবস্থা তাতে ভূত ছাড়াতে যাবার পথেই ধাত ছেড়ে যাবে। এই কথাটা যখন ওকে বোঝাতে পারলাম তখন ও স্থির ক'রল সেই গুণীনকে যে কোন উপায়ে এখানে আনবে। ওকে অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত ক'রতে চাইলাম, বললাম, এ আমার নেহাৎই অসুখ। এর সঙ্গে কোন অশরীরী প্রাণীর যদি কোন সংযোগ থাকে তবে তার নাম রোগজীবাণু। তোমার গুণীন অন্য অনেককে চিনতে পারে একে চেনে না। একে একমাত্র চিনতে পারে অভিজ্ঞ কোন চিকিৎসক, সে তুমি এখানে কোথায় পাবে?

আমার কথাকে জারোমথাঙ্গি আমার বলে বিশ্বাস ক'রতে পারল না কিছুতেই, তার একান্ত বিশ্বাস আমার শরীরকে দখল করে আছে যে অপদেবতা এসব তারই কথা, কণ্ঠস্বর কেবল আমার। আমার রোগের চেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা হল ওকে নিরস্ত করবার। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে কখন কখন মানুষের বিশ্বাসকে টলানো যায় না। ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে মানুষ ভুল করে, ক'রে হয়রাণ হয়ে মরে কিন্তু সেই বিশ্বাস সে ত্যাগ ক'রতে পারে না। জারোমথাঙ্গিও তেমনি এক ভ্রান্তির শিকার, তার সদিচ্ছা আন্তরিকতা কোনটাই কোন কাজে লাগবে না আমি জানি, ওকে কি করে বোঝাই তা? কি বলে বোঝালে ও বুঝবে? আশ্চর্য এই যে আমার কথার ওপর বরাবর ওর অটুট বিশ্বাস সত্বেও ও এখন আমার বলা কোন কথাকেই আমার নিজের বলে মনে ক'রতে পারছে না। আমি আশ্চর্য হচ্ছি ওর মত একটি শক্ত অবিচল চিত্তের মেয়ের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠটা দেখতে পেয়ে। জীবনের এক দীর্ঘ অংশ ওর সঙ্গে কেটে গেল অথচ একটা দিনের জন্যেও বুঝিনি যে ওর মনের নিভৃততম প্রদেশে এমন একটা অর্থহীন দুর্বলতা জমাট বেঁধে আছে। অদম্য সাহসী এই মেয়েটি যে প্রাগৈতিহাসিক এক বিশ্বাসকে মনের মধ্যে এমন ভাবে ধরে রেখেছে কে জানত! অনন্যোপায় হয়ে আমি ওর অনুপস্থিতির সময়ে জাঙ্গি-

রাঙ্গিকে দিয়ে মেরীকে ডাকালাম, মেয়েটি স্থানীয় গির্জার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, স্বামী পলাতক বলে ও পুরুষ সঙ্গ অপছন্দ ক'রতে অভ্যাস করে ফেলেছে, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী আর বুদ্ধিমতী বুঝেছি বলে ওকে ডেকে সমস্ত বলতে সামান্য হেসে ও বলল, এ ব্যাপারে জারোমকে পরামর্শ দিচ্ছে বোধহয় সোয়ামা। আমি তো কিছুই জানি না, দেখছি।

কৌশলটা কাজে লেগে গেল। পরের দিন ও এসে বলল, মেরী এই ওষুধটা দিল। এটা নাকি খুবই ভাল ওষুধ আজকাল জোটানোই যায় না। ভল্লুকের যকৃত দিয়ে তৈরী এই ওষুধে যে কোন জ্বর সেরে যায়।

শোনামাত্রই যেন আমার জ্বর ছাড়ল। যাক তাহলে ঝঞ্ঝাট একটা এড়ানো গেল। ভল্লুকের যকৃতের ওষুধ আমি খাই কি না খাই সে কথা পরের, ওষুধটা যে কাজের তা আমি বুঝলাম জারোমথাঙ্গির মাথা থেকে ভূত নেমে যাওয়াতে। জ্বর ছাড়ানোর হোক আর না হোক ভূত ছাড়ানোর ওষুধটা মেরী যে যথার্থ জানে সেই খবরটা জেনে রাখলাম। ওষুধটা আমার সামনে দিয়েই ও বলল, নাও এখনই একবার খেয়ে নাও। এতে যতটা আছে দশবারে সবটা খেলেই ভাল হয়ে যাবে।

ঠিক আছে একটু বাদেই খাচ্ছি, তুমি আমার হাতের কাছে রেখে যাও।

মনে ক'রে খেয়ো কিন্তু, আমি এখন একবার তেসু যাচ্ছি ভাল চা পাত্র আনতে হবে একসেট পছন্দ ক'রে রবি মহাজনের ছেলের বউ আনতে দিয়েছে। কথা শেষ করতে ক'রতেই সে বেরিয়ে গেল। আমি চিন্তা ক'রলাম ওষুধটা কি করা যায়? ভল্লুকের যকৃৎ দিয়ে করা ওষুধ খেয়ে ভাল হ'তে আমি চাই না। একটা অরণ্যচারী প্রাণীকে হত্যা ক'রে তার শরীরের অংশ কেটে নিয়ে আমার প্রাণ বাঁচানোর ব্যবস্থা করাতে আমার আদৌ সম্মতি থাকতে পারে না। যে ভল্লুক বেচারীটিকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করা হয়েছে তার জন্যে আমার এমনই অনুকম্পা হতে লাগল যে ওই ওষুধ ব্যবহার আমার পক্ষে অসম্ভব। ওটি সরিয়ে রাখাই সাব্যস্ত ক'রলাম, জারোমথাঙ্গি যখনই চাইবে বলব একটু ক'রে খাচ্ছি। সামান্য এই জীবন আমার ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে এসেছে, অপব্যবহারে শরীর হয়ে গেছে দীর্ণ, একে এ ভাবে অযথা মেরামতের বৃথা চেষ্টা ক'রে কি লাভ? বরং আমার যদি এ ওষুধ প্রয়োগে কোন উপকার না দর্শায় তো ভবিষ্যতে এর ওপর নির্ভরতা এদের কমবে ফলে এ ওষুধ বানাবার আগ্রহও কমবে, হয়ত এই ওষুধের অছিলায় যে ভল্লুকের প্রাণ হরণ হ'ত সে অন্তত হবে না। অত্যন্তই অকিঞ্চিতকর এই জীবন, এটা ফুরোলে কি অবশিষ্ট থাকে আমি জানি না। সামান্য সিগারেট ফুরোলে তো তবু থাকে ছাই, সেই ছাই মাটিতে মিশে মাটি হয়ে যায়। জীবনের কি হয়? ফুরিয়ে যায় মানে শূন্য হয়ে যায়, একেবারে ফাঁকা। অথচ পৃথিবীতে ফুরিয়ে যাওয়া না কি নেই, সবই নাকি রূপান্তর, তাই

যদি হবে তবে জীবনের পরবর্তী রূপ ?

উড়ে যাওয়া ধোঁয়া। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবার আগে যেমন ক্রমাগত বড় আরও বড় আরও বড় হ'তে থাকে আমার ভাবনা ও তেমনই বেড়ে চলে। তারপরই এটা হারিয়ে যাবার সময় আসে এমনিভাবেই অসংখ্য ভাবনা আমার হারিয়ে গেছে, অসীমে মিশে যাওয়া ধোঁয়ার মত আমি আর তাদের কখনও খুঁজে পাই নি। খুঁজতেও চেষ্টা করিনি। আমি সবই অর্থহীন মনে করি। আর আমার এই জীবন, এ তো একান্তই অর্থহীন। সামান্য একটি কীটের জন্ম, আর আরও অনেকগুলো কীট সৃষ্টিতে সাহায্য করবার মধ্যে কি এমন তাৎপর্য থাকতে পারে ? বিশ্বময় অসংখ্য প্রাণের মধ্যে অপরিখ্যাত একটি প্রাণমাত্র আমি। আমার সৃষ্টি পৃথিবীর পর্যাবৃত্তে, প্রত্যেকটি সৃষ্টি এবং বিনাশই যেমন এই অমোঘ নিয়মের অনুসঙ্গ আমিও তেমনই মাত্র। কাজেই আমি মৃত্যুকে বিশেষ মূল্য দিই না, তাই গুরুত্বও নয়। তার নির্ধারিত দিনে অবিকল্প সে আসবে এই অমোঘ সত্যের কোন ব্যত্যয় নেই কাজেই তাকে নিয়ে প্রাক্‌চিন্তায় আমার কি প্রয়োজন ? আমি তো চিরদিনই জেনেছি মৃত্যু আমার এবং আমি মৃত্যুর খুব কাছাকাছি। এতদিনের নিঃসঙ্গ ভ্রমনে কেন যে দুজনের দেখা হয়নি বিস্ময় সেটাই।

জারোমথাঙ্গি কিন্তু দ্বিতীয় দিন বলল, ওষুধটা সত্যি খুব ভাল। তোমাকে অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে।

ওর কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। আমার হাসি দেখে ও পাছে কিছু অনুমান ক'রে ফেলে অনর্থ বাধায় তাই সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, হ্যাঁ ওষুধটা সত্যিই খুব ভাল। শরীরেও জোর পাচ্ছি অনেকটা।

পেলেই ভাল। এসব হচ্ছে সাবেক কালের ওষুধ, এর গুণই আলাদা।

তা বটে। তবে কি জান কোন ওষুধই মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। আর আমারও তো দিন অনেক হয়েছে যদি আমার যাবার থাকে তো তুমি তাকে ঠেকাবে কি দিয়ে ?

জারোমথাঙ্গি আমার পাশটিতে বসেছিল। হঠাৎ যেন অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়াল, পরক্ষণেই বলল, তুমি এসব বাজে কথা ব'লো না তো।

বুঝলাম সত্যের কঠোরতা ওর সহ্য হচ্ছে না। সত্যের স্বরূপই এই, সে কঠোর। তার রূপের কোথাও কোমলতা নেই, গ্রীষ্মের সূর্য কিরণের মত নির্মম সে কিন্তু স্পষ্ট, ঋজু। তার স্পর্শে মায়া মমতা স্নেহ কিছু নেই, আছে দৃঢ়তা। সকলের তা সহ্য না-ও হতে পারে, সময় বিশেষে দুঃসহ মনে হতে পারে, সময়ান্তরে যা হয়ত সুবহ হতে পারত। অমি সে সব বিবেচনা ক'রে বললাম, তুমি উত্তেজিত না হয়ে আমার কাছে একটু ব'সো।

ও আমার পাশটিতে বসতে আমি ওর একটি হাত আমার হেফাজতে টেনে নিলাম

যাতে কোন কথা শুনেই চট ক'রে উঠে যেতে না পারে। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, শীতটা এবার কেমন জাঁকিয়ে পড়েছে দেখেছ? লোকে বলে বর্ষা বেশী হলে ঠান্ডা বেশী হয়।

জারোমথাঙ্গি বলল, তোমার জন্যে একটা বেশ মোটা দেখে লেপ কিনে আনব প্রেমনগর থেকে। কাপড়ের টাকাগুলো শ্যামসুন্দর মহাজনের কাছে কাল পেয়ে গেলেই কিনে আনব। তখন আর তোমার কষ্ট হবে না ঠান্ডাতে। আজ বরং মেয়েদের বলি মিল থেকে জ্বালানী কুড়িয়ে আনুক, রাত্রে ঘরে আগুন ক'রে দেব, ঠান্ডা বাঁচবে।

সবই তো বুঝলাম কিন্তু আমার শরীরের মধ্যে যে আগুন আছে সেটাই তো নিভে এসেছে। ভেতরে কোন বল পাইনা, কাঁপুনি ওঠে বুকের মাঝখানটা থেকে।

তোমার শরীর যে এত খারাপ হয়েছে আমাকে আগে বলো নি কেন? এত দুর্বল তো তোমাকে মনে হচ্ছিল না!

আমার যেন কথা বলতেও ক্লান্তি আসছে। তাই কিছুক্ষণ থেমে বললাম, দিনে দিনে তো বেশী ক'রে বুঝছি। আগে তো এমন হ'ত না।—আসলে আমি ওকে আমার শরীরের অবস্থা ঠিক বোঝাতে পারছি না, সন্ধ্যার লগ্নে যেমন ধীরে ধীরে পৃথিবীর আলো নিভে আসে অতি বিলম্বিত বেগে, তেমনি সুদৃঢ়ভাবে আমার শরীর নির্বল হয়ে আসছে দিনে দিনে, মুহূর্তে মুহূর্তে।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে ও বলল, তম্মুতে একজন ভাল ডাক্তার এসেছে। বর্মী ডাক্তার। খুব নাম ডাক হয়েছে ওখানে। তুমি যেতে পারলে তাকে দিয়ে তোমাকে একবার দেখালে ভাল হ'ত।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, ডাক্তার আমার ভাষা যতটা বুঝবে আমিও তার ভাষা ততটুকুই বুঝব।

কেন? প্রেমনগরের প্রত্যেকেই তো বর্মী জানে, সেখান থেকে কাউকে ডেকে নিয়ে যাব। যদি যেতে পার তো বল!

ওর অসম্ভব প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এবার মনের কথাটা বললাম, যে পাহাড়ে তুমি ঘর বেঁধেছিলে, আমার বড় ইচ্ছে ছিল আবার আমি ওখানে গিয়েই থাকি। এখানে থাকতে আমার ভাল লাগে না ঠিকই, কিন্তু চিকিৎসার জন্যে আমার আর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই। আর ওই পাহাড়ের ওপরটায় ফিরে যাবার শক্তিও নেই আমার, তাই যদি তুমি একটা কথা রাখ তো আমার আসল ইচ্ছার কথাটা বলি।

জারোমথাঙ্গি আশা ক'রল কি কথাই না আমি বলব, তাই সাগ্রহে জানতে চাইল, বল তোমার কি ইচ্ছে?

আজ হোক কাল হোক বা কিছুদিন বাদেই হোক মরে তো একদিন আমি যাবই, আমি মরে গেলে তোমরা আমার দেহটা ওই পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে পুঁতে

দেবে। আর আমার সেই কবরের ওপর কোন ফলক না লাগিয়ে দুটো ফলের গাছ লাগিয়ো। এমন গাছ লাগাবে যা খুব বড় হয়, যে গাছের ফল মানুষের অখাদ্য, কিন্তু পাখিতে খায়। কিছু না পেলে ভাল হয় যদি লাগাও বট। তোমার ছেলে মেয়েদের দিয়ে গাছ দুটোকে একটু যত্নে রেখো যতক্ষণ না তারা বড় হয়।

তোমাদের দেহ তো পোড়াতে হয়—জারোমথাঙ্গি বলল। আমি বললাম, মৃত্যুর পর পোড়াও বা পুঁতে দাও বা ফেলেই দাও মৃতের তাতে কিছুই যায় আসে না। আমার যেখানে জন্ম সেই সংস্কারের সকলে মৃতদেহ দাহই করে কিন্তু আমার দেহটা পুঁতে দেবার দরকার আছে।

জারোমথাঙ্গির চোখে মুখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠতে দেখে বললাম, কবরের গাছ কেউ কাটবে না। সব গাছ নষ্ট হয়ে গেলেও চলমান পাখিরা এসে ওই গাছ দুটোয় আশ্রয় পাবে, খাবারও পাবে ক্ষিধের সময়। গাছে যখন অজস্র ফল পেকে থাকবে তখন তো অন্তত আসবে পাখিরা!

অন্যসময় এমন নিঃশব্দে কথা শোনেনা জারোমথাঙ্গি কিছু না কিছু বলেই। এখন কিছুই বলছে না দেখে আমি বললাম, রোগে মারা গেলে রোগীর দেহ পুড়িয়ে দিলে রোগজীবাণু নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পুড়িয়ে দেওয়াই ভাল। আমার তো তেমন ব্যাধি কিছু হয় নি, আমার মৃত্যু হবে স্বাভাবিক নিয়মে।

তবে তুমি এতসব ভাবছ কেন? জারোমথাঙ্গি এতক্ষণে কথা বলল, স্বাভাবিক নিয়মে মারা গেলে এখনও তার অনেক দেরী। তুমি কেন অমন বিচলিত হয়ে পড়ছ বুঝছি না।

মানুষের দিন কবে শেষ হয কিছু বলা যায়? তাই আমার শেষ ইচ্ছার কথা আজই বলে রাখলাম।

তার এখনই কি দরকার? বুড়ো চোবাকে দেখছ না কতদিন বেঁচে আছে? চোখে ভাল দেখে না, কানে শুনতে পায় না হেঁটে চলে বেড়াতেও পারে না অথচ বেঁচে আছে! সেবা সিং পাঞ্জাবীর সব চুল সাদা হয়ে গেছে, চোখের ভ্রু-ও সাদা, তোমার তো অর্দ্ধেক চুলও সাদা হয়নি এখন, তুমি এখনও অনেক দিন বাঁচবে।

আমি ওর ইচ্ছার প্রতিবাদ ক'রতে চাইলাম না। ওর প্রীতি আমাকে আরও কিছুদিন কাছে ধরে রাখতে চায়। সবাই চায়। এরই নাম মায়া। জারোমথাঙ্গির চেহারা কঠিন। ওর মাংসহীন শরীরে, হাড় সর্বস্ব মুখমণ্ডলে যতই কাঠিন্য থাক, শরীরের অভ্যন্তরে কোন্ গোপন স্থানে জানিনা মমতার একটি পূর্ণ পাত্র আছে। সেই পাত্র এমনই পূর্ণ যে সব সময়ই যেন উপচে পড়ছে। উপচীয়মান পাত্রের অপচীয়মান মায়া আমাকে প্রলিপ্ত ক'রে এসেছে অকারণেই, কারণ আমি কারও প্রতি কখনই কোন মমত্ববোধ উপলব্ধি করি নি, নিজের প্রতিও নয়। আজও তাই মৃত্যুর সম্ভাবনায় কোন কষ্ট হচ্ছে না। আমি বরং আপন শরীরে তার নীরব সুঙ্গির

অনুপ্রবেশ বেশ ভালভাবে উপলব্ধি ক'রছি। জারোমথাঙ্গি যা-ই বলুক, যা-ই চাক আমি কিন্তু অনুভব ক'রছি অননুভূত অনুভূতি ক্রমাগত নিকটতর হচ্ছে। প্রার্থনার সময় জানাতে যেমন গির্জার গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি গভীরভাবে বাজতে থাকে আমার মগজের মধ্যে অমনি ক'রে কে যেন বাজিয়ে চলেছে শেষ প্রহরের ঘণ্টা। সে যে কেমন ধ্বনি বোঝানো যাবে না তা, বুঝি মাত্র। বুকের মধ্যে অনুভব করি তার গভীর অনুরণন। বিনাশ থেকে কে রক্ষা ক'রতে পারে? জন্মের লগ্নেই মৃত্যু হয় নিহিত, সৃষ্টির মুহূর্তেই নির্ধারিত হয় বিনাশ। পৃথিবীরও ধ্বংস তেমনই অনিবার্য। আর সেই ধ্বংসের কাজ সমাধা করবার জন্যেই সৃষ্টি মানুষের। এই প্রাণীটির লোভ এবং প্রয়োজন অপরিসীম। শিশু যেমন মায়ের বুকের দুধ ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত স্তনচোষণ ছাড়ে না আমরাও তেমনই এই পৃথিবীর ক্ষমতা যতদিন থাকবে শোষণ ক'রে যাব তাকে। শেষে একদিন প্রকৃতি হয়ে পড়বে অক্ষমা। বাতাস হবে জলশূন্য, মাটি হবে সৃষ্টিক্ষমতা নিঃশেষিতা। যে ভাবে আমরা মাটি কেটে তুলে নিচ্ছি সব রসায়ন, শুষে নিচ্ছি ভূগর্ভের জল, সীমাহীন সার প্রয়োগে স্বগর্ভা মাটিকে নিয়ে যাচ্ছি তার প্রাণ সৃজনের শেষ সীমায় তাতে এ পৃথিবী একদিন নিশ্চয় হবে নিঃস্ব এবং অনুর্বর।

পৃথিবীর সেই শবে তখন প্রাণ বলতেই কিছু থাকবেনা জারোমথাঙ্গি, না আমি না তুমি না তোমার এই সন্তানেরা। থাকবে না অলকানন্দা, থাকবে না তার রুচিশীল আভরণ বা আচরণের কোনই পরিচয়। এই লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছর ধরে আমরা অসংখ্য প্রাণী কেবল এসেছি আর গেছি এর কোন তাৎপর্যই থাকবে না। সেদিন বিখ্যাত চিকিৎসক হয়ত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ অলকানন্দা আর চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ শেষ না করা অনিকেত আমি—কারও কোন বিশেষত্ব থাকবে না। এখনও তো এই পৃথিবী অবিকৃত আছে তাতেই কি কোন তফাৎ আছে হের হিটলার আর হরিপদ হালদারের? হিটলারের বোমার ভয়ে যে হালদার কলকাতা শহর ছেড়ে সাতাত্তর কিলোমিটার দূরে এক অজ গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল দিনের বেলাকার ইঁদুরের মত, তাতে আর হিটলারে এখন ব্যবধান কতটুকু? একথা না হয় বাদই দিলাম অলকানন্দা, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, অষ্টপদ, ভূচর, খেচর, জলচর—এই যে অসংখ্য প্রাণী জন্মেছে আর মরেছে কার সঙ্গে কি পার্থক্য আছে আজ বলতে পার? ক্ষুদ্রতম একটি কীট আর প্রবল বলবান একটি মানুষ—যারা এই মাটিতে সৃষ্টি হয়েছিল একাকার হয়ে গেছে সব।

আমি তাই সামান্যতম ভোগাধিকার আছে মনে ক'রে চাহিদাকে কেবল প্রাণ ধারণের পর্যায়টুকুতে সীমাবদ্ধ রেখেছি। কেবল দুঃখ রয়ে গেল, যে সবুজ বসুধার স্পর্শ আমার সমস্ত অঙ্গ আর প্রাণ মন জুড়ে, সেই মায়াময় সবুজ অরণ্য আমার চোখের সামনে থেকে দুঃসহ এক স্বপ্নের মত নিঃশেষ হয়ে গেল। অসহায়

কাঁটি আমি সসীম শক্তি দিয়ে পারিনি এই বিপুল বিনাশের বিন্দুমাত্রও প্রতিরোধ ক'রতে। আমার চোখের সামনে নিহত হয়েছে নির্বিরোধ হরিণ তাকে রক্ষা করবার সাধ্য ছিল না আমার, ঘুমন্ত শাখামৃগের দেহ সারঙ্গিক শরাঘাতে সুপুষ্ট ফলের মত ঝরে পড়েছে মাটিতে, হাতির মত মহৎ প্রাণীর পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে তাকে দিয়েই তার আবাস করানো হয়েছে ধ্বংস, আপন আশয়ে বিচরণশীল প্রাণীকে খাদ্যের আশ্বাস দিয়ে প্রবঞ্চিত করে তার গলায় বেঁধানো হয়েছে লৌহশলাকা, হত্যা করা হয়েছে তাকে বিচারহীন নির্মমতায়। নিরীহ ছাগশিশুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে তার করুণ আর্তনাদে কর্ণপাত না ক'রে। সবই প্রত্যক্ষ করেছি আমি ক্লে- সহ অক্ষমতায়। সহ্য করতে করতে আমি ক্লান্ত। এই যে জীবন যা অতি দীর্ঘ,সমস্ত জীবনে আমি কখনও কিছু আশা করিনি, অন্তত জন্ম হবার পরে তো নয়ই। কিন্তু এই অন্তিম সময়ে, আমি সামান্য একটু আশা ক'রছি আশাকরি জারোমথাঙ্গি তা রাখবে। আমি দীর্ঘদিনের নিবিড় সঙ্গে জেনেছি, বুঝেছি জারোমথাঙ্গি উত্ত- রমণী। প্রেম তার তাৎক্ষণিক সুখানুভূতির কৌশলমাত্র নয়, নাগরিক কুলটাদের মত প্রেম তার কাছে সুপাত্র সন্ধানের ছলনাও নয়, প্রেম তার অন্তরের নির্দেশ। কাজেই সে আমার অন্তিম বাসনাকে রূপায়িত ক'রবে। যদি কোন সঙ্গীও না পায় তো একলা রূপায়ণ ক'রবে আমার অভীপসার। আমার দেহটি নিশ্চয় কো- বিজন পাহাড় চূড়ায় প্রোথিত হবে। জারোমথাঙ্গি দুটি কিশলয়ও সংগ্রহ ক'রে আমার মাথার দিকে একটি আর পায়ের দিকে একটি ক'রবে রোপন। , দন ... সেই কিশলয় যৌবনপ্রাপ্ত হয় ক্লান্ত জারোমথাঙ্গি একাই হয়ত ক'রবে তার পারচ... তারপর একদিন সেই কিশলয় মহীরূহ হবে কিংবা বনস্পতি। তার্ই নিবিড় ছায়ায় আমি দিনে দিনে ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকব। কি গভীর প্রশান্তিতে সেই মিলিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া। আবার যদি কোন প্রাণী কোনদিন বিচরণ পথে পেঁৗছে যায় আমার দেহকে আশ্রয় দেওয়া শাদ্বলে, যদি পক্ষী বা পতঙ্গকূল এসে আশ্রয় নেয় ওই বৃক্ষ শাখায়, তাদের কাকলি কূজন কিংবা কণ্ঠস্বর আমাকে পরম পরিতৃপ্তির সন্ধান দেবে, আমার বিলীয়মান অস্তিত্বের ওপর তাদের পদসঞ্চার দেবে আমায় প্রশান্ত সুখ। তবে তাদের কেউই জানবে না এই সামান্য ভূমি শয্যায় এমন একটি প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে যে তাদের প্রাণমনে ভালবাসত। সত্যিই ভালবাসত, পৃথিবীর প্রাণমাত্রকেই নিজের প্রাণের সমান মূল্যে বিচার ক'রত।